

৬০ তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

Cuk-Hos135-82-P8286

প্রবন্ধ

22



দীর্ঘজীৱা: শ্রীযুক্ত লালদাস

বৈশাখ ১৩৮২

এপ্রিল-মে ১৯৭৫



আনন্দ উৎসবে ক.হাডের

প্রসারিত সামগ্রী



ক.হাড ২৩ কোং • কলিকাতা - ১

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.
DEPOSIT PERIOD

RATE OF INTEREST
PER ANNUM

- FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS
- FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS
- FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE
BUT LESS THAN 3 YEARS
- FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE
BUT LESS THAN 1 YEAR
- FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE
BUT LESS THAN 9 MONTHS
- FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE
BUT LESS THAN 6 MONTHS

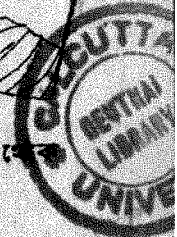
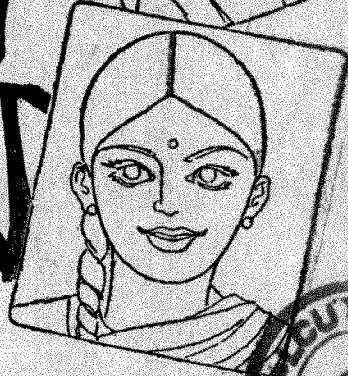
EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, IN
CONTACT:

Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES

ইউবিআই-এর রকারিং ডিপজিট স্কীমে

22



সম্মোহনের সঙ্গে

চাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কোনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে থোক টাকার দরকার পড়ে।
আপনার রকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে
এক টাকা মধ্য সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন।
আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয়
কত দ্রুত সূচ্যে কেমন বেড়ে ওঠে।

যদিও যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি
কম সময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি
১ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমালো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই
আপনাকে লেবে ৯৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

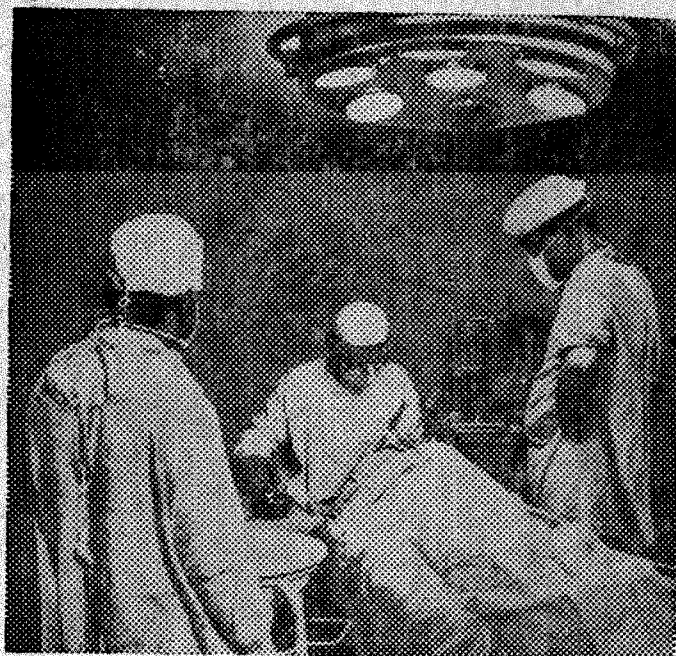
সক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
	১২ মাস টাকা	২৪ মাস টাকা	৩৬ মাস টাকা	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৭২ মাস টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯৯
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa-UBI-7427

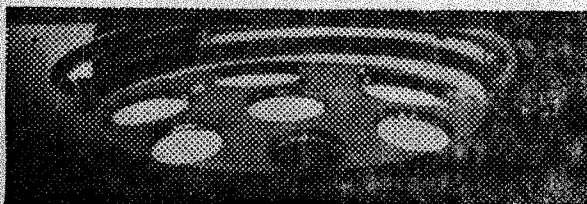


Here, a split-second power failure could mean a life lost...

but for the 'zero lag' emergency battery power from world renowned CHLORIDE

Chloride India are the unrivalled leaders in battery making. They have the finest trained experts, advanced research and development, the longest experience—all backed by the latest know-how of the world-wide, world renowned Chloride Group. This gives Chloride all it takes to bring you batteries not only tailor-made specially for supplying emergency power in operation theatres—but with built-in quality none can beat.

And this same unrivalled battery technology is playing a major role in India, providing battery power for industry, agriculture, defence, transport and communication.



Over land, air or sea—**CHLORIDE** know batteries

The CHLORIDE brands: Dagenite, Index, Chloride

Chloride India Limited

Calcutta Bombay New Delhi
Madras Nagpur Jullundur

Bata

আপনি কি জানেন?



যে আসন আপনার নামে
সংরক্ষিত নয়,
তাঁতে ভ্রমণ করা
অপরাধ।



অন্তের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত
সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু
অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কষ্টকিত এই বেনামী
ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে
চাইবেন না। যে কোন সময়েই তা ধরা পড়তে
পারতেন! ঝগড়াটের শেষ থাকতনা।

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা কিংবা মাঝ পথেই
পাথ্য হয়ে নেমে যাওয়া; অথবা ২৫০ টাকা পর্যন্ত
জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস; ভাগ্য
খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে

পূর্ব রেলওয়ে



অথৈ জলে শুধু শুধু বাঁপ দিতে যাবেন কেন?
মান-সম্মানের প্রদ্বন্দ্ব তো রয়েছে।

১৯৭৩ সালে পূর্ব রেলওয়ে-তে অন্তের
সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে
গিয়ে অসংখ্য লোক ধরা পড়েছেন।

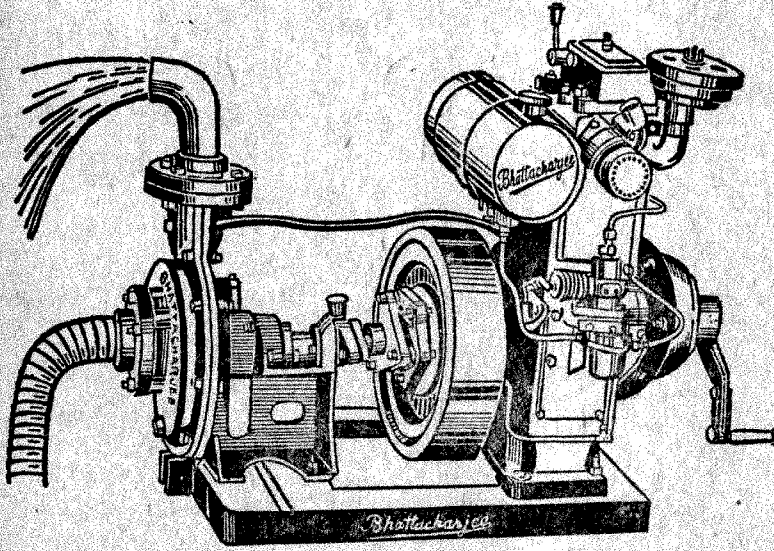
টাকা দিয়ে ঝগড়াট পোয়াবেন না। অহুমোদিত
সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট
কিনবেন।

আপনাদের আরও জালজালে
মোতা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

ভারত সরকারের আশ্রিত টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইনজেক-
সন, হেপোলাইট, ইন্ডিয়া
লাইনার, পিস্টন, ট্রান্স্কো,
ভালভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, ষ্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

প্রবর্তক সূচী : বৈশাখ, ১৩৮২

॥ সূচনা ॥

প্রবর্তক কি করিবে ?

সম্পাদকীয়

প্রবর্তকের নববর্ষ

সম্পাদক শ্রীমতিলাল

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

॥ প্রবন্ধ : রাজনীতি ও অর্থনীতি ॥

অর্থ, মানুষের অর্থ

বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির

প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ

পারুলাল দাশগুপ্ত

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রবন্ধ : সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান ॥

সাহিত্য প্রসঙ্গে

কবিমণীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত

বিজ্ঞান ও ধর্ম

বোধিচিহ্ন পরিগ্রহ ও চৈতন্যচিন্তাকাশ

কক্কীকণ বন্দনা

ভূভারত

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ সূর্যকান্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ আশা দাস

আল্‌হায়ক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

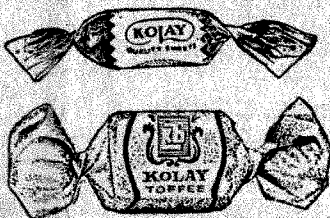
কোলে

* বিস্কুট * * *

* লাজস * *

* জ্যাম জেলী আচার * *

* স্কোয়াশ * *

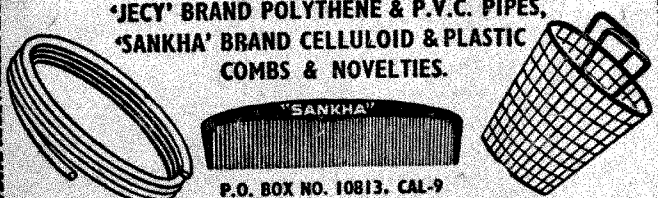





নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০

D. RATAN & Co.
Photographers **PHOTO**
 22-1, CORNWALLIS ST. CALCUTTA
 PHONE: 54-5711

ডি.রতন এন্ড কোং
 ফটোগ্রাফার্স
 ২২-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকতা
 ফোন: ৫৪-৫৭১১

GRAM: PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE: 35-4632
JESSORE COMB INDUSTRY CO.
 MANUFACTURERS OF
 'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
 'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
 COMBS & NOVELTIES.

 P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

নববর্ষে বাংলার ঘরে ঘরে বেজে
 উঠুক—আনন্দের সুর'।

এস, চন্দ্র এণ্ড কোং

বাতায়ন ও সঙ্গীতবিষয়ক
 পুস্তকের পরিবেশক

৪, ওয়েলেসলী স্ট্রীট,
 কলিকাতা-১৩

পোস্ট বক্স ৮৯২৩ ফোন : ২৪-৬৬২৩

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানজ্ঞ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিক্ত : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাছারিক্ত : অশোকারিক্ত : ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভূঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।



WHITEST
GARMENTS
•
BRIGHTEST
LIFE

WASH WITH.. **NEW** **TARGET**



DAWN INDUSTRIES
CALCUTTA • INDIA

প্রবর্তক

বৈশাখ, ১৩৮২



সংস্কর শ্রীশ্রীমতিলাল
প্রতিষ্ঠাতা : 'প্রবর্তক'

আবির্ভাব :
৮ই জানুয়ারী ১৮৮২

স্তিরোভাব :
১০ই এপ্রিল, ১৯১৯



৬০ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

বৈশাখ : ১৩৮২

এপ্রিল-মে : ১৯৭৫

প্রবর্তক

প্রবর্তক কি করিবে ?

ষাট বৎসর পূর্বে (১৯১৫) প্রথম বর্ষের পাক্ষিক
প্রবর্তকের প্রথম সংখ্যার 'অনুষ্ঠানপত্র'।

“সাহিত্যই জাতীয় জীবনগঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। বাংলার নবজাগরণকাল হইতে ইহার অদম্য উচ্ছ্বল মহাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত অথবা সর্বোৎকৃষ্ট নেতার অধীনগত করিবার চেষ্টা সাহিত্যজগতে আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা দেশের এই দাফন সঙ্কটকালে, মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্য-স্তারের মত চিত্তাকর্ষক গল্পগুজবেই পরিপূর্ণ। মানিকপত্রের সম্পাদকগণ দেশের কুচি অনুসারেই চলিয়া থাকেন। যে কয়েকখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে সেগুলি প্রাণহীন প্রস্তাবনা ও মন্তব্যে পরিপূর্ণ। ব্যঙ্গ্য করাই ইহাদের ধর্ম। অতএব স্ববৃহৎ কাগজগুলি বিজ্ঞাপন প্রচার জগতই যেন অমুঠিত। আশার কথা ‘বাঙ্গালী’র মত দৈনিক এবং ‘প্রবাহিনী’র মত সাপ্তাহিক বাংলার অনেক অভাব দূর করিবার জন্ত নূতনভাবে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে।

‘ফুড্ প্রবর্তক’ কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মস্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে রাজ্য প্রজার মর্যাদা রাখে না, প্রজা রাজবিদেষ্টা হয়, প্রজায় প্রজায় সহানুভূতি থাকে না—ঘর ঘরে হাহাকার উঠে। যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জালা অনুভব করে—‘প্রবর্তক’ সেই অমূল্য বস্তু গঠনের সহায়তা করিবে।

সেটি কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা এতটা নীচ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা উপরে সাধু

ভিতরে চোর—উপরে দেশহিতৈষী ভিতরে নিজের পায়ের কুড়াল মারিতে বসিয়াছি। রাজভক্তি প্রকাশচ্ছেলে নিজের স্বার্থ যোলজানা বজায় করিতেছি। ইহাতে না হইতেছে রাজার মঙ্গল, না হইতেছে প্রজার লাভ। উপরন্তু রাজা-প্রজার মধ্যে একটা ভীষণ সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এই চরিত্রের অভাববশতঃই গুণীর আদর নাই, সর্বভোগীর সম্মান নাই, উপযুক্ত লোকের কর্মক্ষেত্র নাই। এই চরিত্র দেব-চরিত্র। মানবচরিত্রের সঙ্গে ইহার কোনখানেই মিল নাই। ইহা মানব-বুদ্ধির অতীত। মানুষের কর্তব্য, মানুষের জ্ঞান, মানুষের চরিত্র যাহা তাহা আজ যুরোপে প্রকট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। পণ্ডিত জ্ঞান জাতির পৈশাচিকতার কাহিনী কাহারও অবিদিত নহে। বাঙ্গালী দেব-চরিত্র লাভ করিবে। এই চরিত্র সাধনার সামগ্রী। বাঙ্গালীকে এই দেবদুল্লভ পরিপূর্ণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর যাহা আছে তাহার উপর দাগ-রাজী করিয়া কিম্বা তাহাকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া দাঁড় করাইলে চলিবে না। একবারে পুরাতন বনিয়াদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতনভাবে নূতন বনিয়াদ হইতে তাহার এই স্তমহান চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাই হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।

‘প্রবর্তক’ এই কার্যের আরম্ভ মাত্র। ইহার অধিক আমরা এক্ষণে বলিতে অসমর্থ। ফলাফল ত্রীকূলে সমর্পণ করিয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

সংস্কার

ততঃ কিম্ ?

‘অথাৎ: অর্থজিজ্ঞাসা’র পরে প্রশ্ন ‘ততঃ কিম্’—তারপর কি? প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল।

প্রবর্তক সজ্জের দৃষ্টা ও স্রষ্টা শ্রীমতিলাল। তাঁরই ব্যক্তিত্ব ও যুগান্তিসন্ধির প্রলম্বিত ভাবরূপ সজ্জ। সজ্জের ভাববাহী পতাকা প্রবর্তক পত্রিকারও তিনি ছিলেন আলোকদিশারী প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ।

সজ্জের লক্ষ্য—ভাগবত ধর্ম, ভাগবত জীবন ও ভাগবত জাতিগঠন—শুধু ভাবগত নহে, বস্তুগত। তাই সজ্জের নিত্যদিনের বাস্তব ব্যবহারিক জীবন লইয়া কারবার।

সত্য সংযম সম্বন্ধ ভাগবত জীবনসাধনার মৌল প্রয়োজন। সত্য তাহাই যাহা নিত্যসত্ত্বাবান—যাহা অপরিণামী। এই অপরিবর্তনীয় পরম চৈতন্যের জ্ঞানই বস্তুতঃ বাস্তব বস্তুজ্ঞান। ইহাই জীবের ইষ্ট ভগবান আত্মা। ভারত শাস্ত্রের নির্দেশ—এই আত্মজ্ঞানই বেদ। ইহাই পরাবিদ্ধা। সূর্যের আলোকরণি চক্ষু-গোলকে প্রতিফলিত হইলে সেই আলোকে সূর্যদর্শনের সঙ্গে এই আত্মজ্ঞান তুলনীয়। আত্মজ্ঞান নিত্য অপরিবর্তনীয়। এই পরাজ্ঞান ব্যতীত অপর সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই অপরা জ্ঞান—আপেক্ষিক, যাহা বস্তুতঃ বস্তুর মিথ্যাতান। সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কালক্ষেভা—কালের আবর্তে বিক্ষেভিত—পরিবেশের পরিবর্তনে পরিবর্তিত। মন ইন্দ্রিয়ঘটকের মাধ্যমে এই বাহ্যজ্ঞান আহরণ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়জ্ঞান জীবস্বরূপের স্বাভাবিকী ভগবৎ অভিমুখী যে নিত্যাবৃত্তি তাহার বহিমুখী প্রবণতা আনিয়া অনর্থ ঘটায়। পুত্র, বিত্ত, অর্থসম্পদ ভোগে মনের যে মুখৈষণা তাহাই এই বিপত্তির হেতু।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবানক্রমে সেই নির্বিকল্প পরম চৈতন্যের যে বাস্তব বিকল্পমুখীনতা তাহার সম্বন্ধী যে ধর্ম তাহাই ভাগবত ধর্ম। সজ্জের সাধ্য প্রেমৈক্য

এই ইষ্ট ভগবান সম্বন্ধকেন্দ্রিক। সংযম—ইন্দ্রিয় সংযম এই অপ্রাকৃত জীবনসমষ্টির সৌধ রচনার বনীয়াদ।

ভারতে ভাগবত জীবনগঠনের অনন্ত বৈশিষ্ট্য সংযম ব্রহ্মচর্য সদাচার, যাহাকে বিশ্বের কোন ধর্ম ক্ষেত্রে এমন প্রাথমিক ও প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই। ঋষি ভারতের ঘোষণা, ধর্ম স্বতন্ত্র কিছু নহে, জীবনই ধর্ম। জীবনবাদী প্রবর্তক সজ্জ তাই সংযম ও ব্রহ্মচর্য প্রাথমিক কৃত্য হিসাবে গৃহীত।

প্রকৃতপক্ষে জীবনধর্মী ভাগবত জীবন ও ভাগবত জাতির ভিত্তি সংযম। সংযমসিদ্ধ যোগজীবনের লক্ষণ সজ্জগুরুজী দিয়াছেন : “আত্মা মস্তিষ্ক সিদ্ধ করতে হবে। অন্তঃকরণ বুদ্ধি মন প্রাণ তবে সিদ্ধ হবে। বুদ্ধি প্রভৃতি ভাগবত যন্ত্র হলে দেহ দৈশ্বর (অর্থাৎ জগদ্ধিতায়) সেবায় ধৃত হবে। বুদ্ধি যেমন যুক্তির করণ, হৃদয় তেমনি বুদ্ধির আশ্রয় অনুভব করে। প্রাণ এই আশ্রয়ের অভিব্যক্তি দেয়। দেহটা বিজ্ঞাপন—অন্তরের সাধন গোপন রাখে না। বিজ্ঞাপন শিক্ষায় ও নিকাম অর্থসাধনায়।”

সজ্জগুরুজীর ভাগবত জীবনগঠনের তত্ত্ব বিজ্ঞান ও নিগূঢ় মর্মকথা এখানে সুপরিষ্কৃত।

অথাৎ: অর্থজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে হৃদয় ও প্রাণের কথা অভিব্যক্ত। কাম কাঙ্ক্ষন শোধনের ফলশ্রুতি ভাগবত জীবন। ইন্দ্রিয়শ্রয়ী কাম অর্থাৎ মুখৈষণা হৃদয়ে স্থির হইলেই ইন্দ্রিয়পীড়ন হইতে মুক্তি ঘটে। এই শোধিত কামের মনোহর মূর্তি ভাগবত সৃষ্টি বা সমষ্টি ভীমেন হয় প্রকটিত। ভগবানের প্রকট মূর্তি জগতের সেবার্থে অর্থসাধনায় হয় প্রাণশক্তির শুদ্ধ সিদ্ধ বীর্যের প্রকাশ। কিন্তু ইহার পরেও কথা আছে ততঃ কিম্ সঙ্কেতে। ব্যক্তি সমষ্টি তথা ভাগবত জাতিগঠনের সামগ্রিক মর্ম এই ছোট বীজগর্ভ কথাটির মধ্যে সম্পূর্ণ। রক্তমাংসের শোধন পর্যন্ত সজ্জগুরুজীর দাবী। এই শোধন সিদ্ধ গোষ্ঠীই নূতন থাকের মানুষ—ভাগবত সজ্জরচনার অধিকারী। একটা সমষ্টির জীবনে এই কঠিনতম আদর্শ ও লক্ষ্য সিদ্ধির অগ্নিপরীক্ষাই তিনি নীরবে আমৃত্যু তপস্তা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, এমনটি যদি সজ্জজীবনে সিদ্ধ হয় তবে তাহাই হইবে

প্রবর্তক সজ্জের জন্মের সূচনা লক্ষণ। অর্থ সম্পদও বাহ্য। শ্রী ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির উপর তিনি কোন জোর দেন নাই। তাঁর কাব্য বস্তুতন্ত্র সমষ্টি ও জাতিগত ভাগবত জীবন গঠনের সফল নজীর বিরল। বৈদিক যুগোত্তর-কালে খণ্ডিত-মর্যাদা পদচিহ্ন তাহাও মধ্যযুগীয় পরাধীন ভারতে মুছিয়া গিয়াছে। তাই তিনি যেন নৈরাশ্যের সুরেই একরকম স্বগতভাবেই বলিয়াছেন, “কে জানে এই অপ্রাকৃত প্রেমের ক্ষেত্র আমরা লাভ করব কি না! কিন্তু এই অর্ধ ভাগবত জীবনই সজ্জের কাম্য।”

এই শুদ্ধ সদাচারমূলক সংযমপূত জীবন যে বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সংজ্ঞা একটি কথায়

ঋষি-ভারত দিয়াছে—চরিত্র। ভারতবর্ষ এই চরিত্রের পূজারী। ইন্দ্রিয় তথা মনোজগতকেই ভারতবর্ষ জগজ্জয়ী বীর আখ্যা দিয়াছেন—‘জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন’।

সজ্জগুরুজীর জীবনসাধনার মূল সুরটিও তাই চরিত্রগঠন। ৬০ বৎসর পূর্বে (১৯১৫) পাক্ষিক প্রবর্তকের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠানপত্রে ইহারই মূহু গুঞ্জন তিনি তুলিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান পত্রটি প্রারম্ভেই প্রকাশিত হইল। এই পত্রে সমসাময়িককালের সাহিত্যের তথা পত্র-পত্রিকার গতি-প্রকৃতি, দেশ ও মানব চরিত্রের কথাও জানা যাইবে

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তকের নববর্ষ

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

(সভাপতি: প্রবর্তক সজ্জ)

“প্রবর্তক”—একটি যুগের নাম-রূপ। নামে—পত্রিকা। রূপে—সজ্জগষ্টি। প্রবর্তক প্রথমে পাক্ষিক, পরে মাসিক, প্রথমে চন্দননগরে প্রকাশ, পরে ঐতিহাসিক ঘটনায় ও প্রেরণায় কলিকাতায় স্থানান্তর। প্রবর্তক সজ্জেরও বীজ ও অঙ্কুর চন্দননগরেই—তার শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়াছে, ছড়াইতেছে, ছড়াইবে—গ্রামে, নগরে, মহকুমায়, জেলায়—দেশ থেকে দেশান্তরে। নামের আবির্ভাব সহজল স্বর্ণাক্ষরে—সজ্জগুরুজীর চিদাকাশে। মহাশয় শ্রীঅরুণচন্দ্রের ইংরাজী “Arya” নবযুগেরই বাণীপ্রকাশের সূচনা করে—১৫ই আগষ্ট, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। বাংলায় “প্রবর্তকের” প্রথম প্রকাশ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে।

পণ্ডিচেরী থেকে “আর্য্য”—চন্দননগর তথা কলিকাতা থেকে “প্রবর্তক”। ‘আর্য্য’ আজ আর নাই, আছে ‘প্রবর্তক’। ‘প্রবর্তক’ আজ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহা তাই তার ‘Diamond Jubilee’ অর্থাৎ হীরক-জুবিলীরই সত্ত্বৎসর।

ইতিহাসেরই স্বাক্ষরে ‘প্রবর্তকের’ মিশন অর্থাৎ জীবন-ত্রত এখনও ফুরায় নাই।

(২)

‘প্রবর্তকের’ জন্মবর্ষের ১ম সংখ্যার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান-পত্রে সজ্জগুরু লিখিয়াছিলেন: “প্রবর্তক কি করিবে? প্রবর্তক নূতন ভাবের ভাবুক করিবে, নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মস্ত্রে দীক্ষা দিবে। বাহা না থাকিলে মানুষে-মানুষে সহানুভূতি থাকে না—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—বাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জালা অনুভব করে—প্রবর্তক সেই অমূল্য বস্তু-গঠনে সহায়তা করিবে। সেটা কি? চরিত্র। এই চরিত্র দেবচরিত্র। ইহা মানববুদ্ধির অতীত, ইহা সাধনার সামগ্রী। প্রবর্তক এই কার্যের আরম্ভ মাত্র।”

মহাশয়ের অনুপ্রেরণা লইয়াই এই কার্যের আরম্ভ। “প্রবর্তক” আমি লিখি আর না লিখি, আমার মধ্য দিয়া “ভগবান্ মতিকে লিখাইতেছেন”—এ অন্তরঙ্গ স্বীকৃতি শ্রীঅরুণচন্দ্রেরই। সংক্ষিপ্ততম মর্ম্ম প্রকাশে সজ্জগুরু

প্রতি মহাশয়ের ইহা পরম আশীর্বাদ। এ আশীর্বাগীর স্বাদ, শক্তি, তাৎপর্য নিগূঢ়, অনির্বচনীয়, অতুলনীয়।

(৩)

“প্রবর্তক” সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের আরও আশীর্বাদ আছে। ছাপার পরেই পণ্ডিতেরা ‘প্রবর্তক’ যথার্থি প্রেরিত হইলেই, শ্রীঅরবিন্দ তাহা নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া লইতেন, পত্রিকার প্রকাশে বিলম্ব হইলে তিনি চিন্তিত হইতেন, এমন কি স্থায়ী অব্যাহত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দূর করার জন্ত আশ্বাস দিতেন, পত্রিকার উৎকর্ষের জন্ত পথনির্দেশ করিতেন। এরূপ একখানি পত্রে মহাশয় লিখিয়াছিলেন :

“What has become of the Prabartak? The last number was very good, but for a long time we have had no other. Is the administration withholding visa or are there other reasons for the irregularity? I hope it is not a discontinuance. We have the Arya here visaed without delay or difficulties.

If you have difficulties of any kind, it is well to let me know at once; for I can then concentrate what force I have more particularly to help you. The help may not be always or immediately effective, but it will count and may be more powerful than a general will, not instructed in the particular necessity. You must not mind, if you do not get always a written answer, the unwritten will always be there.”

এই চিন্তা ও চেষ্টায় তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভয়-দানের অন্তরঙ্গোচিত প্রেরণা অনুভব্য। ‘প্রবর্তকের’ প্রকাশ যাঁহাতে নিয়মিত ও অব্যাহত হয়, তজ্জন্ম তাঁহার কি গভীর ও ঐকান্তিক আকুলতা ছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়, চিত্ত গৌরবে ও পুলকে শিহরিয়া উঠে।

(৪)

মহাশয়ের কারুণ্যমিশ্র আর একখানি পত্রের কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছিলেন :

“It seems to me that Prabartak is getting

on well enough as it is, though if Nalini* could write, it could produce an element of greater variety.

You should be able to develop more writers with the necessary spiritual experience, grasp of the thought and literary ability—these things the inner Shakti can bring to the surface if it is called upon for them—so that Prabartak will not have to depend on three or four people for its sustenance.”

ইহা প্রতিভাসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি প্রেরণা ও সাধনা। নূতন লেখক-লেখিকাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রচনাশক্তির উন্মেষ—অন্তরশক্তির উদ্বোধনের উপর নির্ভর করে; মহাশয় তাহা জানিতেন। সেই সূক্ষ্ম অন্তরশক্তির উদ্বোধনেরই নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। এই স্বচ্ছ সম্বন্ধে প্রতিভার জাগরণ ও প্রকাশের সুস্পষ্ট সন্ধান তিনি উত্তর-পুরুষদের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা অব্যাহতজ্ঞান-সম্বৃত অয়োব বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে। শক্তি আছে অন্তর-মূলে—Inner Shakti. এই অন্তঃশক্তি ভিতরে ঘুমাইয়া

আছেন—তাঁহাকে জাগাইয়া, ভিতর থেকে বাহিরে ডাকিয়া আনাই প্রয়োজনীয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, চিন্তার গ্রাহিকাশক্তি, রচনার প্রকাশক্ষমতা—অন্তরে অধিনিহিত এই গুণগুলিকে প্রবুদ্ধ, সক্রিয়, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত অবস্থায় বিকশিত ও পরিণত করাই চাই—“These things the inner Shakti can bring to the surface, if it is called upon for them—

এই আবাহন করার অঙ্গান্ত ইঙ্গিত গুরু দিলেন শিষ্যকে। “আমার মধ্য দিয়া ভগবান্ মতিকে লিখাইতেছেন”—এই সংক্ষিপ্ত কথারও গূঢ় মর্মগত ইঙ্গিত তো ইহাই!

এই অন্তর্নিহিত প্রতিভাশক্তির উদ্বোধন ও ক্ষুরণেই তো প্রকাশের পূর্ণ সার্থকতা! এখানে শ্রীশুকশক্তির চাই দক্ষণ বা স্পর্শ, আদেশ বা আবেশ, তাঁহারই করুণা বা প্রেরণার—আবাহন। “প্রবর্তকের” ক্ষেত্রে এই

কুণ্ডলিনী প্রতিভার উন্মেষ ও পরিশীলন আরও জীবন-দৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি ও পাইয়াছি। ‘প্রবর্তক’র

* পণ্ডিতেরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীনালিনী কান্ত গুপ্ত।

ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হইবে—এই সিদ্ধবিজ্ঞানেরই অনুসরণে
ও সাধনায়। “প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের” স্বষ্টি ও সাধনা
এই মূল বীজগত উদ্দেশ্যকেই সার্থক করুক—এই প্রার্থনা।

(৫)

প্রবর্তকের বার্ষিক প্রচার—নবজাতির জন্ম ও জীবন।
প্রবর্তক সজ্জের জীবনব্রত তাহাই। তাই জাতির
জীবনসাধনার সঙ্গে প্রবর্তক পত্রিকা ও প্রবর্তক সজ্জের
জীবন বিকাশ ও প্রোত বিজড়িত। বাংলার স্বদেশীযুগ,
বিপ্লব-যুগ, স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতাওয়ার সংগঠন-যুগ,
মহাশূন্যর ভাষায় ‘তন্ত্রের পর বেদান্ত’—প্রবর্তকের বকে
ধারাবাহিক রেশমপাত করিয়াছে। জাতির সাধনা
প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। জাতির ইতিহাস
প্রবর্তক সজ্জের জীবনধারায় লীলায়িত, রূপায়িত।

স্বাধীনতা-সাক্ষ্য প্রবর্তকসজ্জ ঐতিহাসিক বিপ্লববীথে
পরিণত হইয়াছিল। বিদেশী রাজশক্তির সন্দেহদোলায়
নিপতিত প্রবর্তক-সাহিত্যসম্ভার “Sea Customs Act”-
এ চন্দননগরের বাহিরে যাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।
‘প্রবর্তক’ প্রকাশিত বিশেষ কয়েকখানি গ্রন্থ বৃটিশরাজ-
কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহিত
মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ ফরাসী-গভর্নমেন্টও ইংরাজের
বিরুদ্ধে রাজদ্রোহপরাধে অভিযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ত
‘প্রবর্তক’কে তিন মাস বন্ধ করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজের
সংশয়মোচনের জন্ত ফরাসী অধিকারের নিরাপদ আশ্রয়
হইতে ছাপাখানা লইয়া বৃটিশ ভারতের প্রধান নগরী
কলিকাতার বকে ‘প্রবর্তক’ পত্রিকাকে নব
পর্যায়ে নব কলেবরে বাহির করিতে আমরা বাধ্য
হইয়াছি। এই সকল ঘটনার রোমাঞ্চকর কাহিনী ও
যুগান্তকর ইতিহাস ‘প্রবর্তক’ যথাস্থানে, যথাকালে
লিপিবদ্ধ আছে। ‘প্রবর্তকের’ পাতায় ভারতের সংস্কৃতি
ও ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধীজির সত্যগ্রহ ও অহিংস
অসহযোগ আন্দোলন, রাজা রামমোহন হইতে ঠাকুর
রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ
গোস্বামী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন,
কানাইলাল, রাসবিহারী ও নেতাজী স্বভাষচন্দ্র—
সকলের কথ্য ও কীর্তি, দেশসাধনার পরিচয়—সবই
একাধারে মিলিবে।

মোড়, ঘুরাইয়া সংগঠনের পথে প্রবর্তক সজ্জ অগ্রগামী
হইয়াছে। জাতিকেও ডাক দিয়াছে ‘প্রবর্তক’—সংগঠন-
ব্রতী হইবার জন্ত। জাতীয় শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা
একদিকে, অন্যদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার তপস্যায় সর্বাত্মক
ভাবে বাঁপ দিয়াছে সজ্জের মানুষ—পরমপূজ্য সজ্জগুরু
লেখনী অনর্গল ধারায় সেখানে আশা ও আদর্শের আলো,
অগ্নিময় উৎসাহ এবং অনাহত অমুপ্রেরণাশক্তি
যোগাইয়াছে। ‘প্রবর্তকের’ ডাকেই ছুটিয়া আসিয়াছে
দেশের আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, মেধাবী তরুণের দল—অথও
বাংলার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চতুর্দিক হইতে
তাহারাই দিকপালরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে প্রবর্তক সজ্জ।

এই ‘প্রবর্তকের’ বার্ষিক প্রবর্তক সজ্জের সাধনা
এখনও শেষ হয় নাই—তাই ‘প্রবর্তকের’ মিশন ও তার
সমুখের ভবিষ্যৎ অনন্ত ও অক্ষুরন্ত।

(৬)

আজ ‘প্রবর্তকের’ নব বর্ষে—তার হীরক জুবিলী
সম্বৎসরের প্রবেশমুখে সেই দূর ভবিষ্যৎকে হাতছানি
দিয়ে ডাক দিতেছি—বরাভক্ষরা মহামাতৃশক্তির দিব্য-
ঘনস্নেহভরা আহ্বান জানাইতেছি—গভীর-গাঢ়-উদাত্ত
স্বরে—‘এহি’ বলিয়া—যাহারা উত্তরাধিকারী নবীন
অগ্রদূত তাহাদিগকেই।

ওগো অতীত—প্রসন্নচিত্তে ইহাদিগকে আশীর্বাদ
কর। ওগো বর্তমান—উদার স্নেহ হৃদয়ে ইহাদিগকে
স্বাগত জানাও, ইহাদের সহায় হও।

ওগো নবীন—‘প্রবর্তকের’ বিজয়পতাকা স্বন্ধে তুলিয়া
উদীয়মান নবজাতির জীবন-সাহিত্য ও সাহিত্য জীবনে
আগামী নবযুগ-প্রবর্তনের জন্ত বীরদর্পে, অসীম সাহসে,
ও বুকভরা উৎসাহ লইয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হও।

হে নূতন বাংলা, তথা নূতন ভারতের ভবিষ্যৎ—
সম্বৎসরের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতে, হীরকছাত দিকে-দিকে
বিকীর্ণ করিয়া,—বিশ্বমানবের শান্তিমন্ত্রদাতা জ্যোতির্ময়
জগদগুরুরূপে তুমি আবিস্কৃত হও—আবিষ্কৃত হও—

“আবিরাবিম”—এধি

রুদ্ধ যন্ত্রে দক্ষিণ মুখ তেন মাং পাহি নিতাম্”

ও শান্তি:—শান্তি:—শান্তি: হরিরোম্

জয়, মানুষের জয়

পান্নালাল দাশগুপ্ত

সায়গনের নতুন নামকরণ, হো-চি-মিন নগরী। এর চেয়ে যোগ্য ও সুন্দর ঐতিহাসিক নামকরণ আর হতে পারে না। ভিয়েতনামবাসীদের একটিই মাত্র দুঃখ যে ইতিহাসের এই স্বর্ণসন্ধিক্ষণে হো-চি-মিন জীবিত নেই। পৃথিবীতে অনেক দেশেই বিপ্লব হয়েছে, আরও হবে, অনেক দেশেরই স্বাধীনতার সংগ্রামে ইতিহাস ও মানবজাতি সমৃদ্ধ। ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিশেষ অবদান হলো, মানুষের উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। পাশবিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, যন্ত্রশক্তি ও অর্থবলের কাছে মানুষ—সাধারণ মানুষ—অত্যন্ত নগণ্য, দুর্বল ও অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল! তার উপরে সাধারণ মানুষের চরিত্র ও হাল-চাল যদি লোভ মোহ প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয়ে যায়, জনজীবনেও ভ্রষ্টাচার সংক্রামিত হয়, তখন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বভাবতই নৈরাশ্য দেখা দেয়। হো চি মিনের ভিয়েতনাম এর বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মানবজাতির আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলো। এটাই বোধহয়—এই মানুষের জয়—ভিয়েতনাম বিপ্লবের বিশেষ দান, অমূল্য ঐতিহাসিক নৈতিক সম্পদ।

আমেরিকার সিনেটের সংখ্যাগুরুদের নেতা মাইক ম্যানস্ফিল্ড, এই উপলক্ষে বলেন, “যে শোচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা গেলাম, তাতে দেখা গেল যে আফ্রিকের পৃথিবীর যাবতীয় প্রশ্নের জবাব বা সমাধান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নেই। আমাদের কোন্ অস্ত্র না ছিলো, সবই তো ছিল। অপর পক্ষের হাতে আফ্রিক অর্থেও কিছুই ছিল না বলা চলে, কেবল মাত্র নিজেদের দেশকে রক্ষা করার জন্য অনমনীয় এত প্রতিজ্ঞা ছাড়া।” মহাত্মাগান্ধী জীবিত থাকলে হয়তো বলতেন এই সংগ্রাম অহিংসার সঙ্গে হিংসার—যদিও আফ্রিক অর্থে নয়, যে অর্থে হিটলারের আক্রমণের সময়ে পোল্যান্ডের সংগ্রামকে তিনি প্রায় অহিংস সংগ্রাম বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড যখন ঘোষণা করেন যে ভিয়েতনামের যুদ্ধের অবসান হলো, অন্তত আমেরিকার পক্ষে

অবসান হলো, তখন নাকি আমেরিকার নগরে নগরে ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতীরা নৃত্য করতে থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রেঃফোর্ড যখন বলেন যে অতীতের কথা ও দায়দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে, এবং “পৃথিবীর এইটাই শেষপর্ষ নয়, আমেরিকান নেতৃত্বের এইটাই শেষ কথা নয়,” তখন নৃত্যরত ছেলেমেয়েদের আবার ভেবে দেখতে হবে, এ জাতীয় নেতৃত্বের উপরে তাদের কতটুকু ভরসা রাখা উচিত। কিসিজার তো সারা পৃথিবীকে একটু যত্ন ধমকানি দিয়েও বলেছেন যে ভিয়েতনাম থেকে চলে আসার অর্থ এই নয় যে, আমেরিকা তার (বিশ্ব) দায়-দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, সকল মহাদেশ বা সকল মহাসমুদ্র থেকে তারা হটে যাবে! এই কিসিজার সাহেবের দায়-দায়িত্বের বহরটাও কম নয়—যদিও তাকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়!! নিম্ননকে কুপরাশ দিয়ে নিরীহ ক্যাম্বোডিয়াবাসীদের এই যুদ্ধে নামানো বা ক্যাম্বোডিয়াতে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব ডঃ কিসিজারের, কেননা তিনিই নিম্ননকে বোঝান যে নিরপেক্ষ ক্যাম্বোডিয়ার বনজঙ্গল প্রান্তরকে উত্তর ভিয়েতনামীরা ও ভিয়েতকংরা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। জোর করেই ক্যাম্বোডিয়াকে এই যুদ্ধে নামায় কিসিজার। তারপর হানয়ের উপর অনিবার্ণ বম্বারি করার পরামর্শও কিসিজারই দিয়েছিলেন—১৯৭২ সালে।

বলাবাহুল্য আমেরিকার শাসক গোষ্ঠির প্রায় সকল নেতার হাতই এই নোংরাযুদ্ধে রক্ত কলঙ্কিত। ১৯৫০ সালে আইসেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেসের হাত দিয়েই এই নোংরা অধ্যায়টি শুরু হয়। এমন যে কেনেডী ছিলেন, যার বিশ্বময় একটা খ্যাতি আছে—উদারনৈতিক মহলে, তাঁর আমলেই উপদেষ্টা নাম করে প্রকৃতপক্ষে সাদাপোষাকের আমেরিকান সৈনিক, অফিসার ও সেনাধ্যক্ষরা ভিয়েতনামে অবতরণ করে। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট লিনডন জনসন প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য সামন্ত নাবান এবং রীতিমত যুদ্ধে অবতরণ করেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে জনসন প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। বলা যায় সেদিনই আমেরিকান জনসাধারণ এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবার মত একটা সক্রিয় রায় দেয়। কিন্তু তার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়ে আবার এই যুদ্ধকেই জোরদার করেন। ডঃ কিসিজার চীন ও রাশিয়ার সাথে দৈত্যত বা প্রকাশ্য বৈরীনীতি বর্জনের কৌশল নিলেও, ভিয়েতনামীদের জঙ্ক করার নীতি বর্জন করেন না। যেটা করেন, ১৯৭৩ সালে প্যারী চুক্তির ফলে, সেটা হল প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকান সৈন্য সামন্ত সরিয়ে নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামী তাবেদার সরকারকে অস্ত্রশস্ত্রে চূড়ান্তভাবে সজ্জিত করে দেওয়া এবং উত্তর ভিয়েতনাম যাতে বাড়াবাড়ি না করে, তার জন্ত তাদের বিরাট সপ্তম নৌবহরকে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে মোতায়েন করে রাখা। ৫৬০০০ আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যুর পর, পাঁচ লক্ষ হতাহতের পর, ১৫০ বিলিয়ান ডলার খরচের পর, আমেরিকা বুঝতে পারে যে তার শক্তির বা রিজার্ভেরও একটা সীমা আছে। তার জন্তই তারা ১৯৭৩ সালের প্যারী চুক্তির অবসরে বা স্থগোণ নিয়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে “ভিয়েতনামীজেন্সন” নীতি প্রবর্তিত করে—যার অর্থ ভিয়েতনামীরাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ করুক। প্রেসিডেন্ট থিউ সরকারকে সাতলক্ষ অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বাহিনী করে দেয়, যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য পাঁচ বিলিয়ান ডলার (এক হাজার মিলিয়ানে এক বিলিয়ান)। ছয়শত (৬০০)

ফাইটার বম্বার দেয়, আর দেয় নয়শত (৯০০) হেলিকপ্টার ও প্রচুর স্প্যার-পার্টস্! কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাসের যুদ্ধে সব কিছু হারাতে হয়, এমনকি প্রাণ নিয়ে পলায়নের এমন লজ্জাকর দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যত বিস্ফোরক পদার্থ আমেরিকা ব্যয় করেছিল, তার দেড়গুণ এখানে ব্যবহার করে। বনবনান্ত পুড়ে ছারখার হয়। ভিয়েতনাম ও ক্যাম্বোডিয়ার যে কত ক্ষতি সাধন করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমেরিকার নিজস্ব ক্ষতি তার তুলনায় (১৫০ বিলিয়ান ডলার বা হাজার পঞ্চাশেক আমেরিকান প্রাণ) কিছু নয়। সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়েছে, আমেরিকার পক্ষে নৈতিক দিক থেকে, রাজনৈতিক মর্যাদার দিক থেকে। কিন্তু ভিয়েতনাম এক অক্ষয় ঐশ্বর্যে বলীয়ান হয়েছে। নৈতিক বলের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য দিয়ে, কোন সন্দেহ নেই যে, কয়েকবছরের মধ্যে ভিয়েতনাম তার যাবতীয় যুদ্ধক্ষমতালি মুছে ফেলে দিয়ে আবার সোনার সবুজ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে। সেখানকার মানুষের চরিত্র থেকে প্রাণভয়, লোভ, মোহ, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতা দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, এক প্রাণ একতার সত্যিকার একজাগ্রতি করতে পারলেন তারা। (আমাদের মত গুটিকয়েক দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে চিরকালের এক দেশকে খণ্ডিত করার অবিধাবাদ এখানে অরণীয়) তারা শুধু দেশ স্বাধীন ও একই করলো না, দেশগঠনের কার্যক্রম সম্বন্ধে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পারছেন—যাতে দেশ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গড়ার কথাটা কম নয়।

“...আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্ত সকল ভিয়েতনামী জাগো—
পুরুষ হও নারী হও, যুবা হও বৃদ্ধ হও, যাই হোক পাটি আত্মগত্যা, যাই
হোক জাতীয়তা। হাতের সামনে যা পাও তাই নিয়ে লড়াই করো।
...চূড়ান্ত সময় এসে গিয়েছে। আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্ত
আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা উৎসর্গ করব।”

—হো চি মিন

বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ

(০০৬) শ্রীমানপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা করতে বসে, ভারতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গ আপনা হতেই এসে পড়ে। বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতি কোন পথে? সরকারের মিশ্র-অর্থনীতি দেশে শিল্পবিপ্লব আনতে পেরেছে কি না অথবা, কৃষিক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব'-সত্যিই সফল হয়েছে কি না এমনতরো বহু প্রশ্ন মনে ভীড় করে।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার বলেছিলেন 'সভ্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ?' তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও ভাবি সত্যিই কি বিচিত্র আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্র! একদিকে যে দেশ পরপর দুই বছরে দুটি মুগ্ধাঙ্গকারী বৈজ্ঞানিক সাফল্যলাভ করেছে, সেই একই দেশে আজ স্বাধীনতার ২৮ বৎসর পরেও শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্যকতা ছিল প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। কিন্তু হুঃখের বিষয় উপযুক্ত অর্থের বিনিয়োগ এবং প্রযত্নের অভাবে খাদ্যসমৃদ্ধি আজো প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াতেও, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্যঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ এবং ১৯ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫-এ রবিশস্তুর প্রচুর ফলন দেখে কৃষিমন্ত্রী আশা করছেন, দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা, খাদ্য ঘাটতি থেকেই যাবে এবং ভারতকে প্রায় ১কোটি টন খাদ্যশস্ত্র আমদানি করতে হবে। এর কারণ এই যে সরকার দূরদৃষ্টি নিয়ে খাদ্যসমস্যার মোকাবিলা করেন নি। ভারতের মোট রাজস্বের শতকরা ৫০ভাগ কৃষির অবদান, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ মোট পরিকল্পনার নিয়োজিত অর্থের পরিমাণের মাত্র এক পঞ্চমাংশ।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেখি উৎপাদনের হার ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ এ মাত্র ১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যদিও শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আশা করছেন, ১৯৭৪-৭৫এ শিল্পোৎপাদনের হার ৭.৫ শতাংশ হবে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মনে হয়, এই হার ১ থেকে ১.৫ শতাংশও হবে না। বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের শতকরা হারের নমুনা

দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়—যেমন, ইস্পাত ও লোহা (৫৮), রেলের ওয়াগন (৩০), কৃষির যন্ত্রপাতি (৫০), বৈদ্যুতিক মোটর (৫৫), মোটর গাড়ী (৫২), কোক কয়লা (৬৫) ইত্যাদি।

এর অবশ্য একটা প্রধান কারণ দেশে অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি। ১৯৭২ এর জুনমাস থেকে দেশে কৃষিজ দ্রব্য ও শিল্পের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি শুরু হয়। এর জেরে প্রায় ১৯৭৪ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। তারপর মূল্যমান কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা পেলেও, শিল্পক্ষেত্রে শুরু হয় উৎপাদন হ্রাসের প্রতিযোগিতা। কারণ, দেশে মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকার সাধারণ চাহিদার ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরবার জুড় তিনটি অভিযান জারী করেন (যেগুলি পরে লোকসভায় আইন সিদ্ধ হয়) যেমন, (১) বাড়তি মজুরী প্রাপক ও (২) আয়কর দাতাদের জুড় বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প। তৃতীয়টি, শেয়ারের ডিভিডেন্ডের ওপর বাধানিষেধ যাতে সর্বোচ্চ ডিভিডেন্ডের সীমাতানা হয় ১২ শতাংশ বা, নীটলাভের ১/৩ অংশ যেটা কম হয়। এরপর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আরো কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যথা, পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হল, নতুন করে বাজেট পেশ করা হল (১৯৭০-৭৪এ বাড়তি করের বোঝা হল ৯০৫ কোটি টাকা), বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারগুলি থেকে নতুন করে ধার ভিক্ষা করা হল, বিদেশী পুঁজি গুটিয়ে নেওয়া হল ইত্যাদি। এইসঙ্গে সরকার আরো একটি কাজ করলেন তা হল, মজুতদার ও চৌরাই-চালানীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান, কালোচাকার চলন বন্ধ করার জুড়।

উপরোক্ত উপায়গুলি কার্যকর হওয়াতে পণ্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা কমে গেল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পে নেমে এল এক অস্থিতকর অবস্থা। প্রায় গত অক্টোবর থেকে, যাতে করে শিল্পোৎপাদনের হার অনেকখানি নীচে নেমে এল। এতে মনে হয়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকার যেন শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতির রাশ টেনে ধরেছেন।

অপরপক্ষে ১৯৭৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, সার, খাদ্যশস্য প্রভৃতির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩এর ১০৪ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৩-৭৪ এ ৪৩৮ কোটি টাকা ঘাটতিতে দাঁড়ায়। ১৯৭৪-৭৫ এর প্রথম ৯ মাসে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ৫৮৫ কোটি টাকা।

অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে শনির দশা গিয়েছে, ১৯৭৩-৭৬ এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি যদিও আশা করা যায় (রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ সুবিধাদান ও রবিশস্ত্রের অধিক ফলনের আশায়) কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ যে আবার দেশকে গ্রাস করবে না, একথা জোর করে বলা যায় না। অক্টোবর ১৯৭৪ থেকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ যেটুকু কমান্তির দিকে তাতে করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আসবে না। সরকার যেটা চেষ্টা করেছেন, তা শুধু চাহিদার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, যেখানে প্রয়োজন ছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যোগান বৃদ্ধি করার। আর্থিক আয় ও উৎপাদনের মধ্যে মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়াও, সরকারের উচিত ছিল চাহিদার ধরণ অনুযায়ী উৎপাদনের ধরণ ঠিক করা। চাহিদার অনুপাতে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর জন্ম অনেকাংশে দায়ী। যেমন ধরুন, মাষ-পিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৭১ এর ১৭১'২ কেজি থেকে ১৯৭৪এ নেমে দাঁড়ায় ১৬৩'৭ কেজিতে, রন্ধনে ব্যবহৃত তেল ৩'৩ কেজি থেকে ৩'০ কেজিতে এবং জুলার কাপড় ১৩'৬ মিটার থেকে ১২'১ মিটারে। অর্থাৎ এই পণ্যগুলি শ্রমিক শ্রেণীর ব্যয়-বরাদ্দের ২/৩ অংশ অধিকার করে। সুতরাং মূল্য স্থিতি-স্থাপকতা নির্ভর করবে প্রচুর পরিমাণে এই পণ্যগুলির উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর।

এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা সরকার অবশ্য অস্বভাবে দিয়েছেন। সরকার বলেন দেশে অর্থের অতিরিক্ত ঘোঁসাই এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, অর্থের ঘোঁসান ১৯৭০-৭১এ শতকরা ১২ ভাগের ওপর এবং

১৯৭১-৭২ এ শতকরা ১৪ ভাগের ওপর থাকা সত্ত্বেও পণ্যসামগ্রীর পাইকারী মূল্য যথাক্রমে ৩ শতাংশ এবং ৭ শতাংশের বেশী বাড়েনি। এর একমাত্র কারণ কৃষিপণ্যের প্রচুর সরবরাহ, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের। যে দেশ খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামালের জন্ম মূলতঃ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, সে দেশে এটাই স্বাভাবিক যে কৃষিক্ষেত্রে যা ঘটবে সামগ্রিক অর্থনীতিতে তাব প্রতিকলন দেখা যাবে।

বিদেশী ঋণ গ্রহণের ব্যাপারেও আমরা জানি যে ১৯৪৭ এ ঋণাক্ষেপেখানে ছিল শূন্য, ১৯৬১ তে তা'হল প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত, আর ১৯৭৪-৭৫ এ প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ মজা এই যে, মোট বিদেশী ঋণের পরিমাণ যতই বাড়ুক, বার্ষিক দেয় ক্ষেপের টাকা ও সুদ বাদ দিয়ে আমাদের হাতে যা আসে, তার পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এর ফলে এমন এক অবস্থার সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যে কৃষি ও শিল্পে স্বনির্ভর হতে না পারলে আমাদের আর রক্ষা নেই।

পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া (যা এখনো চূড়ান্ত রূপ নিতে পারছেন না) দেখে মনে হয়, আজ প্রায় ২০ বৎসর পরে সরকারের চৈতন্য হয়েছে যে আর বিদেশী অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ভারতের মত একটি বিশাল দেশের অর্থনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শুধু অর্বাচীনতাই নয়, পরন্তু আত্মঘাতী হওয়ার সমিল। তাই আজ দেখছি কৃষি, বিশেষ করে খাদ্যোৎপাদনে সরকার এত আগ্রহশীল। কিন্তু, উদ্দেশ্য মহৎ হলেই কাজ শেষ হয়না—পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। নচেৎ বিদেশী ঋণের টাকা (যার জন্ম চড়া সুদ গুণতে হয়) খরচ করে দায়িত্ব শেষ করলাম, কাজ হোক ছাই না হোক—এদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি না দিলে অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

মিশ্র অর্থনীতির রূপায়নে সঠিক সরকারী ভারী শিল্প কারখানাগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্, ভিলাই ইম্পাত কারখানা ও আরো দু'একটি বাদে বাকী সব কটি প্রকল্পই বছরের পর বছর লোকসান খাচ্ছে। একমাত্র হিন্দুস্থান স্টীল সংস্থায় (একক লগ্নীর ক্ষেত্রে

যা সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান) উৎপাদনের হিসাব ১৯৭০-৭১ এ ৬১ লক্ষ টন থেকে ১৯৭১-৭২ এ ৫৩ লক্ষ টন এ নেমে আসে অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ এ এই কোম্পানী তার মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৫৮ শতাংশ কাজে লাগাতে পেরেছে। একরকম প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। সরকারী মালিকানাধীন শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু লাভাঙ্ক ১ শতাংশের কম, অথচ বেসরকারী ইম্পাত ও অস্থান্য শিল্প সংস্থাগুলি উৎপাদন হার অব্যাহত রেখে লাভ করে চলেছে। আমাদের মনে তাই প্রশ্ন জাগে, মিশ্র অর্থনীতি মানে কি সরকার পক্ষে লোকসান খেয়ে সমাজ সেবা করা, আর বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসংস্থাগুলি যখন লাভাঙ্ক বাড়ায়, তখন তা প্রতিরোধ করতে আইন তৈরী করা? আজও পর্যন্ত এই মিশ্র অর্থনীতির যা পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়, সরকারের নিজস্ব শিল্প পরিচালনা নীতি—না ঘরকা, না ঘাটকা।

এসবের ওপর আবার অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সিমেন্ট কাগজ, সার, ভেষজ ও ঔষুধ শিল্পগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণও নতুন করে মূলধন বিনিয়োগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে, এই শিল্পগুলির মোট উৎপাদন চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কম। কৃষিক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উপযুক্ত সেচ, সার ও উন্নতধরণের বীজের অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে ও হচ্ছে। মোটের ওপর অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে, কৃষি ও শিল্পে, কোনটাতেই লক্ষ্যমাত্রিক উৎপাদন হার বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে আশানুরূপ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে পারেনি। শুধু যে অর্থের অভাবই এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার কারণ তা নয়, কেন না ১৯৭৪ এর হিসাবে দেশে চালু মুদ্রার পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকারও ওপর অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশী। এর একমাত্র কারণ কৃষি, শিল্প ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর সার্বিক উৎপাদন হ্রাস, যার ফলে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি দেশকে গ্রাস করেছে, অপরদিকে ‘কালো’ টাকা ‘সাদা টাকার’ ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা বিচার্য।

সমগ্র দেশের ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন এ রাজ্যে আমরা দেখতে তো পাচ্ছিই, বরং সমস্তা এখানে আরো প্রকট। কৃষিক্ষেত্রে এখনো পশ্চিমবঙ্গ স্বয়ংসর হয় নি, শিল্পক্ষেত্রে অবস্থাও তথৈবচ। মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপে চাহিদা কমে যাওয়াতে বার্গপুয়ের ইম্পাতকারখানা থেকে শুরু করে ব্রেথওয়েট, জেমপ প্রভৃতি বড় বড় কারখানাগুলি আজ ধুকছে। হিন্দুস্থান মোটর কারখানার ১৬ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৬ হাজার কর্মী আজ বেকারীর দিন গুণছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে, দেশের এই চরম অর্থনৈতিক দুঃস্বস্তার দিনে ছাঁটাই বা লে-অফ করা চলবে না। তা’ সত্ত্বেও, এই কারখানার বিভিন্ন বিভাগে গড়ে সপ্তাহে ২ দিন করে লে-অফ হচ্ছে। শিল্পে চাহিদা কমে যাওয়াতে শ্রমিকের গড়পড়তা আয়, যা ওভারটাইম ইত্যাদির বাবদ সে পেত, তা’ যথেষ্ট কমে গেছে। নতুন কোন শিল্পসৃষ্টিও আর হচ্ছে না, সুতরাং নতুন কোন কর্মসংস্থানের আশাও আপাতত নেই। সম্প্রতি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রি কৃত বেকারের সংখ্যা ১৬ লক্ষ।

কৃষিক্ষেত্রে ১৯৭৪-৭৫ এ খাদ্য উৎপাদন ৪৫ লক্ষ টন (১৯৭৩-৭৪—৬৯ লক্ষ টন) হওয়াতে কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও এখনো পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাটতি রাজ্য। অবশ্য এসমস্তা সহজে মিটেবে না। এর কারণ দেশ-বিভাগের পর জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তা’ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের বাহিরাগতের সংখ্যা প্রতি-বছরই হাজারে হাজারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ, সেই অল্পপাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ এই রাজ্যে খাদ্যশস্ত্র, বিশেষ করে ধানের জমির পরিমাণ ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, তার ওপর সব জেলায় সেচের ব্যবস্থা ভাল নেই। উন্নত ধরণের বীজ ও সার চাষীর কাছে ত্রায়া মূল্যে পৌঁছচ্ছে না। সুতরাং অবস্থার উন্নতি যেটুকু হয়েছে মূলত সেটা চাষীদের কায়িক শ্রম ও জলদেবতার অনুগ্রহে।

পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা অবশ্য হ’ত না, যদি চাষযোগ্য জমির বেশীর ভাগ খাদ্যোৎপাদনের কাজে

(শেষাংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়)

সাহিত্য প্রসঙ্গে

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মূল চিন্তাবৃত্তি দুটি। একটি অধিকার-প্রবণতা। Possessive impulse আর দ্বিতীয়টি স্বজনশীলতা অর্থাৎ Creative impulse দুই চিন্তাবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই মানুষের দুইরূপ। জীব-রূপ ও মানব-রূপ। অধিকার-প্রবণতা জীব রূপের অভিব্যক্তি। যেখানে মানুষ বিষয় বুদ্ধি নিয়ে আপন সিদ্ধি খোঁজে, সেখানে তার জ্ঞান ও কর্ম একান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত—সেখানে তার জীব-রূপ। জীব-প্রকৃতির অতি সাধারণ বিকাশ আমরা দেখি, স্বার্থ-প্রণোদিত আমাদের সকল প্রাসের মধ্যেই। জীব-রূপের অভিব্যক্তি এই অধিকার-প্রবণতাই লালিত হয়ে ক্রমশঃ প্রমত্ততায় পরিণত হয়। আর অধিকার প্রমত্ততাই মানুষকে হীন ও হিংস্র করে তোলে। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠিতে, সেখান থেকে জাতিতে সংক্রমিত হয়ে এই জৈবশক্তি সংঘর্ষ, সংঘাত, এমনকি মহাযুদ্ধের আবির্ভাব ঘটায় শেষ পর্যন্ত মানবতাকেই ধ্বংস করতে উদ্রত হয়। আর, স্বজনশীলতা কিছু সৃষ্টি করার আকৃতি,—এ হচ্ছে কিছু দিয়ে যাওয়া, কিছু রেখে যাওয়া। অধিকারের দাবী নয়, পাওয়া-লোলুপতা নয়। স্বজনশীলতা, স্বার্থের সীমানা শেরিয়ে, ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বেড়া অতিক্রম করে, আপন স্ব-স্ব জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন, সেই জীবনের হিকে উদ্ভবিত করে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় ভাগ ও ভণস্যার দিকে। আমার সন্নিষ্ঠ সাধনার সৃষ্টি সকলে উপলব্ধি ও উপভোগ করবে, আমার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি বহুজনের হিতসাধন করবে—এই মানসতাকেই বলা হয় মনুষ্যত্ব। মানুষ যেখানে এই মনুষ্যত্বে মহীয়ান,—সেখানেই তার মানব-রূপ। সাহিত্য মানুষের মানব-রূপের অভিব্যঞ্জনা। সাহিত্যিকের মূল ধর্ম স্বজনশীলতা। আর, মানব-রূপের অভিব্যঞ্জনা যে সৃষ্টি, তাতে শান্তনতা, সৌন্দর্য, সূক্ষ্মতা ও সংযম থাকবে শর্তাবিক নিয়মেই। যেখানে তা থাকে না, তা আর বাই হোক, সাহিত্য নয়, শিল্প নয়। মানুষের মানব সত্ত্বার যা অবদান, তা জীবমাত্রের হিত-সাধনের উদ্দেশ্যেই। “বহুজন হিতায়”। বহুজনের কল্যাণ

সাধনা করে না, যে রচনা, তা রচনা হ’তে পারে, কিন্তু সাহিত্য নয়।

সাহিত্য সাহিত্যের জন্মই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না, অথবা সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না,—এমন সব মতবাদও শোনা যায়। এ ধারণা, এ মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। মানুষের ক্রিয়া-মাত্রই উদ্দেশ্য পরিচালিত। কারণ ছাড়া কার্য হয় না—এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বতরাং উদ্দেশ্য থাকেই, থাকবেই। সেই উদ্দেশ্য সং কি অসং, মহৎ কি স্বা হীন, কল্যাণপ্রদ অথবা অনিষ্টকর, বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন সেইখানেই। দেখতে হবে, সাহিত্যিক-শিল্পীর সৃষ্টি সং উদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা অভিসন্ধি কলুষিত। যে রচনা-শিল্প মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রচিত, তাকে সাহিত্য আখ্যা দিয়ে প্রশস্তি জানানো হয়। তার বরণ্য রচয়িতাকে জানানো হয় সম্রাজ্ঞ নমস্কার। আর, যে রচনা কামনার কলুষতায়, লালসার লোলুপতায়, কু-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিযুক্ত,—তাকে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ক্ষমা করা চলে না। তাকে চিহ্নিত করতে হয় অভিসন্ধি কলুষিত বলেই। অভিসন্ধি : শুধু স্বীয় অর্থগৃহতার পরিতৃপ্তিই নয়। ছুরতিসন্ধি : সমাজকে ভ্রষ্টচরিত্র করার।

পরিপ্রেক্ষণীর বাস্তবতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার দোহাই পেড়ে অনেককে বলতে শোনা যায়, সাহিত্যে রাজনীতি থাকবেই। কিন্তু, নানা যুক্তিসম্মত কারণেই সাহিত্য-ক্ষেত্র কোনোক্রমেই রাজনৈতিক মুষ্টি-যুদ্ধের ‘এরিনা’ হতে পারে না। রাজনীতির গতি-প্রকৃতি প্রভিন্ন; আদর্শ নানান বাদআশ্রয়ী : প্রতিদ্বন্দ্বের পথে তাদের গতাগতি। দক্ষিণ, বাম, মধ্য, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি...ইত্যাদি...এক এক ‘বাদের’ অনুগামীদের কাছে অপরাপর ‘বাদ’ শুধু স্বীকৃতই নয়, নিন্দিতও। ফলে, বাদের বাদানুবাদে রাজনীতির আধড়ায় খুঁষো-খুঁষি চলছেই, চলবেই। একদা প্রচলিত মতবাদ পরবর্তী কালে বিস্মৃত হয়, পরিত্যক্ত হয়। ভিন্নতর মতবাদের হয় আবির্ভাব। আবার স্বাভাবিক নিয়মেই তারও

বিলুপ্তি আসে। বাদের এই বাদানুবাদ এবং ক্রম-পরিবর্তনশীল মতবাদের এই প্রবেশপ্রস্থান কখনোই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। রাজনীতি-কেন্দ্রিক রচনা সাময়িকতা-দোষহুঁই হতে বাধ্য। ফলতঃ তার সমাদরও মাত্র সাময়িক। কিন্তু, সাহিত্যকে কি এই বিপর্যয়শীল পরিপ্রেক্ষিতে নিক্ষেপ করা যায়? সাহিত্যের সমাদর কি দক্ষিণপন্থীদের দুর্গ, কিবা বামপন্থীদের শিবির, অথবা মধ্যপন্থীদের মিলনক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? সাহিত্য কি দল-মত-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সারা বিশ্বের, সর্বকালের সকল মানুষের সমাদৃত শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়?

আমার বক্তব্যের পটভূমিতে রাজনীতি সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিঘোষিত ডঃ স্যামুয়েল জনসন্-এর একটি অভিমতের উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সঞ্চার করতে পারছি না। বরেণ্য মনীষী বলেছিলেন : politics is the last resort for the scoundrels. আর, সাহিত্যিকরা আর যাই হোন, scoundrels হওয়া নিশ্চই তাঁদের সাজে না।

সাহিত্য জীবনেরই বাস্তব প্রতিফলন—এই প্রোগানের সমর্থকদের অনেকে শুধু জীবনের অন্ধকার নোঙরা গলি-বুঁজি নিয়ে সাহিত্য রচনায় মশগুল। জীবনের অন্ধকার দিক আছে। আছে পাপ-পঙ্কিলতা, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, হীনতা-দীনতা। এদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। নিঃসন্দেহে এগুলো বাস্তব। জীবন অবশ্যই এ সব থেকে নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু, তাই বলে কামাতুরতার সলতে উন্মিয়ে দেওয়া, লালসার জলন্ত শিখাকে আরো লেলিহান করে তোলার উদ্দেশ্যে পাখা-চালানো, আর পিচ্ছিল-পঙ্কিলতার পথে আরো একটু ঠেলে দেওয়াই কি সাহিত্যিকদের করণীয়? সাহিত্যের উদ্দেশ্য? না,

সাহিত্যের ক্রিয়া জীবনের শিল্পায়ণ? ধূলা-কাদায় মলিন এক খণ্ড গ্র্যানাইট বাস্তব হ'তে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই তা শিল্প নয়! আবার, সেই গ্র্যানাইট-খণ্ডই আশ্চর্য শিল্পে রূপায়িত হয় রেঁদ-র ভাস্কর্য-কর্মের মাধ্যমে। সাহিত্যের ক্রিয়াও সাধারণকে অসাধারণত্বে উন্নীত করা,—অসুন্দরকে সৌন্দর্যের সুষমায় মণ্ডিত করা,—অন্ধকার থেকে আলোকে উন্নীত করা,—মহুগুড়কে সেই স্তরে নিয়ে যাওয়া যেখানে গিয়ে সে দেবতাকে স্পর্শ করতে পারে।

কিন্তু, আজ বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্থলোভী অথবা বিকৃত-কামিতার শিকার কিছু লেখককে সংবাদ ও সাহিত্য ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় ভয়াবহ রূপে আবির্ভূত দেখে শঙ্কিত হ'তে হয়। সৃষ্টির অপরূপতার মাধ্যমে সুন্দর কিছু, কল্যাণকর কিছু দিয়ে যাওয়ার মানসতা এঁদের নেই। শুধু পাওয়ার লোভে আতুর এঁদের অন্তর। পাওয়া : বিকৃতকামিতার চরিতার্থতা। পাওয়া : অর্থ, সম্ভা জনপ্রিয়তা, হয়তো বা অপর রাষ্ট্রের উৎসাহিত স্বদেশের সমাজ-শৃঙ্খলা-সংস্কৃতিকে সাবোটাজ ক'রে তাদের অর্থে বিদেশভ্রমণের বিলাস। এমনি আরো কতো কি! লোভনীয় প্ররোচনা এবং অবাধ প্রশ্রয় পান এঁরা বিভিন্ন স্বত্রে থেকে। এঁদের রচিত অপকৃষ্ট সাহিত্যের দাপটে সমাজ ও সংস্কৃতির ধ্বংস প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠছে।

সাহিত্যিক সমাজকে সম্ভবপর উপায়ে এঁদের নিরস্ত অথবা নিষ্ক্রিয় করা আজ একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, অবশ্যস্তাবী অবাঞ্ছিত পরিণতির জন্ত আগামী যুগ ক্ষমা করবে না।

কবিমর্নীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত

ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ., এল এল বি, পি এইচ ডি

শুধু বিধে—শোনো বিশ্বজন—বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে
এই আত্মান আসছে—আমি দেখেছি, আমি জেনেছি
(ঋষির রবিষ্ঠ কণ্ঠে অপ্রত্যাহতীত সুরে বেদাহমেতং)
সেই জ্যোতির্ময় মহাস্ত পুরুষকে, সেই অমৃতময় বিভাস-
কে, সেই চিরজাগ্রত সত্তাকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন শুধু
গানের ওপারে নয়, মনের গহন তিমির পারে, তমসঃ
পরন্তাৎ। এই ধরণের একটা অনুভূতি, দেখার, পাওয়ার,
হওয়ার প্রতীতি আমরা শুনেছি বেদ-উপনিষদের
আর্যবাক্যে দেশবিদেশের মহাপুরুষদের বাণীতে,
কথায়, কাহিনীতে, রীতির নয়, নীতির নয়, জীবন-
চর্চার, জীবন চর্যার। এদের আমরা বলেছি কবি-
মর্নীষী, সাহিত্য-রস-রসিক, সাধক, বেত্ত, জ্ঞানী, গুণী।
সেই পুরুষসত্তমদের নমস্কার জানিয়েছি। তাদেরই
একজন সার্থক উত্তরপুরুষ পণ্ডিতেরী শ্রীঅরবিন্দ
আশ্রমের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়।
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইরাণ দেশের এক
কবির কথা বলেছেন যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দিতে
গিয়ে তাকে পুরনো পুঁথির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা
করেছিলেন। পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতার কিন্তু
সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা, কাজেই কিভাবে তার আরম্ভ
আর কোথায় তার শেষ বা পরিসমাপ্তি, সে কথা কেউ
জানেনা। মানুষের আত্মচেতনার প্রাথমিক ইতিহাসের
সুর থেকেই এই পুরণো পাতা খুঁজে বেরাবার পালা
—আগন্তুহীন সীমাকে ধরা যায় কিনা তার পরীক্ষা
নিরীক্ষা—এরই নাম উপলব্ধি এবং এই চেতনা থেকেই
গড়ে ওঠে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, আত্মপ্রকাশের
নানা ধারা, নানা বিরাট রূপ, নানা বিচিত্র শৈলী।

সাহিত্য-রস-রসিক নলিনীকান্তকে সারস্বত তপস্বী
বলেই জানি সেই ছেলেবেলা থেকে। গঙ্গাজলেই গঙ্গা-
পূজা সারি। প্রবাসী ও অভ্যন্তর পত্রপত্রিকায় তাঁর
লেখা পড়তুম আগ্রহ সহকারে। কথার শ্রী, ভাষার
দোল, অর্থের ব্যঞ্জনা রূপময় ছোতনা, এক অবিস্মরণীয়

অনুরণন, ছন্দসৌকর্য ছড়িয়ে দিতো মনোরাজ্যে, অধ-
শতাব্দী পরেও সে কথা ভাবলে তাঁর দেওয়া কালী-
দাসের উপমাই মনে পড়ে—তুগাভ্যষ্টি শারদস্ত্রী।
রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাসাহিত্যের মননের ইতিহাসে
এমন গভীর উপলব্ধি ও মনোহারী বাক্যের সঙ্গে বিচার
ও বিশ্লেষণের অপূর্ব সমন্বয় দেখছি বলে মনে হয় না।
স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,
নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি মর্নীষীদের লেখাতেও এই
ধরণের প্রসাদ গুণ আছে কিন্তু নলিনীকান্ত সাহিত্য
সমালোচনার ক্ষেত্রে শুধু এহবাহ শব্দ নির্ভর নন গভীরে
তলিয়ে গেছেন এবং সেই রসসমুদ্র থেকে শুভ্রিমুক্তা
আহরণ করে এনেছেন যার উজ্জ্বল্য নিজের সত্তার
বৈশিষ্ট্যে আরো সমুজ্বল হয়েছে, এর কারণ তিঁ, শুধু
আগ্রহ করে সংগ্রহই করেন নি, তিনি চেয়েছেন,
নিষেছেন, হয়েছেন—তার Being এর Becomingই
তাঁর লেখাগুলিকে আরো ভাস্বর করে তুলেছে।
শ্রীঅরবিন্দ বা মায়েব কাছে তিনি প্রশ্রয় চাননি, আশ্রয়
পেয়েছিলেন—সে আশ্রয়, আশ্রমের একটি কোণে
ভজনপূজন আরাধন কীর্তন পঠন পাঠন নয়, নিজেকে
সম্পূর্ণভাবে নবভাবে রূপায়ণের সন্ধান ও সাধনা। এ
যেন উপরের আলোর শতদলের প্রতি প্রার্থনা। De
Profundis Clamair—Out of the depths have
I cried unto thee, O! Lord. কিংবা কবি হ্যান্স
রামান্ হিমান্থের ভাষায়—

আমি যাতে অনুভব করতে পারি যে আমি হলেম তুমি
আমি যাতে উপেক্ষা করতে পারি যে তুমি হলেম আমি
আমি যাতে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি আমি হলেম আমি

(নলিনীকান্ত গুপ্ত: 'কবিমর্নীষী' ১৯৫২ পৃ: ৪১)

আসলে এই ধরণের মানুষদের বিশাল জলধিতে
ভাসমান তুষার শিলার (Ice berg) সঙ্গে তুলনা করা
যেতে পারে। উপর থেকে যতটুকু দেখা যায় তার চেয়ে
জলের ভিতর আছে ঢের বেশী—স্তরে স্তরে নূতন সৃষ্টির

উপাদান গড়ে উঠছে, শুধু অবচেতনের রাজ্যে (subconscious range) নয়, অধিচেতনের সাম্রাজ্যেও (supra-conscious range). এরাই কবির্মনীষী। প্রমিথিউস বিদ্রোহী বীর হতে পারেন—আমি দুর্বীর, আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার, কিন্তু শেলীর স্বপ্নে যে প্রমিথিউসের আবির্ভাব তার কাজ সংসাদিত হবে আত্মদানে ও আত্মসিদ্ধিতে। সফোক্লিজের আন্তিগোনার ভাষায় এ জিনিষ আত্মবের নয়, কালকের নয়, রয়েছে চিরকাল। কিন্তু অগ্রজের অটল বিশ্বাসকে ফিরে পেতে হবে, নৌকা বানচাল হয় হোক না—কিন্তু চিরসুন্দরের দূতী যে অপূর্ব জপমন্ত্র নিবিড় সোহাগে বানে দিয়ে দেবে, সেই হবে অস্থির মরীচিকার উৎসুক প্রত্যাশা। সূর্যীন দত্তের এই হুরাশাকেও নলিনীকান্ত সাদরে আমন্ত্রণ করেছেন

কষিত কাঞ্চন কান্তি নগ্ন বসুন্ধরা

তারই প্রলোভন তরে সাজায়িছে যৌবন পমরা

রূপের সে বর্ণে গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,

হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আব্বান

হাফিজের রুবাই তাই তাকে মুগ্ধ করেছে, শুধু তার sensuous ও sensual enjoyment নয় উর্ধ্বতর জ্যোতির্ময় সত্তায় তার মানবিক ভালবাসা যখন স্থাপিত হয়েছে, যখন আত্মেন্দ্রিয় কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা হয়ে যায়—মানুষ হয় আনন্দে বিভোর, রিপূর হয় রূপান্তর, তখন যে মুক ও বাচাল হয়, পঙ্কু ও গিরি লজ্বন করে—সেই পরমানন্দ মাধব যখন হাত ধরে মোরে নিয়ে চলেন সখারূপে, আমি ত পথ জানিনে। সেইজন্ত সকলের শেষ কথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল

যং করোমি জগন্মাতঃ স্তুদেব পূজনং ভব

আর যা কিছু সব তৎসর্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্ত।

নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ‘স্মৃতির পাতা’ সেই কথাই শেখায়। কোথায় সেই রংপুরের পিলায়েদিজ গ্রুপের (Pleiades) একটি তরুণ বিপ্লবী আর কোথায় আজকের স্থিতধী, হুঃখের অস্থিগমন, সুখের বিগতস্পহ, উদাসীন গতব্যথ প্রবীণ কর্মযোগী। নিব্বারের স্বপ্নভঙ্গ কেমন করে হয়েছিল তার সরস সরল সন্তোজ সাবলীল বর্ণনা এই স্মৃতির পাতার ছত্রে ছত্রে

এসেছে সে একদিন

লক্ষপরাণে শঙ্কা না জানে

না রাখে কাহারো ঋণ

জীবন মৃত্যু পায়ের ছুঁত চিত্ত ভাবনাইন।

তাবি, রবীন্দ্রনাথ কি কোনদিন ভেবেছিলেন যে তাঁর এই অনুপম ভাববিলাসের সত্যরূপ দেখতে পাওয়া যাবে বাংলার ও বাঙালীর তখনকার ইতিহাসের আলোকে। নির্ভেজাল গৌড়ীয় ধরণে যে ছেলে গীতা পাঠ করতো, ডন্ সোসাইটিতে গীতা ক্লাসে যে গীতার ব্যাখ্যা শুনতে যেতো—যদ্ যদ্ বিভূতির্য়ং সত্ত্বঃ শ্রীমদুজ্জিত মেব বা—বিভুতিমানই বা কে, শ্রীমানই বা কে, যে পড়ছে Gibbons' The Decline and Fall of the Roman Empire, দেখতে যাচ্ছে শ্রীঅরবিন্দকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে, সেই মানুষটিই নির্বিকার চিত্তে ‘নিমিস্ত মাত্রং ভব সব্যাসাচিন্’ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরী থেকে বোমা তৈরীর তত্ত্ব, তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করা যায় কিনা তার জন্ত ব্যস্ত যারা দেওঘরে গিয়ে উপনষিদের (স্বৈতাস্থতর ২:১৫) পাঠ নিচ্ছে

সত্যেন্দ্রনাথপস্যা যোহনুপশ্চতি

শান্তরসাস্পদ আশ্রমে বসে কল্পনা করছে স্বাধীনতা আসছে, তারাই সহকর্মী বন্ধু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বোমা বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত মৃতদেহ ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ দলপতির আদেশ পিছনের দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই, সামনের দিকে তাকাও।—not to the past dawns but to the noons of the future. অনাগত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের দিকে শুধু নিজের জন্ত নয় পৃথিবীর জন্ত নয়, সর্বজীবের সর্বস্বরের রূপান্তরের জন্ত। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিপ্লবী বাহিনীর এক অখ্যাত সৈনিক, যারা একদিন বোমার ঘায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেদিন আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা হেরে গিয়েছিল, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। সেই প্রতিভাই মোড় নিয়েছিল, নব নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিতে তারই প্রকাশ দেখি তাঁর নিরলস সারস্বত তপস্যায় অনুভূতির উজ্জল পটভূমিকায়, যা লাভাশ্রোতের মত (শেষাংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্রনাথ

চিত্রিতা দেবী

কালের যাত্রার পথে,

ভারত আছার,

সামগ্রিক দৃষ্টি তুমি,

সমগ্র চিন্তার।

সত্যের মাপুর্ষ তুমি সত্যের অময়,

এ যুগের যুক্তি তুমি, তবু ভক্তিময়।

যুগান্তের সংক্রমণে কতনা মানস ধ্যান

কতনা কল্পনা।

স্বার্থত কালের বক্ষে ভারতের

স্বাক্ষিছু সাধনা,

তোমাতে পেয়েছে প্রাণ

লভিয়াছে বাণী—

ভারত চিন্তার তুমি সমগ্র কাহিনী।

সৌন্দর্যের দূত তুমি, সাধনার প্রাণ।

মানবের বন্ধু তুমি অমৃতের গান।

মহর্ষি শিতার কণ্ঠে, বৈদিক ঋষির ছন্দে,

দীক্ষ তব সার্থক আলোর;

আধার তমিস্রা ভেদি আশা তব

সকল ভালোর।

এ দেশের যত বিচিত্র মত,

তোমার মাঝারে লভেছে সমন্বয়।

তোমার জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের

নিত্য মিলন হয়।

ঔপনিষদ ধর্মে তোমার নানা সাধনার ধারা।

ঐকতানের মহা গৌরবে আনন্দে হোল হারা।

অমৃতবুদ্ধ মহাকল্পণায় দুঃখনিবৃত্তি তরে,

যে বাণী বলেছে তাহার অর্থ

শিখালে নূতন করে।

যুগে যুগে যত ঋষিরা এসেছে,

কবিরা গেয়েছে গান।

সবার প্রেরণা তোমার মাঝারে—

লভেছে নূতন প্রাণ।

গ্রামে গ্রামে যত বাউল ফকীর,

চারিণ কবির সাথে,—

স্বীকার করেছো স্বাভাৱ্য তব

মিলিয়েছো হাত হাতে।

ভারপরে যাবে আধুনিক যুগ

অন্তঃসাগর পারে,

নব দ্যোতনায় নূতন আশার

ঘোষিলো অভ্যুদয়,

তোমারি চিন্তে ভারত আত্মা,

সে মহাযুগের ঘটালো সমন্বয়।

যা কিছু মহৎ, যাহা সুন্দর,

যাহা মঙ্গলময়।

মানবধর্মে যা কিছু সত্য যাহা নির্ভীক,

যাহা কিছু অক্ষয়,

সাম্রাজ্য বাণী সত্যের বাণী

স্বার্থত মঙ্গল।

মৈত্রীর বাণী, বৈষ্ণবী প্রেম,

মানবতা অচল।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে নবীন অগং

নূতন চিন্তাধারা

ভাবাল তোমাকে নব বলে,

তুমি দিলে আত্মানে সাড়া।

প্রাচী ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব,

চির সনাতন সত্য।

নূতন যুগের নূতন তথ্য,

নবজগতের সত্ত্ব।

প্রেম কল্পনা, জ্ঞান ও সাধনা,

প্রকৃতির সুধারাসি,

তোমার মাঝারে মহা আনন্দে,

পুলকে উঠেছে ভাসি।

তুমি ঋষি কবি,

ক্রান্তদর্শী, সব মননের নেতা।

জ্ঞানের সাধক, মর্মস্পর্শী,

তুমি জীবনের হোতা।

বর্ষবাণী

মহর্ষি প্রেমানন্দ

মাহুষেরে ভালবাস, ভরিওনা অপমানে,
ফুটাও হৃদয়ে হাসি, জাগাও জীবন গানে,
অতনু হেথায় তনু লয়ে রাজে
সুর হারা বাঁণা এখানেই বাজে
মৌন হেথায় ভাষার আশ্বরে
কথা কয় কানে কানে।
তার হৃদি আধিনায় নীরবে জালায়
কত আশার দিপালী শিখা
কত বেদনার বায় ; পুনঃ যে মিলায়
আধারে আলোর শিখা
তব মরমের পরশ-বুলায়ে
ঝড়ে পড়া কুঁড়ি তুলিও ফুটায়
প্রেমে রাঙ্গিও ভাঙ্গা বুকখানি
ভুলিও যে অভিমানে।

রডোয়োরভেদঃ

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম এ

রএ ডএ একাকার আমাদের বাংলায়,
এই অনাস্থটিকে কোন্ রথী সামলায়।
বড় বড় লেখকের লেখাতেও এই দোষ,
ভাষা জননী যে কাদে, কারও নাই আপশোষ।
মরা মানুষের 'মড়া' 'মরা' হল দিব্য
কাপের পড়িয়ে ওরে করিবে কি ভব্য ?
ঘর থেকে বেড় হয়ে কবে কে বেরিয়ে ফেরে,
নদী পার হতে কবে দিয়েছে পাড়ানি করে ?
সার্থক বই আজ তুলে মহা আলোরণ,
কটুভাষী নিন্দক হুষে তায় অকাড়ণ।
কি কাঁপড়ে পরিয়াছি আমরা পাঠকরা
ড র য়োরভেদঃ ঘোষিছে লেখকরা।

নিফল পূজা

সন্তোষ ভট্টাচার্য

ভগবান !
তোমার দর্শনলাভ কেউ করেছেন কি না
এ তাঁর নিজের উত্তর।
তোমার উদ্দেশ্যে
পূজা উৎসব বহুবিধ বর্ণাঢ্য আয়োজন
অগণিত অর্থ ব্যয়।

নিত্য দিনের এই পৃথিবীতে
অসংখ্য নারায়ণ
মাথার উপর রোদরুষ্টি ঝরা
ছয় ঋতুর আগল খোলা আকাশ
রাস্তায় ফেলে দেওয়া অভোজ্য
হুঁটে খায়।

তাদের না হয় আবাহন
না দেওয়া হয়
অন্ন বস্ত্র পুষ্প ভোজ্য
না আছে প্রতিষ্ঠার জন্য
গির্জা মঠ মন্দির মসজিদ।
পূজা হয় অদৃশ্য ভগবানের
তায়সিক উৎসব।

বোধিচিত্ত পরিগ্রহ ও শ্রীচৈতন্যচিদাকাশ

ডক্টর আশা দাশ

যে মহাপুরুষ মধ্যযুগে ভারত ইতিহাসের মহান যাত্রাপথকে যুগসঞ্চিত লক্ষ্যভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করে তাকে চরম লক্ষ্যের পথ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। মানবমহিমার অখণ্ড ইতিহাসের সুবিশাল পটভূমিকায় এই মহান পুরুষের জীবনব্রতের মূল্যায়ন করার অধিকারী একমাত্র মহাকাল। কারণ মহাকালই ইতিহাসের পটভূমিকায় সূবর্ণ অক্ষরে তাঁর জীবন চিত্রকে মানবজাতির পরম সম্পদ রূপে আজও ধারণ করে রেখেছে। বিশ্বমানবিকতার জন্ম তাঁর যে জীবন চর্চা, বাণী ও কর্মপ্রেরণা তার উৎস বিচার স্বরূপ নির্ণয় এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভবতই বর্তমান কালের দায়িত্ব।

ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গমন্দের আবির্ভাব। তিনি একধারে যুগ-প্রতীক ও যুগপ্রবর্তক। যে যুগে ভারতের মাটিতে তাঁর আবির্ভাব সে কালের বাণী তাঁর মধ্যে সমুন্নত মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিল; কিন্তু এখানেই তাঁর কর্মকৃতির শেষ নয়। যুগের আবহাওয়ায় থেকে, যুগ পরিবেশে লালিত হয়ে তিনি যুগের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র ভারতকে আত্মনা জানিয়েছিলেন, বজ্র কঠোর কণ্ঠে কঠিন দ্বন্দ্বারে মানুষে মানুষে বিভেদের যুগসঞ্চিত হলাহলকে নিষ্পত্তি করেছিলেন। জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদের যে লৌহ যবনিকা সেদিন ভারতের জনচিত্তকে পরস্পর বিমুক্ত করে তুলেছিল শ্রীচৈতন্য সেই কালসমুদ্রকে প্রবলভাবে মথিত করেন। এই উন্মত্তনের ফলে যে অমৃতের আবির্ভাব তাই সর্বমানবে প্রেম ও করুণারূপে শ্রীচৈতন্যচিদাকাশকে জ্যোতির্ময় করে তুলেছিল। মহাকবি কালিদাস একদিন হিমালয় বর্ণনায় বলেছিলেন—

অস্ত্যন্তরস্তাং দিশি দেবতাত্মা

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

হিমালয় যদি দেবতাত্মা হয়, তবে এই ভারতের অগ্র এক মহামানব বুদ্ধকে বলা যায় 'ভারতাত্মা' আর ভারতের শ্রীচৈতন্য নিঃসন্দেহে 'ভারত পথিক'। মহাপ্রহরির বিরাট কলেবর ভারতের অন্তরাত্মাকে

দিয়েছে চির অভয় আর ভারতাত্মা বুদ্ধ ভারতকে ভৌগোলিক সীমানার বন্ধন থেকে দিয়েছেন মুক্তি। ষোড়শ শতকের ভারতবর্ষকে চারিদিকের পরাভব ও আত্মসঙ্কীর্ণতার নিরঞ্জ অন্ধকারের মধ্যে শ্রীচৈতন্য দিয়েছেন নূতন আলোকে নূতন পথের সন্ধান। সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসটাই ঐ ক্ষণিকলেবর প্রেমাশ্রুসিক্ত মানুষটির হাতের জিয়নকাঠির স্পর্শে হঠাৎ নব প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য সেদিন এমন একটি ঐতিহাসিক কার্য সম্পাদনা করেছিলেন যার জন্ম তাঁকে নিঃসন্দেহে এই ভারতভীর্ষের মহান পথিক বলা যেতে পারে। তিনি ভারতের সমস্ত মানবকে একের মস্ত্রে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন এবং একের মস্ত্রে উদ্‌বোধিত ভারতকে প্রেমের দেবতার চরণ তলে উৎসর্গিত করতে প্রয়াস পেরেছিলেন। মানুষ সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত পৃথিবী তগবানের—এই ব্যাপক বিশ্ববোধ ও পরম ভাগবত প্রেমানুভূতি তাঁর জীবনে একান্ত হয়ে গেছে। তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতভীর্ষে যে নানা জাতি, নানা ধর্মের সমাগম হয়েছে একের মস্ত্রে তাদের মধ্যে ঐক্য সাধন করতে পারলেই ভবিষ্যতে এক মহান জাতির উদ্‌বোধন ঘটবে। এই প্রত্যাশার আলোই প্রতিভাত হয়েছে তাঁর বাণীতে—

কিবা বিশ্র কিবা শূদ্র হাসী কেনে কয়।

সেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম পরি।)

কৃষ্ণ নাম আর সর্বমানবে প্রেম—এই হল তাঁর কাছে চরম সত্যের দুই রূপ। 'যে জন কৃষ্ণ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে।' কৃষ্ণ ভক্তির এই উদার প্রশস্ত আকাশ গঙ্গায় এসে মিলেছে সর্ব মানব—জাতিধর্মনির্বিশেষে, শ্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ নির্বিচারে। প্রাদেশিক অনৈক্য, জাতি ও ধর্মীয় অনৈক্য, শাস্ত্রীয় অনৈক্য সে দিন তাঁর পরম প্রেমের শ্রোতে ভেসে গেছে। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা তাঁর প্রেমের হৃৎসহ তপস্কার কাছে সেদিন হার মেনেছে। এ সেই প্রেম যাহা ঋতন্তর ও কল্যাণময়,

আদান বিহীন প্রদানে, আনন্দ ও পরিপূর্ণতায় যাহা চিত্তকে সর্বপ্রাণীর প্রতি উদ্ভূত করে তোলে।

ভারতীয় মানসে যে বিখ্যাতবিকতাবোধ তা কেবল তার emotion নয়, এ তার জাতীয় চরিত্রের একটি বিশেষ Instinct বা অর্জিত ক্ষমতাও নয়; জন্মগত গুণ, পরিবেশ থেকে সংগৃহীতও নয়, উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা। কিন্তু সে কোন উত্তরাধিকার যা এই বৃহৎ ভারতভূমি বহন করে আসছে? এ পুণ্য ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে 'মহনীয় বরণীয় বলে স্বীকার করেছে? রাজনীতির কূটনীতি তা নয়, ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় বন্ধনও তা নয়। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের গতানুগতিকতাকে সে বড় করে দেখেনি। অল্পে, সসীমে, খণ্ডে বৃহৎ ভারত কোন দিন তৃপ্ত হয়নি। 'ভূমৈব স্বং' ভারতাত্মার মর্মবাণী। মহান সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশের এক মেয়ে বলেছিলেন—'যা আমাকে অমৃতত্ব দেবে না তা দিয়ে কি করব। আর্থ ঋষি কঠিন সাধনায় যে মহান সম্পদ লাভ করেছিলেন কেবল আত্মভোগে তা ব্যয়িত করতে পারেন নি। মহাসম্পদের অংশ গ্রহণের জন্ত বিশ্বাসী অমৃতের সন্তানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারতের গোতম নিরঞ্জন নদী তীরে বোধিবৃক্ষমূলে কঠিন সাধনায় মহাবোধি আয়ত্ত্ব করেও 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেব মনুষ্যানং' সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর মহাভারতের পথ পরিক্রমা করে গেছেন। এই চিন্তাধারা আরো পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মে মহামৈত্রীর সাধনায় বোধিসত্ত্ব ব্রত রূপ পেয়েছে। বিশ্বের সকল প্রাণীহৃদয় হতে তিল তিল করে অমৃতস্বরূপ করুণা ও মৈত্রী আহরণ করে বৌদ্ধদার্শনিক ও চিন্তানায়কগণ বোধিসত্ত্ব প্রতিমা গড়েছেন। বোধিসত্ত্ব কে? যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব অর্জন করবেন তিনিই বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের করুণা, দয়া, আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণের কণিকা সঞ্চয়ই ক্রমশঃ অনন্ত অসীম করুণা সমুদ্র 'বুদ্ধ' রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। বুদ্ধত্ব লাভের জন্ত বোধিচিহ্ন গঠন অবশ্য প্রয়োজন। কেবল আত্মনির্বাণ লাভে পরিতুষ্ট হলে চলবে না। সমস্ত প্রাণী জগতের নির্বাণ বা মুক্তির জন্ত চিত্তকে সংগঠন করা, সংকল্পে দৃষ্টি করা এবং তার

জন্ত যে বলিষ্ঠ উদ্ভম তাই বোধিচিহ্ন। 'বোধিচিহ্ন গঠিত হলে সাধক বুদ্ধত্ব লাভ করেও তার প্রতি চরম বীতশ্রু প্রদর্শন করতে পারেন। এ সময় সংসারের সকল জীবের দুঃখ তিনি শিরে বহন করার ব্রত বরণ করেন। সর্ব জীবের হিত সুখের জন্য নিজ প্রিয়জন, নিজের বলতে যা কিছু এমন কি নিজের পরম আকাঙ্ক্ষিত নির্বাণকেও তিনি পরিত্যাগ করেন। আবাহমানকাল ধরে ভারতের অন্তরাত্মা মানবধর্মের মহান আদর্শের যে অত্যাঙ্ক প্রদীপ শিখা জালিয়ে গেছেন, আত্মসমুদ্র পর্যন্ত এই যে একাত্মতা বোধ যুগে যুগে ভারতবাসীর ধীশক্তিকে তা উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। দীর্ঘ অমরজন্মের অবসানে ভারতবর্ষের ধীজ্যোতিতে তা পুনর্বার প্রতিভাত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচিদাকাশ সেই জ্যোতির বিকিরণে ভাস্বর। ভারতবর্ষ বোধিসত্ত্বের কণ্ঠে শুনেছে মহামৈত্রীর মন্ত্র, আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনে দেখেছে সেই মন্ত্রের সংহতরূপ, বোধিসত্ত্ব যে আদর্শের উদ্গাতা, শ্রীচৈতন্য জীবন সে আদর্শের মহাভাষ্য। বরং বৈষ্ণব মহাজনেরা মহামৈত্রীর ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে আরো উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন চৈতন্যবিগ্রহে। শ্রীচৈতন্যের অবয়বে, বাণী এবং মানস গঠন পরিকল্পনায় ভারতীয় মনীষার চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য হৃদয় অনন্ত অসীম আকাশতুল্য। সে হৃদয়াকাশ মানবের প্রতি মৈত্রী ও করুণায় এবং প্রেম ও ভালবাসায় উদ্ভাসিত ও পরিমার্জিত। এই মৈত্রী ও করুণার পরিচয় লাভ করতে হলে এই চিদাকাশে প্রতিফলিত প্রেমবৈচিত্র্য যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি সেই চিদাকাশের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অবহিত হওয়াও প্রয়োজন। সেই চিদাকাশের বিস্তৃত পরিচয় ছড়িয়ে আছে চৈতন্যের জীবনালেখ্যে ও তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত বাণীতে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে—

হুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।

আপনি আশ্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥

সেই দ্বারে আচঙালে কীর্তন সঞ্চারে ।

নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥

(চৈঃ, চঃ, আদি, ৪র্থ পর্ব)

অন্যত্র—প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার । (চৈঃ চঃ; আদি ৪র্থ) সঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন'-এ (এ, ৭ম) এই হেমকান্তি মহাপুরুষের চিদাকাশ ভাস্বর ছিল। প্রেমবন্যায় তাঁর হৃদয় প্রাবিত হয়ে দুই কমল আঁখি হতে মন্দাকিনী ধারা বহির্গত হত। এ প্রেমই গৌরসুন্দরের জীবনালেখ্য। মানুষের শ্রেষ্ঠতম কল্পনা শক্তি যুগে যুগে মানবকল্যাণ যুগপুরুষের সম্ভাবনা আকাঙ্ক্ষা করেছে। চৈতন্য জীবনীকারের মতে এবারের অবতার কেবলই প্রেমাবতার। এজন্ম চক্র ভূণ তীর ধনুক কোনটাই তিনি ধারণ করেননি, তাঁর অস্ত্র কেবল প্রেম, কেবল অশ্রুধূল। কবি বলেন—'গোবা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়।' আবার—এই 'প্রেমে শান্তিপূর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' প্রেমের এই জাহ্নবীধারাকে শ্রীচৈতন্য কেবল নবদ্বীপ ধামেই নিবদ্ধ করে রাখেন নি। সমগ্র ভারতে তাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। এখানেই মধ্যযুগীয় সন্তদের সঙ্গে তাঁর অনন্তসাধারণত্ব। বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞানরূপে নবদ্বীপে যার উৎপত্তি হয়েছিল সমগ্র ভারতের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সেই প্রেমবারি সঞ্চনে স্তুচিন্মিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান কাজী সমাজের অবহেলিত অন্ত্যজ কেউই প্রেমধন লাভে বঞ্চিত হয় নি। বাঙালার মনীষা হয়ত এ কারণেই বিশ্বমনীষার স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং ভগবন্তার দাবী বিচার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেছেন, প্রেম দাতৃ হতেছে তার একটি বিশেষ লক্ষণ। তাঁরা মহাপ্রভুর অযাচিত প্রেমবিতরণরত যে তনয় মূর্তি অঙ্কন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নাই। জীবনীকারগণ সেই অতলস্পর্শ করুণাসাগর থেকে মুক্তো সঞ্চয় করে চৈতন্যজীবনের ঘটনাপঞ্জী রচনা করেছেন। মুসলমান দরজী যে শ্রীবাসের পরিচ্ছদ সেলাই করত সেও বিশ্বভরকে দর্শনমাত্রই মহাপ্রেমে বিম্বল হ'ল। সর্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত বাহুদেব সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম গ্রহণ করেন এবং শঙ্করা-

চার্যের মায়াবাদ ত্যাগ করেন। দক্ষিণ দেশে, আলাল-নাথে, কুর্মক্ষেত্রে, নীলাচলে, গোড় গমনকালে কটকে, মথুরার পথে, মথুরায়, কানীতে সর্বত্র এই শতস্বয়ংসম কান্তি তরুণ সন্ন্যাসী কাকেও কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়ে, কারো প্রতি কেবল কমল লোচনে দৃষ্টিপাত করে, কাকেও স্তবলিত হু' বাহুর আলিঙ্গনে, কাকেও কেবল দর্শন দ্বারা নির্বিচারে প্রেমোন্মত্ত করে তুলেছিলেন। কোন লোককে তিনি দীক্ষা দেননি, সকলকে এমন প্রেমভক্তি দিয়েছিলেন যাতে—'রসং হ্যেবাং লক্ষানন্দী' হওয়া যায়। পার্শ্বদ অনুগত ভক্তদেরও তিনি এই বিতরণ মহোৎসবে প্রেম পরিবেষণের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন—

আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে,

যাই তাই প্রেমফল দেহ যারে তারে।

(চৈঃ চঃ ১১২) অন্যত্র—সন্তে ফল দেহ যারে তারে

খাইয়া হউক লোক অজর অমরে। (এ, ১১২)

ভক্তবৃন্দ ও পরিকরগণও

যেই যাই তাই দান করে প্রেমফল

ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল

মহামোদক প্রেমফল পেটতরি খায়।

মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥

কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহো ত হুঙ্কার।

দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥

চৈ চ ১১২

মহাপ্রভু অর্ঘ্যত আচার্যকে বলেছিলেন—সমাজ যাকে অযোগ্য মনে করে কিছুই দেয়নি, যে অস্পৃশ্য অশুচি তাকেও প্রেমধন দিও। দেখিও সেও যেন বাদ না যায়। প্রভু নিত্যানন্দের প্রতিও এ নির্দেশ ছিল। পদকর্তা এ দৃষ্ট কল্পনা করেই হয়ত গেয়েছেন—

—'ব্রাহ্মণ চঙালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' জগাই মাধাই উদ্ধার বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় জগাই মাধাই বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। অতি শৈশব হতেই এ দুই গুণবন্ত স্বকর্ষরত ছিল। মগপান, চুরি ডাকাতি, পরগৃহ দাহ, গোবধ, জীবধ, ব্রহ্মবধ শত শত পাপাচারে নিযুক্ত

ব্যস্ত থাকত। একদিন দুইজন—‘আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নান’। এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। নিত্যানন্দ ভাবলেন—

পাতকী তরিতে প্রভু কৈলা অবতার।

এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥ * * *

এ দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে

তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে।

চৈঃ ভাঃ ২৫০ পৃ

কিছুদিন পরে নগর ভ্রমণ কালে প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে জগাই-মাধাই-এর দেখা। উন্নত মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করল, রক্তের ধারা বইতে লাগল, প্রভু নিত্যানন্দ কিন্তু অবিচল। ‘মেরেহিস মেরেহিস কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দিব না!’ ইহাই মহাকরণার স্বরূপ। মহাকরণা সকলকেই কৃতার্থ করতে চায়। শত্রুমিত্র, পাপপুণ্য, যোগ্য অযোগ্য বিচারের প্রয়োজন নেই। সকলকে কৃতার্থ করে, সকলের প্রতি সমভাবে তা প্রবাহিত হয়ে যায়। যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করা আয়পরায়ণতার কাজ। বিচারকের মাপকাঠি তা হওয়া উচিত। কিন্তু যিনি মহাকরণায় ভাস্বর তিনি তো বিচারক নহেন, তিনি কেবলই দাতা। জগাইকে শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করলেন। প্রেমের অমৃতধারায় তার সকল কলুষ ধুইয়ে গেল। কিন্তু মাধাই? প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর জীবনের সমস্ত স্মৃতি তাকে প্রদান করলেন

কোন জন্মে থাকে যদি আমার স্মৃতি

সব দিলুঁ মাধাইর—শুনহ নিশ্চিত

মোর যত অপরাধ—নাহি তার দায়।

মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই।

(ঐ, পৃ ২৫৬)

মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে বললেন—

শুন শুন তুমি দুইজন

সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন ॥

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোরা।

আর যদি না করিস সব দায় মোর ॥

ঐ, পৃ ২৫৬

পাপী তাপী, গুণী অগুণী নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের ‘সব দায়’ নিজের স্বন্ধে বীৰ্যবলে গ্রহণ করার এ দৃষ্টান্ত অনুপম। কিন্তু মহাপ্রভুর চিদাকাশে পরিব্যাপ্ত প্রেম-জ্যোতি কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বাবর জগৎমাদির কল্যাণের জন্যও তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠায় ভরপুর ছিল। পশুজগৎ এমন কি বৃক্ষলতা গুল্মের উপরও তাঁর প্রেমজ্যোতি প্রতিভাত হয়েছিল। ব্যাঘ্র গণ্ডার শূকর মস্ত হস্তিযুগ তাঁর প্রেমে বশীভূত হল (চৈঃ চঃ ১।১৭)। যুগ ব্যাঘ্র বাস্তব জগতে খাণ্ড-খাদক সম্পর্ক। কিন্তু চৈতন্যের প্রেমস্পর্শে তারাও পরস্পর প্রিয় স্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে (চৈঃ চঃ ২।১৭)। বৃক্ষলতা গুল্ম ও সে প্রেমবারি সিঞ্চে আনন্দে হিল্লোলিত হয়েছে। (ঐ)

শ্রীচৈতন্য এই সর্বপ্রসারিত অপরিমেয় প্রেমসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেই বলেছিলেন—আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি। নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি (চৈঃ চঃ ১।২)। ভক্তগণ বলেন—‘করণায়বতীর্ণঃ কলৌ’ তিনি কারো প্রাণ বিনাশ করেননি, অথচ দুষ্টির দমন করেছেন, চিত্তের যে মালিন্য তাদের কলুষিত করেছিল সে মালিন্য তিনি মুছে দিয়েছেন। পদকর্তা গেয়েছেন—

রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে

অস্ত্রের করিলা সংহার।

এবে অস্ত্র না ধরিলে প্রাণে কারে না মারিলে

চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার।

বৈষ্ণবাচার্যগণ তাঁকে অবতার বলেছেন, কিন্তু নর-রূপেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়; প্রেমই তাঁর জীবনের পরম অভিজ্ঞান। মহাপ্রেমের অগ্নিদাহে জলে পুড়ে কেঁদে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে যা ছিল ধ্যানমগ্ন চৈতন্যচিদাকাশে তাই প্রেম-জ্যোতিরূপে অনন্য মহিমায় প্রতিভাত হয়ে তাঁর জীবনে ও কর্মপ্রয়াসে বাস্তবরূপ পেয়েছে। কি ভাবে বৌদ্ধ আদর্শ শত ঊর্ধ্ব হু হাজার বৎসরের ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে চৈতন্যচিদাকাশকে উদ্ভাসিত করতে পারে এ প্রশ্নটা সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। বৌদ্ধ আদর্শের পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্য মনোভূমির বিচার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বৌদ্ধ মহাকরণার উত্তরাধিকার

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মে রক্ষিত হয়েছে। মনে-
বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠা ও দার্শনিক তত্ত্ব দৃষ্টি যে কোন দিক
থেকেই এ সিদ্ধান্তে আসতে কোন বাধা নেই।

বুদ্ধেরা বলেন মৈত্রী সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধন। মৈত্রী
করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—এ হল চতত্রীবিহার। জীবের
হিতসুখ কামনা মৈত্রী, পরদুঃখ অপনোদনেচ্ছা করুণা,
পরের সুখ সম্পদ অহুমোদন মুদিতা, চিত্তের অলীন
অনীহা, নিকরদিগ্ন অবস্থা উপেক্ষা। বুদ্ধ মৈত্রী ও
করুণা কেবল প্রভূত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রসূত অযাচিত
প্রদানে বিশ্বের সর্বভূতের প্রতি ধাবিত হয়েছে। কোথাও
তা বাধা মানেনি। বুদ্ধদেব তাঁর তপস্শালক মহাবোধি
নিজের মধ্যে নিবদ্ধ করে রাখেন নি। যদি তা রাখতেন
তবে গভীর অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশের গুপ্তস্থানের
অজ্ঞাত জলসঞ্চিকার ছায়া তা ব্যর্থ হত। পুঞ্জ পুঞ্জ
জলভারাক্রান্ত মেঘমালার ন্যায় দীর্ঘকালের শিপাসার্ভা
ধরিত্রীকে তিনি করুণাধারায় সিক্ত করে দিয়েছেন।
এই মৈত্রী প্রসঙ্গে বলেছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্রং আয়ুসা এক পুত্রম অমরকৃৎ
এবমপি সর্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। (মেত্তাজুত
মুক্তনিপাত)। একমাত্র সন্তানের জননী যেমন করে
নিজের আয়ু দিয়ে তাঁর সন্তানকে রক্ষা করেন তেমনি
ভাবে অপরিমিত মানস মৈত্রী সর্বজীবের প্রতি প্রসারিত
করে দিতে হবে। সর্বপ্রাণীর প্রতি অপরিমিত মানস
প্রসারিত করার মহৎ উদার ভাবসমুদ্রকে শ্রীচৈতন্য জঙ্ঘু
মুনির ছায়া আকর্ষণ পান করেছিলেন এবং আপন হৃদয়-
পাত্রে তাকে গ্রহণ করে জীবন সত্যে পরিণত করে-
ছিলেন। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য তিনি স্বীকার
করেননি। প্রেমই মানুষকে বিচারের কষ্টপাথর, যিনি
প্রেমিক তিনিই দ্বিজোত্তম, তিনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ।
'মৃহনি কুসুমাদপি' মদয় হলেও এখানে তিনি ছিলেন
'বজ্রাদপি কঠোরানি'। তাঁর জীবনে তিনি এর অনুধা
হতে দেন নি।

বৌদ্ধসাহিত্যে একেই করুণাবন বুদ্ধের অমিতাভ-
রূপ, বৈষ্ণব কবি দেখেছেন 'অবিরত প্রেমফল বিতরণে
অখিল মনোরথপুর' গৌরমন্দের প্রেমময় প্রতিমা। তাঁরা

স্পর্শমনির সাথে তুলনা দিয়েছেন এই জীবন্ত
প্রেমের—

পরশ মনির সাথে

কি দিব তুলনা রে

পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।

আমার গৌরান্দের গুণে

নাচিয়া গাইয়া রে

রতন হইল কতজনা ॥ (পরমানন্দ)

প্রেমের ঠাকুর সুরধনী তাঁর উজ্জল করে নাম কীর্তন
করে চলেছেন। তাঁর—

নীরদ নয়নে

নীর ঘন সিঞ্চনে

পুলক মুকুল অলস।

খেদ মকরন্দ

বিন্দু বিন্দু চ্যুত

বিকশিত ভাব কদম্ব ॥ (গোবিন্দ দাস)

ভারতের পথে পথে ভারত পথিকের এই প্রেম-
বিতরণরত 'হরিনাম মুক্তি' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বোধিসত্ত্বের
সাক্ষাৎ প্রতিমাও। বোধিসত্ত্ব বলেন—ক্ষিতি প্রভৃতি
ভূতগণ যেমন অনন্ত আকাশব্যাপী অপরিমেয় জীবগণের
নানারূপ ভোগের উপাদান, আমিও যেন তেমনি এই
গগনব্যাপী প্রাণিগণের নানারূপ ভোগের উপাদান হতে
পারি (বোধিচর্যাবতার, শান্তিদেব ed. পি. এল. বৈদ্য,
মিথিলা বিদ্যাপীঠ, ১৯৬০, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ২০নং)। ক্ষিতি
অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চভূতে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী
সর্বপ্রাণীর অবয়ব গঠিত। বোধিসত্ত্বের কামনা তিনিও
আকাশব্যাপী সর্বপ্রাণীর ভোগের উপাদান রূপে তাদের
সঙ্গে মিশে থাকবেন। তাঁর আকাজক্ষার প্রেমজ্যোতি
নৃশংসতম হৃদয়েও কারুণ্যের স্পর্শ দিয়ে যায়। এ প্রেমের
তপস্শার কাছে নির্বাণও তুচ্ছ হয়ে গেছে। মনে হয়
ভুলোকের সকল সম্পদ যেন ভুলোকে নেমে এসেছে
ধরণীর ব্যাধাহত মানুষকে কৃতার্থ করার অভিপ্রায়ে।
বোধিসত্ত্বের দ্রুতিষ্ট ঘোষণা, 'যতদিন সমস্ত জীব নির্বাণ
লাভ না করে ততদিন আমি যেন নানারূপে তাদের
উপজীব্য হই।' (ঐ, ২১)। খুবই স্বাভাবিক ভাবে এ
কথা বলা যায় যে সর্বকালে সর্বদেশে প্রেমের পন্থা
অমূসরণ করে, প্রেমকেই জীবনের স্রবতারা করে যে
মহান অপ্রেময় প্রেমবহি তাঁরা প্রজ্জলিত করে গেছেন
সেই প্রেমবহি হতে বোধিসত্ত্বের উদ্ভব। আবার

নিজের দেহকেও হব্যস্বরূপ সেই প্রেমবাহিত
তিনি আহুতি দিয়েছেন। বলেছেন—

গ্রানানামস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এব চ।

তদুপস্থায়কশ্চৈব যাবজ্জোগাপুনর্ভবঃ ॥ (ঐ, ৩য়, ৭)
আতুর যারা, রোগী যারা, আমি যেন তাদের ঔষধ
ও বৈদ্য হতে পারি। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত
আমি যেন তাদের পরিচারক হই। আরো বলেছেন—

জুংপিপাসাব্যাথাং হন্যামন্নপানপ্রবর্ধনৈঃ।

হৃৎকিান্তরকল্লেষু ভবেয়ং পানভোজনম ॥ ঐ, ৮
অন্ন ও পানীয় বষণ দ্বারা আমি যেন জুংপিপাসার
ব্যাথা দূর করতে পারি। অন্তর কল্লের হৃৎকিান্তর সময়
আমি যেন তাদের পানীয় ও খাদ্য হই। তাঁর পরম
আকাঙ্ক্ষা—

দরিদ্রাণাং চ সত্ত্বানং নিধিঃ শ্রামহমক্ষয়ঃ।

নানোপকরণকারৈরুপতিষ্ঠেয়মগ্রতঃ। (ঐ, ৯)

দরিদ্র ব্যক্তির আমি যেন অক্ষয় নিধি ভাণ্ড হই।
নানা উপকরণ রূপে আমি যেন তাদের অগ্রে উপস্থিত
হই।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বৈষ্ণবমহাজনেরা সংসারের জল হাওয়া
লাগিয়ে এই বোধিসত্ত্ব প্রতিমায় স্থানীয় রঙ ফুটিয়ে
তুলেছেন। প্রেমের যন্ত্রণার অগ্নিদাহে চিরশুদ্ধ চৈতন্য-
মূর্তি তাঁরা চিত্রিত করেছেন। বাস্তব জগত বলে প্রেমের
চেয়ে জীবন বড়, এঁরা বলেন জীবনের চেয়ে প্রেম বড়।
শ্রীচৈতন্য সে প্রেমের যন্ত্রণার অগ্নিদাহে ভাস্বর প্রতিমা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই প্রেমময় পুরুষকে
একাধারে ভক্তিকল্পতরু, ভক্তিকল্পতরুর রক্ষক ও পোষক
রূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যমালি, তাঁর তত্ত্বাবধানে
কল্পতরুতে কৃষ্ণপ্রেমফল ফলিত হয়েছে, সে ফল
পরিপক্কও হয়েছে আর মালি নির্বিচারে পরম স্নেহে
বিশ্বজনে তা বিতরণ করে চলেছেন—

শ্রীচৈতন্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি।

ভক্তিকল্পতরু রূপিলা সিঁধি ইচ্ছা পানি ॥

উডুঘর বৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব অঙ্গে।

এই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥

পাকিল যে প্রেম ফল অমৃত মধুর।

বিলায় চৈতন্ত মালি নাহি লয় মূল ॥

মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র।

ইহার বিচার নাই, জানে ‘দিব’ মাত্র ॥

(চৈঃচঃ ১২)

এই অরূপণ প্রেমবারি বর্ষণে কে চায়, কে না চায়,
কে যোগ্য পাত্র, কে অপাত্র সে বিচারের প্রয়োজন
কোথায়? এ কেবলই দেওয়া। যেমন জলভারাক্রান্ত
মেঘসত্তার পৃথিবীর বৃকে বর্ষণ করেই তৃপ্ত, স্থান অস্থান
বিচার করে না, সূর্যরশ্মি পৃথিবীর দীনতম ব্যক্তির
দুয়ারকেও আলোকিত করে তেমনি এ প্রেমেও কোনও
বিচার নেই—‘জানে দিব মাত্র।’ কল্পতরুর কাছে
প্রার্থীকে আপন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করতে হয়,
কামধেনুকে দোহন করলে তবে দুগ্ধ লাভ হয়, স্পর্শমনির
স্পর্শ পেলে তবেই লৌহ সোনা হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য
জানেন কেবল সর্বসমর্পণ। এই সর্বসমর্পণের মহান
সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে আরো বহু পূর্বে বৌদ্ধ সাহিত্যে।
বোধিসত্ত্ব বোধিচিহ্ন বরণ করে সর্বদান যজ্ঞের সূচনা
করেছেন—

অনাথানামহং নমঃ সার্থবাহশ্চ যামিনাম্

পারেপস্থনাং চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ ॥

(বোধিচর্যাবতার ৩য়, ১৭)

আমি অনাথের নাথ, পথিকের পথ প্রদর্শক, নদনদী
উত্তরণকারীদের নৌকা, সেতু ও সংক্রম। আরো
বলেছেন—

দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যামিনামহম্।

দাসার্থিনামং দাসো ভবেয়ং সর্বদেহিনাম ॥ (ঐ, ১৮)

আমি যেন দীপপ্রার্থীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা,
এবং দাস প্রার্থীর দাস হতে পারি।

চিন্তামণিভদ্রঘটঃ সিদ্ধবিভা মহৌষধিঃ।

ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কামধেনুশ্চ দেহিনাম ॥ (ঐ, ১৯)

আমি যেন প্রাণীদের চিন্তামণি, ভদ্র ঘট, সিদ্ধবিভা,
মহৌষধ, কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু হতে পারি।

কেবল জীবনের মানস যন্ত্রণাই নয়, মানস ও দৈহিক

উভয় যন্ত্রণার মন্দিরে যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা তার পরিচয়

রয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যে। বোধিসত্ত্বদের জীবনে দেখা যায় এঁদের দেহ যখন অত্যাচারীর নৃশংসতার শিকার হয়েছে তখনও তাঁদের হৃদয়পদ্মে পরম মৈত্রী অঙ্কুর রয়েছে।

যশস্বতীকৃতচাস্ত্রা ময়ায়ং সর্বদেহিনাম।

ব্লস্ত নিন্দন্ত বা নিত্যমাকিরন্ত চ পাংসুভিঃ॥

ক্রৌড়ন্ত মম কায়েন হসন্ত বিলসন্ত চ।

দন্তস্তেভ্যো ময়া কায়শ্চিন্তয়া কিং মমানয়া ॥

কারয়ন্ত চ কৰ্ম্মাণি যানি তেবাং সুখাবহম

(ঐ, ১২-১৩)

সর্বপ্রাণীর সকল সুখলাভের জন্মই আমার দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলি সমাচ্ছন্ন করুক, ক্রৌড়া, হাস্ত, বিলাস তাদের সুখকর যে কোন কাজ করুক, এ দেহ তাদের সমর্পণ করেছি। চিন্তার আর কি প্রয়োজন?

শ্রীচৈতন্যের আত্মদানেও এক অপ্রমেয় প্রেম জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নিজেকে বিলিয়ে দেবার পরম ব্যাকুলতায় বলেছেন—

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন

কি দিয়া তোমা সভার ঋণ করিব শোধন

দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ

তাহাই বিকাই যাই। বেচিতে তোমার মন।

(চৈঃ চঃ ৩।১২)

তিনি সন্ন্যাসী, দেহটাই তাঁর একমাত্র সম্পত্তি। এ দেহকে অস্ত্রের ষেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে তিনি প্রস্তুত। এ মহান আত্মদানের উৎসসিদ্ধ বোধিসত্ত্বের বোধিচিত্ত। আপন চিৎপ্রকর্ষের উদার দাক্ষিণ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন

তস্মাৎসংসারস্যর্থ পরহুঃখশমায় চ।

দদাম্যনোভ্য আত্মানং পরান্ গৃহামি চাত্মবৎ।

অতঃসংবদ্ধমস্মীতি নিশ্চয়ং কুরু হে মনঃ ॥

সর্বসত্ত্বার্থসংস্কার্য নান্যচ্চিন্ত্যং জয়াধুনা ॥

(বোধিচর্যাবতার, ৮।১৩৬-৩৭)

নিজের ও অস্ত্রের উভয়ের হুঃখ দূর করার জন্য আমি আমার 'আমি' অন্যকে দান করছি, অন্যকেও আমার ন্যায় গ্রহণ কবছি। হে মন, তোমার এই সিদ্ধান্ত যেন

হয় যে আমি অন্যের। সর্বজীবের স্বার্থ পূরণ ব্যতীত তুমি অন্য কিছু চিন্তা করো না।

বোধিসত্ত্বের নির্বাণে বীতস্পৃহা আর বৈষ্ণবদের মোক্ষে অনীহা দুই দৃশ্যতঃ এক বস্তু না হলেও মূলতঃ এক। মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে (কারণবৃত্ত) নির্বাণকেও চরম অবহেলায় পরিত্যাগ করার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর স্মেরু শৃঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান সমাধিধারা নির্বাণলাভ করেছেন। তিনি অনন্ত শূন্যলোকে প্রবেশে উদ্বৃত্ত হয়েছেন। এমন সময় চতুর্দিক বলয় কম্পিত করে জাগতিক মানুষের এক গভীর আতর্জন উঠল। অবলোকিতেশ্বর তাদের হৃৎখে গভীর ব্যথ পেলেন। তিনি বহু সাধনায় করায়ত্ত সিদ্ধিকেও উপেক্ষা করে সর্বমানবের কল্যাণ কামনায় বোধিসত্ত্ব ব্রত গ্রহণ করলেন (An Introduction to Buddhist Esoterism, B. Bhattacharya, 1932 p 29)। চারি অপ্রমেয় ভাবনায়ও 'উপেক্ষা' চিন্তের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়। উপেক্ষা লাভালাভ নিন্দাপ্রশংসা সুখদুঃখাদি লোকধর্মে চিন্তের অলীন অকম্পিত ভাব। উপেক্ষা ভাবনায় অধিষ্ঠিত সাধক বহু কষ্টার্জিত নির্বাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের যে সংলাপ আহরণ করেছেন তাতে বলা হয়েছে—'প্রেমভক্তিই সর্বসাধ্যসার'। এ প্রেম জাগতিক মনের একটি Instinct মাত্র নয়, সাধকের প্রাণে মোক্ষ বাসনাটিও যখন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় তখনই চিদাকাশে এই শুদ্ধ প্রেমভাবের উদয় হয়। এ প্রেমের সঙ্গে আত্মইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

আত্মইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তাতে বলি কাম।

কৃষ্ণেইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোষ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য—হয় প্রেম প্রবল ॥

বোধিসত্ত্বও বলেছেন—

স্বার্থদ্বারেণ সা প্রীতিরাত্মার্থ প্রীতিরব সা।

(বোধিচর্যাবতার ৮।২৫)

স্বার্থে যে প্রীতির উৎপত্তি তাই আত্মপ্রীতি।

সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আহরণ করেছে বৈষ্ণব ধর্ম।
শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।

বৃক্ষ যেন কাটিলে কিছু না বোলয় ॥

শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।

ঘর্মবৃষ্টি সহে, আগের করয়ে রক্ষণ ॥ চৈঃচঃ ৩।২০

বোধিসত্ত্বও সহিষ্ণুতার প্রতীক তরুণের সাহচর্য
কামনা করেছেন।

নাবধ্যস্তি তরবো ন চারাদ্যাঃ প্রযত্নতঃ।

কদা তৈঃ স্তম্বসংবাসৈঃ সহ বাসো ভবেন্মম।

(বোধিচর্যাবতার, ৮।২৬)

তরুণ কাকেও অবজ্ঞা করে না। সযত্নে তাদের
আরাধনা করা উচিত। তাদের সহবাস স্তম্বকর। আমি
তাদের সহবাস কবে পাবো।

একদিকে বোধিচিহ্ন পরিগ্রহ করে বোধিসত্ত্বের
জীবনে প্রেমচ্যুতির প্রশান্ত স্মরণে মহাযান সাহিত্যলোক
চমকিত আর একদিকে বৈষ্ণব কবিদের চিত্রিত ভক্তি-
বিনম্র পটভূমিতে প্রেমের সেই তীব্রতা বিদ্যালেখার মত

বলসে উঠেছে শ্রীচৈতন্যের জীবনবেদে। একদিকে
বুদ্ধ দেশনাশ্রিত মানব মহত্বের চরম প্রকাশ হিমাচলের
সর্বোচ্চ শৃঙ্খল উত্তমজ্ঞতা নিয়ে বিরাজিত, অন্যদিকে
প্রেমের ধ্রুব সম্পদকে বক্ষে আহরণ করে সকলের বেদনা
বক্ষে লয়ে সকলের অশ্রুধারা আকর্ষণ করে এ সীমাবদ্ধ
পৃথিবীর বুকে অমরলোকের আশ্বাস—‘বাঙালীর হিয়া
অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া’। অবশ্য এই মিলকে
একের উপর অন্যের প্রভাব জনিত না বলে মহাপ্রভুর
জীবনে এ তাঁর জাতীয় উত্তরাধিকার বলাই অধিক
সঙ্গত।

সহায়ক গ্রন্থ :—

১। শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার, সুজিতকুমার
মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।

২। শান্তিদেববিরচিতঃ বোধিচর্যাবতারঃ ed. পি.
এল. রৈদ্য, মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০।

৩। মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দ, রাধাগোবিন্দ নাথ, ১৯৬৩

৪। গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ড্র. ৪র্থ খণ্ড, প্রাচ্য বাণী
মন্দির, ১৯৫১।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

এক বিশ্বকর যুগে আমরা বাস করি। নানায়ুগান্ত-
কারী আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি ভাণ্ডারকে
ক’রে ভুলেছে ক্ষীত। প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন
চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। অজ্ঞানতার অন্ধকার
ক্রমেই অপনোদিত হচ্ছে এবং সুদীর্ঘকালের কুসংস্কার
যে চিরন্তন সত্যের জ্ঞানসূর্যকে আবৃত করে রেখেছিল
তার মুক্তি হচ্ছে। এ যুগ বিজ্ঞানের অধিকারে।
বিজ্ঞান আজ মানুষের চিন্তা, যুক্তি ও যাবতীয় মানবিক
কার্য—কি কায়িক, কি মানসিক, সব কিছুর উপরেই
প্রভাব বিস্তার ক’রে আছে। তথাপি এ যুগেই বিজ্ঞানের
সঙ্গে ধর্মের সংঘাতের তীব্রতা কমে এসেছে। উভয়ের

মধ্যে একটা মিতালির স্তর গড়ে উঠেছে এ এক অভিনব
সংবাদ।

[এক]

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ দীর্ঘকাল ধরে প্রচা-
রিত। এ বিরোধ পাশ্চাত্যধণ্ডেই শুরু হয়। তারপর
ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। প্রাচীন ভারতে আর্য ঋষিরা একই
সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব (সায়েন্স) আলোচনা
ক’রে গেছেন, তার অমূল্য ক’রে গেছেন তা আমরা
ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এবং পঞ্চম বেদ বা উপবেদ
আয়ুর্বেদ পাঠ করলেই বুঝতে পারি।

প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদের ‘যা গৌর্বর্জনিং পর্যেতি

নিষ্কৃতং পয়ো হুহানা ব্রতনীরবারতঃ। সা প্রক্রবাণা বক্রণায় দাশুনে দেবেভ্যো দাশবিষা বিবস্বতে' (ঋ অ. ৮ অ. ২ ব. ১-মং. ১)। মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে 'লা' হচ্ছে যে সব পদার্থ 'গৌ' নামে অভিহিত হয়েছে (বেদে 'গৌ' শব্দ জ্যোতির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, সূর্য, পৃথিব্যাদি গ্রহগণ, চন্দ্র-মাদি ইত্যাদি 'গৌ' নামে অভিহিত হয়েছে), সেই সমস্ত লোক বা গ্রহগণ নিজ নিজ মার্গে পরিভ্রমণ করে থাকে। অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের চিন্তাধারা এখানে সুস্পষ্ট। সূর্য বা গ্রহাদি নিজদের কক্ষপথে অনবরত পরিভ্রমণ করছে একথা বলা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশে তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। আবার একই সঙ্গে একথাও বলেছেন পরমেশ্বর যে যে গ্রহগণকে যে যে মার্গে প্রদক্ষিণ করার জন্তে নির্দিষ্ট (নিষ্কৃত) করে দিয়েছেন, তাঁরা সেই মার্গে পরিভ্রমণ করছে। উপরোক্ত লোকসমূহ (এহাদি) বিবিধ প্রকার রস, ফল, ফল ভূগ ও অন্নাদি পদার্থ দিয়ে সমগ্র প্রাণিকুলের অভাব পূরণ করছে। এই একটি শ্লোকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা, সর্বনিয়ন্ত্রণরূপে ঈশ্বরের কথা ও গ্রহাস্তরে প্রাণী আছে সে কথা বলা হয়ে গেল। শেষের বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক ধ্যাতি সম্পন্ন লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ এরিখ ফন দানিকেন তাঁর চারখানি অমূল্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাই দেখা যায়, ভারতে বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত প্রাচীনকালে ছিল না।

ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলপত্তন করেছে ঋগ্বেদ একথা আজ অনস্বীকার্য। তাঁরা ঈশ্বরকে জানার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁরা বলেছেন পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহগণ সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কথাও তাঁরা বলেছেন বার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের 'কসমোলজির' তত্ত্বের মিল সুস্পষ্ট।

তাঁরা কানো একথা বলেন নি পৃথিবী স্থির রয়েছে আর সূর্য তা'র চারপাশে ঘুরছে বলেই দিবা-রাত্রি হচ্ছে। ঋগ্বেদে এতই সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞানের আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় ঋষিরা উপনিষদ ও বিভিন্ন পুরাণে ক্রমবিবর্তনবাদের কথা বলেছেন। মানুষ

যে পৃথিবীর জন্ম থেকেই আসে নি এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। যারা বলেছেন সেই সব ঋষি-বিজ্ঞানীরা সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন। অথচ পাশ্চাত্যে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও গিয়োর্দানো ব্রুনো ইত্যাদি খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ সত্য প্রকাশ করেছিলেন বলে কি অকথ্য নির্যাতন সয়েছেন! গীর্জা থেকে প্রচারিত দু'দিনের বিশ্বসৃষ্টির মতবাদ তাঁরা মেনে নেন নি। অস্বীকার করেছেন সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে একথা বলতে। তাঁরাই ফলে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ব্রুনোকে রোমের রাজপথে পুড়িয়ে মারা হলো। গ্যালিলিও কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্যাতনের ফলে প্রায় অর্ধেকশতাব্দী হয়ে পড়লেন। সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা কপিল অথবা চার্বাক দর্শনের উদ্ভাতা ঋষি চার্বাককে সক্রোটি-সের মতো বিষপানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় নি।

আমাদের দেশের ঋষি বলেন নি ঈশ্বরকে না মামলে রোগ বা মৃত্যু হবে। আত্রেয় ঋষি বলেছেন, 'হিতাহার (পরিমিত ও প্রয়োজনীয় আহার) পুরুষের অস্তিত্বের কারণ এবং অ-হিতাহার রোগের।' এই নিয়ে হৃদর্শ আলোচনা রয়েছে 'অগ্নিবিশ তন্ত্রে'। আর 'অগ্নিবিশ তন্ত্র'কে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল চরক সংহিতা। সুপ্রাচীনকালে রোগ ছিল না একথা ভারতীয় ঋষিরা বলেন নি বরং স্বীকার করেছেন— 'বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুভূতাঃ শরীরিণাং। তপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুধাং ॥ তদা ভূতেশ্বরক্রোশঃ পুরুত্বা মহর্ষয়ঃ। সমেতাঃ পুণ্যকর্মণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।' যখন পৃথিবীতে রোগ দেখা দিল, 'রোগ প্রাদুভূত হয়ে মানুষের তপস্তা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও আয়ুর বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগল, তখন পুণ্যকর্মী মহর্ষিগণ কেমন ক'রে রোগবিমুক্ত হওয়া যায় এই দুঃস্থ জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্তে হিমালয়ের পাশে সমবেত হয়েছিলেন। কারা এসেছিলেন— 'অঙ্গিবা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপো ভৃগুঃ। আত্রেয়ো গোতমঃ সাজাঃ পুলস্ত্যা নারদো-হসিতঃ। অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্চলায়নো। পারিক্ষিভিষ্কুরাশ্চৈয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ ॥' ইত্যাদি আরো অনেক মহর্ষি। তাঁরা সব কেমন ঋষি? 'ব্রহ্ম-

জ্ঞানস্রু নিম্নয়ো দমস্ত, নিয়মস্ত চ। তপসশ্চৈজস্মা দীপ্তা
হুয়মানা ইবাগ্নয়ঃ। তাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন,
দম ও নিয়মের নিখিলরূপ এবং তপস্শ্চৈজ হুয়মান অগ্নির
মতো দেদীপ্যমান। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মৎ-
প্রণীত 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা' গ্রন্থে রয়েছে।
যাই হোক একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে, যে মহাবিরা
ব্রহ্মজ্ঞ হবার বাসনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা
সায়েন্স বা বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ধর্ম
বা অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তাকেও প্রশ্রয় দিয়ে-
ছেন। কখনো বিরোধ ঘটেনি না। আত্মিক জীবনে, নী
সমাজ জীবনে। কারণ তাঁরা জানতেন হুই-ই সত্যের
প্রতিক্রিয়া।

তবে এই দুটি সত্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দুধর্ম ও ত্রীমাক্ষক' প্রবন্ধে
বলেছেন, 'দুইরকম সত্য আছে—এক, যা মানুষের সাধারণ
পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থিত অনুমানের দ্বারা
গ্রাহ্য। হুই—যা অতীন্দ্রিয় স্বাক্ষ যোগজগজ্জতির গ্রাহ্য।
প্রথম উপায়ের সাহায্যে সঙ্কলিত জ্ঞানকে প্রচলিত
'বিজ্ঞান' বা সায়েন্স বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের
সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। উপনিষদে যাকে
'বিজ্ঞান' বলা হয়েছে এ হলো তাই। উপনিষদে বলা
হয়েছে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায়। এ
বিজ্ঞান জরাজীর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান নয়। একে পাশ্চাত্যের
'দর্শন' ও 'বিজ্ঞানের' সমন্বয় বলা যেতে পারে। বা
তারও বেশী।

[হুই]

বিজ্ঞানের চরম কর্তব্য সত্যের অনুসন্ধান। সত্যের
সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও
এতে যোগ দিয়েছেন। 'সৎ' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে
'সত্য'। সৎ + ক্ত্য অর্থাৎ সৎ এর প্রকাশ হলো সত্য।
দার্শনিকেরা সত্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—পার-
মার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। এর থেকেই
স্বতই প্রশ্ন উঠবে, এমন কি কোন সত্য বস্তু থাকতে পারে
যা স্বাখ্যত, যা সনাতন, যা সার্বভৌমিক। বিজ্ঞানের
সত্য তা হতে পারে না। বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত

হয় প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর।
একথা অনস্বীকার্য যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দেশ ও কালের
সীমানায় নির্দিষ্ট। যুগে যুগে বিজ্ঞানের সত্যের রূপ
পরিবর্তিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ
কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নতুন পরীক্ষার ফলে পরিত্যক্ত
হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।
এ কারণেই বিজ্ঞানের জগতে 'পরম বা চরম সত্য' বলে
কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য আপেক্ষিক।
আজ বিজ্ঞানীরা সামগ্রিক বা সনাতন সত্যকে সন্ধান
করতে তৎপর হচ্ছেন সত্য, তথাপি তাঁরা একথা স্বীকারে
অকুণ্ঠিত যে, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির
সাহায্যে বা বিচার প্রণালীতে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান
পাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সত্য পরিবর্তনশীল।
তাই বিনা প্রমাণে কেন, কোন কারণেই বিজ্ঞান কোন
সত্যকে প্রব সত্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়।
অর্থাৎ বিজ্ঞানে 'পরম সত্যের' স্থান নেই।

ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা অনেক কথা বলেছেন।
ইংরাজীতে 'রিলিজিয়ন' বা ভারতীয় 'ধর্ম' শব্দ দুটি কি
এক? পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা রিলিজিয়ন সম্বন্ধে
আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য কি ভারতীয়
'ধর্ম' শব্দ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য? তৈত্তিরীয় আরণ্যকে
আছে 'ধর্মো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা...ধর্মে সর্বং প্রতি-
ষ্ঠিতম'—অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বজগতের—নিখিল স্বাবর জন্মা-
ত্মক জাগতিক পদার্থ-নিচয়ের প্রতিষ্ঠা-আশ্রয়, ধর্মেই
সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানসেবী, দার্শনিক সাধক-
প্রবর শশীভূষণ সান্যাল (রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী,
পরবর্তী কালে যোগব্রহ্মানন্দজী) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ
'আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে' 'রিলিজিয়নকে' উপধর্ম বলেছেন।

উপধর্ম বলতে কি বুঝি? 'উপমিতঃ ধর্মেণ উপ-
ধর্মঃ।' অর্থাৎ যা ধর্মের সঙ্গে উপমিত হয়ে থাকে—
যা ধর্মের সদৃশরূপে গৃহীত হয় তাকেই বলে উপধর্ম।
তিনি বলেছেন ২, 'বেদের সহিত উপবেদের, পুরাণের
সহিত উপপুরাণের বা বিষের সহিত উপবিষের যে
প্রকার সম্বন্ধ ধর্মের সহিত উপধর্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ,
ধর্মের সমুদয় লক্ষণ উপধর্মে নাই। উপধর্ম জিজ্ঞাসা

চরিতার্থ হইলেই ধর্ম জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয় না, উপধর্মের স্বরূপাবগতি হইলেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয় না।

ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে জানা যায় যা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে, ধর্মী বা বস্তুকে যা ধারণ করে—ধরে রাখে, যার দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। পাশ্চাত্যপণ্ডিত এ. স্মী বলেছেনও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিদ্বৎ রিলিজিয়নের বীজ। কথাটি সত্য। কিন্তু দেখুন কি তা জানার চেষ্টা ও কার্যমাত্রের পরমকারণানুসন্ধান এক কথা। সৃষ্টি বা কার্য দেশে কারণের অনুমান হয়ে থাকে। কিন্তু এ জাতীয় অনুমান, পূর্ণরূপে কারণের স্বরূপনির্ণায়ক নয়।

বিজ্ঞানী টেট তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিণাম সমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় এবং নির্ণীত কার্য কারণ সম্বন্ধকে গাণিতিক প্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ কোন একটি কার্য কোন্ কোন্ উপাদান-কারণ সমবায়ে উৎপন্ন হয়েছে ও যে যে উপাদান-কারণ সমবায়ে তা সমুৎপন্ন হয়েছে, তাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কেমন, তা নির্ধারণ করা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ। আর সাধক-প্রবর মহাত্মা যোগেন্দ্রিয়ানন্দ বলেছেন, ৫ ‘পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে আগে জগৎকে জানিতে হইবে, চতুর্বিধ বিদ্যাজ্ঞানোপায় অবলম্বনপূর্বক, প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আব্রহ্মসত্ত্বপর্যন্ত সকল জাগতিক পদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে। অন্যত্র দেশ এ প্রশ্নের উত্তর পান নাই বলিয়াই রিলিজিয়ন্ ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।’

যাঁরা ভারতীয় আকর গ্রন্থসমূহ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দুই-ই পাঠ করেছেন তাঁরা উপরিউক্ত মহাত্মার বক্তব্যের সারমর্ম অবগত হইতে পারবেন। রিলিজিয়ন হৈলো কার্যাত্মক বা ভাববিকার, যেহেতু রিলিজিয়নের জন্ম স্থিতি ইত্যাদির পরিণাম আছে। আর ধর্ম কার্যাত্মক ও কারণাত্মক এই দুই ভাবের বাচক। অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বিজ্ঞানীরা ‘রিলিজিয়ন’ (যার পরিভাষা রূপে আলোচ্য প্রবন্ধে ‘ধর্ম’ ব্যবহার করা হয়েছে) বলতে যা বুঝছেন ভারতের

‘ধর্ম’ শব্দ তাঁর থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই এবং অনেক ব্যাপক।

বাট্রাও রাসেল বলেছেন, ৬ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কৃত কতগুলি বিশেষ তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেছে। কতগুলি প্রমাণিত তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান তার পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হয়েছে। ধর্মের অনুশাসন বা তত্ত্ব বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র। ধর্মে কতগুলি চিরন্তন ও চরম সত্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। বর্তমানের তত্ত্ব আগামীকালে পরিবর্তিত হবে এ কথা অযৌক্তিক নয় বিজ্ঞানের রাজ্যে। এবং এ কথা সত্য যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বা শেষ কথা বলতে পারে না। তবে বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার পর্যবেক্ষণ বা ব্যাখ্যা আরো নিপুণ হচ্ছে।

বাট্রাও রাসেল বলেন, বিজ্ঞান পরম সত্যের অনুসন্ধানে আগ্রহশীল নয়। বিজ্ঞানের সত্যকে তিনি বলেছেন ‘টেকনিক্যাল ট্রুথ’। বিজ্ঞানের থিয়োরী থেকে নানা আবিষ্কার হচ্ছে, খানিকটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যাচ্ছে।

বিজ্ঞান শব্দের বিস্তৃতি ব্যাপক হলেও পাশ্চাত্য জগতে এর সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রচলিত। বিজ্ঞান একটা নিয়ম-বদ্ধ জ্ঞান। পৃথিবী সম্বন্ধে দেয় এমন জ্ঞান যা আমাদের ইন্দ্রিয় সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে যা আমরা বুঝি তার শুরু হয় পাশ্চাত্যে সপ্তদশ শতকে। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানীদের প্রবল বাধার সন্মুখীন হতে হয়েছে চার্চের কাছে, ধর্মযাজকদের কাছে। একসময় এমন গেছে যখন চার্চের দোঁর্দিগু প্রত্যাপে বিজ্ঞানীর কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে।

ভারতে এ ধরনের অসহিষ্ণুতার নজির নেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রায় দু’শো বছর লড়তে হয়েছে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্যে। ফলে ওদেশে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য ক্রমেই বড়ো হয়েছে। আজকের দিনে যদি কেউ বলেন ‘প্রকৃতি এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে’—তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করবেন, ‘কিভাবে কাজ করছে তা কি আপনি প্রমাণ করতে পেরেছেন না শুধু

মাত্র কল্পনা' প্রমাণ না করতে পারলে কোন মত গ্রাহ্য হয় না বিজ্ঞানের রাজ্যে।

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইনস্ কলেজের অধ্যাপক বিজ্ঞানী ডক্টর রেনর. সি. জনসন, ডি. এস. সি (লণ্ডন) ১৯৬৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। ঐ বছরের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক, কলকাতা) ভবনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'In India mystics have been numerous; the Indian people have a widespread intuition of spiritual values—more so than any other nation on the earth,...In the western pattern religion is not greatly esteemed, its dogmas and its practices have fallen into disrepute because the scientific spirit is ascendant—and only a small minority of people are essentially religious...The truth of the mystics is just verifiable as that of the scientists, only the method of verification is different.'

বিজ্ঞানী অধ্যাপক জনসন সেদিন স্পষ্টই বলেছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সবচেয়ে বেশি ভারতে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে ভারতের মত দিব্যজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি এত অধিক সংখ্যায় আছেন। পাশ্চাত্যে ধর্মকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় না তার কারণ সেখানকার ধর্মের প্রচলিত অনুশাসন বিজ্ঞানের নিরীক্ষায় টেকেনি, তাতে বিতর্কের স্থিতি হয়েছে প্রচুর। ফলে অল্প সংখ্যক মাহুষ ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলে। বিজ্ঞানী জনসন দৃঢ়কণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন, আধ্যাত্ম-জগতের যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিজ্ঞানের সত্যের মতোই। তবে ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞানের সত্য যেভাবে প্রমাণ করা যায়, সেভাবে নয়। তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ওজন করে বা কোন পরিমাপ দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সাধক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি দিয়ে সেই সত্যকে যাচাই করে নেন। বিজ্ঞানী জনসন বিশ্বাস করেন, 'Truth comes to him with a sense of complete certainty so that no room for intellectual doubt remains'. সাধকের কাছে আধ্যাত্মিক সত্য এমন নিশ্চিতরূপে প্রকটিত হয়

যে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ নেই। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বলেছিলেন, মা কালীকে তিনি সঠিক ভাবেই দেখতে পান, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন যেমনি আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। অথবা শ্রীবামাফ্যাপা যেমন, শ্রীভারা মায়ের চড় খেয়ে শান্ত হয়ে গেলেন, আর উগ্রভাব রইল না। উপস্থিত দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করলেন মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে আসলেন বামদেব কাঁদতে কাঁদতে। গালে হাতের আঙ্গুলের ভুল্পা চিহ্ন। এমনি অসংখ্য উদাহরণ আমাদের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের জীবনে রয়েছে।

বিশ্বাস এবং সন্দেহ এই দুটি বিপরীত অবস্থা সাধারণ মানুষের থাকে। পুরা-জ্ঞান অনেক উৎকর্ষের। এখানে যিনি সাধক তিনি নিজেই দ্রষ্টা এবং তার দেহ-যন্ত্র হলো ল্যাবরেটরী। অর্থাৎ আধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে নিজের দেহকে প্রস্তুত করতে হবে সেই-ভাবে। দেহের ভিতরেই মূল্যধার থেকে সহস্রার পূর্বস্তু নানা পদ্যের কোরক প্রস্ফুটিত হয়। দূর প্রবণ, অতীন্দ্রিয় দর্শন, কায়্য পরিবর্তন, দেহ হালকা করে অশ্রুজগমন ইত্যাদি যা কিছু যোগীদের করায়ত্ত হয় তা দেহকে বাদ দিয়ে নয়। প্রতিটি বিষয়েই দেহ সংশ্লিষ্ট। তাই বলা হয় দেহ হচ্ছে সাধকের ল্যাবরেটরী।

বিজ্ঞান চরম বা পরম সত্যের সন্ধান দেয় না। কিন্তু আধ্যাত্মবিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলেছে। আধ্যাত্মবিজ্ঞানে যারা অনুশীলনকারী একাগ্র পণ্ডিত, তাঁরা অবশ্যই চূড়ান্ত সত্য জ্ঞানার বিজ্ঞানী। কিন্তু তার জন্যে সাধককেও তৈরী করতে হবে নিজেকে এমনভাবে যাতে তিনি এই ধরনের সত্যকে গ্রহণ করতে পারেন।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন, 'বিজ্ঞান হচ্ছে বিধিবদ্ধ চিন্তাধারা। এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়কে যথাসম্ভব ভ্রূসঙ্গত সম্পর্ক-বন্ধনে গ্রথিত করার শতাব্দী ব্যাপী সাধনা। আর একটু বলিষ্ঠভাবে বললে বলা যায় যে, বিজ্ঞান হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্যবাদের পদ্ধতিতে অভিজ্ঞের উত্তরকালীন পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা।

তার মতে ধর্ম মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ মাত্রায় সচেতন হয়ে প্রতিনিয়ত এর পরিণামকে

শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপক করার জন্য মানব সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের হৃদয়াবেগসম্মত আধারের উপরই এর মোটামুটি স্থিতি।

আইনষ্টাইন বলেছেন, 'মানবসমাজকে অহমিকাপূর্ণ কামনা, বাসনা ও ভীতিবন্ধন থেকে যথাসাধ্য মুক্ত করা যদি ধর্মের অগ্রতম লক্ষ্য হয়, তবে আর এক অর্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ধর্মের সহায়তা করতে পারে। যদিও একথা সত্য যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ও তার পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করণক্ষম নিয়মাবলী আবিষ্কার করা, তথাপি এ-ই তার একমাত্র আদর্শ নয়। আবিষ্কৃত সম্বন্ধাবলীকে বিজ্ঞান যথাসম্ভব স্বল্পসংখ্যক পরস্পর-স্বতন্ত্র ভাবমূলক মৌলিকে পরিণত করার অভিলাষী। বহু তির এই যুক্তিসম্মত একত্ব-দর্শন-প্রয়াসের তিরই এর সর্বোচ্চ সাফল্য পরিদৃশ্যমান।'

ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র পৃথক ধরা হয়েছে একথা সত্য, তথাপি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিরাজ করছে। বিজ্ঞান শুধু তাঁরাই সৃষ্টি করতে পারেন যারা সত্য ও ধী লাভের আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণভাবে জারিত। এই অনুভূতি বিজ্ঞানী লাভ করেন ধর্মের এলাকায়। রয়েছে সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস; অস্তিত্বময় জগতের মূলে যেসব কারণ বিরাজ করছে তা যুক্তিসম্মত। এই বিশ্বাসে ওতপ্রোত না হলে কেউ যথার্থ বিজ্ঞানী হতে পারেন না বলে আইনষ্টাইন মনে করতেন। তিনি তাই বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।'

একই ধরনের কথা বলেছেন বিজ্ঞানী-দার্শনিক জ্যোতিষ্যাপক প্রিয়দারশন রায়। তিনি ত্রীদিলীপকুমার রায়কে একপত্রে লিখেছিলেন, '১০ 'বিজ্ঞান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয় যে বিজ্ঞানের সত্যগুলি হচ্ছে খুচরা সত্য; এবং বহু খুচরা সত্যকে জোড়া দিয়ে যে একটি পাইকারী বা ব্যাপক সত্যের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানে—তারও কোন স্থিরতা নাই—কারণ, নূতন তথ্যের আবিষ্কারে তারও রূপ যেতে পারে বদলে, এমনকি তার সমূলে বিলোপ

ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই বিজ্ঞানের কোন সত্য, চূড়ান্ত-চরম বা শাস্ত্র নয়।'

বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ তাঁর অনিশ্চয়তা সূত্রের (প্রিন্সিপল অব আনসারটেনটি) সাহায্যে প্রমাণ করেন, কোন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে বহু আইন কানুন জানতে পারলেও তার সাহায্যে কোন ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তাই মনে হয় মানুষের সীমিত বুদ্ধি-পরিচালিত যে বিজ্ঞান তার সাহায্যে বিশ্বের ভবিষ্যৎ গতিবিধি পরিচালনা করা অসম্ভব। এবং এই বিজ্ঞানের নিয়মামুসারে 'প্রকৃতি' ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন কি না সে বিষয়ে প্রবল সংশয় আছে। হাইসেনবার্গ বলেন, কার্য কারণবিধির একটি প্রধান নিয়ম হল তা সীমিত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে প্রযোজ্য। কিন্তু পারমাণবিক জগতে সীমাবদ্ধ এমনকি আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ জগতেও কোন ঘটনাবলী এর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপরেই যদি কার্যকারণবিধি প্রযোজ্য না হয় তাহলে যে বিশাল জগত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে আছে সেখানে কিভাবে তা কার্যকরী হবে? এ কারণেই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক ১১ বলেছেন মানুষের স্বেচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর মধ্যে কিভাবে কার্যকারণবিধি নিহিত আছে তা সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর হলেও উচ্চমার্গের কোন কার্যকারণবিধির সাহায্যে সেই কার্যাবলী কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কোন মহামানব নিঃসন্দেহে বুঝে নিতে পারেন। এখানেও চৈতন্যসত্তার আভাসস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

(তিন)

এখন বিজ্ঞানের সামনে যে জগৎ তা প্রায় অপরিচিত। গবেষণার ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হচ্ছে, অজানার গণ্ডী হচ্ছে তত বিস্তৃততর। পদার্থবিদের প্রকৃতির মূল বা উৎস সন্ধানে গিয়ে তাঁদের অজানতার সীমা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বায়োলজিস্টরা মনে করেছেন যখন কোন ঘটনাকে প্রাকৃতিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হ'ল—যেমন বস্তু, বল, শক্তি বা অস্ত্র কিছু দিয়ে, তখন তার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু

পদার্থবিদেদেরা জানেন তাঁরা সেখানে অক্ষম। তাই বিজ্ঞানের এলাকা বা সীমা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। বিজ্ঞানকে তাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে মেনে নিতে হবে। একথা সত্য যে কোন বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করে 'প্রকৃত ধর্ম' কখনো উঠতে চেষ্টা করে না। সত্যধর্ম অনেক গভীরের বস্তু। তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দৃঢ় শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বেদান্তের বাণী শাস্ত, সনাতন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিতালি আছে। বেদান্তের ভাবনা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে নয়, এবং সেই চিন্তা কালের পবিবর্তনে পুরোনো বা পরিত্যাজ্য হয় নি। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বেদান্তের মধ্যে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা আবিষ্কৃত হতে পারে তাকেও স্থান দিয়ে রেখেছে বেদান্ত।

বেদান্ত বলে, বিজ্ঞানীরা যতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা অনুভূতির সীমানার মধ্যে। তাঁরা বস্তু জগতের যতটা সম্ভব অনুসন্ধান করেছেন তার সবটাই অনুভূতি গ্রাহ্য। কিন্তু এই অংশ সময়ের আংশিক মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, 'আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে জগতের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা তার প্রকৃত স্বরূপ নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও মনের অবস্থার সঙ্গে এর রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একারণেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অলীক বা অনিত্য।'

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শক্তিমান হয়ে মানুষ নিজেকে মনে করেছে হুর্জয়। লোভ, মোহ, ঘন্দ, হানাহানিতে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত। তাই বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের সার বস্তুটি দিচ্ছে কোথায়—এ 'বিজ্ঞান' দিতে পারে না। সর্বত্র সমান দেখা, সকল বস্তুকে

সমজ্ঞান করা, সকল ভূতে নিজেকে দেখতে পেলে মানুষ হিংসা ভুলে যাবে। ভখন মারামারি থাকবে না। যিনি সমদর্শী তিনি সর্বত্র নির্বিশেষভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলে নিজে হিংসা করেন না, ফলে তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

বেদান্ত ও গীতার বাণীতে আমরা পাই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শান্তি ও মুক্তি লাভের স্তমহান নির্দেশ। তাহলে আমাদের করণীয় কি? বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উপলব্ধিকে। তাহলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অভির্শাপ দেবে না বিজ্ঞানকে।

তথ্যপঞ্জী:

১। চরকসার

২। আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় অংশ

৩। The mind of man—A. Smee.

৪। Recent Advances in Physical Science.

৫। আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ

৬। Religion and Science.

৭। Ramakrishna Mission Inst. of Culture Bulletin, 1963

৮। জীবন-জিজ্ঞাসা—আইনষ্টাইন; অনুঃ শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। ঐ

১০। শ্রীঅরবিন্দ ও ধর্মবিজ্ঞান

১১। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান



কক্কীরূপ বন্দনা

আত্মায়ক

[এক] কহত কহত সন্নি, কেমনে ফিরায়ে আঁখি
এ যে দেখি অক্লরূপ শ্রাম।
নহেত নটবর শ্রাম, নহেত রঘুবর রাম,
নহেত গদাধর নাম,
এ যে ত্রিক্রপেত দেখি, রূপে মাখামাখি,
নিজে বলে 'কালীপদ' নাম।
কলিতে নামিল 'কালী'
'কালী' নামে বনমালী
'কালী' সাথে দিল পদ নাম।
শ্রামে পাঁথা শ্রম আঁখি,
রাম নাম বুনে রাখি,
হরি নাম মুখে ডাকি,
(সই) কহত কেমনে বলি কালী!
তবে চোখে দেখে বুকে রেখে
মুখে বল 'কালীপদ' নাম।
নাম যে ছিল একা আমার,
এবার হলো তোমা সবার,
সবার হ'য়ে বর্ষ দিয়ে,
বল 'কালী' নাম।
নাম ছিল নোর যুগব্যাপী
যুগে দিলাম অংশ সঁপি,
অংশ এবার টাই পেলেনা,
তাইতো আমি নামছি একা।
অক্লপের রূপরেখা,
রেখা রেখে দেখা দিয়ে
বলব বিশ্ববাপী।

টীকা :

[পৃথিবীর সহস্রাব্দ ভূমি ভারত। যুগে যুগে এখানে
তাই এসেছেন অবতার ও অবতারকল্প মহাপুরুষেরা।
পূণ্যভূমি ভারতে বর্ণিত হয়েছে চার যুগের কথা। সহস্র
সহস্র বৎসর ধরে এক একটি যুগের পরিসর। সত্য,
ত্রৈতা, দ্বাপর ও কলি। চক্রাবর্তনে ঘুরে আসবে প্রতিটি
যুগ। প্রতিটি যুগের মধ্যে এক সময় প্রবেশ করে গানি।

ঈশ্বর বিমুখীতা। সত্যযুগে সাধকদের মধ্যে পাপ
সঞ্চারিত হয়েছিল—ভক্তিতে পাপ। সৃষ্টি হলো সুর ও
অসুর। ঈশ্বর ব্রহ্মবাদী, ঈশ্বরের পরম আনন্দময় ওঙ্কার
ধ্বনির সুরে সুর মিলিয়ে চলেছেন তাঁদেরই বলা হতো
'সুর'। ঈশ্বরের মধ্যে এলো অহংকার, নিজেকে মনে
করতে চাইলেন তাঁরাই অদ্বিতীয় তাঁদের বলা হলো
অসুর। অসুরেরা দেবতা মানত না। তাদের নিন্দাসূচক
সংজ্ঞা হলো 'অদেব', 'দেবনিদ', 'অযজ্ঞ' এবং 'অনিল্প'।
ঋগ্বেদের ৭।১৮।১৬, ১০।২৭।৫, ৫২।৩ সূক্তে অনিল্পের
বর্ণনা আছে। তারা বলছে 'নেন্দং দেবস্ অমংসত'
(ঋগ্বেদ)। তারা প্রশ্ন করে 'কোথায় সে?' দেবতাকে
মেনেও 'দেবহেলনের' অপরাধ যারা করে তারাও এই
দলের। সত্যকার অদেব হলো অজ্ঞানের আবরিকা
শক্তি। শ্রীমৎ অনির্বাক্ত তাঁর 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থে
বলেছেন 'মুরদেব, শিশুদেব' এদের সবাইকে ব্রহ্মদেবী
বলা হতো এবং তাদের সাধানন সংজ্ঞা 'রক্ষঃ', তাঁর
থেকেই 'রাক্ষস' শব্দের উৎপত্তি। সত্যযুগে সুর ও অসুর
সংঘর্ষে অসুর দমনের জন্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন গদাধর
'বিষ্ণু' ব্রহ্মের অংশাবতার রূপে।

ত্রৈতায় শক্তিতে পাপ প্রবেশ করেছিল, তাই রাবণ
প্রভৃতি মহাশক্তির তান্ত্রিক লাধকদের ব্রহ্মবিরোধী
(রাবণকে তাই রাক্ষস বলা হয়েছে) কাজ থেকে নিবৃত্ত
করবার জন্তে এসেছিলেন অংশাবতার 'রামচন্দ্র'। দ্বাপরে
জ্ঞানে পাপ অধ্যুষিত হয়েছিল। সেই পাপ হরণের
কাজে অবতীর্ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। সংঘটিত হলো কুরুক্ষেত্রের
মহাযুদ্ধ। তাই কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলে আখ্যা দেওয়া
হয়েছে। শাস্ত্র পাঠে দেখা যায় প্রতিটি যুগের শেষ
অবস্থাতেই দেখা দিয়েছিল, দ্বাপর এবং প্রাকৃতিক
মহাহর্ষিকাপ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ যখন হয় তখন
দ্বাপরের অন্তিম দশা। কলির সূচনা আরম্ভ হয়েছে।
কলিতে ভক্তি, শক্তি এবং জ্ঞান এই তিনেই গানি এসেছে
প্রচণ্ডভাবে। কলি যুগে পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তির দাবানল
জলছে। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা

যায় মহাভারতের যুগের অবসানের পর থেকে শাস্তিস্রোত ভারতে বয়ে যায় নি। নানা সময়ে ভারতের সনাতন ধর্মের উপরে এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। মানুষ হয়ে উঠেছে বিপথগামী। তাই উপযুক্ত সময়ে বহু ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ এবং অবতারকল্প মহাপুরুষেরা এসেছেন ভারতের মহতী বিনষ্টিকে ঠেকিয়ে রাখতে। এ যেন জোড়া তালি দেবার মতো। কিছুদিনের মধ্যে আবার ভক্তি, শক্তি ও জ্ঞান-মার্গের সাধকদের মধ্যে এসেছে অহঙ্কার। সমগ্র বিধে আজ অত্যাচারীর হংকার, গগণস্পর্শী হয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে অত্যাচারিতের ক্রন্দনরোলে টলে উঠেছে পূর্ণব্রহ্মের স্তম্ভাবস্থা। শাস্ত্রকারেরা তাই কলিতে কঙ্কীভগবানের আবির্ভাবের কথা লিখে গেছেন। হৃদীর্ঘকাল ধরে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা একনিষ্ঠ হয়ে সাধনা করে গেছেন তাঁর আসন পাতার জন্তে। তাঁরা বলেন কলির পাপ মোচনের জন্তে আসছেন পূর্ণব্রহ্ম কঙ্কী অবতার।

পূর্ণব্রহ্ম কঙ্কীভগবানের দুইরূপ। এক— ধ্বংসের বীজ (সংহার রূপ) ছড়িয়ে দেওয়া, দুই— এই খোলের মধ্যেই সত্যের শাস পুরে দিয়ে পৃথিবীকে প্রানিমুক্ত করা। অতীব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা বলেছেন, কলির এই ভরা অংশে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ‘কালীপদ’ নাম নিয়ে এই ভারতে, এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অলঙ্ঘ্য ধ্বংসের বীজ ছড়িয়েছেন, মোক্ষ দিয়েছেন উচ্চ কোটির সাধকদের এবং ব্রহ্মভূতা মহাপ্রকৃতির বিধান পরিবর্তন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে সব মহাশক্তিধর পুরুষ তাঁদের শক্তি হরণ করে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন সত্য-সুন্দরের পথে। তাঁর মহাকর্মের একটি অংশ সমাধা করে গেছেন প্রায় অধিকাংশের অলঙ্ঘ্য। কেবলমাত্র উচ্চ কোটির ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা তাঁর পরিচয় জানতেন, যেমন ভোলাগিরি মহারাজ, রামঠাকুর, মহর্ষি রমণ, নান্দাবাবা, বীতরাগবাবা, সন্তদাসবাবাজী এবং আরো সহস্র—সহস্র-বর্ষী প্রাচীন ঋষিরা। দুর্গম গিরিগুহায় ধ্যানমগ্ন থেকে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন পূর্ণব্রহ্ম ‘কালীপদ’ এসেছেন ধরাধামে। তাঁর পূণ্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীপ্রাচীন ঋষি, মুনিরা তাঁদের দেহাবসানকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

যে সব মানুষকে পূর্ণব্রহ্ম ‘কালীপদ’ স্বেচ্ছায়, কৃপালু হয়ে নিজ সত্তার সামান্যতম আভাস দিয়ে গেছেন তাঁরাও ধন্য। পূর্ণব্রহ্ম কঙ্কীভগবান রূপী ‘কালীপদ’ নামের রূপ বর্ণনা এসেছে তাঁরই কৃপাপ্রার্থী ও কৃপাধন্য সাধকের ধ্যানে। তাঁরই বন্দনাগান আলোচ্য কবিতায় গীত হয়েছে। এই রূপ বন্দনা ত্রিশ সত্তার শ্রীকণ্ঠ থেকে নিরূপিত। —ভাস্কর]

[হুই] জ্ঞান সাগরে বাইব তরী,
ভক্তেরা সব বলবে হরি,
শক্তি দিয়ে ঢালবো বারি,
করবো পারাপার।
তরীর আমি একাই মাঝি,
ফুলের আমি একাই সাজি।
ভরলে সাজি হবো রাজি
করতে পারাপার,
সময় নেইকো আর।
তরী নিয়ে বাইছি জলে,
ডাকলে পরে আসছি কূলে,
নায়ের উপর নিচ্ছি তুলে,
যাদের করবো পার
সময় নেইকো আর।

টীকা :

[সৃষ্টির আদিতে কারণসলিলের বর্ণনা রয়েছে। সৃষ্টি শব্দে আছে ‘সমুদ্রোর্ববঃ’। সমুদ্র=সম+উৎ+র। সৃষ্টির মূলে রাজিরূপ যে অব্যক্ত মহাবীজটি রয়েছে, তা যেন কিসের প্রেরণায় নিজেকে অভিব্যক্ত করবার জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। নিস্তরঙ্গ মহাসাগরে বায়ুবেগে যেমন একটা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, তেমনি। এখনও কোন তরঙ্গ দেখা দেয় নি। ত্রিমং স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর ধ্যানলব্ধ ‘জপসুত্রম্’ গ্রন্থে লিখেছেন অব্যক্ত কারণের অভিব্যক্তির নিমিত্ত এই প্রকার আদিম উচ্ছ্বাস, ‘সমুদ্র’ এই শব্দের সেইটাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মেরই ইচ্ছার স্পন্দনে সমুদ্রের সৃষ্টি। এইটেই হলো জ্ঞানসাগর। অরূপ ব্রহ্ম এলেন রূপব্রহ্মে। ‘অর্ণব’ শব্দের দ্বারা এজন বা গতি বোঝাচ্ছে।

‘ক্রিয়ামারভমাণে চার্গবে কলনবৃত্তিতা।

যয়া রূপায়তে বিশ্বং সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাং’ (জপসূত্রম্)
সমুদ্ভ অর্ণব হলো। তখন তাতে দেখা দিল অভিনব
কলন বৃত্তি। একেই বলে কালবৃত্তি। এ পর্যন্ত মূল-
তত্ত্বের যে পরিণাম, সেটি কালকে আশ্রয় করে থাকে
না। তা হলো অকাল বৌদ্ধ পরিণাম। কিন্তু ‘অর্ণব’
অবস্থায় কলন বৃত্তি। তাই কালিক পরিণাম আরম্ভ
হলো। এর ফলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ক্রমে নিখিল বিশ্ব
রূপায়িত হতে থাকে। পূর্ণব্রহ্ম একাই সলিলরূপী। সেই
সলিলে তাঁরই তরী ভাসছে।

পূর্ণব্রহ্ম ‘কালীপদ’ তাই আত্মান করেছেন নিখিল
ভুবনকে ‘শ্রুত্ব বিশ্বম্ অমৃতম্ প্রভাঃ’—শোন, আমি একাই
জ্ঞান, ভক্তি ও শক্তির স্বরূপ। আমার সাজিতে তুমি
তোমার জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তির পুষ্পার্থ্য দিয়ে ভরে দাও।
তাহলে এই সংসারের অলা থেকে তোমাকে মুক্তি দেব।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতাটির
কথা স্মরণ করলে এই ভাবই মূর্ত হয়ে ওঠে। ‘দেখে
যেন মনে হয় চিনি উহারে’। সত্যিই তো, তিনি নিজেই
আত্মান করছেন। কিন্তু বলতে হবে তো সেই তরীর
মাঝিকে ‘এবার আমারে লহ করুণা ক’রে।’ এই
সকরণ আত্মান জানাবার আগে উজাড় করে দিতে হবে
নিজেকে। ‘আমারি সোনার ধানে গিয়েছে তরি’—
শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান সবই তাঁকে অর্পণ করে দিতে হবে।]

[তিনি] আমার তরীর নাই ঠিকানা,
নেইকো কোন জানা শোনা।
উৎল জলে ভাসছে তরী,
কোথা যাবে কেউ জানে না।
জলের সাথে হেলে ঢুলে,
বাঁধবে না সে কোন কূলে,
জলের তরী থাকবে জলে।
জল যে তার সহপাঠী
করছে সাথে ঝটাপটি,
খাচ্ছে কেবল লুটোপাটি
জল যে তার প্রাণ।

টীকা :

[সৃষ্টি স্রষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্রহ্ম
নিরূপাধি। তাই তাঁর তরীর কোন ঠিকানা নেই।
অবাঙ্‌মানসগোচরঃ—তাই সহজে তাঁকে জানা যায় না।
কোথায় যে তিনি নিয়ে যাবেন তাও জানা নেই। তবে
ব্রহ্ম আর তাঁর জ্যোতিসমুদ্ভ অঙ্গাদি। ‘আপো ব্রহ্মঃ’
অর্থব্য।]

[চার] জলের সাথে খেলাধূলী
জল-তরীতে প্রেমের লীলা
জল যে তরীর প্রেমের আসর,
জলই তাঁহার প্রাণ।
তরী আমার হয় রূপসী,
রূপের আমি হই ঘোড়শী।
তরী ফেলে ঝাঁপাই জলে
প্রাণে মেলাই প্রাণ।
এ জলের ভাই নাই কিনারা,
হই না আমি দিগাহারা।
শক্ত হাতে হাল ধরে ভাই
জলের পথে ধাই।
বাইছি তরী আপন মনে,
কইছি কথা জলের সনে,
জল যেন তার আপন জন
আমিই তাহার প্রাণ,
ধরি আমি ‘কালীপদ’ নাম।

টীকা :

[আকার বিহীন জল ব্রহ্মস্বরূপ। ‘আপো প্রাণঃ’
সেখানে এল সৃষ্টি, অ-কৃতি নিয়ে, বৈশিষ্ট্য নিয়ে।
হলো ‘তরী’ স্বরূপ। ব্রহ্মেরই লীলাময় স্থান সৃষ্টি
উভয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ। কিন্তু প্রকৃতিরূপী তাঁর
জানে যে ব্রহ্মই তার প্রাণ। ব্রহ্মমায়াস্বরূপিনী প্রকৃতি
রূপশালিনী। কিন্তু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম যে আরো সুন্দর
তাঁর রূপের ছটার সীমা নেই। ত্রিভুবন আলোকিত যে
জ্যোতিধারায়। সৃষ্টি সুন্দর। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা চিরসুন্দর
তিনি চিরযৌবন। রূপবতী, ঘোড়শী তরুণীর অনিন্দ
রূপমাধুরী তাঁর। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যে আবদ্ধ না থে-
তাঁর প্রাণেই প্রাণ মিলিয়ে দিতে হবে। শাস্ত্রে বঃ
ঘোড়শী অমৃতময়ী।

জাগতিক মোহ থেকে বিচ্যুত হতে হলে প্রয়ো-
বলিষ্ঠ মাঝির, কঠিন হাতের। তিনিই নিয়ে যাবে
মোহ থেকে মোহাতীত সৌন্দর্যের সাগরে। নি-
সৃষ্টলীলায় বিভোর হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু মা
হচ্ছে বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির সাগর থেকে পূর্ণ
‘কালীপদ’ নিয়ে যেতে এসেছেন আনন্দময় সাগরে।
আসন্ন। যাত্রীদের প্রস্তুত হবার জন্তে উচ্চারণ করে
অমোঘ ওঙ্কার ধ্বনি। একটা কাজের পর্ব শেষ -
আবার আসছেন কর্ম সমাপ্তির মহা ইচ্ছা নি-
কোথায় তিনি আবির্ভূত হবেন তারও ঠিকানা দিয়ে-
সাধকের মহা ধ্যানে। —ভাষ্যকার]

সভাপতির মডেল অভিভাষণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য

নেতাদের সভাসমিতিতে সভাপতিত্বের জন্ত ডাক আসে। যারা ডাকে তাদের খাতির না করেও চলে না, অথচ সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জানবার বা চিন্তা করার মত সময়ও তাদের হাতে কম। তাই নেতাদের সুবিধার জন্ত একটা মডেল ভাষণ তৈরী করা গেল যা স্থলবিশেষে একটু এদিক ওদিক করে নিলেই অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আরম্ভ—সমাগত মানবগোষ্ঠী।

(টাকা—এখানে সম্বোধনটা ভাই বোনে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপকতর করা হল, কারণ ভাই-বোন বললে বেয়াই বেয়াইন অথবা ট্রামে বাসে হাটে বাজারে আপনাদের সবাইর পরিচিত মাসিমা ও দাচুরাও বাদ পড়ে যান। স্বামী বিবেকানন্দ যে সম্বোধন করে চিকাগোতে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তা এযুগে অচল। সভায় যারা উপস্থিত তাদের লিঙ্গ নির্দেশ অপ্রয়োজনীয়)

অতঃপর—আপনারা আমাকে সভাপতির পদে বরণ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে এ সম্মান আমার ব্যক্তিগত প্রাপ্য নয়। বস্তুতঃ এ সম্মান সেই মহান পাটির যার আমি অনুগত সদস্য। এইটি সেই পাটি হৃদ্বিনে যে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ ধরেছে—পাটি আপনাদের রক্ষার জন্ত ছুটে গিয়েছে। চাঁদা তুলতে অসুবিধা হচ্ছে, পাটি আপনাদের সহায় হয়েছে। পারমিট চান—অন্য সব দাবী অগ্রাহ্য করে আপনাদের দাবী লবার উপরে ধরে তুলেছে। মামলায় পড়েছেন—পাটি সহময়ী মায়ের মত আপনাদের কোলে আড়াল করে রেখেছে। এ হেন পাটির সদস্য বলে আমি বিশেষভাবে গর্বিত।

সভাপতি হয়েছি বটে কিন্তু তার বামেলা অনেক। আজকাল সভাপতি যেন সাংখ্যের পুরুষ। তার কোন ক্ষত্ব নাই। বক্তার সময়সীমা মানবেন না, প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিকের বালাই নেই, তারা আলাময়ী ভাষায় কেই চলেছেন। শ্রোতাদের ভাল না লাগলে তারা সভা ছেড়ে চলে যাবেন। সভাপতির সে পথ বন্ধ। টার পর ঘণ্টা গড়াশিবের মত চেয়ারে বসে সবই

তাকে শুনতে হবে। হয়ত সে চেয়ারে গাঢ়াকা ক্ষুদ্র জীবের প্রতিকারহীন অত্যাচার চলেছে তার অঙ্গ-বিশেষে। এসব ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তো তিনি সভাপতি। তিনি আর যত্নতৎপুরুষের সভাপতি নন, তিনি হবেন বহু-ব্রীহি সভাপতি—সভাই পতি যার।

আজ যে বিরাট পুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সে রকম মহাপুরুষ এদেশে খুব কমই জন্মেছেন। তিনি লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শিষ্য করে তাদের ইহলোক ও পরলোকের সুব্যবস্থা করেছেন। যখন তাঁর আবির্ভাব তখন দেশের ঘোর দুর্দিন, ধর্মের নামে মানুষ অধর্মের আচরণ করে পাপে ডুবে গিয়েছিল। বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে তারা নিজেরা সংস্কৃতিকে যাচাই করতে গিয়ে তাকে বর্জন করতে শুরু করেছিল। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে এ হেন স্বামীজির আবির্ভাব। তার নামটা না কি হে? হাঁ—স্বামী ভূয়ানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—যদা যদীহি—ইত্যাদি। পরেই বলেছেন পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশয়েচ্ছকৃত্যাম। স্বামীজি এবারে এসেছেন গীতার বাণীকে নব-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হুতন করে সাজাতে। এবারে বলেছেন—পরিভ্রাণায় শকৃত্যাম। সাধুরাভৌ নিজের পুণ্যের জোরেই পরিভ্রাণ পায় তাদের জন্ত অবতার ফবতারের দরকার নাই, স্বামীজির এবার মর্ত্যলোকে আগমন কেবল শকৃত্যের উদ্ধারের জন্ত। সেই জন্যে তার শিষ্যমণ্ডলীতে শকৃত্যকারীর সংখ্যা কিছু বেশী দেখে আপনারা হয়ত ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরে শকৃত্যদের উদ্ধারের জন্যই শক্তিধর মহাপুরুষ ভূয়ানন্দের অবতরণ। তাই তিনি অবতার। নাঃ, অবতার বললে ঠিক বলা হল না, কারণ ইদানীং এদেশে পাইকারীহারে অবতারের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। অবশ্য ভারত তাদের কৃপায় অনেক বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করেছে সভ্য, দেশবাসী এজন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বলি ভূয়ানন্দ স্বামী অবতার নন—তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ম্। তিনি দশ অবতারের উর্দে। এই স্বামীজিও

তেমনি অবতারের উর্দ্ধে। তাঁর কাজ কেবল বিদেশী মুদ্রা উপার্জন নয়, যদিও সকলেই জানেন, বিদেশী চেলা না জুটলে অবতারদের মাহাত্ম্যের সম্যক বিকাশের খুব একটা সুবিধা হয়ে উঠে না। স্বামীজি অদৃশ্য শক্তির পরিচালনা করে মানবগোষ্ঠীর অন্তর্জগতে আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনছেন। যার ফলে পাকিস্তানের পরাজয় ও বাংলাদেশের অভ্যুত্থান। তাই আজ তার মৃত্যু-বার্ষিকীতে (জৈনৈক শ্রোতা—জন্ম বার্ষিকী, আজ তার জন্মতিথি) —একজন বলছেন আজ তার জন্ম বার্ষিকী। এদের প্রকৃতপক্ষে জন্ম মৃত্যু বলে কিছুই নেই। তারা অজ অব্যয়। গীতায় আছে, জন্ম হলে মৃত্যু ক্রম আর মৃত্যু হলে জন্ম ক্রম। একটা টাকার এপিট ওপিট। তাই এদের জন্মবার্ষিকী যা মৃত্যু বার্ষিকীও তা।

শুনে আনন্দ হল, দেশের নানা স্থানে স্বামীজির নামে মন্দির ও আশ্রম স্থাপিত হচ্ছে। মন্দিরে পূজা অর্চনার সঙ্গে পাঁচবার করে ভোগের ব্যবস্থা আছে। আর ভোগের প্রসাদের গুণে ভক্তদের দেহের অংশবিশেষে পরিধির যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। বিনা খরচায় একসঙ্গে আয়তন বৃদ্ধি ও পুণ্য সঞ্চয়। এ ব্যবস্থা দেখে মনে হয় প্রত্যেক গ্রামে, সম্ভব না হলে, প্রথমে অন্ততঃ প্রত্যেক রকে যদি একটা করে মন্দির ও ভক্ত নিবাসের ব্যবস্থা হয় তাহলে খাদ্য সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়ে যাবে। ঠাকুরের ভোগের জন্য রোজ স্বপীকৃত খাদ্য আসছে। লেভির কোন প্রশ্নই নাই। ভারত রক্ষা আইনের ভয় দেখিয়েও সরকার লেভি আদায় করতে পারছেন না, অথচ এখানে স্বতঃপ্রসূত হয়েই লোকে নানারকমের ভোজ্য এনে হাজির করছে। এদেশ ধর্মের দেশ। তাই ধর্মের নামেই এদেশে বিদেশী মুদ্রার ও খাদ্য সমস্যার মীমাংসার পথ খুঁজে বের করতে হবে। এতেই আমাদের ইকনমি (বাংলা প্রতিশব্দ পাচ্ছিনা) সচল হয়ে উঠবে। জি, এন, পি বাড়ানোর কোন আবশ্যকই হবে না। অর্থনীতিবিদদের বলি, বিদেশী চশমা চোখে পরে এদেশের অর্থনীতির মর্মস্থলের সন্ধান পাবেন না। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যাতে গ্রামে গ্রামে

মন্দির ও আশ্রম তৈরীর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার- জন্যেই সরকারকে চাপ দিতে হবে।

দেশের সংখ্যাবিজ্ঞানীদের কাজ হবে সাধু সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ও ভাষা-নিকূপণ করা। মোট লোক সংখ্যার মধ্যে এদের হার কত এবং প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এদের হার শতকরা কত হারে বাড়তে হবে তা ঠিক করা। এরাই দেশের অর্থনীতির বুনয়াদ দৃঢ় করতে সমর্থ। এছাড়া হীবিহীন স্বামী ও রাজ্যবিহীন মহারাজদের সংখ্যা যত বাড়বে পরিবার পরিকল্পনার কাজও তত এগোবে। আজকাল পরিবার পরিকল্পনার নামে কি বুজরুকী ও কালোবাজারী চলছে তা আপনারা জানেন। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার যাদের হাতে আশী বছরের বুড়ো বুড়ীও তাদের শীকার হচ্ছেন। তাই পরিবার পরিকল্পনার স্বর্ণপট্ট হল সাধু সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। এর চাইতে কার্যকর ঔষধ আর কিছুই নাই।

আজ আর একটা কাজ আছে। প্রস্তাব এসেছে স্বামীজির নামে হবে একটা রাস্তার নাম করণ। আমাকে ফিতে কাটতে বলা হয়েছে, তা আমি সানন্দে করব। একজন ভক্ত প্রস্তাব করেছেন রাস্তার নাম অষ্টোত্তর সহস্র শ্রীযুক্ত ভুয়ানন্দ স্বামী সরণি। দেখন নাম লগা হলে লোকে ছোট নাম খুঁজে। বিনয় বাদল দীনেশ বাগ বা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সরণি কয়জনে বলে? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির নামে কোন রাস্তা নাই। এখনও বহু বিদেশীর নামে কলকাতা সহরে রাস্তা আছে। সেগুলিকে না ধরে একটা সোজা নামের সবাইর জানা রাস্তাকে একজন বিদেশী নাট্যকারের দাঁত ভাঙ্গা নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত লোক ছাড়া এনাম সহজে কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। তাই বলি নামকরণ সার্থক করতে হলে ছোট নাম যথা—‘ভুয়াসরণি’ রাখুন। রাম নাম সকলেই তো আঙড়াবে। একটা বৈদান্তিক নাম ভুয়া সরণি। বেদান্ত বলছেন জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা। মিথ্য বা মায়া অর্থাৎ কিনা ভুয়া। তাই এ হেন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে ভুয়া সরণি নাম খাপ খাবে ভাল। বিশেষ ছাড়লেই নাম বিশেষ হয়ে উঠবে—যার পরিণতি নির্বিশেষে।

আবার এই সভার পক্ষ থেকে ও আমার নিজের পক্ষ থেকে স্বামীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়েই শুভ ধন্য বলে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি।

শুভারম্ভ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নববর্ষের আরম্ভে সিদ্ধিদাতা গণেশের 'পূজা' হয়ে থাকে। যারা সারস্বতকর্মে রত তাঁরাও বৈশাখের প্রথম দিনটিতে গণনাথের আরাধনা করেন।

নববৎসরের আরম্ভে সাহিত্য পত্রিকার পরিচালক-বৃন্দও একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। তাঁদের বাসনা থাকে বৈশাখ মাসের মত অস্ত্রাশ্র মাসের সংখ্যাগুলিও শুভ এবং সুষ্ঠুভাবে যেন প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে যখন থেকে সাহিত্য পত্রিকার সূচনা হয়েছে তখন থেকেই নববৎসরে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বের প্রকাশকগণ সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর চরণে শরণ নিয়ে সাহিত্য পত্রিকার কাজ আরম্ভ করতেন। আমাদের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রায় সবক্ষেত্রে কবিগণও গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। এই প্রবন্ধে সেই পুরণো বাংলা সাহিত্যের যুগ থেকে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখকদের সাহিত্যকীর্তির মুখবন্ধের নমুনা এখানে কিছু তুলে দেওয়া হল।

ভবানীনাথ, "লক্ষণদিগ-বিজয়" গ্রন্থে সরস্বতীর সঙ্গে গণেশকে প্রণাম করেছেন.....'গণেশ দেবতা বন্দ আর সরস্বতী।'

কৃত্তিবাস লেখেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।'

তাই 'কৃত্তিবাস রচেন গীত সরস্বতী-বরে।'

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার বলেছেন—

'লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাঁহার দুই নারী।'

বিজয়গুপ্তও 'পদ্মাপুরাণে' এই দুই দেবীর উদ্দেশে লেখেন,—

'লক্ষী সরস্বতী বন্দম দেবী দুইজন'

-গু মহাশয়ের গ্রন্থে শুধু সরস্বতীর বন্দনা আছে, যথা,—

'সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।'

জ রঘুনাথ 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী'তে দু'জনকে পদ্মা-

নে বসিয়েছেন—

'পদ্মাসনে বন্দি সেই লক্ষ্মী সরস্বতী।'

রতিদেবের 'মৃগলুন্ধ' বন্দমা—

'প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর চরণ।'

ভবানীপ্রসাদ 'দুর্গামঙ্গলে' গাইলেন—

'প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী।'

ক্ষেমানন্দ 'মনসা মঙ্গল' গ্রন্থে প্রার্থনা করলেন—

'সাবধান হও বন্দে দেবী সরস্বতী।'

রামেশ্বর চক্রবর্তীও 'শিবায়ন'এ দেবীর প্রতি ভক্তি দেখিয়েছেন—

'দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয়।'

অন্তুতাচার্য্য রামায়ণে বলেছেন—

'সরস্বতী মা-এ বন্দো জগতোমানী।'

জগৎরাম 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে দেবীকে বিষ্ণুশক্তিরূপিনী ভেবে বলেন—

'বিষ্ণুর বনিতা বাণী বন্দিয়া চরণে।'

ভবানীশঙ্কর 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' গ্রন্থে লিখলেন—

'প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী-চরণে।'

বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' রচয়িতা। তিনি গ্রন্থ রচনা করার পূর্বেই বললেন—

'লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী

তাঁহার চরণ ধরি

বন্দিলাম দেব ত্রিলোচন।'

চৈতন্যভাগবতকারের 'জিহ্বায় ফুরায় তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।'

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের প্রার্থনা এইরকম—

'সরস্বতী বন্দোমুণ্ডে

কেলি কর মোর ভুণ্ডে

কহ গৌরহরি গুণ কথা।'

জঃশী শ্যামদাস 'গোবিন্দ মঙ্গল'-এ গাইলেন—

সরস্বতী বন্দো মাগো

মধুর পঞ্চম রাগে

বিষ্ণুর বল্লভা বীণাপাণি।'

তুর্লভ মল্লিক গাইলেন,—'সরস্বতী দেবী বন্দো জাহা হইতে তার'—পদে গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সুর করেন।

সুকুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র কথায়—

'নয় মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে', বলতে ছাড়েন নি।

১) মধুসূদন নাপিতও 'ভারতীপদারবিন্দে' করিয়া, ভক্তি' নৈষধ চরিত রচনা করেন।

শ্রীশিশুরাম দাস 'প্রভাস খণ্ড'তে সরস্বতী বন্দনায় বুললেন, "নমস্তে সারদা বাণী, বেদমাতা বিষ্ণুরাণী, শুভদা সুখদা সত্যবতী।.....

শিশুরে পবিত্র কর, ভবদুঃখ পরিহর, তব পদে এই নিবেদন।"

প্রাচীন কবিগণ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে একটা করে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ 'সরস্বতী-স্তব' আমাদের জ্ঞাত দান করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা—

রমাই পণ্ডিত 'ধর্মপূজা-বিধান', মানিক গাঙ্গুলী 'ধর্ম মঙ্গল', বংশীদাস—'পদ্মাপুরাণ, মুকুন্দরাম—'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ঘনরাম—'ধর্মমঙ্গল', ভারতচন্দ্র—'অন্নদামঙ্গল', প্রেমানন্দ দাস—'মনসার ভাসান'।

কালীসাহক রামপ্রসাদ সেন 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে গাইলেন—

যত্নে পুটাজলি অতি বন্দেমাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজ্ঞাসনী।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজা পাল মাতা নিজ আজ্ঞা
কণ্ঠে বলি কহ স্তববিদ্য।
ব্যাস বাল্মীকাদি-চর মহাকবি মহাশয়
তব রূপালেশে প্রজ্ঞাবান।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা অর হর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইলা সীমা ॥

এর শতবর্ষ পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য'তে লিখলেন—বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি

আমি, ডাকি আবার তোমায়, স্তেতভূজ
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে স্বরতর শরে গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধু সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা,
তেমতি দাসেরে আনি দয়া কর, সতি।

গাইব মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, ঘাসে দেহ পদছায়া।

তারপর এলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরস্কার'এ বললেন—

কবি তবে ছই কর জুড়ি বৃক
বাণীবন্দনা করে নত মুখে—
'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরসবাসিনী,
শুভবসনা শুভহাসিনী
বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী কমলকুঞ্জাসনী,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিহ্নদিন উদাসীন আনমনা।

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

কিরণেন্দু বাগচী

দড়াম্, দড়াম্, দড়াম্।

রিভলবারের তিন-তিনটি গুলিই শিরদাঁড়াটা ভেদ করে বুকে গিয়ে ঢুকেছে।

অব্যর্থ, অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ।

মুখ খুঁড়ে পড়ল শ্রীরামপুর-জমিদার বংশের ফুটফুটে ছেলে নরেন-গোসাঁই, প্রেসিডেন্সী জেলের গোরাডিগ্রীর কাছে, তাঁত কামানের সামনে, রাস্তার ওপর ছিটকে।

পালিয়ে যাবে কোথায় তুমি বেইমান? একটা গুলিও হাতে রাখিনি। সব কটাই তোমার কাজে লাগিয়েছি; পাছে তুমি বেঁচে যাও, ভরসা পাইনি।

আত্মহত্যা! নাঃ, সে আমি করব না। হাসি মুখে ফাঁসীর দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেব। সকলে দেখবে কানাই মৃত্যু ভয় করে না! কানাই মৃত্যুঞ্জয়!

অনেকগুলো নিরীহ লোককে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ,

অরবিন্দ ঘোষের নামটাও গুপ্ত সমিতিতে জড়িয়ে দিয়েছিল। তুমি বেঁচে থাকলে আরও কত লোকের সর্বনাশ করতে কে জানে! রাজসংক্ষী হয়েছিলে তুমি তাই না? কিসের লোভে তুমি এত সব পাপ কাজ করছিলে? দৃঢ় মনোবল যার নেই সে করবে দেশের কাজ! ছি ছি ছি, বিপ্লবের কাল সাপ, বাঙালী নামের কলঙ্ক তুমি! — এইবার ঠিক হয়েছে কেমন না? সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সত্যোনের হাত থেকে রেহাই পেলেও আমার কাছে তোমার রক্ষে নেই। সত্যোনকেও দোষ দিই না। সে বেচারী কি করবে! তার রিভলবারে যে, মাত্র একটাই গুলি ছিল। রিভলবারটা ছুড়ে ছিল ঠিকই, তোমাকে লক্ষ্য করে। বুকে না লেগে উরুতে কেন লাগল? তাতো বুঝতে পারছি না। সেই স্ত্রীযোগে তুমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে হাসপাতালের বাইরে। সমন যে তোমার শিয়রেই দাড়িয়ে ছিল! যাবে কোথায় তুমি পালিয়ে?

...দেখি? দেখি? না না না আর নড়ছে না। সব স্থির হয়ে গেছে। বেইমানের তাজা খুনে অনেকখানি জায়গা ভেসে গেছে।

কই 'মিষ্টার ক্যাবেজ'—বাঁধাকপি জেলার! উন্নত রিভলবার হাতে কানাইকে ছুটে আসতে দেখে কোথায় শটকান দিলে তুমি? বপুখানাতো তোমার কম নয়! তাই বুঝি এখানকার বাসিন্দেরা 'বাঁধাকপি' জেলার নাম দিয়েছে তোমার? কোথায় গেল তোমার চিফ হেড-ওয়ার্ডার। সেও ভয় পেয়ে পালিয়েছে? তোমার সঙ্গেকার সেপাই সান্ত্রিরাই বা গেল কোথায়? এই বুঝি তোমাদের কারা রক্ষার নমুনা? একটা রিভলবার দেখেই ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পালালো রথী মহারথীর দল! আমাদের নরেনের পেছনে ধাওয়া করতে দেখে, সামনে থেকে চোঁচা দৌড় দিলে সকলে!

ঐ, ঐ যে! দেখ! দেখ! বড় জমাদার সাহেব জালার মত ভুঁড়িটা নিয়ে ড্রেনের ভেতর পড়ে কৌকান্দে। ওকে ধরে তোল!

আমার রিভলবারে আর একটাও গুলি নেই! বিশ্বাস

হচ্ছে না বুঝি? এই দেখ হাত থেকে ফেলে দেছি ওটাকে!

আমাকে তোমরা ধরবে না! ধরবে এস! শীগগীর এস! আমি খুন করেছি! নরেনকে আমি খুন করেছি আমি খুনী? আমি খুনী!

সে কি উল্লাস কানাইয়ের।

“The murder of Narendranath Goswami which was committed by persons actually in custody in one of His Majesty's prisons is unique in the history of Bengal”—Bengal Administration Report 1908-9

দিনটা ছিল ৩১শে আগষ্ট ১৯০৮ সাল। নরেনের রাশিচক্রে বড় অন্তত দিন।

সকাল প্রায় আটটা তখন, নরেন বিদায় হোল।

বিপ্লবী নরেন নামের কলঙ্ক ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার করে দিয়ে ফাঁসীর রজ্জু থেকে বাঁচাল কানাইলাল, মাতৃ মস্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদলকে নিজে যুগকাঠে গলা বাড়িয়ে দিয়ে।

আরতো সেই কবে ত্রীকৃষ্ণ বাঁচিয়ে ছিলেন রাখাল ছেলেদের, কালিয়নাগকে বধ করে।

যে কানাই সে-ইতো কৃষ্ণ!

একনিষ্ঠ, মহাযোগী বাঙলার ধরে ধরে তুমি নারায়ণের আসনে বসে আছ। তোমাকে জানাই অবনত মস্তকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অত্ন দিকে চোখ মেলে দেখি—যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলকে ধন্য করেছিলেন অদ্বৈত মহাপ্রভু, মহাপ্রভু জগৎবন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, নলিনী বাগচী আরও কত কে! সেই কুলকে অচিরে অতল গর্ভে তলিয়ে দিতে নরেন তুমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করলে না? এমনই কুলাঙ্গার তুমি?

জানি তোমারই আত্মীয়তা বন্ধে আবদ্ধ ছিল কাল।

পাহাড় *। তার অপকর্মের বিশেষ একটা কারণ ছিল সত্য। কিন্তু কোন্ মোহের বশবর্তী হয়ে এমন একটা জঘন্য পাপে ডুব দিলে তুমি? নিয়তি তো তোমার ইচ্ছাকে সফল হতে দিল না।

এ সমাজের কেউ কি আজ পর্যন্ত সে পাপের খেসারত দিয়ে উঠতে পেরেছে? কেউ কি দিতে পারবে তোমার ঐ স্থগিত অপকর্মের মূল্য ফেরৎ?

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে স্রুজিত চন্দনচিঁতাপালঙ্ক অগুরু চন্দন চটিত। তদুপরি বিল্বপত্র আর পুষ্পস্তবকে সজ্জিত বাসর শয্যা।

কত যেন শান্তিতে, কত আনন্দে ফুলশয্যায় ঘুমচ্ছে কানাইলাল।

দিব্যকান্তি, সৌম্য মূর্তি, অর্ধনিম্নীলিত চক্ষু দুটি, মুখে মৃদু হাসি, বদ্ধ ঠোঁট দুটিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-প্রতিহিংসার ক্রুদ্ধতা, আজানুলম্বিত হস্তদুটি মুষ্টি বদ্ধ।

মহাযোগীর রুদ্ধ কেশদাম ইতস্ততঃ বিচ্যুত। পরিধানে পট্টবস্ত্র। রজ্জুটানে কিক্ষিত অবনমিত স্কন্ধ দুটির পাশ দিয়ে প্রশস্ত বুকের কোলে হাওয়ায় হিল্লোলিত কুক্ষিত

* কালাপাহাড়ের নাম ছিল কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে রাজু নামে পরিচিত। নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র। জগদানন্দ রায়ের বংশজন্ম (জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুণ্ডর-কুন্তিবাস)। এর পদবী ছিল ভাড়াড়ী। কালাচাঁদ রায়ের দেশ ছিল রাজশাহীর অন্তর্গত মান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে। প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশবাহুরাজ ব্রাহ্মণ কুলে কালাচাঁদের জন্ম। কালাচাঁদের পিতা গোড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চপদে চাকরী করতেন। এর উপাধি ছিল ভূঁইয়া। রাজুর অল্প বয়সেই তার পিতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। পিতৃহীন কালাচাঁদকে, মাতামহ অসহায় অবস্থায় ফেলে না রেখে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে যান। সেইখানেই সে মাতুলালয়ের প্রভাবেই মানুষ হতে থাকে। এই পরিবার ভগবৎ চিন্তায় বিভোর ছিল। এখানে সর্বদা হরিনাম স্তননত সে। মাতুলুল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বিশ্বাসী। এই প্রভাব গিয়ে পড়ে কালাচাঁদের ওপর। কাজেকাজেই কালাচাঁদ অল্পবয়স থেকেই দৈত্য এবং প্রবই হরিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মনের এ ভাব ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হতে লাগল সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায়। অনেক চেষ্টা করে দেখল। মনের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিরে পেল না। এই ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মায়। শেষে তার অন্তরে এক পৈশাচিক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, সে ক্রিপ্ত হয়ে হিন্দু দেব দেবীর মন্দির ধ্বংস করতে বেরিয়ে পড়ে এবং ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত মাতঙ্গের স্থায় দেশ দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে থাকে। (তারিখ-ই-খাজেহান, তারিখ-ই-শেরসাহী পায়সী ইতিহাস অবলম্বনে দুর্গাচরণ সান্যাল কর্তৃক লিখিত)।

রেশমের উত্তরীয়খানি। গলদেশে পুষ্পমালা। কপোল এবং ললাটে মায়েরা নতুন করে এঁকে দিয়েছে থাকে থাকে চন্দন বিন্দু। ভ্রুগুলের মধ্যদেশে সিন্দুর তিলক। সে যেন এক অভিনব বরবেশ।

তখনও অজস্র গীতা, ফুল-চন্দন, ধূপ-গুগুলের বর্ষণ চলেছে সেই ফুলশয্যায়, মর দেহের পথ-পরিক্রমায় যেমন চলেছিল গীতা আর পুষ্পবর্ষণ। এখন যেন আরও বেশী। মুহূর্তের জন্মও নিবৃত্তি নাই।

প্রত্যুষ থেকে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হতে চলল, এখনও জনসমুদ্র কানাইলালের চতুর্দিক বেঁটন ক'রে আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজ নরনারীও অশ্রুসিক্ত নয়নে। কার ক্ষমতা এই প্রচণ্ড তরঙ্গের গতি বোধ করে। মুহূর্তে সমুদ্র গর্জনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে বিবর্ণ মুখ ধরিজী যেন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। রবিরশ্মির নৃহপরশনে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সর্বাঙ্গ এক জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

চিতানল ধীরে ধীরে বীরের অঙ্গস্পর্শ করে নবানুরাগে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

মিনিটে মিনিটে কলসী কলসী ঘূত, মণে মণে চন্দন-কাঠ, সেরে সেরে স্রুগন্ধির গুড়া যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হতে লাগল। এর আর শেষ নেই। কে আনছে, কোথা থেকে আসছে কে জানে।

পরম বিশ্বাস্যে চেয়ে আছে শ্মশান বন্ধুরা। এমন তো কখনই দেখা যায় না।

অশ্রুজলে মহাশ্মশান প্লাবিত।

গগনচুম্বী হোমানল বীর শহীদের জীবনালেখ্য এই তাবেই লিখে দিল আকাশের গায়ে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

বন্দেমাতরমের কী স্রমধূর মহিমা! একুশ বছর বয়সের ভরুণ যে কী ঘটাতে পারে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশিংহ লালবাজারের গিরিকন্দরে বসে ছুরু ছুরু বক্ষে সচকিত নয়নে তা উপলব্ধি করেছিল।

রক্তাশ্রয় পরিধান ক'রে সূর্য তখন পশ্চিম গগনের

শেষ প্রান্তে পৌঁছে কানাইলালের অপেক্ষায়। রথতুরঙ্গের বন্না কিঞ্চিৎ প্রশমিত। রথের কিছুটা অংশ যেন ভাগীরথী কূলে শ্মশান বক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে, মহাযোগীর অভিসারে। কানাইলালকে এরা অব্যাহতি দিলে তাকে সঙ্গে নিয়ে দিনমনি যাবেন অন্তাচলে।

তখনও সেই একই অবস্থা। চিতানলে সেই ঘৃতাঙ্কতি। সেই চন্দন বৃষ্টি; এর যে শেষ নেই। কানাইলালের শোকে একী উন্মাদনা? এরা যে কেউই মায়ের ছুলালকে ছেড়ে দিতে চায় না!

এই ভাবে অগ্রসর হতে থাকলে, সন্ধ্যা কোথায় গড়িয়ে যাবে! চিতা নেবা যে অসম্ভব। শবাহুগমন-কারী প্রথম সারির সকলেই এখন পরিশ্রান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। সে-ই ভোরে বেরিয়েছে।

কানাইলালের নখর দেহতো কখন পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেছে। তবে আর কেন?

মতিলাল রায় সঙ্গল নেত্রে এক কলসী গঙ্গাজল এনে চিতা কুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। কানাইলালের অগ্রজ ডাক্তার আশুতোষ দত্তও এক কলসী দিলেন। সূর্য হয়ে গেল বহু কলসীর আনাগোনা।

সামান্য কয়েক মিনিটে চিতাটি নির্বাপিত হল।

যেই এক মুষ্টি চিতাভস্ম গঙ্গা জলে নিক্ষিপ্ত হ'ল স্বর্গ গেলেন অন্তাচলে।

এইবার অস্থি আর ভস্ম সংগ্রহে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

মতিলাল, একটি রৌপ্যাধারে সামান্য অস্থি এবং ভস্ম সংগ্রহ করলেন বহু চেষ্টায়। অস্থির সবই তো নিঃশেষ। অগনিত জনতা স্ত্রী পুরুষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কেউ সোনার কোটায়, কেউ রূপার, কেউবা আবার হস্তিরদাঁড়ি-নির্মিত কোটায়, কেউ অন্য কিছুতে, আবার মা বোনেদের কেউবা আঁচলে ভস্ম সংগ্রহ করে কানাইলালের চিত্তা বৃকে নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ী ফিরে চললেন।

আশুতোষের দল চন্দননগরের বাড়ীতে ফিরে কানাইয়ের বিধবা জননীকে প্রণাম জানালেন।

পুত্রশোকাতুরা মুহমানা বীরপ্রসবিনী মাতা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—“ইয়া গো বাবারা, কানাইয়ের কী কলকাতার চাকরীর ছুটি হয়ে গেল? এখন বুঝি সাগরপারে পাকা চাকরী নিয়ে গেল?

আর ফিরবে না বুঝি? ও যে কোন দিন মিথ্যে কথা বলে না! তা হ'লে সত্যি খোকা চাকরী করছিল? হ'্যারে, আমাকে যে তাই বলে গিয়েছিল!”

মায়ের এই প্রশ্নে কেউ আর স্থির থাকতে পারে না। সকলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর, মঙ্গলবার (২৫শে কার্তিক ১৩১৫) আজই ব্রাহ্মধূর্তে কানাইলাল দত্ত হাসতে হাসতে আলিপুর, প্রেসিডেন্সী জেলের ফাঁসী কাঠে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে অমর্যাবতীতে মহাপ্রস্থান করেছে।

মদগর্বে গবিত কানাই ধাপে ধাপে পা ফেলে, ফাঁসীর মঞ্চ উঠেই, জেল জীবনে ঘনিষ্ঠ সেই আইরিস ওয়ার্ডারকে কাছে ডেকে, তার দিকে মাথাটা ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বল্লে—“কাল রাত্রিতে তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয় তখন আমি কত খুসী ছিলাম বলতো? এমন শুভ মুহূর্তের আমার যেন অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিল না; তাইতো তোমার সঙ্গে এত হাসি তামাশা করছিলাম! তুমি বরং আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে, বলেছিলে—‘মরার ভয়ে তোমার ঠোট দুটো কালো হয়ে যাবে।’ কিন্তু তা হ'ল কি মিষ্টার ফুকারিয়া? আমি সে ধাতুতেই গড়া নই! বিশ্বাস না হয় আমার মুখের চাকাটা উঠিয়ে দেখ না ছাই কেমন তুমি আমাকে দেখছো? হ'্যা, হ'্যা, আর একটা কথা—কাল রাত্রিতে তোফা ঘুম দিয়েছি। এসেছিলে কিনা জানিনা! এসে থাকলে নিশ্চয় দেখেছো, সকালে ডেকে, ওরা আমার ঘুম ভাঙাতেই পারে না। কী হাসির কথা বলতো?”

মঞ্চ উঠে কানাইয়ের কী কোতুহল। ফাঁসীর কায়দা-কাহুনগুলো সবই এক সঙ্গে জেনে নিতে চায়।

‘দড়িটা নিজের হাতেই গলার মধ্যে গলিয়ে নিয়েছে—
—“না, না, না। সে কী হয়। তুমি কেন কষ্ট করবে জল্লাহাদ। ফাঁসীর দড়িটা আমার হাতেই দাও না! আমি পরে নিচ্ছি গলায়। সে রকম নরম হয়নি তো। দড়িটা বড্ড শক্ত। ছি ছি সরকারের বুঝি সামান্য পয়সাটাও ছিল না? বি, সাবান, কলা, চিনি কিছুই কি তোমাকে দেয়নি জল্লাহাদ দড়িটা নরম করতে?

(ক্রমশঃ)

রাজকন্যা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বাবা বরাবর থাকতেন বিদেশে। ন'মাস ছ'মাসে কয়েকদিনের জঙ্গে বাড়ি আসতেন। তাই আমার কণালে স্বাধীনতা জুটত, অটেল স্বাধীনতা। আর এইসব স্বাধীনতা ছেলেদের হুঁদে-খচ্চর হাড়ে-হারামজাদা করতে ওস্তাদ। তার ফলে আমাকে নিয়ে বাড়িতে সমস্যা হল। আর ছ'বছর বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা। দাছু বাবাকে লিখেছিলেন, 'রবিয়ুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যই ফেল করিবেক। অতএব উহাকে সামাদ-বাবাজীবনের কাছে রাখিলে ভাল হয়।' পুনশ্চ: 'তুমি যা ভাল বুঝিবা, করিবা।'

বাবা সেটাই ভাল বুঝলেন এবং করলেন। পিসে-মশাই সামাদ সেই মহকুমামহরের নামকরা মোক্তার। সেখানে নিয়ে গেলেন। ভর্তি করে দিলেন নবাববাহাদুর ইন্সটিটিউশনে। ভাগীরথী নদীর ধারে বিশাল স্কুল। চারপাশে ভাঙাচোরা দালানবাড়ি অর্থাৎ ধ্বংসস্তুপ। জঙ্গল। এই শহরে একসময় দেশের রাজধানী ছিল।

সামাদ সাহেবের ছেলে ফজলু আমার ক্লাসেই পড়ে। বয়সে কিছু বড়। বেঁটে গোলগাল গড়ন। গোঁফ রাখতে শিখেছিল। তারি সুন্দর সেই গোঁফ। ফজলু বলেছিল—আতানবাবের মতো গোঁফ রেখেছি। তাঁকে তুমি দেখনি। দারুন লোক। নিয়ে যাব একদিন। কী কালোয়াতী গায়ে মাইরি।

ইতিহাসের রাজ্যে ঢুকে পড়েছিলুম বলা যায়। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। তারপর মস্তো দেউড়ি। নহবতখানা নাম। দেউড়িতে একজন রোগা টিঙটিঙে সেপাই সঙ্গীন হাতে পাহারা দিত। পরে জেনেছিলুম, সঙ্গীনের বন্দুকটা গাদা। আঠারো শো যেসটি সালের তৈরি। ফজলুই বলেছিল। নবাববাড়ির সব বন্দুকই নাকি গাদা এবং ওইসময়কার তৈরি। আর হাতিগুলো? ফজলুর মতে, বন্দুকেরই সমবয়সী। ওই বুড়ো হাতিটা চেপেই নবাব সিরাজদৌলা পুণিয়ায় শওকতজঙ্গকে শাবাড় করতে গিয়েছিলেন। চোখে পিচুটিপড়া লেজে যা অনবরত কাননাড়া হাতিটা দেখে আমার মন কেমন করত।

আর এইসব হাতিই তো আমাদের গাঁয়ের পাশে পাকা সড়কে ঘটা বাজিয়ে ফেঁত। আমরা পিছনপিছন চলে যেতুম কতদূর। সবাই চৈঁচাত—নবাববাহাদুরের হাতি! হাতি তোর গোদা পোদা পা, হাতি নেদে দিয়ে যা! হাতির নাদির দিকে অঁবাক হয়ে তাকাতুম। গাঁয়ের কোন কোন বাড়ি তা কুড়িয়ে নিয়ে ওয়ুধ করত।

আমি যে ইতিহাসে ঢুকেছি, ক্রমশ টের পাচ্ছিলুম। গা শিউরে উঠছিল যখন-তখন। ক্লাসে নবাববাড়ির ছেলেমেয়েরাও পড়ত। তারা আলাদা বসত। মেয়ের সংখ্যা অবশ্য খুব কম—মাত্র জনাচার। একসময় নবাবনন্দিনীদের কেউ দেখতেই পেতনা। অবশেষে প্রগতিশীল সেজনবাব পর্দাতেঙে নিজের মেয়েকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন স্কুলে। তারপর অনেকটা কড়াকড়ি শুঁচেছিল।

ই করে ওদের দেখতুম। সবাই তেমন ছুধে ধোওয়া টুকটুকে নয় ওরা—তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু সত্যা ছুধেধোওয়া রঙ, কিছু চাপাধরণের ফর্সা, কিছু আমাদের মতোই ময়লা। মেয়েরা সালোয়ার কামিজ উড়নিপরা, ছেলেরা আমাদের মতোই প্যান্টশার্ট। শুধু একটি মেয়ের পরণে সাড়ি ছিল। তার চেহারে অসাধারণ সুন্দর।

ওরা আমাদের সঙ্গে বিশেষ মিশতনা। আলাদা আসত-যেত। টিফিনে ওদের জঙ্গে একটা কমনরুম গোছের ঘর ছিল। সেখানে গিয়ে ঢুকত। শুধু ফজলুর সঙ্গেই ওদের কিছু মাখামাখি ছিল, কিছুটা। এর একটা বড় কারণ, ফজলু ওদের মতো অবিকল খোট্টাই বুলি অর্থাৎ স্থানীয় উর্জুতে কথা বলতে পারত। ভাষা ব্যাপারটাও মানুষে মানুষে আড়াল এনে দেয়।

ফজলুর খুড়তুতো দাদা। ইসলাম মতিমহলের কেয়ারটেকার। সেই স্বত্রেই ফজলু নবাবপরিবারগুলোর সঙ্গে হয়তো ভাব জমাতে পেরেছিল। ক্রমশ ওর কাছেই অনেক তথ্য অবগত হয়েছিলুম। নবাবরা এখন মোটামুট তিন শ্রেণীর। একনম্বর নবাবরাই এখন এষ্টেটের মালিক অর্থাৎ খাঁটি জিনিস। তাঁরা

থাকেন মতিমহলে। বিরাট দেউড়িতে গাদাবন্ধুকের সঙ্গে ছুরি আঁটা সঙ্গী হাতে তাঁদেরই ইজ্ঞতরঙ্গাকারী সেপাই থাকে। একটা দড়ি আছে তার হাতের কাছে—যার সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টাটা অন্তরমহলে রয়েছে। কেউ দেখা করতে গেলে সে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজায়। তখন নফর বা বাঁদী এসে খবর পুছ করে। দেউড়ির পাশে একটা বৈঠকখানা আছে। তার দেয়ালে আয়না এবং রঙীন কাচের নক্সা। বাঘভাল্লুকহরিণের মাথা আছে। সে ঘরে বসতে বলা হয়। তবে গদীনসীন নবাব যারতার সঙ্গে দেখা করেন না। তাছাড়া উনি বা পরিবারের অনেকেই বেশিসময় কলকাতায় থাকেন।

দুশ্বর নবাবরা থাকেন মতিমহলের পাশে ছোটছোট বাড়িতে। তাঁরা অনেকেই সরকারী চাকুরে—বাইরে থাকেন। বৃত্তি পান বছরে পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকা। তিনশ্বর নবাবদের ডেরা বিশাল পাঁচিলেঘেরা কেল্লাবাড়ির মধ্যে। পাঁচিল অনেক জায়গায় ভাঙা। কয়েকটা ফটক আছে—তাও ভাঙা। ফটকের ধারে প্রাইভেট রোড। তাও অরাজীর্ণ। দুপাশে আগাছার ঝাড়। ভেতরে চোখ পড়লে অবাক লাগে। বিস্তৃত ধ্বংসবশেষের মধ্যে কিছুকিছু ফাটলধরা ঘর, পাটকাটির বেড়া, আগাছা, দড়িতে সাড়ি অথবা সালায়র কামিজ ঝুলছে বোদে। দেখলেই বোঝা যায়, ওঁদের মতো গরীব মানুষ পাড়ারোয়ে কেউ নেই।

আমার সঙ্গে যারা পড়ত, তাদের মধ্যে একশ্বর পরিবারের কেউ ছিল না। সবাই দুই ও তিনশ্বরী জিনিস। এই শোনার পর আমার আড়ষ্টতা কিছুটা কেটে গেল। এক দুপুরে টিফিনের সময় লুকিয়ে সিগ্রেট খেতে গেছি পিছনের জঙ্গলে। সেখানে একটা পাঁচিল আর ছাদের খানিকটা টিকে ছিল। বেশ চমৎকার জায়গা। বনকরবী ফুলের ঝোপঝাড় আছে। হলুদ ফুলে গাছগুলো ঝলমল করছে। নিচেই খাড়া নেমে গেছে নদীর পাড়। ইটের চাঁড় জলঅন্ধি ঝোপঝাড় নিয়ে গুয়ে আছে। জলটা কী স্বচ্ছ! সিগ্রেট খাওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড কড়াকড়ি ছিল স্কুলে। সবে সিগ্রেট

(পাসিংশো নাম—টুপিপরা বুড়ো সায়েবের মুখ আঁকা প্যাকেট, গাঢ় বেগুনি রঙ) ধরিয়েছি, কে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল—বোল্ দেগা। বলে দেব... বলে দেব।

চমকে উঠে দেখি করবীফুলের পিছনে একটা উঁচু লতাঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে সাড়িপরা সেই নবাবনন্দিনী সহপাঠিনী। আমি তো জেনে গেছি, এরা দু-তিন-নয়রী জিনিস, অতটা ভয় আর নেই। গভীর হয়ে বললুম—বলে দেবে তো কী হয়েছে। ক্লাস টেনের ছেলেরা সিগ্রেট খায় সবাই জানে। যাও বল গে।

ঝোপ ঠেলে চলে এল মেয়েটি। মুখে তখন আর হাসিটা নেই। এসেই ডাঁট দেখিয়ে বলল—এই বে-অকুফ! আমাকে তুমি শেলাম করলে না যে?

ওর মুখে পরিষ্কার ও শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা শুনে তখন অবাক হবার মতো অবস্থা ছিল না। নেহাত অঙ্গগায়ের ছেলে। নতুন-নতুন গন্ধ ঘোচে নি। ওর আঁট ভঙ্গী দেখে তখন ঘাবড়ে গেছি এবং মনে পড়ে গেছে, ফজল বলেছিল—নবাবফ্যামিলির কারো সঙ্গে দেখা হলেই সেলাম করার নিয়ম আছে। নবাবসাহেব বা হুজুর বেগমসাহেবাও বলতে হয়। অবশি স্কুলের মধ্যে আলাদা ব্যাপার। আরে ভাই! ওরা বরাবর এসব আদবকায়দা পেয়ে এসেছে বংশপরম্পরা। এখন গরীব হয়েছে বলেই তো দাবি ছাড়তে পারে না। ওরা যেমন দাবি করে, আর কেউ না মানুক, আমি ভাই মানি। মানব না কেন? একদিন ওনারাই তো বাংলা বিহার উড়িয়ার কিং ছিল।

আমি ঘাবড়ানো অবস্থায় ফজলুর শিক্ষামতো মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে ডানহাত কপালের কাছে তুলে বলে ফেললুম—সেলাম।

নবাবনন্দিনী কৌস করে উঠল—সেলাম! সেলাম কী? ভারি বেআদব ছেলে তো!

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—সেলাম হুজুরাইন বেগমসাহেবা!

আর ভুগুনি সে হাততালি দিয়ে উঠল। মনে হল, কালান্তক খঞ্জরধারী হাবসী খোজাকে ডাকছে—গদীন

নেবার হুকুম দিবে। কিন্তু আড়চোখে দেখি, সে হাসছে।
মুখে হুঁমু মি ফুটে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কেটে গেল। তারপর সে
মিঠেগলায় প্রশ্ন করল—এই, তোমার নাম কী?

—রবি।

—তুমি হিন্দু?

—না। মুসলমান।

—তবে রবি কেন?

—রবিয়ুল ইসলাম।

—তোমরা তো সেখ?

মুখতুলে বললুম—না। আমরা সৈয়দ।

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল নবাবনন্দিনী।

—যাঃ। ভাগ্, ভাগ্! সৈয়দ এসেছে! বাংলাদেশে
সৈয়দ আছে নাকি—তাও কেল্লাবাড়ির বাইরে? সৈয়দ
আমরা। দেখ না সৈয়দদের চামড়া কেমন হয়। দেখে
নাও না। দেখছ?

আমার নাকের ডগায় ওর জুথের মতো সাদা হাত
—একটু শীর্ণ এবং নীল শিরা আছে, তিনটে লাল
কাচের চুড়ি আছে। আরও ঘাবড়ে গেলুম। বললুম—
আমরা পারস্ত থেকে এসেছিলাম, দাছ বলেন। আমাদের
ফার্সিতে লেখা রোজনামা আছে।

—ভাগ্, ভাগ্! হাবসীর মতো খ্যাবড়া নাক,
কৃতকৃতে চোখ, মাটির মতন চামড়া! বলে সৈয়দ!
তোমরা স্ত্রী তো?

—হঁ।

আমরা শিয়া। শিয়ারা খাঁটি সৈয়দ। তা
জানো?

তর্কের সাহস হচ্ছিল না। ওদেরই তো স্কুল।
কিন্তু এবার ব্যাপারটা খুব অপমানজনক মনে হল।
উঠে দাঁড়ালুম। আর তফুনি কোথেকে ফজলু এসে
পড়ল ত্রাণকর্তার মতো। এসেই বলল—কী রে বিবু
বেগম! ওজলে ওর সঙ্গে কী করছিস?

নবাবনন্দিনী চটেওঠা গলায় বলল—তোর কণ্ঠা-
বাবার পিণ্ডি চটকাচ্ছি। এই ছেলেটা কে রে? বলে
আমি সৈয়দ।

ফজলু বলল—মরেছে! ও তো আমার মামাতো ভাই
রবি।

—তোর মামাতো ভাই! তোর পদবী যদি বিশ্বাস
হয়, তো ও সৈয়দ হয় কী করে?

ফজলু ধমক দিয়ে বলল—বিবু, জাতটাত ছেড়ে
অন্য কথা শোন্! আতানবান ফিরেছে জানিস?

বিবু ঘাড় নেড়ে বলল—ও গাঁজাখোরের খবর
রাখিনে। নিম্মিকো পুছ করিস!

এরপর ফজলুর সঙ্গে ওর খোড়াই উঠতে কথা শুরু
হল। আমি একটুও বুঝিলাম না। কিন্তু ফজলুর
সাহসে সিগ্রেট ধরাতে দেরিও করলুম না। তারপর
টিফিনের পিরিয়ড শেষ হল। ঘন্টা শুনেই বিবু এক
দৌড়ে চলে গেল।

ফজলু আমার কাঁধে হাত রেখে যেতে যেতে বলল
—বিবুটা কেল্লাবাড়ির একখানা জিনিস রে! পাগলী,
পাগলী! ওর বয়স কত বল তো? পারবিনা। আমার
চেয়েও তিনবছরের বড়। ওর একটা হিস্টি আছে।
পরে শুনিস। ..

*

ফজলুর কাছে সেই হিস্টিটা আর শোনা হয়নি।
কেন হয়নি, আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে,
আবেগময়, সেই কৈশোরে বিবু আমার কল্লনায়
দায়িকা হয়ে থেকেছে—সবসময় তার কথা ভেবেছি।
কত বিচিত্র সেসব কল্লন! কিন্তু তার মুখোমুখি
হলেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছি। ওর খিলখিল
হাসি আর 'নকল সৈয়দ' বলে তামাসা বরং আমাকে
রাগিয়েই দিয়েছে অথচ ও যখন সামনে নেই, তখন ও
আমার কাছে স্বপ্নের রাজকণ্ঠা।

পুরো একটা বছর ওই স্কুলে কাটিয়েছিলাম। তখন
ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার কলেজে
গিয়ে ভর্তি হলাম। বিবু'ন সঙ্গে সেই ছাড়াছাড়ি।

কিন্তু আমার আড়ষ্টতাই তার সঙ্গে ফজলুর মতো
আমাকে মিশতে দেয় নি বিবুও অবশ্য মেশার চেষ্টা
করেনি। আমার মধ্যে ওকে আকর্ষণ করার মতো
কীই বা ছিল!

তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সতেরটা বছর।...

চাকরি করি স্টেটলমেন্ট দফতরে। লোকের জমি-জমা মাপজোক করে পুরনো খতিয়ান পরচার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার কাজ চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। জমিদারী ব্যবস্থা উঠে গেছে। - নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই স্টাফ নিয়ে। রিচেকিং চলেছে দশবাঞ্ছতে।

আমাকে বদলী করা হল সেই নবাবী মহাকুমা অঞ্চলে। সতেরবছর পরে এখানে ফিরে চেনাজানা লোক খুঁজলুম। গেলুম না। পিসেমশাই কবে মারা গেছেন। পিসতুতো ভাই ফজলু ফ্যামিলি নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। সেখানেই চাকরি করে। বাড়ি বেচে দিয়ে গেছে।

সবচেয়ে অবাক লাগল, শহরটা যা দেখেছিলুম তাই আছে—এতটুকু শ্রীরুদ্রি হয়নি। শুধু ইলেকট্রিক আলো এসেছে, এই যা। সেই পুরনো ভাঙাচোরা দালান, সেই একই ঐতিহাসিক পটভূমি। বরং নবাববাড়ির সে জেল্লাটুকুও আর নেই। কেল্লার পাঁচিল সবখানে ধ্বংস পড়েছে। ভেতরটায় জঙ্গল গজিয়েছে। মন্ডিমহলের লনে গরু ছাগল চরছে। গেটের কাছে বন্দুকহাতে সেপাইও নেই। নহবতখানায় হুমুমানের দল লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে।

মনটা কেমন করে উঠল। কিন্তু ভেবে দেখলুম, দুঃখ করার কী আছে এতে। লক্ষলক্ষ মানুষকে বঞ্চনা করে ঐশ্বর্যের স্তূপে বসে থাকার মধ্যযুগীয় বিলাস আর তো চলতে পারে না।

নবাববাড়ির এলাকায় মাপজোফ চলছিল। আড্ডা নিয়েছি একটা পুরনো বাড়িতে। দোতালার সেকলে বাড়ি। থাকি ওপরতলায়, নিচের ঘরগুলোতে অফিস।

একদিন সন্ধ্যার পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে আছি। সামনে গঙ্গা। গঙ্গার কথাই ভাবছি। এখন গ্রীষ্মকাল। টলটলে কাজল জলের দহ আছে সামনে। কালই সেখানে স্নান করব। সতেরবছর আগের সেই জলের স্বাদ আমার স্মৃতি ঠেলে বেরিয়ে এল, আমাকে চঞ্চল করে তুলল।

হঠাৎ দেখি, এক ভদ্রমহিলা আমার ঘরে ঢুকলেন।

পর্যত্রিশ ছত্রিশের মধ্যেই বয়স। ধপধপে সাদা সাড়ি পরনে—কিন্তু নাকসি পাড় আছে। মাথায় ঘোমটা দেখে অবাক হলুম। তারপর লক্ষ্য করলুম, সিঁথি শূন্য। সুভরাং মুসলিম মহিলা।

ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই বুকের মধ্যে রক্ত শিসিয়ে উঠল। চিনতে পারলুম। সেই নবাবনন্দিনী বিবু-বেগম!

মাছুষের অনেক স্মৃতি থাকে, যা অনেক সময় চেতনার সজ্ঞান স্তরে ফিরে আসে—কিন্তু তাৎপর্যহীন অথবা অর্থহীন মনে হয় তখন। বিবুর স্মৃতি এ শহরে ফিরে আসার পর তেমনি তাৎপর্যহীন বা অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে বিবুকে সামনাসামনি দেখে স্মৃতির সেই নিয়ম ওলাটপালট হয়ে গেল।

মনে হল, আমার বয়স্ক শরীর মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ভাবপ্রবণ কিশোর। অমনি সেই পুরণো আড়ষ্টতা ও অপ্রতিভ হাবভাবটাও জেগে উঠল। ক্রত উঠে দাঁড়িয়ে সামনে বুকে কপালে হাত তুলে আদাব দিলুম।—সেলাম বেগমসাহেব!

বিবুবেগমের ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠল, বললেন—জুজুরাইন বললেন না তো সৈয়দসাহেব!

সেই পরিহাস! আড়ষ্ট একটু হেসে বললুম—আপনার মনে আছে?

—আছে। বলে উনি গভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ—আপনি আমাকে বসতে বললেন না সৈয়দজাদা!

ব্যস্ত হয়ে বললুম,—বসুন, বসুন।

—এবং গোস্তাকি মাফ করুন! বলে বিবুবেগম একটা চেয়ারে বসলেন। মুখটা কিন্তু গভীর।

হেসে বললুম—হ্যাঁ। গোস্তাকি মাফ করুন বলাও উচিত। যাকগে, কেমন আছেন? আমি আপনাকে এখানেই দেখতে পাব বলে আশা করিনি কিন্তু।

মুখ তুলে বেগম বললেন—কী আশা করেছিলেন?

ওঁর সেই সাদা হৃদয় মুখের দিকে তাকাতে পারছিলুম না। বললুম—ভেবেছিলুম, আপনি বাইরে কোথাও আছেন। মানে—মহিলারা তো বাবার বাড়ি চিরদিন থাকেন না।

আমার হাসি শুনে উনিও একটু হাসলেন।—না। আমি কোথাও যাইনি। বাবার ভিটেতেই আছি। আমার স্বামী আমারই চাচাতো ভাই। আতা নবাবকে মনে আছে আপনার? তিনিই আমার চাচা ছিলেন।

বললুম—কী করেন আপনার স্বামী?

—খোজা খবরখানার কেয়ারটেকার। মাসে সাড়ে সাতাশটাকা মাইনে। আর আমি প্রাইমারি স্কুলের টিচার। আমার মাইনে বাষাট্ট টাকা। নবাবজাদী বা তার স্বামীর মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট নয়—কী বলেন?

কী বলব এর জবাবে? একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে বললুম—ওই তো অবস্থা হয়েছে দেশের!

বিক্রুবেগম একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—শুনুন, কেন এসেছি। আমার বাবা নিঃসম্বল অবস্থায় মারা যান! এমনি কি ভিটেটুকুও বেচে দিয়েছিলেন। তখন আমরা চাচার বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলুম। চাচার কথা আপনি তো জানেন। গাঁজা খেতেন বড্ড। ওই করে উনিও নিজের ভিটেটুকুও বেচে দিয়েছিলেন, আমরা জানতুম না। যে কিনেছিল, সে কেল্লাবাড়ির এক নোকর। এ্যাদিন লোকটা চুপচাপ ছিল। এখন আপনারা সেটলমেন্ট রিচেকিংয়ে এসেছেন। সে কাগজপত্র দাখিল করে দাবি তুলেছে। দেখে ভো আমরা অবাক। দেখুন ভো কী কাণ্ড! ওর নাম যদি নতুন রেকর্ডে ওঠে, আমরা কোথায় যাব?

শুনে বললুম—কিন্তু আপনারা তো দখলদার। আপনাদের উচ্ছেদ করা যাবে না। আমার যে স্টাফ নতুন রেকর্ডের চার্জ আছে, তাকে বলে দেব। ভাববেন না।

বেগম চিন্তিতমুখে বললেন—লোকটার নাম জাহাঙ্গীর পাঠান। চামড়ার ব্যবসা করে অনেক পয়সা জমিয়েছে। মামলা করলে আমরা হেরে যাব—উকিলের কাছে জেনেছি।

বললুম—উকিল বলতে পারেন। কিন্তু এই রিচেকিংয়ে দখলদারকেই অর্থাৎ যিনি বরাবর ভোগ করছেন, তাঁকেই মালিক হিসেবে স্বীকার করার নিয়ম হয়েছে। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আপনি

ভাববেন না। কালই আমি সবজমিনে যাব। কিছু সাফলীর দরকার হবে শুধু। তারা সাফলী দিলেই আপনার স্বামীর নাম পাকা হয়ে যাবে।

—সেটাই যে মুসকিল! জাহাঙ্গীরের ভয়ে কেউ সাফলী দেবে না।

একটু ভেবে বললুম—ঠিক আছে। না দেয়, তাতেও অসুবিধে নেই। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বিক্রুবেগম আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেলেন। নিচে অফিসে গিয়ে দিয়ে এলুম। তারপর একলা ঘরে বসে স্মৃতির দিকে ফিরে তাকালুম। মন বিধ্ব হয়ে উঠল।

কতক্ষণ পরে দরজার বাইরে তার গলার আওয়াজ শুনলুম—আসতে পারি স্তার?

কে?

—আমি স্তার। আমার নাম জাহাঙ্গীর পাঠান।

মুহুর্তে মুখেচেঁখে রাগের ভাব ফুটিয়ে বললুম—কী চাই আপনার? এভাবে সরাসরি আমার কাছে কেন? নিচে অফিসে খোলা আছে এখনও। চল্লিশঘণ্টা কাজ হচ্ছে। ওদের কাছে যা বলার আছে, বলুন গে। আমি ব্যস্ত আছি।

লোকটার চেহারা বিশাল। নির্ধাৎ জ্বালাদের বংশ। কালো কুচকুচে রঙ। মাথায় হোটছোট চুল। মস্তো গোঁফ আছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফহাতা পানজাবি। আমার ধমক শুনে একটুও ভড়কাল না। পানখাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসল। বলল—স্তার, বিক্রুবেগম আপনার কাছে এসেছিল—আমি তখন নিচে অফিসে ছিলাম। বুঝতে পেরেছি, দরবার করতে এসেছিল। কিন্তু স্তার, আইনত ধর্মত ওই মাটি আমার। নগদ সাতশো টাকায় দুকাঠা জমি ঘর গাছ-পালাস্বদ্ধ কিনেছি পাঁচবছর আগে। এ্যাদিন ধরে ওনারদের অনুরোধ করে আসছি—পাঁচবছর তো থাকতে দিলুম। এবার দয়া করে সরুন। ওনারা সববেন না। বংশ তুলে হাল দেবেন। আরে, নবাববাড়ির নোকরের বংশ তো কী হয়েছে? নোকর বলে মাছুষ নই? বলুন স্তার, আপনিই বলুন।

ক্ষেপে গিয়ে বললুম—গেট আউট! চলে যাও এফুনি।
জাহাংগীর একটুও গুড়কাল না। কিন্তু কিছু বলল
না আর। তেমনি হেসে বেরিয়ে গেল। আমি রাগে
অস্থির হয়ে পাঁচচারি করতে থাকলুম।

একটু পরে এবার তৃতীয় একজনের আবির্ভাব হল।
—হ্যালো সৈয়দ!

তফুনি দৌড়ে গিয়ে সম্ভাষণ করলুম—আরে আসুন,
আসুন! কী সৌভাগ্য!

—হ্যাঁ, এলুম। একটু জরুরী প্রয়োজন ঘটল। জাষ্ট
এ মিনিট ওনলি।

—বলুন, বলুন স্তার।

—ব্রাদার, একটা কথা বলি। জাহাংগীর পাঠান
আমার ডানহাত বলতে পারেন। এই শহরে তাবৎ
মস্তান ওর চেলাচামুণ্ডা। তার ওপর, ওর ছেলে ফরিদ—
ফরিদের নাম আপনি শোনেন নি। ফরিদ আমাদের
রাজনৈতিক দলের ইয়ং লিডার। ওকেই সামনের
ইলেকশনে আমাদের পার্টি দাঁড় করচ্ছে। কোয়ালি-
ফায়েড ছেলে—অসাধারণ যোগ্যতা আছে। বাবা গুণ্ডা
হতে পারে, মুখ্য হতে পারে—ছেলে তো তা নয়।
তাছাড়া ব্রাদার, মুসলিমপ্রধান এলাকা—কাজেই ফরিদ
অনিবার্য। এবং যেহেতু ফরিদের বাবা হচ্ছে জাহাংগীর
পাঠান, তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারিনে।

গলা শুকিয়ে গেল। আস্তে বললুম—তারপর?

—আপনি তো সবই বুঝছেন সৈয়দসাহেব।

—কিন্তু

—আপনি জানেন বিক্সুবগম একটা ব্যাড
ক্যাক্টেরার মেয়ে? জানেন, তিন তিনবার ওর মাষ্টারি
যেতে বসেছিল, আমিই বাঁচিয়েছি? অথচ আশ্চর্য ব্যাপার
মশাই, ওই খানকি মেয়ে কিনা উন্টে আমার নামে
বদনাম দিয়েছিল! আমার অপজিট পার্টির লোকের সঙ্গে
ওর কত চলাচলি তা জানেন? সেদিন দেখলুম ওদের
মিছিলে দিব্যি শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। মেয়েলিডার
বানাবে ওকে। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

আমি চুপ করে থাকলুম।

—তাই বলছি, ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। বড় অফিসার

হয়েছেন। জেলারই মানুষ আপনি। জেলার প্রতি
একটা কর্তব্যও তো আছে। নিন, সিগ্রেট খান।

যন্ত্রের মতো সিগ্রেট নিতে হল। এই লোকটিকে
প্রত্যাখ্যান করার সাহস কোথায়? এর দাদা ভূমি
দফতরের মন্ত্রী। ইনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।
একটি রাজনৈতিক দলের নেতাও।

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছি পরদিন সন্ধ্যায়। পিছন
থেকে কে-যেন বলে উঠল—কী সৈয়দজাদা। পালিয়ে
বেড়াচ্ছেন কেন?

চমকে ঘুরে দেখি, কেউ নেই তো। কোথাও কোন
লোক নেই। ধূসর অন্ধকারে নির্জনতা থমথম করছে।
তবে কে কথা বলল?

নাঃ মনের ভুল। হালুসিনেশন। অস্থির হয়ে
হাঁটতে থাকলুম গঙ্গার পাড়ে। ঝাউয়ের গাছে শনশন
করে হাওয়া বইতে থাকল।

হঠাৎ পিছনে কে হেসে উঠল—ভাগ, ভাগ। সৈয়দ
এসেছে! সৈয়দরা হজরতের খান্দান। তারা সত্যবাদী,
তার সাহসী। আগুনে তাদের চামড়া পোড়ে না।

দ্রুত পিছনে ঘুরলুম। কই, না তো! কেউ নেই।

—এ্যাই বুদ্ধু। আমায় সেলাম করলে না যে?

অন্ধকারে কেউ ছিল না। হাত উঠে গেল কপালে।
বিড়বিড় করে ভয়ে ভয়ে বললুম—বন্দেগি হুজুরাইন
বেগমসাহেবা! গোস্তাকি মাফ করুন!

কে খিলখিল করে হেসে উঠল। অন্ধকারে নিচে
গঙ্গার জল ঢলে উঠল। শহর এত অন্ধকার কেন?
হ্যাঁ—লোডশেডিং। বাড়িটা চিনতে পারছি না—
হাঁটছি। ভয়ে লজ্জায় মুখে আড়ষ্ট। এ শহরে আর
যেন আলো না ফোটে! ঈশ্বর! এই শহর তুমি অনন্ত
কাল অন্ধকারে তরে রাখো। কিন্তু আবার কে খিল-
খিল করে হেসে উঠল। আর সেই হাসির সঙ্গে হাত-
তালিও দিল। অমনি মনে হল হাবসী লেলিয়ে দিচ্ছে।
তখন পাগলের মতো দৌড়তে শুরু করলুম। কৈশোরের
কল্পনায় দেখা রাজকন্ঠার কালাস্ত হাবসী অহুচরের
পায়ের শব্দ আমার পিছনে। জানি, পালিয়ে বেশিদিন
বাঁচা যাবে না।

সেকেলে গল্প : চিরকালের মন

মানবেন্দ্র পাল

এ বাড়িতে যদি বড়ো বৌমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হত তা হলেই আবহাওয়া বদলে যেত। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি কলেজে-পড়া নাতনী থাকলে এই যে উমাশংকরী আজও বড়ো বৌকে যা খুশী তাই বলে গাল দিয়ে যান তা হতে পরত না। নাতনীটি যে মায়ের হয়ে ঠাকমাকে মুখের উপর প্রতিবাদ জানাত তা নয়—তার দরকারও বোধ করি হত না; আপন নাতনীর মধ্যে যুগের আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে নিজেই শিউরে উঠতেন। ঘেন মনে হত এইসব আজকালকার মেয়েদের চেয়ে তাঁর পুত্রবধূ অনেক ভালো।

বিচিত্র এই মফস্বল শহরটি। এখানে যেমন কো-এডুকেশন কলেজ, ছোটো সিনেমা হল এবং 'যুবতীসংঘ' নামে একটি 'সাংস্কৃতিক ক্লাব'ও আছে, তেমনি আছে ছেলের বাপের টাকার খাঁই, এক জী বেঁচে থাকতেই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের প্রচলন উদ্ভাবন আর অসহায় বিধবার সম্পত্তিগ্রাসের অসংখ্য মামলা। এখানে এমন একটিও উকিল নেই যিনি ষোপার্জিত টাকায় একখানি দোতলা বাড়ি না ইঁাকিয়েছেন।

এই বিচিত্র শহরের মধ্যে একটি উপযুক্ত বাড়িও আছে। আরতির দুর্ভাগ্য—সুদূর যশোর থেকে এই বাড়িতে সে পুত্রবধূ হয়ে এসেছিল। সেও আজ দেখতে দেখতে বাইশ বছর হল।

খন্ডর বাড়িতে শান্তুড়ির কাছে আরতির গঞ্জনার হুল কারণ, বিয়েতে তার বিধবা মা কিছুই দেন নি।

আরতিদের অবস্থা যশোরে মোটামুটি ঝুঁকলই ছিল; কিন্তু পার্টিশানের পর সর্বস্বান্ত হয়ে বনগাঁয়ে চলে আসার পরই বিপর্যয় শুরু।

এই বিপর্যয়ের মধ্যেই হঠাৎ এক বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বিয়ের কথা উঠল। পাত্র সেখানে স্বয়ং উপস্থিত। তারাও যশোর জেলার লোক। পাকা কথা স্থির হতে দেরি হল না। ছেলেটি বিভানুরাগী। মেয়ে বি. এ. পাস—দেখতেও সুশ্রী, তার ওপর দেশের মেয়ে ব্যাস, পছন্দ হয়ে গেল।

এত সহজে পছন্দ হয়ে যাওয়াটা কিন্তু উমাশংকরীর

মনঃপূত হল না। হোক না যশোরের মেয়ে—বংশ ঠিকুজি দেখা হল না, দাবি-দাওয়ার কথা উঠল না, অমনি এক কথায় রাজি!

অথচ বাধা দেওয়ার উপায়ও ছিল না। সে নিজে যখন পছন্দ করেছে তখন আর কথা কী!

তাই সব রাগ ফোড় রোষ গিয়ে পড়ল আরতির ওপর। এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর থেকেই শুরু হল গঞ্জন। আরতির মা যে ফাঁকি দিয়ে তাঁর ভালোমানুষ ছেলেটিকে ভুলিয়ে ধিঞ্জি মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়েছে—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে উঠতে-বসতে শান্তুড়ি সেই কথাটাই আরতিকে শুনিয়েছেন।

এত কথা—এত অপমান কী করে যে একটি বি. এ. পাস মেয়ে মুখ বুজে সহ করে গিয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

কিন্তু সব দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না কেননা আরতি শুধু শিক্ষিতই নয়, বুদ্ধিমতী। সে দেখত, রাগ করে স্বামীকে নিয়ে যে আলাদা হয়ে যাবে সে ক্ষমতা ছিল না। আলাদা হওয়া মানেই এই বাড়ির একটা বড়ো অংশ থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত হওয়া। এই বাজারে অতখানি ক্ষতিস্বীকার করতে সে বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া, তার স্বামীর উপায়ও সামান্য। পার্টিশানের পর এখানে এসে কোনো রকমে একটি স্কুল মাস্টারির কাজ পেয়েছে। শরীরও পঙ্গু। প্রায়ই ভোগে। এমন মানুষকে নিয়ে পৃথক হওয়া বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। তা ছাড়া অন্য দিকও ছিল। আরতি তার শান্তুড়িকে বুঝত। তিনি সেকালিনী। জাতি-গোষ্ঠীও অনেক। বড়ো ছেলের বৌ আনবেন দেখে শুনে বড়ো ঘর থেকে এটাই সকলের কাছে প্রত্যাশিত। বড়ো ঘর মানে কেবল মাত্র বড়ো বংশ নয়, বড়ো লোকও। সেখানে আরতির মা, পনের টাকা তো দূরের কথা বিয়েতে একটি গহনাও দিতে পারে নি। জামাইকে আশীর্বাদ করেছে শুধু মাত্র ধান-দুর্বা দিয়ে। সোনার একটি আংটিও দেবার ক্ষমতা ছিল না। ফার্নিচার

দেওয়া তো দূরের কথা—নতুন লেপ তোষক পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

এসব কথা তখন আরতির মনে হয় নি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এগুলো অমুভব করতে পেরেছে। আর সেই সঙ্গে শান্তিড়ির ফোঁড়-ছুথের সঙ্গে যেন একমত হতে পেরেছে। অর্থাৎ আরতি এখন ভাবে যে, সে যদি এই পবিবারে ঐ সময়ে শান্তিড়ি হত তা হলে হয়তো সে নিজেও ঐরকম দুঃখ পেত। কুৎসিত ভাষার গালি-গালাজ হয় তো করত না। কেন না সে শিক্ষিত। শান্তিড়ির সঙ্গে এটুকুই তফাৎ।

সেইজন্তে এই দীর্ঘদিন আরতি বিরা প্রতিবাদে শান্তিড়ির গঞ্জন সহ করে এসেছে। দুঃখ যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন শুধু নিঃশব্দে কেঁদেছে—এই পর্যন্ত।

কিন্তু শান্তিড়ির গঞ্জন তিক্ততম হয়ে উঠল দীর্ঘদিন পর আর একটি ঘটনায়। এই দিনের মধ্যে পরিবর্তন অনেক হয়েছে। আরতির ছেলেটি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে, উমাশংকরীর দুটি চোখে ছানি পড়েছে, আরতির স্বামীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। দু-দুবার যমে-মানুষে টানাটানি করে কোনো-রকমে প্রাণটা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু চাকরি করার ক্ষমতা হারিয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে আরতিকে চাকরি নিতে হয়েছে একটা হায়ার সেকেন্ডারি ইস্কুলে।

এই শেষের ব্যাপারটিতেই একেবারে আগুন জ্বলে উঠল। উমাশংকরী কিছুতেই বাড়ির বোকে বাইরে বেরোতে দেবেন না। আর আরতিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—চাকরি তাকে করতেই হবে। চাকরি তাকে করতেই হবে নইলে সংসার চলবে কি করে?

শান্তিড়ির যুক্তি—জমির ধান আছে, বাড়ি ভাড়া লাগে না, বরঞ্চ শহরের তিনখানা বাড়ির আয় একটা গুদাম ঘরের ভাড়া আসে, জমানো টাকার সুদ আছে—কাজেই সংসার ঠিকই চলে যাবে।

আরতি তাতে খুশী নয়। সে দেখিয়ে ছিল এইসব টাকায় তার অধিকার কতটুকু? দেওয়ার আছে, দেওয়ার সংসার আছে, অবিবাহিতা নন্দ আছে—আর

শুভর-শান্তিড়ির পিছনেই কি কম খরচ? তাদের দুধ, মাছ, ফল, সন্দেশ—

ব্যাস—ব্যাস—আর বলতে হয় নি। উমাশংকরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমরা এত বোঝা! যমে কি আমাদের নিতে ভুলে গেল গো?

তারপর অথর্ব স্বামীর পা দুটো ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, ওগো, এখনো তো তুমি আছ—তবু ঐ বড়ো বৌয়ের কাছ থেকে এত কথা শুনতে হবে!

আরতিও কঠোর হয়ে রইল। সে জানে সংসারের টাকায় পেট চললেও ছেলেকে মানুষ করা যাবে না। দেওয়ার যা নামেই—ওদের কাছ থেকে কোনোদিন কোনো সহানুভূতি পাওয়া যায় না, যাবে না।

আরতি একরকম সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইস্কুলের চাকরিটা নিল। উমাশংকরী বড়ো বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন।

তা দিন। তাতে আরতির নতুন কী আর ক্ষতি বৃদ্ধি হবে। বরঞ্চ চাকরিটা পেয়ে আরতি যেন মুক্তির সন্ধান পেল। উঃ কত দিন পর বাড়ির ঐ বন্ধ দুখিত পরিবেশ থেকে বেরোতে পারল!

এখন আরতি যখন ইস্কুলে যায় তখন তার মনে পড়ে যশোরের ছাত্রীজীবনের কথা। এতকাল পর সেই ছাত্রীজীবনটা কি আবার ফিরে এল? মনের আনন্দে আরতি হন্ হন্ করে পথ হাঁটে।

কিন্তু পথও নিষ্ফলক নয়। সেও এক নতুন অবিবাহিতা অভিজ্ঞতা।

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছে রাস্তায় বেরোলেই কেউ কেউ তার দিকে এমন ভাবে তাকায় যা কিছুতেই নিছক কৌতূহল নয়। প্রথম প্রথম আরতি ঠিক বুঝতে পারত না। যখন বুঝতে পারল তখন লজ্জায় ঘোমায় সিউরে উঠল। এই বয়েসে এ আবার কী উৎপাত! এখন তো সে স্বাস্থ্য নেই—সে রঙ নেই! বরঞ্চ হুশিয়ার মুখের ওপর কেমন একটা কালো ছাপ পড়ে গেছে। গলার কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে।

শুধু এই বয়েসে কেন? সময়কালেই কি কেউ তার দিকে অমন করে তাকাত? কি জানি—সে কথা আজ

আর তেমন মনে পড়ে না। আসলে আরতি বরাবরই একটু অল্প ধরণের মেয়ে—যাকে বলে ভালো মেয়ে। যখন ইস্কুলে পড়ত—বিশেষ করে যখন কলেজে নিয়মিত ক্লাস করত যৌবনের সেই বিহ্বল বসন্ত দিনেও আরতি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। কেউ যে তাকে পছন্দ করতে পারে, কেউ যে তার সঙ্গ কামনা করতে পারে, কেউ যে তাকে ভালোবাসতে পারে এ যেন সে কল্পনাই করতে পারত না। বাস্তবিক তার জীবনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটলই না—হুঁ একটা প্রেমপত্র পর্যন্ত কেউ লিখল না। অথচ তেমন ঘটনা ঘটতে পারত যদি সে একটু আত্মসচেতন হত।

একবার অবশ্য একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। তখন যুদ্ধের সময়। যশোরে আমেরিকান সৈন্য ভর্তি। একদিন হঠাৎ একটা আমেরিকান ছেলে তার পথ আটকালো। আরতির মুখটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে যে কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু বিদেশী সৈনিকটি কিছুই করল না; শুধু ওকে দাঁড় করিয়ে ওর একটা ছবি তুলে নিয়ে হেসে থ্যাঙ্কস্ দিয়ে চলে গেল।

এই মজার ঘটনাটি আর একটা ছেলে দেখেছিল। সে ছেলেটিকে প্রায় ইস্কুল যাতায়াতের পথে দেখা যেত। এখন মনে পড়ছে সে ছেলেটাও যেন কেমন ভাবে তাকাত।

একদিন হঠাৎ সেও পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তোমার একটা ছবি তুলব।

আরতি তো অবাক। একটা আধা-পরিচিত বাঙালি ছেলে যে হঠাৎ এভাবে একটা বড়ো মেয়ের কাছে ছবি তোলার প্রস্তাব দিতে পারে তা কল্পনার বাইরে। সে রাগবে, না হাসবে ভেবে পেল না। শুধু মুখলাল করে বললে, পথ ছাড়ো।

এই বলেই ছেলেটির পাশ কাটিয়ে হন হন করে ইস্কুলে ঢুকে পড়েছিল।

ছবি তোলার এই ইচ্ছাটা যদি ভালোবাসার লক্ষণ হয় তাহলে জীবনে ঐ ছেলেটাই হল প্রথম প্রেমিক, শেষও বলা যায়।

আবোল ভাবোল এই সব চিন্তা করতে করতে আরতি কখন ইস্কুলে এসে পড়েছিল খেয়াল ছিল না। সে যেন এই মাত্র তার কিশোর প্রেমিকটিকে প্রত্যাখ্যান করে ক্লাস টেনের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। দিক পরিবর্তন করতে হল।—না, এখন সে ছাত্রী নয়, টিচার। যেতে হবে অফিস ঘরে।

কথা বন্ধ করলেও উমাশংকরী খোঁজ নেন, বৌ কখন যাচ্ছে, কখন আসছে। স্নেহের টানে যে খোঁজ নেন তা নয়—এই যে তাঁর কথা টেলে ফেলে, বনেদী বাড়ির সম্মান (হোক না এখন বাস্তবহার্য) ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এ বাড়ির বড়ো বৌ চাকরি করতে যাচ্ছে—এর ফল ফলবে না? একদিন এর ভেত্রে চোখের জল ফেলে বড়ো বৌকে অনুতাপ করতে হবে না? তিনি তো তার জন্তেই দিন গুণছেন। কিন্তু মনের এই গোপন কামনার কথা একমাত্র তাঁর মেয়েকে ছাড়া আর তো কাউকে, বলার নয়। ছেলে তো বৌয়ের কথায় ওঠে বসে। আর মেজো বৌ—সে তো বড়োলোকের মেয়ে। অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। কেবলই কলকাতায় বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

তাই মেয়ে যখন চুপি চুপি মাকে এসে খবর দেয়—বৌদি এতক্ষণে ফিরল—তখনই শুরু হয় চিংকার। বক্তব্যটা এই—এতক্ষণে বিলিসাহেব টাকা রোজকার করে ফিরলেন। এদিকে ঘরে দুটো মড়া (খুন্ডর শাস্তি) শুষছে সেদিকে খেয়াল নেই।

শুধু যে এই কটি কথাই বলেন তা নয়। এর সঙ্গে যেসব বিশেষণ, অলংকার, উপমা প্রয়োগ করা হয় তা শুনতে শুনতে আরতির হৃদয় গরম হয়ে ওঠে। সে একটি কথাও বলে না। সোজা চলে আসে নিজের ঘরে। ছেলেটা নিজেই টিফিন খেয়ে (কাকীমা বা পিসি ওকে এগিয়ে দেয় না) খেলতে বেরিয়ে গিয়েছে। টেবিলের ওপর যথারীতি একটা স্লিপ রয়েছে...টাকা রেখে যাও নি কেন? আজ তো র‍্যাশান তোলার ডেট। দেখি যদি কারো কাছে ধার পাই।

স্লিপ রেখে যাবার উদ্দেশ্য—কখন যে তাস খেলে এ বাড়ির বড়ো ছেলে ফিরবেন তার ঠিক নেই।

ঐ এক মানুষ—বাড়িতে থাকতে চায় না—টিকতে পারে না। ভুলে যায় স্বাস্থ্য ভালো নয়। অনিয়ম করলেই রোগে পড়বে। তখন তো আরতিকেই—

এমনিভাবেই তিনটে বছর কাটিয়ে দিল আরতি। শান্তি একইভাবে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন—আরতির তা গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে আর পরোয়া করে না। এখন ভাবে ত্যাগি সে বি.এ. পাসটা করে ছিল। কিন্তু শুধু বি.এ. পাশে হবে না। বি.টিটা পড়ে নিতে হবে। নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই বি.টি পড়া শুরু করে দিল। বহুকাল পড়াশোনার চর্চা নেই—পরীক্ষা দেওয়াও হয় নি অনেক কাল। আরতি সংসার ভুলে কেবলই শুল; কলেজ, সহপাঠিনীদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

এই সময়ে শান্তির মন্তব্যগুলিও নতুন নতুন ব্যঙ্গনা পেতে লাগল। এসব মন্তব্য আরতি এখন আর কানে নেয় না। সে ফুরসৎও নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিনের একটা কথা কানে এসে বাজল। নন্দ আর শান্তিতে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল তাকে নিয়েই। হঠাৎ শান্তি বলে উঠলেন—শুনলেই তো ওর স্বভাবের কথা! রাস্তায় ঘোরা মেয়ে। মরলেও এ রোগ যাবে না।

কিছুই নয়, সামান্য কথা। এমন কত কথাই তো তিনি বলেন। কিন্তু কেন কে জানে ঐ যে রাস্তায়-ঘোরা মেয়ে কথাটা তীরের মতো এসে তাকে বিঁধল। রাস্তায় ঘোরা মেয়ে বলার মানে? কথাটা তো ভালো নয়। এ কথা তার কলেজে-পড়া ছেলের কানে গেলে মায়ের সম্বন্ধে কী ধারণা হবে।

কথাটা বারে বারে তার মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল।—শুধু রাস্তায় ঘোরা মেয়ে নয়—চিরকালের নাকি ঐ স্বভাব!

এ মন্তব্য আরো আপত্তিকর। রাস্তায় ঘোরা মেয়ে বলতে যা বোঝায় আরতি কোনোদিনই সে ধরণের মেয়ে নয়। যারা তাকে ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে তারা আজ কেউ কাছে থাকলে সাক্ষী মানা যেত। কিন্তু তেমন সাক্ষী কোথায়?

সাক্ষী জোগাড় করার আগে বিষয়টা নিয়ে শান্তির সঙ্গে ফয়সালা করা দরকার।

শান্তি এত দিন এত কথা শুনিয়েছে আরতির তার কোনোটিরই প্রতিবাদ করে নি। মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছে। কিন্তু আজ—এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার প্রায় বাইশ বছর পর সামান্য একটা কথা আর সহ্য করতে পারল না। এখন তার সম্মান শুধু বড়ো বৌ হিসেবেই নয়—একটি কলেজে-পড়া ছেলের জননী হিসেবেও। এখন যদি প্রতিবাদ করতে না পারে তাহলে বুদ্ধিভ্রংশ বৃদ্ধাটি আরো কত কী যে বলতে শুরু করবেন তার ঠিক নেই। আজ ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে ভাবনা ছিল না। নাতনি নিজেই ঠাকমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারত—কিন্তু ঠাকমা হয় তো তখন নাতনির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারতেন না। কিন্তু যেহেতু ছেলে—সে তো আর ঠাকমার সঙ্গে মায়ের হয়ে বোঝাপড়া করতে যাবে না, মায়ের নামে মিথ্যে দুর্গাম নিঃশব্দেই হজম করে যাবে। আরতির এখানেই ভয়—এখানেই সংকোচ।

না, প্রতিবাদ করতেই হবে। শান্তির সামনে দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতেই হবে—এতদিন পর কেন এই নতুন দুর্গাম?

কিন্তু—

শান্তিকে জেরা! তার মতো শিক্ষিত মেয়ের কি শোভা পায়? একজন অর্থবর্ষ মাহুষের সঙ্গে আত্মসম্মান নিয়ে ঝগড়া করবে?

আরতি ভাবল, আজ থাক। কাল জিজ্ঞেস করলেই হবে।

তখনকার মতো কাঁড়া কাটল বটে কিন্তু মনের সংশয় ঘুলে না। কথাটা উঠলই বা কেন? এতদিন পর কোন প্রমাণে শান্তি বলতে পারলেন—রাস্তায়-ঘোরা মেয়ে!

এক ধরণের উচ্ছ্বল মেয়ে আছে বটে—চিরকালই আছে, যারা রাস্তায় রাস্তায় নিলজ্জের মতো বেড়ায়। ব্যাভিচার তাদের পেশা। আরতি কি সেই ধরণের মেয়ে ছিল?

কখনোই না।

তবে ই্যা, রাস্তায় একটু ঘুরতে হত। তবে তা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়।

অনেক দিন পর আরতির কলেজজীবনের কথা মনে পড়ল। বন্ধু বাব্বুরদের সঙ্গে বেড়াতে হত বৈকি। পিকনিকও করেছে। তাদের ক্লাসের একটা ছেলে একবার তাদের কাছাড়ি বাড়িতে নৈমতন্ন করে খাইয়েছিল। আরতিকেও খেতে হয়েছিল। কিন্তু সে তো লুকিয়ে যায় নি। মাকে বলে আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গেই গিয়েছিল। সেটা কি কিছু অস্বাভাবিক? এই ঘুরে বেড়ানো কি 'রাস্তায় ঘোরা মেয়ে' লক্ষণ?

ই্যা, তারা কলেজের ছেলেমেয়েরা একবার থিয়েটার করেছিল। ভারৎসামাত্র একটা পার্ট ছিল। নাটকের পার্ট করেছিল ভূবু বলে একটি ছেলে। ভালো নাম মনে নেই। সে তাঁকে রোজ রিহার্সালের পরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেত। যখন তারা রাস্তার পথ চলত তখন স্বাভাবিকভাবেই একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটত। সেটা কি অস্বাভাবিক?

একদিন উমেশ হঠাৎ ওর হাতটা চেপে ধরেছিল। সে চমকে উঠতেই উমেশ হাত ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠেছিল—কেমন ভয় শাইয়ে দিলুম!

এই ব্যাপারটাই যদি কেউ সেদিন দেখে থাকে তা হলে নিশ্চয় এতদিন পর তার শাস্তির কাছে লাগানো উচিত নয় যে—আপনার বোমা একটি রাস্তায় ঘোরা দুশ্চরিত্র মেয়ে।

আরতি রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারল না। তার মাথাটা কেমন গোলমাল করতে লাগলো। সে সব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন একেবারে তার কলেজজীবনের নাবাল পেয়ে গেছে।

মনে পড়ল অরুণ একজনের কথা। পার্টি করত। বক্তৃতা দিয়ে কলেজের ছেলেদের বিশেষ করে মেয়েদের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিল।

আরতির মাথা—ঠিক যাকে মাথা খাওয়া বলে, তেমন ভাবে অবশ্য খেতে পারে নি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সে তার শ্রদ্ধা করত। যেখানেই সে বক্তৃতা

দেবে যেমন করে হোক আরতি সেখানে যাবেই। এই নিয়ে তার বন্ধুরা তাকে খ্যাশাত। তাতে অবশ্য আরতির রাগ হত না।

একদিন সে তো তার বক্তৃত শোনার জন্তে বাড়িতে না বলে ঝিকরগাছা চলে গিয়েছিল। সেদিন সেই বক্তৃতা এত খুশী হয়েছিল যে, নিজের গলার মালা আরতির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু—যাক সে সব কথা। ঝিকরগাছায় যদি সেদিন চেনাশোনা কেউ তাকে দেখে থাকে তাহলে নিশ্চয় এতদিন পর তার উচিত নয় শাস্তির কাছে লাগানো যে সে একটা 'রাস্তায় ঘোরা মেয়ে'। এতটা শ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তার বোঝা উচিত আরতির একটি একুশ বছরের ঘোয়ান ছেলে আছে।

কিন্তু সে যাই হোক শাস্তির সঙ্গে ব্যাপারটা কয়সলা করে নিতেই হচ্ছে। জানতে হবে কোন সূত্র থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন সে একটা 'রাস্তায় ঘোরা মেয়ে'!

উমাশঙ্করী কিছুক্ষণ কোনে কথাই বলতে পারেন নি। তিনি বোধহয় নিরীহ ভালোমানুষ বোমাটির চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি কি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি, বাছা? নাকি শুধু শুধু নিজের ছেলের বোয়ের নিন্দে করে যশ আছে? ওই তোমার ননদকেই জিজ্ঞেস কর না—সেদিন ভৈরবই বলে গেল।

—ভৈরব?

—আমার বোনপো গো। নিজের বোনপো নয়, সম্পর্কে। যশোরে থাকত। ছোটবেলা থেকে তোমাদের নাকি দেখে আসছে—

আরতি বিরক্ত হয়ে বললে, আমি আপনার বোনপোকে কোনদিন দেখি নি।

—আমিই কি বাছা এর আগে কখনো দেখেছি? সেদিনই যা দেখলাম। ওই বোজ করে করে এসেছিল। তখন তুমি ইস্কুলে। থাকে বেলেঘাটায়। আবার আসবে।

—আবার আসবে? কবে?

উমাশঙ্করী উৎসাহিত হয়ে বললেন, বোধ হয় অক্ষয় তৃতীয়।

আরতি বললে, ঠিক আছে। তখন একবার আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। দেখব কেমন আপনার বোন পো!

আরতির ঠিক এইরকম মেজাজ উমাশঙ্করী কোনো দিন দেখেন নি। তিনি কেমন ভয় পেলেন। আরো ভয় পেলেন এই ভেবে যে, সত্যি সত্যিই বোমা ভৈরবকে অপমান না করে বসে। ইস্তুলে মাঠারী করে এখন যা দেমাক আর মেজাজ হয়েছে—!

আরতিও দিনগুণতে লাগল কবে ভৈরব আসবে। ভাবতে লাগল—সব দিক বাঁচিয়ে কেমন করে ভৈরবকে আঘাত হানবে।

আশ্চর্য! তার এই প্রায় বেয়াল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল—এই লোকটা এ বাড়ীতে তার যৌবনকালের মধ্যে হুঁপাম রটিয়েছে—যে যৌবন আজ প্রায় অন্তিমিত!

আরতি ঠিক করল—হোক ভৈরব তার শাশুড়ির বোন পো। তাকে সে ছেড়ে কথা বলবে না।

বাড়ির সকলেই একটা বিকী গুমোট থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে রইল। ভৈরবকে তো না আসার জন্তে আর লেখা যায় না।

এ বাড়ীতে যেমন অশান্তি লেগেই আছে তেমনি মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও ঘটে। কোনো একটা কিছু উপলক্ষ্য করে মিলনের উৎসব লেগে যায়। যেমন কোনদিন হয়তো ঠিক হল—বাড়িতে রামায়ণ গান হবে। সেদিন প্রত্যেকেই গানের আসরে বসতে হবে। হোলির দিনেও এমনি আবার নিয়ে মাখামাখির ধুম পড়ে যায়। সেদিন দুই জা আর ননদের ভাব দেখলে অবাক হতে হয়।

একবার বাড়ীতে একজন ম্যাজিসিয়ান এসেছিল। সেদিনও ঐ বড়ো ঘরে বাড়িসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে বসে ম্যাজিক উপভোগ করেছিল।

এবার হঠাৎ ঘোষণা করা হল—বাড়িসুদ্ধ সকলের ছবি তোলা হবে। গ্রুপ ফটো।—এ বাড়ীতে এ একটা নতুন ঘটনা ঘটে।

ছবি তুলতে কে না চায়! ছবি তোলার নাম হলেই ছেলেবুড়ো সকলের মনটা একবার চনমন করে ওঠে।

আরতিও একটু ছলে উঠেছিল বটে কিন্তু মনটা একেবারে ভারশূন্য হতে পারল না। কেননা ছবি তোলার দিনটা স্থির হয়েছে ঐ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই।

এ দিন তো ভৈরবের আসার কথা। আর তাকে অভ্যর্থনা করার জন্তে আরতিও প্রস্তুত।

কিন্তু ঠিক তার আগেই এই ছবি তোলার ব্যাপারটা থাকায়, আরতির আশংকা—মনটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। সাজসজ্জা করে (তা যত সামান্যই হোক) একবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার পর আর কি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়?

কিন্তু উপায় নেই। ছবি তুলতেই হল। ক্যামেরা-ম্যান কলকাতা থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন। দামী ক্যামেরা। নিজের খুব হাসিখুশী বিলাসী মানুষ। গ্রুপফটোতো তুললেনই। তা ছাড়া ফ্যামিলি অ্যালবামে রাখার জন্ত দুই বোয়ের ছুটি আলাদা ছবিও তুললেন। তারপর লুচি রসগোল্লা খেয়ে চলে গেলেন।

আরতি ভাড়াভাড়া কাপড় বদলে আবার রোজ্জকার মতো স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ গভীর থমথমে মুখ, দাপিয়ে চলা, অকারণে ভালো-মানুষ বিটাকে ভৎসনা। শাশুড়ি ননদকে জানিয়ে দিতে চাইল—ভৈরবকে অভ্যর্থনা করার জন্ত সে প্রস্তুত।

কিন্তু ভৈরব আসে কই? বিকেল ফুরিয়ে গেল, সন্ধ্যা হল, ভৈরবের দেখা নেই। এর আগে দুপুরবেলা এসেছিল। সেইটেই স্মরণে। কেননা আবার ফিরে যেতে হবে তো। তা হলে?

আরতি মহা ভাবনায় পড়ল—আশাভঙ্গের ভাবনা। ভৈরবকে চ্যালেঞ্জ করাই তো বড়ো কথা নয়, আসলে শাশুড়ি-ননদের সামনে যখন সে তাদের এই প্রিয় আত্মীয়টিকে দুটো কথা শোনাবে তখন তাদের মুখের অবস্থা কি হবে সেটাই উপভোগ্য দৃশ্য। ওঁরা বুঝবেন,

এতদিন যা হয়েছে হয়েছে এখন আর তাদের বউ অনায়াসে মুখ বুজে সহ্য করে না।

কিন্তু ভৈরবের দর্শন মেলে কই? তাকে কি এরা আসতে বারণ করে দিয়েছে?

সকলো উৎরে গেলে আরতি আর চুপ করে থাকতে পারল না। শান্তুড়ির ঘরে গিয়ে দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে হেসে বললে, কই আপনার বোনপো তো এল না (ইচ্ছে করেই এলেন না বলল না)?

উমাশংকরী যেন অবাক হয়ে বললেন, এল না মানে? এল—ছবি তুলল অতগুলো—তুমি লুচি ভেজে যত্ন করে খাওয়ালে—

আরতি স্তম্ভিত।

উমাশংকরী হাসলেন। এই বোধ হয় তাঁর মুখে প্রথম হাসি দেখল আরতি।

বললেন, তোমার সঙ্গে বৃষ্টি আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় নি। ওরও আলাপ করার খুব যে ইচ্ছে ছিল তা নয়। ওর ইচ্ছে ছিল আমাদের সবাইয়ের ছবি তোলে। ছবি তোলা ওর এক নেশা। সেদিন তুমি ছিলে না বলে ছবি তোলে নি।

আরতি আর একটি কথাও বলে নি। নিঃশব্দে চলে এসেছিল।

রাত এখন বোধ হয় দশট। ঘরে এখন কেউ নেই। একজন ও পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে, আর একজন এখনো তাস খেলে ফেরেনি। আরতি আলো নিভিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন অশান্ত মন নিয়ে ছটফট করছিল। এত বড়ো পরাজয় তার যে ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি।

তার চোখের সামনে চল্লিশোত্তর সেই হাসিখুশী সু-পুরুষ মানুষটার মুখখানা ভাসছিল। এই তা হলে ভৈবব! শান্তুড়ির বোনপো! কোনো এক সময়ে এই ভদ্রলোকও যশোরে থাকত। অথচ—আশ্চর্য, ছোটোবেলায় একে সে কখনো দেখেনি?

হঠাৎ আর একটি মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অতি অস্পষ্ট।—কিন্তু সেই অস্পষ্ট কচি মুখের কিছু কিছু এখনো যেন মনে করতে পারে। দুঃসাহসে ভরা সেই উজ্জল দুটি চোখ—

হ্যাঁ, সেদিনও সে তার একটা ছবি তুলতে চেয়েছিল।

গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরতি। ছবি সে তুলেছে। তবে পনেরো বছর বয়েসের সেই কিশোরীর নয়, একচল্লিশ বছরের যৌবনোত্তীর্ণ এক গৃহস্থবধূর।

মুন্নি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অলক সারাক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। কি করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছে না। রাত বাড়ছে। নবীন ও-ঘরে থুট খাট করছে। ওর সবই গরম খাবার স্বভাব। ওর খেতে রাত হয়ে যায়। এখন হয়তো নবীন গ্যাসের উত্তন জেলে মুরগির বোল গরম করছে। রাতে ওর এখনও ভাত খাবার অভ্যাস। রুটি সে একদম পছন্দ করে না। কোনো হোটেলে খেয়ে এলে নবীন সব তার খেয়ে নেয়। এবং কোনো কোনোদিন সে বেশ খেয়ে ফেললে অথবা পা টলতে থাকলে, সামান্য রোষ্ট

এবং চিলিচিকেন খায়। আজ আর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না। ঘরে সামান্য একটা আলোর ডুম জ্বলছে। এবং দেখলে মনে হবে শরীর খারাপ। সাদা চাদরে শরীর ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। ক্ল্যাটটা এয়ার কন্ডিশানড বলে, কখনও কখনও মনে হয় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘরে। তখন কেন জানি তার নির্জনতা আরও বাড়ে। কোনো আত্মীয়স্বজনের মুখ মনে পড়ে যায়। মা কাছে থাকলেও বৃষ্টি এতটা তার খারাপ লাগত না। দেরাহুনে বড়দার কাছে মা আছেন। এমন একটা

একা বাড়িতে মাকে তার কাছে রাখতে বড়না সাহস পান না।

রাস্তায় কিছু ট্রাম বাসের শব্দ। সোফার অনিল গ্যারেজের তালা বন্ধ করছে। অত বড় বাড়িটাতে সে একা, এত একা সে কখনও যেন অনুভব করে নি। মুন্নি নামটা বেশ। এবং এক খেলা ভেতরে এই মুন্নিকে নিয়ে। সারাক্ষণ গাড়িতে সে বোধ হয় কেবল ওর হাত পা এবং জংঘার কথা ভাবছিল। সে বুঝতে পারছিল, গাড়িতে ফেরার মুখে কি কি দেখেছে কিছুই বলতে পারবে না। কেমন আত্মগত ছিল ভেতরে। সোফার বলেছিল, স্যার ক্রাবে!

অলক শুধু বলেছিল, না।

ক্রাব না হলে বাড়ি। এই দুটো জায়গা রাতের মতো তাঁর পছন্দ। সোজা গাড়ি দক্ষিণ কলকাতার বেশ ডিমছাম একটা বাড়িতে ঢুকে গেলে তিনি নেমে যাবেন। গাড়িতে যা পড়ে থাকল, নবীন এসে তুলে নিয়ে যায়। সদর খোলার শব্দ হলেই নবীন সিঁড়ি ধরে নেমে আসে। এবং কখনও এটা নবীনের ভুল হয় না। যেন সে সব সময় কান খাড়া করে রাখে—সামান্য শব্দ সে কি করে যে টের পেয়ে যায়। দোতালার ঘরে নবীন আর বড় সাব, নীচে মাদ্রাজি পরিবার রাখবন থাকে। আর চারপাশে ফুলের চাষ। ফুলের জন্ত কিছুটা সময় দিতে ভালবাসেন সাব। সে নিজেও একবার একটা দামী বোঁগেন ভেলিয়ার কাটিং এনে দিয়েছিল। সাব খুশি হয়ে তার স্থালক সাধুকে তুর্গাপুরে একটা বাংলাবাড়ির কেয়ারটেকারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। বাপেরও বাপ থাকে। সাব তার বড়সাবকে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে সাধুকে গছিয়ে দিয়েছিল।

তখন অলক ডাকল, নবীন।

নবীনের স্বভাব আজ্ঞে হজুর বলা। ডাকলেই আসে না। সে বলবে আজ্ঞে হজুর যাই। এতটা বিনয় অলক পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে সে ধমক দিয়ে বলত, এই হজুর হজুর করেছতো ঘাড় ধরে বের করে দেব।

সে বলত, আর করব না।

পরে আবার ডাকলেই, সেই আজ্ঞে হজুর। বারবার বলেও নিরস্ত করতে পারে নি। এখন আর এ-নিয়ে সে কিছু বলে না। বন্ধু বান্ধবরা এলে সে লজ্জায় পড়ে যায়। অলক বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব সাদাসিঁদে মানুষ ছিল। সে মানুষের মর্যাদা বুঝত। ছোট মানুষকে ছোট বলত না। এখন কেমন দিনকে দিন তার স্বভাব পাণ্টে যাচ্ছে। হজুর শব্দটি তার এখন ভালোই লাগে। এবং এই যে করজোড়ে থাকা সবার এটা তার ভেতরে অহংকার এনে দেয়। সে তখন তার কাজেরকর্মে বেশি দায়ীত্বশীল হয়ে পড়ে।

নবীন সেই আজ্ঞে হজুর বলেই একেবারে দৌড়ে আসে না। কি যে কাজ থাকে হাতে। আসলে আজ্ঞে হজুর বলেই মনটা তিজিয়ে রাখে, কারণ বড় কুড়ে মানুষ নবীন। খুব চিলে স্বভাবের। কোনো কাজ যদি সে চটপট করতে পারে। আর অবাঁক হয়েছে অলক, নবীন কখন খায় এ-বাড়িতে টের পাওয়া যায় না। কিছুতেই অলকের সামনে কিছু খাবে না। একা মানুষ রান্না বান্না সব হয়, কিছুই পড়ে থাকে না। যত বেশি হোক, বাসি পড়ে আছে, কিংবা কোনো তিথিরিকে সে নবীনকে কিছু দিতে কখনও দেখে নি। ওর কাছাকাছি কেউ নেই—কেউ ওর খোঁজে আসে না। কেমন এক একার সংসারে তার লেপটে থাকার স্বভাব হয়ে গেছে। এমন যখন মানুষ নবীন তখন তার সব কিছুই ক্ষমা করা চলে। সে দেহিতে এলেও কিছু বলে না অলক। কেবল মনে হয়, তখন ঠিক কিছু খাচ্ছিল, মুখ মুছে আসতে সময় লেগেছে। অলকের তখন ভারি হাসি পায়। আসলে নবীন সারাদিনই এটা ওটা মুখে পুরে রাখে, খায়, এবং খাবার ভেতরে সে জীবনের সব কিছু পেয়ে গেছে।

অলকের মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে হয়, তোর আর কোনো কষ্ট নেই নবীন।

যেমন অনেকদিন সে মাতাল হয়ে ফিরলে দেখত, নবীন তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সোফাতে গা এলিয়ে দিলে দেখতে পেত, খুব সন্তর্পণে পা থেকে জুতো মোজা খুলে নিচ্ছে। পা দুটো আলতো করে তুলে দিয়ে বলত, হজুর জল দেব!

অলকের তখনই কেমন একজন অতি কাছের নিকট আত্মীয় ভেবে যেন বলা, নবীন, তুই কাউকে ভালবাসিস না? একটা মেয়ে তোর দরকার হয় না।
সুন্দর! জুইফুলের মতো সুন্দর!

নবীন মুখ নীচু করে রাখত। একটা কথা বলত না।

তখন অলক বলত, তাকে আর একটা বিয়ে দেব। খুব সুন্দর হবে, নাকে নথ থাকবে। ডুডে শাড়ি পরে থাকবে। মুখে ঘোমটা। সবটা দেখা যাবে না, কিছুটা দেখা যাবে।

নবীন তবু কিছু বলত না। পায়ের কাছে বসে থাকত। জুতো মোজা খুলে একসময় উঠে যেতে চাইলে খপ করে হাত ধরে বলত, তোর ইচ্ছে হয় না, একটা মেয়ে তোকে ভালবাসুক।

নবীন জানে বাবুর এটা মাতাল অবস্থায় হয়। তখন মনেই হয় না নবীন বাড়ির সামান্য চাকর। প্রায় সময়সী বন্ধুর মতো যেন নবীন, কত যে কথা হজুর মানুষটির, কত যে দুঃখ, ভালবাসার দুঃখ, ভালবাসায় বৃষ্টি বড় দুঃখ থাকে, নবীনের তখন ভারি কষ্ট হয়, সে এই একা মানুষটির জন্ত কোনো সুন্দরী যুবতীর কথা ভেবে থাকে।

অলকের জড়ানো গলা, চোখ লাল, এবং মুখের চারপাশে সব ভেতরের দুঃখ উঁকি মারছে। ওর হাত ছাড়ছে না। হাত না ছাড়লে সে যেতে পারে না।
—আমি যে এ-সব খাই টাই কাউকে বলিস না কিন্তু।

নবীন বলত, আচ্ছ বলব না।

—আমার মা তো আমাকে খুব ভালছেলে জানে।

—হজুর একটা বিয়ে দিয়ে দি আপনার।

—তোর হাতে মেয়ে আছে।

—আছে।

নবীন খুব বিচক্ষণের মতো বলত, ইয়া আছে। এবং যেহেতু নবীন জানে সকালে আবার এই সাহেব মানুষটি রাশ ভারি, গম্ভীর। সংসারে কি হচ্ছে, কি খাবে কিছু জানেন না। আদৌ যেন সাব মানুষটি সংসারের একেবারেই মানুষ নন। এবং খুব ত্বরিতে কাজকর্ম করে

নেবার স্বভাব। বাথরুম সেভিং স্নান সেরে এসেই সামনে চা, ডিমভাজা, টোস্ট চাই। ইংরেজি পত্রিকায় বুকে কিছুক্ষণ বসে থাকা। ইতিমধ্যে গাড়ি ধোয়া-মোছার জন্ত অনিল চলে আসে। গ্যারেজের চাবি নিয়ে সে চলে গেলে নবীনের তখন এক দণ্ড দাঁড়াবার সময় থাকে না। গতরাতের বাবুর জীবনে সামান্য হাহাকার ছিল। সকালের সূর্য উঠলে আর তা বিশ্বাসই করা যায় না। সুতরাং নবীন যা খুশি রাতে বলে ফেলতে পারে।

—আমার সঙ্গে মানাবে তো।

—খুউব।

—আমাকে খুব ভালবাসবে তো।

—খুউব।

—আমি ওকে ভালবাসব, চুমু খাব, তারপর যে কি করব না....

নবীনের বলার ইচ্ছে হয় বাবু কি যে করবেন বুঝি, কিছু না করলে ভালবাসা থেকে না। তারপরই বলার ইচ্ছে, বাথরুমে সব দিয়ে দিয়েছি। রাত কত হল হজুর! বোঝেন না। কিন্তু সে বললেই ছাড়ছে কে। তাকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যতক্ষণ নিজেকে থেকে ছেড়ে না দেবে সে কিছু করতে পারে না। অথচ আজ এই রাতে নবীন দেখছে, বাবু কিছু খায় নি, চুপচাপ এসেই হাত মুখ ধুয়ে একটা সাদা চাদর টেনে শুয়ে পড়েছে। বলছে, শরীরটা ভাল নেই নবীন। কিছু খাব না।

কিছু না খেলে সে জোরজোর করতে পারে না।

জোরজোর করার সাহসও নেই। যাবার সময় শুধু সে শুনতে পেল, পাশের সুইচটা টিপে দে।

পাশের সুইচটা টিপে দিলেই নীলাভ আলো জলে ওঠে। সে হজুরের শরীরে একটা পাতলা লাল কবল টেনে দেয়। টুলির মতো খোপ খোপ বইয়ের র‍্যাকটা সে শিয়রের কাছে টেনে দিয়ে যায়, এবং শ্রে করে দেয় একরকমের সাদা ফেনা। সন্ধ্যার এক গন্ধের ভেতর মানুষটা তখন ডুবে যায়। তাহলে সে বের হয়ে গেলে তার হজুর মানুষটি কি করে সে জানে না। তারপর তার

অফুরন্ত ছুটি। পাশের ঘরে মেঝেতে সেও দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লে করিডোরে থাকে মাত্র একটা হলুদ আলো। কার্পেটের ওপর শুধু সারা রাত তখন আলোটা জ্বলতে থাকে। কোনো শব্দ শোনা যায় না। কেমন নিঝুম হয়ে যায়। আরশোলা, হেঁটে বেড়ালে পর্যন্ত সে টের পায় ওরা এখন নেমে আসছে। এবং কি যে হয়, সে বেশি সময় জেগে থাকতে পারে না। শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে যায়। তখন হজুর মানুষটি কি করছে সে বুঝতে পারে না।

এবং হজুর মানুষটির ঘুম আসছিল না। পাশ ফিরে শুলে তার স্টেনো ইল্ড্রানীকে মনে পড়ে গেল। মেয়েদের একটা মেসে থাকে। ওর করিডোরে ফোন থাকে এবং দরকার মতো তার কাজ পড়ে যায় বলে ইদানিং সে ইল্ড্রানীর ঘরের ভেতরে একটা ফোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ইল্ড্রানীর সঙ্গে কথা বললে, শরীরের দুঃখটা কমে যাবে ভেবে ডায়ালে হাত রাখতেই মনে হল, মুন্নি ওর মাথার ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য ভঙ্গীতে পা ভাঁজ করে হাতে সেইসব মুদ্রা নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা ওর মগজে কি যে সব ছায়া ফেলে যাচ্ছে। যেন হাত দিলেই ওর স্তনে এবং নাভিমূলে হাত রাখতে পারে। সে আর পারছে না বলে উঠে বসল। কোথাও পেটা ঘণ্টার শব্দ, দেয়ালে কালো অক্ষরে সব লেখার ভেতর ঘণ্টার কাটা নড়ছে। রাত বাড়ছিল। এবং শরীরে দুঃখ জমা হলে সে ইল্ড্রানীকে ফোন করত। ফোনে ভালবাসা টাকার কথা বলত। ঘরে নিয়ে আসত। এভাবে একসঙ্গে খেয়েছে, থেকেকেছে। নবীনকে বিকেলে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। একা বাড়িতে, ইল্ড্রানী এবং সে। এবং দুঃখ নিবারণ হলে ইল্ড্রানীকে কেমন ছাপোষা একঘেয়ে রমণী মনে হয়েছে। ইল্ড্রানীকে সে সংগোপনে খুশিমতো এ-ভাবে ব্যবহার করে আসছে। ছ'মাসেই মেয়েটা তার হয়ে গেছিল। আগের বস্নায়ায় ইল্ড্রানী সম্পর্কে একটা ভাল সার্টিফিকেট দিয়ে গেছিল। বুঝে নিতে অলকের বেশি সময় লাগেনি।

ও-পাশে ফোন বাজছে। কেউ ধরছে না। ইল্ড্রানী কি তবে অল্প কোথাও রাত কাটাচ্ছে! দুঃখ নিবারণের

সময় ওতো খুব পবিত্র টবিত্র কথা বলে থাকে। ইল্ড্রানী বলেছে—সে তাকে খুব ভালবাসে। সব দিয়েছে শুধু ওর ওপর বিশ্বাস আছে বলে। বিশ্বাস কথাটা ভাবলেই তার হাসি পায়। কেউ ফোন ধরল না যখন রেখে দেওয়া ভাল। এবং মুখটা সামান্য তিক্ততায় বেকে যাচ্ছিল। লাইনের মেয়ে হয়ে গেল ইল্ড্রানী। কেমন একটা অধিকারবোধের উপর ভীত আঘাতে সে ভেতরে খান খান হয়ে যাচ্ছিল। আগামী কাল বলা দরকার—কে সে! কার কাছে আবার নতুন করে পবিত্র টবিত্র হতে চাইছে। আর তখনই বাজখাই গলা—যতসব! কেউ ফোন তুলে বলছে হ্যালো এবং পুরুষের গলা। সে খতমত খেয়ে বলল, প্লিজ একস্কিউজ মি। রঙ নাশ্বার। এবং কেমন সংশয়, আর সেই যে মেয়েটা মগজের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে, পা তুলে ঘুরে ঘুরে আগে পেছনে ঘুরে ঘুরে, কখনও হাত তুলে এবং শাড়ি সায়া অন্তর্বাস একে একে বসে পড়ছিল, মুন্নি উলঙ্গ হয়ে নাচছে—সে বলল, হ্যালো, হ্যালো, কি ব্যাপার? ঘুমোচ্ছিলে নাকি—আগে রঙ নাশ্বার হয়ে গেল। ঘুমের গলা বোঝা যাচ্ছে। হাই তুলছে—কি ব্যাপার সাব!

—কি করছ।

—কি করব। ঘুমোচ্ছি।

—চলে এস না।

—মাথা খারাপ।

—আমি যাব?

—মাথা খারাপ।

—তবে কি করব?

—শুয়ে থাকুন।

—তুমি নাচতে পার ইল্ড্রানী?

—নাচতে পারি মানে?

—নাচতে পার মানে, নাচতে জানো কি না!

খুক খুক করে হাসি পাচ্ছিল ইল্ড্রানীর। সে হাসল না। শুধু বলল, কেমন পারি আপনিতো ভালই জানেন।

—ধূল! তুমি কিছু পার না। কি মেয়ে তুমি!

তারপরই মনে পড়ার মতো বলল, ফাংশানে যাওনি কেন?

—আমাকে দরকার ছিল।

অলোকের তখন কিছু বলার থাকে না। এবং কেন যে মনে হয় সে বাড়াবাড়ি করছে। অফিসে স্বাভাবিক ভাবেই কাজপাগলা মানুষ, এবং ফোনে সে যতটা সহজ ভাবে কথা বলতে পারে, অফিসে ইসলামীর সঙ্গে ততটা সহজে কথা বলতে পারে না। সারা শরীরে আশ্চর্য দান্তিকতা এসে ভিড় করে। সে তখন একেবারে বাস্তব সাব। এমন কি হু একবার লঘু হতে চাইলেও মনে হয় ঠিক না। কখনও কখনও, ইসলামীর লঘু শরীর, এবং উচু করে খোঁপা বাঁধা আর কাছাকাছি এলে যা হয়, শরীরের সব সে কিভাবে যে দেখতে পায়, তারি অসহায় বোধ করলে সে সব শেষ বেলায় আর পারে না। একটা ঠিকানা রেখে বলে, দেখা করবে। একসঙ্গে যাব।

ইসলামী বলল, কি চুপ কেন?

—না এমনি। ঘুম আসছে না।

—আপনি গেছিলেন।

—হুঁ।

—মেয়েটা কেমন নাচল?

—একদম বাজে।

—ঘুম আসছে না কেন?

—কি জানি। বলে হাই তুলল অলক। তারপর সহসা ফোন রেখে দিয়ে বলল, ঘুম শালা, তোমার কোনো ইজ্জত নেই। একটা ডেসপাচ ক্লার্কের মেয়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে ছ্যাঃ এবং সে এই বলে পাশ ফিরে শুলে। কে ঘুমোবে। তবু মানুষের কি যে থাকে—ভেতরে সেই জ্বালা সহসা পাগল করে দেয়—অলক সারারাত ঘুমোতে পারল না। বাথরুমে সে বার বার মাথায় ঠাণ্ডাজল এবং ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে শেষ রাতে সামান্য ঘুমোতে শেরেছিল—আর আশ্চর্য অবাক সেই ঘুমের ঘোরেও এক আশ্চর্য নীল রঙের স্বপ্ন দেখেছিল—মুন্নি তার মগজের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে। মগজটা সমুদ্রের মতো লাগছিল দেখতে। মুন্নি তার ওপর হাক পায় কেবল নাচছে

কেমন আছেন?

প্রবীর বিশ্বাস

অপরোধের মধ্যে শুধু বলেছি,

: দাদা কেমন আছেন?

কথাটা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করল কি করল না, দাদা অমনি জ্যা ছেঁড়া ধনুকের মত ছটাং করে ছিটকে উঠলেন।

: আপনে আমারে ইন্সল্ট করেন আপনার আস-পরদা তো কম না! জানেন আমার নাম...বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইয়া চাড়ছি।...আপনেরে আমি ছাড়ুম না—ছাড়ুম না। দৈইখ্যা নিয়ু!

দাদা যত না বলছেন তারচে বেশী চলেছে হস্ত সঞ্চালন ও উল্লেখন! দেখে শুনে প্রায় ভাবাচাকা খাওয়ার মত। তবুও আমতা আমতা করে বলি,

: আমি আপনাকে অপমান করব কেন?

: হুঁ। ধনুপুস্তুর যুধিষ্ঠির আইলেন ঢাকচি। জুতা মাইর্যা গরু দান! ক্যান করবেন সেডা আপনে জানেন, কিন্তুক করলেন যে হেইডা আমি ভালো বুজি।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি,

: আমি আপনাকে অপমান করেছি?

: ইয়ারে অপমান করা কয় না তো ভদ্রলোকেরে আবার কেমন কইর্যা অপমান করবেন শুনি, থাপড় দিবেন, না, কানমলা দিবেন?

ভদ্রলোকের চৈচামেচিতে আশেপাশে লোক জমা হতে শুরু করেছে। একে শ্রায় বাজারের মাধ্যমখান তায় সকাল সাতটার মধ্যে। অফিসার (যারা অফিস

করেন) বাবুতে ঠান। সকলেই তাকাচ্ছেন আমার দিকে। খুবই বিব্রত বোধ করছি। মনে মনে ভাবি, :সাত সকালে এ কোন গেরোরে, বাবা! দিনটা কেমন যাবে কে জানে!

ভদ্রলোক যেমন গলার স্বর তুলেছেন প্রায় তার কাছাকাছি স্বর তুলে রললাম,

: ছি ছি! মুখুজ্জেশমশাই! আপনাকে আমি অপমান করতে যাবো কেন? আর—“কেমন আছেন” জিজ্ঞাসা করার মধ্যে অপমানের সম্পর্কটা কোথায় বুঝতে পারছি না।

মুখুজ্জেশমশাই ঠিক তেমনি বুঝে ভেংচিকেটে বললেন,

: তা বুঝতে পারলি তো গরিবীর উপকার হয়।

আপনেরা সব গরিবী হটাইতে আছেন তো,—

ধান ভানতে শবের গীত আরম্ভ হয়েছে। কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, আমার সপক্ষে,

: আপনে ক্ষম্যামাশা রাগ করেন ক্যান মুখুজ্জেশমশাই! উনি শুকু আপনেরে জিগাইচেন, ক্যামন আছেন? ক্যামন আছেন জিগানো কি পাপ?

: হ পাপ। ইঃ। শুড়ীর সাথী মাতাল আইলেন ঢাকচি—হাতের প্রায় শূন্য বাজারের থলিটা জোর করে মাথার উপরে তুলে মুখুজ্জেশমশাই প্রায় নৃত্য শুরু করে দিলেন।

: “আমি ওনারে ভাল কইরা চিনি, উনি আমার অবস্থা ভাল কইরা জানেন, জাইনা শুইনা বিজ্ঞপ করনই ওনার কাম। ছাখেন না খবরের কাগজে উনি ক্যামনে কাটুন অঁকেন, বলে মুখুজ্জেশমশাই এমন একটা ভঙ্গী করলেন, উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। মুখুজ্জেশমশাই সে দিকে ভ্রক্ষেপ না করে বলে চলেছেন,

: উনি আমারে ঢাকচেন। সেই সকালে আইন্তা আমি একবার মাছের দিকে চাই আর একবার মেছুনিরে দেখি আর একবার পকেট টিপ্যা টিপ্যা পয়সা গুনি—হালায় ইউন ইউন তিত পুঁটি কয় কিনা নয় টাং—আর হালায় কই—কাতল তো খাওনের কথাই ওঠে না, পোলাপানের মত বুক কইর্যা আদর করণ লাগে! ঘরে জামাই আইলে শগুর হালায় লাইনে গলা দিবার পারলো বাঁচা যায়! উনি ঢাকচেন—আমি সি সকাল থিকা গরুরোয়ের মত একবার ইদিক থিক্যা উদিক যাই আবার পকেটে হাত বুলাইয়া উদিক যাই। চালওলাবে একবার দেখি, চালগুলানে হাত বুলাইয়া লই। চাল

সিদ্ধকইরা প্যাটে দিবার কথা ভুইল্যা যাই! এ সকলেই ঢাকচেন, বাঁড়ীতে যাইয়াও ঢাকবেন, এই সকালেই গিন্নী বসছেন ঘরের আটার পিণ্ডি চটকাইতে।

আমার পক্ষধারী ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন,

: এডা কি আপনের একলার কথা মুখুজ্জেশমশাই! আমাগোর সকলের দশাই তো হেই!

মুখুজ্জেশমশাইর গলার স্বর একটু যেন নরম হয়েছে। বললেন,

: হ। বুঝলাম ম্যান! কিন্তুক সেই সকাল-থেইকা বাজারে অ্যাইসা এছাখেন আলু-কুমড়া-ভেণ্ডি করলা মিলাইয়া আড়াইশ গেরাম নিছি,—হালায় সব গুলানের তো একই দাম। গিন্নীকিলেইবনা আমারে? কিন্তুকন তো কি করি? আমার কি ছাপাখানা আছে যে নোট গুলো ছাপ্যা ছাপ্যা দিমু। আর উনি মস-করা করেন, “কেমন আছেন।” বাজারে আইন্তা সওদা করতি পরিনা। ঘরে গিয়া চা খাইতে পারিনা। চিনি নাই—দুধ নাই—হামান্দিস্তার গুড়া দুধ তাও হালায় জোটাবার পারিনা। রাতে ঘরে যাইয়া ছাখেন এক ফোটা আলো নাই। ঘোর, অমাবস্তা ম্যান ছাইয়া আছে। ক্যামন আছেন জিগানো মানে ত এই গুলান দগদগাইয়া ওঠে। ইয়েরে কি অপমান কয় না! তাই আমি ক্ষেপচি! ওনারে দেইখ্যা ছাড়ুম। কাটুন অঁকেন!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুবই নরম স্বরে হাতজোড় করে বলি।

: আমাকে মাক করবেন মুখুজ্জেশমশাই। আপনাকে কোন রকম ব্যথা দিতে চাইনি। আমার খুবই অন্যায় হয়েছে আর কখনো বলব না “কেমন আছেন”

মুখুজ্জেশমশাই সরল লোক। একেবারে রাগ রহিত হয়ে ফোকলা দাঁতে হাসির প্রাবন এনে আমার হাত ছুটি জড়িয়ে ধরে বললেন,

: সত্যই ক্যামন আছেন জিগানো, ঠিক না। অহন জিগাইবেন অহনও যান নাই?

: ঠিক বলেছেন!

সকলে আমরা হাসতে হাসতে সায় দিই। প্রায় শূন্য বাজারের থলিটা দোলাতে দোলাতে মুখুজ্জেশমশাই এবাউটটার্ন করে বললেন: বাজার দেইখ্যা গিন্নী অহন না কিলয়। ঘরের পিণ্ডি ভুইল্যা, ভুইল্যা কজির জোর বাড়ছে তো!

(১০ পৃষ্ঠার পর.)

লাগান হত। কিন্তু তা' হয়নি, হ'চ্ছেনা এবং হবেও না। দেশবিভাগের পর শতকরা আশীভাগ পাটচাষ-
জমি পূর্ব পাকিস্থানে চলে যায়। অথচ অবিভক্ত
বাংলার পাটকলের মোট সংখ্যার আশীভাগই রয়ে
যায় গঙ্গার দুই তীরে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনে পাটজাত
দ্রব্যের স্থান সবার ওপরে। ভারতসরকার তাই পশ্চিম-
বঙ্গের ধানের ক্ষেতে পাট বুনতে আদেশ করলেন।
এরপর থেকে শুরু হ'ল খাদ্য-ঘাটতি, যার জের এখনো
চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। আজ ১৯৭৪-৭৫ এ
রবিশস্তের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের
খাদ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের অধিবাসীদের ক্ষুধার অন্ত জোগাড়
করতে দিল্লী দরবার করতে হবে (সম্প্রতি কেন্দ্রীয়
খাদ্যমন্ত্রী সে আশা নস্টাংকরে দিয়েছেন)।

প্রসঙ্গত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কয়েকটি অনুশাসনের
কথা এসে যায়। সংবিধান অনুযায়ী রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা
ও অর্থমন্ত্রকগুলি চাড়া অস্ত্র কোন মন্ত্রকের সোজাসুজি
কোন পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব নেই। যা কিছু
দায় তা' রাজ্যসরকারগুলির। ভারতের মত বিশাল,
বহুভাষী ও বিচিত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন একটি দেশের পক্ষে
গণতন্ত্রের মাধ্যমে ঐকিক শাসনতন্ত্র ঠিক প্রযোজ্য কি না,
এ চিন্তা আজ অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে। এরূপ
শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা দেখা
দেয় আর্থিক ব্যাপারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,
ভারতের রাজস্ব বাবদ মোট আয়ের শতকরা ৩০ভাগের
জোগানদার পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু কেন্দ্র থেকে ব্যয়-বরাদ্দ
বাবদ এরান্ত্র্য পায় মাত্র ৯শতাংশ। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
কর্মসংস্থান প্রভৃতি রাজ্যসরকারের দায়িত্ব। কেন্দ্রের
সাপোর্ট পূর্ণ করতে রাজ্যকে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে
তার ধানের জমি ছেড়ে দিয়ে, যার ফলে রাজ্যে খাদ্য
ঘাটতি সমানে চলেছে, (এবং এ বাবদে শুধু অর্থনৈতিক
নয়, বহু জটিল রাজনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে),
কিন্তু, যেহেতু সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে
রাজস্বের ৯ শতাংশের বেশী হওয়া উচিত নয়, সে হেতু
প্রতিবাদও করার উপায় নেই।

শিল্পক্ষেত্রেও দেখি, গত বিশ বছর থেকে পশ্চিম-
বঙ্গ তার গৌরবের আসন থেকে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে।
এই ক্রমাগত অধঃপতনের মূল কারণ, দেশকে সমভাবে
গড়তে গিয়ে সমস্তাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের প্রতি (তার
বিশেষ কতগুলি স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) ভারত-
সরকার বিশেষ নজর দেন নি। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের
যে বিমাতৃ-সুলভ ব্যবহারের কথা আমরা বলে থাকি
তা' নিছক বিদ্রোহমূলক নয়। কিন্তু একথাও যেমন
আংশিক সত্য, তেমন শিল্পক্ষেত্রে দৈন্যবস্থার এটিই
একমাত্র কারণ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির ধরণ লক্ষ্য করলে দেখা
যাবে, এ রাজ্য মূলত তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ও
সমৃদ্ধিলাভ করেছিল—পাট, চা ও ইঞ্জিনিয়ারিং। এই
শিল্পগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং অল্প নতুন ধরনের
শিল্প গঠনের জন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্র
এই রাজ্যকে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন, তা
মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের জন্য মিলিত বরাদ্দের প্রায় সমান।
কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ হাতে পেয়ে রাজ্যের বেশীর
ভাগ শিল্পপতিরা বিদেশী মালিকানাধীন পুরোনো
জরাজীর্ণ পাটকল, চা বাগান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা
কিন্তে উঠেপড়ে লাগলেন। ফলে না হ'ল কোন
নতুন শিল্পসৃষ্টি না কোন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
অথচ এই একই সময়ে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট প্রভৃতি
রাজ্যগুলি বরাদ্দের টাকায় তাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির
আধুনিকীকরণ তো করলই, উপরন্তু আরো নতুন শিল্প
গড়ে তুললো। যার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে এ রাজ্যগুলি
গেল এগিয়ে, আর পশ্চিমবঙ্গ তার পিছনে পড়ে
রইল।

শিল্পের একে এই জরাজীর্ণ হাল, তার ওপর
১৯৭০-৭১ এ রাজ্যে রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং ১৯৭৩-৭৪
এর মুদ্রাস্ফীতির ঝড়োঘাত পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পক্ষেত্রে
ধরাশায়ী করেছে।

কৃষিক্ষেত্রের কথায় কিরে এসে বলি, পাটচাষের জমি
ছেড়েও, ধানের জমি বা আছে, তাই যদি আধুনিক
যন্ত্র, উপযুক্ত সেচ, সার, ও উন্নত ধরনের বীজের

ব্যবস্থা করে চাষ করা হত, তবে খাদ্যসমৃদ্ধ একেবারে দূর না হলেও, অনেকখানি স্বনির্ভরতা আসত। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সরকার চাষীকে সাহায্য বা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। অথচ, পাঞ্জাবের দিকে চেয়ে দেখুন, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার, উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা ও আধুনিক ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ করে রাজ্যটি আজ বহু বছর যাবৎ একটি উদ্বৃত্ত রাজ্য হয়েছে, এবং সমগ্র ভারতে গমের প্রধান যোগানদার এখন পাঞ্জাব রাজ্য।

আমরা জেনে আশ্চর্য হয়েছি যে, পঞ্চম পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড কৃষির উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। একদিকে এটা যেমন আশার কথা, অত্ৰদিকে এটাও আমরা লক্ষ্য রাখব যাতে রাজ্যসরকার তার প্রাকৃতিক, আর্থিক ও শ্রমিক সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন। কিন্তু কৃষি উৎপাদন শুধু বাড়ালেই হবে না, লেভী সংগ্রহের ব্যাপারেও রাজ্যসরকারকে কঠোর হতে হবে। ১৯৭৪-৭৫এ রাজ্যসরকারের নির্ধারিত ৫ লক্ষ টন ধান লেভী করার কথা ছিল। কিন্তু সংগৃহীত ধানের পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের বেশী হয়নি। অভিযোগ করা হয়ে থাকে, জোতদারের ব্যক্তিগত স্বার্থে ও কোন-কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষার্থে লেভীর ধান সংগ্রহ ঠিকমত হয়নি। রাজ্যের খাদ্য সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রতি যে মনোভাব দেখিয়ে গেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকারকে লেভীর ধান সংগ্রহের ব্যাপারে আরো কাঠার হতে হবে।

কিন্তু কৃষি ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলাকে যদি তার নৃপ্ত গৌরব ফিরে পেতে হয় তবে নতুন নতুন মাঝারি ও হালকা ধরনের শিল্প কারখানা গড়ার সুযোগ দিতে হবে। আর এই সঙ্গে অসুস্থ ভারী শিল্পকারখানা গুলিকে প্রয়োজন হলে জাতীয়করণ করে, টেলে সাজাতে হবে। এগুলিকে কোনমতেই আর অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ এইসব ভারীশিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার ছোট/ছোট কারখানা বেঁচে থাকে, যেখানে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বেশী সুযোগ।

আর রাজ্যের বেকার যুবকদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে অথবা একক প্রচেষ্টায় তৈরী পরিকল্পনাকে শুধু উৎসাহ নয় বাস্তব সাহায্য করতে হবে। এদিকে মহারাষ্ট্র রাজ্য শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (SICOM) ভাবে যে উত্তম নতুন শিল্পগঠনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছেন তার প্রশংসা করতে হয়। টালাও ঋণ দান, জল, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করেই তাঁরা দায়িত্ব শেষ করছেন না উপরন্তু নতুন শিল্পকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিক্রয়করের হাত থেকে রেহাই দিচ্ছেন। এর ফলে, নাগপুর আওরঙ্গাবাদ, জলগাঁও, রত্নগিরি, তারাপুর প্রভৃতি জায়গায় আজ শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে ও উঠছে। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে যে সব ঋণদানকারী সংস্থা আছে তাঁদের অনুহত নীতি ও ব্যবহার নৈরাশ্রজনক। নতুন শিল্পের জন্য যে কোন ঋণের আবেদন বা অন্ত কোন সাহায্য প্রার্থনা করলে, সেই আবেদন বা প্রার্থনা কেন নাকচ হবে না এই ধরনের “শো-কড” নোটিশ যেন তারা আগে থেকেই ঝুলিয়ে রাখেন। ফলে নতুন শিল্পোদ্যমীদের উৎসাহে ক্রমেই ভাঁটা পড়ছে। সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে, একটা অভিযোগ আমরা প্রায়ই শুনি যে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে বলে কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি হচ্ছে না। অভিযোগটা সর্বব না হলেও সত্য। কিন্তু শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের অবনতির এটাই শেষ কথা নয়। কারণ ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ রাজ্য হিসেবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা়ার সবিশেষ বদনাম আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটো রাজ্যই আজ সবচেয়ে স্বচ্ছল এবং মাথাপিছু আয় সারাভারতের মধ্যে এ দুটি রাজ্যই সবচেয়ে বেশী। অবশ্য দুর্নীতির প্রশ্রয় যেমন কোনমতে উচিত নয়, তেমনি একথাও আমাদের ভাবতে হবে যে, নীতিজ্ঞানরহিত অথচ স্বদক্ষ এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন শাসকই আমরা চাইব, না সং-নীতি জ্ঞানসম্পন্ন অথচ নিষ্কর্মা, বাস্তব বুদ্ধিহীন, নীরেট প্রশাসকই আমাদের আমাদের কাম্য। এখন বিচার্য ভাল ও মন্দের মধ্যে নয়, মন্দ আরো মন্দের মধ্যে।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

গড়িয়ে পড়েছে— নানাধরণের চিন্তায়, বিশ্লেষণে বিবরণে। একটিকে পাই বিদগ্ধ সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যেমন সাহিত্যিক, রূপ ও রস, আধুনিকী, শিল্পকথা, শিক্ষা ও দীক্ষা, নববিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান কবির্মণীষী, রবীন্দ্রনাথ, তার সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের ব্যঞ্জনাময় রহস্তে চমৎকার বিবরণ পূর্ণযোগে দেবজন্মে ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালায়, চেতনার অবতরণে, আলোর পথে, ঐশ্বরের বর্ণনায়, সাধকের কথায় প্রভৃতি পুস্তকে এবং নানা প্রবন্ধে ও অনুবাদে যা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন লেখায় যেমন বর্তিকায়, শ্বষন্তে Advent, Sri Aurobindo Annual প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ লেখক হিসাবেও তিনি কীর্তিমান। সম্প্রতি তাঁর ইংরাজীতে TLE Collected Works বেরিয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখাগুলি। বর্তমান সমস্তা ও তার সমাধান নিয়েও তাঁর লেখা কম নয়—কোথায় বোলশেভিকী, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান, নীটশের বাণী, স্বরাজের পথে, স্বরাজ গঠনের ধারা, ভারত রহস্য, বাংলার প্রাণ, নারীর কথা, ভাবী সমাজ, মৃতের কথোপকথন (অনুবাদ) প্রভৃতি পুস্তকে। আশ্চর্য্য একটি ঐতিহাসিক ও অধ্যাত্মিক সত্য মিশে আছে এই শেষের পুস্তকটিতে যেটির মূলে ভাব শ্রীঅরবিন্দের। এই ছোট্ট গ্রন্থটিতে ভেড় জমিয়েছে শুধু সাবিত্রী দ্রৌপদী নয় বঙ্কিমের শান্তি স্বর্ষমুখী কপালকুণ্ডলাও। আবার আসরে বসেছেন, বিচার করেছেন গৌতমবুদ্ধ, লাওৎস এবং কন-ফুসে, আকবর, আওরঙ্গজেব, শিবাজী, জয়সিংহ। বুদ্ধ যখন জিজ্ঞাসা করছেন লাওৎসকে—তোমার মনে হচ্ছে সবই স্তম্ভ, সবই আনন্দ—রোগ, জরা, মৃত্যু কি বড় স্তম্ভ, খুব আনন্দের জিনিষ? যার রোগ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা কর। মৃত্যু শয্যায় যে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর—ভুক্তভোগী কি বলে জান? কবির খোসা চোলা সত্যের পরিচয় দিতে পারে না। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে জীবনের শেষ নয়, জীবনের সমগ্রতা যেখানে সেইখানেই পূর্ণসত্য। জীবনের কোন সম্বন্ধই বন্ধনের নয়, যদি সকল সম্বন্ধের মধ্যে যে

রয়েছে বৃহত্তর সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধাতীত সম্বন্ধের খোঁজ পাই। জীবনের একান্ত ভিতরেও নয়, একান্ত বাহিরেও নয়—মানুষের সমস্তা এ দুটির মধ্যে যুগপৎ লীলাখেলা। লাওৎসএর এইমত স্তম্ভরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন নলিনীকান্ত শ্রীঅরবিন্দের অনুসরণে।

সাহিত্য সমীক্ষক নলিনীকান্তের, রবীন্দ্রনাথ ও কবি মনীষী সমধিক প্রচলিত। আরো আগেকার 'সাহিত্যিক' বাংলার প্রাণ, শিল্পকথা প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে যে কাব্য ও তত্ত্বের বিচারে তিনি তার অগ্রজবন্ধু অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মতই প্রসিদ্ধ। চলতি ভাষার ও সাধু ভাষার (অনুবৃত্তি) নানা নিদর্শন তিনি দিয়েছেন—সবুজপত্র গোষ্ঠীর একজন তরুণ লেখক হিসেবে তাঁর তখন প্রতিপত্তি। ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় কল্প রসের বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, যে উদাহরণটি তিনি দিয়েছিলেন সেটি আজও মনে আছে রবীন্দ্রনাথের—

আমার সকল কাঁটা ধ্বংস করে ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
একে কোন এক কবি রূপান্তরিত করেছিলেন—

সকল কণ্টক সার্থক কবিতা কুসুমমণ্ডক ফুটিবে
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।
প্রথমটিতে 'ধ্বংস' সহজ সরল ভাব, আর দ্বিতীয়টিতে কৃত্রিমতা, আড়ম্বর ও আড়ম্বর্তা।

এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথাই তুলে দিচ্ছি—
প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন কয়েকটি মানুষের সমষ্টি। বিশেষতঃ যারা লোকান্তর পুরুষ তাঁদের চেতনা বহু-তর পুরুষের চেতনা সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারামিলে কি অপকৃপা অভিনব এক্যতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্র প্রতিভা। নলিনীকান্তের নিজের সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রযুক্ত। আজকালকার বহু বিদগ্ধ গুণীদের মতে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে দৈশ্বরানুভূতির স্তর থেকে উত্তরিত হয়েছেন এক ট্রাজিক উপলব্ধিতে। জানিনা এ মত কতদূর ওকসহ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখরে হইতো ওঠেননি কিন্তু তাঁর উপলব্ধি ইষ্ট হচ্ছে "সমবন্ধ"। নলিনীকান্তের ভাষায় 'হে অনির্বচনীয় সত্য রহিয়াছে

সর্বত্র সমানভাবে সর্বত্র খদিলং ব্রহ্ম, স্বথে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, জীবনে মৃত্যুতে, স্বর্গে মর্ত্যে, এ লোকে ঐ লোকে এবং যাহার সৌন্দর্যের আভায় অতি কুৎসিত ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়—যসাত্তাসা সর্বমিদং বিভাতি। রবীন্দ্র চেতনায় শেষের যুগে 'sea change' হয়তো আছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে qualitative নয়, quantitative. সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ যুগযন্ত্রণায় ঐক্য পবিত্রীকৃত হয়ে শেষের যুগে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকের পথে এগিয়েছিলেন। মনে পড়ছে একদিন একদল রব তুলেছিল যে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আধুনিক নন, তিনি সনাতনপন্থী, বেদবেদান্ত উপনিষদ আওড়ান, শাস্তিনিকেতনের বেদীতে বসে উপাসনাচ্ছলে উপদেশ দেন। তিনি 'পোশাকী' কবি, আটপৌরে নন—তার বাসাংসি জীর্ণানি নয়। মনে পড়ছে একটি পরমসত্যের চরম অনুলেখন—What is Art? It is the response of a Man's creative soul to the call of the Real. And from the beginning of our History, we are seeking value and not success. Man may die that Man may live.

রবীন্দ্রনাথের অন্তরপুরুষ যে কোনদিনই নাস্তিক্যবাদী নয়, একথা নলিনীকান্ত গুপ্ত বিশেষভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনদেবতা বিষপান করেন, বিষ কাটাবেন বলে, সর্বস্বত্বত্বারে যিনি ক্রোধদাহে উত্তীর্ণ হন তাঁর ব্রাত্যদেবতা মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারায়, কিন্তু ফিরে পায় দেশবিদেশের সীমানা পেরিয়ে, ভেদচিহ্নের তিলকপরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে। তারপর এক অদ্ভুত জীবন প্রত্যয়ের ধ্বনিতে, কবির কণ্ঠে উৎসারিত হয় মন্ত্রের মত,

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।

সে অমৃত অমরতা না হতে পারে কিন্তু অসীমতার দ্যোতক। রক্তের অক্ষরে অক্ষরে এ মাটির পৃথিবীকে চিনে তিনি মধুমং পার্থিব রজঃ এর সন্ধান পেলেন 'মধু দৌ রক্ত নঃ পিতার' মহামনে। এই কবি আন্তিক্যবাদী না

নাস্তিক্যবাদী, শুধু যুগযন্ত্রণায় বিশ্বাসী পান্ডুরনের সখা না আরো উর্ধ্বে স্বধঃখের অতীত এক স্তরে সমাসীন আত্মোপলব্ধির মহিমায়, নিরাসক্ত ধ্যানের আসনে, সেকথা শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্তের মত অন্তর্জীন সমালোচকই বুঝিয়ে দিতে পারেন, আমরা শুধু জানি যে রক্তসূত্রে বাঁধা মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত আর

প্রভাত আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ

পুরাতন তপস্বীর

ধ্যানের আসন

কল্প-আরন্তের

অন্তহীন প্রথম মুহূর্ত খানি

প্রকাশ করিল মোর কাছে।

এই কবিই তাই নিঃসংশয়িত চিন্তে বলতে পারেন, বন্ধনপীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে

আমি আছি, তুমি আছ

সত্য আছে স্থির।

আত্মার বন্ধনহীন গান তিনি শোনে—গভীরত্রে ডুবে যান সত্যিকার কবির (বৈদিক অর্থে) অর্থই তাই তিনি মনীষীঃ পরিভূষয়ন্তু। আত্মোপলব্ধির ধারা বেয়ে তা রূপ নেয় নাদে, ছন্দে, স্বরে, তানে, তালে—বিখল্ল ধরা পড়ে সেখানে। কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি কলহন তাঁর রাজত্বরঙ্গিনীতে বলেছেন প্রকৃত ঐতিহাসিককে কবি হতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ য়হ্নাথ সরকার কলহনের এই উক্তিকে একটি অভিনন্দনীয় সত্য বলে স্বীকার করেছেন। শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সৃষ্ট সাহিত্যে এই সরস গভীরতাই লক্ষণীয়। তামসীরে বাক্ত করাও কবির কাজ, শুধু আলোর, সংগীতের, সৌন্দর্যের উপাসক ও তাকে বাক্ত করাই সাহিত্যিকের কাজ নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই কথাই বললেন নলিনীকান্ত, কারণ সাবিত্রীর কবি যা বলেছেন—

None can reach heaven who has not passed through hell, এমনকি এলিয়টকেও বলতে হয়েছে—
Not here, not here, the darkness, descend lower.
যুধিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করতে হয়েছিল, কারণ সেখানেই

আছে the secret key of Nature's change—প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়, তার গুপ্তরহস্য যে সেখানে—অগ্নি অক্ষরে' লেখা হয় অক্ষরের প্রতিমূর্তি। কবির্মনীষী পুস্তকটিতে সাহিত্যসাধক নলিনীকান্ত সাহিত্যসৃষ্টির মূল সত্যে পৌঁছেছেন। দেবত্ব ও এসকিলস্ একটি প্রতীকী ভঙ্গকে উদ্ঘাটিত করলে দেবতার নবজন্ম দিয়ে। জিউস্ শুধু কি দণ্ডবিধাতা, না ছায়াধীশ—দেবতাদেরও ক্রম-পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে। আজকার উষা অতীতের উষা পরম্পরার শেষ উষা, কিন্তু আজকের উষাই আবার ভবিষ্য পরম্পরার প্রথম! ত্রীঅরবিন্দের এই অমোঘ বাণীই আরো পরিস্ফুট হয়েছে

Nothing ends, all but begun

শেষ নেই অশেষের, প্রতিদিনই আরম্ভ। মহামনীষী গ্যোটেকে নলিনীকান্ত চিত্রিত করেছেন মানুষী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীকরূপে তাই গ্যোটের স্ট্রফাউষ্ট পূর্ণ মানুষী মানুষ। সে ভগবানকে চায়, আবার শয়তানের সাক্ষেত্তীও করে—এ যে তার আত্মহত্যা, হারিকিরি, সেটা সে বোঝেনা—

I ascend the witch mountain for the last time, and because my own cask runs thick, the world also is come to the dregs.

শেক্সপীয়র আর একজন কবির্মনীষী যা মুগ্ধ করেছে নলিনীকান্তকে—তিনি সহজ সরল হলেও তাঁর মধ্যে পরিণত চেতনা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। বহু উপমা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু একটি উদ্ধৃতি অপূর্ণ।

In such a night

Stood Dido with a willow in her hand

Upon the wild sea-banks and waft her love

To come back to carthage.

তাঁর নিজের কথাতেই কয়েকলাইনের মধ্যেই ভাঙিলের একটা সমগ্র সর্গের করুণকাহিনী ভরে দিয়েছেন শেক্সপীয়র।

ত্রীঅরবিন্দের আধুনিক ঋষিদৃষ্টি দিয়েই শেষ করেছেন নলিনীকান্ত জীবননাট্যের এই প্রসঙ্গ—

Annulling the decree of death and pain
Erasing the formulas of the Ignorance ...
Nature shall draw back from mortality
And spirit's fires shall guide the earth's
blind force.

এই মনীষীর ইংরাজীতে লেখা বইগুলিও এক অপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়, যেমন The Coming Race, Towards a New Society, The Malady of the century, The March of civilisation, The Quest and the goal. প্রবন্ধগুলির শিরোনামা গুলিই তাঁর বক্তব্যকে ধরিয়ে দেয়—শেষ কথা—আলো, আরো আলো—light, more—light. ভিতর বাহির যে কালোয় কালো কিন্তু আশা আছে, ভরসা দিচ্ছেন মনীষীরা—সত্যিকার নিষ্ঠা থাকলে সব কালো দূরীভূত হবে—If you are sincere, if you have the correct attitude, things will come always right to you. The trouble is for him who is not himself true or does not propose to be true.

সত্যকাম সত্যসংকল্প হতে হবে, তবেই অভীঃ হওয়া যায়, সত্যদর্শন হয়, সত্যময় হওয়া যায়। জীবনের পরম লগন্ আসে। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের উপরও নলিনীকান্তের অপূর্ণ দখল। তাঁর Poets and Mystics পড়ুন, কাব্যবিচারে, নিপুণ বিশ্লেষণ দক্ষতায়, সমগ্রতার নিরুপণে তাঁকে সাহিত্য সমীক্ষক হিসাবে ত্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষই বলা যেতে পারে। অবার এর সঙ্গে Aldous Huxley বা T. S. Eliot এর নাম করা যায়। কবির অন্তরে প্রবেশ করতে হয়, কাব্যের গভীরে ডুব দিতে হয়—বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে—the letter killeth but the spirit giveth life. সত্যিকার অনুরণনের রক্ষারই ফুটেছে ত্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের লেখায়।

আমি সাধক নই, যোগ ও যোগশাস্ত্র কাকে বলে তা বোঝবার ক্ষমতা নেই, অধিকারী, নই আমি। জীবনের সাফাফে এসে শুধু এইটুকু বুঝি যে যোগ মানে যুক্ত হওয়া—যেমন পিতা পুত্রের সঙ্গে (পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি) নারীর সঙ্গে পুরুষের (দেহগতই হোক মনের নৈকট্যই হোক, আত্মিক

সংযোগের দ্বারাই হোক), ভক্তের সঙ্গে ভগবানের, অহং এর সঙ্গে ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের—ভূমি যে শিব এ কথা মোরে বুঝিতে দিয়ে। নির্ঝাঁপ, মুক্তি কৈবল্যসাধন এর অর্থ ও সার্থকতা কি জানিনা—জীবন কি স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন, না ক্ষণিক বেদনার সমষ্টি—কোন মতে দীপশিখাকে নির্বাণিত হতে দিলেই কি পরমপুরুষার্থ, উপরে উঠে বৃহৎ বা মহৎ বা মহত্তমের সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়াই কি শেষকথা। এই ধরনের নানা প্রশ্ন যখন আমাদের আলোড়িত করে, তখন সাধক নলিনীকান্তের কথাই মনে পড়ে “শরীরের অতীত হবার জন্য শুধু শরীর নয়, মনের অতীত হবার জন্যই শুধু মন নয়, জ্ঞান প্রেম কর্মের অতীত হবার জন্যই শুধু জ্ঞানপ্রেমকর্ম নয়—শরীর মন আত্মা সবের মধ্যেই তিনি আছেন—কিন্তু সে সিদ্ধি ব্যক্তিগত সিদ্ধি নয়—বিশ্বমানবগত সিদ্ধি—এই হ’ল পূর্ণযোগ—দেহই সেখানে দেবালয়, রিপূর হবে রূপান্তর মোহ মোর মুক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া—এই চঞ্চল বিক্ষুব্ধ জগতের অন্তরালেই আছে সমাহিত স্থিতি—‘কায়েন মনসা বাচা’ একে উপলব্ধি করতে হবে—শিবই ব্রহ্ম, প্রত্যাহারের শক্তিতেই তিনি নটরাজ। তাই বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহির্জালা।

আমার মুক্তি আমার মুক্তি সর্বজন্মের মনের মাঝে
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে,
আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।

আজকের পণ্ডিত দার্শনিকরাও বলতে আরম্ভ করেছেন (যেমন বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানবিৎ Teilhard De Chardin) যে আমাদের “Interiorly consciousness জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি totality of an event অর্থাৎ সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি, আমরা যখন রূপকালও কাজ না করে থাকতে পারি না তখন “নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকুং” তখন সব কর্মই সামগ্রিক সাধনার অঙ্গ’

The socialisation which he (a modern man) sees as taking place is not only a Socio-

economic process, it is also a process within the hearts of people who are becoming increasingly sensible of the dignity of man and of an obligation to help one another.

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের এই সাঙটি প্রশ্ন ছিল—তার মধ্যে শুধু কিম্ব তদব্রহ্ম নয়, কিমধ্যাত্মম্ নয়—কিং কর্ম, কর্ম কি, কাহাকেই বা অধিভূত বলে, অধিদৈবই বা কি, এই দেহে অধিযজ্ঞ কোথায়, এখানে তিনি কি ভাবে আছেন ইত্যাদি। যদি সেই অক্ষর (যার ক্ষয় নাই, ক্ষয় নন যিনি) পুরুষই ব্রহ্ম হন তাহলে তার স্বভাবই হ’ল ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ—অত্র দেহেই এই অধিভূতম পুরুষের অধিযজ্ঞ যখন এই জ্ঞান হয় তখনই তেজোভরাপূর্ণ জগৎ সমগ্রম্ সেই সত্তার দীপ্ত অনলস্বয়ংসম অপ্রমেয় আদি মধ্য অন্তহীন অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখ যায়—হয় বিশ্বরূপদর্শন,

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরি

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্

গীতাকে যারা ধর্মশাস্ত্র বলেন তাঁরা নমস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ বিসম্বাদ বিতণ্ডা নেই কিন্তু গীতা কর্মশাস্ত্রও, জীবনকে এক অনির্বচনীয়তার সঙ্গে যুক্ত করে অনিকেত হওয়ার ইঙ্গিতও সেখানে আছে অপ্রমত্ত হয়ে কাজ করার। কাজ শুধু তথাকথিত manual or mechanical work নয়, মনেন স হি জীবতি, যোগবা-শিষ্টকথিত মননের এই কাজও উন্নত মানুষের বৈশিষ্ট্য। সেই কর্মেই লিপ্ত আছেন কবির্মণীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত। তাঁকে নমস্কার।

মাহ হং ব্রহ্ম নিরাকুর্থাং মা মা ব্রহ্ম নিবাকরোং
আমি যেন বৃহৎকে উড়িয়ে না দিই, বৃহৎ যেন আমাকে উড়িয়ে না দেয়—

পূর্বমদঃ পূর্বমিদং পূর্বাং পূর্বমুদচ্যতে

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

পূর্ব ইনি পূর্ব উনি পূর্ব হতে পূর্ণের উদয় হয়

পূর্ব হতে পূর্ব হতে অবশিষ্ট রয়।

এই জ্ঞানই হচ্ছে আলো।

The Sun from which we kindle all our suns

The Light that leans from the unrealised vasts

—“Satviri”

আত্মনিয়ন্ত্রণ

তুর্গাদাস ভট্ট

বুকের কাছে ধরা চিঠিটা স্পর্শ মাত্রই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়। সাদাখামের ওপর বড় বড় অক্ষরে বিভাসের নাম লেখা ছিল। বিভাসের মনে আছে, চিঠিটা দেখেই সে কমলকে চিনতে পেরেছিল। হাতের লেখাটা এতদিনেও পুরোনো হয়নি। সেই আগের মতই স্পষ্ট এবং ঝকঝকে। অথচ বিভাস এখন নিজেকেই চিনতে পারে না। যে দ্রুততার সঙ্গে তাকে চলতে হয়, ছুটতে হয়, ধাক্কাধাক্কি করে বেঁচে থাকতে হয়, তার মধ্যে কোনো কিছুর ভারসাম্য থাকে না।

গত সন্ধ্যায় যখন চিঠিটা হাতে এল বিভাসের দেহে তখনও অক্সিসেরসাজ। সবেমাত্র সে তখন ঘরে ফিরেছে। ক্লান্তি এবং অবসাদের এক ঘনঘোর জায়গায় যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজেকে অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হ'ল। পা হড়কে বসে পড়ার মত নিঃশব্দ একটা ঝঙ্কারে বেজে উঠার পর মুহূর্তেই মনে হ'ল—না এখন খামের মুখ খুলব না। বরং বাড়ির সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়বে, ছেলে মেয়েদের জুতা যে টেবিল ল্যাম্পটা আছে, সেটার একটা পাশ বই দিয়ে ঢেকে দিয়ে খুব আরাম করে চিঠিখান পড়ব। কিন্তু তা হয়নি! অতঃপর ধৈর্য সয়নি বিভাসের। একটু ঘুরে আসছি বলে রথ-তলার মোড়ের চায়ের দোকানে বসে সে কমলের চিঠিটা পড়েছিল।

সেই থেকে রাতের ঘুমেও যেন অবসাদ মুক্তির স্বপ্ন স্তনতে পাচ্ছিল। আবার ভিন্ন একটা জগতে চলে যেতে যেতে সাম্প্রতিক স্মৃতিগুলিকে চিনতে পারল না। বরং মনে হ'ল এরা আমার কেউ নয়। শুধু নিরবিচ্ছিন্ন পরবাসে জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি চলে গেছে। ঘুম আসছে অথচ আসছে না এই গোছের অবস্থায় কমলের চিঠির জগৎ ডেকে কথা বলছে। কেবলই জল ভাঙার শব্দ। দূরে কোথায় যেন বাঁশী বাজছে অথচ মাঝ পথে হা হা শূন্যতা।

জেগে ওঠার কালে নিজেকে তাই বড়ই নির্জম মনে হল। একা। চারিদিকের ভোরের বার্তায় নিজেকে গুছিয়ে

নিতে হ'ল। বাড়িতে তখন সবেমাত্র তার এবং স্ত্রী মল্লিকার ঘুম ভেঙেছে। উঠানের এক কোণ থেকে হাঁসেরা ডাকছিল। নড়াচড়ার শব্দ। সেগুলো ক্রমাগত মাটিলেপা বন্ধ কুঁরির বাইরে আসতে চাইছে। বিভাস জানলা ফাঁক করে দেখল অদূরের মাঠে কুয়াশা ঘেরা শুরুত। পিটুশী আর রাধাচুড়ার গাছ দুটো যেন স্বর্ষ ওঠার প্রতীক্ষা করছে। মাঠের গা ঘেঁষা বারাসত রোডের উপর দিয়ে একটি কি দুটি বাস কি লরী ছুটে যাচ্ছে। প্রথমে শুয়ে শুয়েই আমকাঠের চৌকীর উপর এপাশ ওপাশ করল বিভাস। ডান হাতটা গেঞ্জীর তলদিয়ে বুকের ওপর বুলিয়ে নিল। হাতটা একটু পাশের দিকে নামতেই মনে হ'ল পাঁজরাগুলি নড়ই স্পষ্ট। যাকে বলে ঠেলে উঠেছে। অথচ এমনটি ছিল না। ভাবতেই আবার সেই কমলের চিঠির কথা মনে আসে। দেওয়ালের পেরেকের তার হাক্কা গেরুয়া রঙের পাজ্জাবীটা ঝুলছে। যার পকেটে সেই চিঠি। যার সর্ব্বাঙ্গে এখনো সেই ফেলে আসা উদ্ভাপ। কিছু অদৃশ্য তরঙ্গ যেন বিভাসের চৈতন্যের মধ্যে এসে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু কি করে? এখন এইমাত্র বিভাসকে শযাত্যাগ করতে হবে। দরজার ওপার থেকে গৃহস্থালীন শব্দ। বড় ড্রামটায় জল ঢালছে বোধহয় মল্লিকা। দরজার ফাঁক দিয়ে ঘোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়া মাত্র বোঝা গেল উন্মুনে হাওয়া করা হচ্ছে। মল্লিকার বাড়ানো হাত গজিয়ে প্লাস্টিকের চুড়ি নেমে এসেছে। হল্ হল্ করছে। শরীরে শ্রীছাদ নেই। শাঁশ উড়ে গেছে। যা একদিন নধর ছিল। চোখে পড়ার মত চটকে ক্ষণে ক্ষণে নাটকীয় হয়ে উঠত। ইচ্ছে করলে সেও তো বিভাসকে ডাকতে পারত। হু বালতী জস টেনে দিতে বলতে পারত। সত্যি ওকে কি দিয়েছি! চোখ ঘুরিয়ে বাস্তব সচেতন হ'তে চেষ্টা করল বিভাস। ঘরের মেঝের দুটি ছেলে ও বড় মেয়ে শুয়ে আছে। এই ভোরের ঠাণ্ডায় ছেলে দুটির গায়ে চাদর নেই। সব ছোট স্তম্ভন ঘুমন্ত অবস্থায় পাক খায়। এখন তার মাথাটা নিচের দিকে

দেখা যাচ্ছে। বিভাস উঠে খুব সাবধানে শুয়ে থাক। ছেলেমেয়ের গা বাঁচিয়ে স্নমনের পাশে এল এবং দেওয়ালের পাশে নিচু হয়ে স্নমনকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে চাদর মুড়ল এবং উঠে দাঁড়ানো মাত্রই পেরেকে ঝুলন্ত পাঞ্জাবীটা ঝুপ করে খসে পড়ল। বিভাস আবার বুঝল যেন তার মন ওই পাঞ্জাবীর পকেটে রাখা চিঠিটাই ছুঁয়ে আছে। ইচ্ছে করল বাইরে এসে আবার সেই চিঠির আমেজের সঙ্গে সকালের নরম আমেজকে মিলিয়ে দেখে। কিন্তু নিজেকে সামলাল। ভিতরটা হঠাৎ কেমন যেন উপচে যায়। যা ছিল তাকে আপাতত দূরেই রাখতে চাইছিল বিভাস। কৈশোরের গাহপালা শালুক ফুল। দীর্ঘির জলে যখন বর্ষার জল মিশে যাচ্ছে সেই সবই কমলের চিঠি মারফৎ ঘুরে এসেছিল। কিন্তু এই সবের হাত থেকে এই মুহূর্তে ছাড়াপেতে চাইল বিভাস। ছেলে মেয়েদের ঘুম না ভাঙিয়ে ঘরের বাইরে এপে দাঁড়াল।

শেষরাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। উঠোন ভিজ। কচুর পাতায় জল জমে আছে। হাত দিয়ে নাড়া দেওয়া মাত্র সকালটাই যেন নড়ে উঠল। প্রায় বিস্মৃত ঘটনা-গুলি আবার তাকে উজানে ঠেলছে। বিভাস দেখতে চাইল না অদূরের রাঙাচিটা বেড়া ঘেষে ধূঁতরা ফুল ফুটে আছে। একটি মাত্র ডালিয়াকে নিতান্তই দলছুট বলে মনে হয়। বরং বারাসত রোডের দিকে তাকানোই ভালো। যেখানে ক্রমাগত মানুষ বোঝাই বাস ছুটছে। যারা যত সকালে উঠে কাজের জগতে ঝাঁপ দিচ্ছে তারা ঠিক তত শীঘ্র কাজের জায়গায় পৌঁছে যাবে।

মল্লিকা ততক্ষণে উন্নত আলিয়েছিল। ভেজা কয়লা সহজে জ্বলেনি। রীতিমত বাতাস করতে হয়েছিল। ওর চোখ দুটি তাই ঈষৎ লালচে দেখাচ্ছে। বিভাস দেখল জ্বলন্ত কয়লার ওপর দু'খানা ঘুঁটে চাপিয়ে পেপে-তলা থেকে তোলা উন্নতটা রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল মল্লিকা। তারপর বাইরে এসে আঁচল দিয়ে হাত মুছল। যে ভাবে আঁচল করে ও শাড়ি পরেছিল তাতে আঁচলে আঙুন ধরে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। এর আগে বছবার বিভাস ওকে সাবধান করেছে। কিন্তু

কোন কথা ওর কানে যায় না। বেশী বললে ওর ঠোঁট কাঁপে। কখনো মুখ তেতো করে বলে ওঠে—থাক আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। আজ তাই সব দেখেও কিছু বলল না বিভাস। গোটা ব্যাপারটা যেন তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে এই রকম একটা ভাব করে বলল—আজ উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল।

—তাহলে ?

মল্লিকা এবার চোখ ঘুরিয়ে বিভাসের দিকে তাকাল।

—তাহলে আবার কি ? রান্নার জোগাড় আছে তো ?

—না থাকলে কি হয় ?

—খাওয়া হয় না। আর সেই ভাবেই অফিসে দৌড়তে হয়।

—তা বটে। তার ওপর ছোটটা গত পরশু থেকে মাহের জন্ম বায়না করছে।

—ওঃ ভারি বড়লোকের ব্যাটা !

বিভাস ঠোঁট ওন্টাল।

—কি আশ্চর্য গতকালই তো ও যখন কিছুতেই ঘুমতে চাইছিল না তুমি মাছ আনার কথা বললে।

—ওরকম বলতে হয়, বুঝলে ? যাও তাড়াতাড়ি চা-টা ছেকে ফেল।

বিভাস ততক্ষণে এগিয়ে এসে একটা কচার ডাল ভেঙে ফেলেছিল। সেটার একটা দিক কামড়ে কিছুটা ঝাড়ুসদৃশ করে নেওয়ার পর থুথু ফেলল। মুখের মধ্যে দাঁতনটার কিছু অংশ চলে গিয়ে থাকবে। গলা বাড়িয়ে ভিতর থেকে কফ্ টানুল বিভাস। তারপর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাড়ি দাঁতের ওপর ঘসল। ধূতিটা রাত থেকেই লুড়ির মত করে পরা ছিল। দাঁতন করা এবং তেলমাখা একই সঙ্গে করা দরকার মনে হওয়া মাত্রই বারান্দার সেলফে কাঁচের শিশিতে সরষের তেল রাখা আছে দেখতে পেল বিভাস। এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে বাঁহাতের চেটোর ওপর তেল ঢালল। ধূতিটা থাই পর্যন্ত তুলে পায়ে তেল মাখল। নিজের ঘাড়ে বুকে তেলমাখা হাত খানা ঘষতে ঘষতে আজ আবার নতুন করে নিজেকে চিনতে পারছে বিভাস। শৈশবে সে যেন পদ্মদীঘীর জলে কিনারায় দাঁড়িয়ে তেল মাখছে। কমল অদূরে গভীর

জলে দাপাচ্ছে। জল ছিটকোচ্ছে। কচ্ছপের মত ভেসে এসে পাড়ের কাছে একইটু জল দাঁড়িয়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে বিভাসের গায়ে মুখে।

—এই খেলবি আয়!

—কি খেলা?

—আজ আমরা জল যুদ্ধ করব।

বিভাসের মনে আছে সময়টা তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। বাবা কাকাদের মুখে কুজার ড্রেপ্তার এবং প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজের চাওর মধ্যে ঢুকে পড়ে জাপানী বোমারুরা কিতায়ে ডুবিয়ে দিল, সেই সব গল্প। বিভাসের আজ তাই তেল ফুরিয়ে গেল। আধশিশি সরসের তেলের সবটা মেখে ফেলার পর মনে হ'ল—

ঠিকমত তেল ঘষা হয়নি। রান্নাঘরের দরজার মুখে এসে বুকে পরে তেল চাওয়া মাত্রই মল্লিকা তেরুটা চোখে তান্নাল। সে তখন উনুন থেকে ফুটন্ত জলের কেতলী ন্যামাচ্ছে। বিভাসের কথার উত্তর না দিয়ে টি-পটের ঢাকনা খুলে জল চালুল। তারপর হু চামচে চা দিল। উদগত বাষ্প, চায়ের গন্ধ এবং জলন্ত কয়লার লালচে রঙ মল্লিকাকে ঘরোয়া দেখাচ্ছিল। কোমরের শাড়িটা ঠিকমত জড়িয়ে নিল এবার। উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের সিমেন্টের তাকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—

—কেন বাইরের তাকে তো অনেকটাই তেল ছিল?

—ও টুকুতে আমার হ'ল না।

—তাই নাকি?

বিভাস এবার বুঝতে পারে মল্লিকা যেন রহস্যের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে। কাটা কাটা অথচ তাৎপর্য পূর্ণ কথায় প্রকাশিত হওয়ার আগে নিজেকে যেন সামলে নিচ্ছে মল্লিকা। বিভাসের বাড়ান হাতে অল্প একটু তেল ঢেলে দিয়েই বলে ওঠে—তেলও কিন্তু বাড়ন্ত।

—সে কী এই? সে দিন দেড় কেজী আনলাম।

—তুমি অন্তত কুড়িদিন আগের কথা বলছ।

তারপর ঘুরে এসে মেঝেতে আবার উবু হয়ে বসল মল্লিকা। চা হাঁকল। বিভাস বুকে পিঠে তেল ঘষে মল্লিকার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলল,

—এ ভাবে খরচ হওয়াটা অস্বাভাবিক।

—বাক তাও ভালো, তুমি অন্তত বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক বলোনি।

—তার মানে?

—মানে আবার কি, মাহ্ তানতে পারব না, হাফ-লিটারের বেশী হুও নয়। অথচ ছেলে মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করবে। মাস্টার না রাখিলেও পরীক্ষার ফলও ভাল হবে।

—দেখ মল্লিকা এই সাত-সকালেই দিলে তো মেজাজটা খারাপ করে। দাও খলি দাও। স্নান সেরেই আমি বাজারে যাব।

—থাক, আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। গতকাল সন্ধ্যাতেই আমি নিজেই কিছু বাজার এনে রেখেছি।

বিভাসের আর কথা বাড়াত্তে ভাল লাগে না। মনটা আবার ক্রমশই বাইরের দিকে ফিরে যাচ্ছে। এতক্ষণ ছোট বড় আকারে যে সব স্পন্দন জাগছিল সেগুলি যেন ঝাপসা হয়ে এসে সংসারের আচার আচরণের মধ্যে আটকে গেল। বিভাসের মনে হয় শীতের সন্ধ্যায় সে যখন ঘরে ফেরে এই প্রায়-গ্রাম শহরতলিতে বৈশীরাগ ঘরেই আলো থাকে না। আসন্ন রাত্রি যেন আগবাড়িয়ে নেমে এসেছে। রাস্তারাইলেক্ট্রিক বাতিগুলো আলো ছড়ায়। কচিৎ ছু একটি বাড়িতে সন্ধ্যার পাট শেষ হয় না তখনো। আলো জলে। গল্পগুজব অথবা ছেলেমেয়েদের সরব পড়াশুনোর শব্দ শোনা যায়। তখন প্রায় প্রতিদিনই একটি উপলব্ধি অফিস এবং ট্রেন ফেরৎ বিভাসের মনটি যেন তীষণ অন্ধকারে ভরিয়ে দেয়।

—আমার নিজের জন্তে কোন সময় নেই। এখনি ছেলে মেয়েদের পড়া নিয়ে বসতে হবে। কেউ ঘুমে চুলবে। কেউ মশার কামড়ে ছট ফট করবে। একটা অঙ্ক বারবার ভুল করবে। তুফানগঞ্জ কোন জেলায় কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে কোন জেলায় একটি মাত্র মহাকুমা এটা অনেকবার পড়ার পরও ভুল বলে রেগে উঠার উপায় নেই। মল্লিকার মতে এ হচ্ছে এক ধরনের অন্তঃমনকতা যা নাকি ওরা পৈতৃক স্বভেদে পেয়েছে।

আসলে প্রত্যেকেই নিজের ধারণার প্রেক্ষাপটেই বাঁচতে চায়। অস্ত্রের জায়গায় নিজেকে বসাতে পারে না। পরক্ষণেই মনে হয়—আজ আমাকে বাজারে যেতে হবে না। মল্লিকা তার এত কাজের মধ্যেও দোকান বাজারের কথা ভেবে রেখেছে। কিন্তু সেটাই বা কেমন কথা। মাঝে কিছুদিন বড়ছেলেকে বাজারে পাঠিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল প্রায় সব পয়সাই মাছের পেছনে খরচ করেছে। সেই সঙ্গে বড়জোর আধেকজি আনু। তারপর বাজারে কুলোয় নি। মল্লিকা তখন রেগে গিয়েছিল। বিভাসের দিকে অঙ্গুল তুলে বলেছিল—তুমি কি কিছুই নও, সংসারের সবদিক কি আমিই দেখব। প্রত্যুত্তরে চুপ ছিল বিভাস। কারণ এবাৎ সে তাকে বোঝাতে পারেনি যে তার নিজের বলতে কিছুই নেই। সে যদি মনে করে শ্রেফ ওই সামনের নির্জন মাঠে ঠাং ছড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকবে, নিজেকে দেখবে, সেখানেও সময় এসে কাঁকড়ার মত চেপে ধরে নিজের কাতরানিটাকে নিজের মধ্যেই বন্ধ করে রাখতে রাখতে একআধবার ক্ষেপে ওঠে বিভাস। চোখ মুখের অবস্থা পাণ্টে যায়। বিরক্তি এবং ক্রোধ ক্ষণে ক্ষণে ফেটে বেরোয়। এমনি একটা কালে, বোধ হয় মাস দেড়েক আগে এক কলেক্টরের বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে এখন নামজাদা আর্টিস্ট। দেখা হতেই বিভাসের হাতে একটা কার্ড গুঁজে দিয়ে বলেছিল সামনের শুক্রবার একাডেমি অব ফাইন আর্টসে আয়, আমার একটা চিত্র প্রদর্শনী আছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে কথাটা মল্লিকাকে বলতেই ওকে আবার আগের মত দেখাল। কিছুটা চক্ চকে ভঙ্গীতে এমন ভাবে তাকাল বিভাস যা ভাবতেই পারে না। চাপা অথচ সংশয়াতীতভাবে একটা গভীর ইচ্ছাকে তুলে ধরেছিল মল্লিকা।

—যাবে নিশ্চয় যাবে, আসলে তোমার নিজের জগৎটা হারিয়ে যাচ্ছে বলেই তুমি আজ অস্তরকম হয়ে যাচ্ছ।

সেই চিত্র প্রদর্শনীর আসরে নিজেকে কিছুক্ষণের ভাঙে হারিয়ে ফেলল বিভাস। চারিদিকেই তার

চৈতন্যের খাদ্য। বোঝা না বোঝা, চেনা না চেনা এক শিল্পময় গাভীর্য। ফ্রেমে আঁটা আঁতি এবং রঙ তুলির জগতেই তাঁর সমুদ্র দৃশ্য যেন ঠিক মত এসে দাঁড়াচ্ছে আবার প্রচলিত বাপ্‌টায় টলে যাচ্ছে।

এই বিমূর্ত অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে আরো তিনটে দিন কেটে গিয়েছিল বিভাসের। সত্যি সে কোথায় আছে? তার বন্ধুরা এখন কোথায়? অথচ সে যাকে এনেছে, যাদের সৃষ্টি করেছে তাদেরও তো কোন দোষ নেই। চিত্র প্রদর্শনীর আসরেও অপরজনকে আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছে করেছিল। মনে হয়েছিল ওরা এসব দেখতে পেল না।

সেই থেকে আরো জোরে সামনে যা আছে সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল বিভাস। সংসারের প্রতি আরো বিশ্বস্ত হ'ল। আরো সকালে উঠে সব খুঁটিনাটি কাজ করল। সকালে বিকালে ছেলে মেয়েদের পড়াতে বসল। অফিসে এসে ঘাড় গুঁজে এমন কাজ করল যা দেখে অনেকেই বিস্মিত হ'ল। কিন্তু তারপরেই এই কমলের চিঠি। যা পেয়ে সে ভিতর থেকে উঠে গিয়েছে কোনো কাজটাই সময় মত করতে পারছে না। শ্রেফ তেলমাখা চা খাওয়া এবং স্নান সাড়তে সাড়তেই আটটা বেজে গেল। কলতলার পাশের ঘেরা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সাবান ঘসছে বিভাস। জল ঢালছে। ওদিকে যে বারান্দার পাটি বিছিয়ে ছেলে মেয়েরা পড়তে বসল, মল্লিকার রান্নার পাট শেষ হয়ে গেল, নির্দিষ্ট ট্রেন শেয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে প্লাটফর্ম ত্যাগ করল, কোনো দিকেই হুঁস নেই বিভাসের। সে এখন স্নানের অন্তে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে।

শুধু খেতে বসে বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে হাত মুখ চালিয়ে যাওয়ার পর চোখ তুলল বিভাস। মল্লিকা তখন হাতায় করে চচ্চড়ি পরিবেশন করছে। আজ প্রায় হঠাৎই মনে হ'ল—যেন বড় বৈশীক্ষণ তারা দুজনে চুপ করে আছে। বিভাস বলল—

—কি কোন কথা বলছ না যে।

—কি বলব! আমি তো জানি তুমি আজ কোথায় যাবে!

জান ?

হাঁ জানি। সেই জন্তেই তোমার কলমে একটু আগেই কালি ভরে রেখেছি।

বিভাস আবার মল্লিকার দিকে তাকায়।

ওর সর্বাসঙ্গে এখনো ব্যস্ততার চিহ্ন। আঁচলে বিভাস।

হলুদের দাগ। শুকনো ঠোঁটে এতটুকু উত্তাপ নেই।

চোখের ভাবে বিভাসের প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই মুহূর্তে তাই নিজেকে বিপন্ন হয়ে মেতে দেখল

বিভাস।

নীল দিগন্তে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বেলের শরবত খাওয়ালো বন্ধুবর বলরাম চাকী। তারপর মুখের এক প্রকার শব্দ করে যে প্রশ্নটিকে সে আমার সমক্ষে সমুপস্থিত করল, তা বড় অভিনব! এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

প্রশ্নটি এই : তোমার কী চিংপুরের পল্লীতে যাতয়াত ছিল ?

আগের কথা একটু বলে নেই।

সম্প্রতি আমার যে কর্মস্থল সেটা অবশ্য উত্তরে নয়। দক্ষিণে। কলকাতার মোমিনপুরে। অথচ থাকি আমি তালতলায়। ফলে ট্রামে চড়ে প্রথম আমাকে গিয়ে নামতে হয় এসপ্ল্যান্ডে। সেখান থেকে ফের ট্রাম ধরতে হয় কালীঘাট, কি বেহালার। ৩১ কি ৩৫ নম্বর। তারপর অফিসে গিয়ে হাজির হই বেলা দশটায়। মানে দশটায় গিয়ে হাজির হয়েছি খুব কম দিনই। খাতায় কলমে ওই দশটা। কিন্তু এমন অনেক দিন হয়েছে—বাড়ির কাঁটা যখন ছাড়িয়ে গিয়েছে সাড়ে দশটার ঘর।

কিন্তু সময়টা অর যাই হোক, একটা ব্যাপার দেখে তারি অরাক হয়েছি। ব্যাপারটা আর কিছু নয়—একটি শ্রিয়দর্শন ভদ্রলোক। পরনে প্যাণ্ট, গায়ে হাওয়াই শার্ট, চোখে নীল চশমা। ঠিক যে সময়ে ৩১ কি ৩৫ নম্বর ট্রামে গিয়ে চড়তাম, দেখি ভদ্রলোকটিও কোথা থেকে এসে উঠেছেন আমার গাড়িতে। আমার সামনে নহ তো আমার দৃষ্টিপথে পড়বার মতো জায়গাটিতে গিয়ে ঠিক বসে পড়েছেন।

এক-একদিন গায়ে-গায়ে শাক লাগবার উপক্রম। তবু কথা বলিনি।

শেষ পর্যন্ত কোতূহল চেপে রাখা হল দুঃসাধ্য। এক সঙ্গে যাব। একসঙ্গেই নেমে গিয়ে কে কোথায় হারিয়ে যাব—এত তো বড় বিচিত্র ব্যাপার।

ভদ্রলোকও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, কিন্তু তিনি বলেননি। শুধু লক্ষ্য করতেন আমাকে তাঁর রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে।

কর্মস্থল থেকে ফিরতাম সাধারণত বেলা দুটোর পর। এক-একদিন তিনটে বাজত। অফিস পালানো তো বটেই কিন্তু উপরওলা বলতে সেখানে একা আমিই। উপর-ওলার আবার অপরাধ কোথা! অশ্চর্য, ফেরবার ট্রামেও দেখি সেই ভদ্রলোক। আমাকে লক্ষ্য করছেন তিনি তাঁর রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে।

মারো মাস দুই ছুটি নিয়েছিলাম। তখন ভদ্রলোক কী করতেন জানি না।

ছুটির পর ফের অফিসে বেরিয়েছি, দেখি তখনো ট্রামে সেই ভদ্রলোক! রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছেন। তবু জিগ্যেস করেন নি, মশাই আপনাকে দেখিনি কেন এত দিন?

জিগ্যেস করলে বরং খুশিই হতাম।

কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার শুধু আমাকে দেখেই তার তৃপ্তি। কথা বলতে নয়।

শেষ পর্যন্ত কথা একদিন আমাকেই বলতে হল। মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যান্ডে ফেরবার পথে ট্রাম

ধরেছি। ট্রামে অসম্ভব ভিড়। বসবার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে চলেছি। পাশে দেখি সেই ভদ্রলোক। বললাম, মাফ করবেন, দু বেলাই আপনাকে দেখি। আপনি কী এদিকে কোথাও চাকরী করেন?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, চাকরি কোথায় মশাই? বেকার, ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

আমি কোথায় চাকরি করি, সবিস্তারে তাঁকে জানালাম, নিজের নাম ঠিকানাও বললাম। এমনকি নিমন্ত্রণও জানালাম, একদিন অফিসে এসে চা খেয়ে গেলে খুব খুশি হব।

ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোক কী বললেন, শুনতে পাইনি। তাঁর নাম জানবার অভিলাষ ছিল। জিগ্যেস করা হয়নি। করতে ভুলে গিয়েছি।

এরপর কিন্তু ভদ্রলোককে আর দেখতে পাইনি। প্রায় দু মাস হতে চলল, ভদ্রলোককে আর দেখা গেল না। না সকালে না বিকেলে। না মোমিনপুর যাবার সময়, না মোমিনপুর থেকে আসবার কালে।

সেই কথাই একদিন এসপ্ল্যান্ডে বসে ভাবছিলাম। এমন সময় বন্ধুবর বলরাম চাকীর সঙ্গে দেখা। বলরাম চাকীর সঙ্গে একদিন বাল্যে কলেজের কমনরুমে ক্যারাম পিটতাম। সেইসূত্রে আলাপ। তারপর কলেজ ছেড়েছি। বলরাম চাকীর সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়েছে। দীর্ঘদিন তার কোনো খবরাখবর রাখিনি। অর্থাৎ পাইনি।

বলরাম চাকী তার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে নাকি ইতিপূর্বে লক্ষ্যে ছিল। এখন কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। গোয়েন্দাবিভাগের একজন ছোট-শাটো রায়গুণকর।

প্রথমে বেলের শরবত পরে জলখাবার সহযোগে

চা। তারপর মুখের একপ্রকার শব্দ করে যে খবরটি বলরাম চাকী ফাঁস করল, আমার পক্ষে তা সত্যই বড় হৃদয়বিদারক।

বলরাম চাকী বললে, তোমার নামে খাতার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

কী অভিযোগ?—নিরুদ্ভ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে হল। তোমার সোনাগাছিতে যাতায়াত ছিল। এবং তুমি একটি মহিলাকে খুন করে রহস্যজনক ভাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলে!

বলরাম চাকী মুখের এক প্রকার শব্দ করে একটা ফটো দেখালো। বললে, আয়নার মিলিয়ে দেখো—তোমার কি না।

অবাক হয়ে দেখলাম, অবিকল আমার চেহারার সঙ্গে ফটোর অভূত মিল।

আরেকখানা ফটো দেখালে বলরাম চাকী। সেটা দেখে আরো বিস্মিত হলাম।

এইতো সে ভদ্রলোকের ছবি, যার সঙ্গে আগে দু বেলা ট্রামে দেখা হত। থাকে দু মাস আর দেখিনি।

প্রশ্ন করলাম, এ ভদ্রলোক কে?

ইনিই তো সেই সি. আই. ডি গণেশ গড়গড়ি—যিনি তোমার গতিপথ অহরহ লক্ষ্য করতেন।

তাঁকে আর দেখিনি কেন?

আর কোনোদিনই তাঁকে দেখতে পাবে না। আসল অপরাধী ধরা পড়েছে। তোমাকে ওয়াচ করার কাজও তাঁর শেষ হয়েছে।

চক্ করে একটা শব্দ করল বলরাম চাকী। তাঁর এই মুখের আওয়াজটি বড় অপূরণ।

বলরাম চাকী অনুরোধ করল, আর একটু বেলের শরবত খাও!

POPULAR FURNITURES

A-Class Furniture Makers, Designers & Indoor Decorators

Office :

Bye Pass Road, Chas, Dhanbad (Bihar)

Factory :

Bahmnia Road, Chas, Dhanbad (Bihar).

সাধারিক

অর্থবহ দুটি সংবাদ :

সম্প্রতি তামিলনাড়ু সরকারের পরিচালক ডি. এম. কে দলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরণানিধি রাজো মদের দোকান তুলে দিয়েছেন এবং মদ বেচা কেনা-বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ডি, এম, কে দল মহাস্বাক্ষীর বিরোধী। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজীর প্রভাবিত ছাত্র-যুবশক্তি পাটনায় মদের দোকান বন্ধের জ্ঞাত সত্যাগ্রহ শুরু করেছে। অপরপক্ষে গান্ধীজীর নামের দোহাই ধারা দেন তাঁরা রাজস্বের জ্ঞাত মদের কারবার অব্যাহত করেছেন। ১৯৬১ সালের ২৫ জুন তারিখের 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন, “আমাকে যদি এক ঘণ্টার জ্ঞাত সারা ভারতের ডিস্ট্রিক্টের নিযুক্ত করা হয় তা হলে সর্বপ্রথম আমি সারা ভারতের সমস্ত মদের দোকান তুলে দিব।”

রাজস্বের জ্ঞাত মদ বেচা প্রস্রব দেওয়া এক রকম গণিকারিত্তি। গণিকার প্রভাব সীমিত। নেশার অহিতকারী পরিধি ব্যাপক। নেশার ঝাঁক, তরুণ মহলের কিয়দংশে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছোঁয়াচে রোগের মত অস্ত্রকেও দলে টানছে। ক্রমবর্ধমান অসামাজিক প্রবণতার অন্যতম হেতুও ইহাই। এখনও সাবধান না হলে এর পরিণাম ভয়াবহ ও সমাজ জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

ভারতরত্ন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ :

ভারত রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ভারতরত্ন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ গত ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৫ পরলোক গমন করেছেন। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও মনীষা তাঁকে এই পদেরও বহুউর্দ্ধে স্থাপন করেছে। ভারতরত্ন উপাধিটি তাঁর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করে তিনি রাষ্ট্রপতি পদের যে গৌরববৃদ্ধি করেছেন তা

পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই জ্ঞানতপস্বীর মৃত্যুতে ভারতমাতা একটি অত্যাচ্ছন্ন রত্নকেই হারালেন। বস্তুত বহু সাধনায় বহুদিন ব্যবধানে দেশে একরূপ মনীষার আবির্ভাব হয়। দেশ বিদেশের সুধী সমাজের নিকট ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অতীত ও আধুনিক ভার এক সমন্বয় ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ স্মরণে প্রবর্তক সাহিত্যচক্র :

গত ৫।৪।৭৫ প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক সভায় মনীষী সাহিত্যিক বালিদাস মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অঙ্কীত হয়। অশোককুমার ভট্টাচার্যের উদ্বোধন, সঙ্গীতের পর সম্পাদক ডঃ সুনন্দন চক্রবর্তীর প্রস্তাব অনুসারে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

সম্পাদক তাঁর ভাষণে বলেন, আজ সব চেয়ে বেশী করে যা মনকে পীড়িত করে তা হল আমাদের পরম আত্মীয় একান্ত সুহৃদ, পরামর্শদাতা ও অগ্রজপ্রতিম কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তিরোধান। পঁচাশি বৎসর বয়সে গত ৭ই চৈত্র ১৩৮১ (ইং ২১।৩।৭৫) শুক্রবার তিনি সজ্ঞানে তার ঋষ্টিফার রোডের বাসভবনে পরলোকগমন

‘মর্মগাঁথা’, ‘হাসির হল্লা’, ‘ছায়াপথ’, ‘রামধনু’, ‘নভরেনু’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দাঙ্গগামী কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ প্রবর্তক সাহিত্য-চক্রের আত্মবিন সত্য ও আন্তরিক হিতৈষী ছিলেন। ময়মনসিংহের গৌরিপুরে তাঁর জন্ম হয়। পরাধীন ভারতের রাজনীতিতেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। যতীন্দ্রপ্রসাদের তিরোধানে আমরা একজন মহান আলোক দিশারীকে হারালুম। সদা হাস্যময়, প্রফুল্লচিত্ত ও বিশালহৃদয়ের এই মানুষটির সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনিই ধন্য হয়েছেন। সকলকে আপন করে নিয়ে আদর্শের আলো ধরতে এই নির্ভীক মানুষটির ক্ষমতা ছিল অসীম। অতঃপর ছুই মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁর অমর আত্মার উর্দ্ধগতি কামনায় সমবেত উপাসনায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

হিন্দুমহাসভার নববর্ষ উৎসব :

বিগত ১লা বৈশাখ ১৩৮২ বাংলা তারিখে সকাল ৮।৩০ মিনিট সময়ে ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা ভবনে গাভীর্ষপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম, এ, সি, আর এস, পঞ্চতীর্থ সপ্তশাস্ত্রী মহাশয়। সর্বপ্রথম গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। অতঃপর মহাসভার সঙ্কল্প বাক্য পাঠের পর বন্দেমাতরম সঙ্গীতের দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথমই মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমমুজচন্দ্র সর্দাধিকারী নববর্ষ উৎসবের উপযোগিতা ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং শাস্ত্রামুগ হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে সকলকে আহ্বোধ জানান। অন্যান্য বক্তারাও হিন্দু আদর্শের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতঃ বর্তমান যুগের দানবীয় আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ত সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন।

নেতাজী দাঁতব্য চক্ষু হাসপাতাল :

বিগত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৫ নেতাজী মৃত্যুচন্দ্র বর্মুর জন্মদিন পালন উপলক্ষে বকচড়ায় নেতাজী চক্ষু হাসপাতালে একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়। এই দাঁতব্য চিকিৎসালয়ে এই শুভ দিনে 'কুড়ি জন রোগীর ক্যাটা-রেকটু অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করা হয়। ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মিগণ বিনা পারিশ্রমিকে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করেন।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় মহকুমা হাকিম। 'নূতন আলো'র সম্পাদক, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক শ্রীদীপেন রাহা সভা পরিচালনা করেন।

নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন :

গত ২৩শে মার্চ, ১৯৭৫, শান্তিপুর ভারত পোন্ধারের বাড়ীতে নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলমত নির্বিশেষে শতাধিক সংগ্রামী জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে উপস্থিত হয়ে বর্তমান দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাতীয়তা, দেশ প্রেম, ও নৈতিক চরিত্রের পুনরুজ্জীবন কল্পে "নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সংঘ" নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হয়। শ্রীনরেন সোম এবং শ্রীমুবোধ চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সর্ব-সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীদ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ ভূপাল বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের ইতিহাস রচনা করার একটি কার্যক্রমও গৃহীত হয়।

কামারহাটি প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের (বালিকা বিভাগ) পুরস্কার বিতরণোৎসব :

গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৫, রবিবার, বিদ্যালয়ের মেধাভিত্তিক ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রবর্তক সংঘের সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ২৪ পরগণা জেলা-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। কামারহাটি বিধান সভার সদস্য শ্রীপ্রদীপকুমার পালিত এবং পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ডের সদস্য শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান বেলা ১০ ঘটিকায় আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্নে সমাপ্ত হয়।

বিদ্যাপীঠের প্রধানা শিক্ষিকা ও সম্পাদিকা শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক ও অগ্রাঙ্ক সহকর্মীদের সহযোগিতায় উৎসব সূর্য ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীবি.কর

প্রবর্তক পাব্লিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন শিমিটেড, ২২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবর্তক

দ্রষ্টব্য - বিজ্ঞান



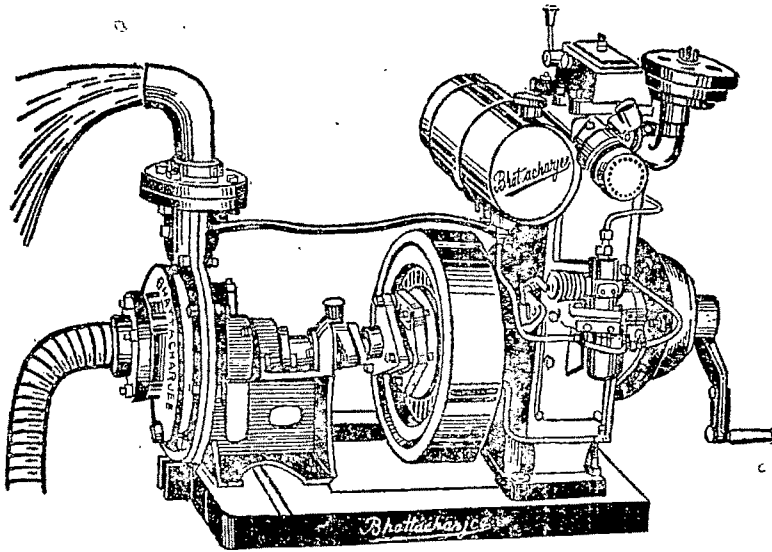
আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারন সামগ্রী



ভারত সরকারের গ্যারান্টি টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অগাঢ় সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্-
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, স্টীল পার্টস, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২১১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

সূচীপত্র : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

শিরোনাম	বি.	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	সজ্জবল্লী শ্রীমতিলাল	
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকা ঘোষ	৭৪
সম্পাদকীয়	...	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	৭৫
ধুন, না, বলি	কবিতা	নীহারকণা দাস দে	৭২
এ তাবেই সব শেষ হয় না	কবিতা	দেবশীষ দাস	৭৩
চাঁদকে	কবিতা	ভূপেন্দ্রনাথ শীল	৭৩
শেষের গান	কবিতা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১০০
কবি গান	কবিতা	চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০৩
অতীত ভারতের ঐশ্বর্য	নিবন্ধ	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	৮০
জাতীয়কবি ও সাধক বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ	প্রবন্ধ	অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	৮১
যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মেরই অনুলিপি	প্রবন্ধ	ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার	৮৪
কালীর রূপ বন্দনা	স্তোত্র	শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮৮
বিপ্লব যজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	জীবনালেখ্য	কিরণেন্দু বাগচি	৯৩
ডঃ অক্ষ কোলের দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ বসু	সমালোচনা	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	৯৭
ছবি	গল্প	শান্তনু দে সরকার	৯৮
রক্তের সম্পর্ক	গল্প	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	১০১
সজ্জ-সংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	১০৪
সাময়িকী	...	...	১০৭

কোলে

* বিস্কুট * * *

* লাজল * *

* জ্যাম জেলী আচার

স্কোয়াশ

* * *

নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০



WHITEST
GARMENTS
•
BRIGHTEST
LIFE

WASH WITH... **NEW TARGET**



DAWN INDUSTRIES
CALCUTTA • INDIA

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.

TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)

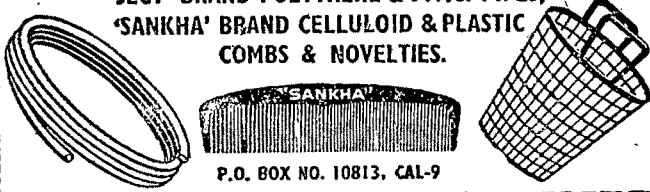
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

D. RATAN & Co.

Photographers **PHOTO**

1 CORNWALLIS ST. CAL-9

PHONE : 54 - 5711

ডি রতন & কোম্পানী

ফটোগ্রাফার্স

১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৫৪ - ৫৭১১

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিক : দশনসংস্কার চূর্ণ :
সারিবাছারিক : অশোকারিক : ব্রাহ্মী স্মৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় এটি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।



বুদ্ধজ্ঞান চিহ্ন

৬০ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮২

মে-জুন : ১৯৭৫

প্রবর্তক

বার্ষিক দক্ষিণা ছয় টাকা

প্রতি সংখ্যা পঁচাত্তর পয়সা

জীবনের আলো

আমরা কি উদাস্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিনি—ঐক্য আমাদের ভিত্তি, সংহতি আমাদের প্রাণশক্তি। কার্যতঃ তাহা যদি সিদ্ধ না হয়, মিথ্যাকেই কি আশ্রয় দেওয়া হয় না? আর এই পাপ বড় হয়ে আমাদের উত্তম ও অধ্যবসায়কে কি ব্যর্থ করে না? আমাদের হৃদয়ভেদ কি মৃত্যুর কারণ হবে না?

মনই হৃদয়ের কারণ। আঘাতে সত্যে মিথ্যায় মনেই সাড়া তোলে—কিন্তু ইহার উপরেও মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় আছে, সে বুদ্ধিও যদি বিচলিত হয়, আছে অমৃততত্ত্ব অম্বা। তার সন্ধান না যদি পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ আছে গুরুশক্তি। ইহাই মাতৃকোড়, অনাময় ক্ষেত্র। এইখানে তখন ছুটে আসতে হয়। মনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে কাজ, তাহা হয় ভিদ। ইহা ক্ষয় করে প্রাণ, অসন্তোষ বাড়ায় তাই স্টিক নিরাপদ ক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়ে জয় করে দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি। সিদ্ধ আধারেই তো সিদ্ধ বীৰ্য মূর্তি নেবে দিগ্বিজয়ী বেশে।

ক্ষণে ক্ষণে হোক মন। বিনা আঘাতে লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, আত্মসংগ্রামেই রক্তাক্ত হতে হয়। এ অভিজ্ঞতা আছে। মনের ধর্ম স্বভাবের সুরে গান গাওয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সংঘাতে তা' শোনায বেহুশো, অশান্তির কোলাহলে পরিণত হয়। এই হাতেই মানুষ হারায় আপনাকে, আপনার জনকে পর করে, তাই সাবধান।

নিজের কৃতিত্ব কুরুক্ষেত্রে নেই, সবই চক্রীর চক্রান্ত। রথী এখানে বড় নয়, সারথির কণ্ঠে উঠে বেদধ্বনি রথী যন্ত্র, যন্ত্রী তাই ভগবান। রথী মনের মানুষ; সে সর্বদাই বলে, 'দূর ছাই, রুখা ঝাট'—ইহা বড় মনের কথা। ছোট মন দুর্বোধন—সে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, জয় তার অবশ্যভাবী এ আশা ছুরা।। যে রথীর পুরোভাগে সারথি, সে নিজে উদাসীন। কিন্তু এই সবাসাচীই জয়ী হয় দারুণ দৌর্মণে—কেন না ভগবান তার মনকে সর্বদাই তাজা রাখেন, প্রতিপদেই বলেন, 'ক্লৈব্যং মান্স গমঃ'। দুর্বোধনের কানে এ বাণী শোনাবার মানুষ নাই, আর তার কানে এ সুর ভালও শোনায না। কর্তৃত্ব ও আত্মাভিমানের বর্মে তার কর্ণপটাহ আচ্ছাদিত।

যাহ তোমাদের স্বধর্ম, যাহা তোমাদের অমৃততত্ত্ব—সেই প্রেম ও ঐক্য কথায় নাই; জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় তাহা অর্জন কর। যদি হও পার্থ, তবে আজও বলি জয় অবশ্যভাবী সর্বক্ষেত্রে। কেন না

যত্র যোগেশ্বরো কুরুো যত্র পার্থঃ ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিক্ষুবানীতির্মতির্মম॥

অল্প আশা আমার নাই। সকলকেই বলি—'নাশপন্থাঃ'। এই শুভচেষ্টনা কঠোর কুরুক্ষেত্রে হারিও না—
সজয়গুরু শ্রীমতিলাল

সজয়বাণী : ২রা আষাঢ় ১৩৪৫, ১৬ই জুন, ১৯৩৭

বেদমন্ত্র

প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ দ্বাদশং সূক্তং ॥ পঞ্চমী-ষষ্ঠী ঋক্ ।
(মণ্ডলস্য অষ্টপঞ্চাশং সূক্তং)

তপুর্জন্তো বন আ বাতচোদিতো যুথে ন সাহস্রী অববাতি বংসগঃ ।

অভিব্রজমক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ ॥৫

দধুষ্ণা ভৃগবো মানুষেষু রয়িং ন চারুং সূহবং জনেভ্যঃ ।

হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে ॥৬

অন্বয়—তপুর্জন্তো অগ্নি বাতচোদিত অক্ষিতং রজঃ পাজসা অভিব্রজন্ বনে সাহস্রন্ যুথে বংসগঃ ন আ অববাতি । পতত্রিণঃ অগ্নিং স্থাতুঃ চরথং ভয়তে ॥৫

হে অগ্নে মানুষেষু ভৃগবঃ দিব্যায় জন্মনে ত্বা (ত্বাং) চারুং রয়িং ন আ দধুঃ । ত্বং জনেভ্য সূহবং ত্বং হোতারং, অতিথিং, বরেণ্যং, মিত্রং ন শেবং ॥৬

ব্যাখ্যা—তপুর্জন্তঃ অগ্নে (তপুংষি 'আলা' এব জন্তা আয়ুধানি মুখানি বা যন্ত সঃ তথোক্তে—সায়ন। 'আলাই বাহার আয়ুধ বা মুখ) বাতচোদিত (বায়ুচালিত শিখাসমূহ) অক্ষিতং (অক্ষীণঃ অশোষিত) রজঃ (উদক, বৃক্ষরস) পাজসা (বলের দ্বারা) অভিব্রজন্ (আক্রমণ করিয়া) বনে সাহস্রান (বনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া) যুথে বংসগঃ ন (গোযুথের মধ্যে বৃষের ছায়) আ-অববাতি (সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া) পতত্রিণঃ অগ্নিং (পতনশীল অগ্নিকে) স্থাতুঃ (স্থাবর) চরথং (জঙ্গম) ভয়তে (ভয় পায়) ॥৫

হে অগ্নে মানুষেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) ভৃগবঃ (ভৃগুরা বা ভৃগুবংশীয়রা) দিব্যায় জন্মনে (দিব্যজন্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত) ত্বা (ত্বাং—আপনাকে) চারুং রয়িং ন (শোভন ধনের ছায়) আদধুঃ (ধারণ করিয়াছিলেন) ত্বং জনেভ্যঃ (আপনি মনুষ্যদিগের বা যজ্ঞমানদিগের জন্ত) সূহবং (সুহবিস্বরূপ) হোতারং (দেবতাদিগের আহ্বানকারী) অতিথিং (অতিথি) বরেণ্যং (বরণীয়) মিত্রং ন শেবং (মিত্রের ছায় আনন্দদায়ক) ॥৬

সরলার্থ—জালামুখী অগ্নি বায়ুচালিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত শিখাদ্বারা অশোষিত বৃক্ষরস সবেল শোষণ করিয়া গোযুথের মধ্যে বৃষের ছায় বনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সর্বত্র ব্যাপ্ত এই অগ্নিকে স্থাবর জঙ্গমের সকলেই ভয় পায় ॥৫

হে অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে ভৃগুগণ দিব্যজন্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত শোভন ধনের ছায় আপনাকে ধারণ করেন। আপনি যজ্ঞমানের নিকট সুহবিস্বরূপ, দেবতাদের আহ্বানকারী, অতিথি এবং বরণীয় মিত্রের ছায় আনন্দদায়ক ॥৬

পঞ্চমা ঋকে নোদা ঋষির দাবাগ্নির সার্থক বর্ণনা। বনে অগ্নি আপনাআপনি জ্বলিয়া উঠিয়া সজীব বৃক্ষরাজিকেও যেভাবে দগ্ধ করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে ধাবিত হয়—তাহা ভয়ের কারণ বৈ কি। কিন্তু ষষ্ঠ ঋকে ঋষি একটি নূতন বার্তা শুনাইয়াছেন। সে বার্তা দিব্য-জন্মের। মানুষের মধ্যে যে প্রাণাগ্নি আছে তাহা যদি দিব্য হয়, শুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই মানুষের জন্মও দিব্য হইবে। এই অনুভূতি নোদা ঋষির মতে ভৃগুরাই প্রথম লাভ করেন। প্রাণই কর্মের দ্যোতক; প্রাণই জীবনীশক্তি। জীবনকে দিব্য করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাণের শুদ্ধি। প্রাণাগ্নির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞাগ্নির সাধন। অগ্নির শিখা স্বভাবতঃই উর্দ্ধমুখী। যাহা কিছুই অগ্নিতে তর্পণ করা হয়—তাহাই ধূমে, বাষ্পে ও বায়ুতে পরিণত হইয়া উপদের দিকেই উঠিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনার উন্মেষও উর্দ্ধমুখী হয়। প্রাণাগ্নির সহিত যজ্ঞাগ্নির একীকরণ করিয়া দিব্য জন্ম ও দিব্যজীবনেরই পথ প্রদর্শক ভৃগুরা ॥

রেণুকণা ঘোষ

সম্পাদকীয়

ততঃ কিম্ ?

‘অথাৎ: অর্থজিজ্ঞাসা’র (গত বৎসর ১৩৮১ সালে আলোচিত) পরে প্রশ্ন ততঃ কিম্—তারপর কি ?

প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল।

প্রবর্তক সজ্জের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতৃ আলোকদিশারী সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল। সজ্জের ভাববাহী পতাকা প্রবর্তক পত্রিকারও তিনি প্রাণপুরুষ।

সজ্জগুরুজীর সুদীর্ঘ জীবন (১৮৮২-১৯৫২)। এই জীবন বহু বিচিত্র বিপরীতমুখী ঘটনায় ঠাসা—নানা বৈপ্লবিক আবর্তন বিবর্তন অম্বর্তন দিক্‌পরিবর্তনে চিহ্নিত। কিন্তু এই সত্যানুসঙ্গানীর জীবনধারা বিশেষ বহুমুখীনতার মধ্যে পথ হারায় নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মিক ও চারিত্রিক মূলগত সত্যস্বরূপে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে।

সজ্জগুরুজীর জীবনের সত্যকার ইতিহাস তাঁর এই লোকচক্ষুর অন্তরালের অন্তর্জীবনেরই ইতিহাস। ফল্গু-প্রবাহী এই অন্তর্জীবনধারার শীরশৃঙ্গ চলন্তোত্তের উর্মিমাল্য বাহু ঘটনাক্রমে প্রকটিত। এই বিচিত্র স্বরিরোধী ঘটনাবলীর বুদ্ধির বিচার ও মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত মহাপ্রবর্তক মতিলালের স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলিতে পারিবে না—যাহা পারিবে তাহা একটা দিক্‌দিশা মাত্র। অথচ তাঁর অন্তঃস্বরূপ নিরূপণের অবলম্বন এই বাহু ঘটনাই।

শ্রীমতিলালের বিচিত্র বহুল ঘটনা ও তথ্যপূর্ণ জীবনের একটমাত্র বিশেষ পর্যায়ের বিচার তাঁর জীবনসত্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করিবে। সত্যের সমগ্র রূপটি তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না—এমন কি আংশিকও নহে। স্বরূপাভিমুখী জীবনাব্যক্তির আবর্তে ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া-আসা বিচিত্র জীবনের ক্ষণিক মিলন তাঁর আত্মার উদ্ভাসিত উত্তরণের সহায়ক হইলেও, তাহা তেমনি ঘূর্ণাবর্ত কাটাইয়া আবার তার গন্তব্য পথে ভাসিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ

শ্রীমতিলালের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্রতার মধ্যে আছে তাঁর বিভিন্ন জীবনপর্যায়ের, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচিত্র রূপ-বিবর্তন যাহা তাঁহার জীবনের কেন্দ্রীভূত স্বরূপ সত্যের বিহ্বাৎ-চমকের মতো ক্ষণিক বিকাশ। ইহা তাঁর স্বরূপ সত্যের অভিমুখে পথ-পরিভ্রমার দিক্‌দিশা বলা যায়।

সজ্জগুরুজীর অন্তর্জীবনের স্বরূপ সত্যটি বোধগম্য করার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে নৈর্বাচক প্রাক্‌সংস্কারবর্জিত দৃষ্টিকোণ, গভীর অভিনিবেশ, সুনিবিড় অনুধ্যান, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং তাঁরই আত্মপরিচয়-মূলক লেখা, কথা ও বাণী। যেহেতু যোগজীবনসিদ্ধ মহাপুরুষ একমাত্র তাঁর কথা তিনিই অবিকৃত বলিতে পারেন—অথো নহে। সজ্জগুরুজী প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা যথাসম্ভব সেই পথই অনুসরণ করিয়াছি।

প্রকান্ত বিষয় অবতারণার প্রারম্ভে প্রসঙ্গটি বুঝিবার আনুকূল্য এখানে এই ভূমিকাটুকু করার প্রয়োজন ছিল। সজ্জগুরুজীর উপলব্ধি সত্য এবং এই সত্যের আঁকর উৎস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা না থাকিলে তাঁর অন্তর্মুখীন ও বহিমুখীন জীবন বিকাশের মৌল ধারাটি ঠিক উপলব্ধি করা যাইবে না, বরং বিতর্কেরই হেতু হইবে। তাঁর স্ব-ভাব, প্রকৃতি, পরিবেশ, মানস গঠন, উত্তরাধিকার, দেশ-কাল-পাত্রসংশ্রয়জনিত যে স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি ও প্রেরণা তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁর তত্ত্ব-দর্শন-মিশন, জীবন, কর্ম, পরিকল্পনা, প্রচেষ্টাপ্রযত্ন, প্রকল্পসমূহ অবর্তিত। ইহার একটি রূপরেখা নিয়ে প্রদত্ত হইল যথাসম্ভব বিভিন্ন সময়ে ও প্রসঙ্গে তাঁরই দেওয়া সংকেত অনুসরণে।

(১) জীবন, জগৎ ও স্বজনদর্শন বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি প্রতিসম্মত। স্ব-বর জন্ম বিবেচ্য অনন্ত বৈচিত্র্যের আধার এক সংবস্তু। এই সং চেতনবস্তু —নিষ্ক্রিয় স্থানুমাত্র নহে, পরন্তু স্বয়ং অনন্ত বিচিত্ররূপে

নিত্য প্রকাশশীল—কবি মনীষী পরিভূ-স্বয়ন্তু স্বরূপে নামরূপ গুণাশ্রয়ে প্রকাশাত্মক পূর্ণচৈতন্যের আশ্রয়।

(২) এই সং ও চিং—জগতাতীত ও জগৎ—অপ্রকাশ ও প্রকাশ—নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। দুই-এ মিলিয়াই এক অখণ্ড তত্ত্ব। শক্তিসহযোগে ব্রহ্মই পূর্ণব্রহ্ম—স্বয়ং প্রকাশ—স্বয়ন্তু। পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ অখণ্ড সত্যস্বরূপ। সত্যের সমস্ত বিভাব এই সং ও চিদিতর অখণ্ড স্বরূপে সমাহত—‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।’

(৩) সজ্জগুরুজীর সাধা-সাধনের মূলগত লক্ষ্য ভাবগত জীবন, এককের নহে একটা সমষ্টির, যাহা ক্রমবিস্তৃতি ভাগবত জ্ঞাতিরূপে হইবে অভিব্যক্ত। ভারত সভ্যতার মর্মগত অভিসন্ধিও ইহাই। বেদ উপনিষদে ইহার ইংগিত থাকিলেও সুস্পষ্ট বিস্তার নাই। ১৯৩৬, ২২-এ আগষ্টের বাণীতে ইহার যে দিগদর্শন তিনি দিয়াছেন তাহা এখানে তাঁরই নিজস্ব জবানীতে উদ্ধৃত হইল :

“ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—ভারতের ধর্ম এই পর্যায়ক্রমে বিকশিত। এই পর্যায়ক্রমে ভারতের ধর্ম-ইতিহাস। ব্রহ্মতত্ত্ব নিছক দার্শনিকতা। আত্মা যোগবিজ্ঞানরূপে প্রকটিত। ভগবান জীবন সিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম দেহ, আত্মা হৃদয়, ভগবান অবতার এই দুইয়ের উপরই জাগে দর্শন, পরে যোগ, তারপরে সিদ্ধ মূর্তি ভগবান। রহস্য—কিন্তু সিদ্ধেক্ষেত্রে স্পষ্ট দিনের মত পরিষ্কার।

“ভগবান নিয়েই পূর্ণ যোগ—ভাগবত জীবন। ব্রহ্ম লয়, আত্মায় জাগরণ, ভগবানে প্রকাশ—দিব্য জন্ম। ভগ + বান্ = পুরুষ আর প্রকৃতি। ইচ্ছা আর তার পূরণ শক্তি। ঈশ্বর লীলা। ব্রহ্ম জগৎ। আত্মা চৈতন্য, ভগবান লীলা। নতুবা সব মায়া।

“নরদেহে ভগবান অবতার হয়।

এ কথা শুনিয়া কেবা করিবে প্রত্যয়।”

“ইহা গীতারই প্রতিধ্বনি। গীতায় ভগবানতত্ত্ব। বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব। পাতঞ্জল প্রভৃতি যোগ সংহিতায় আত্মতত্ত্ব।

“গীতায় ভাগবৎ তত্ত্ব, গীতার ভাষ্য বাংলার বৈষ্ণব গ্রন্থে বিস্তারিত—শঙ্কর রামানুজে নয়।

“আশ্রয় যার অব্যর্থ হয়, সেই পায় দীক্ষা। দীক্ষা জীবে আর ভগবানে পরিণয়। সং-এর সঙ্গে অসং যাহা, অনিত্য যাহা, তাহার সন্ধি। এই যুক্তি অপরূপ স্থিতি। ইহাতেই বিগ্রহ গড়ে উঠে। বিগ্রহ না হলে সেবার ক্ষেত্র নাই। আশ্রয় পাওয়ার আগে শ্রদ্ধা। দীক্ষায় ভক্তিনিষ্ঠা। সেবায় প্রেম। নতুবা সংহতি স্থিতি হয় না। গুরু ভিন্ন এ পথ দেখায় না কেউ। গুরু আশ্রয়। দীক্ষা ও সেবা সাধন। সংহতি সিদ্ধি। সজ্জ সিদ্ধ বিগ্রহ। এইরূপ সংহতি সিদ্ধজ্ঞাতির অঙ্কুর।

“এ শাস্ত্র বেদান্ত নয়। এ শাস্ত্র যোগাদি গ্রন্থও নয়। বরং সিদ্ধ অবস্থায় গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ। হৃদয়গ্রন্থি খুলে গেলে নূতন বেদ কণ্ঠে উদগীত হয়, নূতন শাস্ত্র প্রতিভায় ফুটে উঠে। গীতা আশ্রয়। বৈষ্ণবযুগের ইতিহাস অনুশীলনযোগ্য। জীবন শ্রীভগবান (অর্থাৎ ভগবানের প্রকাশ আশ্রয়)। যত তাঁর ইচ্ছা মূর্ত হবে, সত্য হবে, ততই সেবার আনন্দে ও রসে আত্মপুষ্টি। এই চেতনা সংহতিতে লীলায়িত হয়ে উঠবে।

“এই জীবন সাধনায় বিধিমাগ নাই—আছে রূপ-মাগ।

“হৃগম পথ। মানুষের নয়—দেবস্বভাব নিয়ে চিহ্নিতের। আমি চিহ্নিতদের আহ্বান করি। ভারত সাধনার প্রদীপ্ত ইতিহাস। কত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবীর, চৈতন্যের জন্ম—এদেশে চিহ্নিতের অভাব নাই। বলি এহি—একাশ্রয়ী এহি। আমি দীক্ষাদাতা, তুমি সেবা দাও—সংহতি বিগ্রহ রচনা কর। সার্থক কর স্বপ্ন, অতীষ্ট সিদ্ধ কর। উদ্বৃত্ত হও আত্মদানের মস্ত্রে। বস্তুতন্ত্র জীরনযজ্ঞে হবিদানের আহ্বান উপেক্ষা মৃত্যুর নামান্তর।...আজ্জ কে মরণ চায়? বলি মাথা তোলা, মৃত্যুকে কটাক্ষে বিদায় দাও। তুমি আর ভগবান, মাঝে কেহ নাই। আনন্দে উন্মাদ হও! বিশ্বজয়ে অভিযান কর নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে।”

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণবীয় মরমীয়া সংতেকগর্ভ ভাষায় সাধা-সাধন ও সংহতি-বিজ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধির বিচারে নয়, মর্ম দিয়াই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রেমিক্য ভিত্তিক ভাগবত জীবন ও জাতি গঠনের বনিয়াদ রচনার প্রয়াস বাংলার বৈষ্ণবসাধনজ্ঞান অনন্য বৈশিষ্ট্য। বাঙালী প্রেম-বৃন্দাবনের আবিষ্কারক। বৃন্দাবনের রাগরঞ্জিত মুরলী-মুচ্ছনা সংগ্রামজীবনের কুরুক্ষেত্রের কর্কশ মরুময়তাকে করিয়াছে সরস সজল।

এখানে লক্ষণী= যে, সজ্জের জগদ্ধিতার নিকাম প্রেমসেবামূলক কম-ঘোণের রহস্য এই ঈশ্বরের-প্রকট জন্মতিতত্ত্বে। এ শতকের চতুর্থ দশকে ঘোষিত শ্রীমতিলালের রাগমণীয় সাধ্যসাধন শুভ্র দ্বিতীয় দশকে মহাশয় শ্রীশ্রীরবিন্দে নিদেশিত তন্ত্রাশ্রয়ী যোগবিজ্ঞান-ভিত্তিক দিব্য জীৱন ও জাতিসাধনার প্রভাব অনুপস্থিত।

(৪) বস্তুতন্ত্র জীবন, বাস্তব বিশ্বমুখীনতা, নিরন্তর শ্রম—সজ্জগুরুজীর জীবন সাধনার অভিনবত্ব। তাঁরই ঘোষণা (সং: বাঃ ২: ৬।৩৭)। “কাকি দিয়ে মহং কাজ হয় না। চালাকি করেও বড় আঙ্গ হয় না। ভাবুকতা নয়, বাস্তবতার কুরুক্ষেত্র। প্রাচীন বা প্রচলিত সংস্থার সঙ্গে প্রবর্তক সজ্জের তুলনা হয় না। ধর্মক্ষেত্রে আমি অভিনবকে বহন করে এনেছি।”

সজ্জগুরুজীর বস্তুতন্ত্র জীবন ও বিশ্বমুখীনতার পটভূমি হইতেছে এক সর্বান্বেষী সংবা চেতনবস্তু—ধর্মবর্জিত নহে—ব্যাপ্তি হইবে ধর্মের বিগ্রহ আর জাতি হইবে ধর্মের বিজ্ঞাপন।

(৫) মানবতন্ত্র বা মানবতাবাদ সজ্জগুরুজীর জীবনসাধনার অতীতম মুখ্য অঙ্গ।

বর্তমানকালে পৃথিবীব্যাপী যে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকার তার প্রাণস্বরূপ কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে মানবতন্ত্র। মানবতন্ত্র এবং মানুষের জন্মই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র শিক্ষা সভ্যতা সমাজ রাষ্ট্র অর্থ—এক কথায় মানবজীবনের বিকাশ ও কল্যাণে সব কিছুই আবর্তিত। কালক্রমে এই মানবতাবাদ অবশ্য ধারণায়, লক্ষ্যে ও প্রয়োগে রূপান্তর লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক হিউম্যানিজম বিংশ শতকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজমে পরিণত হয়।

ইউরোপের রেণেসাঁ যুগে এই মানবতন্ত্রের জন্ম এবং পরবর্তী কালে বিগত ও বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে ইহার অবাধ বিশ্বব্যাপ্তি। উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্তর্প্রবেশের সঙ্গে এই মানবতন্ত্রের চমৎকারিত্ব পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের চিত্তমন বিষয়বিমুগ্ধ করে—জীবনের নতুন দিগন্ত করে উন্মোচিত। ডিরোজীও প্রমুখ মানবতাবাদীর প্রভাব ‘ইয়ং বেঙ্গলকে’ উন্মাদ করিয়া তোলে। এ বিষয়ে ভারতের নিজস্ব যে তাত্ত্বিক দার্শনিক ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত তাহা ক্রমশঃ জ্ঞান কোণঠাসা ও বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

বিগত শতকের শেষার্ধ্বে হইতেই ভারত-চেতনা ক্রমশঃ আত্মস্থ হইতে শুরু করে। রাজনারায়ণ-ভূদেব-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণ-বিশিন পাল-অরবিন্দ-রবীন্দ্র প্রমুখ ক্রমে আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটিতে থাকে। এই ক্রমেই সজ্জগুরুজীরও আসরে অবতরণ। তাঁর এই মানববাদী ধারণায় বিশিষ্ট যে অবদান তাহা বিশদ করার অপেক্ষা রাখে। সজ্জগুরুজীর সাধ্য-সাধনায় বিশেষ ভাগবত-জীবন ও জাতিগঠনে ইহা একরকম মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া বিদ্যমান, বলা যায়। ভারতীয় বিশেষ বাংলার সাধন সংস্কৃতিসম্মত সজ্জগুরুজীর পারমার্থিক মানবতাবাদ মানবসভ্যতার উন্নয়ন সমুন্নয়ন লক্ষ্যে বিশিষ্ট অবদান।

(৬) সজ্জ ও সজ্জনতা : প্রবর্তক সজ্জের দৃষ্টা ও দৃষ্টা শ্রীমতিলাল। কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সংগঠিত দল সজ্জ নহে! একরূপ দল ভাঙ্গে ও গড়ে। মনের মানুষের একত্র সমাবেশে যে দল তাহা স্থায়ী হয় না—হইতে পারে না। মনের অমিলে দলভ্যাগ করে, করে বিরোধিতা। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই মনের মানুষ লইয়া কোনদিন স্থায়ী স্থিতি সম্ভব হয় নাই, হইবেও না।

সজ্জগুরুজীর কথা—“ভারতের সত্য রক্ষার জন্য মনের মানুষ চাহিনা—চাই মনের উপরের মানুষ। মনের উপরে মানুষের চেতনা যদি স্থির হয় আর সেই চেতনা যদি অনাসক্তির ক্ষেত্রে হয়, এইখানে এইরূপ অধিকারের

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যদি কিছু করে তবেই তাহা স্বাধী হইতে পারে। এই যে দীর্ঘ জীবন ধরিয়া সর্ব সৃষ্টির প্রেরণা ইহার সাফল্য নির্ভর করে না মনের মানুষের মিলনে। ভারতের সনাতন সংস্কৃতি আজও যে টিকিয়া আছে তাহার হেতু এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতে নির্মাণ হইয়াছে।”

সজ্জের সাধ্য প্রেম ও ঐক্যের ভূমি তাই মন নহে— মনের উপরের প্রজ্ঞালোকে, বিজ্ঞানভূমি বা ‘সুপার মাইণ্ডে।’ সজ্জের লক্ষ্য হিসাবে তাই নির্দেশিত হইয়াছে—ভাগবতচেতনায় ব্যক্তিজীবনের প্রতিষ্ঠা এবং এইরূপ চেতনপ্রতিষ্ঠা মানুষের সজ্জত্ব।

সজ্জের লক্ষ্য সংক্ষেপে বলা যায়—ভাগবত ধর্ম, ভাগবত জীবন ও ভাগবত জাতিগঠন। ইহার উৎসমূল হইতেছে গীতা, ভাগবত, গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন।

ভাগবত ধর্ম জীবাত্মার সহজ নিত্য ধর্ম—কোন প্রচেষ্টা-প্রযত্নসাপেক্ষ নহে—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ-ত্যাগেরও নহে। ভোগ-ত্যাগের পথে অহংকারের লুকোচুরি থাকে। সম্পূর্ণ নিষ্কাম অহেতুক আত্মদানে এই ধর্ম লক্ষিত। কালবশে অত্যাশ্রয় মার্গের মত এই আত্মধর্ম পরিবর্তনশীল নহে। যেহেতু ভগবান ও জীবাত্মার ইহা নিত্য সম্বন্ধ। ভাগবত ধর্ম, ভাগবত জীবন ও জাতিগঠনের গভীর গভীর নিগূঢ় রহস্য নিহিত গুরু-কেন্দ্রিকতায় ও গুরুর ভগবত্তায়। গুরুরেব পরমব্রহ্ম, ‘গুরুই ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বর, গুরু নরদেহধারী পুরুষোত্তম ভগবান, ভগবান প্রকটিত শ্রীগুরুর আধারাশ্রয়ে—এই নিঃসংশয় বিশ্বাস ও উপলব্ধি। অতথায় ভাগবতজীবন ও জাতি সন্তবপর হয় না। যেহেতু বাস্তব সৃজনের পরমগীর্ষ নিষ্কর্য স্থান অচল ব্রহ্ম বা আত্মায় নাই—আছে মানুষী তনুধারী ভগবানে। শ্রীভগবানের পরম পাবনী শক্তিমূর্তি শ্রীগুরু জীবের ষথার্থ আপন জন। শ্রীভগবানের কৃপাধন করুণাবতার সদগুরু। গীতার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ইহাই। ভারতে বিশেষ বাংলায় যে কোন ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানে শ্রীগুরু এইভাবেই গৃহীত পূজিত হন বলিয়াই ব্যক্তির মনোবল, উৎসর্গ ও আত্মদান—যাহার নজীর কোন রাষ্ট্র বা অর্থমূলক তন্ত্রে মিলিবে না—না মিলিবে পশ্চিমী মানবতন্ত্র বা মানবতাবাদে।

ভাগবত ধর্ম তথা ভাগবতজীবনে মুখ্য সাধনা দ্বন্দ্বের সহজ অনুরাগ, অপ্ৰাকৃত প্রেম রস। তত্ত্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ‘সাঁ নিষ্ঠা পরমেশ্বরে’—দ্বন্দ্বের একান্ত অনুরক্তই তত্ত্ব প্রেম রতি রস। অলক্ষ্য, অনির্দেশ্য, অনাস্বীয়, অপরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রেম প্রীতি অনুরাগ উদ্ভিক্ত হইতে পারে না—যেমন বন্ধ্যার অপত্য স্নেহ হয় না।

ভাগবত ধর্ম ও জীবনবাদী প্রবর্তক সজ্জ সজ্জগুরু-জীর আধারাশ্রয়ে ভগবত্তার প্রকট হইয়াছিল। প্রবর্তক সজ্জের গায়ত্রী মন্ত্রে ইহার মাসিক রহস্যটি সংগৃহীত। গায়ত্রী মন্ত্রটি হইতেছে—‘যোগেশ্বরায় বিদমহে, সজ্জ তজ্জায় ধীমহি, তন্নো ইষ্ট প্রচোদয়াৎ।’ এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রটি ভাগবতজীবন, ভাগবত সজ্জ ও সজ্জগুরুজীর অভীষ্ট ভাগবত জাতির সংকেত বহন করে।

যোগ-ভূমিকায় আকৃত অবস্থায় সজ্জগুরুজী স্বকীয় ভগবত্তার বার্তা বার বার বহবার ঘোষণা করিয়াছেন।

বক্ষ্যমান নিবন্ধের অত্র তিনি আহ্বান করিয়াছেন—“বলি, এহি একাশ্রয়ী এহি। আমি দীক্ষাদাতা, তুমি সেবা দাও, সংহতি বিগ্রহ রচনা কর।”

এই যোগাক্রুত অবস্থায়ই তিনি যোগেশ্বর। বার কয়েক গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই যোগাক্রুত অবস্থা অপনীত হইলে আর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন নাই।

“ন চ শক্যং পুনরুক্তং অশেষণ ধনঞ্জয়,
পরং হি ব্রহ্মকথিতং যোগযুক্তেন তময়া।”

শ্রীঅরবিন্দকেও যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যোগাক্রুতমাত্রকেই যোগেশ্বর বলা যায়। ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্য ইহাই। ধারা সাধন বিশেষ রাগমার্গীয় শরণাগতি সাধনপথের পথিক তাঁরা জানেন গুরুতে মানুষ জ্ঞান আসিলেই সব সাধনাই হয় পশুশ্রম। আসলে এক্ষেত্রে তত্ত্ব রাগ রতি প্রীতিরসই দাঁড়ায় না—জমাট বাধে না। বৈধি সাধনের মতো প্রাকৃত শ্রীগুরুমূর্তিতে অপ্ৰাকৃত ভগবানের আরোপ নয়—বোধে প্রত্যক্ষিত হওয়া চাই।

সম্পাদকীয়-র সীমিত অবসরে সজ্জগুরুজী তথা প্রবর্তক সজ্জের আদর্শ ও লক্ষ্য বিশেষ অন্তরঙ্গ সাধ্য সাধনার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মাত্র দেওয়া হইল। দিব্য প্রয়োজন ছিল এইজন্ত যে, সাধারণতঃ সীমিতলাল সজ্জীয় আলোচনা তাঁর বহিরঙ্গ জীবন, কর্ম—বিপ্লবী, কর্মী, সংগঠক, অর্থসাধক ইত্যাদি লইয়াই আলোচিত হইয়া থাকে। এই বাহ্য আলোচনায় সাধারণতঃ তাঁর অন্তর্জীবন ও সাধনরহস্য উহাই থাকিয়া যায়। অবশ্য এখানে যাহা উক্ত হইল তাহা আরও ব্যাপক বিশদ করার অপেক্ষা রাখে। বারান্তরে সজ্জগুরুজীর লক্ষিত ভাগবতজীবন ও জাতিগঠনের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

খুন, না, বলি

নীহারকণা দাস দে

আজ এইমাত্র

একজনকে খুন করে এলাম।

সে আমাকে নিয়ে-

অনেক খেলা খেলেছে।

তার পরিত-প্রমাণ ইচ্ছার পেছনে-

সে আমাকে

ক্ষাপা কুকুরের মত-

ছুটিয়ে মেরেছে;

চতুর্দিকে কত মধুর, কত সুখের

কত প্রেমময় হাতছানিকে

আমি অবহেলা করেছি,

শুধু ঐ হৃদাস্ত লোভী

অহংয়ের পেছনে

ছুটে বেড়িয়েছি

তার আজ্ঞাবহ দাসের মত।

আজ সন্ধ্যায়

যখন পশ্চিম গগনে

সূর্য্যদেব

তার সাতরঙা বশিক

নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছেন,

যখন পৃথিবী রবি-বিরহে

কালো বসনে মুখ ঢেকে

চোখের জল সামলাচ্ছে,

ঠিক তখনই

আমার চলাই পথের মন্দিরে

ঢং ঢং করে বেজে উঠল পূজার ঘণ্টা

আমার দেহমন

এক অজানা, অচেনা

আলোকে উদ্ভাসিত হলো,

সেই জ্যোতির বিভাষ

আলোকিত তনুমন

নত হয়ে পড়ল পূজা-প্রাঙ্গণে

আর অজান্তে

অহংয়ের টুটি চেপে ধরে,

তাকে—

নির্ধূরভাবে হত্যা করলো।

এভাবেই সব শেষ হয় না

দেবানীষ দাস

গাছ থেকে সৌরভ নিয়ে

তুলে দিলে সুদেষ্কার হাতে,

বেকুব, বুঝেছিলে ডুল

সকল সুগন্ধি হাত মৃদু করে নেওয়া যায়—

না কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

উঠানে গন্ধরাজ কিষা হাসমুহেনা সাজিয়ে

ভেবেছিলে তুমি তাবৎ গন্ধ লুটে নেবে।

অথবা গোলাপবাগে গিয়ে পা টিপে টিপে

চুরি করবে সকল সৌন্দর্য।

কিষা একরাশ রজনীগন্ধা দিয়ে বলবে

ভালবাসি শুধু তোমাকে।

গর্দভ, সৌন্দর্য কি নেওয়া যায় চুরি করে?

ভেবেছিলে, এভাবেই শেষ হয়ে যাবে সব

যত সুগন্ধ কিষা ভালবাসা

ছ'পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাবে।

এ ভাবেই কি শেষ হবে সব?

চাঁদকে

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

আকাশের রাণী তুমি।

আদিমকাল থেকে তোমার স্বপ্ন কবিদের কল্পলোকে।

বিজ্ঞানীদেরও তুমি করেছ আকর্ষণ।

কবির ভালবেসেছে তোমাকে,

কাব্যে তোমাকে রূপ দিয়েছে কত ভাবে,

ডেকেছে কত নামে।

তোমার রূপালী জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্য বাড়ায়,

তাজমহলকে আরও রমণীয় করে।

অন্তকাল ধরে তুমি প্রেমের সহচরী।

তোমার জ্যোৎস্না প্রেমের তৃষ্ণা বাড়ায়,

প্রণয়ীকে বিমনা করে।

বহুবিচিত্র তোমার নাম। মোহিনী তোমার রূপ।

কাল তোমার রূপকে ম্লান করে না।

ক্লিষ্টপাট্টার মত বৈচিত্র্যময়ী সুন্দরী।

অতীত ভারতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

অতি প্রাচীনকালে নববর্ষ দিবসে যজ্ঞ করা অবশ্য কর্তব্যরূপে বিবেচিত হইত, এই কারণে যজ্ঞের এক নাম, সম্বৎসর (সম্বৎসরো বৈ যজ্ঞঃ)।

মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে অতীত ভারতের সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিস্তারিত

(১) জয় রাজার যজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে যে স্বর্ণমুদ্রার রূপ দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল তাহার আয়তন ছিল—৪০ হাত প্রস্থ, ৮০ হাত দীর্ঘ এবং ৩৬ হাত উচ্চ।

(২) রাজর্ষি সগর তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে একটি বিরাট স্বর্ণস্তম্ভ এবং তৎসহ একটি স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করেন। এই প্রাসাদটি ছিল ৮টি কক্ষে বিভক্ত এবং প্রতিকক্ষে একজন লোক শয়ন করিতে পারে এমন একটি বিছানা দ্বারা সুসজ্জিত।

(৩) পরশুরাম যজ্ঞান্তে এমন একটি স্বর্ণ নির্মিত কৃত্রিম পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন, যাহার ব্যাস ছিল ৬৬ হাত।

(৪)। রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞান্তে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে একটি করিয়া স্বর্ণ নির্মিত বৃষ, অথবা গাভী এবং রাজর্ষি দিলীপ তাহার যজ্ঞ সমাপ্তির পর প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটি করিয়া সোনার রোহিত মৎস দান করেন।

বর্তমানে মনে হইতে পারে সগর রাজা কর্তৃক স্বর্ণরচিত প্রাসাদ ও স্তম্ভ দান এবং অগ্ন্যস্ত্র ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মামুদ যখন ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করে তখনও এই দেশের স্বর্ণ ও রৌপ্যসম্পদ এত বেশী ছিল যে, মাত্র একেবারের লুণ্ঠিত স্বর্ণ রৌপ্য বহন করিবার জন্য সুলতান মামুদকে ৩০০টি উটের গাড়ী ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। আর একবার আক্রমণের সময় এই দস্যু মধ্যভারতের ভীমনগর দুর্গ অধিকার করিয়া উহার সম্পদ লুণ্ঠন করিবার কালে এক-খানা ভাঁজ করা রৌপ্য নির্মিত গৃহ পায়। দুর্গ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রতিটি হিন্দু পুরুষ জীবন বিসর্জন দেওয়ায় এবং মহিলারা শিশু সন্তানসহ অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন করায় উক্ত গৃহের ভাঁজ খুলিবার কৌশল

বলিয়া দেওয়ার মত লোক কেহই ছিল না। সুলতানের ইঞ্জিনিয়ারেরা কয়েকটি ভাঁজ খুলিয়া মাপিয়া দেখেন উল্লিখিত রৌপ্য নির্মিত গৃহের আয়তন প্রস্থে ৩০ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত। উহা গজনীতে লইয়া যাওয়ার পর যখন বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্র হইতে রাজদূতেরা এই বিচিত্র গৃহ দেখিতে আসেন, তখন ইরাকের রাষ্ট্রদূত আর একটি ভাঁজ খুলিতে সমর্থ হন। ফলে গৃহের পরিমাণ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্যে ১২০ হাত এবং প্রস্থে ৬০ হাত। সুলতান মামুদের সভাস্থিত ঐতিহাসিক কর্তৃক লিখিত 'তারিখ-স-সুজ্জিগিন' (সুজ্জিগিনের সময়ে ইতিহাস) এবং অগ্ন্যস্ত্র পারশ্ব ভাষাময় গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কিছুকাল পূর্বে ইংলণ্ডবাসী মনীষী স্তার এলিয়ট এবং অধ্যাপক ডবসন (Dowson) উক্ত গ্রন্থ-গুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আকবুর রজ্জাক নামক যে আরব দেশীয় পর্য্যটক ভারত ভ্রমণ করেন তিনি দেখিয়েছেন—বিজাপুর রাজপ্রাসাদের সম্পূর্ণ ভিতরের দিক এক ইঞ্চি পুরু সোনার পাত দিয়া মোড়া ছিল। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও যদি ১২০ হাত দীর্ঘ, ৬০ হাত প্রস্থ রৌপ্য নির্মিত গৃহ থাকিতে পারে, তবে সগর রাজার সময়ে ৮ কক্ষ বিশিষ্ট স্বর্ণ নির্মিত গৃহ থাকা কি অসম্ভব?

ইংরাজের সমৃদ্ধি ভারতের বিশেষ বাংলার অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া। ইংরেজেরা যখন এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখনও আমাদের দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের অভাব ছিল না, তখনও সোনার গিনি, এক ভরি রূপার টাকা, অর্দ্ধভরি রূপার আধূলি এবং তাহার অর্দ্ধেক রূপার দিকি প্রভৃতি মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বাধীনতালোভে মাত্র ২৭১২৮ বৎসরের মধ্যে আমরা আমাদের যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদ হারাইয়া কাগজ, টিন, দস্তা প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলন করতঃ দারিদ্র্যে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে জনকল্যাণে ব্রতী না হইতে পারিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না।

জাতীয়তার ঋষি ও সাধক বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ

অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমাদের দিনে আমরা যাকে জাতীয়তাবাদ বলে জানি, য়ুরোপে তার সূত্রপাত, মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এর প্রথম অরণীয় অতিব্যক্তি ঘটে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে, যে বিপ্লব জাতীয়তাবাদের গোটা ধারণাকেই একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর এনে দেয়। একটা সমষ্টিগত আঙ্গিক ঐক্যবোধ, তার পেছনে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত একতা বা পরশাসন সম্পর্কে সমানুভূতি, যে কোন কারণই থাকুক না কেন,—যখন একটা বৃহৎ জনসমাজকে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে তখনই জাতীয়তাবাদের সম্ভার ঘটে। এই একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ জনসমাজকে আমরা বলি জাতি, আর যে ভাবধারাটি তাদের ঐক্য চেতনার প্রাণ-স্বরূপ, তাকে আমরা বলি জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদ। আমাদের ভারতবর্ষে, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব য়ুরোপের তুলনায় অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা। বলা চলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারায় এর প্রথম অভিব্যক্তি, এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে এর পরিণত আঙ্গপ্রকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে যারা গভীরভাবে পর্যালোচনা অনুধাবন করে একটা নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন—বিপিনচন্দ্র আর শ্রীঅরবিন্দ সেই মুষ্টিমেয় সাধকদেরই হু'জন অগ্রণী পথিক।

বিপিনচন্দ্রের জন্ম ১৮৫৮ সালে, আর শ্রীঅরবিন্দের ১৮৭২ সালে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রকে তাই শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজপ্রতিম বলা যুক্তিসিদ্ধ। স্কুল-কলেজের পড়াশোনায় বিপিনচন্দ্র কখনোই সার্থকতা দেখাতে পারেননি। শ্রীহট্টের স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখানে হু'জ্বার এফ, ই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে, তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজী বাংলা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা বইপত্র গলাধঃকরণ

করতেন ক্ষুধার্তের মতো। ছাত্রজীবনের শেষে যখন তিনি কিছুকালের জন্ত Calcutta Public Library-র (যার বর্তমান নাম National Library) সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হন, তখন দিনের পর দিন তিনি অমানুষিক পরিশ্রমে অধ্যয়ন করেন রাষ্ট্রনীতি-ধর্ম-দর্শন ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থাবলী। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রবল জ্ঞান-তৃষ্ণার জন্য বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ছিল অপরিপাক। তাই বাঁধা-ধরা পাঠ্য-সূচীর বাইরেই থাকতো তাঁর মনের অন্বেষণ গতিবিধি। বিবিধ বিষয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর এই যে উন্নত মননশীলতা—তারই খানিকটা পরিচয় আমরা পাই, যখন তাঁকে দেখি আই, সি, এস ছাত্রদের শিক্ষক হিসাবে, এবং পরিণত বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, আর, এস ও পি, এইচ, ডি'পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবেও।

শ্রীঅরবিন্দের মানস মণ্ডলটি একটু স্বতন্ত্র ধরনে গড়ে উঠেছিল। শৈশব থেকেই ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী এবং সার্থক। ইংলণ্ডের একটি স্কুলে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। স্কুলের শিক্ষা শেষে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কেম্ব্রিজ যান, সেখানে য়ুরোপীয়ান ক্লাসিক্স-এ অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং দক্ষতার সঙ্গে আই, সি, এস পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। কিন্তু অস্বাভাবিকতায় তিনি ব্যর্থ হন বলে, তাঁকে আই, সি, এস-এর কোন চাকরি দেওয়া হলো না। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি বরোদা-রাজের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন, এবং অনতিকালের মধ্যেই তাঁর বিদ্যাবত্তা তাঁকে বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালপদে অধিষ্ঠিত করে।

গড়ে ওঠার দিক থেকে দুজনের মধ্যে এই ভিন্নতা লক্ষিত হলেও, তাঁদের মননবৃত্তির যে পরিষ্কৃতিত রূপায়ণ সেখানে তাঁদের একই পর্যায়ভুক্ত আমরা দেখতে পাই। পাণ্ডিত্যে দুজনেই ছিলেন অসাধারণ। হু'জ্বনেই অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। অপরিমেয় ছিল দুজনের সত্যনিষ্ঠা। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ যখন ইংরাজ শাসকের

চোখে দিবারাত্রির দুঃখপ্ল বিশেষ; এবং শ্রীঅরবিন্দকে যখন ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করা হয়, তখন সরকার পক্ষের পুলিশপ্রধান সামস্থল আলম কিন্তু এদের সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে অন্তত একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন। মামলা চলাকালীন প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন, 'Men like Bepin Pal and Aurobindo Ghosh will never disclaim whatever they have done.'

বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেম ও সমাজসেবাবোধ মূলত এই চারিত্রিক গুণাবলীর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বিপিনচন্দ্রের চরিত্র ও চিন্তায়, তাঁর মাতা পিতা ছাড়া আর যারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মুরেল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-কথা বিপিনচন্দ্র নিজেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজের স্পষ্ট করে কোথাও বলে যান নি, তাঁর চরিত্র ও চিন্তায় কাদের প্রভাব অধিকতর বিদ্যমান। তবে, তাঁর রচনাবলী ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে যে, তাঁর স্বদেশিকতা ও অধ্যাত্মচেতনার পেছনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন একদিকে পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতামহ রাজনারায়ণ বসু, অল্পদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও দয়ানন্দ সরস্বতী।

প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন, তখন জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ ও কার্যক্রম দেশব্যাপী প্রচারিত—যার নেতৃত্বে ছিলেন দাদাভাই নৌরজী, মুরেল্লনাথ, ফিরোজশাহ মেটা, গোখেল প্রভৃতি। কিন্তু ক্ষুদ্র বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত করে, ইংরাজ শাসকশক্তির সঙ্গে বৈঠক আলোচনা করে স্বাধিকার বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর, এ-ধরণের বিশ্বাসে তখন সংশয় ও অনাস্থা দেখা দিয়েছে অনেকের মনে। প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল একটা নতুন জাতীয় ভাবাদর্শের, একটা নতুন আদর্শবাদ ও কর্মপন্থার—যাতে করে নিরাশ নিম্নজাতি তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে পায়, নিজস্ব ক্ষমতায় অর্জন করতে

পারে তার স্বাধীনতা। বিপিনচন্দ্র ১৮৮৭ সালে, মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করে ঘোষণা করলেন—'I am a radical and a democrat'। কংগ্রেসের অধিবেশনে এটি ভিন্নধর্মী কর্তৃত্ব। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র বার বার গতানুগতির পন্থা পরিহার করে বিশ্লেষণমূলক এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানান। যদিও তখনও তিনি প্রবীণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহী নন, কিন্তু তাঁর নতুন চিন্তাধারার প্রমাণ তিনি প্রতিটি বক্তব্যেই রাখেন দৃঢ়তার সঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ সালে বোম্বাই-এর 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, এবং তাতে এক জায়গায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, জাতি যেটি চাইছে সেটি হচ্ছে a nobler and more inspiring Patriotism.

বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি-প্রতিভা এইভাবে প্রয়োজনীয় সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদের নতুন উৎস-মুখ রচনা করলো। বঙ্কিম প্রতিভা আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ সালে লিখেছিলেন:

"Genius it is true, exists independently of environments and by much reading and observation may attain to self-expression, but it is environment that makes self-expression easy and natural; that provides sureness, verve, stimulus." একথাটি তাঁর নিজের এবং বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অত্যন্ত খাঁটি। বস্তুত, তাঁদের ধ্যাননিষ্ঠ নব্যচিন্তাধারাটি ১৯০৫ সালে কার্জনীশাসনের প্রতিকূলতায় আরও গভীরতা লাভ করে, একদিকে তার অভিব্যক্তি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে স্বদেশী আন্দোলনের নতুন রাজনৈতিক কার্যক্রমে, অল্পদিকে তার বহিঃপ্রকাশ নব্য-জাতীয়তাবাদ বা New Nationalism-এর আদর্শ প্রবর্তনায়।

অবশ্য, বঙ্গভঙ্গের পূর্ব থেকেই বিপিনচন্দ্র নব্য-জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করতে থাকেন তাঁর New Age নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিভিন্ন রচনায়। এই পত্রিকাটি তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৯০১ সালে প্রকাশিত করেন। ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সালে এই পত্রিকায়

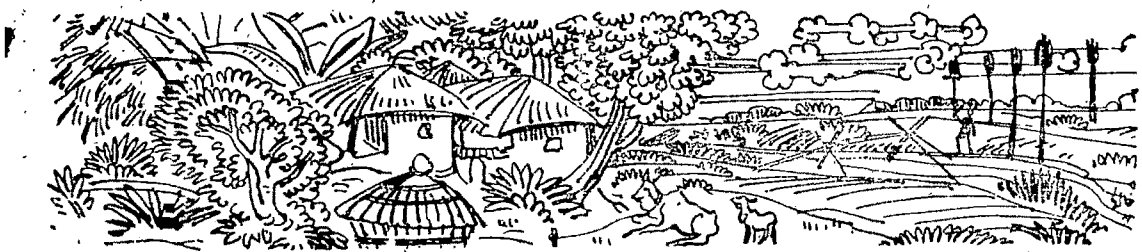
প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা সারা ভারত জুড়ে যে স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন নেমেছিল, তার আদর্শগত বনেদ তিনি পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নবীন ভারতবর্ষ তার অতীতের মহৎ নৈতিকশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে, যুরোপীয় সভ্যতার গুণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাবে আত্মবিকাশের পথে। বুঝেছিলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া, ভারতীয় জন-জীবনের নৈতিক বা মননশীল অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। তাই তিনি স্বদেশী শিল্প-প্রসারের কথা বলেছিলেন। বুঝেছিলেন স্ব-রাষ্ট্র ছাড়া কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবার নয়। তাই ঘোষণা করেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার। তাঁর নিজের ভাষায়, 'a state which is built upon the free will of the people.' এই যে নতুন চেতনা বা স্বাদেশিকতা, এটি তৎকালীন বর্ষায়ান নেতৃবৃন্দের স্বাদেশিকতার ধারণার তুলনায় আরও ব্যাপক, আরও বাস্তবধর্মী। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে একটি লেখায় বিপিনচন্দ্র জানালেন : 'পূর্ণ স্বাদেশিকতা ভারতের নাম নিয়ে আশলে যুরোপ বা আমেরিকার সমাজ-জীবনই চিত্রিত করে। কিন্তু নতুন স্বাদেশিকতার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ ভালোবাসা,—সে ভালোবাসা হৃগম্ ধূলিমলিন গ্রাম-গঞ্জের জন্মে; নিরস্ত্র দরিদ্র ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত কোটি

কোটি কৃষিজীবির জন্মে—সে ভালোবাসা ভারতের ভাষা সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্যে।'

জাতীয়তাবাদের এই আদর্শের কথাই আমরা শ্রীঅরবিন্দের রচনায় আরও স্পষ্টরূপে পাই, যখন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নাহক। যতোক্ষন ইংরাজ শাসনকে অপসারিত করে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক মুক্তি লাভ না করছে, ততোক্ষন ধর্মীয়-সামাজিক-বৈষয়িক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ যে নিছক নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়, এ-কথা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে, ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করে, প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়া জাতির আত্মোপলব্ধি কি করে সম্ভব? তাঁর নিজের ভাষায় :

'The political salvation of our country is thus the prime necessity not only because it is worth having in itself but also because it is the one precondition of our national progress in the different walks of life.' এবং বিপিনচন্দ্রের মতো তিনিও 'The life of nationalism' রচনায় দেখালেন যে, এই জাতীয়তাবাদের প্রাণশক্তি তৈরী হয়েছে কোটি কোটি সাধারণ ভারতবাসীর স্বপ্ন-কামনায় —'in the obscure and despised homes of the poor and ignorant'— মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের ঘর থেকে এটি আসেনি।

(আগামীবারে সমাপ্য)



যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মেরই অনুলিপি

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

বেদ, উপনিষদ মন্ত্রক'রে একটি পুণ্যনাম বারে বারে চিন্তের দর্পণে প্রতিফলন সৃষ্টি করে। তাঁকে সরাতে গেলেই অন্ধকার। আবৃত হন সবিতারূপী ব্রহ্ম। তিনি হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। হিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানে জড়িয়ে আছে এই পাপ'হর নাম—'যোগীশ্বরম্ যাজ্ঞবল্ক্যম্'। তিনি কি শুধুই যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগীদের শ্রেষ্ঠ বা তাঁদের আরাধ্য পুরুষ? বেদ-উপনিষদের গভী অতিক্রম ক'রে কি তাঁর-বিরাট সত্তা ডানা মেলে উড়ে যায় নি-মহাশূন্যে, অসীম নভোমণ্ডলে অবিনাশী অনন্ত পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হ'তে? না তিনিই সেই পরব্রহ্মের প্রতিভাস? একমাত্র তিনিই জেনেছিলেন অক্ষররূপী ব্রহ্মকে, জেনেছিলেন অব্যক্ত ব্রহ্মকে, যার সঙ্গে তাঁর নিত্যরাস। কে পারেন সদৃশ কণ্ঠে ঘোষণা করতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। যিনি পারেন তিনিই আসেন অরূপ থেকে রূপে, রূপ থেকে রূপান্তরে। বারে বারে আসেন সনাতনী বাদী বহন ক'রে।

আমরা ইতিহাস লিখতে জানি না। যদি জানতাম তাহলে যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ণ বিবরণ কালের গ্রাসে হারিয়ে যেত না। ভারতের আদর্শ হচ্ছে সাল-তারিখের হিসেব রেখে কি হবে, আমার চেহারার বর্ণনায় কি হবে, আমার আদর্শ কি, কি আমার ভাবমূর্তি, কি চিন্তাধারা রেখে যাচ্ছি উত্তরসূরীদের জন্যে তা দিয়েই বিচার করো আমাকে। দেহ জীর্ণ হয়, বারো পড়ে। কালের গ্রাসে মিলিয়ে যায় পাখীর কাকলীতে ভরা তপোবন, বিলীন হয়ে যায় আশ্রমের হোমাগ্নি, অশ্রুত হয় সামগান। কিন্তু রয়ে গেছে আদি বাক প্রণব ধ্বনি। 'ইথর তরঙ্গে ভাসছে সেই ব্রহ্মবাক্ অনাদি কাল থেকে একই তালে, একই হৃদে ও সুরে। প্রাকৃতিক ঘাত প্রতিঘাত পারে নি তাকে বিলুপ্ত করে দিতে। তেমনি পারে নি বেদমন্ত্রকে।

'যোগি যাজ্ঞবল্ক্যম্' গ্রন্থের প্রারম্ভে যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'যাজ্ঞবল্ক্যং মুনিশ্রেষ্ঠং সর্বজ্ঞং জ্ঞাননির্মলম্। সর্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বজ্ঞং সদা ধ্যান পরায়ণম্॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং যোগে চ পরিনিষ্ঠিতম্। জিতেন্দ্রিয়ং

জিতক্রোধং জিতাহারং জিতাময়ম্॥' যাজ্ঞবল্ক্যকে বলা হচ্ছে মুনিদের শ্রেষ্ঠ। মুনি কে? যিনি মৌনী হয়ে সর্বদাই পরব্রহ্মের মনন করেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর প্রজ্ঞার মলিনতা নেই। তিনি সর্বশাস্ত্র পারদ্রুম। প্রতিটি তত্ত্ব তাঁর কাছে সুপরিজাত। তিনি সদা ধ্যানমগ্ন। বেদ-বেদাঙ্গ সব-কিছুর তত্ত্ব তিনি জানেন, যোগে তিনি সর্বদা অধিষ্ঠিত। তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, ক্রোধকে বশীভূত করেছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণার উর্ধ্বে তিনি। কে সর্বদা যোগে অধিষ্ঠিত থাকেন? যার সঙ্গে ঘটে ব্রহ্মের নিত্যলীলা। তাই যদি হয় তবে কি যাজ্ঞবল্ক্যকেই ব্রহ্মের প্রতিক্রপ বলা যেতে পারে?

'যাজ্ঞবল্ক্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত করলে দেখা যায় যজ্ঞবল্ক্য (অপত্যার্থে) অর্থাৎ যজ্ঞবল্ক্যের পুত্র। বর্ণনা আছে যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা ছিলেন ঋষি ব্রহ্মরাত। তিনি সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন বলে ঋষিরা বলতেন যজ্ঞই এঁর বন্ধল, অতএব ইনি যজ্ঞবল্ক্য। আবার গৃচভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যিনি এই বিশাল সৃষ্টি যজ্ঞের বন্ধল পরে আছেন তিনিই যজ্ঞবল্ক্য। তিনি কে? স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর রূপ কেমন? তিনি রূপাভীত। তবে যখন ইচ্ছা জাগে সৃষ্টির, তখন তিনি সত্ত্বগত্ব প্রাপ্ত হন। সেই রূপব্রহ্মের বর্ণনা দেওয়াও সুকঠিন। 'বৃহন্নারদীয় পুরাণে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

'অজ্ঞা যজ্ঞস্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু সর্বদা।

সর্বত্র সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্॥

কর্মানি যন্ত রূপাণি তপাংসি চ মহাত্মনঃ।

জ্ঞানরূপং সদা কাম্যন্তমীশং সততং ভজে॥

সর্বতত্ত্বময়ং শাস্ত্রং সর্বত্রস্তারমীশ্বরম্।

সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ম্॥'

অজ্ঞলোকে যে জগদীশ্বরকে পাষাণ-প্রতিমাদি রূপেই অবস্থিত বলে সর্বদা মনে করে, সেই সর্বত্র সংস্থিত পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। কর্ম এবং তপস্মা মাত্রই যে মহাত্মার রূপ সেই সদাকাম্য জ্ঞানময় ঈশ্বরকে সতত

ভজনা করি। সর্বভূময়, সর্বশ্রী, সহস্র শীর্ষা, শান্ত, ভাবনাময় ঈশ্বরকে বদনা করি।

সৃষ্টির আদিতে রূপব্রহ্ম কিভাবে থাকেন? নারদ বলেছেন, ‘নারায়ণেশ্বরোহনন্তঃ সর্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ। তেনেদমখিলং ব্যাপ্তং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্।’ সৃষ্টি করার মৌলিক অর্থ হলে নিজেকে প্রবাহিত করা—আলাদা উপকরণ নিয়ে কোনও কিছু নির্মাণ করা নয়। এর নূলে রয়েছে অদ্বৈত ভাবনার প্রবেশ—কবির কাব্যসৃষ্টির মতো। যেমন কবির তাঁর কাব্য পৃথক নয়। কবি যখন মুক তখনও তিনি কাব্যময়। এই অবস্থায় কবি আর তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র অবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। তারপর কবির মধ্যে জাগ্রত নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর চিত্ত সমুদ্রে যেমন একটুখানি ছলে উঠলো। এ দোলা হলো ভাবের দোলা। কাব্য তখন চিন্ময়। তারপর মননের রেখায় রেখায় চিত্ত ঠিকরে পড়তে লাগল—কাব্য হলো মনোময়। শেষে মন থেকে কথার ফুলঝুরিতে বাইরে এসে কাব্য হলো বাঙময়। আমরা কৃত্রিম ভেদের সৃষ্টি করলাম। জ্বাঘার সঙ্গে ভাবের, কাব্যের সঙ্গে কবির। কিন্তু কবি, তাঁর কাব্যশক্তি এবং তাঁর কাব্য—তিনই এক।

তেমনি পরাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টিশক্তি ও তাঁর সৃষ্টজগৎ এসেই। ব্রহ্ম, অতিমানস আর জগৎ এই তিনে মিলে এক অখণ্ড ধারা। আমরা সীমিত দৃষ্টি নিয়ে বলি ‘বহু’। তা আমরা বলি আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানের স্পর্ধিত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জ্ঞানকে ছাপিয়ে থাকে বিজ্ঞান। চর দর্শনকে ছাপিয়ে ওঠে অদ্বৈতের ভাবনা। মনে রাখতে হবে বহু কিছুতেই ‘এক’ কে আড়াল করতে পাচ্ছে না। এ হলো আলোর রাজ্য। নিগুরঙ্গ পরব্রহ্মের মধ্যে আলোর ফুল ফুটেছে। ‘একের’ উল্লাস ভেঙে পড়ছে বহুর বৈচিত্র্যে। তাহলে কি বলবো আলোর রাজ্যে নব একাকার, ছায়ার কুণ্ডলী নেই। মনে হয় তা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও বলবো তেদ আছে, তা নইলে সৃষ্টি হতো না, শক্তি শিবের বুকে ঘুমিয়ে থাকতেন। এই ভেদ তো অভেদের উল্লাসেরই এক নবতর ভঙ্গিমা। এক অদ্বৈতের চারটি ভঙ্গি। প্রথমটি

ব্রহ্মের স্বরূপসত্তা আর তিনটি হলো অতিমানসের ত্রিপুটি। এখানে শক্তির উল্লাস। একের বহু হবার ক্রমিক ধারা। যিনি যজ্ঞেশ্বর তিনিই তো পরব্রহ্ম। তাঁর বুকেই যখন জাগে দোলা তখন তিনি হন সৃজ্য যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহৎ যজ্ঞকাণ্ডের বঙ্কল পরবেন এমনি ভাবনা উদয় হয়েছে। যাকে বলা হয় ‘কাম সঙ্কল্প ঈক্ষণম্’। হলো রূপব্রহ্ম বা সঙ্কণব্রহ্ম। তাঁকে বলা যেতে পারে যাজ্ঞবল্ক্যসত্তা। এখানে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এই যাজ্ঞবল্ক্যসত্তা হলো অরূপ ব্রহ্মের রূপ। এ থেকেই দেব দেবীর সৃষ্টি, জগৎ সৃষ্টি বা তার পরিকল্পনা। বেদ সম্বন্ধেও একই কথা।

এই প্রসঙ্গে আমরা দেহী যাজ্ঞবল্ক্য অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয়াদি নিয়ে সামান্য আলোচনা করবো। বর্ণিত আছে গুরু বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি কোন কারণবশতঃ বিশেষ রোষণরায়ণ হন। পুরাণে উল্লেখ আছে বিপ্রনিন্দার কারণে গুরু শিষ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আবার পুরাণে এমন উল্লেখও আছে বাসদেব যখন পশ্চিম ঋক্, গণ্ডগ্রন্থান যজুস্ ও গীতিগ্রন্থান সামগুলির পৃথক বিচার করছিলেন তখন তিনি বৈশম্পায়নকে শ্রাবক শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন যজুর্বেদের জন্যে। যাজ্ঞবল্ক্য পিতা ব্রহ্মরাতের কাছে যাগযজ্ঞাদি বিষয়ে পাঠ করে সমধিক জ্ঞানলাভের আশায় বৈশম্পায়নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কালক্রমে অজ্ঞানতা-বশত বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হন। তখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং উপযুক্ত উন্নত শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে ঐ যজ্ঞে ব্রতী হতে আহ্বান করেন। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি যজ্ঞ করা দরকার তা নিয়ে গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ হয়। বৈশম্পায়ন ক্রোধভরে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন, ‘মদধীতং ত্যজ্জৈতি’ অর্থাৎ আমার নিকট অধীত বিদ্যা ত্যাগ কর। যোগসমর্থ হেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদকে মূর্তিমান করে যথাবিধি তা উদ্গীরণ করেন। গুরুকর্তৃক বেদবিদ্যা পুনর্জীবীত হলে বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ তিস্তির মূর্তি পরিগ্রহ করে যজুর্বেদ ভক্ষণ করেন। এই কাহিনীর মূল কথা হলো যাজ্ঞবল্ক্যের উপর অসম্ভব

হ'লো বৈশম্পায়ন শিষ্য তিত্তির মুনিগণ যজুর্বেদ শিক্ষা করেন। কিন্তু সেই শিষ্যদের বুদ্ধির মালিন্যতার জন্য বেদ শুদ্ধ হলো না, তাই তাকে বলা হয় কৃষ্ণ যজুর্বেদ।

বিষাদক্লিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্য তখন সবিতৃদেবের উপাসনায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। তিনি জানতেন অন্তরা-দিত্যে হিরণ্য পুরুষ আছেন। পরমপুরুষস্বরূপ আদিত্যের ধ্যানের পরমায়ু লাভ হয়। সবিতৃদেব বাজিরূপ ধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যকে 'নতুন বেদ প্রদান করেন' 'ততো দুঃখিতো যাজ্ঞবল্ক্যঃ সূর্য্যমারাদ্যান্যানি শুক্লানি যজুংসি প্রাপ্তবান।' তিনি আরাধনা করে পেলেন শুক্ল যজুর্বেদ। এর ভাবার্থ হলো বৈশম্পায়নের কাছে বেদ অধ্যয়ন করার পর যাজ্ঞবল্ক্যের মনে হয়েছিল এই বেদ অপূর্ণ। তাই বেদজ্ঞানের পূর্ণতা লাভের জন্যে তিনি সূর্যদেবের আরাধনা করেন। ফলে শুক্ল যজুর্বেদ রূপ নির্মল বেদ তাঁর অধিগত হয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মরাতের পুত্র। আবার ঋত্বিতে আছে 'বাজসনেয়ন যাজ্ঞবল্ক্যেন।' তাহলে কি বাজসনি এবং ব্রহ্মরাত অভিন্ন? অথবা দুই যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বলা হয়েছে? পুরাণে বাজসনির উৎপত্তির সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে যাজ্ঞবল্ক্যকে বাজসনির পুত্র বলা যায় না। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, সূর্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বরূপ ধারণ করে অভিলষিত বর প্রদান করেন। বাজি-প্রোক্ত বলে 'বাজসনেয়' নাম সূচিত হয়েছে। 'যজুংসি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈধিজোত্তম। বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাস্থঃ সোহভবদ্যতঃ।' তাই বাজসনেয় সংহিতা নাম হয়েছে। প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সবিতৃদেবকে বলেছিলেন, 'যজুংসি তানি মে দেহি যানি সন্তি মে গুরোঁ। এবমুক্তো দদৌ তমৈষ যজুংসি ভগবান রবিঃ। অযাতযাম-সংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদগুরুঃ।' যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করে বলেছিলেন, আমার গুরুও জানেন না এমন যজুর্বেদ আমাকে দান করুন। ভগবান সূর্য, যা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, সেইরূপ অযাতযাম নামে যজুর্বেদ তাকে দান করেন। শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রমুহ যাবাল (জাবাল): গোঁধেয়, কথ

মাধ্যান্দিন ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যের পনের জন শিষ্য অধ্যয়ন করেন।

এ সম্বন্ধে ঋত্বিতে (বৃহদারণ্যক, মাধ্যং ৫।৫।৩৩) আছে, 'আদিত্যোনোমানি' প্রভৃতি, অর্থাৎ আদিত্য থেকে অধীত, এই হেতু শুক্ল বা বিস্ক্ল। আবার 'বাজ' মানে অন্ন, 'সনি' শব্দের অর্থ হলো 'যিনি দান করেন'—তিনি হলেন বাজসনি। তাঁর পুত্র হলো বাজসনেয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য হলেন বাজসনেয় অর্থাৎ আদিত্য বা সবিতৃপুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মের আত্মজ। তাই দেখি জনক রাজার সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কে তা নিয়ে যখন বিচার চলছে তখন যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যধর্মির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'কিং দেবতোহস্ত্যাং প্রাণ্যাং দিশসীতাদিত্য দেবত ইতি স আদিতাঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুযীতি কশ্মিন্ চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেদ্বিতি চক্ষুযী হি রূপাণি পশ্যতি...'আমি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহ দিকের তত্ত্ব জানি। পূর্বদিকে আমি আদিত্যের সঙ্গে এক। আদিত্যের প্রতিষ্ঠা চক্ষুতে, চক্ষুর প্রতিষ্ঠা রূপে, রূপের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। এমনি ভাবে দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, ধ্রুবে অগ্নির সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য এক। অগ্নির প্রতিষ্ঠা বাকে, বাকের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। হৃদয়ে সবার প্রতিষ্ঠা। যাজ্ঞবল্ক্য যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা একদেববাদ (Mono-theism) এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। দেববাদ যখন আসে পরাক (objective) দৃষ্টি থেকে তখন ইষ্ট হলো জ্যেয়। আর ইষ্ট যখন জ্ঞান তখন প্রত্যক (subjective) অনুভব থেকে আসে অদ্বৈতবাদ। একদেববাদ হয় কুক্ষিগত। কিন্তু এতেই সব শেষ হয় না। প্রত্যক অনুভবের চরমে একটা কিছু থাকে যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বলেছেন 'তাৎ'।

প্রাচীন ভারতে সাধনার পর্য্যায় বিন্যাস করতে গিয়ে উপনিষদ দুটি অনুকূল কালের উল্লেখ করেছেন। দিনের আলোয় চেতনাকে আপ্লুত রাখা হলো বাসবী সিদ্ধি। অগ্নি বস্তুগণের প্রমুখ। এই সিদ্ধিকে আগ্নেয় সিদ্ধি বলা যেতে পারে। এখানে অমৃতচেতনার অভ্যুদয়। তাই তার রূপকে উদীয়মান সূর্যের মত লাল বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই সিদ্ধির সাধন হলো ঋগ্বেদ।

এর পরের পর্যায়ে হলো উত্তরায়ণের আদিত্যের উপাসনা। তাঁর গতি দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এটি দেবতাদের দিবাভাগ। প্রথমটিকে যদি 'উজ্জ্যোতিঃ' বলা যায়, তাহলে পরেরটি হলো 'উত্তরজ্যোতিঃ'। এই জ্যোতিকে লাভ করা হলো 'রৌদ্রী সিদ্ধি'। রুদ্রগণ অন্তরীক্ষস্থান দেবতা, ইন্দ্র তাদের মুখ। তাই এই সিদ্ধিকে রৌদ্রী সিদ্ধিও বলা চলে। অমৃতচেতনা তখন মাধ্যান্দিন স্বর্ষের মত ভাষার। তাই তার রূপ শুক্ল। এই সিদ্ধির সাধন হলো শুক্ল যজুর্বেদ। তার উদ্গাত হলেন আদিত্যপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য। অথবা বলা যেতে পারে যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যেই আদিত্যের পূর্ণ বিকাশ। যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেই ব্রহ্মিষ্ঠ। তিনি কর্ম ব্রহ্ম উভয়ের তত্ত্ব সবার থেকে বেশী জানেন।

'যাজ্ঞবল্ক্য' শব্দকে এভাবেও পৃথক করা যায়—যিনি যজ্ঞের বন্ধ অর্থে বন্ধ। তিনিই যজ্ঞবন্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম। তাঁর আত্মজ্ঞ অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য। জনক রাজা সহস্র পয়স্বিনী গাভীর প্রতিটির শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ স্বর্ণ পদক বিলম্বিত করে তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এভা গা উদজতাম্'। আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ তিনিই এগুলি গ্রহণ করুন। কেউ সাহসী হলেন না। শুধু ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যকে গোধান নিয়ে যেতে বললেন। ফেটে পড়লো সভাস্থল। চললো তর্কযুদ্ধ। একদিকে গার্গী সমেত সমবেত ঋষিগণুলী, অপরদিকে একা যাজ্ঞবল্ক্য। অবশেষে তাঁরই জয় হলো। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলে তিনি রইলেন অপরাজিত।

এ কালের বেদব্যাসতুল্য পূজ্যপাদ স্বামী প্রত্যাগাত্য-নন্দ সরস্বতী তাঁর 'জপসূত্রম্' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আদিত্যো ব্রহ্ম মূর্ত্তং বিশতি যদখিলং বাপ্য চার্কঃ স্বধায়া।' শ্রুতি বলেছেন ব্রহ্মের ছুটি রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত। অদিত্যরূপে ব্রহ্ম অমূর্ত আর আদিত্যরূপে মূর্ত। স্থল, সূক্ষ্ম, ও পর এই ত্রিবিধরূপে যৎকিঞ্চিৎ অস্তি ও ভাতি, তা সবই আদিত্য। স্থলের মধ্যে সূক্ষ্ম আবার সূক্ষ্মের মধ্যে পর এইভাবে যে অখিল বিশ্ব বিরাজ করছে তার মধ্যে আদিত্য প্রবিষ্ট রয়েছেন। আবার অর্ক রূপে নিজের

তেজ ও মহিমা দিয়ে এ সকলে তিনি ব্যাপ্ত আছেন। মূর্তব্রহ্ম আদিত্যের অন্তর্বহিঃ, সর্বতঃ এই পঞ্চবৃত্তি ধ্যান করতে হয়। আদিত্য, বিবস্বান, অর্ক, সবিতা, নারায়ণ গভস্তিমান, হরিদশ্ব বা সপ্তাশ্ব এ সবই রহস্য নাম। সব কিছু প্রসব করেন বলেই তিনি সবিতা, স্বর্ষ; তিনি পোষণ করেন তাই পৃষা। হংসবতী ঋকে আছে, 'ঋতং বৃহৎ' অর্থাৎ ঋতব্রহ্ম বা হংসরূপে তিনি সব কিছু শালন করেন। তিনিই Cosmic Life Principle। আবার কালাগ্রিকরূপে তিনিই সবকিছু ভক্ষণ করেন। ইনি প্রণব (ওঙ্কার) রূপে প্রাণসমূহকেও প্রাণন করেছেন। জপসূত্রমের আর একটি চরণ 'প্রাণানোম্ প্রাণিনক্মীং য়ণিরিতি হৃদয়ং' 'হৃন্ম একর্ষয়েহর্ষম্'—'ও হ্রী' য়ণিঃ' এই হলো আদিত্যের হৃদয়। ও রূপে 'হৃৎ', হ্রী' রূপে 'অয়' বা গতি। এ হেন একর্ষি প্রত্যক্ষ ভগবান আদিত্য-নারায়ণকে আমরা অর্ঘ্যসবন অর্থাৎ বাক, মন ও প্রাণের দ্বারা কল্পিত করছি। এই মূর্ত ব্রহ্ম আদিত্যনারায়ণ ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে একীভূত। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের নর্মান্তরাতে রয়েছেন প্রদীপ্ত আদিত্য ব্রহ্ম। মানুষী সন্তা শুধু বহিরঙ্গ মাত্র। ব্রহ্মের ভুলছবি।

যজ্ঞসমাপনান্তে যাজ্ঞবল্ক্যের রূপধ্যান করে পূর্ণ আত্মতা দেবার রীতি সুপ্রাচীন। কারণ যজ্ঞকর্তারা যাজ্ঞবল্ক্যকে যজ্ঞের অধীশ্বর বলে বিবেচনা করতেন। যে নামে যজ্ঞারম্ভ বা যজ্ঞান্ত হয় তা তো যজ্ঞেশ্বরের। যাজ্ঞবল্ক্য তাই যজ্ঞেশ্বর। আর যজ্ঞেশ্বর তো ব্রহ্ম স্বয়ং। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীমৎ রামঠাকুর, নান্দাবাবা, মহর্ষি রমণ প্রমুখ উচ্চকোটির সাধকেরা শ্রীমৎ কালীপদ গুরায়কে ঐ স্থান দিয়ে গেছেন। মহাশক্তি এবং সাধকপ্রবর ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও বোধহয় একই কথা বলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যই বলেছেন 'হংপুরুজ্যে ব্যোম্মি যদেকরূপং, সত্যং সদানন্দময়ং তু হৃদ্যম্'। তদ্ব্রহ্ম নির্ভাসময়ে গুহায়ামিতিঃ... হৃদয়মধ্যে আকাশস্থানে সত্যস্বরূপ, সদানন্দময়, হৃদ্য দীপ্তিময় ব্রহ্ম দীপ্তি পাচ্ছেন। তাঁর অন্তরে নিরন্তর ব্রহ্মেরই উদ্ভাস। আলোয় আলোয় প্রদীপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্থান নির্দেশনা না হলেও সহজেই অনুমেয় পরব্রহ্ম থেকে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য পর্যন্ত একই ধারা চলেছে। রূপব্রহ্ম, সূক্ষ্ম যাজ্ঞবল্ক্য ও পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত্রে গ্রথিত। 'নেতি'রই 'ইতি'রূপ ব্রহ্মবিদ্য যাজ্ঞবল্ক্য। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

তথ্যপঞ্জী :—

১। বেদ-মীমাংসা—অনির্বাপ

২। দিব্যজীবন প্রসঙ্গ—ঐ

৩। গুরু বজ্রবেদ—দুর্গাচরণ লাহিড়ী সম্পাঃ

৪। জপসূত্র [১]—শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দসরস্বতী

বর্তমানে অন্তর্গত প্রাণের যুগে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও ব্যস্ত জৈবিক বিষমতাকে স্তম্ভ করার কাজে, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা যে থেকেই যায়। তার প্রশমনের ব্যবস্থা পত্র নিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসুন তাঁদের কাছে এ আমার সবিনয় নিবেদন।

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ সম্পাঃ

৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—স্বামী গভীরানন্দ

৭। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য

৮। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

৯। বিষ্ণুপুরাণ

১০। বৃহন্নারদীয় পুরাণ

১১। ককীরূপ বন্দনা, প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৮২

কালীরূপ বন্দনা

(কালীপদায় নমঃ)

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কালী কালী মহাকালী সর্বরূপ প্রদায়িনী । ১ ॥
সর্বভূতে স্থিতা কালী ব্রহ্মরূপ প্রদায়িনী ॥ ২ ॥
ব্রহ্মরূপ দক্ষিণা কালী সর্বকালিনী ক-ত্যায়েনী ॥ ৩ ॥
সর্বরূপ হরে দেবী সর্বশাস্ত্র বিনোদিনী ॥ ৪ ॥
সর্বশাস্ত্র দেহি মাং কালী সর্বরূপধারিনী । ৫ ॥
সুখদাং বরদাং কালী রূপকালী প্রবাহিনী ॥ ৬ ॥
অস্তিমে মোক্ষদা কালী কালী সত্তা বিহারিনী ৭ ॥
সর্বলোকে পূজিতা কালী ভদ্রকালী বিলাসিনী ॥ ৮ ॥
কালীরূপ মহাসত্তা কালিকে বিন্দুবাসিনী । ৯ ॥
ও কালী মত্ত কালী কালী মুণ্ডমালিনী ॥ ১০ ॥
কালীরূপ শুদ্ধ সত্তা ভক্তকালী যুগলিনী । ১১ ॥
ভক্তিরূপে শুদ্ধা কালী কালী অমৃতভাষিনী ১২ ॥
মুক্তিরূপে স্থিতা কালী কালী দর্পহারিনী । ১৩ ॥
অব্যক্ত প্রেমিকা কালী সর্বকালী শোভিনী ॥ ১৪ ॥
অখণ্ড পূজিতাকালী ব্রহ্মকালী স্বরূপিনী । ১৫ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড কালী কালী সুরধনী ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্ম কালী কালীরূপা কালী সিংহবাহিনী । ১৭ ॥
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে কালী কালী নিত্যযোগিনী । ১৮ ॥

চামুণ্ডা রূপিনী কালী কালী মহিমমদিনী । ১৯ ॥
অকালে পূজিতা কালী কালী শিবসঙ্গিনী ॥ ২০ ॥
লেপহান জিহ্বা কালী কালী শক্তিবিরাজিনী ২১ ॥
ভূতলে পতিতা কালী কালী শযাশায়িনী ॥ ২২ ॥
শিব মাতা শিব পিতা কালী শিব নন্দিনী । ২৩ ॥
অমৃত স্বরূপ কালী কালী রূপপ্রাসিনী ॥ ২৪ ॥
মহেন্দ্র পূজিতা কালী কালী রূপ বিনাশিনী । ২৫ ॥
অখণ্ড প্রেমিকা কালী কালী প্রেম উন্মাদিনী ॥ ২৬ ॥
অখণ্ড প্রকৃতি কালী কালী পদ প্রসারিনী । ২৭ ॥
শক্তি ভক্তি জ্ঞানং কালী কালী পদ আগমনী ॥ ২৮ ॥
কালী পদ রূপা কালী কালী অখণ্ড শ্রোতয়িনী ২৯ ॥
কলিতে কালিকা কালী বন্দে কালী কপালিনী ৩০ ॥
কালীপদ পূজা কৃতম্ বন্দে কালী চিন্তামণি । ৩১ ॥
চিন্ময়ী রূপা কালী বন্দে কালী দিনমণি ॥ ৩২ ॥
কালীপদ দেহি মাং কালী কালী পদ প্রসারিণী ৩৩ ॥
অখণ্ডপৃষ্ঠে স্থিতে কালী কালী সিংহনাদিনী ॥ ৩৪ ॥
প্রিয়তে প্রতিমা কালী কালী রূপ আকর্ষনী । ৩৫ ॥
তিষ্ঠতি নিমিত্ত কালী কালী অন্তর্দায়িনী ॥ ৩৬ ॥

বিরজা সম্পদা কালী স্বর্ণকালী ব্রাহ্মণী । ৩৭ ॥
 কালী রূপা রূপ কালী অন্ত্যে পদ শোভিনী ॥ ৩৮ ॥
 কালী অন্ত্যে পদ বৃত্তে অখপৃষ্ঠে আরোহিনী । ৩৯ ॥
 কঙ্কী নামী কালীপদে অহং তাং নমামি ॥ ৪০ ॥

কাছে পরিবেশিত হলো। এই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে
 সংক্ষিপ্ত টীকা। ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত
 হলে তার দায় দায়িত্ব অক্ষম ভাষ্যকারের। [অ. কু. ম.
 —ভাষ্যকার]

টীকা : কালী ত্রিগুণাতীতা আবার সর্বগুণাশ্রয়ী।
 তিনি স্বরূপতঃ নিগুণ আবার মায়া রূপে সগুণ। তিনি
 একাধারে সগুণ-নিগুণের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি প্রবৃত্তি
 নিবৃত্তি শূন্য। তিনি নিখিল দ্বৈতের লেশ পর্যন্ত বারবার
 ‘মার্জন’ করে কৈকল্য দান করেন, একারণেই কালীকে
 বলা হয় কৈবল্যদায়িনী। কালী একাধারে গুণাত্মিকা,
 গুণাশ্রয়ী আবার গুণাতীতা। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এইভাবে
 ব্রহ্মময়ী কালী সব কিছুকেই নিজের মধ্যে ধারণ করেন
 মুণ্ডমালা রূপে। যা ছিন্ন হয়েছে তাও একত্রিত হয়
 তাঁরই অখণ্ড সত্তা। এইভাবে তিনি একদিকে নির্বিশেষ
 একতত্ত্বা, আবার অন্যদিকে অশেষ তত্ত্বের সাফাং জননী।
 তিনি সর্বতত্ত্বময়ী, ভক্তি, মুক্তি, জ্ঞান-প্রেম সবকিছুই
 পূর্ণ ধনি।

কালী দুহাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্, ভোগ ও মোক্ষ
 এই উভয়কেই বিতরণ করেন। মা কালী ‘জিহ্বা’
 বাহুবং অনাস্রাব্বে আশ্রসাং করে ও শেষে ক্ষারনাদে
 প্রপঞ্চের বিলয় ঘটে মহাকালীর পায়ে তলায় শবশিব।
 কালী অর্থাৎ শক্তি ছাড়া চিং শুধুমাত্র চিং-ই থাকে, চিতি
 হয় না, অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া শিব মুক, শুদ্ধ আনন্দ মাত্র,
 সেখানে উল্লাস-বিলাস নেই। চৈতন্যের অধিষ্ঠানে
 শক্তিরূপা কালী মহোৎসাহে নেচে চলেছেন। তিনি
 চেতনেরও চেতয়িত্রী বা চৈতন্যসম্পাদনকারিণী। ‘চিতি’
 ছাড়া ‘চিং’ শুধু শিব বা মড়ার মত।

কালীরূপ বন্দনার স্তোত্রকার ঈশ্বরের কৃপাধন।
 পরব্রহ্মের যোগেশ্বরী রূপিনী কালীর বন্দনা গানে তিনি
 আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। সমগ্র কবিতাটি সুদীর্ঘ।
 কালিকা দেবীর ঐ জাতীয় মহামায়া-গাঁথার সঙ্গে কঙ্কী
 অবতারের সামঞ্জস্য সাধন ইতিপূর্বে আর কখনো শোনা
 যায় নি। কালীর বন্দনা গানের রীতিও স্বতন্ত্র, অনাস্রা-
 দিতপূর্ব। এ বিষয়ে স্তোত্রকার নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ।
 ধ্যানে লব্ধ এই স্তোত্র। তার সামান্য অংশ পাঠকদের

শ্লোক ১-৪ : মহাকালী বিশ্বাশ্রয়ী, বিশ্বেশ্বরী,
 বিশ্বাত্মিকা। কালী ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ত্রিধা অতিব্যক্তি
 হলো—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। শিব
 আছেন, কিন্তু ‘এক’ নেই। শিব শক্তি হয়ে আছেন।
 হয়ে এক, একে দুই। ব্রহ্মকে দু’দিক থেকে দেখা যায়—
 সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম, এবং সর্বং বদ্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হলো
 নিরঞ্জন, নিরূপাধি সচ্চিদানন্দ। একটা ধূলিকণাও ব্রহ্ম।
 একারণে শিব-শক্তি রূপিনী কালী পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।
 সকল শাস্ত্রের সার হলো কালী।

টীকা শ্লোক ৯ : সাধকপ্রবর স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ
 সরস্বতী বলেন, ‘মহাকালের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের
 ‘বিস্তার ও সংকোচ’ তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে। নাদ-বিন্দু-
 কলার তত্ত্বটিকে কালীরূপের মধ্যে অনুধাবন করা যায়।
 আনন্দজ্যোতি হল নাদের রূপ। সেই নাদকে সঙ্কচিত
 করে কালী ‘বিন্দুরূপ’ ধরেন। নাদ ও বিন্দুর মধ্যে
 তিনি পূর্ণ। এই পূর্ণের মধ্যে ‘কলা’—এখানে তিনি
 লীলায়িত হন অর্থাৎ বিবর্তিত করেন নিজেকে। বিস্তার
 ও সংকোচ—এই যে পরস্পরের ধাবন বা গতি—একেই
 বলে জগৎ। ধাবনের মধ্যেও দুই ধারা রয়েছে।
 নানারূপে তিনি মহাকাল, এবং তগ্রাংশ বিহীন অর্থাৎ
 অখণ্ড। আর বৈন্দবরূপে তিনি বিন্দু, ক্রম এবং অংশরূপ
 ধারণ করেন। প্রথমটির প্রতীক হল কালীর স্বয়ং
 মহাকাল আর মুণ্ডমালার মধ্যে কালীর বৈন্দবীমূর্তি
 অর্থাৎ বিন্দুরূপ প্রকাশিত। তাই কালী বিন্দুবাসিনী।

শ্লোক ১০ : মা কালীর গলায় বহু ছিন্নমুণ্ডের একত্র
 সমাবেশে রচিত হয়েছে এক বিচিত্র মুণ্ডমালা। আবার
 হাতে রয়েছে একটি খণ্ডিত মুণ্ড বা ছিন্নমুণ্ড। এর রহস্য
 হলো হাতে খণ্ডকে ধরে রেখেছেন, আবার গলায় ঐ
 ব্যস্ত বা খণ্ডিত রূপকেই সমস্তীকরণ করে মালা
 পড়েছেন। কালী ভূমারূপিনী অখণ্ড সামগ্রী। অখচ
 তিনি ঘৃঞ্জের সাহায্যে অখণ্ডতাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে

ফেলেছেন। ‘আমি বহু হবো’—এই বোধের জন্মেই বোধকরি তিনি দেশ-কাল, কার্য-কারণ ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের জাল রচনা করেছেন উর্ণনাভের মত, আবার এই ব্যস্ত, খণ্ড বস্তুগুলিকে নিজের মধ্যেই গৌণে রেখেছেন।

শ্লোক ১৩ : কালী তাঁর এলায়িত কুন্তলরাশি চারদিকে সঞ্চালিত করে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছেন ও করালী সেজেছেন। এই কেশপাশের সাহায্যে কালী তাঁর প্রকৃত মুখচ্ছবি, পরমসুন্দর মুখধানিকে ঢেকে রেখেছেন সকলের দৃষ্টির অন্তরাল করে। এই কালী মানবের দর্পহরণ করেন।

‘সত্যাস্ত্রং যা শিখায় প্রলয়ঘনরুচিচ্চিদ ঘনেন্দু প্রকাশং, মায়া ঘোরেন্দ্র জালঞ্চ চিকুরপটলৈশ্চয়তী যা করালী।

(জপসুত্রম্, ১ম)

শ্লোক ১৪—১৮ : যিনি অব্যক্ত, নিরূপাধি পরব্রহ্ম, তাঁর প্রেমসী হলেন মহাকালী। পরমশিবের সঙ্গিনী কালী। অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সৃষ্টিতে, উভয়কে পৃথক করা চলে না। ‘কালীতন্ত্রে’ আছে—‘ত্বমাচ্চে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাংপরং’ তাই মহাকালী ব্রহ্মের প্রেমিকা তো বটেই। ‘মহাকালী নিরাকারা, জ্যোতিঃস্বরূপা, চিত্তিরূপা, ব্রহ্মস্বরূপিনী। তাই যদি হবে তবে তিনি দেহ ধারণ করেন কেন? পরব্রহ্ম রূপব্রহ্ম, মহাকালী, মহামায়ার উদ্দেশ্য একই। সৈবকদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্মে নানা রূপ ধারণ করেন। ‘গায়ত্রীতন্ত্রে’ আছে—‘স্বেচ্ছা গৃহীত বপুষীম’ লীলাচ্ছলে স্বেচ্ছায় দেহ গ্রহণ করেন। ‘পিচ্ছলাতন্ত্রে’ও একই কথা রয়েছে—‘সাহি নানাবিধা ভূত্বা সাধকাভীষ্ঠদা ভবেৎ’।

কালীর সর্পমণ্ডিতা রূপ দেখা যায়। তারাদেবী মহাকালকে সর্পাকারে মাথার জটায় স্থান দিয়ে লজ্জাবনতমুখী হয়ে রজোরূপী জিহ্বা বের করলেন। নাগ হলো তারাদেবীর যজ্ঞোপবীত, এটি মহাযোগের চিহ্ন। কারণ তিনি নিঃসন্দেহে মহাযোগিনী। প্রশ্ন হতে পারে কালী আর তারা কি একই? এর উত্তর আছে ‘মায়াতন্ত্রে’—‘যা কালী সা মহার্জুণা যা দুর্গা সৈব তারিণী। অভেদেন যজ্ঞেদেবীং সিদ্ধয়োহষ্টৌ

ভবন্তি হি।’ যিনি কালী, তিনিই দুর্গা, তিনিই তারা।

‘কালী সিংহবাহিনী’—কালিকাপুরাণে আছে ‘যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। ভূজৈঃ ষোড়শভি যুক্তা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা’—ষোড়শভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী যোগনিদ্রা মহামায়া ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধা। কাজেই এই ধ্যানটি ভদ্রকালীর। এই ধ্যানের শেষের দিকে আছে—‘সিংহস্থা নয়নৈরুক্তবর্ণৈস্ত্রিভি জ্জলা। শূলেন মহিষং ভিত্বা তিষ্ঠন্তি পরমেধরী।’ দীপ্তিশালিনী দেবী সিংহবাহিনী। তাঁর ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ। ত্রিনয়ন হলো সত্ত্ব, রজ ও তমের প্রতীক।

শ্লোক ১৯—২২ : কালী সর্বমঙ্গলকারিণী। তিনি সকলের হৃদয়স্থিত শুভকর, মঙ্গলজনক অভিলষিত ফল দান করেন, তাই তাঁর নাম সর্বমঙ্গলা। তিনি ভক্তদের দুঃখ নিবারণ করেন ও ভক্তদের শোভন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন, তাই তাঁর নাম মঙ্গল্যা। তিনি যোগমায়া, আবার তিনিই চামুণ্ডারূপে অসুর বিনাশ করেন, মহিষাসুরকে মর্দিত করেন। ‘দেবীপুরাণে’ আছে—‘বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবপরাজিতা। সিংহ মারুহ কল্লান্তে নিহতো মহিষো যথা। মহিষঘ্নী ততো দেবী কল্যা বৈ সিংহবাহিনী। কালী দক্ষাপমানেন সর্বশত্রু নিবহরী। কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে।’ দেবী বিজয়া। তিনি কল্লান্তে সিংহে আরোহণ করে মহিষাসুরকে বধ করেছেন বলে তাঁকে মহিষঘ্নী এবং সিংহবাহিনী বলা হয়। দক্ষাপমানকালে তিনিই কালী অথবা ইনি কালে সব পদার্থের কলন করেন বলে তাঁর নাম কালী। ইনি রুর নামে মহাদৈত্যকে বধ করে তাঁর চর্ম ও মুণ্ড বাম করে ধারণ করেছিলেন বলে তাঁকে চামুণ্ডা বলা হয়।

‘সিংহ’ শব্দটিকে অনুধাবন করলে কি দেখা যায়? ‘হংসঃ’ এই বর্ণদ্বয় উন্টে দিয়ে তার মধ্যে উর্দ্ধগ (elevating) ‘ই’ স্বর বসালে কি হয়? সিংহ। এ হলো মহাশক্তিধর, সাধিষ্ঠ সমর্থ ভাগবতী শক্তির বাহন। জড়িমার পরাকাষ্ঠা হলো মদোদ্রত ‘কৃষ্ণ মাতঙ্গ’। এটি হলো হুবার রিপু, দুর্জয় সংস্কার ও অভ্যাস এবং দুর্লভ্য

পরিবেশের প্রতীক। জগদ্ধাত্রী ধ্যানে এই কৃষ্ণ মাতঙ্গ সিংহবীৰ্য দ্বারা নিপাতিত ও নিবাসিত। যিনি কালী তিনিই জগদ্ধাত্রী।

‘ভূতলে পতিস্তা কালী’—এই অংশের ‘সামঞ্জস্য’ কালিকাপুরাণের কামাখ্যাদেবী অধ্যায়ে মেলে। ‘তস্মিন্স্থ কুজিকা পিঠে সত্যাত্তদ যোনিমণ্ডলম্। পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া বালিয়ত।’ কুজিকা পিঠে সতীর (কালী) যোনিমণ্ডল পতিত হয়, এবং মহামায়াও সেখানে বিলীন হয়ে থাকেন। আবার অত্ৰভাবে বিচার করলে দেখা যায় ব্রহ্মাণ্ড লয়ের পরে কালী নিষ্ক্রিয় হন, মহামায়া তাঁর মন্ত্রাজাল গুটিয়ে নিয়ে পরব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হন। এই যে মহাপৃথ্বী তা তো মহাকালীরই শয্যাভূমি। তাই উপরে থেকে তিনি আবার নতুন সৃষ্টির উদ্ভাদনায় মেতে ওঠেন। কুজিকাতন্ত্রে আছে ‘ব্রহ্মানী কুরুতে সৃষ্টি নতু ব্রহ্মা কদাচন।’ কামাখ্যাদেবী জগৎ প্রসবকারিণী। তাঁকে ধারণ করে আছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব কালীর অত্ৰরূপ কামাখ্যা। তিনি কামনাশিনীও।

শ্লোক ২৩-২৫ : পরমশিব স্বরূপত দেবদেবীর সৃষ্টিকর্তা। একারণে ‘কালী’ পরব্রহ্মের হুহিতা স্বরূপও। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মান মেবাদিবং অহং ব্রহ্মাস্মেতি। তস্মাৎ তৎ সৰ্ব্বমভবৎ’ (৩।৩।৯)। এই জগৎ প্রকাশের আগে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। সাধকের ধ্যানে এসেছে পরব্রহ্ম বা রূপব্রহ্ম বলছেন, ‘পুরাণের যত দেবদেবী, তাঁরা মোর রূপছবি’। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৪।৩) আছে ‘ত্বং স্ত্রী ত্ব পুমানসি। ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দেওন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।’ বৈদিক ঋষি নোপাধিক ব্রহ্মকে পরমশিব আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন করে বলছেন—হে দেব, তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, কুমার হও, কুমারী হও, তুমিই ব্রহ্ম হয়ে দণ্ডধারণ করে স্বরূপাচ্ছাদন কর। সকলের মুখ তোমার মুখ, অতঃ তুমি জাত হও।

কালীর দর্শন বা কৃপা লাভে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন। আবার কালী সমগ্র রূপ গ্রাস করেন, বিনাশ

করেন। এই যে মহাকালী আমাদের গোচরীভূত হচ্ছেন তিনি অখণ্ড বা পরব্রহ্মের বিলাসিনী শক্তি। ‘খণ্ডে প্রকৃতি কালী’—এই কথাটির মানে হলো ‘যখন পৃথক ভাবে দেখা হয় তখন কালী হলেন প্রকৃতি।’ সাংখ্যদর্শন মতবাদ। প্র=প্রকৃষ্ট, কৃতি=সৃষ্টি, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি। আবার প্র=সত্ত্বগুণ, কৃ=রজঃ, তি=তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতি হলো ত্রিগুণের আধারভূতা। অত্ৰভাবে বলা যেতে পারে প্র=প্রথম, কৃতি=সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হলো যিনি সৃষ্টির আদিভূতা। কালী তাই প্রকৃতি স্বরূপ।

শ্লোক ২৮-৩০ : কালী শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞানের আধারস্বরূপ। এই কলিতে কালীপদ নামে যে কব্বী অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি ত্রিগুণাতীত আবার ত্রিশক্তির উৎসস্বরূপ। কলিযুগে কব্বীরূপী ‘কালীপদ’ নিজেই একাধারে পরমশিব ও মহামায়া কালী। সেই অমৃতময় কালীপদকে প্রণাম।

শ্লোক ৩১-৩৪ : আমি কব্বীরূপী কালীপদকে পূজা করি, পরম চিন্তামণি, বিশ্বপতি কালীপদকে বন্দনা করি। কালী চিৎশক্তি আধার স্বরূপ, তাই তিনি চিৎস্বয়ী। তাঁকে বন্দনা করি। হে অমৃতময়ী কালী, আমি প্রার্থনা করি তুমি আমাকে ‘কালীপদ’ রূপী পরব্রহ্মের পদ লাভ করার যোগ্যতা প্রদান কর। গির্ধনি অঞ্চলে অশ্ব পৃষ্ঠোপরি কালীমূর্তি বিরাজিত। এই মূর্তি কব্বী অবতারেরই প্রতীক। অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন কব্বী-কালীকে আমি আরাধনা করি। কব্বী অবতার অশ্বপৃষ্ঠে আছেন। অশ্বের বর্ণ শ্বেত। কেন? সত্ত্ব গুণের চিহ্ন। সাধক বলেন কব্বীর অশ্ব হলো দাবানল। সবাইকে বিদগ্ধ করে তাদের আত্মার স্বরূপ জানিয়ে দেবে। দেহ যখন বিদগ্ধ হয় অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরস্থ আঁগুণ মলের বিনাশ যখন ঘটে তখনই সাধক আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বীরভূমে বীরসিংহ কালী আছেন।

শ্লোক ৩৭ : বিরাজ ক্ষেত্র একটি গীঠস্থান। স্থানটি কটক জেলার অন্তর্গত যাত্তপুরে। এখানকার দেবীর নাম বিমলা বা বিভয়া বা বিরজা। এখানে সতীর ‘নাভি’ পড়েছিল বলে প্রকাশ। কপূরাদি স্তোত্রে আছে

কালিকাদেবীর দুই ওষ্ঠ প্রান্তে রক্তধারা বিগলিত হচ্ছে।
রক্তধারা রজোগুণসূচক। এর অর্থ দেবী রজোগুণ
রহিতা শুদ্ধা সত্ত্বান্বিতা বিরজা। ইনি সম্পদদায়িনী।

‘স্বর্ণকালী ব্রাহ্মনী’—ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্তী বর্ধিষ্ণু
পরিবারে ত্রিপুরসুন্দরীর মূর্তি পূজিত হয়। কালিকা-
পুরাণে আছে—‘কালীভূতা স্বর্ণগৌরী শরীরাক্ষ
শঙ্করম। প্রাপ্তমোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী (৪৫
অধ্যায়, ১৬৫ শ্লোক)’। কালী স্বয়ং স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা
হয়ে শঙ্করের দেহাধী প্রাপ্ত হলেন। এতে অসীম আনন্দ
অনুভব করতে লাগলেন। দুর্গাপূজা বিধিতেও আছে
কালীই দুর্গা হয়েছেন। দুর্গার মহাস্নানের সময় ‘ওঁ হ্রী
ভদ্রকালৈ নমঃ, কালিকায়ৈ নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে নানাবিধ
জলে স্নান করানো হয়।

শ্লোক ৩৮-৪০ঃ কঙ্কীকৃপী কালীপদ একাধারে ব্রহ্ম
ও মায়াশক্তির বাচক। তিনিই রূপব্রহ্ম ও যোগমায়া
এবং মহামায়া। তাঁর থেকেই উদ্গত হয়েছে ব্রহ্মঃ বিষ্ণু
মহেশ্বর এবং যাবতীয় শক্তি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা।
শ্বেত তুরঙ্গমে অর্থাৎ সত্যযুগ, সত্ত্ব ও ধ্বংসের বাহনে
এসেছেন কঙ্কী ভগবান। ভারতের সুপ্রাচীন এবং
ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা যাকে পূর্ণব্রহ্ম বলে আখ্যা দিয়ে, তাঁকে
দর্শন করে জীবন চরিতার্থ করে গেছেন, সেই কঙ্কীকৃপী
কালীপদ একপর্যায়ে বিনাশ করেছেন দুষ্কৃতদের,
পরিভ্রাণ করেছেন সাধুদের। ধ্বংস ও নবসৃষ্টির বীজ
একই সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁকে প্রণাম
করি।

—[ভাষ্যকার (অ)]

‘বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল’ ধারাবাহিক রচনার (৯৩ পৃঃ) ‘লেখক পরিচিতি’

বাগচী-যমসেরপুর (নদীয়া) বাগচী পরিবারে
শ্রীকিরণেন্দু বাগচীর জন্ম বাঙলা ১৩১৭ সালের ৮ই

অভিভক্ত বাঙলার কারাবিভাগে চাকুরী তিনি
গ্রহণ করেন ১৯৩৪ (ইং) সালে।



কিরণেন্দু বাগচী

তখন থেকে উনি বঙ্গভ্রমী, দেশ, পুষ্পপাত্র, বহুমতী,
হোমশিক্ষা, নবান্ন, ভারতী, ছদ্মবেশী প্রভৃতি নানা মাসিক
এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধাদি লিখে
চলেছেন।

বর্তমানে ইনি তিনখানি ইতিহাস ভিত্তিক বৃহৎ
উপগ্রন্থ লিখে শেষ করেছেন। ‘বিপ্লব যজ্ঞে ঋত্বিক
কানাইলাল’, ‘হারেমের সেই মেয়েটি’ এবং ‘মধ্য
প্রদেশের জঙ্গলে।’

১৯৭১ সালের সরকারী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের
পর কানাইলাল এবং এংকালীক তথ্য বহুল বিপ্লবযুগ
সম্বন্ধে লিখতে লেখনী ধারণ করেন। সম্প্রতি তা শেষ
করে প্রবর্তক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশার্থ
দিয়েছেন। এই বিপ্লবমূলক প্রবন্ধটি সর্বদা মুদ্রণ করে
তুলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব বাগচী
মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

বর্তমানে ইনি প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্গে বিশেষভাবে
জড়িত এবং প্রবর্তক পত্রিকারও অগ্রতম শুভানুধ্যায়ী
সুহৃদ। এখন কলকাতায় নিজ গৃহে বাসিন্দা।

চৈত্র, বুধবার। পিতা ঐন্দ্ৰধ্বজ শেখর বাগচী পৃথিবী
বিখ্যাত রেশম শিল্পী ও মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের
প্রবর্তক।

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

(২)

কিরণেন্দু বাগচী*



শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে। কানাই-
লালের আবির্ভাব ঠিক জন্মাষ্টমীতে ১৫ই ভাদ্র ১২৯৫,
ইংরাজীর ১৮৮৮র ৩০শে আগষ্ট, মাতুলালয় চন্দননগরে।
তবে ভুল করিনি নিশ্চয়, 'যে কানাই সেই কৃষ্ণ,
ব'লে।

চন্দননগরে বাড়ী। পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী
জেলায় খরসারি—গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনটি সহোদর।
সর্বকনিষ্ঠ সর্বতোষ কিন্তু সে নাম কবেই তো মুছে
গিয়েছিল। জন্মাষ্টমীতে জন্মেছিল বলেই তো সর্বতোষ
হ'ল কানাই।

বাবা চুনিলাল ব্রজ আর মা ছিলেন ব্রজেশ্বরী দাসী।
জাতিতে তন্তুবায়-ব্রাহ্মণ।

চুনিলাল থাকেন বোম্বাইয়ে। সেইখানেই তাঁর
অন্ন সংস্থানের জায়গা। ভারতীয় মেরিন ডিপার্টমেন্টে
একাউনটেন্টের চাকরী করেন।

পাঁচ বছরে পা দিয়ে কানাইকে যেতে হল বোম্বাইয়ে।
আর্থ মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হ'ল সেখানে। স্বভাব,
চরিত্র, লেখাপড়া সব দিকেই চৌখস। শিক্ষকমশাইদের
মন জয় ক'রে ফেল সামান্য কটা দিনে। তাঁদের
কাছ থেকে কত সুন্দর সুন্দর বই উপহার পেল কানাই।
এক রত্তি ছেলে। মাত্র তিনটে বছরেই স্কুলে বেশ
আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেলল নিজের স্বভাব গুণে।

ন বছরে পড়তেই কানাই এল চন্দননগরে। ভর্তি
হল, এখানকার ডুপ্লেক্স কলেজে। এই কলেজের আগের

নাম ছিল Ecle-Se-santa-Maria মাদার মেরীর নামে।
এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ফাদার বার্থ এই সময় থেকে
প্রায় বছর চল্লিশ আগে। ১৯০১ সালে ফরাসী সরকার
এখানে এফ, এ ক্লাস খুলে পূর্বের নাম বদলিয়ে
শিক্ষায়তনের নাম রাখলেন Duplex College। এক
বছর এখানে পড়ে, কানাইকে আবার যেতে হ'ল
বোম্বাইয়ে।

ছোটবেলা থেকেই দুধমুড়িতে ছিল তার খুব লোভ।
মা দিনে আড়াইসের ক'রে মোষের দুধ খাওয়াতেন
কানাইকে।

পরে বড় হয়ে যখন বিপ্লবী দলের গন্ধে গন্ধে চন্দন-
নগর থেকে কলকাতায় পাড়ি দিল সে, সে দিনও সে
মার হাত থেকে দুধমুড়ি খেয়েই বওনা দিয়েছিল।

গর্ভধারিনীকে বলেছিল 'সত্যবাদী 'কানাই'—
চাকরী করতে যাচ্ছি ইয়া সত্যি কথাই তো! সে যে
চাকরী নিয়েছিল ভারত জননীর দপ্তরখানায়।

ইয়া কি* যেন বলছিলাম—সেই দশবছর বয়স থেকে
অর্থাৎ ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত এক নাগাড়ে
বোম্বাইয়ে কাটিয়ে লেখাপড়া করল কানাইলাল।

প্রথম থেকেই কেমন যেন উদাসীন ভাব। নেই
পোষাক আষাকের কোনও আড়ম্বর। প্রাচুর্য থাকলেও
কোনদিনই সে দিকে ছিল না তার নজর। গরীব
বন্ধুদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেত সে। খাওয়ার
জিনিষে ছিল না কোন দৃষ্টি। দরিদ্র মহারাষ্ট্রিয় ছেলে-

* লেখক পরিচিতি—৯২ পৃ: দ্রষ্টব্য

দের সে বড় ভালোবাসত। বিষ্ণু গণেশ পিংলে ছিল তার সহপাঠীদের বিশেষ একজন। কতদিন মার কাছে বন্ধুদের নিয়ে এসে ভূরিভোজন করিয়েছে সে। তাদের মধ্যে “টোষা” কানাইয়ের জীবনের শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। টোষার বাবা-মা তার ছেলেবেলাতেই প্লেগে মারা গিয়েছিলেন, তাই বোধহয় কানাইলালের এত দরদ ছিল তার ওপর।

কাগজে কানাইয়ের শেষ খবর পেয়ে টোষা চোখের জলে ভিজিয়ে একখানা ছিটি দিয়েছিল চন্দননগরে।

অজুত মেধা। বই মুখে নিয়ে কোন সময়েই পড়ে থাকতনা কানাই। পরীক্ষার মাস খানেক বাকী থাকতে বই হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর পাঁচচারী স্ক্রু হয়ে যেত তার। কেবল বইয়ের পাতাগুলো সব একবার উল্টে নিতে পারলেই তারপক্ষে ছিল যথেষ্ট। ব্যাস এতেই সে ক্লাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় একটা জায়গা কেড়ে নিতই।

চন্দননগরে ডুপ্পে কলেজ থেকে সে এন্ট্রান্স পাস করে, পরে এফ, এ পাস করল। হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিল।

সে যখন ফাঁসীর আসামী, তার বি এ পাসের খবর বেরুল। সরকার রাগে তার সে ডিগ্রী কেড়ে নিয়েছিল। তাতে তার বড় বয়েই গেল।

সে ছিল সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী বিনয়ী।

কোনদিন বাপমার চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলেনি। কিন্তু যখন দেখেছে সত্যের অপলাপ হচ্ছে তখন তাঁদেরকেও রেহাই দেয় নি। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান সে বরাবর দিয়েছে, কিন্তু তাঁদের অত্যায়ে সে কোন দিনই মেনে নেয়নি। সামান্য একটা ঘটনা থেকে তার কিছুটা আমরা জানতে পারব।

কানাইয়ের ছেলেবেলায় তার মাতুল তাকে রোদ লাগাতে বারণ করেছিলেন। ছেলের দল রোদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, কানাই ছাদের টিনের চালার নীচে বসে ঘুড়ি ওড়ান দেখছে। মামা তাকে ডেকে এনে রোদ লাগানোর জন্তে প্রহার করলেন—কানাইলালের কোন কথাই শুনলেন না। সত্যের অপলাপ সে তো করে নি।

তবুও কেন তাকে মিথ্যাবাদী বানানো হবে। এরপর দুঃখে সে জল পর্যন্ত মুখে দিল না! মাতুল বিপদে পড়ে ওর সমবয়সী ছেলেদের কাছে জিজ্ঞেস করে যখন জানলেন, সে রোদ লাগায়নি, তখন আবেগে কানাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অপরাধ স্বীকার করলেন। অমনি সব দুঃখ মন থেকে মুছে ফেলে দিল সে। শুধু কি আত্মীয় স্বজন, যার সঙ্গেই যখন সে মিশেছে সকলেই জানত কানাইলাল সত্যের অপলাপ কখনই করে না।

ভারতবর্ষ কিভাবে ইংরেজদের পদানত হ'ল আবার কিভাবে এ দেশে যুবজাগরণ হল তার কিছুটা না আলোচনা করলে কানাইলালের জীবনালেখ্য সম্পূর্ণ হবে না।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান এত সুদৃঢ় যে এরোপ্লেনের আগের যুগে একে কুক্ষিগত করা যে কোন বহিঃশত্রুর পক্ষে বেশ কঠিন ছিল।

কিন্তু এই স্বর্ণ প্রসবিনী সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা হিন্দুস্থানকে আক্রান্ত হতে হয়েছে শক, হুণ পাঠান এবং মোগলের হাতে, উত্তরপশ্চিম গিরিপথ দিয়ে তারা এসেছে। আক্রমণ চালিয়েছে যৌথ বাধা প্রদানকারী রাজশক্তির অভাবে। ভারতবর্ষ তখন ছিল ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত।

পরে একে একে সমুদ্র পথে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের অছিলায় এসে এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসল। ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ আরমেনীয় সকলেই পর পর এসে ভারত ভূমিতে আস্তানা গাড়ল।

স্মার টমাস রোয়া এল ইংরেজ রাজের দূত হয়ে। ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে অবনত মস্তকে আবেদন জানাল এ দেশে সামান্য কিছু বাণিজ্য করবার অনুমতি চেয়ে। ঠিক যেন সেই বামনরূপী ব্রাহ্মণের বলিরাজের কাছে তিন পা জমি চাওয়া। যেই খোসমেজাজী বাদশা জাহাঙ্গীর তখান বললেন অমনি ভারতবর্ষে দুর্খ্যোগের দিন ঘনিয়ে এল।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কালভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করে বিষ উদ্গিরণ করতে লাগল। বিষের আশুপে

ভারতবর্ষের চতুর্দিক জলে উঠল। নানান ষড়যন্ত্র জাল ইংরেজরা বিস্তার করল। বাণিজ্যের নামে জাহাজ ভরতি অস্ত্রশস্ত্র এনে বন্দরে বন্দরে ফাঁড়ি পাতল।

দেখতে দেখতে শলাশীর মাঠে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার সেই ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজ-দণ্ডের রূপ নিয়ে দেখা দিল। এর মূলে ছিল ইংরেজ কূটনীতি আর সেনাপতি ইয়ার লতিফ, হুর্লভরাম, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা তরুণ নবাব সিরাজ-দৌলার সঙ্গে। সুবঙ্গ পথে ক্লাভইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল উমিচাঁদ। বাঙলা বিহার উড়িষ্যা ইংরেজরা দখল করল।

কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে ক্লাইভের নিজের উক্তি—

“They thought of nothing but the present time, regardless of the future; they said—‘let us get what we can to-day, let to-morrow take care for itself’, they thought of nothing but the immediate division of the loaves and fishes.

বাঙলার মসনদের পর ইংরেজরা ১৮০৩ সালে পাঠানদের পরাস্ত করে দিল্লীর সিংহাসনও কেড়ে নিল।

এইবার বেনিয়া ইংরেজদের স্তব্ধ হল শাসন শোষণ। প্রায় দেড়শ বছর রাজত্ব করে ভারতবর্ষকে কঙ্কাল সার করে দিল। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহীরা কোমর সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল, ভারতবর্ষকে যারা প্রকৃত ভালবাসত। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় সে খবর ফাঁস হয়ে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা আরন্তেই শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশীয় সামন্ত রাজারা।

হ’ল বরকন্দাজ বিদ্রোহ। তারপর তিভুমীরের বিদ্রোহ। ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দে তিভুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পুরুষ গণ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তার ছ তিন বছর পূর্বে থেকেই নানানসাহেবের গুপ্তচরের দল গোপনে দেশীয় নৃপতিদের মনে ইংরেজ বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে বেড়াচ্ছিল—এরাই সিপাহীদের মনেও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের একটা বিশিষ্ট দিনও ধার্য করা হয়েছিল। একই দিনে এই আগুন

অলেছিল বাঙলার ব্যারাকপুরে বহরমপুরে; মীরাত, আখালা লক্ষৌ কানপুরে এবং কাঁসীতে। এই বিদ্রোহের পর ওয়াহাদি ষড়যন্ত্রের কর্ণধাররাও চেয়ে ছিল মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে। এই সব কারণেই এইসব বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা চলে না।

বিপ্লব কথাটির অর্থ হল—চলতি শাসন ব্যবস্থা অহিংস উপায়ে পরিবর্তন করে উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন। ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ততন্ত্র ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা বিপ্লব নয়—প্রতি বিপ্লব। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকেই বিপ্লব নাম দেওয়া যেতে পারে; কারণ সর্বাপেক্ষা উন্নত শাসন ব্যবস্থাই মধ্যবিত্ত পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা।

সময়টা ১৮৭০ সালে হবে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে এমন একটা ধারণা শেকড় গেড়ে বসল যার অর্থ হ’ল সশস্ত্র বিদ্রোহ হাড়া দেশে স্বাধীনতা আনা অসম্ভব।

১৮৭৬ সালে কলকাতার ঠাকুরবাড়ীর ছেলেরা উত্তেজনার আগুন পোষাবার ভেত্রে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ইউরোপীয় আদর্শে এবং গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির নাম-করণ হ’ল ‘সঞ্জীবনী সভা।’

ঠিক এই সময়ে কলকাতার জনাকয়্যেক মেধাবী ছাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিন পাল, হুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি। এই মন্ত্রসাধকদের প্রত্যেককেই আপন আপন বুক চিরে রক্ত নিয়ে, সেই রক্তে এই অঙ্গীকার লিখতে হত—‘স্বায়ত্তশাসনই, আমরা একমাত্র বিধি নির্দিষ্ট বলে মানি। অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্যের, মধ্যশ্রেণী কখনো গর্ভমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করব না। আমরা নিজেরা ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুঁতে শিখব এবং অপরকেও শেখাব। জাতিভেদ অস্বীকার করব। লোক শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করব এবং কোন সম্পত্তি অর্জন করব না।’ তারপর এই অঙ্গীকার পত্র একে একে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতেন

ব্রতচারীরা। এরপর শুরু হ'ত তাঁদের কাজ। অগ্নি-মন্ত্রের আচরণ বিধিই ছিল এই।

খবর এল 'যুগ্ম যুদ্ধের'। মুষ্টিমেয় যুগ্মদের কাছে প্রথম দিকেই ইংরাজদের জঘন্য পরাজয়, বাঙালার তরুণ মনে এনে দিল চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

বছর কয়েক আগেই প্রেসিডেন্সী কলেজের জনা-কয়েক তরুণ 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামে একটি বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল।

এইবার ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র গুপ্তসমিতির দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় পা বাড়ালেন। এই উদ্দেশ্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতে তাঁর মনের খোরাক যোগালেন জাপানী শিল্পী ওকাকুরা। তিনি প্রশ্ন করলেন—“যে ভারতের অতীত এমন গৌরবোজ্জ্বল, তার বর্তমান এত অন্ধকার কেন? পরাধীনতার নাগপাণ মোচনের কোন চেষ্টা হচ্ছে না কেন?”

ওকাকুরার এই মন্তব্যের পর প্রমথ মিত্র, সরলা দেবীর সাহায্যে গুপ্তসমিতি ভালভাবে গড়ে তুলবার দিকে নজর দিলেন। এই গুপ্তসমিতির এখন চেহারা হল অন্য রকম। ভগিনী নিবেদিতা এঁদের সহযোগিতা করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন যুবজাগরণ না হলে পরাধীনতার গ্লানি ঘুচেবে না। তিনি লিখলেন—“আনন্দমঠ।”

এল বন্দেমাতরম।

হল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা একে একে সকলেই হল, বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষিত। মাতৃ বন্দনার ভেতর দিয়ে জাতীয়তার বীজ বপন করলেন, বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙালীইতো সারা ভারতকে শিখিয়েছে 'Nationalism'.

এরপর রবীন্দ্রনাথ যুবকদের প্রাণে আরও সাড়া জাগালেন, এই গানটি লিখে এবং ভাবোদ্বেল কণ্ঠে গেয়ে

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই

মাথা,

তোমাতে বিশ্ব মায়ের, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল

পাতা...”

বাঙালী যদিও এই গানে উদ্ভুদ্ধ হল, কিন্তু পথের সন্ধান মিলল কই?

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর স্ফুলিঙ্গ এইবার যুব শক্তিতে অগ্নি সঞ্চার করল। স্বামিজী চাইলেন বীর্যবান যুবক, বললেন—“বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! বীর্য প্রকাশ কর। পৃথিবী ভোগ কর; তবে তুমি ধার্মিক। আর লাখি বাঁটা খেয়ে চুপটি করে ঘুণিত জীবনযাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই।” স্বামিজী আরও বললেন—

“Believe first in yourself then in God. Man has never lost his Empire. The soul has never been bound. Believe that you are free and you will be.”

শিবশক্তি বিবেকানন্দ প্রচার করলেন—“আত্মার জাগরণ আগে, পরে আর সব।”

তিনি বললেন, প্রকৃত মানুষ গড়াই হবে, তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি যুবকদের আত্মান করে বজ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, “দেশের এই দুর্গতি মোচনে তোমরা কি কেহ নাম-ধাম, ধন-জন, পুত্র পরিবার এমন কি নিজের দেহের প্রতিও মমতা ত্যাগ করতে পার?...সেই বজ্র কঠিন সঙ্কল্প কি তোমাদের আছে—যাহার বলে পুরুত-প্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়?”

স্বামিজীর এই বজ্রনিদানে সমগ্র যুবশক্তির ক্রীবদ্ধ তড়িৎ প্রবাহে দূরীভূত হয়ে অগ্নি ঝঙ্কারে স্পন্দিত হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল ইটালীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক গ্যারিবন্ডির অলৌকিক কাহিনী।

সত্যই তো! গ্যারিবন্ডি যদি মাত্র একহাজার অহুচর নিয়ে অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে খরখরিয়ে কাঁপিয়ে তুলতে পারে, তবে কেন মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকরাই বা পারবে না সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে।

এই সত্য চিন্তায় উদ্ভুদ্ধ বীর্যবান যুবশক্তির বুকের রক্ত টগবগিয়ে ফুটে লাগল। চোখ, মুখ, কান দিয়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরিয়ে এল। ঘর ছাড়া হল তারা। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল। বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, হৃদয় দিতে দিতে বাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে।

[ক্রমশঃ]

ডক্টর অশ্রু কোলের দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ বসু

ডক্টর অমিরকুমার মজুমদার

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশ বহু মনীষীর দৃষ্ট প্রতিভায় সমৃদ্ধ। এই সময়ে বাংলাদেশে (অবিভক্ত বঙ্গদেশ) আসে নতুন চিন্তাধারা। অবক্ষয়ে পরিপূর্ণ দেশে বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে এলেন রাজা রামমোহন রায়। তমসাস্ত্র জাতির ঝুঁটি নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুর পরিবারের প্রতিভাসম্পন্ন সন্তানেরা, স্বামী বিবেকানন্দ এমনি আরো বহু মহাজন।

একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, আর একদিকে শতাব্দীর কুসংস্কার এই দুয়ের মধ্যে পড়ে নাস্তিবাদ উঠেছিল বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর। দেশের এই চরম দুদিনে যারা এই জাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

উনবিংশ শতকের দিকপালদের নিয়ে দেশের পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করেছেন কিন্তু প্রজায় ভাস্বর, ব্যবহারে শিশুর মতো সরল এবং উত্তমে চিরনবীন যে রাজনারায়ণ বসুর কথা রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন তিনি ছিলেন শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। শ্রীমতী অশ্রু কোলে বিস্মৃতির অতল থেকে নিয়ে এসেছেন প্রজাসম্মত রাজনারায়ণকে আলোকিত প্রাঙ্গণে। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর গ্রন্থেরঃ সর্বত্র। গবেষণা পত্র রচনার জন্যে শ্রমদান অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে দক্ষতার ছাপ তিনি এ গ্রন্থে রেখেছেন তা অত্যাধুনিক কালে বিরল বললেই চলে।

যিনি ব্যক্তিবিশেষের উপর গবেষণা করেন, তাঁর প্রতি গবেষক বা গবেষিকার মমত্ব থাকা স্বাভাবিক,

* রাজনারায়ণ বসু : জীবন ও সাহিত্য—ডক্টর শ্রীমতী অশ্রু কোলে। পরিবেশক—জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে, ৩৬, ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। পৃষ্ঠা ৪২৭ + ১৪, মূল্য—তিরিশ টাকা।

কিন্তু অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন হলে গবেষণার ধর্ম বিচ্যুত হয়। এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে শ্রীমতী কোলে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজনারায়ণ প্রথম যৌবনের বিশৃঙ্খলতা সমূলে উৎপাটিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক আদর্শ মাহুষরূপে। মাহুষ গড়ার ত্রুটি তিনি নিজের জীবনকে করেছিলেন উৎসর্গীকৃত। তিনি অনুভব করতেন প্রকৃত মাহুষ না হলে ভারতের কল্যাণ সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি নিজের জীবনে রেখেছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অর্থের প্রলোভনে তিনি স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন না দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন দারিদ্র্যকে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর। মেদিনীপুরে শুধু ব্রাহ্মধর্মের বিজয়পতাকা উড়ান করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, আপামর জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্যে তাঁর প্রয়াস ছিল বিশ্ময়কর। বিপ্লবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রথা তিনি সমর্থন করতেন অকুণ্ঠভাবে। তার নিদর্শনও তিনি স্বগৃহেই স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থব্যয় হয়েছিল এই বিবাহে কিন্তু রাজনারায়ণের নিষ্ঠা অনিন্দনীয়। কয়েকটি দিক থেকে বিচার করলে রাজনারায়ণ যেন দেবেন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে যান তেজস্বীতায় ও গভীর মননশীলতায়। ডক্টর কোলে সেই সব প্রাচীন দিনের কথা সজীব করে তুলেছেন।

রাজনারায়ণ ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব ধর্মকেই তিনি প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি ছিলেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী। ডক্টর কোলে বলেছেন, “তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় রয়েছে ধর্মভাব—আদিতে অন্তে ও মধ্যে। ধর্মের বাণীকে তিনি কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি কর্মের ধার্মিক পুরুষ, জীবনের সর্বকর্মে ধর্মই যার প্রধান কথা।”

তঁার জীবনে, চরিত্রে ও চিন্তায় স্বাদেশিকতা মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তারই প্রেরণায় তিনি ধর্মাস্তরিত হয়েছিলেন। এর মূলে কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা। শ্রীমতী কোলে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'রাজনারায়ণ মনে করেন যে, ব্রাহ্মদের যখনই ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলা হয়, তখনই তাঁদের হিন্দুধর্মাবলম্বী হিন্দুও বলা চলে।' গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একথা খাঁটি, তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে হিন্দুদের মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মরা চিরকাল বিযোদ্ধাগর করেছেন। রাজনারায়ণ নিজেও মূর্তি পূজার বিপক্ষে ছিলেন। উপনিষদে নিরাকার ব্রহ্মের কথা সমুচ্চারিত কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের প্রাধান্যও হিন্দুধর্মে প্রবল। রূপে চিত্ত সমাহিত করতে পারলে শেষ পর্যন্ত অরূপের সন্ধান লাভ করা যায় একথা ভারতের সাধকেরা বারে বারে বলেছেন। অবশ্য পূজা যদি শুধুই অমুঠান হয় তাহলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ন'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থটির বিস্তারিত নিঃসন্দেহে চিন্তাকর্ষক। পারিবারিক জীবনে রাজনারায়ণ বহু সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণের মুখের হাসিটি নেভে নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলেছেন 'সেই খোলা উচ্চ হাসির মধ্যে একটি সুমধুর সরলতা এবং একটা নিরন্তর বিরতি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত।' শ্রীমতী কোলে বলেছেন, 'আজ মানুষের সমস্তাকণ্টকিত জীবন দেখে মনে হয়, রাজনারায়ণের মতো যারা প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তাঁরা বোধ হয় অন্য জগতের লোক।' লেখিকাকে ধন্যবাদ তিনি এছেন একটি মহান চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করে উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে। নিঃসন্দেহে এ এক মূল্যবান সংযোজন। সুলিখিত, সুমুদ্রিত, সুগ্রথিত এবং সুসজ্জিত এই গ্রন্থের সমাদর অবশ্যস্তাবী।

ছবি

শান্তনু দে সরকার

কলকাতার অন্তর্বর্তী কোন শিল্পাঞ্চলে জীবিকা অর্জনের জন্তে, অতনুকে যাতায়াত করতে হয়েছিল কয়েকদিন। কর্ম বিরতির অবসরে ও এসে দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে ছায়া ঢাকা একটা গাছের তলায়। ওখানে একজন হিন্দুস্থানী ফেরিওয়াল বসে মটর ছোলা আর চিনে বাদাম বিক্রী করছিল। গাছের অপর দিকে পথের পাশে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর বসেছিল জন কুড়ি নানা বয়সের মেয়ে। অতনু সহকর্মীদের মুখে শুনেছিল, মেয়েগুলো সামনের ছাতা-কলে শ্রমিকের কাজ করে। ওদের এখন কর্মবিরতি।

একটি অল্প বয়েসী বাঙালীর মেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। পাশের সমবয়েসী মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো,—কাঁদছিস কেন ছবি? কি হ'ল তোর? আবার জানোয়ারটা তোকে কিছু বলেছে নাকি?

ছবি কথার কোন জবাব দিল না। একজন মাঝ-বয়েসী হিন্দুস্থানী মেয়ে বললে,—তোকে তো বললুম ছবি, তুই গোকুল হারামজাদার কথা ম্যানেজার সাহেবকে বল। ও ছোঁড়া ভারি মেয়েদের সঙ্গে ইয়ারকি-মারতে আসে।

ছবি বললে,—বলেছিলুম ছুলালী দিদি। ম্যানেজার আগে চুপ করে শুনলে, পরে মুখ গভীর করে বললে—রাস্তায় কে কাকে কি বললে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোম্পানীর সময় নেই। তাছাড়া মজদুরের কাজ করতে গেলে মজদুর হতে হবে, ভদ্র লোকের মত সামান্য কথায় গলে পড়লে চলবে না। আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে কাজ। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো সমান নয়। মন্দ লোক তো থাকবেই। যে যার মান বাঁচিয়ে কাজ করতে পারো করো, না পারো ছেড়ে দাও।

হুলালী বললে,—জানিস উর্মিলা, ম্যানেজার ব্যাটাই হল আসল হারামী; গোকুলটা ওর দালাল। পেটের জ্বালায় গরীব মেয়েটা কাজ করতে এসেছে, জানোয়ারের ব'চ্চারা ওদের ইজ্জত খেতে চাইছে। মারতে হয় পেটে তিন লাথি।

উর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে,—গোকুল তোকে কি বলেছে? ছবি?

ছবি জবাব দিলে,—কত আর বলবো বল। ফাঁক পেলেই সামনে এসে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়াবে; চং করে গলার আওয়াজ করবে, মুখের দিকে চেয়ে হাসবে, চোখ ছোট-বড় করে ইসারা করবে। ছুটির পর পেছা নেবে; বলবে—চল, ছবি সিনেমা দেখে আসি; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়ে আসি। তোর কি খেতে ইচ্ছে যায় বল? ঘুঘনি খাবি? কুলপি মালাই?

উর্মিলা বললে,—ভদ্রলোকের মেয়েরা এখানে কাজ করতে পারবে না ছবি, তুই এ কাজ ছেড়ে দে।

ছবি অসহায়ের মত বললে,—এক এক সময় আমারও তাই মনে হয় উর্মিলা। কিন্তু কি করবো তেবে কুল পাই না। বাবা তো চোখে দেখতে পায় না। ছানি পড়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল। ছাপাখানায় প্রফরিরডারের কাজ করতো, চাকরীও গেল। চিকিৎসার অভাবে মা মারা গেল। আমি এখান থেকে ষাট টাকা মাইনে পাই, এতে কোনো রকমে দুজনের চলে। চাকরী ছেড়ে দিলে না খেয়ে মরতে হবে তাই।

পাশের নেপালী মেয়ে চম্পা বললে,—গোকুলের বাবার সাখি আছে আমাকে অমন কথা বলে। দোবো ভোঁজালী দিয়ে গুয়োরের বাচ্চার পেট হাঁসিয়ে না।

নৈরাশু ভরা চেখে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ছবি। বাঙালীর মেয়ে ও, অতখানি সাহস ওর নেই।

চং চং করে বিরতি শেষের ঘণ্টা বেজে ওঠে। কাপড়ে জড়ানো ঘাসের গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েরা ছাতা-কলের মধ্যে ঢুকে যায়। দূর থেকে ওদের অদ্ভুত সংলাপ শুনে ধীরে ধীরে অতনু চলে যায় ওর কর্মস্থলে।

এর কিছুদিন পর থেকে অতনুর কর্মস্থলের পরিবর্তন

হয়েছিল। চার বছর পরে ও গিয়েছিল ওর মাসতুত দিদির খন্তুর বাড়ী বেহালায়। ও অবাক হয়ে দেখলে, ছবি কলতলায় বাসন মাজছে, ওর পাশে একটা ছুবছরের ছেলে খেলা করছে, উঠনের একধারে ছেঁড়া টেনার ওপর দু-তিন মাসের একটা বাচ্চা শোয়ানো।

ওকে দেখে অতনুর কেমন কোঁতুহল হ'ল; ও জিজ্ঞাসা করলে তোমার নাম কি ছবি?

ছবি আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও তো অতনুকে চেনে না।

অতনু আবার জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ছাতা-কলে চাকরী করতে না? ছবি মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

অতনু বললে,—তবে এ কাজ করছো কেন? কি হ'ল ছাতা-কলের চাকরী।

ছবি জবাব দিলে,—ছাতা-কল বন্ধ হয়ে গেছে।

অতনু অবাস্তব প্রশ্ন করলে,—তোমার স্বামী নেই?

লজ্জায় মাথা নীচু করে ও যা শোনালে, তা সংক্ষেপে হাছো, ওর মত হতভাগিনীকে কে বিয়ে করবে? অন্ধ বাপ আর নিজের পেটের জ্বালা চাকরী করতে গিয়ে পরিশ্রমের মজুরী ছাড়া এই বাচ্চা দুটোকে ও উপরি পেয়েছে। ও দু-টো ওর কুমারী জীবনে চাকুরী করার অনুদান। বাবা আগে ভালো চাকরী করতো, এখন চোখে দেখতে পায় না, তাই মেয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। পেটের বোঝা বড় বোঝা; এ দুর্ভাগ্যের বোঝার জ্বালা তার কোনো বিকার নেই। ছ-মাস হ'ল ছাতা কলের দরজা বন্ধ হয়েছে, কোনো উপায় না দেখে ও বিয়ের কাজ করতে শুরু করেছে। বাবাকে বড় রাস্তার ওপর নেকড়া পেতে ভিক্ষেয় বসিয়ে এসেছে।

হঠাৎ ছোট বাচ্চাটা চিংকার করে উঠলো। রান্নাঘর থেকে দিদির শাপুড়ী বলে উঠলেন,—ছবিকে রেখে আমার বাকুমারী হয়েছে। কানকর্ণ গেল। দুটো ছেলে সঙ্গে করে কাজ করতে এসেছে। পেটে ভাত নেই এত ছেলে পুলে আসে কোথা থেকে!

ছবি ছাই-মাখা হাতে ছুটে এলো ছেলেকে থামাবার জন্তে। জীবনটা ওর জীবন্ত আত্মকুঁড়! সব ছাইয়ে ভরা।

অতনু দৌড়ে উঠে গেল সিড়ির ওপর। ওর বয়েস তখন পঁচিশ-ছাক্সিস, ছবির হয় তো একুশ-বাইস হবে। ছবির মনের অবস্থা ও বুঝতে পারে না, কিন্তু ওর মাথা যেন ঘুরতে থাকে। ও রাস্তার ধারে খোলা বারান্দার ওপর এসে দাঁড়ালো মাথায় হাওয়া লাগাবার জন্যে। চেয়ে রইলো পথের দিকে উদাস ভাবে। প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনার একটি চিত্র ওর তরুণ মনকে চঞ্চল করে তুললো।

সদর দরজা খুলে কাজ শেষ করে ছবি পথে নামলো। ছেঁড়া টেনা জড়ানো ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে, বড়টার হাত ধরে টানতে টানতে ছবি চললো পথের ওপর দিয়ে। ওর পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে চলতে লাগলো একটা মোটর গাড়ী। ভেতর থেকে মাইকে প্রচার হতে লাগলো,—‘করমুক্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি,—“দারিদ্র্যের অবসান”। নীল আকাশ সিনেমায় আজ থেকে রজতজয়ন্তী সপ্তায় পদার্পণ করলো।’

দূরে চৌ-মাথার মোড়ে লম্বা একটা মিছিল দেখা গেল। ওরা তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো,—

“ধনীর শোষণ রুখতে চাই, খেয়ে পরে বাঁচতে চাই, সমান হয়ে থাকতে চাই, নতুন সমাজ গোড়তে চাই, সমাজতন্ত্র আনতে চাই।”

‘আলসে’ ধরে দাঁড়িয়েছিল অতনু। ওর মাথার ভেতর তখন যেন বিশ্ব-সংসার নাগোর দোলার মত ওঠা নামা করছিল। ওর মনে হ’ল, সত্যি জেতা স্বাপর কলি ধীরে ধীরে চার যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সূচনা হ’ল নব সমাজতন্ত্রের। পথের ওপর দিয়ে ছেঁড়াটেনা জড়ানো একটা তিন মাসের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে বাঁ হাতে দু-বছরের ছেলের হাত ধরে বাইশ বছরের মেয়ে ছবি নব সমাজতন্ত্রের ছবি একে চলেছে পথে বসে ভিক্ষে করা অন্ধ বাপের কাছে। ওর পেছনে পেছনে চলেছে একটা মাদী কুকুর। তার সঙ্গে চলেছে তিনটি শাবক। ওরা যেন নব সমাজতন্ত্রের নব কেতনের প্রতীক চিহ্ন। নেই কুকুর বাচ্চাদের পিতৃ পরিচয়, নেই ছবির সন্তানদেরও। প্রগতির উল্লাসে মানুষ আর পশু এক হয়ে গেছে। অভিনব ইউনিফিকেশন! বিরাট একী-করণ।

শেষের গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মোর ভাবনারে ভরি’ পল্লব মেলে
জাগে কল্পনালতা,
কল্পনা সেতো নয়, সে যে গো মনের
গভীর গোপন কথা।
এমন মধুর লগ্ন কখন হবে
সেই কথাগুলি বলিব তোমারে যবে,
অসহ হয়েছে না বলার ব্যথা—
বুকভরা আকুলতা।

হয়তো আকাশে ঘনাবে আমার
সন্ধ্যার কালো ছায়া
তখনো যে শেষ হবে না আমার
মায়াবী মনের মায়া।
তাই তুমি এস এই স্তমধুর ক্ষণে
দু’জনের কথা নির্জন আলাপনে
ভুল ঘূচে গিয়ে হোক জানাজানি
দু’জনের যত ব্যথা।

রক্তের সম্পর্ক

শ্রীযীরেন্দ্রলাল ধর

মুনাফাবাজির যুগ।

ছোট শহরটির বৃক্কে সাড়া পড়ে গেল। তরুণ ছাত্র নেতা আসছেন, মূল্যবুদ্ধি ও ভেজালের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে। নিম্নবিস্তের মানুষেরা উৎসুক হয়ে উঠলো। মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীরা বাঁকাহাসি হাসলো, দেখা যাক না কি করতে পারে!

চৌরাস্তার মোড়ে বিরাট সভা হলো। ছেলে ছোকরার দল ভেঙ্গে পড়লো সেই সভায়। তরুণ বক্তা দ্যুতিময় সোজা কথা স্পষ্ট বললো—আইনের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না, স্বাধীন হবার পর ছাব্বিশ বছর চলে গেছে। কিন্তু ভেজাল বন্ধ করার জন্য কোন কড়া আইন পাস হয় নি, ওষুধ অবধি জাল হয়, রোগী মারা যায়। কিন্তু তার কোন প্রতিকার নেই। জিনিষের দাম বাড়িয়ে শহরে দশতলা বাড়ী হচ্ছে, মোটর গাড়ী হচ্ছে, সাধারণ মানুষ খেতে পাচ্ছে না, সেদিকে দেখবার মানুষ দেশে নেই। অনেক সময় চলে গেছে আর নয়। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হবে, নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সত্যগ্রহ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়ে গুণ্ডা লাগাবে। তারা হাঙ্গামা বাধাবে। পুলিশ এসে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু খেয়ে পরে বাঁচতে চাইলে এই ভয় রাখলে চলবে না। এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এতে এবার নামতে হবে।

চারিপাশের ছেলেরা সাড়া তুললো—এ লড়াই, বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

মিছিল বেরুলো শহরের পথে। ছেলেরা হৈকে বললো—মূল্যবুদ্ধি বন্ধ করতে হবে। আপনারা দলে দলে সত্যগ্রহে যোগ দিন।

তেলকলের সামনে এসে মিছিল থামলো, ছেলেরা সাড়া তুললো—ভেজাল দাতা নিপাত যাক, নিপাত যাক।

হঠাৎ কয়েকখানি ইঁট এসে পড়লো দলের উপর।

একটা বিশৃঙ্খলা।

পরক্ষণেই পিছন দিকে একটা মারামারি শুরু হয়ে গেল।

দ্যুতিময় ছুটে এল মারামারি থামাতে। একখানা ইঁট এসে লাগলো দ্যুতিময়ের মাথায়। মাথা ফাটলো। রক্ত গড়িয়ে পড়লো পালের উপর। দ্যুতিময় রুমাল চেপে ধরলো।

পাশেই এক পানওয়ালীর ছোট দোকান। পানওয়ালীর বালতি ভরা জল ছিল। পানওয়ালী তাড়া-তাড়ি দোকান থেকে নেমে এলো। বললো—বাবা একটু জল দাও রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা ছেলে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে দ্যুতিময়ের মাথায় চেপে ধরলো। পানওয়ালীর বেঞ্চির উপর দ্যুতিময় বসে পড়লো।

পানওয়ালী দ্যুতিময়ের মুখের পানে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখলো, তারপর বললো, বাবা আপনি কি ব্রাহ্মণ?

দ্যুতিময়ের সেদিকে কান ছিল না। সামনের পানে তাকিয়ে দেখলো মারামারি তখন জমে উঠেছে। তাদের নেতাকে আঘাত করার জন্য তরুণের দল ফেপে গেছে। তেলকলের দরজা ভেঙ্গে তারা ভিতরে ঢুকে গেছে। দ্যুতিময় তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগোলো।

পুলিশ এসে পড়লো। লাঠি চালালো। আরো কয়েকটা মাথা ফাটলো। তারপর শুরু হলো গ্রেপ্তার।

দ্যুতিময়কে পুলিশ ধরলো। ধরলো আরো অনেককে। চারিপাশে সাড়া উঠলো ইন্কিলাব, জিন্দাবাদ। ভেজাল দাতা নিপাত যাক! মুনাফাবাজ নিপাত যাক।

দ্যুতিময়কে দলবল সহ পুলিশ ভ্যানে তুললো।

পানওয়ালী তখনও দ্যুতিময়ের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। পুলিশ তাকে হঠিয়ে দিল—তুমি আবার এখানে কেন—হট যাও—

পরদিন।

আদালতে মাথলা উঠলো।

হ্যুতিময় কোন উকিল দিল না, নিজের পক্ষে কিছু বললও না। দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর অপরাধে হ্যুতিময়ের কারাদণ্ড হলো। দলের অত্যাচার ব্যক্তিগত মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেল।

আদালত থেকে বেরিয়ে হ্যুতিময় পুলিশের গাড়ীতে উঠছে, সামনে এসে দাঁড়ালো সেই পানওয়ালী। বললে বাবা, আপনার জেল হলো? আপনি তো কোন দোষ করেন নি বাবা, আমি সাক্ষী দোব।

হ্যুতিময় হাসলো। বললো বিচার শেষ হয়ে গেছে, সাক্ষীর আর দরকার নেই।

একজন বলিষ্ঠ পাহারাওলা পাশ থেকে গর্জে উঠলো;—ভাগো হিঁয়াসে—

পানওয়ালীকে পাহারাওলাটি সামনে থেকে সরিয়ে দিল।

পুলিশের গাড়ী চলে গেল হ্যুতিময়কে নিয়ে।

পানওয়ালীর মুখখানা হ্যুতিময়ের মনে একটা ছাপ রেখে যায়। কেন যে, হ্যুতিময় তা ভেবে পায় না।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে হ্যুতিময়ের মনে পড়ে তার বাবার কথা।

হ্যুতিময় তখন এম-এ পড়ে। বাবার রক্তের চাপ বেড়েছে। আহা! ত্যাগ করে চুপ চাপ বাড়ীতে শুয়ে বসে আছেন। হ্যুতিময়কে ভেকে সামনে বসালেন, তোকে একটা কথা বলবো, বোস।

খানিক চুপ করে থাকার পর বললেন তুই জানিস, তোর মা মরে গেছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। তোর মা বেঁচে আছে।

—মা বেঁচে আছে? হ্যুতিময় বিস্মিত হলো।

—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। আগে সবটা শোন। এতদিন বলিনি। বলবো না ভেবেছিলাম, এখন ভেবে দেখলাম তোকে বলা ভাল।

বাবা চুপ করলেন। হ্যুতিময়ও চুপ করে তাকিয়ে রইল।

খানিক পরে বাবা বললেন—তোমার জন্মবার বছর খানেক পরে নীলু এলো এইখানে সেটলমেন্ট করতে। আমার বাড়ীতেই সে এসে উঠলো। শুভার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেই থেকেই স্কুল হল ওদের ঘনিষ্ঠতা। তারপর কাজ শেষ করে নীলু চলে গেল। সেইদিন থেকে শুভাকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

হ্যুতিময় আর শুনতে চায় নি। তার ইচ্ছা হয়েছিল পিতার মুখটা সে চেপে ধরে। কিন্তু পিতা নিজেই চুপ করেছিলেন।

খানিক থেমে বাবা বলেছিলেন আমি আর তার খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করিনি। ভেবে নিয়েছিলাম সে মরে গেছে।

হ্যুতিময় কোন প্রশ্ন তোলেনি। মায়ের এই চরিত্র তার সারাজীবনটাকে বিষাক্ত করে দিল। সেই বিষ পরিপাক করতে তার সময় লেগেছিল।

ছমাস পরে।

হ্যুতিময় জেল থেকে বেরিয়ে এলো। দলের অনেক ছেলে এসে জড়ো হয়েছিল সেখানে। তারা তাকে নিয়ে এলো পাটি^২ অফিসে।

আজ বিকালে আবার একটা সভা হবে।

ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতেই সকালটা কেটে গেল। জুপুরে আহা^৩রাদি সেরে একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে হ্যুতিময় খবরের কাগজগুলো দেখছিল।

কোন এক সময় একটী মেয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো—বললো নমস্কার।

—কে? কি দরকার?

—আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—বলুন?

—এক পানওয়ালী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দয়া করে একবার যাবেন সেখানে?

—কোথায়?

এক বস্তিতে?

—কি দরকার?

—বলে বাবুকে একবার দেখবো। খুবই অসুস্থ বোধ হয় আর বাঁচবে না।

—তুমি তার কে হও?

—কেউ না। আমাদের উপর ওই বস্তুটা দেখা
গুনা করার ভার আছে।

—চল, দ্যুতিময় উঠে পড়লো।

মেয়েটি আগে আগে চললো দ্যুতিময় তার অনুসরণ
করলো।

চলতে চলতে মেয়েটি বললো, এখনই সে পানওয়ালী
হয়েছে, একসময় সে বড় ঘরের বউ ছিল। পলাশপুরের
জমিদার বাড়ীর বউ। বরাতের ফের।

—পলাশপুর? হুগলী জেলার পলাশপুর?

—তা হবে, ঠিক জানি না।

—জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবার পর অনেকের অবস্থাই
খারাপ হয়েছে। কিন্তু পানওয়ালী হবার মত অবস্থা
হয়েছে এসব তো জন্মিতাম না।

—এর ব্যাপারটা যা শুনেছি, ঠিক জমিদারী বাজে-
য়াপ্ত হবার ব্যাপার নয়। এ ভুগছে নিজের কর্মফলে।
এঁর স্বামী জমিদার ছিলেন মাতাল। জমিদারের
এক বন্ধু গিয়েছিলেন সেই বাড়ীতে। বন্ধুর সঙ্গে
স্বামীই পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে বন্ধুর
সঙ্গে কথাবার্তা করার জন্য স্ত্রীকে মারধোর
স্বরূপ করলেন। অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন বন্ধু
বললো ওকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দেবে। কিন্তু নিয়ে
গেল নিজের বাড়ীতে। জমিদার তাকে সন্ধান করে
ঘরে ফেললেন। সঙ্গে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিল।
জমিদার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। বন্ধুটিও
পুলিশের হাঙ্গামা হবাব ভয়ে পালিয়ে গেল। তারপর
থেকেই এখানে ওর এই পানের দোকান।

কাহিনী শুনতে শুনতে দ্যুতিময় কেমন যেন অত-

মনস্ক হয়ে গেল। কোথায় যেন একটা কিসের অন্ধকারে
তার মন হাতড়াতে লাগলো।

তারা এসে পড়লো বস্তুটার সামনে।

সরু গলি। দুপাশে টালি আর টিনের ঘর। অন্ধকার
ঘুপসী। এখানে সেখানে উলঙ্গ ছেলেমেয়ের চীৎকার,
হটোপাটি। কাছাকাছি ছোটো বড় আশুাকুড়।

মেয়েটি একখানি ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

দ্যুতিময়কে নিয়ে সে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

ঘরের মেঝেতে জীর্ণ কাঁথার উপর শীর্ণ দেহ। চোখ
বুজে পড়ে আছে পানওয়ালী।

মেয়েটি তার উপর বুক পড়ে ডাকলো—পানওয়ালী
মা!

পানওয়ালী চোখ মেললো—কে?

—তাকে নিয়ে এসেছি।

পানওয়ালী দ্যুতিময়ের মুখের পানে তাকালো।

ঠাণ্ড দ্যুতিময় বুক পড়ে বললো—আমায় চিনতে
পারছ, আমি পলাশপুরের জমিদার অপূর্ব বাগচির
ছেলে

পানওয়ালী চমকে উঠলো।

চমকে উঠলো মেয়েটিও।

পানওয়ালী সহসা দু হাত বাড়িয়ে দ্যুতিময়কে
জড়িয়ে ধরলো। থর থর করে কেঁপে উঠলো। কি
যেন বলতে গেল। বলতে পারলো না। তার হাত
দুখানি শিথিল হয়ে পড়ে গেল।

দ্যুতিময় চট করে তার নাড়ী টিপে ধরলো। স্পন্দন
নেই।

কুণ্ডা দুর্বল পানওয়ালীর এতটা আবেগ সহ্যের
সামর্থ্য ছিল না।

কবিগান

শ্রীচূণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙলার শিব,

লক্ষায়

লীলাময়।

বাঙালীয় কালী,

তিব্বতে

বলিতা।

সজ্জ-সংবাদ

আশ্রমী

পূর্ণিমা সম্মেলন :

বিগত ১৩ই চৈত্র ১৩৮১ (ইং ২৭শে মার্চ ১৯৭৫) বৃহস্পতিবার দোল পূর্ণিমা। এই দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও জন্ম তিথি। সজ্জের সকল প্রতিষ্ঠানেই এইদিন পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও স্মরণ করা হয়। মূলকেন্দ্রে সজ্জসভাপতির সভাপতিত্বে এবং সজ্জ সম্পাদকের পরিচালনায় এই অস্থান পালিত হয়। নববারাকপুরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস ও শ্রীমতী কণিক দাসের এবং কাঁকিনাড়ায় শ্রীভোলানাথ শর্মা ও শ্রীমতী শকুন্তলা শর্মার গৃহে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রেজার-গঞ্জ প্রবর্তক আশ্রমেও যথারীতি পূর্ণিমা সম্মেলন হয়। কেন্দ্রসজ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমান রবি কর এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

দক্ষরপুর আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলন :

হাওড়া দক্ষরপুর আশ্রমের পূর্ণিমা সম্মেলনে যোগদান করেন, কেন্দ্র সজ্জ হইতে রেণুকণা ঘোষ। তিনি ৫দিন তথায় অবস্থান করিয়া অক্লান্ত শ্রমে ও উৎসাহ সহকারে সজ্জ বিষয়ক প্রচার; আলোচনা-সভা, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, পারিবারিক উপাসনা, ও বিভিন্ন গ্রামে গমন করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা করেন।

বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। আশ্রমিক নীতি অনুযায়ী প্রভাতী উপাসনা ও প্রাতঃসম্মেলনান্তে আবীর দান। তৎপরে শ্রীশ্রীসজ্জগুরু দেবের জীবনী ও কর্ম লইয়া আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমতী ঘোষ বলেন—দক্ষিণেশ্বরের পর সজ্জগুরু। সজ্জগুরুদেবের কথা—অর্থের বর্জন নয়, অর্থের প্রতি আসক্তির বর্জন। অর্থকে যেভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেইভাবেই সে শুভাশুভ ফল প্রদান করবে। অর্থের শুভাশুভ ফল নির্ভর করে প্রয়োগকারীর উপর। সজ্জগুরুদেব তাই সর্ব প্রথম জোর দিলেন মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধির উপর। মানুষ যদি হয় নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ও আসক্তিশূন্য—সৃষ্টিও

হবে তদ্রূপ। সজ্জগুরুজীর ঘোষণা—“কাম কাঙ্ক্ষনের বর্জন নয়, চাই শোধন।” দেখা যায়, ঠাকুর-রামকৃষ্ণ দেবের মধ্যে একটা যুগের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাঁরই উত্তর সাধক স্বামী বিবেকানন্দর মধ্যে নূতন যুগধারার প্রবর্তন। যে অর্থকে ঠাকুর বর্জন করেন—সেই অর্থকেই স্বামীজী আমেরিকা থেকে আহরণ করে আনেন। স্বামীজী যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সজ্জগুরুদেব সেই ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণে ব্রতী হন।

শ্রীমতী ঘোষ বলেন—ইতিহাসের পটভূমিকায় সজ্জ-গুরুদেবের ইহা এক অভিনব অনুবাদিত অবদান।

এইদিন আশ্রমে মধ্যাহ্ন-উপাসনান্তে ভোগ নিবেদন করা হয়; এবং সন্ধ্যায় দীক্ষিত সহযোগী সত্যা শ্রীমতী চায়না ঘোষের গৃহে উপাসনা। এক বৎসর পূর্বে এই গৃহে এই দিনে উপাসনার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়; আজ তাঁরই সাধাৎসরিক উৎসব সভা। যথাবিধি গুরুবন্দনা, উপাসনা, গীতা পাঠ ও সজ্জগুরুদেবের একটি বাণী পাঠের পর ৫ মিনিট নীরব ধ্যান। তৎপরে কুমারী সন্ধ্যারাগীর আবাহনী সঙ্গীত ও শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষের উদগান (ঈশোপনিষদের মন্ত্রে) অন্তে সাধৎসরকাল উপাসনা করার ফলে যে অস্থূতি লাভ হয় তার অভিব্যক্তিস্বরূপ পুত্রবধূ শ্রীমতী রমারাগী ঘোষ বলেন—“আমি মায়ের সঙ্গে উপাসনা করি—কিন্তু এখনও ঠিকমত আশ্রয় করতে পারিনি। তবে কোন দিন, কোনও কারণে যদি সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে বসতে না পারি, তাহলে ভাল লাগে না, কেমন যেন অতাববোধ অনুভূত হয়।” পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র ঘোষ বলেন—“আমার চাকুরীর জীবন। উপাসনা করা হয় না। মায়েরা করেন—আমার বেশ ভাল লাগে।” শ্রীমানের কথার স্বত্ব ধরেই রেণুকণা ঘোষ বলেন—ভাললাগা আর ভালবাসা প্রায় সমগোত্রীয়। শ্রীমতী ঘোষ শ্রীমানকে উদ্দেশ্য করে বলেন—তোমারও তাই হোক ভাললাগাটাই ভালবাসায় পরিণত হোক—তাহলেই শত কাজের মধ্যেও উপাসনা না করে পারবে না। অতঃপর তিনি

তালবাসার সঙ্গে উপাসনার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া বলেন—তালবাসায় থাকে ছুটি বস্তু এক আশ্রয় আর এক আশ্রিত। তেমনি উপাসনারও। এক উপাস্ত আর এক উপাসক। আশ্রয় বস্তুই উপাস্ত, আর আশ্রিতই উপাসক। সমস্ত এই আশ্রয় বস্তু নিরূপণ করা নিয়ে। আশ্রয় বস্তু এমন হওয়া দরকার—যিনি ক্ষুদ্র নন পরন্তু ভূম। যাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ক্ষুদ্র আশ্রিতও বৃহৎ ভূমায় পরিণত হয়। শ্রীমতী ঘোষ ভাগবত থেকে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

সর্বশেষে তিনি অজকের দিনটির বিশেষ তাৎপর্যের উল্লেখ করে বলেন—দোল পূর্ণিবার দিনেই শচীমাতার কোল আলো করে বাংলার ঢুলাল নদীয়ায় অবতীর্ণ হন। শচীনন্দন নিমাই যদি অবতীর্ণ না হতেন, বৃন্দাবনের নন্দনন্দন বনজঙ্গলের মধ্যেই ঢাকা পড়ে থাকতেন—বিশ্ব-জগতের কাছে এমনভাবে তিনি ঘোষিত হতেন না। আজিকার বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই অবদান। বাংলার এই যে গৌরবময় ঐতিহ্য এর উত্তরাধিকারী বাংলার প্রতিটি সন্তান-সন্ততি। শ্রীমতী ঘোষ গৌর-সুন্দরের কাছেই প্রার্থনা জানান বাংলার ছেলেমেয়েরা যেন তাঁদের নিঃস্ব জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী হয়।

পূর্ণ প্রশস্তি মন্তোচ্চারণের পর শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেব ও শ্রীশ্রীসজ্জজননী শ্রী বর্ণে আবীর ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও তৎপরে প্রসাদ বিতরণ।

ইহার পর কয়েকজন ভরূণ শ্রীমতী ঘোষের সহিত সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রনোত্তরে আলোচনা করেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় পরদিন সকাল ৭টায় আশ্রমে এই বিষয় সুইয়া আলোচনা করার সময় স্থির হয়।

পরদিন যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হয় এবং প্রায় দুই বটা এই বিষয়ে আলোচনাও হয়। ছাত্রদের আগ্রহে এইরূপ সাংস্কৃতিক আলোচনা প্রতি রবিবারেই হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শ্রীমান রঞ্জিতকুমার কোণ্ডার সাগ্রহে আলোচনার তার গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী ঘোষের গৃহে

সাক্ষ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের গৃহে। দ্বিতলের প্রশস্ত বারান্দায় এই সম্মেলনের আয়োজন হয়। শুভ শঙ্খধ্বনীর সহিত শ্রীমান রঞ্জিত শ্রীশ্রীসজ্জজননী ও শ্রীশ্রীসজ্জদেবের প্রতিকৃতিতে মালা-দান করেন। গুরুবন্দনান্তে সমবেত কণ্ঠে উপাসনার মন্তোচ্চারণ, পাঁচ মিনিট নীরব ধ্যানের পর সমবেত কণ্ঠে দ্বাদশ অধ্যায় গীতাপাঠ ও শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের একটি লিখিত বাণী পাঠ করা হয়। তৎপরে প্রবর্তক বিভা-মন্দিরের শিক্ষক শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ কোণ্ডার ধর্ম সম্বন্ধে এবং এইরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপযোগীতা সম্বন্ধে সুন্দর অভিযুক্তি প্রদান করেন। উভয়েরই কথার সারমর্ম—ভারত ধর্মের দেশ বর্তমানে ধর্ম গ্রাহি দেখা দিলেও ধর্মকেই আমাদের রক্ষা করে চলতে হবে। ধর্মও আমাদের রক্ষা করবে।

শ্রীমতী রেণুকা ঘোষ বলেন—ভারত ধর্মের দেশ। ধর্মই মানুষকে ধারণ করে আছে। সে ধর্ম কি? বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম চৈতন্য। ব্যক্তি জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করাই ধর্ম। এইরূপ চৈতন্যযুক্ত মানুষদের নিয়েই ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাম্য ছিল। এই কাম্য প্রাকৃষাধীনতা যুগের। আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতা এসেছে ধর্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ। কিন্তু আমরা যদি অবিদ্বেশী মনোভাব নিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব এরও পশ্চাৎ একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। তাৎপর্যটি হচ্ছে এই যে, কোন ধর্মের প্রতিই রাষ্ট্রের শঙ্কপাত থাকবে না। তাই বলে দেশ থেকে মানুষের মধ্য থেকে ধর্ম নিষ্কিহ হয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই; আর তা সম্ভবও নয়। কারণ, মানুষ সব কিছু অস্বীকার করলেও রক্ত ধারায় ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমাদের রক্ত কণিকায় আজও ধর্মের প্রবাহিত। ধর্মের গোত্র প্রবর নিয়েই আজও আমরা ন্যায়বোধ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যত্ন সহকারে প্রতিষ্ঠা করছি।

পরায়ণ হবে। রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে এইভাবেই অনুসৃত। অন্যান্য ধর্মের মাহুসর—যেমন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি তারা হচ্ছেও তাই—কেবল ব্যতিক্রম হিন্দুর বেলায়। কেন? অনুধাবনীয় সেইটাই।

ইতিহাস অনুধাবন করলেই এর কারণ পাওয়া যাবে। ষাঁপরের শেষে কলির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। তখন থেকেই ধর্মের মধ্যে গ্লানি এসে গেছে। মানুষ হয়েছে ধর্মহীন আচার সর্বস্ব। যার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কেও বেদাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়েছে। তিনি চেয়েছেন ধর্ম শুধু বেদ মন্ত্রেই নিবদ্ধ হয়ে থাকবে না—শুধু আবার সর্বস্ব হয়েছে থাকবে না—ধর্ম মূর্ত হবে মানব জীবনে। প্রতিটি মানুষ হবে ধর্মের বিগ্রহ। আহায়ে বিহারে জীবনের সর্ববিধ আচার অনুষ্ঠানে চৈতন্যের প্রকাশ হবে। সে চৈতন্য ব্রহ্ম চৈতন্য। যাহাই জীব-জগতকে ধারণ করে আছে। সে প্রচণ্ড শক্তিশালী, তার তুলনা হয় না। আনুষ্ঠানিক হোম-যজ্ঞ করে বা মালা তিলক ধারণ করে নিত্য গঙ্গা স্নান ও তুলসী তলায় জল দিলেই সেই ব্রহ্মচেতনার জাগরণ হবে না—ব্রহ্মশক্তির স্পর্শ লাভ করা যাবে না, হতে হবে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত। কেমন করে? সে পথও তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজের বুকে হাত দিয়ে তিনি বলেছেন—“মামেতি”—আমাঙে যুক্ত হও। আমি কে? আমি তুরীয় পরম ব্রহ্ম নই—আমি বসুদেবনন্দন—বাসুদেব। অহং দেব ন চ অন্য অশ্মি—আমিই ব্রহ্ম, আমিই দেবতা—আমাতে যুক্তি পেলে তুমিও ব্রহ্মরূপ হবে। এইখান থেকেই শুরু হল এই অভিনব জীবনযাত্রা। গুরু শিষ্য বা ভক্ত ভগবান উভয়ের মিলন যেখানে—ধর্ম মূর্তিমান সেখানেই। শ্রীগীতায় সর্ব প্রথম এই অভিনব বার্তা আমরা পাই। শ্রীসঞ্জয় এই কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয় ভূতিক্ষুবানীতির্মতির্মমঃ ॥

যুক্ত জীবন যেখানে, সেখানেই শ্রী বিজয়, ভূতি ও জ্বা-নীতি অবশ্যই আসবে। এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ। এই ধর্মকেই আমাদের রূপ দিতে হবে নিজ নিজ জীবনে। এখানে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধক হবে না। ছয়হাজার বছর ধরে এই ধর্মকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা চলে আসছে—আজও তার বিরাম নাই। সৌভাগ্যবান আমরা—আমরা এর উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মেছি। আমরা যেন এই গুরুকেন্দ্রিক যুক্তজীবন নিয়ে ধর্মকে রূপ দিতে পারি, এই প্রার্থনা।

অতঃপর পূর্ণ প্রশস্তি মন্তোচ্চারণের পর গৃহকর্ত্রী মাতৃ দেবী পরমানন্দে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন।

পূর্ব প্রস্তাবানুযায়ী রবিবার সকাল ৭টায় আশ্রমের উপাসনা মন্দিরে একটি গাংগাতীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে-সাংস্কৃতিক ক্লাসের উদ্বোধন হয়। পাঁচ মিনিট নীরব ধ্যানে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আবাহন, বেদমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম এবং আশীর্বাদী গ্রহণ। তারপর প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ বলেন—এই সাংস্কৃতিক ক্লাসটি যেন ফালতু না হয়। ইহাকে একাধারে পরীক্ষামূলক ও সাধনমূলক, দুই ভাবেই পরিচালিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও বিশ্বভারতীর পাঠ্যক্রমের অনুসরণ করতে অনুরোধ করেন। পরে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়টি মৌখিক গল্পাকারে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যাসহ পাঠ করিয়া অঙ্ককার সাংস্কৃতিক ক্লাসের উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভিন্ন কয়েকজন গুণী শিক্ষকও উপস্থিত থাকেন। তাঁহারাও এই বিষয়ে খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করেন।



সাহিত্যিক

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে দুটি এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে একটি করে সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য দশ হাজার টাকা। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে পুরস্কারের একটি দেওয়া হবে রবীন্দ্রোত্তর কালের কোনও লেখকের সমগ্র সাহিত্য কৃতিত্বের উপর, অপর পুরস্কারটি প্রদত্ত হবে রবীন্দ্র পরবর্তীকালের শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির যে পুরস্কারটি দেওয়া হবে তার বিচার্য হল পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য গল্প উপন্যাস বা গল্প।

গীতা ভারতী মিশন সংবাদ :

কেন্দ্রীয় গীতা ভারতী মিশন হাতিয়া নোয়াখালী (বাংলাদেশ) সর্ধর্ম্মসম্বয়বাদী—যুগপ্রবর্তক মহর্ষি প্রেমানন্দজীর ৩য় বার্ষিক তিরোধান দিবস গত ২০শে মাঘ ১৩৮১ ভাবগভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মবাদিনী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী মিশনের পতাকা উত্তোলন করেন। মিশন সভাপতি পতাকা তলে সংকল্পবাণী পাঠ করেন। তৎপর অত্যাশ্চর্য আঙ্গিক যথার্থীতি অনুষ্ঠানের পর অপরাহ্নে এক ধর্মসভায় মহর্ষিজীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

গত ৫ই হইতে ১৫ই ফাল্গুন পর্যন্ত মিশনের ২৯তম বার্ষিক উৎসব শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর পরিচালনায় সম্পন্ন হয়। সারা দিন গীতা পাঠ, ওম্ হরি ওম্ নাম যজ্ঞ, দারিদ্র্য-নারায়ণ সেবা, গীত-যজ্ঞ, ভক্ত-সম্মেলন যথাবিধি সমাধা হয়। উৎসবে দেশ বিদেশ হইতে বহু ভক্ত সঙ্কনের সমাগম হয়।

বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ মিশন প্রতিষ্ঠাতা প্রেমানন্দ মহারাজের ৬৫তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব নিবিড় নিষ্ঠায়

উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতে মিশন পতাকা উত্তোলন, সঙ্কল্পবাণী পাঠ, গীতা পাঠ আচার্যবরণ, ভজন শিশুনারায়ণ সেবা, সন্ধ্যায় দীপদান প্রভৃতি আঙ্গিক নিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবর্তক সাহিত্যচক্র সমাচার :

গত শনিবার ১৯শে বৈশাখ ১৩৮২ (ইং ৩০।৭।৭৫) প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক সভায় বৈশাখী রবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রীকিরণেন্দু বাগচী শ্রীআরাধনা গুপ্তের উদ্বোধন সংগীতের পর ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তীর প্রস্তাবানুসারে সকলে দুই মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গত রাধাকৃষ্ণ ও পদ্মজা নাইডুর অমর আত্মার প্রতি শান্তি কামনা কারিয়া প্রদীপ্য নিবেদন করা হয়।

কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান গীতি পাচালী, আলোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন সর্ধর্ম্মী কিরণেন্দু বাগচী, আরাধনা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার ভট্টাচার্য, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু দে সরকার, বীথিকা দাস, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুদর্শন চক্রবর্তী, প্রভাস সরকার, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, টগর দাস, রমেন আচার্য, অবনীকুমার সিংহরায়, জগদীশ দাস প্রভৃতি।

চক্রের সভাপতি শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি শ্রীতারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় সভা পরিচালনা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির

গত ১০ মে ১৯৭৫ শনিবার বিকাল ৫-৩০টায় রামকৃষ্ণ জনশিক্ষা মন্দিরের (বেলুড় মঠ, হাওড়া) বার্ষিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী চিদাম্বানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী সভা ও সন্ধ্যায় নাটক অভিনয় হয়। পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়া সমাজ কল্লক 'নীলাচল লীলা' যাত্রাভিনয় হয়।

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বস্ত্রসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাট্টিং, স্লিটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা যজ্ঞত থাকে।

বক্তৃশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ POLISHING & BUFFING

DOUBLE ENDED-GRINDER
FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332

সম্পাদক : শ্রীভরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীরবি কর

প্রবর্তক পারিশাদ, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্তৃক সম্প্রদিত।

৬০ তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

সম্পাদক: শ্রীমতী লালদাস

আমার ১৯৫০

১৯৫০



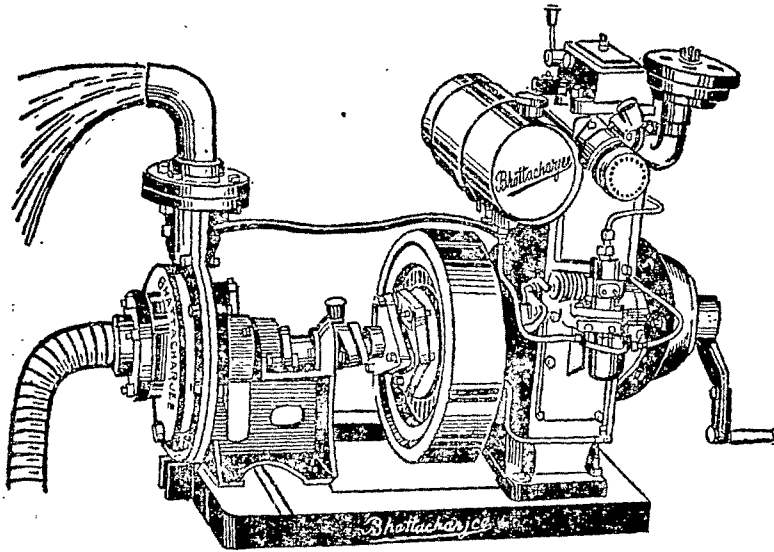
আনন্দ ডায়েরি
ক, হোডের
প্রসারিত সামগ্রী



ভারত সরকারের ন্যাশনাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অগাঢ় সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্-
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, স্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

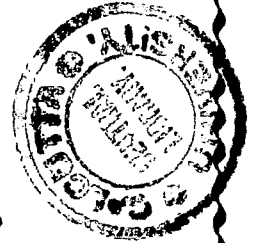
টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED



has the pleasure to announce
**INCREASED
RATE OF INTEREST ON
FIXED DEPOSITS**

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

**EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.**

**FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:**

Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.

TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)

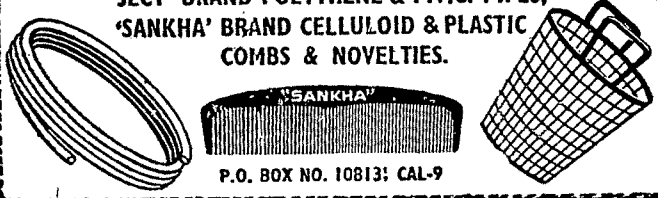
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813; CAL-9

D. RATAN & Co.

Photographers **PHOTO**

22-1, CORNWALLIS ST. CAL-5

PHONE : 54 - 8711

ডি.রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স **ফটো**

২২-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ৫৪ - ৮৭১১

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিহারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসূচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি:

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রোণারিষ্ট : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাটারিষ্ট : অশোকারিষ্ট : ব্রাহ্মী স্মৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভূঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : আষাঢ়, ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	১০২
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	১১০
সম্পাদকীয়	...	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	১১১
জাতীয়কবি ও সাধক বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ	প্রবন্ধ	অধ্যাপক অমলেন্দু ব্রূষোপাধ্যায়	১১৫
বিপ্লব যজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	জীবনালেখ্য	কিরণেন্দু বাগচি	১১৮
ফসল	গল্প	দীপেন রাহা	১২২
উদাত্ত ভারত	কবিতা	বাজীরাও সেন	১২৪
শরণ স্মৃতি	কবিতা	শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪
তুমি এখনো বেঁচে আছো	কবিতা	সন্তোষ ভট্টাচার্য	১২৪
কাশীর রূপ বন্দনা	স্তোত্র	শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১২৫
ভায়েরী থেকে	দিনলিপি	শ্রীজুবোধ চক্রবর্তী	১২৮
হৈমন্তী সান্তাল	গল্প	দীপংকর সেন	১২৯
মুনাকা	গল্প	শ্রীশ্যামাপদ দে	১৩০
পাঠকের মতামত	আলোচনা	ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার	১৩৩
চট্টল স্মৃতি সমীক্ষা	সমীক্ষা	ক্ষিতীশচন্দ্র দে	১৩৮
সজ্জ-সংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	১৪০
পুস্তক সমালোচনা	...		১৪১
সাময়িকী	...		১৪৩

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চল্ছে
অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক
হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য। অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে
বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্ম দায়ী নহে। কপি
রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—
সম্পাদকের নহে।

এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া
হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য।
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে
পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

৬০তম বর্ষ

প্রবর্তক শারদীয়া সংখ্যা—১৩৮২

খ্যাতিমান লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও
সাহিত্যিকদের অবদান-বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হয়ে বর্ধিত
কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যার মূল্য—২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য
দিতে হয় না।

বার্ষিক দক্ষিণা সডাক মাত্র ৬-০০ টাকা

যোগাযোগ করুন :

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন—৩৪-৩০৮৯

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, হুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

*

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

- ★ ELECTRICAL MOTOR
- ★ POLISHING & BUFFING

- DOUBLE ENDED-GRINDER
- FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY:

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



৬০ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় : ১৩৮২

জুন-জুলাই : ১৯৭৫

প্রবর্তক

বার্ষিক দক্ষিণা ছয় টাকা

প্রতি সংখ্যা পঁচাত্তর পয়সা

জীবনের আলো

মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। স্বধর্ম অপরিত্যজ্য। স্বার্থও বর্জনীয় নয়। স্ব-কে কেন্দ্র করেই তো প্রকাশ। সব চেয়ে বড় আনন্দ তাই স্বেচ্ছাচার। রামপ্রসাদ তাই বলেছিলেন, “ওরে মন, বলি ভজ কালি ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।”

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। এই স্ব-ধর্ম, স্ব-ভাব নিজে খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তে দেখিয়ে দেয়। তাই পরবর্তী গানের ছত্র “গুরুদত্ত সাধনমন্ত্র দিবানিশি জপ করে।”

গুরুদত্ত সাধন। আর সে সাধন দিবানিশি করতে হয়। প্রণামে শয়নে, আহুতি ভোজনে, ধ্যান নিদ্রায়, ইষ্টমন্দির প্রদক্ষিণ বিচরণে অর্থাৎ জীবনের সকল কর্মই হয় আচার—নিজের ইচ্ছা কি আর অতিক্রম করবে! চেতনা তার সবখানিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই রহস্য অদ্ভুত। আর ইহাই ঈশ্বরপ্রসাদ।

আমি আছি বলেই তোমার মহিমা। আমার মাঝে তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমার স্বভাব ও স্ব-ধর্ম। তোমার সঙ্গে পরিচয়ে নূতন আমি হই। প্রাকৃত জীবন কথা ভুলিয়ে দিলে বলেই তো অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে আমার নবজন্ম। আমি যে অমৃত একথা তুমি জানিয়ে দিলে। শুধু জ্ঞান দিলে তা নয়, আমায় নিজের মধ্যে ভুলে নিলে। আমার স্ব-কে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পরিণত করলে, তাইতো আজ বলি—“অহং দেব ন চাত্তোহস্মি”। তোমার সঙ্গে যুক্তি পেয়েই এত বড় আমি। জোর করেই বলি—“স্ব-ধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ”—জানি মৃত্যু আমার নাই, আমি অমৃতের পুত্র।

আমি চলেছিলাম সংহারের পথে। কেন না, সে স্বভাব একত্বের লক্ষ্যে, একান্ত নিরাবলম্ব্য, অতি সঙ্গীর্ণ তাহা, আজ আমায় বন্ধুত্বের পথে এনেছে। ইহাই মর্ত্যের সনাতন ইচ্ছা, মর্ত্যের শাপ্ত ধর্ম, মর্ত্যের নিত্যভাব। আজ তো নির্জন নয়, বহুজন ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত যোগ উচ্চতে—প্রেম ও ঐক্যের অমর সম্বন্ধ। হে দেবতা, শুধু তুমি আর আমি, এই নিয়েই তো আমার স্বভাব, স্বধর্ম। অভিনব, কল্পনাতীত আশ্চর্যতত্ত্ব।

দাও ডুবিয়ে দাও। অসীমের মাঝে আমার চেতনা ডুবে যাক। আমার লয় তোমার মাঝে। লয়ের ক্ষেত্রে যে অমৃত, তাই ডুব দিতে গিয়ে নিত্য আমার আবিষ্কার যোগতত্ত্ব, বেদে পুরাণে ছিল না, ছিল তোমার মুখে। যত উচ্চ সব মৃত। তাই নব নব বাণীমন্ত্র, আমার শ্রুতি ভরে যায়, কানের ভিতর দিয়া মরম মুগ্ধ করে। তুমি বল আমি শুনি। আজ সত্যই তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা, তুমি Teacher আমি preacher, তুমি গুরু আমি শিষ্য, তুমি ভগবান আমি ভক্ত—এই স্বভাব, স্বধর্ম চিরযুগের, তাই অপরিত্যজ্য। এই অমৃতের পথ এই সনাতন ভারতের সত্যধর্ম। এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আমি। জীবনে আমার তোমার মুরলী ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠুক—ইহাপেক্ষা আনন্দের আশ্বাদ আর কিছু নাই।

সঙ্গযগুরু শ্রীমতিলাল

সঙ্গযবাণী : ২৪শে ভাদ্র ১৩৩৫, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

বেদমন্ত্র

প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ দ্বাদশং সূক্তং ॥ সপ্তমী-অষ্টমী ঋক্ ।

(মণ্ডলস্য অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং)

হোতারং সপ্ত জুহে। যজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু ।

অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসুনাং স পর্য্যামি প্রযসা যামি রত্নং ॥৭

অচ্ছিত্রা সুনো সহসো নো অত্ৰ স্তোতৃত্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ ।

অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুয্যোজ্জোনপাং পুভিরায়সীভিঃ ॥৮

অন্বয়—সপ্ত জুহুঃ বাঘতঃ অধ্বরেষু যং অগ্নিং যজিষ্ঠং হোতারং বৃণতে । বিশ্বেষাং বসুনাং অরতিং অগ্নিং প্রযসা সপর্য্যামি রত্নং যামি ॥৭

হে সহসঃ সুনঃ, হে মিত্রমহঃ, নঃ স্তোতৃত্যো অত্ৰ অচ্ছিত্রা শর্ম যচ্ছ । হে উজ্জোনপাং অগ্নে গৃণন্তং আয়সীভিঃ পুভিঃ অংহসঃ উরুয্যঃ ॥৮

ব্যাখ্যা—সপ্ত জুহুঃ (সপ্ত আহ্বানকারী) বাঘতঃ (ঋত্বিক) অধ্বরেষু (যজ্ঞে) যং যজিষ্ঠং (যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয়) [অগ্নিকে] হোতারং (দেবতাদিগের আহ্বানকারীকে) বৃণতে (বরণ করেন) বিশ্বেষাং বসুনাং (বিশ্বের সকল প্রকার ধনের) অরতিং (প্রাপয়িতা, দাতা) অগ্নিং (অগ্নিকে) প্রযসা (যজ্ঞানের দ্বারা) সপর্য্যামি (পরিচর্যা করি) এবং রত্নং যামি (রমনীয় ধন যাচঞা করি) ॥৭

হে সহসঃ সুনঃ (হে বলের পুত্র) হে মিত্রমহঃ (হে অনুকূলদীপ্তিযুক্ত) নঃ স্তোতৃত্যো (আমাদিগের যজমানদের) অত্ৰ (আজ) অচ্ছিত্রা (অচ্ছিত্রানি—নিরবচ্ছিন্ন) শর্ম (স্বখ) যচ্ছ (দাও) উজ্জোনপাং (উজ্জ ভুজেন অগ্নেন জঠরাগ্নেঃ প্রবর্ধনাং অগ্নেঃ অন্নপুত্রত্বাং—সায়ন্ । ভুক্ত অন্নদ্বারা জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়—এইহেতু অগ্নিকে অন্নপুত্র বলা হয়—অন্নপুত্র) অগ্নেঃ (অগ্নির) গৃণন্তং (স্তবকারীকে) আয়সীভিঃ (লৌহের ত্রায় দৃঢ়) পুভিঃ (পালনের দ্বারা) অংহসঃ (পাপ হইতে) উরুয্য (রক্ষা কর) ॥৮

সরলার্থ—সপ্তসংখ্যক হোমকারী ঋত্বিক যজ্ঞে যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় ও দেবগণের আস্থনীয় অগ্নিকে বরণ করেন—সেই সর্বধনদাতা অগ্নিকে আমি যজ্ঞানের দ্বারা সেবা করি এবং তাঁহার নিকট রমনীয় ধন যাচঞা করি ॥৭

হে বলপুত্র, হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! অত্ৰ আমাদের যজমানদের নিরবচ্ছিন্ন স্বখ প্রদান করুন। হে অন্নপুত্র অগ্নি! আপনার স্তবকারীকে লৌহের ত্রায় দৃঢ়রূপে পালন করিয়া পাপ হইতে হইতে রক্ষা করুন ॥৮

যজ্ঞ দুই প্রকার—কৃত্রিম ও ব্যাপক। বিশ্বসৃষ্টির মূলই যজ্ঞ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম আপনাকে আহুতি দিয়াই বিশ্ব সৃজন করেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান তাই দ্রব্যত্যাগ, জপ, স্বাধ্যায়, তপস্তা জ্ঞান সব কিছুকেই যজ্ঞনামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাপক যজ্ঞকর্মকেই বেদমন্ত্রা ঋষিগণ কৃত্রিম উপায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন করার বিধি-বিধান দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটি কৃত্রিম যজ্ঞ সম্পাদন করিতে কম করিয়া “সপ্তসংখ্যক হোমকারী ঋত্বিকের” প্রয়োজন হয়। মুখ্য ৪ জন আর তাঁদের সহকারী ৩ জন। মুখ্য ৪ জনের নাম হোতা, অধ্বর্যু, উদগাতা ও ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদজ্ঞ—তিনি ঋক্মন্ত্রে দেবতাকে আহ্বান করেন। অধ্বর্যু যজুর্বেদজ্ঞ—তিনি যজুর্মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করেন। উদগাতা সামবেদজ্ঞ। তিনি সামমন্ত্র সুর-সংযোগে গান করেন। আর ব্রহ্মা ঋত্বিক—তিনি ত্রিবেদজ্ঞ। অপর ৩ জনের মন্তোচ্চারণ ও ক্রিয়াকর্ম নিভুলভাবে হইতেছে কিনা তাহা তিনি দেখিয়া থাকেন। অস্ত্রাণ্যদের অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ—তাই তাঁর সহকারীর প্রয়োজন হইত না—সেইজন্মই ঋষি মন্ত্রে “সপ্তঃ জুহুঃ বাঘতঃ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যাঁরা যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করিতেন—তাঁরা যাজ্ঞক বা ঋত্বিক। যে গৃহস্থের উদ্দেশে যজ্ঞকর্ম সম্পাদিত হইত—তিনি যজমান। আত্ম-স্বর্গই ঋষিদের কামা ছিলনা, তাঁরা চাইতেন গৃহস্থের মঙ্গল, যজমানের স্বর্গ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি। তাই যজ্ঞকর্ম পরার্থ। যাহা পরার্থ তাহাই নিকাম। নিকাম কর্মের শিক্ষা ক্রটি স্মৃতি শুধু উপদেশই দেন নাই—জীবন দিয়া আচরণ করিয়া শিখাইয়াছেন।

রেণুকণা ঘোষ

সেবাসাদকীর

তত: কিম?

সজ্জ্বের দ্রষ্টা ও প্রবর্তক সজ্জ্বমিশনের শ্রষ্টা সজ্জ্বগুরু শ্রীমতিলাল এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে (৭৬।৩৭.সজ্জবাবী)।

ধর্ম প্রতিষ্ঠানে স্বাবলম্বনমূলক অর্থসাধনার প্রবর্তন করিয়া একটা বৈপ্লবিক অভিনবকে তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন, যাহা প্রচলিত ধর্ম-ধারণা ও সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী। বস্তুতঃ ইহা অতীতের ক্রেদমুক্ত একরকম নূতন জন্ম।

গীতার সিদ্ধান্ত সজ্জ্বগুরুজীর এই নবজন্মের প্রেরণার উৎস। গীতার অভিধেয় ‘সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্’ ব্রজ—সর্বধর্ম সংস্কার মুক্তির ইহা যুগদর্শন।

পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্রে ধর্মবিসর্জন দিবার স্পর্শ দৃষ্ট হয় না। নবযুগের, নবজন্মের বাণীবহ গীতাশাস্ত্র একমাত্র ইহার ব্যতিক্রম। মানুষ সাধন বলিতে যাহা জানে বা বুঝে তাহাকে বিসর্জন দিয়া সর্ব সংস্কারমুক্ত হওয়া সাধারণ মানুষের কল্পনা করাও কঠিন। ভারতের ধর্মশাস্ত্রে নবজন্মের এই দিদর্শন থাকিলেও, ভারতের ধর্ম-সাধনা এখানে আসিয়াই প্রকৃতপক্ষে লাট খাইয়াছে। ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়। আজিকার প্রগতিশীল মানব সভ্যতার দরবারে তার নিজস্ব সাধন ও অধ্যাত্ম সংস্কৃতির যুগোপযোগী আলো লইয়া টাই পায় নাই। অর্থকৌলিষ্ঠ ও অর্থ নিয়ন্ত্রণী শক্তির বর্তমান বাতাবরণ ভারতবর্ষ তার নিজস্ব ধর্ম-বৈশিষ্ট্য আর শ্রদ্ধার গণ্যমাত্র আসন পায় না। হুবহু অনুকরণের প্রতিযোগীতায় অর্থ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান ভারত যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিতেছে তাহা এই অনুকরণে কোন দিন তাহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা দিবে না—দিতে পারেনা।

সজ্জ্বগুরুজীর যুগবৈশিষ্ট্য এখানেই। ভারতে নব-জন্মের অর্থাৎ নব্য ভারতীয়ের অভ্যুত্থান প্রেরণা তাঁর মধ্যে সক্রিয় মূর্তিতে আবির্ভাব যে হইয়াছিল, তাহা

তাঁহার জীবন কর্ম ও মিশন-চেতনা হইতেই সুস্পষ্ট পরিস্ফুট।

এই নবজন্ম সম্বন্ধে সজ্জ্বগুরুজীর কথা (সঃ বাঃ ২৫।৪।৩৬) : “মিশন (ভাগবত সজ্জ্ব) হয় অতি মানুষ নিয়ে, অসামান্য জীবন নিয়ে। মানুষ স্বভাবতঃ যে উপাদানের সে উপাদান কোন মিশনের উপযোগী নয়। বিশেষ প্রবর্তক সজ্জ্ব একটা নূতন ধর্ম। ইহা পুরাতন মনোবৃত্তি ও মানব-প্রকৃতির লেশমাত্র থাকতে সিদ্ধ হবে না। তাই নবজন্মের দিকে গীতায় এতখানি রৌক দেওয়া হয়েছে।”

এইরূপ ভাগবত সজ্জ্বের ভিত্তি আত্মসমর্পণ যাহাও গীতারই নির্দেশ—‘মামেতি’ কেন্দ্রপুরুষের ভাগবত স্বরূপের নিকট নিঃসর্ত আত্মদান। এই আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হইতেছে সমষ্টি সত্তার বিগ্রহ যে কেন্দ্র-পুরুষ তাঁর সিদ্ধসজ্জ্ব-স্বরূপের রূপপ্রকাশ সজ্জ্বমিশনে। অনুলোম প্রতিলোম ক্রমে এই সাধনক্রিয়া চলে স্বরূপ হইতে রূপ আর রূপ থেকে স্বরূপে।

সজ্জ্বগুরুজী এই সজ্জ্বসাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন : “আত্ম সমর্পণ মন্ত্র যে পায়, সে সাধন পায়। সাধন আপনার মধ্যে মূর্তি নেয়। তার কৃত কিছু এখন বোধ থাকে না। এমন কিছু ঘটে না যার জন্ত সে দায়ী। কাজ, কাজের ফল উৎসর্গ—প্রবর্ত ও সাধন অবস্থা। কর্মের দায়িত্ব যখন অপস্থত হয়, তখনই সিদ্ধ মূর্তি। এমন সিদ্ধ শত মানুষ যদি পাই, পৃথিবী কোন্ ছার, আমি ত্রিভুবন জয় করতে পারি। এমন সজ্জ্ব দ্রুজয় সর্বজয়ী।”

এই হেতুই ভাগবত সজ্জ্ব রচনায় তিনি ‘চিহ্নিত’ মানুষের কথা বার বার বলিয়াছেন। এই হোমাপাখীর জন্তই তাঁর আকুল প্রতীক্ষা আর পথ চাহিয়া থাকা।

সজ্জ্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন (সঃ বাঃ ১৫।৪।৩৬) : “সজ্জ্ব আজ এমনি সন্ধিস্থানে। কাজ বড় জিনিষ নয়, অর্থও গোণ। কর্ম চাই, কিন্তু কর্ম যেন সাধকের অবস্থা অবস্থারণের পরিমাপ না হয়।

সাধকের অন্তরের রূপান্তর লক্ষ্য করে সজ্জের গতি, সজ্জের শক্তি বৃদ্ধি নির্ভর করে।”

সজ্জগুরুজীর জীবন (১৮৮২-১৯৫৯) বিবর্তনের ষষ্ঠ দশক অর্থাৎ বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকটি তাঁর জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকে (১৯৩০-১৯৪০) তাঁর অর্থ-সাধনার চূড়ান্ত পর্যায় বলা চলে। প্রবর্তক ইনসিওরেন্স, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক হইতে শুরু করিয়া প্রবর্তক জুট মিলে যার পরিসমাপ্তি। এই দশকেই তাঁর ‘ভাগবত প্রীতকাময়া’ অর্থ সাধনার চরম পরিণতির পর সজ্জ-গুরুজীর চেতনায় সজ্জ প্রবল হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তি-প্রাধান্য ছিল সমস্ত কৃতকর্ম সাধনার নিয়ন্ত্রণী কেন্দ্র। তারপর সজ্জপর্বের শুরু। তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি (সঃ বাঃ ৫।৯। ১৩৩৭): “আমার ব্যক্তি জীবনের অঙ্গপাত। সজ্জ-জীবনের ইহা নবমুহুর।”

এই সজ্জচেতনা হইতেই তিনি তরুণদের আহ্বান দিয়াছেন (৫।৯।৩৭): “হে উদীয়মান তরুণ, এস, তোমাদের প্রতিষ্ঠা দিই। এই চক্র ধিরে এখনও যারা অনাগত তাদের সজ্জতত্ত্ব অবগত হওয়ার ইহা সিদ্ধক্ষেত্র হবে। আজ যাদের আশ্রয় করে এই রচনা তাদের যেন এই বিশ্বাস ও এই শ্রদ্ধা অটুট হয়।”

ইহার পরেই সজ্জগুরুজী একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক কালে যারা তাঁর অনুগামী ছিল, বা এখনও বর্তমান আছে, তাদের উপর এই গুরু দায়িত্ব ভার গ্রাস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, “আমার সান্নিধ্য এই প্রণালীতে নিহিত রইল।”

এ দায়িত্বের তাৎপর্য এই যে, অনাগত যারা তারা তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য যখন পাবে না, তখন তাঁর সান্নিধ্য যেন মিলে যারা আগত ও অনুগত তাদের জীবনে। ইহা অবশ্য নির্ভর করে কেন্দ্র-পুরুষ সজ্জগুরুময় হওয়ার উপর। নিজের প্রাক্ স্ব-ভাব, প্রকৃতি ও স্ব-ধর্ম বিসর্জন দিয়া চক্রগতিতে চাই রূপান্তর। ইহাই নবজন্ম—যাহার সিদ্ধির উপরই সজ্জগুরুজীর যে স্বপ্ন ভাগবত সজ্জ ও ভাগবত জাতি, তার সাফল্য নির্ভর করে। ভাগবত জীবন অর্থে জীবনের প্রতিটি ছন্দে

ভগবানকে লীলায়িত হইতে দেওয়া, যাহা শ্রীগুরুতে অনন্ত আশ্রয়সাপেক্ষ। চেতনায় অনন্ত আশ্রয়বোধ উপজাত ও দৃঢ় হয় শ্রীগুরুস্বরূপের তত্ত্ব ভাবনায়। সজ্জগুরুজীর স্বরূপের মধ্যেই বিচ্যমান যুগধর্ম সজ্জত্ব। এই গুরুস্বরূপে একাশ্রয়ী যে, সেই প্রেমের হয় অধিকারী। প্রেম বিভিন্ন ব্যক্তি সত্তাকে শ্রীগুরু সজ্জের রসায়নে ঐক্যবদ্ধ করে, যাহাই ভাগবত সজ্জের সাধ্য ও ভিত্তি।

সজ্জগুরু-স্বরূপের এই গর্ভবেদনা তাঁকে অস্থির উন্মাদ করিয়া তুলে। অপরূপ প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহে তিনি শতজন এমন নবজন্মকামী মানুষকে ডাক দিয়াছেন: “এস প্রিয়তম, আমার কেন্দ্র ধিরে শতদল পদ্ম সন্নিবেশ কর। আমি এখনও অপরূপ। তাই তোমার স্থান আজিও কেন্দ্রে বিদ্যমান। এ স্বেযোগ, এ সৌভাগ্য, এ স্তুদিন চিরদিন থাকে না।”

সজ্জত্বের স্বচনা-পর্ব ইহা।

এখানে উল্লেখ্য যে, সজ্জগুরুজীর স্বাবলম্বনমূলক অর্থ সাধনা ও প্রেরণার আরম্ভ ও সমাপ্তি এই চতুর্থ দশকেই নহে, যদিও ইহার চরম স্ফুর্তি ও বিকাশ এই দশকে সজ্জটিত। বস্তুতঃ বলা যায়, ইহা তাঁর আজীবনের স্বাবলম্বন প্রচেষ্টারই পরিণতি। এখানে তাঁর অর্থ-সাধনার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হইল।

(১) ১লা সেপ্টেম্বর (১৯১৫ খৃঃ ১৫ ভাদ্র ১৩২২ বঃ) রয়েল ৮ পেপী ১৬ পৃষ্ঠায় সজ্জের ভাববাহী পতাকা ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার চন্দননগরে প্রথম আত্মপ্রকাশ।

(২) প্রবর্তক পত্রিকা প্রকাশের জন্ম সজ্জের আদি ছাপাখানা ‘সাধনা প্রেস’-এর প্রতিষ্ঠা।

(৩) স্বাবলম্বনের অঙ্গস্বরূপ মাণিকলাল রক্ষিত ও সাগরকালী ঘোষের সহযোগিতায় “রক্ষিত. দে. ঘোষ এণ্ড কোঃ”—এইনামে চন্দননগরে কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা।

(৪) ১৯২০ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট, (১৩২৬-২৭ বঃ) ইংরাজী সাপ্তাহিক “Standar Bearer” প্রকাশ ও প্রথম সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের “Ourselfes”—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। Standar Bearer-এর কভারের উপরে মুদ্রিত হয় “—uuder the insiration of Sri Aurobindo”।

(৫) সজ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রসারকল্পে বার্ষিক ৯ টাকা হুদে লক্ষ টাকা ঋণ-গ্রহণের পরিকল্পনায় ঋণ গ্রহণ শুরু হয়।

(৬) শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদিত সংগঠনী প্রেরণায় অন্ন ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী সাধনাজ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর নামে চন্দননগরে 'মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্যালয়' নামক তাঁতশালার প্রতিষ্ঠা।

(৭) ১৯২০ খৃঃ-এ সমুদ্রতীরবর্তী ফ্রেজারগঞ্জে (২৪ পঃ) হুদ্রবনে চাষের জমি সংগ্রহ শুরু হয়।

(৮) ১লা নভেম্বর ১৯২০ খৃঃ, (১৫ কার্তিক ১৩২৭ বঃ) সজ্জের সাপ্তাহিক মুখপত্র “নবসজ্জ” পত্রিকার প্রকাশ।

(৯) ফেব্রুয়ারী ১৯২১ খৃঃ (১ ফাল্গুন ১৩২৭ বঃ) শ্রীপঞ্চমীর দিনে চন্দননগরে প্রবর্তক বিজ্ঞাপীঠের প্রতিষ্ঠা।

(১০) পুস্তক প্রকাশ বিভাগ প্রবর্তক পারিশিং হাউস-এর প্রতিষ্ঠা।

(১১) ১৯২৫ খৃঃ, ৬ই মার্চ তারিখে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী দিল্লী হইতে Extra-ordinary Gazette প্রকাশ করিয়া ফরাসী চন্দননগরে প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক ও সজ্জের সাধনা প্রেস হইতে মুদ্রিত যে কোন পুস্তক প্রচার-পত্রিকা ইত্যাদি ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ফরাসী সরকারের রাজধানী পণ্ডিচারী হইতে ‘প্রবর্তক’ পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ করে। ১৯২৫ খৃঃ (জীবন-পঞ্জী ১৯২৫ খৃঃ পৃষ্ঠা ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য) এপ্রিল মাসে চন্দননগর হইতে মুদ্রণ বিভাগ কলিকাতায় ৬৬নং মানিকতলা স্ট্রীটে ও ২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়। নবপর্যায়ে দশম বর্ষে পাক্ষিক প্রবর্তক মাসিক পত্রিকা রূপে কলিকাতা হইতে প্রকাশ আরম্ভ হয়। মুদ্রণ-বিভাগের নামকরণ হয় ‘প্রকাশ প্রেস’ (পরবর্তী-কালে প্রবর্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস)।

(১২) ১৯২৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে ৩০ নং বোবাজার স্ট্রীটে প্রবর্তক ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোঃ লিঃ-এর (পরবর্তীকালে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ) প্রতিষ্ঠা।

(১৩) ১৯২৯ খৃঃ স্বল্প বিক্রীর জন্য প্রবর্তক এস্পো-রিয়াম নামক বিক্রয়-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বর সজ্জজননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় পার্ক সার্কাস-এর এক বাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ নবজীবন ব্যানার্জী প্রভৃতি তদানীন্তন প্রখ্যাত চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্যলাভ করেন নাই। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় তিনি দেহত্যাগ করেন। ইহার পর ১৯৩০ খৃঃ হইতে সজ্জগুরু নানাদিকে প্রচার ও সৃষ্টি বিস্তার আরও অধিকতররূপে প্রকাশ হইতে থাকে।

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল বিশ্ববী, কর্মী, সংগঠক, শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়দাতা হিনাবে যতটা বাহিরের জগতে বিজ্ঞাত ততটা তাঁর বহুমুখী স্বজনী প্রতিভার পরিচিতি সুবিদিত নহে। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সব্যসাচী—জাতীয় জীবন বিকাশের সর্বতোমুখী সৃষ্টিকরী প্রতিভার অধিকারী। নানামুখী নির্মিতির বৈচিত্র্যে তাঁর অসাধারণ জীবন ছিল বিশিষ্ট। তাঁর অনির্বাক্ষ অগ্নিশিখার মত বিরামহীন কর্মময় জীবনের প্রতিপদক্ষেপে সৃষ্টির শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে শ্রীমতিলাল তাঁর প্রথম তাত্ত্বিকগুরু সিদ্ধাচার্য শ্রীমৎ কালিকানন্দের কাছে অযাচিতই লক্ষী-মন্ত্র লাভ করেন এবং এই মন্ত্রের সিদ্ধ রূপ তাঁর জীবনে বিকশিত হইতে দেখা যায়। সজ্জগুরুজীর জীবন বিবর্তনের ষষ্ঠ দশকটি (১৯২৯-৪০ খৃঃ) শ্রী-ঐশ্বর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষী-দেবীর পূর্ণ প্রকট। এই দশকেই প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ (১৯২৯), প্রবর্তক ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ (১৯৩১), প্রবর্তক ট্রাষ্ট (১৯৩২), প্রবর্তক হাফ-টোন লিঃ (১৯৩২), প্রবর্তক কো-অপারেটিভ্ টোরস (১৯৩২) প্রবর্তক, ফার্নিশার্স (১৯৩২ পরে প্রবর্তক ফার্নিশার্স লিঃ), প্রবর্তক মেসিনারী ট্রেডিং কোঃ [১৯৩৬, পরে প্রবর্তক কমার্শিয়াল করপোরেশন লিঃ (আমদানী-রপ্তানী বিভাগ)], প্রবর্তক জুটমিলস্ লিঃ (১৯৩৫-এ সূচনা ও ১৯৪১, ১৬ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন প্রভৃতি আধুনিক বৃহৎ অর্থ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা।

এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু অর্থসাধনা নয়, তাঁর স্বজন মুখী প্রতিভার বিচরণ ঘটিয়াছে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনবিকাশের প্রত্যেকটি আঙ্গিনায়। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংস্কৃত, আয়ুর্বেদ, শিক্ষা, লোকসেবা, খদ্দর, কুটির শিল্প, স্বদেশী সামগ্রীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই তাঁর সংগঠনী কৃতির সুস্পষ্ট পদচিহ্নের রূপরেখা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিপ্লব হইতে, মুখ ফিরাইয়া তিনি সংগঠনে ব্রতী হন। প্রায় দুইটি যুগের (১৯১৫-১৯৪০) অবিরাম কর্ম-যোগের ফলশ্রুতি ইহা। তাবিলে আশ্চর্য বিষয় লাগে, অসম্ভব মনে হয় যে, একজন নিঃসম্মল সর্বভাষী সন্ন্যাসী কয়েকজন অনুগত উৎসর্গীকৃত গৃহ-সংসার হইতে উপাটিত মধ্যবিত্ত তরুণদের আশ্রয় করিয়া এই বহুমুখী ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর ও বাস্তবায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি ছিলেন—প্রখ্যাত সমালোচক অতুল গুপ্তের অভিধায় ‘অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণ।’

লক্ষণীয় এই যে, এই সকল বিচিত্র স্বজ্ঞের পশ্চাতে কাহারও কোন বংশ পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি সংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তি-প্রেরণা ছিল না—না ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বিত্তৈষণা। ইহার নিগূঢ় রহস্য হইতেছে—অহেতুক ইষ্টপ্রেম, শ্রীগুরু ভগবানে অনুরাগ ভালবাসা। আত্মিক আত্মসংযম একমাত্র প্রেম-ব্রতাবনের কেন্দ্র পুরুষের নেতৃত্বে নিঃসর্ত নিবিচার আনুগত্য ও আত্মদান ইহার হেতু। প্রেমাস্পদের প্রীতিার্থে নিরন্তর কর্মের মধ্যেই কর্মের মর্যাদা সজ্জগুরুজীর বিপুল অর্থসৃষ্টি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। এই অভাবনীয় দৃষ্টান্ত ভারতীয় ধর্ম ক্ষেত্র ছাড়া কোন অর্থ বা রাষ্ট্র ক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব।

বর্তমান বিংশ শতকের চতুর্থ এবং তাঁর জীবন-বিবর্তনের ষষ্ঠ দশকের শেষে, বাট বৎসর বয়সে বাহ্য-ভ্যন্তর ত্রিমতিলালের জীবনে কেবল দৃগ্ নয়, দিক্ পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। জুট মিল প্রতিষ্ঠার পরেই এই মোড় পরিবর্তন ঘটে—যার ফলশ্রুতি অর্থসাধনার বিরতি ও সজ্জসাধনার সমারম্ভ। অধ্যাত্ম পরিভাষায় বলা যায়, লক্ষ্মীশক্তির অন্তর্ধান এবং শ্রীভগবানের

হ্লাদিনী রাধাশক্তির আবির্ভাব। তন্ত্রগুরু কালিকানন্দের বৈধী মার্গের রাজসধর্মী লক্ষ্মীশক্তির মাস্তিক সাধনার সিদ্ধির উৎসর্গের ফলে তাঁর চেতনার জগতে যে অবকাশ সৃষ্টি হয়, সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করেন প্রেমময়ী-শ্রীরাধা, যার ফলশ্রুতিতে উপজাত হয় সজ্জত্বের প্রেরণা। সজ্জগুরু সমগ্র সত্তাকে এই প্রেরণা উদ্ভাদ উদ্ভুদ্ধ করিয়া রাখে জীবনের শেষদিন (১৯৫৯, ১০ই এপ্রিল) পর্যন্ত।

এই আন্তর সাধনার সংকেত সজ্জগুরুজী নিজেই দিয়াছেন। তাঁর কথা (৫।১।৩৭) : “বৃহত্তর স্থূলকর্ম জুটমিল। সজ্জের এক যুগাহ্বের শেষপর্ব—চূড়ান্ত অভিনয়। ইহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া আমার জীবনে অর্থসাধনার সমাপ্তি—সজ্জ জীবনের স্বত্বপাত। সজ্জের অনন্ত পরমায়ু—আমার পরিমিত।”

সজ্জগুরু এই ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়া গিয়াছেন (সং বাঃ ৫।১।৩৭) যে, চন্দননগর (সজ্জের মূলকেন্দ্র) হইবে এই ভাগবত সজ্জের শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার রাজধানী।

সজ্জগুরুজীর মন্তব্য “.....আমার জীবনে অর্থসাধনার সমাপ্তি—সজ্জজীবনের সূত্রপাত”—বিশদ করার প্রয়োজন আছে। অতথায় যাদের তাঁর জীবন সাধনা ও সাধ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নাই তাঁদের পক্ষে ভুল ধারণার অবকাশ আছে। সজ্জগুরুর সৃষ্ট প্রবর্তক সজ্জ অর্থ সাধনা জীবনগঠনের অত্যন্ত বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহার সমাপ্তির কোন প্রশ্ন নাই। বস্তুতঃ এই মন্তব্যের অন্তর্গত অভিপ্রায় এই যে, সজ্জগুরুজীর ব্যক্তি সত্তার সজ্জত্ব রূপান্তর এবং ব্যক্তি সাধকের এই কেন্দ্রীয় সমষ্টি সত্তায় জন্মান্তর। সজ্জগুরুজীর আত্মিক ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণে এযাবৎ ব্যক্তির যে আত্মকারিক অর্থস্বজন প্রেরণা তার অবসান এবং সজ্জত্বের অভ্যুত্থান। ব্যক্তির বে-তাল আত্মকেন্দ্রিক স্তরে সজ্জত্বের মূল স্তরের আনুগত্যে যে ঐক্যতান তাহাই সজ্জগুরুজীর কাম্য সজ্জত্ব। এই সজ্জ-বিজ্ঞানের বস্তু তন্ত্র রূপ দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তাহা সজ্জগুরুজীর বিশিষ্ট যুগাবদান। বিষয়টি স্বগভীর বারাত্তরে আলোচ্য।

‘অখাতঃ অর্থজিজ্ঞাসার’ পরে ‘ততঃ কিম্’ প্রশঙ্গের অন্তঃশায়ী অলক্ষ্য গূঢ়তম ব্যঞ্জনা ইহাই।

শ্রীরাধরামণ চৌধুরী

জাতীয়তার ঋষি ও সাধক বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ

(২)

অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনকে আরোও প্রসারিত রূপ দেবার জন্তে, প্রধানতঃ বিপিনচন্দ্রেরই উদ্যোগে ‘বন্দেমাতরম্’ দৈনিক পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়, ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট। প্রথম সংখ্যা থেকে ১৯০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিপিনচন্দ্রই ছিলেন এর সম্পাদক। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ New age-এ বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য এবং ‘বন্দেমাতরম্’-এ বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের তথ্যসমৃদ্ধ অগ্নিগর্ভ রচনা সম্ভারই হয়ে দাঁড়ায় গোটা স্বদেশী আন্দোলনের পথ নির্দেশক—নব্য জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ও দার্শনিক ভিত্তি। তাঁদেরই যৌথ চিন্তার অবদান—স্বদেশী স্ব-নির্ভরতা স্ব-শাসন বা স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং passive resistance বা পরোক্ষ প্রতিরোধ—যে নীতিগুলো ছিল আন্দোলনের মৌলিক কাঠামো।

বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়িয়া এ আন্দোলন ও মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক এবং পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ালেন বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের পাশাপাশি। কিন্তু ইংরেজ-শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে তৈরী হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ সরকার ‘বন্দেমাতরম্’ এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর রচনা প্রকাশের অভিযোগ আনে; উদ্দেশ্য ‘বন্দেমাতরম্’-কে বন্ধ করে দেওয়া এবং অরবিন্দকে কারানিষ্ক্ষেপ করা। সেই মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হয় আদালত অবমাননার দায়ে। ছয় মাস কারানির্বাচন ভোগ করে বিপিনচন্দ্র বেরিয়ে এলেন। অরবিন্দ সাময়িকভাবে তখনও নিরাপদ। ‘বন্দেমাতরম্’ এর ‘A great message’ নামক একটি অনবদ্য সম্পাদকীয় লিখে তিনি বিপিনচন্দ্রকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই, ১৯০৮ সালের ২রা মে, অরবিন্দকে আলিপুর

বোমার মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। ওদিকে ইংরেজ সরকার তখন পাঞ্জাবের লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে তখন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করেছে। আর লোকমান্য তিলককে ছ’বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে পাঠিয়েছে মাদ্রাস জেলে। বাকি রইলেন বিপিনচন্দ্র। ‘বন্দেমাতরম্’ মামলায় কারামুক্তির পর থেকেই ইংরেজ-সরকার নানান অজুহাতে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার বা নির্বাসিত করার স্লোগান খুঁজতে থাকে। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ সেটা আঁচ করতে পারলেন। তাঁরা দেখলেন যে বিপিনচন্দ্র কারানিষ্কিপ্ত হলে ইংরেজের দুর্ভিসন্ধিই জয়যুক্ত হয়—স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তিটাই ধুলিসাং হয়ে যায়। তাই তাঁদেরই পরামর্শ-সহায়তায় বিপিনচন্দ্র ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় চার বছরের জন্ত দেশান্তরিত হয়ে লণ্ডন চলে যান যাতে বিদেশে থেকে প্রচারাভিযান চালিয়ে তিনি স্বদেশী-মস্তের দীপ-শিখাটি অনির্বাক্ষ রাখতে পারেন। বিপিনচন্দ্রের স্বদেশ ত্যাগের পরই, অক্টোবর মাসে, কুখ্যাত প্রেস এ্যাক্টের কবলিত হয়ে ‘বন্দেমাতরম্’ বন্ধ হয়ে যায়।

আলিপুর বোমার মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে ১৯০৯ সালের, ৬ই মে অরবিন্দ কারা মুক্ত হন। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি নিজেকে নিঃস্ব বোধ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের তিনিই তখন একক অগ্নিশুদ্ধ পথিক। নতুন উত্তেজিত তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক ‘কর্মযোগিন’ প্রকাশিত করেন—দেশভক্তি ও স্বাধীনতার মৃত্যুহীন প্রতিষ্ঠা দেশবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্তে। ইংলণ্ড থেকে বিপিনচন্দ্রও লেখা পাঠাতে থাকলেন ‘কর্মযোগিন’এ। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আবার সরকার তাঁকে শামশুল অ-লম-হত্যা মামলায় জড়িত করে কারাবাসী করতে তৎপর হ’লো। ইংরেজের অভিসন্ধি টের পেয়ে ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দকে অবিলম্বে কলকাতা ত্যাগের পরামর্শ দেন। তাঁরই পরামর্শ, এবং নিজেরও বিবেকের নির্দেশে, অরবিন্দ

চন্দ্রনগর চলে যান। সেখানে প্রবর্তক-সভার সজ্জগুরু মতিলাল রায় অরবিন্দকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন। এই আশ্রয়েই নিভূতে অরবিন্দ অধ্যায় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন কিছুকাল; এবং তাঁরই ইচ্ছাক্রমে মতিলাল তাঁর অবস্থানের কথা গোপন রাখেন। এই নিভূত-নির্জন তপস্যায় অরবিন্দের চিন্তাধারায় কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে,—তখন তিনি দিব্য-জীবন-সন্ধানী। ১৯১০ সালের ৩১ শে মার্চ তিনি চন্দ্রনগর ছেড়ে বরাবর-কার মতো রওনা হয়ে যান পণ্ডিচেরীতে।

এইভাবে একদিকে ইংরাজের নির্মম নিপেষণে, অতীত যোগা নেতৃত্বের অভাবে, ১৯১০ সালের শেষ দিকে নব্য-জাতীয়তাবাদ একটা সুসংহত রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে আর টিকে থাকতে পারলো না। কিন্তু আন্দোলন হিসাবে নিঃশেষিত হলেও জাতীয়তাবাদের যে ভাবধারা বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ সৃষ্টি করে গেলেন তা রয়ে গেল চিরকালের চিন্তা ও অনুপ্রেরণার উৎস-রূপে। মনে রাখা দরকার, বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ নিছক কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী বা কোন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম রূপায়িত করার জন্ত আন্দোলনে নামেন নি। তাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন একটা গভীর মতবাদকে, একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদকে জাতীয় জীবনের স্তরে-স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার জন্য। এই আন্দোলন বিপিনচন্দ্রের কাছে মূলতঃ ছিল একটা ভাবধারার আন্দোলন। ১৯০২ সালে তিনি তাই বলছেন,—‘Every large human movement, essentially a movement of thought, has, whether consciously or unconsciously, some Philosophy of life behind it’. আর এই ভাবধারার যুত্বহীন শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বলেই শ্রীঅরবিন্দও ১৯০৭ সালেই বলছেন: “There is only one force and for that force I am not necessary. Neither myself, nor another, nor Bepin Chandra Pal, nor all those workers who have gone to prison. Let them be thrown away as so much waste substance, the country will not suffer.” বস্তুতঃ, স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের যে অবদান—তা

জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ও সাধক হিসাবে। তাঁদের যে মুখ্য ভূমিকা তা চিন্তানায়ক হিসাবে।

বলেছি, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র অগ্রজ, আর শ্রীঅরবিন্দ অনুজ-প্রতিম। কিন্তু চিন্তা-রাজ্যে তাঁরা দু’জনেই ছিলেন সমমর্মী ও সমদর্শী। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঐতিহাসিক উত্তরণপাড়া ভাষণে বিপিনচন্দ্রকে বলেছেন ‘the mightiest prophet of Indian nationalism. অতঃ ‘কর্মযোগিন্’-এ তিনি লিখেছেন Bepin Chandra Pal is the prophet and first preacher of passive resistance. বিপিনচন্দ্র ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে একটি নিবন্ধে লিখছেন The youngest age among those who stand in the forefront of the Nationalist propaganda in India, but in endowment, education and character perhaps, superior to them all—Arabinda seems distinctly marked out by Providence to play in the future of this movement a part not given to any of his colleagues and contemporaries.’ আবার সেই সময়েই, যখন স্বদেশী আন্দোলন বিক্ষিপ্ত এবং কতকাংশে নীতি-বিচ্যুত, তখন লগুন থেকে প্রেরিত ‘কর্মযোগিন্’-এ একটি লেখার মারফৎ তিনি এই প্রস্তাব রাখেন যে, শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে Indian Nationalist Association গঠিত হোক, কেননা একমাত্র অরবিন্দেরই যোগ্যতা রয়েছে একটি সুদৃঢ় মতবাদের ওপর অসংবদ্ধ আন্দোলনকে আবার সংঘবদ্ধ করার। বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এই যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিশ্বাস, এর থেকে এই কথাটিও পরিষ্কার যে স্বদেশী আন্দোলন ও নব্য-জাতীয়তাবাদ তাঁদের যৌথ প্রতিভারই প্রতিক্রিয়া।

বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ বুঝতে গিয়ে কোন কোন দায়িত্বশীল মহলের কয়েকটি বিভ্রান্তি মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। প্রথমতঃ বলা হয় যে, তাঁরা ছিলেন Hindu revivalists বা হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী, কেননা, তাঁরা হিন্দু-ধর্ম দেব-দেবী উৎসব ইত্যাদির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, নানাভাবে এইসব শাস্ত্র ও রীতিনীতির গৌরব ও মহত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁরা অ-হিন্দুদের আকর্ষণ করতে

পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ বলা হয় যে, তাঁরা ছিলেন extremist বা চরমপন্থী, এবং militant nationalism বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভাতা।

একথা অনস্বীকার্য, হিন্দুধর্ম ও দর্শন, হিন্দু উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি তাঁরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে শিক্ষিত ও উদ্ধুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, জাতীয়তাবাদ অনিবার্যতাই কতকাংশে অতীত চেতনা এবং ঐতিহ্যবোধের ওপর নির্ভরশীল; এবং এই উপলব্ধি জনসাধারণের মনে প্রচলিত প্রথা-রীতি উৎসবের প্রতীক ব্যবহার করেই সঞ্চারিত করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশের জাতীয়বাদী ইতিহাস সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য মূলতঃ হিন্দু-নামধারী জনগোষ্ঠীকে বিধৃত করে আছে। সেই ঐতিহ্য বিশ্লেষণে হিন্দু জীবন দর্শনের কথা যে স্বভাবতই এসে পড়বে, এটাই তো বাস্তবায়িত এবং ইতিহাস সম্মত। যদি এমন হতো যে, এ-ধরণের প্রচেষ্টায় বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ আধুনিক জগৎ-জীবনকে অস্বীকার করে শুধু অতীত কণ্ঠস্বরেই নিমগ্ন শুধু কোন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব বা আধিপত্য-স্থাপনেই সচেষ্ট তবে তাঁদের সম্পর্কে Hindu revivalism এর অভিযোগ আনা চলতো। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বিপিনচন্দ্র মধ্যযুগীয় ও সংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির সমালোচনা করেছেন। বরাবর তিনি বলেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে feudal বা composite culture, এবং composite nationalism-ই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য, এবং এই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মগোষ্ঠীর সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে আগামীকালের ভারতকে গড়তে হবে। শ্রীঅরবিন্দও বরাবর একটি স্খার ওপর জোর দিয়েছেন—সেটা হচ্ছে Politics under modern conditions. তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'In the ideal of Nationalism which India will set before the world, there will be an essential equality between man and man, between caste and caste, between class and class, all being as Mr Tilak has pointed out,

different but equal and united parts of the Virat Purush, as realised in the nation.

বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের দেশ-স্বাধা, জাতীয়তা এবং স্বরাজের ধারণা সর্বদাই বিশ্বমানবতার আদর্শে পরিপূর্ণতা খুঁজেছে। অরবিন্দের ঘোষণা : 'Patriotism is only a phase of that universal brother-hood which humanity aims at. আর বিপিনচন্দ্রের মন্তব্য : Politically, the ideal of swaraj is not a mere national but essentially an international ideal. দুটি উক্তিই তাৎপর্য এক। এবং এইভাবে তাঁদের চিন্তাধারার নানাদিক উদ্ধৃত করে দেখানো চলে যে তাঁরা কোন অর্থেই পুনরুত্থান বা পশ্চাৎ-গামিতার সড়িক ছিলেন না, ছিলেন নব-জীবনের প্রবক্তা, বলিষ্ঠ মানবতাবাদের পথ-প্রদর্শক। আর বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দকে extremist বা militant বলে ঝাঁরা চিহ্নিত করেন, তাঁদের বক্তব্যের উত্তরে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কোন চরমপন্থী বা জঙ্গীবাদ কখনো মহৎ বা কালজয়ী ভাবনা-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন পারেন নি জার্মানীর ট্রিটস্কে বা গিয়াকি। স্বয়ং বিপিনচন্দ্র বা অরবিন্দ নিজেদের কখনো extremist বা militant বলে ঘোষণা করেন নি।

প্রচলিত এ-ধরণের কয়েকটি বিভ্রান্তি ঘুচিয়ে যদি আমরা বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের জাতীয়তাবাদের গভীরে প্রবেশ করি, তবে দেখবো যে, যে ভারতীয় জাতি আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত গড়তে পেরেছি তার-স্বষ্টিতে বহুলাংশে ব্যয় গেছে তাঁদের হৃৎকেন্দ্রই কর্ম-চিন্তা। এবং যে মহত্তর ভারতীয় জাতি আগামী দিনে আমরা গড়বো বলে কৃতসংকল্প, তাতেও অনিবার্যভাবেই থাকবে বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের ধ্যান-ধারণা। কেন না, ঝাঁরা জাতীয়তার সাধক তাঁদের চিন্তাধারা চির-নতুন ও চির-পুরাতন। যুগে-যুগে তাঁদের ভাবধারা জাতীয় প্রয়োজন মেটায় নতুন প্রেরণা মিশায় নতুন উপলব্ধিতে।

[সমাপ্ত]

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

(৩)

কিরণেন্দু বাগচী



শাসক সরকারের প্রতিনিধি স্থার আর্থার কটনের মন্তব্য ভারতবাসীর অন্তর থেকে মুছে যায় নি। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত এই চোদ্দ বছর ইংরেজ শাসিত ভারতের জন্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'Public Works' এ যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছিল, কেবলমাত্র ম্যানচেষ্টার শহরের অধিবাসীদের জন্তে জল সরবরাহে অনেক বেশী অর্থ ছড়িয়ে ছিল এই চোদ্দ বছরে। শাসক গোষ্ঠীর এই অবহেলা ভারতবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। ঐ সময়ে আর্থার কটন শাসিতের ক্ষত বিক্ষত দেহে নুনের ছিটে দিয়ে এই বলে, নিজের লোকদের হুঁসিয়ার করে দিলেন—

"Public works have been almost entirely neglected throughout India. The motto hitherto has been,—Do nothing, have nothing done, but no body do anything. Bear any loss let the people die of famine, let hundreds of lacs be lost in revenue for want of water or roads, rather than do anything."

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা।

১৮৫৭তে হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজদের মুখ শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেল।

এই বিদ্রোহের মূলে ছিলেন ঝাঙ্গীর রাণী লক্ষ্মীবাই আর মাতাজী মহারানী তপস্বিনী। পশ্চাতে থেকে সিপাহীদের উত্তেজিত করে এক একটিকে আগুনের

গোলা ভৈরী করে দিলেন। আর নির্বিবাদে রাজ-শক্তির উৎপীড়ন এরা মেনে নিতে চায় না।

১০ই মে মীরাতে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে, গরুর চৰ্বি মাখান কারতুজ দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে অস্বীকার করল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সিপাহী সকলেই বেকে দাঁড়াল—কেউ কারতুজ স্পর্শ করবে না। মুসলমানরাও ও একই কারণে শূয়োরের চৰ্বি লাগান বলে, অস্বীকার করল কারতুজ ব্যবহার করতে।

অনেকদিন আগে থেকে এই দুই মহীয়সী নারী এই বীজ ছড়াচ্ছিলেন।

এদের দমন করতে ইংরেজদের বেশ নাকানি চোপানি বেতে হ'ল।

বাঙলার বহরমপুরে আর ব্যারাকপুরে সিপাহীরা ঐ একই সঙ্গে একই কারণে বিদ্রোহ করে ব্রিটিশরাজকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সামান্য একজন সিপাহীর ক্ষমতা কতখানি।

এর প্রতিশোধ নিতে কুটনীতি পরাকাষ্ঠা ইংরেজ এইবার ভারতবাসীর ওপর নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করল। দুটি মাত্র অস্ত্র—দারিদ্রের সৃষ্টি হল প্রথম; পরেই এল ভেদনীতি।

—এইবার বোঝ ভারতবাসী ইংরেজ জাত কি ভয়ঙ্কর! আমরা কি ভাবে তোমাদের শ্বাসরোধ করে মারতে পারি! দেখতে না, দেখতেই প্রথম অস্ত্র রূপ নিল—মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে (Man made famine) দ্বিতীয়টিতো আগে থেকেই তারা সজ্জা করে দিয়েছিল—

শাসন দণ্ড হাতে নিয়েই ভেদনীতি স্থাপিত করেছিল ইংরেজরা। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তন করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য হল নতুন একদল জমিদার স্থাপিত করা।

লর্ড বেক্তিঙ্ক বললেন—

“If security was wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that the permanent settlement, though a failure in many other respects and in most important essentials, has this great advantage at least, of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of people.”

মিষ্টার হিউম বড়লাট লর্ড ডাফরিনের কাছে সুপারিশ করলেন, ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়ার জ্ঞান।

তিনি ডাফরিনকে বুঝালেন—

“Congress will act as a ‘safety valve’ for the escape of great and growing forces, generated by our action, was urgently needed and no more efficacious safety valve than our Congress movement could possibly be devised.”

১৮৮৫র ডিসেম্বরে সরকারের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল বোম্বাইয়ে।

কংগ্রেস-নামী হিউম জলপোতে ধারা মাঝি মাল্লা সঙ্গে বসলেন, তাঁরাই ‘Moderate’ বলে চিহ্নিত হলেন।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয় ভারতবাসীর শত্রু নয়—দারিদ্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কার এই তিনটি বস্তুই ভারতবাসীর আসল শত্রু। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের সদাশয় সরকার বাহাদুর বুঝি বা এই তিন শত্রুকে সমূলে উৎপাতিত করতে তাঁদের যথোপযুক্ত সাহায্য করবেন।

আনন্দমোহন বসুতো গদগদ হয়ে বলেই বসলেন—

“The educated classes are the friends and not the foes of England. Her natural and neces-

sary allies in the great work that lies before her.”

অদ্ভুত কথা!...এই মোহে পড়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এক আশ্চর্য রকমের ভুল করে বসলেন। তাঁরই কলমে লেখা বেকুল—“ইংরেজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিতেছে না, সে জ্ঞানও আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্ত্য ঘুচিলে, তবে তাহাদের কৃপণতাও ঘুচিবে।... নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্ঠা, নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব।... যখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজদের সহযোগী হইব, তখন ইংরেজকে আমাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিতে হইবে।”

এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত রবীন্দ্রনাথকে নিজেরই করতে হয়েছিল সময়কালে।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল কলকাতাতে।

এ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন।

স্যার সৈয়দ আমেদ মনে মনে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করছিলেন। এইবার তিনি তা সর্বজনকসমক্ষে ব্যক্ত করে ফেললেন। লঙ্কোয়ের এক বিরাট জনসভায় সেই বিষ উদ্গিরণ করলেন। বললেন—“মাদ্রাজ কংগ্রেসে তৃতীয় অধিবেশনে বাঙালীর জুতো চাটতে যাওয়া মুসলমানদের কখনও উচিত হবে না। অধিবেশন বয়কট করা।”

১৮৮৯ এ বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে আবরু ত্যাগ করে সর্ব প্রথম দুইজন বঙ্গললনা যোগদান করলেন। এঁদের একজন কংগ্রেসনেতা জ্ঞানকীনাথ খোষালের সহধর্মিণী ‘সাহিত্য সম্রাজ্ঞী’ স্বর্ণকুমারী দেবী এবং দ্বিতীয় জন—বিশিষ্ট নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী, প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। এঁরাই পরবৎসর কলকাতা কংগ্রেসে স্বকীয় অংশ গ্রহণ করলেন। উভয়েই প্রতিনিধি মনোনীত হ’লেন। অধিবেশনান্তে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে কাদম্বিনী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কাদম্বিনীর এই বক্তৃতাকে উল্লেখ করে আনিবেসান্ট বলেছিলেন—“ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীজাতিরও উন্নতির দ্যৌতক, এ ব্যাপারে তাহাই স্থিতি হল।”

এই নারীজাগরণ রাণী ভাবানী, রাণী রাসমণি, স্বর্ণময়ী, শরৎকুমারী, জাহ্নবী, দিনমণি, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত হতে থাকে এবং অচিরকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

১৮৯০ সালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জি. বি. ম্যালিসন্ বললেন—“Congress has started by the noisy and cowardly Bengalees but not countenanced by the real people of India.”

প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে এই মডারেট দলের মুখে কেবল কথার তুণ্ডি ছুটত। এদের দ্বারা দেশের সাংগঠনিক কোন কার্য হওয়ারই সম্ভব হত না।

কংগ্রেসের এই ইংরেজ-ভজা নীতি যুবসমাজকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। তারা তখন ভেতরে ভেতরে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ এই মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘পথের দাবীর’ সভ্যসাচীর মুখ দিয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন, “কংগ্রেস নেতারা গভর্নমেন্টের কাছে জোড় হাতে আবেদন করতেন, আমাদের গলায় দড়ি বেঁধেছ ক্ষতি নেই, কিন্তু দোহাই সাহেব, দড়িটা একটু লম্বা করে দাও যাতে আমরা চ’রে খেতে পারি”।

হুঃখ কষ্টে জর্জরিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল নিয়মধাবিত শিক্ষাজীবী ছাত্র, সামান্ত বেতনের কেরানী আর ক্রমবর্ধমান বেকার সম্প্রদায়। এঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার পুরুষসিংহের অভাব হল না। বাঙলা থেকে এগিয়ে এলেন, বিপিন পাল আর অরবিন্দ ঘোষ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক আর পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। এই বিফুর জনগোষ্ঠী এঁদের সাদরে নেতৃত্ব পে বরণ করল।

কংগ্রেস এঁদের চরমপন্থী আখ্যা দিলেন।

চরমপন্থীরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা চলবে না। চাই নতুন পথ—নতুন মত।

অরবিন্দ পৃষ্ঠ ভাষায় লিখলেন—“কংগ্রেস দিন

দিন ক্ষয় রোগে ক্ষীণ হচ্ছে। কংগ্রেস নেতারা ব্যবস্থাপক সভার স্বাস্থ্যরোধকারী পরিবেষ্টন থেকে তরুণ সম্প্রদায়ের বলগা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। দেশের এখন প্রয়োজন দেশাত্মবোধ, যা অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হবে”।

বীতিশ্রদ্ধ দেশবাসী দেখল কংগ্রেস তিন দিন বাৎসরিক অধিবেশন ছাড়া আর কিছু করে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই ১৮৯৩ এর আগষ্ট থেকে ১৮৯৪ এর মার্চের মধ্যে, বোম্বাইয়ের ‘ইন্দুপ্রকাশে’ অনেকগুলো শ্লেষ ব্যাঙ্গক প্রবন্ধ লিখলেন, ‘New Lamps for Old, শিরোনাম দিয়ে।

১৮৯৬ সালে ১২ই জাহ্নবীরী তিলক দক্ষিণ ভারতের সর্বজন সমাদৃত পত্রিকা ‘কেশরী’তে লিখলেন—“for twelve years the Congressmen had been shouting hoarse, but it produced no more effect on the Government than the sound of a gnat. Let us now try”.

চতুর্দিকে বিফুর জনগণ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল।

এই অবস্থার ভেতর বড়লাট লর্ড কার্জনের এক-জোড় মনোভাব সর্বনাশ আরোও বেশী করে ডেকে আনল। ১৯০০ সালে কার্জন লিখলেন—“The Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambitions, while in India, is to assist it to a peaceful demise.”

বাঙলা এবং দক্ষিণাত্যের চাষীদের স্বদেশীমন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধপরিকর হলেন। ইতর ভদ্র সকলকে একই মন্ত্রে বাঁধতে পারলে তবেই ইষ্ট লাভ করা যাবে। স্বদেশীই জনজাগরণের একমাত্র পথ। মাতৃভূমিকে ভালবাসতে হলে স্বদেশীর দ্বারাই তাকে জাগাতে হবে, এই হ’ল তাঁর চিন্তাধারা।

What is nationalism ?

অরবিন্দ এর সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন—“Nationalism is not a mere political programme. Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed in which you shall have to live. It

is an attitude of the heart, of the soul. What the intellect could not do, this mighty force of passionate conviction, born out of the very depths of the national consciousness, will be able to accomplish."

বিপিন পাল হৃদয় ভাবে এই দেশাত্মবোধের অর্থ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন।

তিলক বললেন, "Swaraj is my birth-right and I will have it."

অরবিন্দ বললেন—"There are some who fear to use the word freedom, but I always used the word because it has been the mantra of my life to aspire towards the freedom of my nation."

এই সময় মডারেট দলের লক্ষপ্রতিষ্ঠ সদস্য গোখেল বললেন—

"Only mad men outside Lunatic Asylum could think or talk of independence. ... We owe it to the best interest of the country to resist the propaganda with all our energy and all our resources. There is no alternative to British rule, not only now, but for a long time to come, and any attempt to disturb it, directly or indirectly, are bound to recoil on our own heads."

গোখেলের মত একজন ধূরন্ধর রাজনীতিজ্ঞের এই রূপ মনোভাবে বেশ অস্বস্তি হয় এবং বেশ দেখা যায় যে মডারেট পার্টির ভাবধারা তাঁর মধ্যে কী ভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল। গোখেল এবং তাঁর পার্টির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মায়নি। কিন্তু উগ্রপন্থীরা এসব কিছুই মানতে চায় না।

মডারেট দলের এই হীন মনোভাব এবং ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে অরবিন্দ গার্জে উঠলেন। বললেন—

"Political freedom is the life-breath of a nation, to attempt social reform, educational

reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom is the very height of ignorance and futility."

বিপিন পাল বললেন—"The new spirit accepts no other teacher in the art of self-government except self-government itself. It values freedom for its own sake, and desires autonomy, immediate and unconditioned, regardless of any considerations of fitness and unfitness of the people for it; because it does not believe serfdom in any shape or form to be a school for rest, freedom in any country and under any conditions whatever. It holds that the struggle for freedom itself is the highest tutor of freedom which, if it can once possess the mind of a people, shapes itself the life, the character, and the social and civic institutions of the people, to its own proper ends."

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তখন একমাত্র অধিকার ছিল, জাতির পক্ষ হয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলা, মডারেট দলের ক্ষুণ্ণ কংগ্রেস তার কিছুই করতে না।

১৮৯৮ থেকেই তুষের আগুনে ভারতের চতুর্দিক ধিক-ধিকি জলছিল। জনজীবনে কোথাও ছিল না শান্তি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অভাব, অনটন, উৎপীড়ন ভারতবাসীকে অগ্নিদগ্ধ করে তুলল। কার্জন এসে আগুনে ঘৃত সিঁধন করলেন।

১৮৯৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন পাস হ'ল। কলকাতার পৌরসভার কমিশনারদের সংখ্যা ৫০ থেকে ২৫শে নামিয়ে এনে তাদের কাজ করবার স্বাধীনতা প্রায় কেড়ে নেওয়া হ'ল। আর এক জায়গায় ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল। সরকারী নীতিতে শিক্ষিতেরা ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল।

[ক্রমশঃ]

ফসল

দীপেন রাহা

রাহুল একজন শিক্ষিত যুবক। বি, এ পাশ করে চাকুরি না পেয়ে প্রচুর অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে কবিতা লিখে। অজস্র কবিতা। অধিকাংশ আধুনিক, কোন কোনটা অত্যাধুনিক। তার সঙ্গে পত্রিকার মাধ্যমে পরিচয়। আমি কোন একজন উদীয়মান কবির কবিতা সমালোচনা করেছিলাম। সেই স্ত্রধরে সে আমার ঠিকানা বার করে যোগাযোগ করেছে। তাঁর নির্ভা ও ধৈর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এক নাগাড়ে তার অনেকগুলো কবিতা মনযোগ দিয়ে শুনেছি। কোন কোন কবিতা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশংসা করারও বিপদ আছে।

রাহুল বলে, যদি কোন পত্রিকায় ছাপাবার বন্দোবস্ত করে দেন, তাহলে...

বাকী কথাগুলো সে আর বলতে পারে না। কৃতজ্ঞতায় তার বক্ষ-ভারী হয়ে ওঠে।

বললাম, কোন একজন বন্ধুর অনুরোধে একটি কবিতা বই-এর সমালোচনা করেছিলাম। বলতে গেলে তার দায় উদ্ধার করার জ্ঞ। পত্রিকা দপ্তর আমাকে সমালোচক হিসাবে নিযুক্ত করে নি। যদি করত...তাহলে

সত্যি কথাই বললাম রাহুলকে। তবু রাহুলের কান দুটো যেন সন্ধি হয়ে উঠল। সে বিশ্বাস করল না। বলল, আপনি না পারলে আর কে পারবে?

কী করে তাকে বোঝাব যে তার আর আমার অবস্থা প্রায় একই। দু'জনের মধ্যে শুধু বয়সের তফাৎটা বেশী। সে আমার অর্ধেক বয়সী স্বাস্থ্যবান যুবক।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, কবিতা লিখে এদেশে পেট ভরবে না। একটা চাকুরির চেষ্টা কর। বয়স ও স্বাস্থ্য আছে।

একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে রাহুল বলল, অনেক চেষ্টা করেছি, অনেককে ধরেছি। সকলের মুখে সেই একই জবাব, হুঃখিত। আমি নিশ্চিত জানি, চাকুরি আমার হবে না। তবে স্বেযোগ পেল কবি হিসাবে

নাম করতে পারি। অনেকেই বলেছেন, বিরাট সম্ভাবনা আছে।

দেখলাম, তার চেঁচারার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ আছে।

বললাম, চর্চা করে যাও; একদিন না একদিন ফসল পাবেই।

আশীর্বাদ করুন, বলেই চেয়ার ছেড়ে ওঠে—রাহুল পদধূলি নিল।

কী আশীর্বাদ করব, ঠিক করতে না পেরে মনে মনে বললাম, শুভ, শুভ, মঙ্গল হোক। যাবার আগে রাহুল বলল, একটা কবিতার বই ছাপব ভাবছি, যে করেই হোক।

বললাম ও সব ঝেয়াল ছাড়। আগে একটা রোজ-গারের রাস্তা ধর, তারপর ও সব কথা ভেব। আর যদি যথেষ্ট জায়গা জমি থাকে, তাহলে আলাদা কথা।

দুটো কবিতা আমার হাতে দিয়ে রাহুল বিনীত ভাবে বলল, দেখবেন কোথাও দিতে পারেন কি না? আমি পরে এসে দেখা করব। বলেই রাহুল দৃঢ়ভাবে বেরিয়ে গেল।

কবিতা দুটো পড়লাম, দেখলাম বেশ আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোথায় ছাপাই, কাকে দিই! দু'একজন ভক্ত ও পত্রিকার লোককে বলতেই তাঁরা বিরক্ত হয়ে বলে, অজ্ঞাতকুলশীলদের কবিতা ছেপে কাগজ নষ্ট করবার মত পয়সা নেই।

শেষে বহু চেষ্টার পর একটি মফঃস্বলের পত্রিকায় রাহুল রায়ের একটি কবিতা বার করলাম। পত্রিকাটি দেখে খুবই খুশী হলাম, রাহুল দেখে আরো খুশী হবে। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হয়ত তার এই প্রথম কবিতা।

রাহুলের ঠিকানা জানা নেই। জানলে একটা পোষ্ট কার্ড লিখে জানিয়ে দিতাম। সে পত্রটি পেয়ে নিশ্চয়ই দুটে আসত। শীর্ণকায় পত্রিকাটি টেবিলের ওপর রেখেছি। বড় বড় হরফে লেখা 'জোনাকি' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। কবিতার নামটা 'প্রতিশ্রুতি'। প্রতিটি

পংক্তির মধ্যে রান্নালের চেহারার ছায়া যেন রয়েছে।
ইচ্ছে করেই ছুঁতে পড়লাম। তালই লাগল। কিন্তু
কোথায় কবি রান্নাল? আজ ছ'মাস হয়ে গেল সে
আসছে না। তবে কি সে কোথাও চাকুরি পেয়েছে?
না কোন ব্যবসায়ে নেনমেছে।

না, না, সে ব বসা করতে পারবে না। কবির তা
পারে না। স্বয়ং কবির রবীন্দ্রনাথও পারেন নি।

তবে?

কাজের ফাঁকে রান্নালের কথা মনে পড়ে। সেদিন
বিকলে বাইরের ঘর একা বসে বসে একটা কবিতার
রূপ দেবার চেষ্টা করছি। এমন সময় একটা লোক
ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল।

কে? বলে চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলাম।

গোঁফ দাঁড়ি তব্রতি মুখ। নোংরা কাপড় জামা।
হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না রান্নালকে। তাঁর কাঁধে
কাপড়ের ঝোলা। চেহারার সেই জৌলুস নেই।
চাহনির সৌন্দর্য নেই, আচরণে বিনয় ভাব নেই। ধপাস
করে স্তম্ভের চেয়ে বটায় বসে পড়ল। তারপর বলল,
আর একগ্লাস জল।

নিজে দৌড়ে গিয়ে ভেতর বাড়ী থেকে একগ্লাস জল
এনে দিলাম। চক্ চক্ করে সবটুকু প্রায় এক নিঃশ্বাসে
খেয়ে নিল। তারপর সশব্দে গ্লাসটা টেবিলের ওপর
রেখে ঝোলা থেকে একখানা বই বার করে আমার
দিকে এগিয়ে দিল। নিঃস্বার আমার কবিতার বই।
বলেছিলাম না বই ছাপাব। ছাপিয়েছি কিন্তু কেউ
নেয় না, প্রকাশকরা জমা নিতেও রাজী নয়। বলে,
বাজারে কাটবে না পোকার কাটবে! কিন্তু আমার
বিশ্বাস, ও কথা আপনি বলবেন না।

বইটা হাতে নিয়ে বললাম, প্রচ্ছদপট বেশ সুন্দর
হয়েছে। পাতা উল্টে বললাম, ছাপাও সুন্দর। কিন্তু
বই ছাপাবার টাকা পেলে কোথায়।

রান্নাল উত্তরে বলল, অল্প কিছু চাষের জমি ছিল।
বিক্রী করে সেই টাকা দিয়ে বই ছাপিয়েছি। মা হুঃখ

করে বললেন, ফি বছর জমি থেকে কিছু ফসল পেতাম,
তাও গেল।

আমি বললাম, জমি বেচা টাকা দিয়ে বই ছাপিয়েছি
তোমার ফসলের চাইতে ভাল লাভ হবে। রয়েলটি
পাবে। মাকে সান্ত্বনা দিলাম।

বলতে বলতে একটা ঢোক গিলে নিয়ে আবার
বলে চলল রান্নাল:

বলুন তো ঠিক বলেছি কি না। এর চাইতে ভাল
কাজ আর কি হতে পারতো? যদি কারো নজরে পড়ে
যায়, পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে, রবীন্দ্র পুরস্কার বা
একাডেমি পুরস্কার। এর চাইতে কত বাজে কবিতার
বই আছে। মানুষের পেটের ক্ষিদে ছাড়াও কৃষ্টির
ক্ষিদে আছে। একথা আর কেউ মানুষ বা না মানুষ,
আপনি মানবেন।

একটানা বলেই চলেছে রান্নাল। অনেকটা অপ্র-
কৃতস্থের মত। ইচ্ছে করেই বাধা দিইনি। বলে যদি
সে সুখ পায়, বুকটা হালকা হয়, হোক। বলতে বলতে
হঠাৎ রান্নাল টেঁচিয়ে উঠল 'ফসল' 'ফসল'। আমার
'ফসল'। কবিতা বইটার নাম সে 'ফসল' রেখেছে। হয়ত
রান্নাল মনে করছে এ তার সার্থক সৃষ্টি। তাই তার
উল্লাস। এ উল্লাসের সার্থকতা আছে। কিন্তু তার
চোখ মুখ ও চিংকারের ধরণ দেখে সন্দেহ ভঞ্জন হল।
একটু টেঁচিয়েই ডাকলাম, রান্নাল। ইচ্ছে ছিল তার
ছাপান কবিতার পত্রিকাটার কথা বলব। কিন্তু সে
আমার ডাকে সাড়া দিল না। হঠাৎ উঠে সে খপ্ করে
আমার হাত থেকে তার 'ফসল' বইটা কেড়ে নিয়ে
আবার টেঁচিয়ে ওঠল, আমার ফসল, আমার ফসল!
কেউ চুরি করে নেবে সেই আশংকায় বইখানা বুক
সঙ্গে চেপে ধরল। তারপর একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর
থেকে।

বুকল'ম'রান্নাল পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু সে ভুলতে
পারে নি তার সৃষ্টি অনাস্বাদিত 'ফসল'কে। তবে কি
সে তার সৃষ্টির আনন্দেই পাগল হয়ে গেল!

উদাত্ত ভারত

বাজীরাও সেন

—কতবার কত দর্পী বেঁধেছে তোমাকে
মদমত্ত ক্রুর অফ্রোহিনী, ভয়ংকর অমিত লাজ্জনা—
অথচ আশ্চর্য দেখি—স্বচ্ছ স্রষ্টি, চিন্তায় স্বাধীন
সর্বদ্বন্দ্বী দৃষ্টি
নাও নি দাসত্ব মেনে
সহজ শৃঙ্খল থেকে চির উদ্ধার রেখেছ নিজেকে।

দম্য ও লুণ্ঠেরা এলো মিছিলে মিছিলে
বারবার, সমুদ্রের পর্বতের অন্তপার থেকে
নগ্ন গুপ্ত জলন্ত লালসা!
যা পেল হাতের কাছে—
মাঠে ধান, সিন্দূকের সোন:

নিষেছে ফেলেছে তারা, কখনও বা, দিয়েছে আগুন
তবু তুমি অপ্রলিহ উজ্জল মর্যাদা
সর্বস্বান্ত দারিদ্র্যের তৃণ সিংহাসনে
অভিনব সাম্রাজ্যের অনন্তা বিধাতা।
কতো এলো শোষণ শাসন—
ধর্মে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে নিরন্তর নিষ্ঠুর আঘাত!
অথচ এখনও আছে অনিশেষ স্তুতীক্স নবীন
বেনে: জল নেমে গেলে, মুছে গেলে গলিত প্রাবন
ভ্রান্তিহীন প্রসারিত প্রাণের ভূমিকা—
ধূলোর ধ্বংসের পরে স্বজনের শ্রামল বিকাশ,
উদাত্ত ভারতবর্ষ! অপরূপ প্রাণের উদ্গাতা তুমি,
আদর্শের অনিবার্ণ শিখা।

শরণ স্মৃতি

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞাসাগর দিয়ে গিয়েছেন আমাদের হাতে ষড়ি।
মাতৃভাষার উপর আস্থা বন্ধিম দেন গড়ি।
আমাদের ভাষা অন্যতম সে সেরা ভাষা পৃথিবীর
রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন—গর্ব তা বাঙালীর!
শরণচন্দ্র, তুমি সে ভাষায় বাঙালী জাতির মনে
অন্তরঙ্গ করেছো প্রথম বাঙালারই জনগণে।
লাঞ্ছিত অবহেলিত ঘৃণা ছিলো সমাজেতে যারা
তোমারই পরশে প্রাণময় হয়ে ভাষা পেয়েছিল তারা।
সবার উপরে মানুষ সত্য—শাস্ত্রত এই বাণী,
তোমার লেখার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত রয়েছে জানি।
আমদানী-করা কোনো 'ইজম'-এর কখনো ধারোনি ধার
স্বাধীনতা-আন্দোলনেও ছিলো পন্থা সে আপনার!
রুধিরে তোমার ছিলো বিপ্লব—সে তথাকথিত নয়,
তোমার জীবনে, তোমার স্বজনে রেখে গেছো পরিচয়!
তোমার ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, তোমার সব্যসাচী,
তারা বঙ্গের খাঁটি সম্মান—চিরদিন রবে বাঁচি।

তুমি এখনও বেঁচে আছো

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য

ভালবাসি, আগেও বাসতাম,
ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক পোড়া রুটিটাকে
যেমন খুঁড়ে খুঁড়ে খায়—
আমিও তোমাকে তেমনই করেছি
চেউয়ের মত আছড়ে পড়েছি
তোমার অক্ষুরক্ত বাত্বের সন্ধানে।
এখন.....
কোলের শিশু
জিল জিলে চামড়া ঢাকা
বুকের কঙ্কালে
শাস্ত্রত অমৃত খুঁজে না পেয়ে
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।
আমি দেখছি
তুমি এখনও বেঁচে আছ।

কালীরূপ বন্দনা

(পূর্বাত্তরুতি)

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মনসা রূপা কালী কালী মাতা ভুজঙ্গিনী ।
শিবস্বন্ধে মৃতা কালী ভীমা কালী আবরণী ॥
ব্রহ্মপুত্র নদ্যা স্থিতা কালী কালী রূপা ভবানী ।
পুত্রাঙ্কে স্থিতা কালী শিব যুক্তা আমোদিনী ॥
ব্যাক্তচর্য যুক্তা কালী কালী তবতারিণী ।
সমুদ্রান্তে স্থিতা কালী কালী কৃষ্ণ দামিনী ॥
বৃহদারণ্যে জাগ্রতা কালী কালী পথ প্রদর্শিনী ।
অখণ্ড মণ্ডলা কালী কালী কিরাত জননী ॥
জন্ম জন্ম স্থিতা কালী রূপা-কালী শিবানী ।
সৌরাষ্ট্রে বগলা কালী কালী মাতা সৌদামিনী ॥
রূপহীনা রক্তপ্লুতা ছিন্নমস্তা প্রসবিনী (শিখরিনী) ।
বালুকায় তাপিতা কালী তীর্থ কালী হেমাঙ্গিনী ॥
হিমকন্ডা হিমস্থিতা কালী শঙ্খচূড়দলনী ।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশাস্তা মৃত্যু কালী শিবসত্তা স্পন্দনী ॥
বদরিকা-আশ্রম-কালী কালী ব্রতচারিণী ।
আসামে ঝটিকা কালী কালী শিব শিরোমণি ॥
তমালবনা স্থাপিতা কালী শাক্তকালী নিতম্বিনী ।
মোহমুগ্ধগুণা কালী কালী তপস্চারিণী পার্বতী ॥
দশভক্তমহাবিড়া কালী কালী আকাশভাষণী ।
ঘটচক্রভেদা কালী কালী সহস্রার কুণ্ডলিনী ॥
তিরিতে তাড়িতা কালী নীলকণ্ঠ লোভিনী ।
অষ্টারূপা দ্রষ্টা কালী কালী বিশ্বজননী ॥
অহংকালী স্পৃষ্টা কালী ব্রহ্ম কালী মাতঙ্গিনী ।
মদ্রদেশে পূজিতা কালী কালী রণরঙ্গিনী ॥
বিশ্বরূপা ব্রহ্মরূপা রূপব্রহ্ম সনাতনী ।
কঙ্কী নাগী কালী গদে অহং তাং নমামি ॥

শ্লোক ৪১ : যিনি কালী তিনি মনসা রূপিনী
লৌকিক দেবী । তিনিই সর্পজননী । এখানে উল্লেখ
যোগ্য হবিষ্যারে বিশ্বপর্বতে 'মনসা' দেবীর মূর্তি আছে ।
অনেকে আবার জঙ্গুলী তারাকে বাংলার লৌকিক
দেবতা মনসার আদিক্রম মনে করেন !

আবার কালী-রূপ মনস্বত, একথাও বলা যেতে
পারে । ভুজঙ্গিনী বলা হলো কেন ? কুণ্ডলিনী শক্তিকে

৪১ সাধকেরা ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন । মূল্যধারে
৪২ কুণ্ডলিনী স্নায়ুগুণা । তাঁকে জাগ্রত করে নিয়ে যেতে হবে
৪৩ সহস্রারে । অর্থাৎ শক্তি মিলিত হবেন শিবের সঙ্গে ।
৪৪ শ্লোক ৪২ : যিনি সতী তিনিই কালী । পুরাণে
৪৫ আছে দক্ষকন্ডা সতী পতি নিন্দায় কাতর হয়ে আত্ম-
৪৬ বিসর্জন দেন । তখন শিব সতীর দেহ স্বন্ধে নিয়ে বিভিন্ন
৪৭ স্থান পরিক্রমা করেন । ভীমা কালী আবরণী—ভীমা-
৪৮ স্থানকে একটি তীর্থ বলা হয়েছে । কথিত আছে ভীমা-
৪৯ দেবীর উত্তম স্থানে ভীর্থসেবীর যাওয়া উচিত । সেখানে,
৫০ যোনিকুণ্ডে স্নান করলে মানুষ স্বর্ণকুণ্ডলধারী দেবীপুত্র
৫১ হবে এবং শতসহস্র গোদানের ফল লাভ করবে । এই
৫২ ভীমাস্থানই হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত প্রাচীন গান্ধারের
৫৩ ভীমাস্থান মনে হয় । তমলুকে বর্গভীমা পীঠস্থান অর্ন্তব্য ।
৫৪ শ্লোক ৪৪ : লিঙ্গপুরাণের হৃদবিংশতিতম অধ্যায়ের
৫৫ ১৫-২৮ শ্লোকে আছে পার্বতীর, আজ্ঞায় পরমেশ্বরী কালী
৫৬ সুরপতিদের বিনাশে উগ্ধত দারুককে বিনষ্ট করলেন ।
৫৭ কালীর বেগের আতিশয্যে উদ্ভূত হলো ক্রোধাগ্নি ।
৫৮ তাতে কাতর হলো ত্রিভুবন । ভগবান ভূতভাবনও
৫৯ ক্রোধাগ্নি পান করার জন্তে মায়াবলে বালকরূপ ধারণ
৬০ করে প্রেতসঙ্কুল শাশানে (কাশীতে) গুহ্য পানের ছল
৬১ করে কাঁদতে লাগলেন । পরমেশ্বরের মায়ায় মুগ্ধা হয়ে
৬২ দেবী কালী সেই বালকরূপী দৈশানকে বুকে তুলে নিয়ে
৬৩ চুষন করে গুহ্য পান করাতে লাগলেন । সেই সময়ে
৬৪ দেব ও তাঁর গুহ্যচুষ্কের সঙ্গে কোপাগ্নি পান করাতে সেই
৬৫ বালক ক্ষেত্রপালক হলেন । এই প্রসঙ্গে তারাদেবীর
৬৬ প্রকৃত শিলামূর্তির চিত্রটির কথাও অর্ন্তব্য ।

শ্লোক ৪৫—৪৭ : তারাদেবীর কটিদেশ ত্র্যম্বচর্মে
আবৃত । যিনি কালী তিনিই তারা । তিনিই ভব-
সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী । এই বিশাল সংসার অরণ্যে
একমাত্র কালীই জাগ্রতা, আর সকলে স্নায়ুগুণ । কেন না
কালী নিজেই তাঁর মায়া দিয়ে বিশ্বসংসারকে সৃষ্ট
রেখেছেন; মোহাচ্ছন্ন করেছেন । যিনি মায়া দিয়ে
আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, তিনিই মায়াযুক্ত করতে পারেন ।

শ্লোক ৪৮ : অবশু মণ্ডলা কালী—শক্তি ব্রহ্ম-
স্বরূপিনী। দেবুপনিষদে আছে—সব দেবতা একবার
দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,
'মহাদেবী, কে তুমি?' দেবী বললেন, 'আমি ব্রহ্ম-
স্বরূপিনী'। আমার থেকে প্রকৃতি পুরুষাঙ্গক জগৎ
উৎপন্ন হয়েছে। আমি শূন্য এবং অশূন্য, আনন্দ ও
অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান।

'সাত্ৰিবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিনী। মণ্ডঃ প্রকৃতিপুরুষাঙ্গ-
কং জগচ্ছন্যং চাশূন্যং চ অহমানন্দানন্দা বিজ্ঞানা-
বিজ্ঞানে অহম্।' দেবুপনিষৎ, মন্ত্র ১।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখেছেন, 'অন্ত
জগতঃ জন্মস্থিতি ভঙ্গঃ সতঃ সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তেঃ
কারণাভবতি তদব্রহ্ম (ব. সূ ১১২)—যে সর্বজ্ঞ
সর্বশক্তি কারণ থেকে এই জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গ অর্থাৎ
সৃষ্টিস্থিতি লয় হয় তা ব্রহ্ম।

কপূঁরাদি স্তোত্রে কালীকে বলা হয়েছে হরি, হর,
বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাদের আরাধ্যা আত্মা। ব্রহ্ম যেমন
নির্গুণ এবং সগুণ, শক্তিও তেমনি সগুণা এবং নিগুঁণা।
নিরুক্ততন্ত্রে বলা হয়েছে, 'শিবশক্তিদ্বিধা দেবি! নিগুঁণা
সগুণা পি চ। নিগুঁণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরংব্রহ্ম
সনাতনী' (২প) শিবশক্তি দ্বিবিধা—নিগুঁণা ও সগুণা।
নিগুঁণা জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্ম সনাতনী।

শ্লোক ৫১ : মায়ের আর একটি রহস্যমূর্তি হলো
ছিন্নমস্তা। এই মূর্তির মধ্যে বেদান্তের প্রসিদ্ধ চারটি
মহাবাক্যের রহস্য লুকিয়ে আছে। এ যুগের বেদব্যাস
সাধককুলচূড়ামনি শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
তঁার বিখ্যাত 'জপসূত্রম্' গ্রন্থে লিখেছেন,

'ব্রহ্মাত্মাতি প্রমাণাৎ পদতলদলিতা বিপ্রতীপা রিরংসা
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পূর্ণাদিতি পদগমনাচ্ছাস্তিক্রিয়মন্তবর্গৈঃ।
আত্মায়ং ব্রহ্ম চেতি ক্রতিযু নিগমনাৎ তত্ত্বম স্তাদিতত্ত্বং
নাদৈয়ং গ্যাস্তদর্থঃ স্মৃতিতপরিচয়া ছিন্নমস্তাহস্ত গুহা।'

চারটি মহাবাক্যের মধ্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ যেটি
প্রথম পদ, তা দিয়ে তিনি 'বিপ্রতীপা রিরংসাকে
সর্বোতভাবে দলিত করেছেন, কেন না তা হলেই শুধুমাত্র
পরমাত্মাতেই পূর্ণ রতি হয়ে থাকে। 'বিপ্রতীপ

রিরংসা' কথাটির অর্থ স্বরূপের যা বিপ্রতীপ তাতে
রমনেচ্ছা।

আত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, যেটি অনায়াস বস্তু তার
প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক ধর্ম হওয়া উচিত
নয়। অথচ অল্প, খণ্ডিত, অনায়াস পদার্থের প্রতিই জীবের
আকর্ষণ প্রবল। এটিই হলো তার বিপরীত রিরংসা।
ছিন্নমস্তার পদতলে বিপরীত রতাতুর রতিকাম—
এরই প্রতিমূর্তি। এই বিপরীত রতি দূর হয় একটি
বুদ্ধিতে। তা হলো আমি স্বরূপতঃ আনন্দ ব্রহ্মই, এবং
ব্রহ্মেরও কিছু নেই। তাই আত্মা ছাড়া আর রতি
কোথায় হবে?

আবার 'ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' ইত্যাদি যে শাস্তি
পাঠের মন্ত্রবর্ণ সমূহ তার সাহায্যে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এই
অপর মহাবাক্যটি নিজের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।
কেমন করে? নিজের মাথা নিজে কেটে এবং নিজের
রক্ত নিজে পান করে দেখাচ্ছেন যে 'ইহাও পূর্ণ। উহাও
পূর্ণ, গুঁণ থেকে পূর্ণকে নিলে পূর্ণই থাকে, পূর্ণ ছাড়া
অপূর্ণ কোথায়?' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এটিও তিনি প্রকাশ
করে দেখাচ্ছেন যে নিজের দিব্য কলেবরের ভিতরে যে
আত্মা 'রুধির' রূপে আছে, তা অন্তরে, বাইরে সর্বত্রই
আছে, প্রকৃতপক্ষে তার উপাদান নেই। শেষে 'তত্ত্বমসি'
এই মহাবাক্যরূপ 'অসি' দিয়ে নিজের তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব
তিনি নিজের মধ্যে প্রতিপাদন করছেন। হাতের অসি
এই 'অসি'রই প্রতীক। নিজের দেহ হলো 'জং', নিজের
উত্তমাত্ম হলো 'তং', 'অসি' পদটি এই দুটির ভাগত্যাগ-
লক্ষণা প্রকাশ করছে।

ছিন্নমস্তার কলেবর এবং তা থেকে ছিন্ন মুণ্ড হলো
নাদ-বিন্দু। কিন্তু নাদ বিন্দু এ ছয়ের মধ্যে ব্যবধান—
'অন্তরীক্ষ' (hiatus) বজায় থাকা পর্যন্ত 'শাস্ত' ভাবটি
সম্ভাবিত হয় না। নাদে যে তত্ত্ব নির্গলিত, বিন্দুতে তা
পর্যবসিত—এই সমীকরণটি সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হওয়া
পর্যন্ত 'শাস্ত' ভাব নেই। তাই ছিন্নমস্তা নিজের বৃকের
রক্ত নিজে পান করে শাস্ত হয়েছেন। বিপরীতরতাতুর
রতিকাম=বৈথরী জপ, দেবীর কলেবর=মধ্যমা;
মুণ্ড=পশুস্ত্রী; রুধির পান=পরা।

শ্লোক ৫২—৫৬ : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বিখ্যাত শক্তিপীঠ মরুতীর্থ হিংলাজ। একে হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাটও বলা হয়। এখানে পড়েছিল দেবীর নাভি, মতান্তরে ব্রহ্মরক্ত। দেবীর নাম কোটুরী, কোটুবী, কুটুবী বা কোটুরিশা। ভৈরব—ভীমলোচন।

নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে দক্ষগৃহা সমুদ্ভূতা লোক বিশ্রুতা সতী রাজর্ষি দক্ষের প্রতি কুপিতা হয়ে দেহত্যাগ করেন এবং মেনকার প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় কালী। মেনকার গর্ভসমুদ্ভূতা বলে তিনি হিমকন্যা। অর্থাৎ গিরিরাজ কন্যা।

বদরিকা আশ্রম ও (বদরিকাশ্রম) দেবীস্থান। এখানকার দেবীর নাম ত্রীবিদ্যা মতান্তরে উর্বশী।

আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে (দ্র. শ্লোক ৩৪) পাহাড়ের উপর কামাখ্যা মহাপীঠ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম কামরূপপীঠ। এখানে দেবীর মহামুদ্রা বা যোনি পতিত হয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী—কামাখ্যা, নীলপার্বতী, কামেশ্বরী এবং কালী।

শ্লোক ৫৭ : মথুরায় দেবীস্থান আছে। দেবী দেবকী, মতান্তরে মাধবী। কংকালী টীলাতে প্রাচীন দেবী মন্দির আছে। দেবীর নাম কংকালী। দেবী কংকালমালিনী, সিংহবাহিনী এবং উগ্রদর্শনা। লোক প্রসিদ্ধি আছে ইনিই সেই যশোদা গর্ভসমুদ্ভূতা যোগমায়া। প্রকৃতপক্ষে ইনি কংসকালী।

মথুরার কাছে প্রাচীন দেবীস্থান মহাবন। একে তমালবনও বলা যেতে পারে। একে পুরোনো গোকুলও বলা হয়। এখানকার দেবী হলেন ভজা বা ভজকালী বা ভজেশ্বরী। বৃন্দাবনে দেবীর কেশ পড়েছিল বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। এই পীঠকে উমাবনও বলা হয়। দেবী—উমা, ভৈরব ভূতেশ। মহানীলতন্ত্রে আছে অখিলাত্মিকা মহাদেবী কাত্যায়নী গোবর্দ্ধনে বিরাজ

করছেন। বর্তমানে বৃন্দাবনেই কাত্যায়নী মন্দির আছে।

শ্লোক ৫৮ : কালীরূপা পার্বতী নিজদেহ গৌর করার জন্তে কঠোর তপস্বী করেন। কালিকাপুরাণের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে, ‘হিমালয় স্তূতা মায়াতে মোহিত হয়ে বললেন, আমার দেহ স্বর্ণ সদৃশ গৌর হোক। পার্বতী এই কথা বললে, মহাদেব পার্বতীকে আকাশ গঙ্গার তোয় সমূহে স্নান করালেন।’ ইত্যাদি।

শ্লোক ৫৯—৬০ : দশমহাবিষ্ণুর মধ্যে কালী শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধানা, নির্বিকারা, নিঃশব্দ ব্রহ্মরূপ প্রকাশিকা। যোগিনীতন্ত্রে আছে দেবী ঘোর নামে অম্বরকে বলছেন এখন আমার পরম ব্রহ্মানন্দময় রূপ দেখ। পরম ধাম এই রূপ—কালীরূপ। এর চেয়ে পরতর ব্রহ্মরূপ আর কিছুই নেই।

‘ইদানীং পশু মদ্রূপং ব্রহ্মানন্দং পরম পদম্। তদ্রূপং পরমং ধাম কালী রূপমিতি শৃণু। ইতঃ পরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রচিৎ।’ যোগিনী তন্ত্র, পৃ ৮।

এই আত্মা বিদ্যা কালী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। কামধেনুতন্ত্রে আছে—‘শূন্যগর্ভে স্থিতা কালী কৈবল্যদায়িনী।’

কুজিকাতন্ত্রে দশমহাবিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এঁরা সর্বদা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ভুজ প্রদান করে। যে কোনো প্রকারে এঁরা কলিযুগে পূর্ণফল প্রদান করে থাকেন। ত্রিভুবনে এঁদের সমান কেউ নেই। মন্ত্রোচ্চারণে জীব পাপ থেকে মুক্ত হয়, মহাবিষ্ণুর স্মরণ করলে জীব ভববন্ধন মুক্ত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে কালীই বিরাজিতা। ষট্চক্রে ভেদে তিনিই পরম শিবের সঙ্গে সহস্রারে মিলিত হন। সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ৬৬ : কল্পীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন কালীপদ। তিনি শিব-শক্তির আধার স্বরূপ। তাঁকে প্রণাম করি।

—ভাষ্যকার : ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার]

(ক্রমশঃ)

ডায়েরী থেকে

শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী

আরো একটা বছর বিদায় দিয়ে আমরা নতুন বছরে শুভ কিছু কামনা করছি। কামনা করছি গত বছরের দুঃখ দৈহ্য ও দারিদ্র্য যেন ছুটে এসে নতুন বছরকে গ্রাস করে না বসে। নতুন বছর যেন প্রথম থেকেই শুভ কিছু দিয়ে শুরু হয়। এ ইচ্ছা আমাদের সকলের। কিন্তু ইচ্ছার জোর আমাদের এমন নয় যে তা যথার্থই কার্যকরী হয়ে উঠবে।

আমাদের ইচ্ছাও একেবারে বন্ধ্য। কোন সৃজন ক্ষমতা ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত নেই। চাওয়াটাই চাওয়ার মত নয়। আমরা চাই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন উন্নত হোক, সর্ব প্রকার দুর্নীতি বন্ধ হোক, শান্তি প্রবাহিত হোক একটানা ভাবে। চাই, কিন্তু সে চাওয়া কি যথার্থ চাওয়া? সে চাওয়া কি আন্তরিক? না তা নয়। আমরা ভাবের ঘরে চুরি করে কেবল কথা বলতে শিখেছি। অপরকে সং হতে পরামর্শ দিই, দুর্নীতি মুক্ত হতে বলি, কিন্তু নিজে সে পথে কখনই যাব না।

আমি যদি সং না হই, অপরে হবেই বা কেন? কেউ আর বোকা নয়। দুষ্ট বুদ্ধি কারো কিছু কম নেই। বুদ্ধির দোঁড়টা চলে একেবারে জোর প্রতিযোগিতার মত। কে কাকে হারাতে তারই চেষ্টা চলতে থাকে প্রকাশে ও অপ্রকাশে। এ মানসিকতা সমাজ-জীবনে ব্যাপক ভাবে, সংক্রামিত হয়েছে। এ ব্যাধি বাড়ছে মহামারির ক্ষমতা নিয়ে। স্নেহের স্থান, পারিবারিক মধুর সম্পর্ক এ মহামারিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সবাই কেবল চালাকি করে বাজিমাং করতে চাই।

নতুন বছরের কাছে আমরা কিছু শুভ, কিছু কল্যাণ আশা করতে পারতাম যদি আমরা প্রতিনিয়ত ভাবের ঘরে চুরি না করতাম।

সুখ চাই, শান্তি চাই, আনন্দ চাই। এ সব চাই বলেই এত হানাহানি, এত মারামারি। মনে করি অপরকে বঞ্চিত করেই সুখ ব্যক্তিগত ভাবে পাওয়া যাবে। যদি অর্থ ও সম্পদের মধ্যেই শান্তি, আর দৈহিক

উত্তেজনার মধ্যেই আনন্দ থেকে থাকে তবে চালাকিতে সুখ আসতে পারে। কিন্তু সুখ শান্তি তা নয়। আমরা যে পথে যে ভাবে চলেছি তাতে সুখ পালিয়েছে। আনন্দ বোধহয় চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে চলেছে।

একটু আনন্দের জন্য কি না করছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছি। হত্যা করছি, বঞ্চনা করছি, মিথ্যার পাহাড় সৃষ্টি করে তার আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছি। ভাবছি এখানে কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, আড়াল থেকে লক্ষ্য ভেদ করেই সরে পড়বো।

এই নিরবিচ্ছিন্ন সমাজ ও সমষ্টি চেতনাহীনতায় আমরা তলিয়ে যাচ্ছি অতল তলে। সমষ্টি-চেতনাই কিন্তু আত্মসুখ ও তৃপ্তি এনে দেয়। সমষ্টির মঙ্গল হলে ব্যক্তির মঙ্গল হবেই। কিন্তু সকলকে বঞ্চিত করে ব্যক্তি কখনই তৃপ্ত হতে পারে না, সুখী হতে পারে না, আনন্দ পেতে পারে না। অথচ আমরা এক বিকৃত মানসিকতায় বিভ্রান্ত হয়ে এক দুষ্ট চক্রের শিকার হয়ে পড়েছি। কাজেই একটি অপরাধকে ঢাকার জন্য শত অপরাধ না করে আর উপায় থাকে না।

ব্যক্তি জীবনে, বিশেষ করে সমাজের, রাষ্ট্রের কর্তব্যীদের বিকৃত মানসিকতা ও কর্ম পদ্ধতি সমগ্র সমাজকে কলুষিত করে, একটা দুষ্ট চক্রের মধ্যে নিষ্ফল করে ঘুরপাক খাওয়ায়। এ থেকে মুক্ত হতে হলে একটি রাস্তাই খোলা আছে, তা হচ্ছে সং চিন্তা ও কর্ম অনুশীলন করা। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নয়—সমষ্টিগত ভাবে।

মনে রাখতে হবে অশ্রায় দিয়ে অশ্রায়কে, দুর্নীতি দিয়ে দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করা বা সমূলে ধ্বংস করা যায় না।

আলো যেমন অন্ধকারকে গ্রাস করে, তেমনি সং চিন্তা ও কর্মের আলো দুর্নীতি ও চরিত্র সংকটের গভীর অন্ধকার দূর করতে পারে।

এ দৃষ্টি ভঙ্গী ও মানসিকতা দিয়ে যদি নববর্ষকে বরণ করি তবেই সুফল আশা করতে পারি।

হৈমন্তী সান্যাল

দীপংকর সেন

নিউএম্পায়ারে ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করছেন হৈমন্তী সান্যাল। একদা এটি ছিল সাহেব পাড়া। বিদেশী ছবিই দেখানো হোত। আজ যুগের পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। হলটি দর্শকে ভর্তি ছিল। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই।

সঞ্জয় সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখলে কোণের দিকে একটা ক্যামেরায় ফ্লিম লোড করছে সুহাস রায়। সুহাস কলকাতার এক সংবাদ পত্রের ক্যামেরা ম্যান।

সঞ্জয় বললে, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।

সুহাস বললে, একবার আমার কয়েকটি ছবি নিয়ে-ছিলেন। ম্যাগেষ্ঠার টাইমসে বেরিয়েছিল।

হাসলে সঞ্জয়। বলল, মোঠা, থিলিং। কলকাতায় ফটোগ্রাফার পাই না। টেলিফোন করেছিলাম। ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে। তারপর দেখা হয়েছিল ইডেন গার্ডেনসে।

ওরা যখন কথায় ব্যস্ত সেই সময়ে সংগঠকদের একজন শোভন মিত্রকে দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে। সঙ্গে এক সুবেশ তরুণী। ফিনফিনে চেহারা। দেখলে মিসেস কেনেডি বলে ভুল হয়। সারা দেহে লাবণ্যের সঙ্গে এক ঋজু ভাব। যেন খরধার তলোয়ার।

শোভন মিত্র বলেন, আরে মিঃ বোস আপনি এখানে? আসুন আলাপ করিয়ে দেই। ইনি স্বনামধন্য পামেলা নাদার। একটি সুইস পত্রিকা ফ্যাসেন এণ্ড কালচারের ক্রিটিক। আর ইনি সঞ্জয় বোস। ম্যাগেষ্ঠার টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা।

ডিলাইটেড টু মিট য়! পামেলা বলে।

মি টু—সঞ্জয় মুহূ হেসে বলে।

সঞ্জয় দেখে সুহাসের সঙ্গে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি বিনিময় হোল। ওর পাতলা ঠোঁটে এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

সঞ্জয় বলে, আমি আপনার লেখা পড়তে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না। পরিচয় হয়ে গেল। এবার পড়বো। সুইস ফ্যাসেন পত্রিকা আমি দেখেছি।

বেল বাজার শব্দ শোনা যায়। সুহাসের ক্যামেরা লোড করা হয়ে গেছে। ও অডিটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে যায়। সঞ্জয়ও চলতে থাকে দেখে পামেলা ইতস্তত করছে। বলে, চলুন আমার সঙ্গে। ওরা অডিটোরিয়ামে ঢুকে যায়। আলো-আঁধার অডিটোরিয়ামে শুধু কয়েকটি মাথা দেখা যাচ্ছে। এখনই নৃত্য প্রদর্শনী শুরু হবে। ওরা যায় সামনের রোর দিকে। সঞ্জয় একটা খালি সীট দেখিয়ে বলে, সিট ডাউন প্লিজ।

পামেলা বসে। বলে, থ্যাংক ইউ।

সঞ্জয় বলে, নিড নট মেনসেন ইট প্লিজ। তারপর ওর পাশের সীটটায় বসে পড়ে।

নৃত্য শুরু হয়। সঞ্জয় দেখে হৈমন্তী তন্ময় হয়ে নৃত্যের স্রোতে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। সমস্ত অডিটোরিয়াম মন্ত্রমুগ্ধ। সুহাসের ক্যামেরার ফ্লাস কয়েকবার জলে উঠলো। মাঝে পামেলা একবার এগিয়ে গেল ডায়াসের কাছে। হয়তো সুহাসকে কিছু বলতে গেল। ফিরে এসে বসলে আপন সীটে। কয়েকটি পয়েন্টস টুকে নিলে। কিন্তু মন তার পড়ে রয়েছে ডায়াসের দিকে। দৃষ্টি ঘুরছে সুহাসের ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে। হৈমন্তী নাচছেন। গ্রীক পে-ষাকে আবৃত। তার সারা অঙ্গে লাবণ্যধারা। পৌষাকে বিদেশী বনেদি আনা। আর দেহে ভারতীয় ঐশ্বর্য। অঙ্গ ভঙ্গিতে অনায়াস গতি ছন্দ। সঞ্জয় মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

এক সময়ে পাশে পামেলার দিকে তাকিয়ে সে বলে, আপনার স্বামী কি করেন?

মিঃ নাদার একটি ব্রিটিশ ফার্মের সেলস ম্যানেজার। কোম্পানীর সেলস বাড়তে সারাদিন কেটে যায়। সঞ্জয় মুহূ হাসে।

আচমকা অডিটোরিয়ামের দরজা দিয়ে কয়েকজনকে ঢুকতে দেখা গেল। এত আলোয় অনেকে ফুঁক হলেও কিছু বলতে পারলো না। প্রেস রোতে শোনা গেল মুহূ গুঞ্জন। ভাস্করাদিত্য এসেছে। ভাস্করা-দিত্যকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল সঞ্জয়ের সামনের

কয়েকটি সীট পরে। সে সম্প্রতি জার্মানীর লাইপ্-জিগ্ অপেরায় নৃত্য প্রদর্শনী করে এসেছে। কলকাতার কাগজগুলি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। একদিন প্রত্যুষে সে দেখলো সে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে গেছে। যেন সে সীজার। হি কেম, হি স, হি কনকার্ড।

নৃত্য চলছে। কিছু পরেই ওপরকার গ্যালারী থেকে চিৎকার শুরু হয়।

ডায়াসের কোণের লাইট নিবিয়ে দিন চোখে লাগছে। অশ্রুদিক থেকে আর একটি গলা। নাচ হচ্ছে, না ছাই হচ্ছে।

নৃত্যরতা হৈমন্তীকে দেখা গেল নির্ভীক চিত্তে ডায়াসের বাইরে চলে যেতে। নীল আলোর বন্ডা ছড়িয়ে পড়লো মঞ্চে। আর হৈমন্তী আরও বিদ্যুৎ দীপ্তিতে নৃত্য পরিবেশন করে চললো। এ নৃত্য নয়। যেন নৃত্যারতি। দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন। সমস্ত অডিটোরিয়াম বিষ্ময়ে বিমুগ্ধ।

সুহাসের কয়েকটি ফ্লাস জ্বলে উঠলো। পামেলা এগিয়ে গেল ডায়াসের দিকে।

সজয়কে এতক্ষণে চিনতে পেরেছে ভাস্করাদিত্য।

বললে, আপনিও এসেছেন?

সজয় হাসলো। কোতুকের হাসি। বললে, দেখলাম আপনার কি অপরিসীম দক্ষতা।

ভাস্করাদিত্যের মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সে আচমকা হাতের রিষ্টওয়াচটির দিকে চেয়ে বললে, আর একটা এপয়েন্টমেন্ট আছে আজ চলি।

ভাস্করাদিত্য চলে গেল।

পামেলা ফিরে এসে বললে; কি সুন্দর নাচলো না?

সজয় হাসলো। বললে, অপূর্ব। সারা অডিটোরিয়ামে আলো জ্বলে উঠলো। দেখা গেল চারিদিকে শুধু মানবের বহা। ওদের কলগুঞ্জরণ। সজয় হারিয়ে গেল ওদের মধ্যে।

যুনাফা

শ্রীশ্যামাদাস দে

তিন বৎসরের উর্ধ্ব প্রত্যেক ব্যক্তি—গ্রীষ্মকালে এক আনা, বর্ষাকালে একআনা; প্রত্যেকটি গরু/মহিষ—দু'পয়সা, বর্ষাকালে এক আনা; প্রত্যেকটি ছাগল/ভেড়া—গ্রীষ্মকালে দু'পয়সা, বর্ষাকালে দু'পয়সা; প্রত্যেকটি অশ্ব—গ্রীষ্মকালে এক আনা, বর্ষাকালে দু'আনা; প্রত্যেকটি হস্তী/উষ্ট্র—গ্রীষ্মকালে চার আনা, বর্ষাকালে আটআনা; দশটি পর্যন্ত গরু মহিষের পাল....।

অতঃপর আরও আছে। আছে তামাম দুনিয়ার তাবৎ স্বাবর জঙ্গল প্রাণী ও পদার্থের পরিপূর্ণ ফিরিস্তি রাধার ঘাটের প্রকাণ্ড তিরিশ-বাই-ষাট ইঞ্চি নোটিশ বোর্ড-এর সুদীর্ঘ দুই কলম ব্যাপিয়া। সমস্ত যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বেশ দর্শনীয় ভাবেই দুটি বৃহৎ

সাল পিলায়ের সহিত নোটিশ বোর্ডটি টাঙানো থাকে সারা বৎসরই। গঙ্গা পারের পারানির হিসাব।

গ্রীষ্মের শীর্ণা গঙ্গা পদব্রজে পার হয় ক্ষুদ্র ছাগ শিশুটিও, কিন্তু পারের কড়ির মাপ নেই এ খেয়াঘাটে কোন ঋতুতেই।

আজকের গঙ্গা অবস্থা গ্রীষ্মের শীর্ণা গঙ্গা নয়, আর তার ভয়াল ভয়ঙ্করী প্রমত্তা রূপ। একে বর্ষাকাল তার ময়ূরাক্ষীর বাঁধভাঙ্গা প্রচণ্ড বন্যার তোড়। ছাপ্পান্নর সেপ্টেম্বরের গঙ্গা প্রতি মুহূর্তেই তীর ভাঙার নেশায় সে এক নির্ভুর খেলায় মত্ত। পতিতপাবনী সুরধুনী কুলু কুলু কলধ্বনিতে আজ আর ঘুম পাড়ানো গান গাইছে না, আজ তার হিংস্র ভয়াল গর্জনে, তার খলখল অটুহাত্তে দিক দিগন্ত কম্পমান।

খেয়াঘাটের কাঁচারী এখন খুব ছসিয়ার। যাত্রী নেয় কম। সময় নেয় অনেক বেশী। এ সময়ে একটা খেয়া মিস্‌ মানে যে, কম-সে-কম একটা ঘণ্টা লস্‌ তা আর কেউ না বুঝলেও অভিমুখ্য বুঝেছে হাড়ে হাড়ে। তাকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করতে হয়। গোকর্ণ-বহরম-পুর গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই। রিক্সা-চালকের কাজটা পাওয়া অবধি এই ব্যাবস্থা চলে আসছে প্রায় দু'বৎসর। সাইকেল রিক্সা চালানো এমন আর কঠিন কি। আয়ও হচ্ছে মন্দ নয়। অভিমুখ্যর শুক কঠ এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই সিক্ত হয়। সেই শালা ফজলু চামারের টিনের চালার নীচে বসে অসহ্য গরমে সারাদিন বিদঘুটে তামাকের গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজার পানসিকে রেটে বিড়ি বাঁধার চেয়ে এ স্বাধীন ব্যবসাটা ঢের ভাল। কী বিশ্রী খিস্তি করত ফজলু শালা। তার চেয়ে অনেক বেশী সুখে আছে এখন অভিমুখ্য।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে খেয়া নৌকাটা ছেড়ে গেল। অভিমুখ্য ডেকেছিল, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেই ডেকেছিল প্রাণপ্রাণে ছুটে আসতে আসতে। মাখিটা কানও দিল না। অবশ্য এই শ্রোতের মুখে একবার নৌকা ছেড়ে দিয়ে আর কারও মুখ চেয়েই যে সে নৌকার মুখ ফেরানো যায় না, তা বোঝে অভিমুখ্যও। সুতরাং অসহ্য একটা আক্রোশকে অতিকষ্টে সংহত করে গভীর অভিমানে অভিমুখ্যকে অপেক্ষাই করতে হল।

আক্রোশটা প্রথমে গিয়ে পড়ল বাস ড্রাইভারের উপর। শালা পথে দু' ছ'বার পিসাব করতে নেমে প্রায় পাঁচ মিনিট লেট করেছে। ওটার নিশ্চয় বহুমুত্র ব্যারাম আছে। ও শালার ঐ রোগটা না থাকলে তো অভিমুখ্যর কপালে এই দুর্ভোগটা হত না। তারপর ফোঁধ হল তার বুদ্ধা জননীর উপর। বুড়ীটা যদি আর একটু আগে ডাল ভাতটা নামাতে পারত তবে তো থার্ড টিপটা মিস্‌ হত না। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল ঘাটোয়াল বাবুর উপর। শালাতো ঘাটের কড়ি খেয়ে ভুঁড়ি ফুলোতে ফুলোতে লাটের গদিতে চড়েছে। একটা টাকার কুমীর। এ সময়ে তো আরও দু'এক খানা বেশি নৌকার ব্যবস্থা করলে পারত। তাহলেতো

আর একটা খেয়ার জন্তে একঘণ্টা সময় লস্‌ হত না। এ সময়ে এক ঘণ্টা লস্‌ মানে কম-সে-কম দুটো টাকা লস্‌। ও শালা আর কি বোঝে? বোঝে অভিমুখ্য। স্কুল-কাছারির সময়টাতে অভিমুখ্যর রিক্সা ঘণ্টায় প্রায় দু'টাকা কামায় বৈকি।

যাঃ শালাঃ, দিনটাই আজ বরবাদ হল। আহত অভিমানে গুমরে উঠল অভিমুখ্য।

খেয়া নৌকাটা ফিরতে যতোই বিলম্ব হচ্ছে, অভিমুখ্যর মেজাজটা ততই ক্ষিপ্ততর হয়ে উঠছে। অবশ্য গোকর্ণ থেকে ভাদ্রের কড়া রোদে ভ্যাপসা গরমে তাকে দশ মাইল রাস্তা বাসে আসতে হয়েছে ঠায় দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়েও ঠিক নয়, বরং বলা চলে খানিকটা নীল ডাউন আর খানিকটা কুঁজো হয়ে। কারণ মাথা তুলে দাঁড়াবার মত উচ্চতা নেই এ অঞ্চলের কোন বাস-এর। 'আমরা শালা মাথা তুলে দাঁড়াতে ভুলেই গেছি, তা আর বাসের দোষ কি!' অভিমুখ্য ঠাড়া করে বলে-ছিল কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো অন্য সহযাত্রীকে।

আধ ঘণ্টা নীল ডাউন হয়ে থেকে অভিমুখ্যর মেজাজ বাসেই চড়ে গেছিল। খেয়া নৌকাটা সেই চড়া মেজাজ-কে আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান মনুষ্যগণ যেক্রপ আচরণ করিয়া থাকেন অভিমুখ্যও তাহাই করিল। অর্থাৎ ফস্‌ করিয়া একটি দেশলাই কাঠিতে অগ্নি সংযোগ পূর্বক একটি কড়া বিড়ির মুখাগ্রি করল। তারপর একটা কড়া মেজাজী টানে প্রায় আধাআধি শেষ করে ফেলল। একেবারে কাঁচা কয়লার আঁচের ধোয়ার মত কুণ্ডলীকৃত ধূমোদগীরণের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বের হল কঠিন বিরক্তি জাপক একটা কর্কশ শব্দ। অতঃপর হান্কা ভাবে বিড়িটি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বেশ সাহেবী কায়দায় প্যাটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আর পাঁচজন রিক্সাওয়ালায় তুলনায় অভিমুখ্যর আভিজাত্য অধিকতর। ও প্রাইমারী পাশ করেছে, সিনেমাও দেখেছে অনেক বেশী। লারে লাগ্না...হো লালা...নিলামওলা...এসব গান ওর মুখে লেগে আছে সারাক্ষণ। যাত্রাগানের কংশের মত বারবী চুল।

জুলুপি রেখেছে জগাই মাধাই মার্ক। হাফ্‌ প্যান্ট অথবা গামছা নয়, ওর পরিধানে পুরোপুরি ফুল প্যান্ট তৎসহ বাটার নটাকা পনর আনা দামের হু। বেশে বিন্যাসে, হাব ভাবে ও সর্বদা নিজেকে তাদের থেকে উচ্চতর স্তরে তুলে রাখে। যখন-তখন পা ফাঁক করে দাঁড়ায় প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, আর বাবরীতে এক একটা নাটকীয় ঝাঁকানি দেয়। ওর হাফ্‌ সার্টের বুক পকেটে শোভা পায় আট আনা দামের রাইটার কলম। সে অভিমন্যু রিক্সাওয়ালা অভিমন্যু নয়, তিনি অভিমন্যু বাবু।

এখনও অভিমন্যু তেমনই দাঁড়িয়েছে “অভিমন্যু বাবু” হয়ে। এই সময়ে ধুম্রজ্বালের ভিতর দিয়েই ওর নজরে পড়ল পার-হারের নোটিশ বোর্ডটার দিকে। আশ্চর্য তো, ভাবল অভিমন্যু, এতদিন ধরে যাতায়াত করছি এই পথে অথচ এতবড় নোটিশ বোর্ডটা একবারও তো নজরে পড়েনি।

অভিমন্যু পড়তে শুরু করল।

তিন বৎসরের উর্ধ্বে প্রত্যেক ব্যক্তি...

প্রাণীবাচক নামগুলি পড়তে পড়তে ব্যবসায়ী অভিমন্যু ভাবছে, শালা যে কিছুই বাকী রাখে নি। একেবারে হাঁস মোরগ পর্যন্ত। তারপর আবার পিঞ্জরা বদ্ধ পক্ষী।

দীর্ঘক্ষণ গবেষণার পর খেয়াল হল, তাই তো হনুমানটা তো বাদ্ গেছে, আর বাদ্ গেছে, তিন বছরের কম বাচ্চাগুলি। ক্রী পাস পাবার মত তাহলে রইল বাচ্চা আর হনুমান। অবিবাহিত অভিমন্যুর রাচ্চার প্রশ্ন আসে না। একবার ক’টা হনুমান ধরে আনলে কেমন হয়? কে যেন কবে খবরের কাগজ পড়ে বলেছিল, আমেরিকা না কোন দেশ থেকে কয়েক হাজার না কয়েক লাখ হনুমান কিনতে চেয়েছে। কনট্রাক্টটা নিয়ে দেখলে হয়! এখান থেকে বিদেশে কিছু পাঠাতে হলে এই খেয়ালতো শালা পার হতেই হবে। কমছেকম হাজার খানেক হনুমান চাই। বহুৎ আচ্ছা! এক গুলি, দুই পাখি! ঘাটোয়াল শালা আচ্ছা জঙ্গ হবে তো। অভিমন্যু আপন মনেই ঋণিক হেসে নিল।

বিড়িতে শেষটান দিয়ে তলানিটা সজোরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে ব্যবসায়ী অভিমন্যু পড়ায় মন দিল। হঠাৎ একসময় স্তম্ভিত বিন্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল অভিমন্যু; প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আট আনা! এঁ্যা! মরলেই কি শালা দাম বেড়ে যায় মানুষের!

কাঠের হাতবাক্সে হেলান দেওয়া নিমাদ্-কণ্ডুয়ণরত বৃহৎ বপু ঘাটোয়াল বাবুকেই প্রশ্ন করল অভিমন্যু: ইঁ্যা মশাই, জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মরা মানুষের দাম বেশী হল। পশ্চিমা ঘাটোয়াল বাবু অভিমন্যুর বঙ্গ ভাষার মর্মোদ্ধার করতে না পেরে বোকা বোকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কুহ বোলা বাবু?’

অভিমন্যু রাষ্ট্রভাষার শরণ নিল।

‘বৃষতে পারতা নেহী? বলি, জিতা আদমীকা ভাড়া এক আনা, আর মরা আদমীকা ভাড়া আট আনা, কাহে হোতা হায়?’

সিনেমা দেখে দেখেই রাষ্ট্র ভাষাটা আয়ত্ব করে ফেলেছে অভিমন্যু।

ব্যাপারটা বুঝল ঘাটোয়ালবাবু। হেসে বলল, ‘তা বাবু, আপ যবত্‌ক্ জিন্দা রহা, এক আনাসেই হোগা, আট আনা আপকো কতী নেহী দেনা পড়েগা।’

কথাটা ভাল লাগল না অভিমন্যুর। শালা কি ঠাট্টা করল নাকি? গর্জে উঠল অভিমন্যু, ‘আমি দেব না কি তোমার বাবা দেবে?’

ঘাটোয়াল তেমনই হেসে বলল, ‘হামার বাবা কাহে, মালুম আপকো বাবাই দেগা।’

‘কী বললি বেল্লিক, তোর তো সাহস কম নয়।’ চোখ রাঙিয়ে রুখে উঠল অভিমন্যু।

ঘাটোয়াল একেবারে তত্ত্বকথায় এসে পড়ল এবার, ‘জনম-মরণ কা বাত্‌ কি কই ঠিক সে বাৎলাতে পারে বাবু? কোন জানতা কব্‌ কিসকা সমন্‌ আয়গা?’

মরণাপন্ন পিতৃদেবকে স্মরণ করেই হয়তো। অভিমন্যুর ক্রোধটা এত প্রচণ্ডরূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল। ঘাটোয়ালের তত্ত্বকথা শুনে অভিমন্যু তখন ল্যাজ ধরা সাপের মত ফৌস ফৌস করছে। ঘাটোয়াল তেমনই বোকা হাসি মুখে বলছে, ‘ওহি ত্তো শেষ খেয়াবাবু। তাই...

‘তাই বুঝি শেষবারের মত জন্মের মত উশুল করে নিতে চাও? যতো সব...। বলি, ধোঁ শালা, দুনিয়া-দারী থেকেই ফ্রী হয়ে গেল তাকে তোমরাও না হয় শেষবারের মত ফ্রী পাশ দিতে। তাতে পুণ্য হত।’

‘পুণ্য তো কুছ, কুছ, হোতী ছায় বাবু। সারে জিন্দীগি ভর সাধন-ভজন করে ভী বহুৎ আদমী কা গঙ্গা-প্রাপ্তি নহী হোতা, লেকিন হাম তো শ্রিক্ আঠ আনায়...

বাটোয়াল বাবুর তত্ত্বকথা শেষ হবার আগেই খেয়া নৌকাটা এসে ঘাটে ভিড়ল। অভিমন্যু উঠে পড়ল এক লাফে।

* * *

ভরাপালে তীব্রগতিতে ছুটে আসছে একখানা

হাজারমণী বজরা। একে বন্যার উদ্দাম শ্রোত, তার উপর হঠাৎ শুরু হল একটা ঝোড়ো হাওয়া। বহুৎ কসরৎ করেও বাঁচান গেল না খেয়া নৌকাখানা। মূর্তিমান হিংস্র জন্তুর মত যেন ঝাপিয়ে পড়ল বিশাল বজরাখানা ক্ষুদ্র খেয়া নৌকাটার বুকের উপর। যাত্রীদের আর্ত চীৎকার মুহূর্তে তলিয়ে গেল মৃত্যুর অভলে।

ছুই তীরের অসংখ্য মানুষের হৈ-হৈ হাহাকারের মাঝে গঙ্গা লাভ করল খেয়ানে-কাখানা জনাত্মশেক যাত্রীসহ।

অ-সাঁতারু অভিমন্যু পাতালপুরীর অন্ধকার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে হয়তো এই মুহূর্তে ভাবছে, ঘাটোয়াল শালা আচ্ছা ঠকেছে এবার। এক আনাতেই.....।’

আলোচনা

পাঠকের মতামত

প্রবর্তক সম্পাদক সমীপে—

দীর্ঘকাল ধরে ‘প্রবর্তক’ মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপনার জ্ঞানগর্ভ ও অব্যাহত স্রষ্টামণ্ডিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাশ্রুত। বহু পত্র পত্রিকা পাঠের সুযোগ আমার হয়ে থাকে। ধর্মীয় সংস্থা-সমূহের মুখপত্রগুলিতে বটেই। কিন্তু আপনার প্রবন্ধে চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাই তা বর্তমান সময়ে অবশ্যই হ্রাস। বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তা-ধারার সঙ্গে ভারতীয় ঋষিদের প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত চিরন্তনী ভাবধারার যে তুলনা মূলক আলোচনা আপনি করে চলেছেন তা ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

‘অথাৎ: অর্থজিজ্ঞাসা’ এই পর্যায়ে আপনি কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য তা আপনার মনীষার আলোকে প্রদীপ্ত। ‘পৌষ’, ১৩৮১ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি।

সমাজে যে নীতি বা দুর্নীতি আজ পরিব্যপ্ত তার বিরুদ্ধে আপনি তীব্র কষাঘাত করেছেন।

তথাপি কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। প্রবন্ধের ৩১৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সারি-ব দ্বিতীয় স্তম্ভে আপনি লিখেছেন, ‘স্বাধীন ভারতে..... কাম কাঞ্চন হইয়াছে অপাংক্ষেয় পরিত্যজ্য। বস্তুতাত্ত্বিক জীবনধর্ম অবিভা বলিয়া হইয়াছে অস্বীকৃত।’ মনে হয়েছে এখানে বক্তব্য-টির আরো পরিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আধুনিক কালে কাঞ্চনের কোলিন্দ ও জয়জয়কার অনস্বীকার্য। আজ মানুষ স্বর্ণ মারীচের পশাতে দ্রুত ধাবমান হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ স্বর্ণলক্ষ্য স্থপ্তির বাসনায় উন্মাদ। ফলে বস্তুতাত্ত্বিক জীবনধর্মকে তো উপেক্ষা করা হচ্ছে না। হতে পারে কোন কোন সাধক বা ধর্মসংস্থা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জগ্রে বস্তুতাত্ত্বিক জীবনধর্মকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু সমাজে তার প্রতিফলন কতটুকু! এবারে যে কথাটি আসছে তা হলো অর্থোপার্জন করা অরুচিই প্রয়োজন কিন্তু তার প্রয়োগ-

বিধি কেমন হবে সে সম্পর্কে আমরা সজ্ঞানভাবেই উদাসীন। শাস্ত্রে বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে অপরা-বিদ্যা বলা হয়েছে, যেহেতু তার সাহায্যে লাভ করা যায় না প্রজ্ঞান। এই প্রজ্ঞানের সাহায্যে হিরণ্য পাত্রের উপরকার ঢাকাটিকে খুলে ফেলে অভ্যন্তরস্থ সত্য স্বরূপকে দর্শন করা যায়। তাই অধ্যাত্ম বিদ্যাকে বলা হয়েছে পরা-বিদ্যা। উভয়ের সমন্বয় সাধন ঘটছে না বলেই জড় বিজ্ঞানের মন্বনে ক্রমেই সহস্র কালীয়নাগের সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞান মুখে যতই বড়াই করুক না কেন, অন্তরে তার তীব্র বিষের জ্বালা। ঈর্ষ্যা, ঘেহ, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, পরিশ্রী-কারতা, ভয় ইত্যাদি বিষ মানুষকে জর্জরিত করছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই প্রবন্ধের ৩১২ পৃষ্ঠায় সমাজতন্ত্রকে কটাক্ষ করছেন। আপনি বলেছেন, ‘এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের শোষণ পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের জন্ম—ব্যক্তি সেখানে নগণ্য, প্রায় শূন্য—রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রাণহীন, বাণীহীন অংশবিশেষ।’ প্রথমেই কার্লমার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ এর ‘Manifesto of the Communist Party থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি— ‘We Communists have been reproached with the desire of abolishing the right of personality acquiring property as the fruit of a man’s own labour, which property is alleged to be the ground work of all personal freedom, activity and independence, (Foreign Lang. Pub. House, Moscow, 1953, P69)

এই গ্রন্থেরই ৭২ পৃষ্ঠায় আছে, ‘From the moment when labour can no longer be converted into capital, money or rent, into a social power capable of being monopolised, i.e from the moment when individual property can no longer be transformed into bourgeois property, into capital, from that moment, you say, individuality vanishes’

সংঘগুরু শ্রীমতিলালের দৃষ্টি ব্যাপকতর। তিনিও চাননি ব্যক্তিমালিকানার সৃষ্টি হোক, অর্থ পুঞ্জীভূত হোক ব্যক্তিবিশেষের সেফলকারে, ব্যাঙ্কের খাতায় বা কালো আবরণের তলায়। তিনি বলেছেন, ‘প্রবর্তক সন্তোষাত্মকতার ক্ষেত্র নয়। ধর্মকে তারা জীবন দিয়ে গ্রহণ

করেছে। তাদের কেউ নেই—পিতা নেই, মাতা নেই আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। সর্বহারা তারা। যাদের কেউ আছে, তাদের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, এ ক্ষেত্র তাদের নয়।’ (বাণী ও রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৩)

সংঘগুরু বলেছেন, ‘অর্থ পরমার্থ। অর্থ পরমার্থেরই symbolic expression, একথা বৈজ্ঞানিকগণও অস্বীকার করবেন না। অর্থ—পৃথিবীর কল্যাণের জ্ঞান। এ সত্য যারা উপলব্ধি করতে না পারবে, তারা অর্থের অপব্যবহার করবে।...প্রবর্তক সংঘের, সর্বহারার দল অর্থোপার্জন করেছে স্বীয় স্বার্থের জ্ঞান নয়, সমাজের কল্যাণে।’ (বাণী ও রচনাবলী, ১ম, পৃ ২৩২)।

সংঘগুরুর ‘সর্বহারার দল’ যদিও উন্নততর অর্থে প্রযোজ্য, তথাপি এখানেও লক্ষ্যণীয় প্রবর্তক সংঘ অর্থোপার্জন করবে কিন্তু সেই অর্থ ব্যক্তিবিশেষের হবে না। যদি তা হতো তা’হলে এই সংঘ একটি ক্যাপিটালিষ্ট সংঘে পরিণত হতো। অর্থের সদ্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না, অর্থায় সংগৃহীত অর্থের স্তম্ভ বণ্টন হয় না। ফলে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই বাঁধে, দাসত্ব প্রথার সৃষ্টি হয়। জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে। বোধ করি এজন্যই কার্ল মার্কস বলেছেন, ‘The capitals increase in number and extent. The numerical increase of the capitals increases the competition between the Capitalists. The increasing extent of the Capitals provides the means for bringing more gigantic instruments of war into the industrial battlefield. (K. Marx, Wage labour and Capital, 1952 edn, P 60)

রামায়ণ, মহাভারতে দেখা যায় যদিও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহলেও রাজারা তাঁদের কোষাগার অনেকটা উন্মুক্ত করে দিতেন জনসাধারণের জন্যে। পরবর্তীকালে অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি কালজয়ী সম্রাটদের ব্যক্তিগত ইতিহাসও একই কথা বলে। কিন্তু ভারতেও কি সর্বসময়ে ধনের সমবণ্টন ব্যবস্থা মেনে চলা হতো? পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করলে দেখি তখন দেশে চলছিল ‘মাৎস্যনায়।’ জনগণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ। ধনীদের অত্যাচার ও অবিচারে

দেশ জর্জরিত। ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি হলো। জন-প্রতিনিধি রূপে এলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'গোপাল'। আরো অতীতে ফিরে যাই। মথুরার রাজা উগ্রসেন ছিলেন জনমুখ্যদের প্রতিনিধি। কিন্তু কংস! অহঙ্কার, মদ ও মাংসখর্বের প্রতিমূর্তি কংস অত্যাচারী, নৃশংস ছিলেন। রাজার হাতে রয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। ফলে দেশের জনসাধারণের উপরে পড়েছিল অসহ্য করভার এবং আরো অনেক অবিচার। অর্থায় যার সাহায্যে বা যাকে ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিল। ফলে আবার বিপ্লব হলো। সেই বিপ্লবের নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পার্শ্বদ শ্রীবলরাম এবং উদ্যোক্তা যাদব ও বৃষি বংশোদ্ভূত জনমুখ্যরা, সমস্ত নরপতিরা এবং অত্যাচারিত জনগণ।

তাই দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে রাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র যেমন ভাল কাজও করেছে, তেমনি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহারও করেছে। যেমন ক্ষমতার লড়াইতে দুর্বোধ্যন যুদ্ধিগাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে করলে গৃহহারা। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকা সত্ত্বেও ধ্বংসাত্মক বা দুর্বোধ্যনের চৈতন্য হলো না। অবশ্য রাজা হিসেবে দুর্বোধ্যনের প্রজার উপরে অত্যাচারের কথা মহাভারতকার বলেছেন বলে মনে হয় না।

তবে একটা কথা আপনি যথার্থ বলেছেন; রাষ্ট্র যদি যন্ত্রে পরিণত হয় তাহলে মানুষ প্রাণহীন হবে! অর্থাৎ সেখানেও আসবে mechanisation। রিলিজিয়ন আর ধর্ম এক নয়। রিলিজিয়নকে বলা যেতে পারে উপধর্ম। তার ব্যাপ্তি অনেক কম। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য। সাম্রাজ্যভূমিতে রিলিজিয়নের নামে চূড়ান্ত ব্যক্তিচার চলেছিল একসময়ে। গীর্জা থেকে ধর্মযাজকেরা নিজেদের খুশিমত অনুশাসন দিয়ে বহু অনর্থ ঘটিয়েছেন, বিরুদ্ধ-পক্ষকে সরিয়ে দিয়েছেন পৃথিবী থেকে। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আমাদের দেশেও কি ধর্মের নামে অত্যাচার চলেনি? আসেনি কি ক্রোধ, পঙ্কিলতা জনজীবনে? কিন্তু ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর অত যে কোন রাষ্ট্রের তফাৎ হলো—এখানে সাধুদের মধ্যেও যখন প্রানিএসেছে

ভারত আত্মার ভিত্তি উঠেছে ন'ড়ে, তখনই আবির্ভাব ঘটেছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের, হয়েছে ঈশ্বরের মহাবতরণ স্থল-দেহে। অন্য কোন দেশে এমনটি হয়নি। সমগ্র পৃথিবীর সহস্রার ভূমি হলো ভারত। ভারতের ধর্মের মূল বক্তব্য ধরতে পারেন নি বিদেশী পণ্ডিতেরা।

তাই দেখি কার্ল মার্ক্স বলেছেন, 'Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the spirit of soulless stagnation. It is the opium of the people.'

ভারতের সনাতন ধর্ম নিষিদ্ধিতের জন্তেই নয়, সর্বমানুষের জন্তে, সর্বকালের জন্তে। আমাদের দেশে দেবতা আমাদের আত্মীয়। তিনি দূরসম্পর্কীয় নন। বেদ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত, উপনিষদ, বেদান্ত সর্বত্র রয়েছে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার মহামন্ত্র। আহা, নিদ্রা, মৈথুন, ইত্যাদির দ্বাচ্ছন্দ্য বিধান হলেই জীবনের পরম প্রাপ্তি হয় না। একারণেই সোবিয়ত রাশিয়াতে আজ নতুন করে গীর্জা তৈরী হচ্ছে; স্ট্যালিনের মৃত্যু এবং ক্রুশ্চেভেভ পতনের পরে ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে।

লেনিন রিলিজিয়ন সম্পর্কে আরো নির্ঘম ছিলেন, হয়তো তাঁর দেশের পরিস্থিতি তাঁকে তেমনি হতে বাধ্য করেছে অথবা এমনিতেই। তাঁর ভাষ্য হচ্ছে—

'Religion is the opium of the people... Religion is a kind of spiritual gin in which the slaves of capital drown their human shape and their claim to any decent life'. (Sochineniya, vol 10. p66).

বলতে বাধ্য হচ্ছি লেনিন ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। কিছুসংখ্যক ছনীতি পরায়ণ মানুষ ধর্মের নামে ছনীতি চালাতে পারে, বিজ্ঞানের বেলাতেও একই কথা। লেনিনের মুখে শোনা যায় 'Every religious idea, every idea of God, even flirting with the God is unutterable vileness' (Sochineniya, vol. 35, pp 89-90')

তিনি সমস্ত ধর্মের মধ্যে দেখেছেন প্রতিজ্ঞাশীল বৃজোয়াদের প্রেতাত্মা, যারা শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করবে। ছাড়া রোগ হলে যেমন সবাই চোখে হলুদ

দেখে, তেমনি মানুষের পুঙ্খলিয়ের বাইরেকার বোধিকে অস্বীকার করে বলেছেন, 'We deny all morality that is drawn from some conception beyond men, beyond class. We say that it is a deception ... a fraud and a stultification of the minds of the workers and peasants in the interest of the land owners and capitalists' Ibid, vol 31, pp 266-268)

লেনিনের ধারণা ছিল না যে ধর্ম আত্মাশীল মানুষ ধর্মের সমবর্টন করবার জন্তেও উদগ্র হতে পারে। ভোগ ও ত্যাগের মহান আদর্শের যে বাস্তব প্রয়োগ ভারতে হয়েছিল সেই ইতিহাস তিনি জানতেন না। তাই তাঁর কাছে যে কোন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো লোক ঠকিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। একারণেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'The social oppression of the toiling masses, their apparent complete helplessness before the blind force of capitalism... that is the deepest contemporary root of religion' (ibid, vol 15, pp 374—375)।

১৯১৯ সালে পার্টির প্রোগ্রামে লেনিন ধর্মের বিরুদ্ধে বিবোধকারী তুলেছিলেন। যুদ্ধের পরবর্তীকালে চার্চ এবং ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল বিনা যুক্তিতে। আলেকজান্ডার সলঝেনৎস্টিনের 'A day in the life of Ivan Denisovich'-এ বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ব্যাপটিস্টদের চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছে। কারণ কি? সলঝেনৎস্টিন লিখেছেন, 'All they did was pray to God. And were they in anybody's way? They all got twenty-five years.' ঈশ্বরকে মানার অপরাধে কারাদণ্ড! এটা পাশ্চাত্যেই সম্ভব।

মাত্র মনে করতেন, জীবনে অস্বাচ্ছন্দ্য হলেই ধর্ম এসে জুড়ে বসবে। কাজেই যদি সকলের জীবনধারণের পথ জগম হয় তাহলে সত্যিকারের মার্ক্সপন্থীদের কাছে ধর্ম মৃত বলে মনে হবে। কিন্তু তা হয়নি সোবিয়তের কড়া অনুশাসনের মধ্যে থেকেও রাশিয়ার বিখ্যাত কবি পাস্তেরনাকের জীবনে ধর্মের অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমনকি

স্ট্যালিনের নিজের মেয়ে পর্যন্ত বহু বছর বয়সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, এথেনিস্ট আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও রিলিজিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

একদিন লেনিন বলেছিলেন সদৃশে, 'We demand that religion should be a private matter as far as the State is concerned, but under no circumstances can we regard religion as a private matter as far as our own party is concerned'. (Lenin, Schineniya, vol. 10, pp 66—68

রাশিয়াতে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন সেখানকার রিলিজিয়ন এবং চার্চ ইয়তো গোঁড়া ও কুসংস্কার যুক্ত ছিল। তার জন্তে লেনিনের ক্রোধ থাকে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁর বক্তব্য সর্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির (Komsomol Central Committee) তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বীকার করত্রে বাধ্য হয়েছিলেন, 'young boys and girls have come under the influence of religion; (Pravda, Oct 7, 1952) এরপরে নানাভাবে ধর্মসংস্কার উপর পীড়ন করা হয়েছে। তার প্রমাণ Literaturnaya Gazeta, Jan, 21, 1964 ; Pravda Ukrainy, Oct 20, 1960 ; Izvestiya, June 7, 1963 ইত্যাদি নানা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়তে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। Nauka Religiya অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ধর্ম পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (1959) আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট কুকার্বিন চাঁদে সোবিয়ত রকেট পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে লিখেছিলেন, স্বর্গের কোন অস্তিত্ব নেই। এর দু'বছর বাদে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, 'আমরা যাজকদের কাছে স্বর্গের কথা অনেক শুনতে পাই। কিন্তু যুরি গাগারিন যদিও মহাশূন্যে চকর দিয়েছে কিন্তু নিঃসীম অন্ধকার ছাড়া কোন স্বর্গের সন্ধান সে পায় নি। এর পরে

জার্মান টিটভকে পাঠানো হলো। সারাদিনের প্রোগ্রাম দিয়ে। কিন্তু সেও গাগারিনের মতোই বললো 'মহাশূণ্ডে কিছুই নেই।' (প্রাভদা, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

হাস্যকর ব্যাপার যে নভোচারী টিটভকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় (১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে), তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি না। উত্তরে টিটভ বলেন, তিনি মহাশূণ্ডে কোন ঈশ্বরকে দেখেন নি। অতএব সিদ্ধান্ত হলো ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ বলেন, কার্য-কারণবিধির একটি প্রধান নিয়ম হলো তা সীমিত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে প্রযোজ্য। কিন্তু পারমাণবিক জগতে সীমাবদ্ধ, এমনকি আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ জগতেও কোন ঘটনাবলী এর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপরেই যদি কার্যকারণবিধি প্রযোজ্য না হয় তাহলে যে বিশাল জগৎ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে আছে সেখানে কিভাবে তা কার্যকরী হবে? তাই দেখি বিশ্ববরণ্য বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক বলেছেন, 'মানুষের স্বেচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর মধ্যে কিভাবে কার্যকারণবিধি নিহিত আছে তা সাধারণ মানব বুদ্ধির অগোচর হলেও উচ্চ-মার্গের কোন কার্যকারণবিধির সাহায্যে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন কোন মহামানব নিঃসন্দেহে বুঝে নিতে পারেন।' এখানেও চৈতন্য-সত্তার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'অর্থ' অবশ্যই প্রয়োজন তবে আমরা যেন অর্থের দাসত্ব না করি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সব কটিকেই ভারতীয় শাস্ত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে রাখা হয়েছে। আপনি যথার্থই বলেছেন, খণ্ডিত সত্যের মোহে পড়ে আমরা দিশেহারা। মোহমুগ্ধতারে আছে 'অর্থমনর্থম্,

ভাবয় নিত্যম্।' কথাটি একদশদের্শী। এর বিশ্লেষণ এমনভাবে হলে ভাল হয়, অর্থ তখনই অনর্থ আনে যখন তার সদ্যবহার হয় না। যে দেশে ধন-দৌলত নেই, সে দেশ উৎসরে যায়। বিখ্যাত ভারত সন্ন্যাসী 'বিষ্ণুরণ্য স্বামী'র জীবনেতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় ধর্মরাজ্য বিজয় নগর প্রতিষ্ঠার সময়ে হরিহর ও বৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি দিয়েছিলেন দৈবী সম্পদ। জগন্মাতা দিয়েছিলেন অগণিত স্বর্ণমুদ্রা যার সাহায্যে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক বিরাট রাজ্য। যেখানে প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র সেখানেও যদি ধন উপার্জনে অপ্রবৃত্তি দেখা যায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে অপরাধ। দেশের সব মানুষ যদি এই নির্দেশে চলে তাহলে তার গতি রুদ্ধ হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাকে জর্জরিত হতে হবে।

শুধু পরা বিদ্যা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। আবার কেবল মাত্র অপরা বিদ্যাকে নিয়ে মেতে থেকোও পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশ্বে শান্তি আনতে পারে নি, বরং ধুমায়মান হয়ে উঠছে তীব্র অসন্তোষ। যে কোন মুহূর্তেই আন্তর্জাতিক ক্ষেপণাস্র, হাইড্রোজেন বোমা, পারমাণবিক বোমা সত্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু কেউ চায় না অবলুপ্ত হোক এই মানব সভ্যতার। তার জন্ত প্রয়োজন পরা ও অপরা বিদ্যার সুষম সমন্বয় সাধন। এই পন্থা রয়েছে ভারতের সনাতন শাস্ত্র সমূহে। তাকে সঠিকভাবে অমুসরণ করতে পারি নি বলেই এই বিপত্তি। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই মহাজিজ্ঞাসাবে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। আপনার লেখনীতে প্রজ্ঞা সরস্বতী আবির্ভূত হোন। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে। বিনীত

(ডক্টর) অমিয়কুমার মজুমদার

সজ্জ সংবাদ

আশ্রমী

শ্রীশ্রী সজ্জজননীর ৮৫তম আবির্ভাবোৎসব

কেন্দ্রসভ্যে বিগত ৬ই আষাঢ় ১৩৮২ (ইং ২১শে জুন ১৯৭৫) পরমারাধ্যা সজ্জজননী শ্রীশ্রীরাধারানী দেবী ৮৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৮৫ বৎসরে পদার্পণ করেন। এই পুণ্যক্ষণটিই দেবী রাধারানীর মহা-আবির্ভাবের-স্মরণপর্ব। সজ্জ সন্তান-সন্ততি এই দিনটিতে মাতৃদেবীর বিশেষ শ্রদ্ধা মননের ব্যবস্থা করেন আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া। এতদিন এই আবির্ভাবোৎসব কেন্দ্র পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিগত তিন বৎসর ধরিয়া উৎসবটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় সজ্জের অন্যান্য স্থানেও সনিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এতদিন সজ্জ দীক্ষার জন্ম ধার্য ছিল বৎসরে একটি দিন—২২শে পৌষ শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের জন্ম দিনে। গত বৎসর হইতে ৬ই আষাঢ়ও দীক্ষার দিন ধার্য হওয়ায় উৎসবটি অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। এই বৎসর এই দিনে ৫ জন সহযোগী দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে বাংলাদেশের শ্রীমিহিরকুমার আদিত্য ও শ্রীমতী ভারতী আদিত্য; কলিকাতার শ্রীরতনকুমার দাস ও শ্রীমতী বুলারানী দাস এবং উট্টো-ডাঙ্গার শ্রীমতী বুলারানী নন্দী।

এই উপলক্ষ্যে ৫ই আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সজ্জ-মন্দিরে সঙ্গীত, সমবেত উপাসনা, ধ্যান, সজ্জবাণী পাঠ, মাতৃজীবনী আলোচনা, মায়ের কথা পাঠ, ও মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতি সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানের পর আশ্রমের দীক্ষাক্ষেত্রে দীপদান করা হয়।

পরদিন ৬ই আষাঢ় শনিবার প্রাতঃ পাঁচঘটিকায় সজ্জ-মন্দিরে সমবেত উপাসনা। উপাসনার পূর্বে অষ্টোত্তরশত মাতৃনাম জপ ও উপাসনা। শেষে সজ্জবাণী পাঠ করা হয়। পরে সজ্জজননী দেবী রাধারানীর বিশেষ পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

বেলা নয় ঘটিকায় আশ্রমে দীক্ষায়জ্ঞ। যজ্ঞ সম্পাদন করেন সজ্জ-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। তৎপরে দ্বিতলে সজ্জগুরু তবনে সজ্জসভাপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদান। দ্বিপ্রহরে সজ্জ-মন্দিরে ভোগারতি। তৎপরে

প্রসাদ গ্রহণ। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আশ্রমে সমবেত উপাসনান্তে উৎসব-সভা। সভাপতিত্ব করেন সজ্জ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।

কেন্দ্রতীরে মাতৃ আবির্ভাব উৎসব এইবার এই ভাবেই সমাপ্ত হয়।

সজ্জের অন্যান্য শাখা আশ্রম যেমন হুন্দরবন, দফরপুর, নববারাকপুর, রাঘনা প্রভৃতি স্থানেও দীক্ষাবাদে কেন্দ্রসজ্জের অনুরূপ স্ব-স্ব ক্ষেত্রানুযায়ী সামান্য পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করিয়া মাতৃউৎসব সম্পন্ন হয়।

আশ্রম ব্যতীত দীক্ষিত সহযোগী সভ্য-সভ্যারাও সমবেতভাবে নানাস্থানে নানাভাবে সজ্জজননীর আবির্ভাব উৎসব সুসম্পন্ন করেন।

তন্মধ্যে বাংকুলা ও কাকিনাড়ার উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংকুলায় দীক্ষিত সহযোগী সভ্য-সভ্যাবৃন্দ সমবেতভাবে শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাসের গৃহে মহা-সমারোহে সজ্জজননী দেবী রাধারানীর আবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন করেন। ৫ই আষাঢ় তাঁহারা ৮৫টি দীপ জ্বালাইয়া মাতৃদেবীর আবাহন করেন। ৬ই আষাঢ় যথোচিত পূজা ও ভোগ নিবেদন করিয়া গ্রামস্থ রহ নরনারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্ন প্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তিমতী শ্রীমতী নিভারানী দাস উপবাসী থাকিয়া স্বহস্তে ভোগ রান্না করেন। সন্ধ্যা হইতে পরপর দুইদল কীর্তনীয় কীর্তন করেন রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যন্ত। কীর্তনীয়ারাও কীর্তনান্তে মাতৃপ্রসাদ পাইয়া অশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

কাকিনাড়াতেও অনুরূপভাবে মাতৃআবির্ভাবোৎসব সুসম্পন্ন হয় শ্রীপ্রভাতকুমার মজুমদারের গৃহে। ভক্তিমতী শ্রীমতী রমারানী মজুমদার এই উৎসবের প্রধান ধারিক। তিনিও উপবাসী থাকিয়া ভোগ রান্না করিয়া মাকে নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় তাঁদের গৃহে স্থানীয় সকল দীক্ষিত সহযোগী সভ্য-সভ্যাবৃন্দ সমবেত হইয়া উপাসনা, মাতৃকথা ও মাতৃজীবনী আলোচনান্তে ভক্তিমূলক গান হয়। রাত্রে সকলকেই মাতৃপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চটল স্মৃতি-সমীক্ষা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে

[প্রবর্তক কমর্শিয়াল কর্পোরেশন লিঃ-এর অগ্রতম ডাইরেক্টর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে
এজেন্সী অফিস চালু করার উদ্দেশ্যে গত ২৩শে মে, ১৯৭৪ বিমানযোগে ঢাকা উপস্থিত হন। সেখান থেকে ২৯শে
মে চট্টগ্রাম পৌঁছান এবং ছুদিন প্রবর্তক সন্ম-আশ্রমে অবস্থান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রঃ সংঃ]

ভগবান সজ্জগুরুদ্বীর লীলাক্ষেত্রের অগ্রতম চট্টগ্রাম। ১৯৫১ সনে একবার দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন
আশ্রম সজ্জগুরু-প্রচুরে মুখর ও ভরপুর ছিল। বিগত
'৭১ সনের মহাক্লিষয়ে যে নিদারণ মর্মভুদ বিয়োগান্ত
নাটক ঘটেছে তাতে মনপ্রাণ ভেঙ্গে পড়ে। দীর্ঘ
দিনের ব্যবধানে অনেক কিছুই ঘটেছে—ঘটেছে
কল্পনাভীত পরিবর্তন। তথাপি একটা আগ্রহ সেই
সুন্দর পাহাড়ঘেরা লীলা-ক্ষেত্রটিকে দেখার। গত
২৯শে মে বুধবার সকালে ঢাকা থেকে গুরু-ভাই
রামমোহন চৌধুরী সহ বাসে রওনা হয়ে বিকালবেলা
আশ্রমে উপস্থিত হলাম।

পুরোনো দিনের সেই স্নেহ সাদর আত্মান না
থাকলেও একটা সখী সশ্রদ্ধ সাগ্রহ অভ্যর্থনা আমাকে
মুগ্ধ করলো। প্রাণ-পুরুষেরা কেহ নাই, কিন্তু তাঁদের
স্মৃতি আর অনুভূতি সমগ্র আশ্রম-অঙ্গন ভরে আছে।
মেঘলা দিনে একটা ক্রন্দন আমাকে বার বার ভারাক্রান্ত
করে তুললো। সংজ্ঞা সুরল সহাস্ত ছুটি অকৃত্রিম নিষ্ঠাবতী
সেবারতা ভগ্নি শ্রীমতী মীরা সিংহ ও বরণাধারা চৌধুরী
আমাকে যেভাবে গ্রহণ করে নিল তাতে মুগ্ধ হলাম।
যেন কত আপন জন—কত দিনের পরিচয়!

মীরা ও বরণা তাদের হাতের কাজ রেখে দিয়ে
আমাকে সঙ্গে করে প্রথমে আশ্রমের মন্দির প্রদক্ষিণ
করতে নিয়ে গেল। মন্দির অভ্যন্তরে যে বেদী রয়েছে
তাতে একটা ঘণ্টাঘাট ব্যতিক্রম দেখলাম—তিন
ধাপের বদলে দুটি ধাপ। মীরাকে তিনটি ধাপ করতেই
বলে দিলাম। সেই মন্দির ও বক্ষিমদার বাস ভবনের
মধ্যস্থানে পাঁচতলের (বক্ষিমদা, হরিশদা, নন্দা,
অষ্টতদা ও যোগেশদা এঁরা পাকিস্তানী জহাদের
হাতে এক সঙ্গে নিহত হন) স্মৃতি সংরক্ষণ কাজে
শহীদবেদীর কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। সাক্ষ্য নেত্রে

সংয ভাইদের বেদীতে আমর শ্রদ্ধা ও প্রণতি
রাখলাম।

বক্ষিমদার ও হরিশদার বাসগৃহে তাঁদের চিত্রপট স্থাপন
করে স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্রমে স্কুল, লাই-
ব্রেরী গৃহ দেখে সিঁড়ি পথে অগ্র পাহাড় অতিক্রম করার
সময় বীরেনদার বাসগৃহটি দেখলাম। বীরেনদার
মানসকন্যাদয় ঐ গৃহকে শুধু নহে, পাহাড় শীর্ষকে একটা
বিশেষ দৃষ্টব্য ও পুণ্যক্ষেত্র হিসাবে আশ্রম-অঙ্গনে রক্ষা
করার ব্যবস্থা নিয়েছে। সুন্দর গৃহটির অভ্যন্তরে একটা
শয্যা-সমন্বিত খাটের ওপর বীরেনদার ফটো। তাঁর
সামনে সত্তা ফুলের তোড়া। নিত্য সেখানে উপাসনার
ব্যবস্থা আছে। একজন রক্ষক নিযুক্ত রয়েছে। সত্যি
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদ্বয়কে কত মহিমামণ্ডিত করে
তুলতে পারে তার পরিচয় পেলাম।

অতঃপর আমরা আরোগ্য-নিকেতনে উপস্থিত
হলাম। নিখুঁত ব্যবস্থা—কটি কোথাও নাই।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেবার আন্তরিকতার সাক্ষ্য
সর্বত্র। হাতমুখ ধোয়াপর্ব শেষ করে আমরা মৈত্রেয়ী-
ভবনে গেলাম। মৈত্রেয়ী ভবন ছাত্রী ও সদন-কন্যাদের
বাসভবন। সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। পরিবেশ উদার ও
সবুজে ভরপুর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জ্ঞাও ব্যবস্থা
রয়েছে। উপরের তলায় গিয়ে দেখলাম সমবেত প্রার্থনা
মন্দির। ত্রিবেদীর ওপর প্রণব বিগ্রহ। মন্দির সংলগ্ন
অলিন্দে আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হল। তখন
সাক্ষ্য উপাসনার সময়। প্রকৃতি পর্বের অবসরে কিছু-
ক্ষণের জ্ঞা মীরা তার শয়ন গৃহে বসার ব্যবস্থা করে
দিল। সুসজ্জিত ঘর। শুধু বই আর বই! সমবেত
সাক্ষ্যোপাসনা শুরু হল। মীর-ই হারমনিয়াম যোগে
উপাসনা পরিচালনা করলো। ভাবগভীর পরিবেশ।
শান্তি ও আনন্দে সবখানি সত্তা ভরে উঠল। উপাসনান্তে

সুন্দর ভাগবত সঙ্গীত মীরাই করল। তৎপর সমবেত মাতৃসঙ্গীত ও কীর্তন। আমি যেন সেই পুরাতন আশ্রমেই ফিরে গেছি মনে হলো—শুধু নাই আমাদের সংঘ ভায়েরা কেহই। মীরার অনুরোধে আমাকে মেয়েদের নিকট কিছু অনুভূতি প্রকাশ করতে হলো। প্রথমেই সংঘের অগ্রজদের এমন মর্মান্তিক অন্তর্ধান বলতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সকলের মঙ্গল কামনা করে সাধনার অঙ্গ হিসাবে গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম প্রভৃতি ত্রয়ীর কথা বলে তাদের যোগ্য পরিচালিকাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

উপাসনার পর্ব শেষ করে ওদের ভোজন-গৃহ দেখে আমরা আরোগ্য নিকেতনে ফিরে এলাম। মীরা ও তার একান্ত ও অভ্যন্ত প্রাণবন্ত সহকারিণী ঝরণা-ধারার পরিবেশনে রাত্রির আহ্বার পরম পরিতৃপ্তির সহিত সম্পন্ন হল। সারাটা সময় তারা সাগ্রহে অরুণদা, রমণদা চ্যাটার্জিদা, ঘোষদা, ইন্দুদা, নির্মলাদি, রেণুদি এবং অন্যান্য সকলের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। বর্তমানে সংঘের পরিচালনার উত্তরাধিকারী মীরা। ঝরণা এই দুর্ঘ্যোগের দিনে মীরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সাহস, ধৈর্য, ও সেবার জীবন্ত বিগ্রহ সে।

এত প্রশংসনীয় এরা যে এই প্রতিষ্ঠানে তাদের মত এমন আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ঝরণার মত এমন সুনিপুণ সুযোগ্য সহকারিণী পাওয়া শ্রীভগবানের আশীর্বাদই বলতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি তারা সংঘের আদর্শের প্রতিষ্ঠা চায়। তারা একান্তভাবে অরুণদাকে এবং অন্যান্য প্রবীণ সজ্জ-সভ্যদের চট্টলে পেয়ে যেন সার্থক হতে চায়। মধ্যভাগে যেন বিজ্ঞান্টি ঘটেছিল মূলকেন্দ্র হতে আগত সভ্যের ভূমিকায়। এরা নিতান্ত একক অসহায় কর্ণধারহীন। কেন্দ্র হতে অভিজ্ঞ সহানুভূতিশীল, দূরদী ও মরমীর আগমনের প্রত্যাশা তারা করে। অকুতোভয় সংসাহসী সেবাত্রী ও সক্ষমকর্মী মীরা ও ঝরণা। এরা প্রবর্তক সংঘকে ও বীরেন্দ্রার স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখার জন্য চিহ্নিত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পরদিন সকালে মন্দিরে ছাত্র ও কর্মীদের নিয়ে সমবেত উপাসনা হল। সবার অনুরোধে আমায়ও কিছু বলতে হল। আমি সংঘের স্থানা, আক্ষর দীঘির পাড় থেকে গোলপাহাড়ে সংঘস্থিতির ক্রম সম্বন্ধে কিছু বলে বর্তমান পরিচালিকাদের প্রশংসা করলাম। সকলের নিকট আবেদন জানালাম তারা যেন এই নিষ্ঠাবর্তীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে এবং সহযোগিতা করে।

ওদের একান্ত আগ্রহ মূল কেন্দ্রের সঙ্গে একটা আত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখা। মাঝে মাঝে সজ্জগুরু সাক্ষাৎ প্রবীণ সন্তানদের আসা যাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং ওদের প্রত্যাশাও। আমিও তাদের বললাম তারা যেন সতত কেন্দ্র-সংঘের সঙ্গে একটা নিত্য যোগাযোগ রাখে।

অনেক বিদ্য ওরা অতিক্রম করেছে, ঘেরাও, অনশন, গুণাধারা শারীরিক আক্রমণ, স্থানীয় লোকদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেও অসম্ভব মনোবল রক্ষা করেছে এরা।

সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রায় আশ্রমের শুধু পাকা দেওয়াল ছাড়া কিছুই ছিল না,—আজ সমগ্র পাহাড়টি উজ্জ্বল সাজানো গোছানো মনোরম উদ্যান। বিধ্বস্ত শ্মশানের ধ্বংস স্তূপ হতে আজ নূতন স্থিতি-সম্ভব করে তুলেছে এই ছুটি মহিয়সী আদর্শবাদী নারী। জানলাম বাংলাদেশ সরকারও আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, বিশেষ করে বাংলা দেশ সহায়ক সমিতি এবং বৈদেশিক C. O. R. R. (Christian Organisation of Relief and Rehabilitation) প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাহায্যে ও দ্বীয় তত্ত্বাবধানে ভগ্ন-গৃহগুলি পুনর্নির্মিত করা সম্ভব হয়েছে। এই ছুটি মেয়ের স্থিতির প্রেরণা ও উত্তম সর্বত্র বিদ্যমান।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি কেন্দ্র সজ্জ এই সময় সহানুভূতি ও সহযোগিতার সঙ্গে চট্টল কেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ায় সেখানে সংঘের পূর্ব গৌরবই বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা ফিরলাম। পূর্বে মীরা অভ্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সজ্জ-সাহিত্য ও নিত্য পাঠের জ্ঞান গীতা, চণ্ডী, উপাসনা বই চাইলো। শ্রীভগবান ও সজ্জ জননীর হৃদয় হৃদি অতি অবশ্য পাঠাতে বলল। ঝরণা-ধারা জানালো নীচুই কলকাতা আসবে, ঐ সময় চন্দননগর যাওয়া ও কয়েকদিন থাকবে।

মাত্র ছুটি দিন। প্রাণভরা স্নেহ মমতা আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার মধুস্পর্শে চিত্ত আমার অভিভূত—মনে অবিস্মরণীয় রেখাপাত করলো। ফিরবার মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। আশ্রমবাসীর একদিকে যেতে নাহি দিব। অনিচ্ছায়ই বিদায় নিতে হল। করুণ সে বিদায় দৃশ্য। চাপা ক্রন্দনে রুদ্ধ আবহাওয়া।

পাহাড়ীতলীর নীচে ট্যাক্সি ঠ্যাণ্ড পর্যন্ত সবাই সঙ্গে এল। মীরা ঝরণা আবেগে ভেঙ্গে পড়লো। আমি আমার অশ্রু ভরা। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধা নির্বাক। আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম। ট্যাক্সি ছাড়লো। যতক্ষণ দেখা যায় সবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি চলন্ত গাড়ীর দিকে।

সংস্মরণ

From The Corridors of Memory By Sri Rabindra Nath Aditya, M.A.B.L., Published by the Author from Karimganj, Dt. Cachar, Assam.

অনেকদিন বাঢ়ে একটি স্মৃতিস্রাবী নাম শোনা গেল 'From the Corridors of Memory'। স্মৃতিগত গ্রন্থকার প্রাক স্বাধীনতা পর্বে আসামের একজন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ছিলেন। আইনব্যবসার ফলে ধনলক্ষ্মী যখন তাঁর উপরে অজস্র ধারায় ককুণা বর্ষণ করছেন সেই সময়ে দেশমাতৃকার আশ্বাসে তিনি ত্যাগ করলেন অর্থসাধনা, বাঁপিঁয়ে পড়লেন দেশের স্মৃতিমান কর্মে। দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত তিনি আসামে কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির চীফ হুইপ ছিলেন। অবশ্য দেশবিভাগের পরবর্তী অধ্যায়ে ত্রীযুক্ত আদিত্য নানা কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে। শিল্প বিস্তারে মন দিলেন।

জীবনের একটি বিশেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে ত্রীযুক্ত আদিত্য স্মৃতিচারণ করেছেন বিগত জীবনের দিনগুলির। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে মুখ্য স্থান লাভ করেছে আসাম অতি স্বাভাবিক কারণেই, যেহেতু গ্রন্থকার তাঁর জীবনের বসন্ত ঋতুগুলি কাটিয়েছেন দেশের ঐ প্রান্তে। তথাপি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রয়েছে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। গ্রন্থটিতে দুটি প্রধান পরিচ্ছেদ রয়েছে—প্রথমটি ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত (In the throes of Independence) এবং দ্বিতীয়টি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত 'In the wake of Independence'। প্রতিটি পরিচ্ছেদে আছে বহু অধ্যায়। রচনার প্রসাদগুণ পাঠককে নিয়ে যাবে অতীতের কর্মমুগ্ধ দিনগুলিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ভারতেও চলছে তার প্রস্তুতি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ সরকার এই তিনে

মিলে ভারতভূমিতে তুলেছিল প্রস্তুত ঘূর্ণাবর্ত। সেই সর্ব দিনগুলির সজীব বর্ণনা দিয়েছেন গ্রন্থকার। দেশ বিভাগ বিশেষতঃ আসামের ঋণীকরণ অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ লেখক উপস্থিত করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক নির্ভীকভাবে সমালোচনা করেছেন জিন্না, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি জননেতার। মিজো এবং নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে তখনই যে ফুলিংগের আভাস দেখা গিয়েছিল তার কথা বলেছেন লেখক। আজ তাই দেখা যায় ঋণরাজ্য রূপে সৃষ্টি হয়েছে নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের। ভারতের বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি 'our foreign policy' অধ্যায়ে। এটি নিঃসন্দেহে বিতর্কের বিষয়। চিয়াং কাইশেক দম্পতীকে সমর্থন না করার কারণ দর্শিয়ে লেখক বলেছেন এই ঘটনা বিশ্বাস-ঘাতকতার তুল্য। তেমনি হিমালয় অঞ্চলের তিব্বতে চীনের আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়াকে তিনি বলেছেন নেহরু সরকারের 'Himalayan blunder'। এখানেও বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে।

এই রাজনৈতিক স্মৃতিচারণীর মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অংশ হলো 'The Unifying Influence of Indian Culture' অধ্যায়। সুদীর্ঘ অধ্যায়টিতে প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার ভারতীয় দর্শনের ও সভ্যতার মূলতত্ত্বটি বলে ধর্মের মধ্যে যে গ্লানি এসেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। নেফা, মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের প্রসারের কথা বলেছেন। কিন্তু আসামের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কোন হিন্দু সংস্থা ভারতীয় সভ্যতার কথা শোনাতে যান নি, গিয়েছেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। তাঁরা স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করেছেন, সেবা করেছেন আত্মমানবের। এমনি একজন মিশনারী ছিলেন ডঃ (মিস্) জেন হেলেন রোলাণ্ডস। তিনি ছিলেন ওয়েলস মিশন ভুক্ত মহিলা। ভারতে এসে বাংলা শেখেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষায় এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আচার্য ডঃ দীনেশ সেন মহাশয়ের অধীনে গবেষণা করেন। তিনি করিমগঞ্জে স্থাপন করেছিলেন 'দীপ্তিনিবাস

আশ্রম'। রবীন্দ্রবাবু এই মহীয়সী মহিলার মানবসেবার বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপিত করে এই বিদেশিনীর কাছে আমাদের ঋণ আংশিক ভাবে পরিশোধ করেছেন।

গ্রন্থকার অভিযোগ করেছেন হিন্দু মিশনারীরা আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে চান নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী আসামের গারো অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন তাঁর আশ্রম। হাজংদের মধ্যে ছিল তাঁর মেলামেশা। তারা মায়ের আদরের ছুলাল নিগমানন্দ স্বামী ঐ অশিক্ষিত হাজংদের মধ্যে থেকে তাঁদের উন্নতিবিধানে মন দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাও এখন পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে লেখক ভারত সরকারের অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছেন, বলেছেন ভারতমাতার অঙ্গে রক্তাক্ত ছুরিকা দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার পরে যে স্বাধীন ভারত হয়েছে সেই স্বাধীনতার উৎসবে তিনি যোগদান করতে আন্তরিকভাবে উৎসাহ পান না। এ তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তথাপি তিনি কারোর উপরে ক্ষোভ রাখেন নি, বলেছেন, 'I have no malice against any one. No, against none....Every man like myself is possibly wise after the event. It is easy to advise locking the stable after the horse has been stolen. এখানেই লেখকের হৃদয়ের ঔদার্য লক্ষণীয়। ভারতীয় সাধনার মর্মবাণী হলো অস্থায়ী পরিত্যাগ, অক্ষোভ এবং আত্মমার্জনা। রবীন্দ্রবাবু অতীতের সব গ্লানিকর অধ্যায় ভুলে গেছেন বা যেতে চাইছেন। মানুষ আশাবাদী। তিনিও তাই আশা করছেন বর্তমান ভারতে যে অমানিশা রয়েছে, তার অবসান হোক, যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ভারতের আকাশ সমাচ্ছন্ন তার মধ্যে আত্মক রূপালী আলোর ঝলকানি।

লেখক কামনা করেছেন সর্বভারতীয় নেতার কি উদ্ভব হবে না? অবশ্যই হবে। একদা যখন ভারতে চরম দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন এসেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

ভারত রাজনীতিতে হাল ধরেছিলেন সগুণ ব্রহ্ম। তাঁরই মহাবাহী স্বরণ করে বলি—

যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।

অত্যাখানধর্মস্ত তদাত্মানং স্বজাম্যহম্ ॥

সুখপাঠ্য স্মৃতিতে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হোক এই কামনা করি।

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংখ্যায় সম্পাদকের কলমে—বিজনকুমার লোধ সম্পাদিত। দীপ্তি প্রকাশনী, ৩৭ নং টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। সাইজ ডিমাই অক্টোভো। পৃষ্ঠা ১০২। দাম ছয় টাকা।

স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তির কালে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত। বাম দক্ষিণ পন্থী নির্বিশেষে দৈনিক সংবাদপত্রগুলি হইতে উপাদান গৃহীত। এই প্রকাশের একটা অভিনবত্ব আছে—আছে প্রয়োজনও। বর্তমান কালটা সংবাদপত্রের যুগ। এযুগে মানুষের মন ও মনন সংবাদ পত্র প্রভাবিত। প্রত্যেকটি সংবাদ পত্রের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। আজকের অধিকাংশ মানুষই দলীয় চিন্তা-চর্চার গ্রামোফোন বললে অত্যাধিক হবে না। প্রায় সংবাদপত্রই কোন ন কোন রাজনৈতিক দলের মতবাদের বাহক। দলনিরপেক্ষ মুষ্টিমেয় সংবাদপত্রের লক্ষ্য অর্থোপার্জন, লোকমত গঠন নয়, লোকরঞ্জন। সুতরাং আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের উপযোগিতা এই যে, সমসাময়িক ঘটনার বিভিন্ন মতবাদী সংবাদপত্র কোন দৃষ্টিকোণ হতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে তার একত্র সন্নিবেশ। এ থেকে প্রচলিত মত, বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতের গতি প্রকৃতির একটা ধারণা মিলবে।

বিভিন্ন নেতৃপুরুষদের বাণীর সংকলন গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট অথবা এ বিষয়ে কৌতূহলী যারা তাদের রেফারেন্স বই হিসাবে গ্রন্থখানি অপরিহার্য। প্রত্যেকেরই হাতের কাছে রাখা কর্তব্য।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সাহিত্যিক

এবারের প্রবর্তকের প্রচ্ছদপট :

শিল্প সৃষ্টি করা এক—আর, শিল্পী সৃষ্ট হওয়া আর এক ঘটনা। মাত্র বারো বছরের মেয়ে কুমারী মধুমিতা পাকডাশী এই নূতন প্রচ্ছদপটের শিল্পী। পুরুষ-প্রকৃতি অথবা শঙ্কর-পার্বতী, কিম্বা নর-নারীর নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রবর্তক-এর প্রতি—এ ভাব অথবা ভাবনা মাত্র বারো বছরের মেয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়। অথচ কি অপূর্ব অভিব্যঞ্জনা!

প্রকৃতপক্ষে স্রত: সৃষ্ট এ শিল্পী। সার্থক শিল্পী কুমারী মধুমিতা।

প্রবর্তক সাহিত্যচক্র সমাচার :

গত ৫ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্নে মনীষী সাহিত্যিক ত্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে চক্রের মাসিক অনুষ্ঠান হয়। প্রবন্ধ গল্প কবিতা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অনেক কবি সাহিত্যিক। পূর্ণমদ উপস্থানের সঙ্গে সভা সমাপ্ত হয়।

* * *

গত ৭ই জুন শনিবার বৈকালে তরুণ কবি মুকুল বাগচীর পৌরোহিত্যে চক্রের মাসিক অধিবেশন হয়। সভায় বহু কবি সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী উপস্থিত হন ও অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত আলোচনা ও পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠান লুপ্ত ও মনোজ্ঞ হয়।

ফেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রম-অধ্যক্ষ সম্মানিত :

সুদীর্ঘ যুগাধিক নিরাম জনকল্যাণমূলক সমাজসেবার স্বীকৃতিতে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ফেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস গত ২৩-এ মার্চ ১৯৭৫ বলশিধি (পোঃ বরিয়া, ২৪ পং) তরুণ সংঘ কড়ক সম্মানিত হন। এই উপলক্ষে টি, এস বাস্তু-কেন্দ্রের বার্ষিক সভায় ত্রীদাসকে মানপত্র (স্যাটিকিটেট ও নগদ টাকা) প্রদত্ত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য

করেন পশ্চিমবঙ্গের রেড ক্রস সোসাইটির সহকারী সম্পাদক। সভায় এই অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্যাটিকিটেটে উল্লেখ করা হয়েছে :

Awarded to Sri P.C. Das of Frajergunj as a token of recognition at the first anniversary of T. S. Health Centre in appreciation of his selfless silent and exalted service to the community and of his bearing an inimitable but the impeccable public stature which the people of this locality hold him in high esteem and exhort others to follow.

ত্রীদাস সমবেত উপাসনা, ধর্ম সম্মেলন, অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুল, দাতব্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা, গ্রন্থাগার, তাঁত সমাজসেবা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই সেবাকার্য পরিচালনা করে থাকেন। ত্রীদাসের বর্তমান বয়স ৭৯ বৎসর। তাঁর যেন কোন দেহচেতনা নাই। কল্যাণ প্রেরণার মূর্তি বিগ্রহ, নিরলস সদা উত্তত প্রাণ, অক্লান্ত পরিশ্রমী, স্বধর্মনিষ্ঠ, গুরুগতপ্রাণ, সদাচার ও সংযমপূত তাঁর অসাধারণ আদর্শ জীবন সত্যই অনুকরণীয়।

উপেন্দ্রনাথ পাড়ুই স্মরণে

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী তথা সমাজ সংস্কারক চন্দ্রনগরের সুসন্তান উপেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের তিরোধানে গত ৩ই এপ্রিল চন্দ্রনগর-বাসীর পক্ষে এক শোকসভা আহত হয়। নাড়ুয়া শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। স্বামী প্রদ্বানন্দ, সর্বশ্রী বলাই গোল, শচীন মোদক, বীরেন নাথ, সত্যচরণ ঘোষ, পশুপতি লাহা, প্রকাশ দাস, বটকৃষ্ণ গোল প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভাবগভীর পরিবেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, সাহিত্য, রাজনীতিক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে সমাজসেবা তথা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে স্বর্গত পাড়ুইয়ের অবদান অতুলনীয়।

স্বর্গত পাড়ুইয়ের কন্যা কুমারী স্বপ্না পাড়ুই স্বর্গত পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

পণপ্রথা উচ্ছেদ :

আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে পণপ্রথার উচ্ছেদ দাবী করে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকেও ওই দাবী সোচ্চার হয়ে উঠে এবং পঃ বঙ্গ বিধান সভায় মহিলা সদস্যরা বিশেষ শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে সরকারী আইন সংস্কারের দাবী করেন। ফলে পঃ বঙ্গ সরকার পণ প্রতিরোধ বিল (১৯৭৫) সিলেকট কমিটির সুপারিশক্রমে সংশোধিত আকারে গত ৭ই মে বিধান-সভায় উপস্থাপিত করলে একবাক্যে গৃহীত হয়। বিলটিতে বিবাহে পণ দেওয়া ও নেওয়া হুইই দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে স্বীকৃত এবং এই সংক্রান্ত মামলার সমস্ত ব্যয় সরকারই বহন করবেন।

“ব্যাবৃত্তের” নতুন নাটক : অভিশপ্ত অধ্যায় :

সম্প্রতি “ব্যাবৃত্ত নাট্য সংস্থা” তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করলো বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। অনুষ্ঠানান্তে শিল্পী শ্রীমতী কানন দেবীকে সম্বর্ধনা জানালেন শ্রীমহিমা রঞ্জন কোনার। পরে শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য রচিত এবং পরিচালিত “অভিশপ্ত অধ্যায়” নাটকটি অনুষ্ঠিত হলো। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নাটকটি রচনা করা হয়েছে এবং পরিবেশনার গুণে তা হয়ে উঠেছে একটি সার্থক নাটক। শ্রীভট্টাচার্যের অভিনয় প্রত্যেকটি দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

দড়ি বেঁধে কত্যা সম্প্রদান :

তমলুক হরিদাসপুরে, ৬ই জুন শুক্রবার রাতে অনন্তপুর গ্রামে নারীবর্ষে কন্যাদায়গ্রন্থ পিতার অসহায়ত্বের এক নজীর সৃষ্টি হয়েছে। টাকার অভাবে কন্যাদায়গ্রন্থ পিতা মেয়ের অমতে জোর করে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটি পঙ্গু অন্ধ পাত্রের হাতে মেয়েটিকে সম্প্রদান করে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে বাধ্য হয়। প্রদীপ, ২৬ ৭৫

নাৎসী যডযন্ত্র :

বিল্লিনের সংগ্রহশালায় যে সমস্ত গোপন দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধের বহু

আগে থেকেই নাৎসীরা এশিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক অভিযান চালানোর ফন্দি খঁটছিল। নাৎসী পাটির ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ব্যুরো যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিল তাতে দেখা যায় যে, জার্মান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষের অনেকটা অন্তর্ভুক্ত। এইসব দলিলপত্রে এশিয়ার স্থল ঔপনিবেশিক মানচিত্র রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ত্রিপক্ষীয় (জার্মান-ইতালী ও জাপান) চুক্তির গোপন ক্রোড়পত্রের উল্লেখ করা যায়।

সংগীত শিল্পীর সংবর্ধনা :

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী পুলমা দাসের একক সংগীত আসরের আয়োজন করেন বেলঘরিয়ার শ্রীমতী চক্রবর্তী এনং নন্দন কাননে। শ্রীমতী পুলমা ইতিমধ্যেই গৌহাটি বেতার কেন্দ্রে খ্যাল-গায়িকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার কয়েকটি ঘরোয়া আসরে সংগীত পরিবেশন করে সুর-রসিক শিল্প সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগীত বিশারদ প্রখ্যাত কলাকার শ্রীমতী চাকলাদার। উদ্বোধন করেন কবি নিবারণ চক্রবর্তী।

নবীন শিল্পীকে মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়।

প্রথম জার্মান-হিন্দী অভিধান :

সম্প্রতি জি. ডি. আর-এর এক সংবাদে প্রকাশ্য লাইপৎসিকের কার্ল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রহণ একটি গবেষণা প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে—প্রথম জার্মান-হিন্দী অভিধানের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। অভিধানটি বর্তমানে যন্ত্র। আশা করা যায়, ১৯৭৫ সালের শেষদিকে বা ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে অভিধানটি প্রকাশিত হবে। এই অভিধান ভারত-বিষয়ক অনুশীলনে প্রগতি-শীল জার্মান ঐতিহ্যের অনুসারী এবং এক্ষেত্রে লাইপৎসিক বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়েই জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়ে এসেছে।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীবি কর

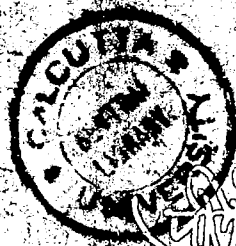
প্রকাশক : পরিপার্শ্ব, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কচ্ ক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাউস লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠরায় কচ্ ক মুদ্রিত।

14 AUG 1975



৩৬ জন্ম বর্ষ : ১৫ নং

প্রবন্ধ



সিদ্ধিভোগ: শ্রীধরলালদাস

ভাট ১৯৩৬
আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩৬



আনন্দ উৎসবে
ক, শেডের
প্রসারিত সামগ্রী

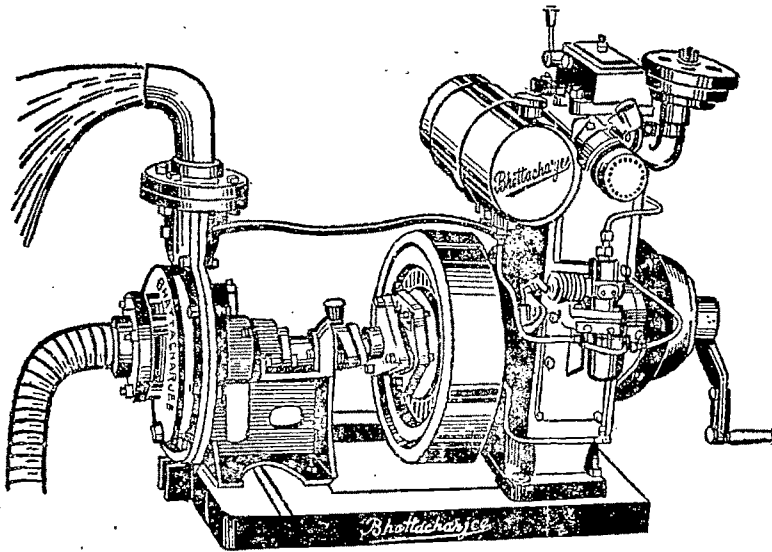


ক, হাউ ২৩ কাক • কলিকাতা-১৯

ভারত সরকারের গ্রামাশ্রয়াল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্-
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো,
ভলভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, স্টীল পার্টস, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্‌ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.

TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)

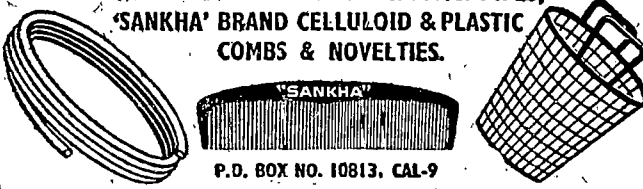
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4832

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.D. BOX NO. 10813, CAL-9

D. RATAN & Co.

Photographers **PHOTO**

22-1, CORNWALLIS ST., CALC.

PHONE : 54 - 5711

ডি.রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স **ফটো**

২২-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ৫৪ - ৫৭১১

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড :: বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিহারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিষ্ট : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাণ্ডারিষ্ট : অশোকারিষ্ট : ব্রাহ্মী স্মৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : ভাদ্র, ১৩৮২

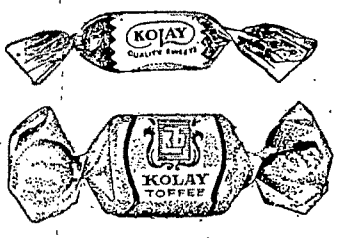
শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সজ্জৎক শ্রীমতিলাল	১৭৩
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	১৭৪
সম্পাদকীয়	...	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	১৭৫
শরৎ-সাহিত্য জীবনের গান	প্রবন্ধ	শ্রীশান্তনু দে সরকার	১৮১
আনন্দো ব্রহ্মোতি	কবিতা	নচিকেতা ভরদ্বাজ	১৮২
শরৎ চন্দ্র	কবিতা	ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২
একটা পয়সার প্রার্থনা শেষ হল না	কবিতা	সন্তোষ ভট্টাচার্য	১৮২
মহাকাশে আর্ঘভট্ট	প্রবন্ধ	শ্রীগোপাল বাগচী	১৮৩
কালীরূপ বন্দনা	স্তোত্র	শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮৬
আঠে পৃষ্ঠে শোকাভূত	কবিতা	হসেন আহমদ নুরী	১৮৮
বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	জীবনালেখ্য	কিরণেন্দু বাগচী	১৮৯
অভিশাপ	গল্প	ডাঃ গৌরমোহন দাস দে	১৯৩
শীল	প্রবন্ধ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়	১৯৫
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	প্রবন্ধ	শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য	১৯৬
সমালোচনা	...	...	১৯৭
পাঠকের মতামত	চিঠি	শ্রীফনীভূষণ সামন্ত	১৯৮
সজ্জ-সংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	১৯৯
সাময়িকী	...	...	২০০

কোলে

* বিস্কুট * * *
* লেজেন্স * * *

* জ্যাম জেলী আচার * * *

* কোয়ার্ন * * *



নিম্নোক্ত :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০

K.B.-3174/B.

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেণ্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

পুজার বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাট্টিং, স্ফটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ POLISHING & BUFFING

DOUBLE ENDED-GRINDER
FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



বহুজন হিগা

৬০তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র : ১৩৮২

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর : ১৯৭৫

প্রবর্তক

বার্ষিক দক্ষিণা ছয় টাকা

প্রতি সংখ্যা পঁচাত্তর পয়সা

জীবনের আলো

তত্ত্ব আর ধর্ম। তত্ত্ব অদ্বয় জ্ঞান। ধর্ম ভগবান। তত্ত্বের রূপ নাই, আকৃতি নাই। ভগবান বিরাট, আবার আত্মমায়ার জীবের দ্বারা জন্ম-কর্ম সমন্বিত। জীবের সহিত কেবল বৈশিষ্ট্য—ইন্দ্রিয় ষড়বর্গ দ্বারা গ্রহণাদি সত্ত্বেও, তিনি নিঃসঙ্গ।

বিরাটের রূপ কোথাও অংশ, কোথাও বিভূতি। সব রূপই বিরাটের রূপ। বিরাট হইতে উৎপত্তি, বিরাটেই লয়। অংশও বিভূতির বৈশিষ্ট্য অবতার স্বরূপ। ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বিরাটই আবার ঘেঁষায় পরিমিত শরীরে অবতীর্ণ হন। বাসুদেব মূর্তি পরিগ্রহ করেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণচক্র এইরূপ পূর্ণস্বরূপ, অংশ বা বিভূতি নহেন।

জীবের দ্বারা তাঁরও অন্তর্ধান হয়েছিল। বিরাট ধরেছিলেন নবরূপ। ভগবান মূর্তিমান ধর্ম। তাঁর তিরোধানে ধর্ম কোথায়? এই প্রশ্ন ভাগবতকার করেছেন—উত্তর সুস্পষ্ট, দিনের মত পরিষ্কার।

পূর্ণস্বরূপ ভগবান যখন নরদেহ ধরেন, তখন নরদেহের লয় নাই। সুতরাং তিনি নিত্য। এই হেতু সবার উপর জীব। জীব-ধর্মই ভাগবত ধর্ম। এমন প্রমাণ ধর্মতিহাসে ভূরি ভূরি মিলে। কাজেই ধর্ম শাস্ত্রত।

ভগবান মন দিয়ে ধর্মের রূপ সৃজন করেন—আর বাক্যে বেদ। বেদ ঘোষণা, নাম সংকীর্তন। রূপ আছে, তাই বাণী, তাই নাম। আর তাই ধর্মও মূর্তিমান। জীবের লয় ও মোক্ষ। ভগবান সনাতন ধর্ম প্রবর্তক—রূপে নাম।

তত্ত্ব—নিরাকার। জ্ঞান—মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান। ধর্ম—চতুর্বর্গ। ধর্মতত্ত্ব বীজভূত। অর্থ—জন্ম। কাম—কর্ম মোক্ষ—শ্রেয়ঃ জীব কল্যাণ।

জন্ম ভগবত কোথায়—কর্ম যেখানে নৈকর্ম। নৈকর্মের লক্ষণ কি? যাহা মোক্ষের নিদান অর্থাৎ জীবের শ্রেয়ঃসাধনের হেতু, মঙ্গলের কারণ। অভূত কথা! কিন্তু এই ধর্মই তোমাদের গ্রহণীয়। অম্বা কথা অশ্রাব্য। কেন না ব্যবসায়িকাবুদ্ধি না হলে ঈশ্বরজ্ঞান হবে না—আমার স্বরূপ পাবেনা। আমি যাহা বলি, তাহা বেদ। রূপ দাও মনে, বাণী দাও বাক্যে। এই জীবনবেদ প্রচার কর। তোমার জন্ম-কর্ম ভাগবত হবে।

তোমার গতি বাসুদেবে। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কথা—বাসুদেবই পরম গতি। বাসুদেব প্রভু। বাসুদেব বিভূ—সর্বব্যাপক। তোমার সবখানি ভুবিye দাও—অসাধারণ দাবী, অসাধারণ জীবন। এই বৈশিষ্ট্যই সঙ্ঘের জীবনে। সঙ্ঘ—ভাগবত। তত্ত্ব নয়, ধর্ম। ধর্মকে মূর্তি দিতেই জন্ম। ধর্মই কর্ম। ধর্ম নিঃশ্রেয়স্। উপলব্ধি কর। এই মহাযান—উঠে এসো—এই।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(সঙ্ঘবাণী, ২৮শে মাঘ ১৩৪৩; ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭)

বেদমন্ত্ৰ

প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ অয়োদশং সূক্তং ॥ দ্বিতীয়া-তৃতীয়া ঋক্

(মণ্ডলস্থ একোনষষ্ঠীতমং সূক্তং)

মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতি রোদস্তোঃ ।

তং ত্বা দেবাসৌহজনয়ন্তু দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্য্যায় ॥ ২

আ সূর্য্যো ন রশ্ময়ো ঋবাসো বৈশ্বানরে দধিরেহগ্না বসুনি ।

যা পর্ব্বতেষু ওষধীষ্পু যা মানুষেষু তস্য রাজা ॥ ৩

অনয়—অগ্নিঃ দিবঃ মূর্ধা, পৃথিব্যা নাভিঃ, অথ রোদস্তোঃ অরতি অভবৎ । বৈশ্বানরঃ তং দেবং দেবাসঃ ত্বা (ত্বাম্) আর্য্যায় জ্যোতিরিং অজনয়ন্তু ॥২

সূর্য্যো ন (যথা) রশ্ময়ঃ ঋবাসঃ সন্তি, তদ্বৎ বৈশ্বানরে অগ্না (অগ্নৌ) বসুনি দধিরে । যা (যানি) পর্ব্বতেষু ওষধীষু অঙ্গু যা মানুষেষু তস্য রাজা অসি ॥৩

ব্যাখ্যা—অগ্নিঃ দিবঃ মূর্ধা (অগ্নি দ্ব্যলোকের মূর্ধা অর্থাৎ মস্তক) পৃথিব্যা, নাভিঃ (পৃথিবীর নাভি) অথ রোদস্তোঃ (অতএব দাবা পৃথিবীর) অরতি অভবৎ (অধিপতি হইয়াছিলেন) বৈশ্বানরঃ তং দেবং (হে বৈশ্বানর আপনি দেব) দেবাসঃ (দেবগণ) ত্বা (ত্বাম্—আপনাকে) আর্য্যায় (আর্য্যের নিমিত্ত) জ্যোতিরিং (জ্যোতিরুপই) অজনয়ন্তু (উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ২ ॥)

সূর্য্যো ন (সূর্য্যো যেমন) রশ্ময় (রশ্মিসকল) ঋবাসঃ সন্তি (নিশ্চল হইয়া আছে) তদ্বৎ বৈশ্বানরে অগ্নৌ (তেমনি বৈশ্বানর অগ্নিতে) বসুনি (ধন সমূহ) আ-দধিরে (স্থাপিত ছিল) যা (যানি) পর্ব্বতেষু ওষধীষু অঙ্গু (যে সমস্ত ধন পর্ব্বতাদিতে ওষধীসমূহে এবং জলরাশিতে) এবং যা মানুষেষু (এবং যে সমস্ত ধন মনুষ্য মধ্যেও সংস্থিত ছিল) তস্য (সেই সমস্ত ধনের) রাজা অসি (রাজা হন) ॥৩

সরলার্থ—বৈশ্বানর অগ্নি দ্ব্যলোকের মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি—অতএব তিনিই দাবাপৃথিবীর অধিপতি । হে বৈশ্বানর অগ্নি আপনি স্বয়ং দেব, দেবতাগণ আপনাকে আর্য্যের জন্তই উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥২

সূর্য্যো যেমন রশ্মিসমূহ ঋব তেমনি বৈশ্বানর অগ্নিতে সমস্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত । পর্ব্বতাদিতে, বৃক্ষসমূহে ও নদীসমূহে এবং মনুষ্য মধ্যে যে সমস্ত ধন নিহিত আছে—বৈশ্বানর অগ্নিই সেই সমস্ত ধনের অধিপতি ॥৩

এই দুইটি ঋকে বৈশ্বানর অগ্নিকে আদিত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । দ্ব্যলোকের আদিত্য আর ভুলোকের অগ্নি দুই-ই জ্যোতির আকর । প্রজ্জলিত অগ্নির দিব্য জ্যোতিকেই ঋষি এখানে বৈশ্বানর নামে অভিহিত করেন । দ্ব্যলোকের আলো যত সহজে প্রকাশ পায়—ভুলোকের অগ্নি তত সহজে প্রজ্জলিত হয় না । তারজন্ত অগ্নিহোত্রীদের আছে কঠোর সাধনা । সাধনার বলেই তাঁরা অগ্নির মধ্যে বিশেষ করে দেখতে পান জ্যোতির শক্তিরূপ । এই অগ্নিজ্যোতিই ভুলোকের নাভি আর দ্ব্যলোকের মস্তক । ঋষি দৃষ্টিতে দেবতারা এই জ্যোতির, এই বৈশ্বানর রূপী দেবতার জন্ম দিয়েছেন “আর্য্যের জন্ত চিত্তির সহায় । চিত্তি অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে প্রথম চেতনার নিকষরেখা ।” এই চেতনার আলোকই বৈশ্বানর অগ্নি । ঋষি ইহাকেই ভুলোকের নাভি আর দ্ব্যলোকের মস্তক বলে অভিহিত করেন । কারণ জ্যোতিপুঞ্জ এই উভয় লোকের মধ্যেই গতিশীল । সেইজন্ত বিশ্বের সৃষ্টি পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মানব সবেই জীবনী শক্তি দ্ব্যলোক-ভুলোকের সম্মিলিত এই জ্যোতিপুঞ্জ । ঋষি সত্যই বলেছেন—হে বৈশ্বানর অগ্নি ! যানি পর্ব্বতেষু, ওষধীষু, অঙ্গু যা মানুষেষু অপি ত্বম্ তস্য রাজা অসি ।

সুতরাং বিশ্বব্যাপী এই জ্যোতিপুঞ্জের উপাসনা করাই সকলের বিষয় । কারণ এ জ্যোতি কারু একার সম্পত্তি নয়—এ জ্যোতি সবার জন্তই । সবারই অধিকার আছে এই জ্যোতির আরাধনা করে ইহ ও অমৃতের সম্পদে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলায় ॥

রেণুকণা ঘোষ

সিদ্ধান্তকায়

তত: কিম্?

তারপর কি—কিসের পর?

এই প্রশ্ন লেখকের সম্মুখের ব্যক্তি স্বরূপ, অন্তরঙ্গ জীবন ও জীবনব্রত সম্পর্কে—যাহা তাঁর তত্ত্বগতীর, ঘটনাবল্ল, বিচিত্র বহুমুখী কর্মমুখর জীবনী আলোচনায় সাধারণত নেপথ্যেই থাকিয়া যায়।

বিষয়টি অবতারণার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ লেখকের একটু বক্তব্য রাখার প্রয়োজন।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে অথবা মার্চের প্রথমে লেখক প্রবর্তক সত্ত্বে যোগদান করে। অতীত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অবশ্য ইহার পূর্বেও যোগাযোগ ছিল। ১৯১৫ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে এই সংযোগের সূত্রপাত। ঘটনাক্রমে বিপ্লবগন্ধী অরবিন্দ-মতিলাল গোপনচক্রের সংপর্শে আসে লেখক। তখন সবে মাইনর স্কুল উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমান ক্লাস সেতেনের) ছাত্র। নদীয়া জেলার এক পল্লী পরিবেশ।

এই চক্রে আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানত দেবজন্ম ও দিব্যজাতীয়তা। খানকতক অরবিন্দ সম্পর্কিত গুস্তিকা এই আলোচনার উৎস। প্রতি সন্ধ্যায় স্কুলের পরে গুটিকয়েক নিষাচিত সন্তের উপস্থিতিতে পুস্তকের বিষয়বস্তু পঠিত ও আলোচিত হইত।

একদিন একখানা স্বল্পকায় নিরাভরণ পত্রিকা পড়া হইল। পাক্ষিক 'প্রবর্তকের' প্রথম সংখ্যা।

সাধারণত পাঠ করেন চক্রপতি বীরেশ্বর সেন। তিনি নাকি অরবিন্দ-মতিলাল-সংশয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ঘণ্টা দেড়েক তিনি প্রবর্তক পাঠ ও তার মর্ম সত্যদের কাছে বিস্তার করিলেন। শ্রীসেন অমায়িক নিরহঙ্কার মুছ, মধুর স্বভাবের মানুষ। সুপুরুষ। সদা সহ্য বদন। তাঁর আপন করা ভাবটি আকর্ষণ করে, কাছে টানে, অনুগত করে। কেমন আশ্চর্য্যভাষা আদর্শবিশেষের। সন্তেরা উৎকর্ষ হইয়া মস্তমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনিল।

কি যে তিনি বলিলেন এবং তার কতটুকুই বা হৃদয়ংগম্য হইল আজ আর তা মনে নাই। সে সময়ে সম্প্রতি কিছু না বুঝিলেও পূর্ণাঙ্গ জীবন, দেবজন্ম চরিত্র, মানুষের প্রাকৃত স্বভাব-প্রকৃতির রূপান্তর, দিব্য সমাজ সংগঠন এমনি ধরণের একটা নূতন, আন্দোলনের স্বপ্নচিত্র এমনভাবে সামনে ধরিলেন যা তখন বোধে সুপরিষ্কৃত হোক বা না হোক কানের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিল।

চক্রনেতা নীরব হইলেন। অনুষ্ঠান হইল সমাপ্ত। যে যার মত প্রশ্নান করিল।

আশ্চর্য্য অন্তরের অন্তঃস্থল অব্যক্ত একটা অনুভবের অজ্ঞাতে অনিচ্ছায় কোনরূপ প্রশ্ন প্রচেষ্টা ব্যতীতই যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চার। অনুভব্য কিন্তু অনির্বচনীয়। চিন্তের অহৈতুক উদ্বুদ্ধতা। ভবিষ্যৎের বুঝিবা উদ্বোধন। যা ছিল মুছিত, যা ছিল সম্ভাবনারূপে সংগোপিত তাহাই শিহরিয়া উঠিল প্রবর্তকের বাণীর ভুকম্পনে।

তখন কি বুঝিয়াছিলাম জীবনের আমূল দিক পরিবর্তনের সূচনা ইহা। সর্বনিঃস্বস্তা কল্পপুরুষের অলঙ্ঘ্য অনিবার্য নিয়তির ইতিবৃত্ত রচনার ভূমিকা। তুচ্ছ ঘটনা বৃহৎ হইয়া দেখা দিল একটি জীবনের পাদপীঠে। নির্মম কালচক্রের অনিবার্য পরিক্রমণের পথে আশ্চর্য্য অকল্পনীয় পরিণতি। লেখকের ভাগ্য শেষপর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত হইয়া পড়িল।

মাত্র চারিটি মাস। নূতন স্কুল। সবে শুরু। আট চালা খড়ের ছাওনি। মাটির মেঝেতে খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। কিছুতেই মন বসলো না, মোহকুমা কুষ্টিয়ার প্রাসাদোপম স্কুলে হইল স্থানান্তর।

বিদায়কালীন করুণ আবহাওয়া। অনাগ্রীয় মানুষ একটা মহৎ আদর্শের সম্পর্কে এমন আপন, এত আত্মীয় হইতে পারে তার নিবিড়ঘন অমৃতব প্রবর্তক-এর পীরতিনগর গড়ার স্বপ্নকে আরও বাস্তবায়িত করিয়া তুলিল কল্পগণ্টে। অভিভূত চিত্ত, উদ্বেলিত, হৃদয়। অশ্রুসজল আঁখি। চক্রপতি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভূনত প্রগতি রাখিলাম। জুইট বস্তু তিনি আরক চিহ্নস্বরূপ লেখককে উপহৃত করিলেন—প্রবর্তক পত্রিকা আর প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের একখানি দাঁড়ানো মুদ্রিত চিত্র।

শুধুই কি ছবি! জীবন্ত, নড়ে চড়ে, চোখের পলক পড়ে, ইঙ্গিতে কথা বলে। আঁখির অণাংগ দৃষ্টিতে যেন একটা সংকেত—কাছে টানার আকুল আকৃতি—আত্মান। বুঝিবা আস্তুর নবানুরাগেরই প্রতিচ্ছন্দন।

প্রথম ছবি দর্শনেই অহৈতুক অপ্রাকৃত অমুরাগ। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ নাই—না হইল পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা। রাগের ঘনিষ্ঠ্য প্রণয়ের উদয়। বুঝিবা অনন্ত ভাবনারই ফলশ্রুতি। জাগ্রত মনের অগোচরেই প্রণয় রন্ধনে বাঁধা পড়িল গোপন সত্তা। হইল গান্ধব্য পরিণয়। ইহাই প্রথম এবং শেষ দীক্ষা। এই দীক্ষার বীৰ্যই অন্তরের অন্তঃস্থলে সক্রিয় থাকিয়া অজ্ঞাতে বহু বিস্তৃত অমুকুল-প্রতিকূল সংঘাত-সংঘর্ষ আক্ষেপ-বিক্ষেপ, ঘটন-অঘটনের মধ্যে জীবনের গতিক গন্তব্যে উপনীত করিয়া দিয়াছে, স্থিতি করিয়াছে নিঃশয় নিঃসন্দেহ ভূমিতে। আত্মার এই মুক যৌন প্রণয় সম্বন্ধই সমসাময়িক কালের মহাত্মাজীর প্রচণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বব্যাপ্ত সংবেগের মধ্যেও দ্রবতারার মত স্থির থাকিয়া লক্ষ্যচূত হইতে দেয় নাই।

অতঃপর স্বল্প কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়া কর্মক্ষেত্র। ১৯২৫-১৯৩২। স্থান আসাম। কাছাড় জেলার শিলচর-হাইলাকান্দি। পিতৃস্থানীয় নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠভাতের প্রস্তুত কর্মক্ষেত্র। ভূ-সম্পত্তি, চাষ আবাদ, করেষ্ট লিজ, বাঁশ-বেত, টিটাগড় পেপার মিলস্-এ পাল্প, সরবরাহ, চা-বাগানের পরিকল্পনা প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসা।

যে অনন্য কর্মনিষ্ঠায় ব্যবসায়ে সাফল্যতার ঐকান্তিক অভাব। চিন্তন একটি মস্তিষ্কে নিবদ্ধ—‘প্রবর্তক’। প্রবর্তকের ভাক পীরিতিনগরের বাসিন্দা হবার। উষার সংসারমরুভূমে সরস মরুতান। সম্প্রীতির সুবুজ ভূস্বর্গ। নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়া শূন্য হওয়া। শূন্যতার গর্ভেই পূর্ণতা। অন্তরের গোপন বীণায় অনাহত মুহূর্তে এ ‘মন্দিরে’ আর কেহ নাই শুধু তুমি আর আমি’ কেমন যেন আনমনা করিয়া রাখে। প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় এই স্বপ্নচিত্র আকুল উন্মাদ করিয়া তোলে। আরাধ্য দেবতার চিত্রপটের সামনে কাতর

প্রার্থনা—‘আর কতদিন! মুক্তি দাও, তোমার করে নাও।’

সন্তানের এই ভারবৈকল্য লক্ষ্য করিয়া পিতৃবোর উপদেশ—‘অনেক কর্তব্য সামনে। যৌবনে বৃদ্ধ বয়সের সংসারবৈরাগ্য শোভা পায় না।’

লেখকের হঠাৎই মূখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, বৃদ্ধ বয়স যদি না আসে।

জ্যোতামশায় কেমন ধতমত খাইয়া গেলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে বাবা, অকৃতদ্বার বাউল কাকা, জ্যেষ্ঠার একমাত্র পুত্র সন্তান লেখক—বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতারও অধিক স্নেহ আর আশায় জ্যেষ্ঠতাত পিতৃহীন লেখককে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু কল্পপুরুষের অমোঘ ইচ্ছা অতুল্য।

শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটিল। জ্যেষ্ঠতাত দেহরক্ষা করিলেন পরিণত ৭২ রংসর বয়সে।

আশ্চর্য সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় প্রাণায়ামের সঙ্গে দেহ ত্যাগ। প্রাণায়ামসিদ্ধ গুণ্ডযোগী ছিলেন তিনি। বিদেশে বিভূঁই। লেখকের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁর শেষ সেবা পরিচর্যার।

অদ্বিত আশ্চর্য যোগাযোগ। ১৯২৯ সালে সজ্ঞা-জননী যে তারিখে অন্তর্ধান করেন তিনিও ১৯২৯ সালে সেই তারিখে প্রায় সেই সময়ই মর দেহ রক্ষা করেন।

জীবনে এতবড় মর্মস্বন্দ বজাঘাত, কিন্তু লেখক এত-টুকুও মুহূর্তমান হয় নাই। না হইবার কারণ সম্ভবত লক্ষ্যের অনন্ততা। বরং মুক্তির কেমন একটা হালকা ভাব। এত বিস্তৃত জটিল কর্মজাল গুটানো অবশ্য সময়সাপেক্ষ।

১৯৩২ সাল। বিগত প্রিয়জনের গয়ায় পিও দান সমাধা করিয়া এবং কয়েকটি তীর্থ ঘুরিয়া প্রত্যাবর্তনে পথে লেখকের চন্দননগরে আগমন। অবস্থান সজ্ঞা-শ্রমের সন্নিকটেই স্বগ্রামবাসীর বাশায়। উদ্দেশ্য; পরম প্রিয় প্রেমাস্পদের পুণ্যলীলাভূমির রজে মাথা লুটানো। আগের দিন সন্ধ্যায় জানা গেল পরদিন প্রত্যুষে সজ্ঞা-ধিবেশন। ভগবান বাণী দিবেন। স্থান গঙ্গাতীরবর্তী রবীন্দ্র হল (পুরাতন)।

ঐ দিনই সাড়ে দশটায় লেখকের ফিরিবার ট্রেন। কিন্তু কেমন যেন আকর্ষণ! এত কাছে আসিয়া এ সুযোগ ছাড়া যায় না। ভোরবেলা উঠিয়া কোন রকমে হাতমুখ ধুইয়া লেখকের অধিবেশনে যোগদান। একটু বিলম্ব হইল। শ্রীভগবানের বাণী শুরু হইয়া গিয়াছে। হল ভর্তি নরনারীর সমাবেশ। ভাব-গভীর পরিবেশ। নিবিড় নিষ্ঠায় অবহিত চিত্তে অবনত শিরে সভ্যসভার বাণীর অনর্গল নিব্বরে অভিযুক্ত হইতেছেন।

সবার অলঙ্কার লেখকের হল ঘরের একটি কোণে আসন গ্রহণ। ইচ্ছা নীরবে আসা এবং নীরবেই প্রস্থান। সাড়ে দশটায় ট্রেন। প্রস্তুতি আছে।

বাণীর প্রায় সমাপ্তিমুখে শ্রীগুরু ভগবানের আশ্বান—‘রমণ অরুণের (বর্তমান সভ্য সভাপতি) পাশে এসে দাঁড়াও। সমস্ত ভাবপতাকা প্রবর্তক তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমরণ সংকল্পে এই পতাকা বহন কর। এতেই সর্বার্থ সিদ্ধি। এ আমার অনুজ্ঞা।’

এবেবারে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত। লেখক কিংকর্তব্য বিমুক্ত ক্ষণিকের জ্ঞান। সম্মিত ফিরলো। লেখকের স্মরণে পড়িল সেই ১৯১৫ সালের অরবিন্দ-মতিলাল চক্রের কথা। প্রবর্তক প্রথম সংখ্যার সংগে প্রথম পরিচিতি। দীর্ঘ সতের বৎসর পরে কল্পপুরুষের অমোঘ অনিবার্য বিধানেরই বুলিবা এই পরিণতি।

একটা অস্থি—ইতস্ততঃ ভাব।

যাত্রা রহিল স্থগিত। অপরাহে শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবানের সংগে সাক্ষাৎ হৃদ-সন্দেহ-সংশয়মুক্তির জ্ঞান লেখকের দুইটি প্রশ্ন:

(১) প্রবর্তক পরিচালন তথা সাংবাদিকতায় অনভিজ্ঞতা। সংগে সংগেই উত্তর—‘সে ভাবনা তোমার কেন, তোমার ভার আমিই বহন করবো। একটি মাথা দুইটি হাত, দুইটি পা হলেই চলবে। চাই উৎসর্গ—পরিপূর্ণ সমর্পণ। আমায় তোমার মন বুদ্ধি সর্বপ্রিয়ের হৃদে প্রকাশ হতে দাও। আর কিছু করার বা ভাবনার নাই। গুরু শক্তিই তার কাজ করবে।’

(২) লেখকের দ্বিতীয় নিবেদন—আপনার চিহ্নিত

মানুষ লেখক কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্শংশয়তা। এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত উপলব্ধি লেখকের নাই। পরন্তু আছে দন্দ। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তই চরম এবং শিরোধার্য।

একটু নীরব রহিলেন।

আরও চক্ষু। তারপর বলিলেন, কাল সকালে এস। আরও নির্দেশ দিলেন রাত্রে একাগ্র অনুধ্যানের। ধ্যানের আলম্বনস্বরূপ একটি নাম দিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে পুনশ্চ সাক্ষাৎ। যেন লেখকেরই আগমন অপেক্ষায় ছিলেন। প্রফুল্ল আনন। ওষ্ঠপুটে শ্মিত হাসি।

প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই বলিলেন, ‘কিছু আলো পেলো?’

‘তেনন কিছু নয়, তবে একটা অলঙ্কার আকর্ষণের অনুভূতিতে অন্তঃস্বন্দেহ অনেকটা অবসান। এ বিষয়ে আপনার নির্দেশই বেদবাক্য।’

নিশ্চিত দৃঢ়কণ্ঠে সংসদেবতার অন্তঃবাণী—‘ভোরে দেখলাম, তোমাদের মায়ের আগমন। প্রশ্নকে (নারীমন্দিরের অধ্যক্ষা) বলছেন, ছেলেটিকে বরণ করে নাও।’

আর কোন বাক্য বায় নাই। ঋণিকটা নিস্তরতা।

তারপর নলিনকে (প্রবীণ সহ সভাপতি) হাঁক ডাক শুরু করিলেন। নির্দেশ দিলেন, আশ্রমে রমণের থাকার সুব্যবস্থা কর। প্রশ্নকে খবর দাও।

বাকহীন বিমূঢ় লেখক। নীরবেই প্রণাম করিয়া যজ্ঞ চালিতের মত নলিনের অনুসরণ। সিঁড়িপথে কানে আসিল সজ্জগুরুজীর পুনশ্চ হাঁক ডাক—‘নির্মলা নির্মলা (সর্বক্ষণের সেবিকা) রমণকে রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও।’

১৯৩২ সাল। লেখকের অতীত জীবনের উপর যবনিকা পড়িল। একবারে দিক্‌পরিবর্তন right turn। প্রাকৃত জীবনরাত্রির দেখা হৃৎস্পন্দ যেন সদগুরুর দিনের আলোতে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। যেন ঘটন জন্মান্তর। অতীতের প্রাকৃত সম্বন্ধ জগৎ, যৌবনের রঙীন কল্পনা, গৃহ-সম্পদ-সম্ভাবনা সবই বিগত জীবনের

মুহিত স্মৃতি হইয়া গেল। নূতন জগৎ। অতিনিব
অপ্রাকৃত পরিবেশ।

কিন্তু বেশীদিন নয়। স্বপ্ন ভংগ হইল। অন্তর্দ্বন্দ্বের
তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেন মধুপানরত
মৌন মৌমাছির চাকে পড়িল ঢিল। সমোহিত প্রাকৃত
স্বভাব-সংস্কারের অতৃপ্ত সংবেগ স্তব্ধ করিল কলরব।
কল্পনার সুখস্বপ্নের সংবেগ-সম্মোহিত আত্মভোগ
প্রবৃত্তি প্রবণতা সহস্র ফণা মেলিয়া মাথা তুলিল।
ভোগ-বঞ্চনারও প্রতিহিংসা আছে—আছে বঞ্চনাকারীর
প্রতি ঘেঘ-বিঘেঘ। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, অনাত্মাত্ম
আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে টানাটানি। আছে দীক্ষা-
পরিণয়, প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস ভংগের বিবেক দর্শনও।

ভগবানের পথে নগ্ন মনের এই নিগূঢ় দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত
উপন্যাসের চেয়েও জীবন্ত বাস্তব ও রোমাঞ্চকর।

বাস্তবে সবচেয়ে রুঢ় আঘাত আসিল মনের রঙে
আর অন্তরের মাধুর্যে মেশানো কল্পস্বপ্নে। কোথায়
পীরিতিনগর? প্রেম বৃন্দাবনের মুরলী মুছনা? প্রেমা-
স্পদের রস রাসচক্র। কোথায় প্রেম পড়সী আর পীরিতি
নগরের নাগর নাগরী।

এ যে সংগ্রামময় কুরুক্ষেত্র। চক্রপতির কণ্ঠে সংগ্রামের
পাঞ্চজন্ম ধ্বনি। প্রচণ্ড কর্মোন্মাদনা। সেই প্রাকৃত
স্বভাব প্রকৃতির সংশয় সংঘর্ষ আত্মতৃপ্তি আত্মপ্রসাদ।

১৯৩২ সাল সজ্জগুরুজীর অর্থ স্বজন যুগ। বৃহৎ
বৃহৎ অর্থ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। বাহ্য জীবন তাঁর
অনির্বাক্য ভুবড়ীর মতো স্বজনপ্রেরণা দীপ্ত। অবিরাম
কর্মচঞ্চল।

লেখকের অন্তর্দ্বন্দ্ব—কোথায় সেই অভীষ্ট প্রেমময়
আরাধ্য দেবতা।

লেখকের এই সংশয়-সংকটময় জীবনের সন্ধিক্ষেপে
সজ্জগুরুজীর বহিজীবনের মেঘাবরণ বিদীর্ণ করিয়া তাঁর
অন্তঃস্বরূপের যে বিদ্যাবালক। প্রকটিত হইয়াছে তাহাই
আলোকদিশারী হইয়া লেখককে বিপথগামী হইতে দেয়
নাই। প্রথম তিনি এত কর্মমুখরতার মধ্যেও যত কথা
বলিয়াছেন তার বারো আনাই ভগবানের কথা আর
ভগবানের মানুষ হওয়ার আত্মান। দ্বিতীয় তিনি

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই ৪টা হইতে
৫টার মধ্যে যে প্রভাতবাণী লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা
সাধারণের নিকট অকল্পনীয়। স্নগভীর তত্ত্ব-দর্শন,
বিচিত্র সাধন-সংকেত, বিভিন্ন মতাদর্শের আলোচনা,
সংঘজীবন ও সংস্থা নির্মাণের দিগ্‌দর্শনায় এই সকল
প্রভাতবাণী ছিল সমৃদ্ধ। অনুপম ভাষা ও ব্যঞ্জনা।
প্রতিদিন এই নব নব বাণী শ্রবণে লেখক আশ্চর্য্য বিষয়ে
অভিভূত হইত। মনে হইত কতখানি তত্ত্বভাবনায় বৃদ্ধি
হইয়া থাকিলে ইহা সম্ভবপর। তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপ
সত্তার উদ্ঘাটনে এই বাণী ছিল সহায়ক। লেখকের
বোধে মাঝে মাঝে উদয় হইত বুঝিবা এই অপরিচয়ের
জ্ঞান দায়ী লেখকেরই চিন্তা বিক্ষেপ-প্রক্ষোভ অনাত্ম বস্তুর
প্রতি প্রীতির জের। প্রশান্ত মুহূর্তের আত্মসমীক্ষার ইহা
ফলশ্রুতি।

১৯৩২ হইতে ১৯৫৯ লেখকের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয়
সন্দেহ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইত্যন্তঃ মনোভাবের ব্যারো-
মিটারের উঠানামা। ১৯৫৯-এ সজ্জগুরুজীর অন্তর্ধান।
বিদেহী হন তিনি। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ এই পনের বৎসরে
ক্রমশঃ শ্রীগুরুর মানবিক দাপটের স্মৃতি স্নান হইতে
স্নানতর হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লেখকেরও চেতনা
আসংগ ক্ষেত্র হইতে অসংগ ভূমির দিকে উত্তরিত হইতে
থাকে। এই অধ্যাত্ম ক্রমটি স্বরাগিত হয় বিগত এক
বৎসরে—পরিণত জীবন-সাহায্যে। একটি অপ্রত্যাশিত
দুর্ঘটনায় লেখক গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।
সমস্ত বাহ্য কামনামুক্ত অবস্থায় অশুভ অবসরে ঐকান্তিক
শরণাগতি ও অনন্ত গুরুতত্ত্ব ভাবনার ইহা ফলশ্রুতি।

আজ লেখকের বোধে ধরা পড়িয়াছে যে, নিজের দেহ-
মন বুদ্ধির প্রাকৃত স্বভাব-প্রকৃতিগত ভাবনার পরিপেক্ষিতে
যে সিদ্ধান্ত তাহা কখনই অপ্রাকৃতে অনন্ত নিরপেক্ষ গুরু
বস্তুর ইদিশ পাইতে পারে না। এই ভুলই লেখক এত
দিন করিয়া আসিয়াছে যাহাই তার অন্তর্দ্বন্দ্বের হেতু।
সাধকের আহঙ্কারিক অর্থাৎ দেহগত দৃষ্টির দেখার ও
ভাবনার ভংগিটির স্থলে গুরুদৃষ্টি না খুলিলে গুরুস্বরূপ
অনধিগম্যই থাকিয়া যায়। লেখকের এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘ
অভিজ্ঞতা ও আত্মসমীক্ষারই ফল।

আজ লেখক অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারে যে, সজ্জগুরুজী কখনই কোন অবস্থায়ই কোন ঘটনায়ই স্ব-ভাব, স্ব-ধর্ম, স্বরূপচ্যুত হন নাই। একদা যে ঘটনা তুচ্ছ, যে কথা কথার কথা মনে হইয়াছে, আজ গুরুদৃষ্টিতে তাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টদৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। দৃষ্টান্ত-গুলি সবই সজ্জগুরুজীর জীবন-বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা কর্মমুখর গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ দশকে (১৯৩০—৪০) সংঘটিত।

(১) ১৯৩২ সালে লেখককে সজ্জসপতাকা প্রবর্তকের তার দিবার সময় তাঁর যে মন্তব্য 'আমার ভার আমিই বহন করব, শুধু আমাকে বহন করা।' এ মন্তব্যের তাৎপর্য লেখক তার দীর্ঘ জীবন-সাধনার অতি-জ্ঞতায় বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে কিন্তু বহু বিলম্বে। অন্তঃ-প্রজ্ঞা নাই বলিয়াই কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নেতার পক্ষে এমন অসম্ভব বাক্য উচ্চারণ করা অকল্পনীয়—কখনও কোন নেতা বলেন নাই, বলিতে পারেন না। ভগবৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা ঈশ্বরমানবের পক্ষেই এমন ভবিষ্য-দ্বানী করা সম্ভব।

(২) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়ার উদ্বোধন। ভোরে শ্রীমন্দিরের নাটমন্দিরে সমবেত উপাসনান্তে উদ্বোধন উৎসব সভা। সজ্জ সত্য-সত্য। তত্ত্ব-সজ্জনের সমাবেশে ভক্তি হল ঘরটি। তিল ধারণের স্থান নাই। গর্ভমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সজ্জগুরুজী উদ্বোধন বাণী দিতেছেন। লেখক শ্রোতাদের প্রথম সারিতেই সমাসীন। অক্ষয় তৃতীয়ার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বর্ণনা করিতে করিতে এক সময়ে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথাই আসিলেন। অত্যন্ত আবেগের সংগে কথাটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন বাহুজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। উদ্বাহ হইয়া কেবলই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন 'আমার কেহ নাই, কিছু নাই, কোন বন্ধন নাই। আমি নগ্ন চৈতন্য।' ক্রমশঃ পরিধেয় বস্ত্রাদি একে একে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মুখে বৈরাগ্যের গান। একেবারে উদাম উলংগ।

মিনিট দুই বুঝি সন্নিহিত ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্বের খিড়কী দরজা দিয়া দ্বিতলে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বাণী রহিল অসমাপ্ত।

১৯৩২—১৯৩৩ (অন্তর্ধান) দীর্ঘ দুইটি যুগ। ডোর কোপিন উত্তরায় সার। চাপা ফুলের রঙ। সজ্জ-গুরুজীর গাত্রবর্ণের সংগে হরহ মিল। চমৎকার শোভনীয়। তাঁর না ছিল পকেট, না ছিল টের। এই দীর্ঘকালের মধ্যে লেখক সজ্জগুরুজীকে কখনও অর্থ

স্পর্শ করিতে দেখে নাই। বিগত শতকের কামকাঞ্চন ত্যাগী ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা আমরা পুস্তকে পড়িয়াছি। বর্তমান শতকে সমসাময়িককালে ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্তি বিগ্রহ শ্রীমতিলালকে প্রত্যক্ষ করিলাম। ভারতীয় জীবন সংগীতের মৌল মূল সুর 'ত্যাগেন ভুজিথাঃ'র প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সজ্জগুরুজী। অথচ তিনি ছিলেন স্বাবলম্বনব্রতী, বড় বড় অর্থপ্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা। নিরন্তর নিরলস কর্মচঞ্চল উদীপ্ত প্রাণের মানুষ। ভোগ নয়, স্বজনশীলতাই তাঁর স্ব-ভাব। তপস্বী—তপঃ তপঃ ছিল স্ব-ধর্ম। অবিরাম চলা—চরৈবেতি। নিজেকে উৎসজ্জা করিয়া সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার 'মন্তাব' ইহাই—সৃষ্টির মধ্যে অনুসৃত থাকিয়াও নাই।

বৈদিক ঋষি-রাজর্ষি কালোত্তর যুগে সংঘ-গুরুজীর যুগ-জীবন-দৃষ্টান্ত বর্তমান কালের সাধ্য—যুগগতি-প্রকৃতিরই দিগ্दर्শন বলা যায়।

ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ ও অ-সাধারণ ঈশ্বরকল্প মানুষের পার্থক্য এখানেই—এই নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ততার ক্ষেত্রে। সজ্জগুরুজীর স্ব-রূপ পরিচয়েরও মর্মকথা এখানেই—সংগঠনব্রতে, অর্থসাধনা বা বিপ্লবকর্মে নহে।

(৩) সংঘের পঞ্চ সন্ন্যাসীর মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্বামী চিদানন্দজী। বড় স্বামীজী নামে সজ্জে অভিহিত। সজ্জগুরুর প্রায় সমবয়সী। স্থানীয় অধিবাসী। ঋজু সুউচ্চ দেহ—তপঃজীর্ণ কর্মঠ ব্রতী। কর্কশ বাহ্যচরণের নীচে একশানি সুকোমল হৃদয়। গৈরিক বহির্ভাস। হস্তে দণ্ড। মুখে সতত 'ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদম্'। সম শিরোকার্যগ্রীব—ধ্যানী মানুষ। এমন অনন্তনিষ্ঠ গুরুগত সাধকের দৃষ্টান্ত দুলভ।

১৯৩৪। একদিন সজ্জগুরু বড় স্বামীজীকে নির্দেশ দিলেন কলকাতায় সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যাঙ্কের ভার নিতে। বলিলেন, 'ক্লাইভ স্ট্রিটে, গৈরিক উড়াইয়া জগদ্ধিতায় নিকাম অর্থ সাধনায় প্রমাণ কর যে তুমি নির্লিপ্ত নিঃসংশ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী'।

মুখে দ্বিতীয় কথা নাই। যৌন নীরবেই গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া স্বামীজীর কলিকাতায় গমন। মুখে সেই 'ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদম্'।

এই অ-সাধারণ ঘটনার লেখকের প্রচলিত ধারণায় কেমন যেন ঠেকিল। সুযোগ বুঝিয়া লেখক নিবেদন জানাইল, প্রভু, এ কি করিলেন! ছুঁবোধ্য। ধ্যান ধারণায় সিদ্ধি লাভ করিলে সংঘের কি আরও সুবিমল সৌরভ ছড়াইত না? লোক সংগ্রহের পথও হইত না সুগম?

সহাস্ত্রে প্রত্যুত্তর করিলেন, সংঘ তথা জাতির শুদ্ধ প্রাণের জাগরণ আনাই আমার জন্ম কর্মের অতিসন্ধি।

বুদ্ধির জগৎ হইতে ধর্ম-তত্ত্ব-দর্শনকে-শূণ্যগর্ভে ভাবুকতামুক্ত করিয়া প্রাণের কঠিন বাস্তব ক্ষেত্রে নামাইয়া আনা। তবেই তো জীবনই হইবে ধর্ম। ভারত বুদ্ধির এই অবাস্তব বিলাসের মধ্যে 'এতদিন লাট খাইয়াছে। আত্মকেন্দ্রিক অর্থশ্রোতে যদি নিকাম প্রেমপদ্ম না ফুটানো যায় তবে সে অর্থ বিভৎস বিশ্বংসী যাহা আজ জগতে অনর্থ সৃষ্টির হেতু হইয়াছে; দেখা দিয়াছে উৎকট মূর্তিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব অর্থ।

ক্ষণিকের জ্ঞান নীরবতা। তারপর পুনশ্চ ভারী গলায় বলিলেন, স্বামীজীর মতোই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে এই অদৃষ্টপূর্ব তপোপাশে ব্রত সাধ্য। এই পরীক্ষার সাফল্য একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে।

(৪) মানুষকে অগাধ বিশ্বাস করাই ছিল সংস্কৃত-জীর সহজ স্ব-ভাব। প্রথম প্রথম তিনি লক্ষাধিক টাকা ধারকর্জ করিয়া অনুগতদের হাতে দিয়াছেন মুছিত সৃষ্টি-শক্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে। অর্থের সবটাই সেদিন অপব্যয়িত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া প্রবর্তক ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অভিনব অর্থসাধনার ভার সংস্কৃতজী গৃহ করেন কয়েক জন অনুগত তরুণের উপর। ইহাদের মধ্যে কেহ ব্যর্থ হইয়া, কেহ মরণ বরণ করিয়া, কেহ আত্মকামৈষণার বশবর্তী হইয়া এই গুরুদত্ত গৃহ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছে। ইষ্টের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইয়াছে ব্যর্থ।

বর্তমানে ইহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ পরিণত ৭৪ বৎসর বয়সে শ্রীগুরুর এই গুরুদায়িত্বব্রত সিদ্ধির তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশা এবং আজিকার পারিবেশিক প্রাতিকূল্যতার মধ্যেও। এ কথা আজ বিনা বিতর্কে বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণপ্রসাদ সংস্কৃতজীর এই অভিনব অর্থসাধনার যুগপ্রকল্পের চিহ্নিত সন্তান এবং তাঁর মধ্যে শুদ্ধ অর্থসিদ্ধির, সর্বাংগীন না হইলেও, একটা আভাস পাওয়া যায়। ট্রাস্টের প্রথম ভারপ্রাপ্তদের পরবর্তীকালে অবশ্য কয়েকজন উৎসর্গীকৃত সন্তান শ্রীগুরুর আর্থব্রত সিদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া আজও তপস্তারত।

কৃষ্ণপ্রসাদেরই ব্যবসায়ী জীবনের অজস্র স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে এখানে একটিমাত্র উল্লিখিত হইল।

বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকের (১৯৩০—৪০) শেষাংশেই আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা

লোকসান হওয়ার ফলে ব্যবসায়েরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। মুহম্মান কৃষ্ণপ্রসাদ নৈরাশ্যে হতোম্ম হইয়া পড়ে। এ অবস্থা শ্রীগুরুর গোচরে আনিলে শ্রীগুরু উত্তরে যে পত্র দেন সেই স্বহস্ত লিখিত পত্র হইতেই লেখক পত্রের সারমর্ম এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছে।

নির্বিকার শ্রীগুরু লিখিয়াছেন, 'অর্থের মোহ তোমায় স্বরূপস্থিতিদ্রষ্ট করেছে। তুমি সর্বত্যাগী সর্বহারী সন্ন্যাসী। 'করপুট ভিক্ষা তরুতলবাস' সন্ন্যাসীর সম্বল। নিঃসঙ্গ নিলিপ্ততা সন্ন্যাসের লক্ষণ। শুদ্ধ প্রাণের জাগরণেই বিদগ্ধ অর্থসিদ্ধি। আত্মশুদ্ধিকল্পে জগদ্ধিতায় নিকাম ইষ্ট প্রীত্যর্থ্যে অর্থোপার্জনই মোল লক্ষ্য আত্মস্থ হও হও স্বরূপে প্রতিষ্ঠ—এই আশীর্বাদ।'

এই ঘটনা এবং এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বোঝা যায় সংস্কৃতজী নিঃসঙ্গ ও গুপের সন্ধিস্থলে তটস্থ ভূমিতে সর্বদা বিচরণ করিতেন। নিঃসঙ্গ নিলিপ্ততাকে অবতার পুরুষের মুখ্য লক্ষণ বলা হইয়াছে ভারত-শাস্ত্রে।

ভারতীয় সনাতন জীবনধারার সাধ্য 'ত্যক্তেন ভূজীথাঃ' যার পরাকাষ্ঠা 'কৌপীন বস্ত্রঃ খলু ভাগ্যবস্ত্রঃ'। ভারতীয় মোল চরিত্রের এই মুখ্য লক্ষণ অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও সংস্কৃতজীর জীবনে পূর্ণ প্রকট হইতে দেখিয়া আশ্চর্য বিশ্বয়ে লেখক অভিভূত।

বার বার স্মরণে পড়ে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে 'মনীষী তলস্তয়ের মন্তব্য—'এমন মানুষও রক্তমাংসের শরীরে এই মর্মে বিচরণ করিয়াছে ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো বিশ্বাসই করিবে না।'

ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া লেখকেরও ধারণা বর্তমান বিংশ শতকে এই সেদিন, আমাদের সম-সাময়িককালে সংস্কৃতজীর মতো এমন নরতনুধারী অ-মানব মানব আমাদের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছিল—সে অপ্রাকৃত ঘটনা প্রচারের অভাবে বৃথিবা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। অথচ এমন মহাজীবনের আলোই ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা ও তার চলার পথে আলোকদিশারী হইয়া থাকিতে পারিত। যুগে যুগে পুণ্য ভারতভূমিতে এমন যুগমানবের আবির্ভাব ও তাঁদের জীবনের মহত্তম দিব্য আদর্শই সনাতন ভারত বর্ষকে আগন্তুকালের পথে বিপথগামী হইতে দেয় নাই।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

শরৎ-সাহিত্য জীবনের গান

শ্রীশান্তনু দে সরকার

বাংলা সাহিত্যে উষার আলো নিয়ে এলেন বঙ্কিম-চন্দ্র, উদ্ভাসিত হ'ল নতুন প্রভাত রবিরশ্মিতে। মাতৃ-ভাষাকে শাসকের ভাষার সঙ্গে সমান আসনে বসাবার শুরু হল আশ্রাণ চেষ্টা।

এয়ি এক সাহিত্য বিপ্লবের ক্ষণে আবির্ভূত হলেন শরৎচন্দ্র, লোকসাহিত্যের অভ্যুত্থান রূপে। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের রেলিং ধরে, বাংলা সাহিত্যে সেদিন সাধারণ মানুষের জন্তে পথে নেমে থমকে দাঁড়াল, শরৎচন্দ্র তাকে বয়ে নিয়ে গেলেন ধরে ধরে।

তিনি কথিত ভাষায় সহজ ভঙ্গিতে আমাদের নিত্য দেখা মানুষগুলিকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন চোখের সায়ে। আমরা যেন নিজেদের ছবি দেখতে পেলাম শরৎ-দর্পণে। আমাদের সাহিত্য-স্মরণাগ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল কাহিনীর মধ্যে মা-মাসিমা, ঠাকুর-মা, পিসীমা, ভগ্নী, প্রেমসী প্রেমসীদের স্নেহ প্রেম বেদনা ব্যর্থতার সরল অভিব্যক্তিতে।

মহাকাব্যের যুগ থেকে কাব্য আর সাহিত্যের নায়করা বীরবান, দিগ্বিজয়ী, ত্যাগী, নায়িকারা পরমা স্নন্দরী, পতিব্রতা এবং রোম্যাণ্টিক্সের ছাঁচে ঢালা।

গল্প-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বাস্তববাদী। তাঁর উপন্যাসগুলির নায়ক নায়িকারা মহাকাব্যের প্রভাব মুক্ত। তিনি রূপকান্তের উইল, বৃষরক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা ছাড়া উপনায়ক, খল-নায়ক, উপনায়িকা, সখাসখী ও পার্শ্ববর্তী চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করবার হস্তপ্রাপ্ত করেন। তাঁর মনোরমা, রোহিনী, কুন্দনন্দিনীর জীবনযন্ত্রণা, মাধবী রমা কুসুম কিরময়ীর মধ্যে দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনে গভীরভাবে দাগ কটলেন শরৎচন্দ্র। রামমোহন আর বিভাগসাগরের নারীসমাজকে নিঃপীড়ন ও লাঞ্ছনামুক্ত করার অনুপ্রেরণা সাধারণ মানুষের মনে সঞ্চারিত করলেন শরৎচন্দ্র তার লেখনীর মাধ্যমে। নারীজাতির নতুন মূল্যায়ণ করলেন তিনি তাঁর উপন্যাসে। তিনি অভূতভাবে তাঁর সাহিত্যে বিশ্লেষণ করলেন গোলাপটিকে স্নন্দর করে ফুটিয়ে তোলার আড়ালে আলো বাতাস জল মাটির অবদান কতখানি।

শরৎসাহিত্য সাধারণ পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠল নারী চরিত্রের অপরূপ বিন্যাসে। তিনি অধিকতর সংবেদনশীল মন নিয়ে উপেক্ষিত নারীজাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পুতুল প্রেমসী প্রাণদায়িনী হয়ে উঠল, লাক্ষ্মী বিদ্রোহিনী হয়ে প্রতিবাদ জানালো,

নিমিত্তা সহানুভূতির পাত্রী হ'ল। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটালেন।

আধুনিক অনেক সমালোচক শরৎসাহিত্যকে উচ্চাসপ্রবণ, নায়িকাপ্রধান, একপেশে সাহিত্য বলে থাকেন। তাঁদের মন্তব্য সখ্যে কিছু না বলাই ভাল। যিনি সৃষ্টি করেন তিনি এক, যিনি অপরের সৃষ্টির বিচার করেন তিনি আর এক।

কোনো সৃষ্টিই ক্রটিহীন নয়। শরৎসাহিত্যে নারী চরিত্রের দীপ্তির কাছে পুরুষচরিত্র কিছু স্নান একথাও যেমন অস্বীকার করা যায় না, বাস্তব জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের অন্তঃদৃষ্টিকে ও উচ্চাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর তিন দশকের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। তবুও মনে হয় না বাংলা সাহিত্যের সাবলীলতা তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের বেশি প্রিয় হয়েছে। আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের অমুকরণে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতা চলছে তা কোনো ক্রমেই কালগ্রসী সাহিত্য নয়। শরৎচন্দ্রের ভাষায় এরা পুণ্ডর আঙুন দপ করে জলে উঠে খপ করে নিভে যায়' দাহিকা শক্তির অভাবে। জোনাকির আলো কি চাঁদ-স্বর্ষের মত চিরজ্যোতি বিকীর্ণ করতে পারে?

“গ্রামখানি ছোট, জমিদার আবার ছোট, এয়ি তার দোদীপ্ত প্রতাপ, গরিব প্রজার টু শব্দ করবার জো টি নেই।” এর চেয়ে সহজ সরল ভাষায় কোন আধুনিক সাহিত্যিক এত বেশি বোঝাতে পেরেছেন? অভূত ভাবে দরদী সাহিত্যিকের জন্ম শতবার্ষিকীর সঙ্গে তাল রেখে আজ শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ। যে সহানুভূতি বৃকে নিয়ে তিনি তাঁর কলম দিয়ে নারীর মূল্য লিখেছিলেন আজ যেন তা বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত পেল। এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা, সাহিত্যিকের দিগ্বিজয়।

শরৎসাহিত্য অবিসংবাদীভাবে সাধারণ মানুষের সাহিত্য, সামাজিক স্বার্থ আর কুসংস্কারের নাগ পাশ থেকে নারীমুক্তির অভয় সংকেত। মানুষ তো যন্ত্র চালিত রকেট নয়,—রক্তে মাংসে গড়া। শরৎসাহিত্য মানুষের সাহিত্য, তাই মানুষের ব্যাথা বেদনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাধালের বাঁশী কলের সাইরেন নয়, তাই তাতে রাধা অনুরাগের মুচ্ছনা। শরৎসাহিত্য জীবনের গান, তাই সেখানে হাসি-কান্নার রাগরাগিনীর ছড়াছড়ি।

আনন্দো ব্রহ্মোতি

নটিকেতা ভরদ্বাজ

আজকের পৃথিবীর এইসব মানুষেরা মানুষীরা
একদিন কেউ এখানে ছিল না, থাকবে না
একথা ভাবতে আমার বিস্ময় লাগে,
যদিও এর চেয়ে নিষ্ঠুরতম সত্য আর নেই।
এবং একদিন এরা সবাই
একটি পুরুষ ও নারীর শরীরে মিলিয়ে ছিল
ভাবতে আরো বিস্ময় লাগে।
একদিন আমরা সবাই জননীর জরায়ুর মধ্যে
একান্ত নীরবে শুয়েছিলাম
একথা ভাবতেও বিস্ময়।
অথচ একদিন এখানে এই পৃথিবীর কেউ আমরা
আজকের এই পৃথিবীতে,—কোথাও থাকব না।
ভাবতে ততোধিক বিস্ময়।
এবং ভাবতে আরো এক বিপন্ন বিস্ময় যে

তা সত্ত্বেও একজন মানুষ আর একজন মানুষের বিরুদ্ধে
অস্ত্র শাণায়, গুলি ছোড়ে।
কী রকম পরস্পর পশুর মতন ব্যবহার করে—
লোভ হিংসা শাঠ্য আর ষড়যন্ত্রের
সহজতম শিকার হয় এবং করে
পরস্পর কী রকম দস্তুর জন্তুর মতন
অসহায় মারামারি কামড়া কামড়ি করে
একটুকরো মাটির জন্ত—এক মুঠো সোনার জন্ত
একটি নারীর জন্ত, এক টুকরো কটির জন্ত
একটু যশ, একটু খ্যাতি—একটুকু সুখের জন্ত
কী রকম উদ্ধাম মরীয়া হয়ে ওঠে সবাই।
অথচ আশ্চর্য, নিম্নতলা-কেওড়াতলা এবং
কাশী মিস্তিরের ঘাটে দাউ দাউ করে
আগুন জ্বলছে—অবিরাম জ্বলছে আর জ্বলছে।

॥ শরৎচন্দ্র ॥

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই বাংলার ক্ষয়িষ্ণু অন্ধকার সমাজে
নীতিভ্রষ্ট মানুষ ছিলো আত্মহননে লিপ্ত।
সেই কলঙ্কময় অন্ধ-মূঢ়তার মাঝে
জ্বলেছিলে আলোক-বর্তিকা স্বচ্ছ প্রদীপ্ত।
যেখানে নিপীড়িত-মানবাত্মার অব্যক্ত ক্রন্দন,
দর্পার অকথ্য লাঞ্ছনা, আর দুঃসহ অত্যাচার—
তোমার নির্ভীক চিত্ত ছিল কোরে সর্ব-বাধা-বন্ধন
সেখানে হেনুছে নির্মম-বাণী তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার।
মানব-কল্যাণে যারা তিলে-তিলে দিলো আত্মাহুতি—
তারা হলো নিঃশ্ব, রিক্ত, ভাগ্যহত সর্বহারা দল,
তোমার দরদী মহৎ সৃষ্টি তাদেরি কোরেছে স্তুতি—
বিস্ফোভে হয়েছো ক্ষুব্ধ, কখনো করুণার্জ কোমল।
ভগু-সমাজের চক্ষে যারা পতিত, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য
মিথ্যা দোষে যারা সংসার-ক্ষেত্রে নিয়েছে বিদায়,
তোমার সৃষ্টির বিচারে তারা মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ—
মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ মর্যাদায়।
তোমার সৃষ্টির স্নিগ্ধ সবুজ বিশাল বৃক্ষচ্ছায়
বঞ্চিত পাপী-তাপী যারা যুগে-যুগে পাবে আশ্রয়।
সর্বহারার অন্ধকার-বক্ষে প্রোজ্জ্বল মহিমায়
ভূমি রবে ধ্রুবতারা কালোত্তীর্ণ, অনন্ত, অক্ষয়।

একটা পয়সার প্রার্থনা শেষ হল না

সন্তোষ ভট্টাচার্য

সন্ধ্যার গঙ্গা
আকাশ কাছে নেমে এসেছে।
জাহাজের চিমনির ধোঁয়া
ওপারে বাপসা বিজলী আলো।
জলের ধারে নিবীড় হয়ে বসা
তরুণ তরুণী।
মাথার উপর গাছের ডালে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা
পাখীর কলরব।
কানায় কানায় জোয়ারের জল
জাহাজের ভৌ, গাড়ীর হর্ণ
ঝাল মুড়ি চিনে বাদাম
বেল ফুলের মালা।
আমার নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে
ভঙ্গ করল একটি কাতর আবেদন—
“বাবু একটা পয়সা।”
পথে ঘাটে, জলে জঙ্গলে, আকাশে
সর্বত্র পয়সার প্রাচুর্য,
মানুষের কল্যাণে কত আয়োজন—
তবুও একটা পয়সার প্রার্থনা
পেশ হল না।

মহাকাশে আর্থভট

শ্রীগোপাল বাগচী

আর্থভট ? না আর্থভট ?

নামটা নিয়েই লেগে গেল সোঁতাগুঁতি। খবরের কাগজের পাতায় কথা ছোড়া ছুড়ি। এই নিয়েই কাগজ বেশ মাতিয়ে রাখল পড়ুয়াদের। আসল খবরের দিকে নেই লক্ষ্য। নেই কোন বলিষ্ঠ প্রশ্ন।

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এসব ছুটকান্টিকা বাকবিতণ্ডার কোন জবাব না দিয়ে আপন মনে মহাকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। বয়েই গেছে তার নাম নিয়ে। সে চায় কাজ। তাই সেদিন ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৫ বাঙলা ৫ই বৈশাখ (১৩৮২) শনিঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, দিন দুপুরে সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণার এক ঘাটি থেকে তাদেরই এক রকেটের চুড়ায় বসে সে চোঁচা দৌড় দিল মহাশূন্যের পানে। আমাদের ঘড়িতে তখন ১২ করে ১টা বাজল। আনন্দ মসগুল বাতাসে ভর করে পতপতিয়ে উড়ছে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় পতাকা। কল্যাণশঙ্খ নিনাদিত হচ্ছে দিকে দিকে। চোখে পড়ছে প্রকৃতির বুকে কল্যাণের স্পর্শ। পৃথিবীর ট্রাটোসফিয়ার, আয়নোসফিয়ার আর ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়* ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে সে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছে গেল ৬২৩ কিলোমিটার উঁচুতে। সেখানে এসেই আর্থভট পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমায় লেগে পড়ল।

*Stratosphere :—ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে দশ থেকে বাট কিলোমিটারের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বা আকাশ (এখানে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না)।
আন্তর—আকাশ, Stratres—অনুভূমিক অনুধার মেঘখণ্ড, স্তর মেঘ।
An upper portion of the atmosphere above seven miles more or less depending on latitude, season and weather in which temperature changes but little with altitude and clouds of water are rare.

Iono-sphere.—The part of the earth's atmosphere begining at an altitude of about 25 miles and extending outward 250 miles or more, containing free electrically distances around the earth, and consisting of several regions within which occur one or more layers that vary in height and ionization with time of day, season and the solar cycle.

Vanal-len (va-nal-n).—Van-Al-len radiation belt—a belt of intense ionizing radiation that surrounds the earth in the outer atmosphere.

নিদ্রিত ভারত জেগেছে। মহাকাশযুগে এবার পা বাড়িয়েছে।

৩৬০ কিলোগ্রাম ওজনের স্থল দেহ নিয়ে অবিরাম ঘুরে চলল পৃথিবীকে বেঁঠন করে প্রতি ৯৬'৪১ মিনিটে একবার। পৃথিবীর মাটি থেকে দূরত্ব রেখে চলল ৬২৩ থেকে ৫৬৪ কিলোমিটার, কিন্তু ভুলে যায়নি বিষুবরেখা থেকে ৫৪'৪ ডিগ্রি কোণ বেখে চলতে। তার শারীরিক শক্তি ঠিক রাখতে আহার যোগাচ্ছে সৌর ব্যাটারীর দল। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে দেহকে যতটুকু গরম রাখা দরকার সে ব্যবস্থা সে আগে থেকেই করে নিয়েছে।

ভারতের বিজ্ঞানীরাই তাকে মহাকাশে পাঠিয়েছে খবরের জন্তে এতদিন তো আর সে সোঁতাগ্য হয়নি তাই।

ঘুরে ঘুরে সে কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবে, এই কথা দিয়েই আর্থভট ভূমণ্ডল ছেড়ে এসেছে এত দূরে। করছেও তাই! সে আমাদের জানাবে সূর্য আর দূরবর্তী ছায়াপথ থেকে ভেসে আসা এক্স রশ্মির পরিমাপ কী! সে-ই আমাদের সাহায্য করবে খুঁজে বার করতে নিউটন কনিকা। তা হলেই তো যাচাই করে দেখতে পারব আমরা সূর্য ছাড়াও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক থেকে দৌড়ে আসা গামা বিকিরণ। আর্থভট একথাও আমাদের বলে দেবে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা আয়ন মণ্ডলের খবর কি?

যাত্রার পূর্বেই আর্থভট, টেমপেরেচারের একটা বোরখা তার গায়ের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে, এই চিন্তা করে, যে তার গায়ের ওপরেই আপনা থেকে যেন লেখা হয়ে যায় ঐ বিরাট মহাকাশের মহাতথ্য।

সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের সঙ্গে সোহাদ হুত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাইতো তারা ভারতবর্ষকে জগৎসভায় বিশেষ আসনে বসাতে এত আগ্রহী। মসকোর কাছে বেয়ারস্ লেকের রকেট ঘাটি থেকে তারা লেগে পড়ল নির্দেশ পাঠিয়ে তার জবাব নিতে আর্থভটের কাছ থেকে।

অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরি কোটাও ঐ একই ভাবে আমাদের উপগ্রহের কাছ থেকে খবর আনাচ্ছে।

ভারতবর্ষ আর স্নহস্তির কোলে নিমগ্ন নেই। এইতো এক বছর আগে ১৮ই মে ১৯৭৪এ প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান রাজস্থানের মরুভূমিতে। সে দিনটাও ছিল শনিবার।

আর কারা পাঠিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জারমানি, চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান আর ইটালি। তাদের আসনের সঙ্গেই আসন পাতা হ'ল ভারতবর্ষের এখন থেকে।

আর্যভট্টের শুভযাত্রার ব্রাহ্মমূর্ত্ত উপস্থিত। পাশেই দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রদূত ডি. পি. ধর, ৪২ জন ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, আর রুশ বিজ্ঞানীদের নিয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পল অনুপলে আপন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গুণছেন কি হয়? কি হয়?

শট করে ওপরে উঠে গেল আর্যভট্ট।

ইনটার কসমসের চেয়ারম্যান বরিসপেট্রভভ সাক-সেস, সাকসেস বলে উল্লাস করে উঠলেন। সেইসঙ্গে করতালি বেজে উঠল। টোঁ করে উপগ্রহটি নিমেষে উধাও হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

পেট্রভভ সৌজন্যমূলক অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। এতেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজ্ঞান য়াকাবেমীর ইনটারকসমস পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষে দিলেন তাঁরা, স্বীকৃতির পদক ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান এবং প্রকল্পের ভারতীয় ডিরেক্টর অধ্যাপক ইউ, আর, রাওকে। কিন্তু আর যে সব ভারতসন্তান এই মহাযজ্ঞে আত্ম নিয়োগ করে ছিলেন, কায়ীক এবং বিজ্ঞানী বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রধান ভূমিকা সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের দিকে তো কেউ একবার ফিরেও চাইল না। তাঁদের নামও কেউ একবার মুখেও আনল না। আমাদের কাছে তাঁরা অজাতই রয়ে গেলেন।

— কেন এই বিচার?

কে এই আর্যভট্ট? কি এর পরিচয়? এই ছোট্ট-খাট্ট নাম টুকু নিয়ে এত বাকবিতণ্ডা কেন? একি শুধুই উপগ্রহ?

না। ইনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীর মুকুটমণি, প্রাচীন ভারতের হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিত শাস্ত্রের শ্রুতি মহাপণ্ডিত আর্যভট্ট। ইনিই পৃথিবীর আবর্তনজনিত দিবারাত্র ভেদের আবিষ্কারক। ইনিই আবিষ্কার করেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

তাই আমাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম আর্যভট্ট হওয়ার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, তাঁকে অমর করে রাখতে এর পেছনে যে যুক্তি অনেক! আছে যে এই নামটি বিজ্ঞানীদের মনে সোনার অক্ষরে লেখা তাই। এ যে কোনদিন স্মান হতে পারে না। জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন জুড়ে বসে আছেন, আজও আর্যভট্ট ভারত-বিজ্ঞানের কর্ণধার। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পৃথিবীর সর্বাধিনায়কের সাক্ষর তিনিই রেখেছেন। একে বাদ দিয়ে ভারত যে অন্য কাউকে চিন্তাই করতে পারে না। এর পূর্বসূরী যদিও বা কেউ থেকে থাকেন এ বিষয়ে, তাঁর নাম আজও জানা নেই। তাই ইনিই প্রধান।

‘আর্যভট্ট’ আমাদের কি দিয়ে গেছেন? কি তাঁর আবিষ্কার? তিনি বলেছেন—

“অনুলোমগতিনৌহু ওশুত্যাচলং বিলোমগং যদ্বৎ।

অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম ॥”

পূর্ব মুখে ভেসে চলেছে একটা তরী। আরোহীরা দেখছে উভয় কূলের অচল বৃক্ষশ্রেণী, পাহাড় পর্বতাদি পশ্চিম দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই প্রকার লঙ্কাবাসী (নিরক্ষর দেশ) অচল নক্ষত্রগুলিকেও পশ্চিমদিকে ধাবিত হতে দেখে।

আর্যভট্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে জ্যোতির্বিদ কোপার্নিক ইউরোপে এই তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। কিন্তু আর্যভট্ট কবেইতো এর কারণ বলে দিয়ে গেছেন। আবার বিশ্ব রেখা যে লঙ্কার ভূপৃষ্ঠ অতিক্রম করেছে তাও তিনি বলে গেছেন।

স্বর্ষ এবং চন্দ্রগ্রহণের কারণ আর্যভট্ট সবই ঠিক স্থানতেন। চন্দ্র ও গ্রহসমূহের কারোর নিজের যে কোন আলো নেই—স্বর্ষের আলোকেই তারা আলোকিত এ মত তিনি ব্যক্ত করেন। গ্রহগুলি পৃথিবীর মত স্বর্ষের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের ভ্রমণপথ বা গ্রহণ কক্ষ যে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নয় নীচোচ্চ বৃত্ত (epicycle) অর্থাৎ অনেকটা দীর্ঘ বৃত্তের (ellipse) মতো তিনি এ কথা বলেছিলেন।

ভারতীয় হিন্দুরাই প্রথম জ্যোতিষ গণনার সাহায্যের জন্তে দুই নিয়মে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করেন। তাঁরা বীজ-গণিতের এইসব সূক্ষ্ম গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রে আর জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেছেন। কোলক্রেই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। বলেছেন,—“যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, ভারতবর্ষ ও আলেকজেন্দ্রিয়ার দু'জন গণিতজ্ঞ (আর্যভট্ট ও ডায়োফ্যান্টাস) প্রায় সমসাময়িক তবুও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞের পক্ষে একথা বলতেই হবে, যে এ বিজ্ঞানে তিনি অধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।”

ত্রৈয়াশিকও প্রথম হিন্দুরাই আবিষ্কার করেন। আর্যভট্ট প্রণীত গ্রন্থে ত্রৈয়াশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। ভগ্নাংশের শ্রষ্ঠা হিন্দুরাই। হিন্দুরা অতিপ্রাচীন কাল থেকেই ছন্দগণিত (Permutation and combination) জানত। শ্রেণী (arithmetical and geometrical) ব্যবহারও হিন্দুরা জানত। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মও রয়েছে। হিন্দুরা জানত পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, ঘন, বর্গমূল ঘনমূল এই আট রকমের প্রশালী এক কথায় বলতে গেলে হিন্দুরা পাটীগণিতে প্রাচীনকালে অবিসম্বাদিরূপে পৃথিবীর সমস্ত জাতির চেয়ে উন্নত ছিল।

ধর্ম হিন্দুদের জ্ঞানলাভের প্রেরণা জুগিয়েছে। যথা সময়ে ধর্মকার্য করার জন্ত হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের

বিশদভাবে চর্চা শুরু করে দেন। গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায় না, এ তাঁরা জানতেন।

এখনকার পাটিনা যা আগে ছিল কুসুমপুর, সেইখান কার ছেলে এই আর্যভট্ট।

পণ্ডিতেরা বলেন, খৃষ্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতকে এই মহাবিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিল। আবার দেখতে পাই পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি ‘আর্যভট্টতন্ত্র’ রচনা করেন। এরপর ১২১টি শ্লোকে ‘আর্যভট্টীয়’ নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। এই পুস্তক দুখানিতে উপরিলিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে। আর্যভট্টের সময়ে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কুসুমপুর অঞ্চলের মাতৃভাষা বা প্রাকৃতের বৈষম্য বড় একটা ছিল না, তাই সেই ভাষাতেই গ্রন্থ দুখানি রচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এটিও স্মরণ রাখা ভাল যে গণিতজ্ঞের মধ্যে ভাকরাচার্যই সর্বশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত। ইনি ৬৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে এ’র সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘সিদ্ধান্তশিরো-মণি’ রচনা করেন।

দ্বিতীয় আর্যভট্টের আবির্ভাব ঘটে ২৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম আর্যভট্টের অনেক পরে, ইনিও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রচনা করেন ‘আর্যসিদ্ধান্ত’ আর্যভট্টের নাম দিয়েই গ্রন্থখানি বাজারে চালু করেন। ইনি অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রণেতা যে প্রথম আর্যভট্ট নন সেটি অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর একে দ্বিতীয় আর্যভট্ট নামে অভিহিত করা হয়

এরা উভয়েই আর্যভট্ট। প্রথম আর্যভট্ট এবং দ্বিতীয় আর্যভট্ট কেহই আর্যভট্ট নন।

‘আর্যভট্ট’ বলতে প্রথম আর্যভট্টই বোঝায়।

কালীরূপ বন্দনা

(শ্রীকালীপদায় নমঃ)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কণারূপা ভর্তুকা কালী কালী পদশ্চারিনী ।	৯৩	যথার্থ । মন্ত্রযোগ বা শব্দযোগ যথার্থ হলে তা জগৎ
অহং ব্রহ্মস্থিতা কালী কালী সন্তানজননী ॥	৯৪	যায় ।
সূক্ষ্মরূপ অবস্থিতা কালী কালী কুন্তলবিলাসিনী ।	৯৫	শ্লোক ৯৩—৯৫ : অনেক দার্শনিক পণ্ডিত আছেন
ভোগলিপ্সা বরাভয়া কালী কালী লক্ষ্মী স্বরূপিনী ॥	৯৬	যাঁরা সুযোগ বুঝে বলে থাকেন শক্তি উপাসনা
নিশ্চলা বগলা কালী কালী বিদ্যাচলস্থায়িনী ।	৯৭	ব্রহ্মোপাসনা নয় । বেদান্তমতে যাঁর নাম মায়ী বা
কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিকা কালী কালী পুতনানামাশিনী ॥	৯৮	অবিদ্যা, এঁরা তাঁকেই 'আদ্যাশক্তি' মহামায়ী বলে স্থির
সর্পমাথে কৃষ্ণ কালী কালী কালিয়দমনী ।	৯৯	করেছেন । এঁদের সিদ্ধান্ত ভুল । তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ
ধনুর্বাণহস্তা যুগয়া কালী কালী মৃতসঞ্জীবনী ॥	১০০	আগে করবো না । শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাবে
পদাঙ্কে অঙ্কিতা কালী কালী ভক্তা সরোজিনী ।	১০১	ব্রহ্মকৃতশিবস্তবে আছে—'জানে ছা মীশং বিশ্বস্ত জগতো
নির্মাল্য দেবীকা কালী কালী হস্ত প্রসারণী ॥	১০২	যোনিবীজয়োঃ । শব্দে: শিবস্তচ পরং যত্তদ ব্রহ্ম
পারিজাত ফুলরা কালী কালী শোক নিবারণী ।	১০৩	নিরন্তরং ।—আপনি বিশ্বের ঈশ্বর তা আমি জানি,
তপশ্চারণ রতা কাশী কালী ভক্তা কল্যাণী ॥	১০৪	আবার এই নিখিল চরাচর জগতের যোনি বীজস্বরূপ শক্তি
যোগমায়া রূপা কালী কালী অক্ষ পাশাণী ।	১০৫	এবং শিব হুয়ের অভিন্নরূপ পরব্রহ্ম যে আপনি তা-ও
পশ্চাদ্দেশে পূজিতা কালী কালী বিপদতারিণী ॥	১০৬	আমি জানি । ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তাই বলা হয়েছে 'অস
অহং কালী ব্রহ্ম-কালী কালী করমর্দিনী ।	১০৭	জগতঃ...জন্মস্থিতিভঙ্গঃ যতঃ সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তি
লব্ধ প্রতিষ্ঠা শিব কালী কালী শিব সমাপনী ॥	১০৮	কারণান্তবতি তদব্রহ্ম' । যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ থেকে

(ক্রমশঃ)

[টীকাঃ কালীর এবং অগ্ৰদেবতাদের যা রূপ তা কি লীলা না কল্পনা? দার্শনিকদের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাচীনকালে দেখি, অনেকে মন্ত্রময়ী তনু ছাড়া দেবতাদের অগ্নরূপ মানতেন না । মন্ত্রগুলি অবশ্যই নিত্য, চিরন্তন । যারা ঋষি তাঁরা মন্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করতেন কিন্তু মন্ত্রের মন্ত্রময়ী দেবতা বা তাদের ছন্দঃ তাঁরা সৃষ্টি করতেন না । মা কালী নিখিল বর্ণময়ী, সর্ববীজ মন্ত্রময়ী । তাহলেও তাঁর নিজস্ব একটা বীজমন্ত্র আছে । তার সঙ্গে কৃষ্ণবীজের খুব বেশী তফাৎ নেই । মায়ের পদতলে যে শিব শায়িত আছেন তাঁকে কি বলবো? ওঙ্কার? প্রণবের আবার অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, শান্ত, শান্তাতীত এইসব নানা ভূমি রয়েছে । তাহলে কি কালীর পদতলে শব-শিব ঐ শেষের দুটি? জানিই বা কি আর কেমন করেই বা বলি? শিব উচ্ছিন্ন হন না—মুখে বলার না । মন্ত্র যদি কল্পিত না হয় তাহলে মন্ত্রময়ী দেবতাও কল্পিত নন । তিনি প্রকৃত, তিনি

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তা ব্রহ্ম । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কালীকে বলা হয়েছে 'সর্বাদ্যা তু ভবেচ্ছক্তিরাবানন্দ ঘনগোচরা । ব্রহ্মরূপচিদানন্দা পরব্রহ্মেব কেবলম্ ।' সর্বাদ্যা শক্তি আনন্দঘনরূপে অনুভূত হন । তিনি চিদানন্দলক্ষণ শুধু পরব্রহ্মই বটে ।

দেবীভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—'একার্ণবম্ সলিলং রসরূপমেব । পাত্রং বিনা নহি রসস্থিতি রশ্মি কচ্ছিতং ॥ যা সর্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা । তাং সর্বভূত জননীং শরণং গতোন্মি ॥ (দে. ভা. ২ অধ্যায় ৫৫) মহাপ্রলয়কালে জগৎ যখন একার্ণবে পরিণত সেই একার্ণবের জল অবশ্যই রসরূপ তাতে সন্দেহ নেই । পাত্র ছাড়া কখনো রসের অবস্থিতি হয় না তা সর্বাদি সিদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্মার । আধার বিষ্ণু, বিষ্ণুর আধার অনন্তদেব, অনন্তদেবের আধার একার্ণবের জলরাশি । এই জল-রাশির আধার কে? এই ভদ্রই দূরধিগম্য । সব আধারের অবসান হলে সর্বভূতের আধার স্বরূপা জগদ্ধাত্রী

মহাশক্তির পুরম তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়, জগতের সকল আধার যার কাছে আধার ছাড়া আর কিছু নয়, সেই সর্বাধার রূপিনী জননীর শরণাপন্ন হলাম। ‘চণ্ডী’তে আছে—‘সংসারবন্ধ মুক্ত হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধ হুতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী।’—সেই সনাতনী পরমাবিদ্যা মুক্তির হেতু, আবার তিনিই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ এবং তিনিই সর্বৈশ্বরেশ্বরী।

শ্লোক ৯৬ঃ কালী লক্ষ্মী স্বরূপিনী—কুজিকাভ্রের মতে ‘বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীৰ্ত্তিতা। পাতাল-বাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী’ (প্রা. তো. কাণ্ড. ৫, পরিঃ ৬)—দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী হলে তাঁকে বলা হয় কমলা, আর পাতালবাসিনী হলে লক্ষ্মী। ‘স্বতন্ত্রতন্ত্রে’ কমলাকে শ্রীভুবনা ও মহালক্ষ্মী বলা হয়। দেবীর উৎপত্তি নম্রক্বে বলা হয়েছে—পুরাকালে ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বরী তারিণী স্বয়ং চৈত্র শুক্লানবমীতে উদ্ভূতা হন। এই সর্বশক্তিময়ী শিবা ক্রোধরাজি নামে খ্যাত হন। চৈত্রশুক্লানবম্যাস্তে উৎপন্ন্য তারিণী স্বয়ং। ক্রোধ রাজি সমাখ্যাতা সর্বশক্তিময়ী শিবা।’ ইনিই পূর্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র মথনের পর উদ্ভূতা হয়েছিলেন। যিনি কালী তিনিই লক্ষ্মী।

শ্লোক ৯৭ঃ নিশ্চলা বগলা কালী—স্বতন্ত্রতন্ত্রে বগলার উদ্ভবকাহিনী এইভাবে বলা হয়েছে—পুরাকালে সত্যযুগে একসময় অতি প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। চরাচর বিনষ্ট হতে পারে মনে করে বিষ্ণু চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বায়ুবেগ স্তম্ভিত করার জন্ত তপস্যার দ্বারা জননী ত্রিপুরাকে সন্তুষ্ট করেন। দেবীর ক্রপায় বায়ুবেগ স্তম্ভিত হয়। দেবী হরিদ্রা নামে একটি সরোবর দেখে তাতে জলক্রীড়া করতে থাকেন এবং এই মহাপীত রক্তের সামনে জননী বগলারূপা আবিভূতা হন। লক্ষ্য করার বিষয় মেরুতন্ত্রেও বলা হয়েছে ‘অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি স্তম্ভনীং বগলামুখীম্।’ বগলাকে স্তম্ভনী বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমুখ স্তম্ভনে এই বিদ্যার বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৯৮-৯৯ঃ রাধাতন্ত্রের ১৭ পটলে আছে, শ্রীপদ্মিনী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে মহাবাহো

কেশব, সর্বাভরণসংযুক্ত তোমার এই শ্যামদেহ কোথায় পেয়েছ সত্য করে বল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সর্ববিশেষভূষিত দলিতাঞ্জনপুষ্পাভ আমার এই যে শরীর দেখছ তা আমি ত্রিপুরাদেবীর চরণ অর্চনা করেই পেয়েছি। আর এই যে আমার মূর্তি দেখছ তা সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা—‘এম মে বিগ্রহঃ সাক্ষাৎ কালী শব্দরূপিনী।’ (রা. ত. ১৭ পটন)

মহাভাগবতে আছে—‘কদাচিদ্বিষ্ণুরূপাচ বামেচ কমলালয়া। রাধয়া সহিতা কস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিনী।’ আদ্যাশক্তি কখনও বিষ্ণুরূপা—বামাঙ্গে লক্ষ্মী, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপা—রাধিকা তাঁর বামাসঙ্গিনী। কাজেই কালী এবং কৃষ্ণ অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে এই ভাবে যে আদ্যাশক্তি কালীর সাধনার সর্বার্থকাম শ্রীকৃষ্ণ কালীময় হয়ে গেছেন।

রাধাতন্ত্রে বলা হয়েছে ‘দমনং কালিয়স্যাপি যমলাজুন-ভঞ্জনম্……কৃষ্ণস্য পরমেশানি যদ্যৎ কৃষ্ণং বরাননে। তৎসর্বং পরমেশানি কালিকায়্যঃ প্রসাদতঃ।’ (রাধাতন্ত্রম্ ১২ পটল ১৩—১৫)। —কালীয়দমন, যমলাজুনভঞ্জন, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, বক ও কেশী বিনাশ, গোবর্ধন গিরি ধারণ ও দাবানল নির্মাণ এবং অন্যান্য যে সব কার্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদন করেছেন তা সবই মহামায়া কালিকা দেবীর প্রসাদের ফলে।

শ্লোক ১০০—১০৩ঃ অযোধ্যায় ধনুর্বাণ হাতে মূর্তি আছে। পদাঙ্গে অক্ষিতা কালী হলো সতীর পা, নির্মালা দেবীকা কালী হলেন কন্যাকুমারী। একথা স্তোত্রকার বলেছেন।

শ্লোক ১০৩—১০৫ঃ বীরভূম জেলায় অটুহাসে দেবীর ওষ্ঠ পতিত হয়। অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা, মতান্তরে ফুল্লরা। তিনি সর্ব শোক নাশ করেন। কালীই স্বয়ং যোগমায়া। মহাসাধক তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যাগর্ব বলেছেন ‘জীবের নিদ্রা ‘নিদ্রা’, আর ঈশ্বরের নিদ্রা ‘যোগনিদ্রা।’ ‘তোমার আমার মায়ার নাম ‘মায়া’, তাঁহার মায়ার নাম ‘যোগমায়া’।’ পরমেশ্বরীর নিদ্রা-শক্তিও চেতনাময়ী। এসম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

শ্লোক ১০৬ঃ ভারতের উত্তর পশ্চিমখণ্ডে হিংলাজ দেবীস্থান। কাশ্মীরেও গীঠস্থান আছে। মেধা, সরস্বতী,

মহামায়া এবং ত্রিসঙ্খ্যা দেবী আছেন। কিশোরগঙ্গা ও মধুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে পাহাড়ের উপর আছে প্রাচীন সারদাস্থান। আধুনিক নাম সারদি। মহানীলতলে এদের সারদাপীঠ বলা হয়েছে। শ্রীনগর থেকে পনের মাইল উত্তরে ক্ষীরভবানী বা যোগমায়ার বিখ্যাত মন্দির আছে। হরমুখ পর্বতের পাদদেশে গঙ্গা হ্রদ তীর্থ। দেবী—নীলা। অচ্ছাদের আধুনিক নাম অচ্ছাবট। স্থান—কাশ্মীর। দেবীস্থান এটি। শিবকারিণী, শিবধারিণী, সিদ্ধিকায়িনী এবং শক্তিধারিণী দেবী মূর্তি আছে। সিন্ধুদেশে করবীর পীঠস্থান। আধুনিক মুকদুর হলো প্রাচীন সিন্ধুদেশের শর্করার। কালিকা পুরাণে আছে করবীরপুর ছিল ব্রহ্মাবর্তের (বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাব) রাজধানী। স্থানটি দৃষদ্বতী নদীর তীরে। দেবী—মহিষমর্দিনী। জালন্ধরে আছেন দেবী ত্রিপুরমালিনী। জালামুখীতে আছেন দেবী সিদ্ধিদা বা অম্বিকা। একে জালাজীও বলা হয়। কথিত আছে এখানে সতীর জিভ পড়েছিল। কালীর আরাধনা করলে মানুষের বিপদ নাশ হয় তাই তিনি বিপদ তারিণী নামে খ্যাত।

শ্লোক ১০৭—১০৮ : শ্রীকালীপদ বলছেন আমিই সেই কালী, আমিই ব্রহ্ম কালী, আমি ব্রহ্মস্বরূপ। শান্তমত চন্দ্রিকাতে আছে ‘শক্তি ব্রহ্মা শিবঃ শক্তিঃ শক্তিবিষ্ণুশ্চ বাসবঃ। অন্বে চ বহুবো দেবাঃ শক্তিমুলাঃ প্রকীর্তিতাঃ।’ —ব্রহ্মাও শক্তি, শিবও শক্তি, বিষ্ণুও শক্তি এবং অত্যাগ্—বহু যত দেব আছেন সবাই মূল শক্তি, বাসবও শক্তি থেকেই জাত। কুজিকাতে আছে ‘ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্তিতাঃ। প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্বকর্ষা-ক্ষমাঃ প্রবং’ (কুজিকা তন্ত্র ১ম পটল, ৪৮ং শ্লোক) —শক্তি অংশ ত্যাগ করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবগণ সকলেই জড়, কারণ প্রকৃতি ছাড়া কেউ নিজের কর্মসাধনে অক্ষম একথা প্রব নিশ্চিত। মহাকালী এবং মহাকাল চণকাংকারে (ছোলাবীজ) অবস্থিত। চণকের যেমন উপরিভাগে আবরণ থাকে এবং ভিতরে সমভাবে বিভক্ত এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট দ্বি-দল, পরব্রহ্মতত্ত্বও তেমনি বাইরে মায়ার আবরণে আবৃত এবং ভিতরে শিব-শক্তি রূপে পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

—ভাষ্যকার : ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

আষ্টে পৃষ্ঠে শোকাতুর

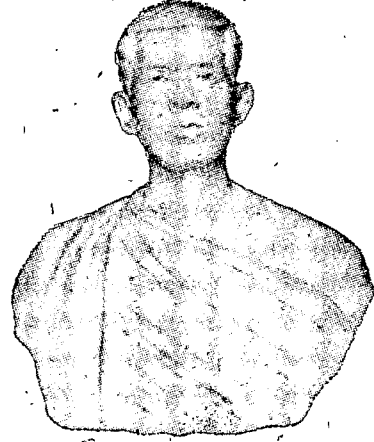
হুসেন আহমদ নূরী

মুঠোর ভেতর সম্মোহিত পাখি আষ্টে পৃষ্ঠে শোকাতুর
কখন হুংপিণ্ড থেকে যায় এইভাবে শিশির বসানো বিশাল হুংপিণ্ডে
রূপান্তরের ক্রিয়াকর্মগুলির অধীত ভুলের ডালপালা, বাহু, মন
কিছুই জানে না, শরীরেই থাকে যাবতীয় রিএজেন্ট
নেশার অস্থৈর্যে বিশেষ ক্ষমতা বাড়ে, বুব দুঃখ, তবু ব্যবহৃত অর্থে
বিরুদ্ধ অভ্যাসে সম্প্রসারণের আগ্রহ বিসর্জিত।
আকাশে অথবা আকাশের অনেক ডিটেলে আষ্টে পৃষ্ঠে শোকাতুর
ভ্রমরেরা পরাগরেণুর মধ্যে যতটুকু থমথমে ভাব সব
হুলের ভেতর ভুলে রাখে এরপর যেন কেউ ফুল হাতে ভালবাসার অসুখে
স্বনিধনের ভয়াল কণ্ঠ ভুলেতে পারে না।
হৃদয়ের সঙ্গে ঝুমুর ঝুমুর
কোরায়ে কোরায়ে শেষ চালচিত্র আর অবৈধ শেকড় পুতে রাখি,
যত দিন যায় শেকল শেকড় ফাটলের মধ্যে
মধ্যবর্তী জীবনের নির্বাপিত সম্মোহন দৃষ্টাপ্য বিষাদে স্থান পায়।
মুঠোর ভেতর ভালবাসা মাথা নেড়ে ওঠে, প্রতিশ্রুতি ছিল
অথচ আশ্চর্য পাখী শূন্যের গভীরে শোকাতুর।

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

(৫)

কিরণেন্দু বাগচী



কানাইলালের বয়স তখন বছর তের হবে। পুণায় ‘আর্য-মিশনের’ ছাত্র। ওর সহপাঠী-সমবয়সী বিষ্ণু-গণেশ পিংলে। বড় বড় চোখ দুটো তার জল-জল করে জ্বলছে। দেখলেই মনে হয় বুদ্ধিমান্ ছেলে, অত্যন্ত মেধাবী। এই বয়সেই সে একটি কিশোরকে হার মানায়, এত বুদ্ধি তার। যা তার একবার কানে ঢোকে সে জীবনে তা আর ভোলে না। স্বাস্থ্যবান্ তেজী ছেলে সে। ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয় তার। দু’জনে হৃদয়তাও খুব। দুই বাড়ীর সকলে তা জানেন।

ঐ টুকু ছেলে পিংলে। স্বদেশ প্রেমের বীজ তখনই তার শরীরে এক মহামহীকর সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য্য! এই বয়সেই মনটা যেন তৈরী হয়ে গেছে।

সে একদিন, চারজন স্বদেশ প্রেমী বীর মারাঠীর ফাঁসীতে ঝোলার ঘটনা কানাইলালকে বললে, কুলে এসে। কানাইয়ের সঙ্গে মনের মিল তার খুব। ঘটনাটা বলবার জন্তে মনটা তার উসফিস করছিল, সে তৈরী হয়েই এসেছিল। এসব কথা শুনে কানাইলালের খুব আগ্রহ।

কুলের ছুটির পর দু’জনে বাড়ী ফিরছে।

পিংলে কানাইকে বললে—শুনছি তোমাদের বাঙলা দেশে স্বদেশীর ঢেউ এসেছে?

কানাই বললে—আমি তত খবর রাখি না।

—তুমি না রাখ, কিন্তু আমি রাখি। আমাদের দেশও কম যায় না, জান! একটা ব্যাপারে তোমার বাঙলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। চাপেকারদের নাম শুনেছ?

—কৈ, না তো!

—বাবার কাছে চাপেকারদের আত্মত্যাগের কথা শুনে বুকটা আমার ফুলে উঠেছিল। আমার কি ইচ্ছে হয় জান? বড় হয়ে আমিও এদের মত নাম রেখে যাব। এই ভাই তিনটির সাহসের কথা শুনে তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। এদের সঙ্গে আর একজনও ছিল। নাম তার রাণাড়ে। ওরা দু-দুটো সাহেবকে খতম করে দিয়েছে, জান! একদম মেরে ফেলেছে। তাই জগেইতো ওদের ফাঁসী হ’ল। চাপেকার ভাইদের নাম কে না জানে, ভারতবর্ষে! তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাণাড়ে। এইতো সেদিনের ব্যাপার তাও খবর রাখনা?

—কি বললে? সাহেব মেরেছিল ব’লে ওদের ফাঁসী হ’ল?

—হ্যাঁ, তাই। সাহেব দুটো ভারি অত্যাচারী ছিল। পুণায় তখন প্লেগের হিড়িক লেগেছে। সেই সময় ওদের অত্যাচার শুরু হ’ল।

—কি করেছিল বলতো?...চল পার্কে বসে শোনা যাক। দেবী হয়ে গেলে তুমি আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে, মার কাছ থেকে দুধ-মুড়ি খেয়ে আসবে। তোমাকে দেখলে মা আর আমাকে বকবেন না। জানতো, মা তোমাদের কত ভালবাসেন। তুমি আমার বাড়ীতে এসেছিলে জানলে তোমার মাও তোমায় কিছু বলবেন না। দু’জনেই মারের হাত থেকে বেঁচে যাব।

—তাই চল। ঐ কোণটাতে বসা যাক। লোক-জন কেউ যাবে না ওখানে।

...বল এইবার।

—চাপেকাররা তিন ভাই, তিনটে যেন ‘রয়েল টাইগার’। বড় দামোদর, মেজ বালকৃষ্ণ, সবার ছোট বাসুদেব, আঠার উনিশ বয়স হবে। সাংঘাতিক কাণ্ড করল এরা।

—কি করল বলই না ছাই ভনিতা বাদ দিয়ে। তাইতো গুনতে চাইছি।

—‘কেশরী’ পত্রিকা পড়েছে?

—না।

—পড়ে দেখো, তিলক দেশের লোককে কেমন ক্ষেপিয়ে তুলছেন। আমি সুযোগ পেলেই পড়ি।

—দূরছাই, ও কথা এখন থাক। যা বলতে এসেছ তাই বল।

—পুণায় প্লেগ শুরু হয়েছে, তারই সুযোগ নিয়ে রায়গের অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হয়ে গেছে, নিরীহ পল্লীবাসীর ওপর। বোম্বাই আর পুণায় তখন কাতারে কাতারে লোক মরছে প্লেগে। যে বাড়ীতে রোগটা একবার ঢুকছে সেই বাড়ীর সব কটাকে শেষ করে তবে ছাড়ছে। তার ওপর ঐ শয়তানটার অত্যাচার। বদমাশটা ছিল সাতরার ম্যাসিস্ট্রেট কলেকটর। বদলী হয়ে এলো এখানে প্লেগ কমিশনার হয়ে। সে প্লেগ তাড়াবে! আস্ত পাগল ছিল লোকটা। তার ব্যাপার-স্থাপার দেখে সারা দেশ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। পাছে সাহেবপাডায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে সেই ভয়ে বেটা করল কি জান? সে নাকি এইভাবে প্লেগ তাড়াবে—ভারত-বাসী ধনে প্রাণে মরলে তার কি ক্ষতি। যদি সে শুনেছে কোন বস্তিতে একজনও প্লেগের রুগী পাওয়া গেছে। ওমনি গোরা সেপাই দিয়ে বস্তীকে বস্তী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। কাউকে ঘরের কোন জিনিস সরিয়ে নেওয়ারও অবকাশ দেয়নি।

—কি বলছ। গরীবদেরও না?

—না, কত কান্নাকাটি তারা করেছে। কে শোনে? বেটা তৈমুরলংয়ের রাজত্ব শুরু করল। কতদিন আর দেশের লোক এই অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করবে বল? প্রথমটা কাগজে প্রতিবাদ জানাল তারা। মহারাজের ‘কেশরী’ আর ‘কলকাতার ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ সম্পাদকীয় স্তম্ভে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। বাধ্য হয়ে

ইংরেজ সরকারকে একটা কমিশন বসাতে হল, এই অভিযোগ সত্য কিনা বিচার করে দেখবার জন্মে।

বিচারের ফলাফল দেশের লোক কেউ জানতে পারল না তখন। হ্যাঁ, দিন কতক পরে রিপোর্টটা গোপনে জানা গিয়েছিল। সে রিপোর্টটা আমার কাছেই আছে তোমাকে দেখাচ্ছি।

কি লিখেছে? দেখি, দেখি, বলে—কানাই গিংলের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল, “The System of discovering plague cases by house to house visitation is absolutely intolerable to the people who looked upon the plague measures as more horrible than the plague itself.” তাজ্জব! এতখানি মিথ্যে কথা কেউ বলতে পারে? লোকগুলো কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

—অন্ধতো বটেই। রায়গের হল কচুটি। লাভের মধ্যে পাগল গেল বেশী করে ক্ষেপে। এরপর যা চরম অত্যাচার হয়েছিল তা শুনেলে তুমি কানে আঙ্গুল দেবে। ছুঁচটা তার রাগের শোধ কিভাবে তুলল জান। হুকুম দিল ঢালাও। আর কি রেহাই আছে? রাই-ফেলে বেয়নেট লাগিয়ে ফিরিঙ্গী সেপাইগুলো এক-একটা পাড়া ঘিরে ফেলে, ঘর থেকে টেনে টেনে বাহিরে বার করে নিয়ে আসে মেয়ে-পুরুষদের, গা থেকে জামা কাপড় সব টেনে খুলে নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছাগল-ভেড়ার মত এক জায়গায় জড় করে, ডাক্তারী পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে। এটা-একটা প্রহসন মাত্র। ঐ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রাখে। ডাক্তারী পরীক্ষা চলতে থাকে। তখন বেটারা দেয় ঘর গুলোতে আগুন লাগিয়ে। দাউ দাউ করে চারদিকে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘরের শেষ জিনিসটুকু বাঁচানোর জন্মে ছোট ছোট করতে থাকে তারা নগ্ন দেহে। আনন্দে উল্লাস করে ওঠে বর্বর ফিরিঙ্গী সেপাইয়ের দল।

—কি বলছ কি?

—বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই না? ১৮৯৭ সালের ১৯ই মার্চের ‘মিত্র’ পত্রিকা এর সাক্ষী, সেটাও তোমাকে দেখাচ্ছি। কি লিখেছিল দেখ—“The men are completely stripped in presence of others and made

to wait in that position for some time, while the women are asked to undo their cholies ('bodices') and to holdup their 'wearing apparel in presence of others.' এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয় ১২ই এপ্রিল ১৮৯৭এ গণডেপুটেশন গেল রাণ্ডের কাছে, অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধের জন্তে। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগ দিলেন। ভবী ভুলবার নয়। শয়তানটা, জবাব কি দিয়েছিল জান? —“পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের, আমি রেহাই দিতে পারি; কিন্তু হিন্দু মেয়েদের ঐ অবস্থাতেই পরীক্ষা দিতে হবে। পুরুষদের বেলায় নিয়ম যা আছে তাই বহাল থাকবে। আমার লুকুম এর চেয়ে আর এক চুলও নড় চড় হবে না। দিনের বেলাতেই ঐভাবে সকলের সামনে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে।”

বালগঙ্গাধর তিলকের লেখনী গর্জে উঠল। ‘কেশরী’ কেশর ফুলিয়ে হুকার ছাড়ল—“তোমরা দেখ! দুঃশাসন আজ দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ ক’রে পৈশাচিক উল্লাসে হাস্ত করছে। দর্পহারী মধুসূদন! কোথায় তুমি? তোমার সুদর্শনচক্র নেমে আসার সময় কি আজও হয়নি চক্রপাণি? মহারাজ্জে কি একজনও ভীম-সেন জন্মায়নি, যে দুঃশাসনের বক্ষঃচিরে রক্তপান করতে পারে?”

কানাইলাল যেন পাথর হয়ে গেছে, স্তম্ভিত হয়ে শুনেছে পিংলের কথাগুলো।

পিংলে বললে, তারপর শোন; মহারাজ্জের তরুণরা রাগে ফুঁসতে লাগল।

—আমার মনে হয় বাঙালী নিশ্চয় এ অত্যাচার সহ্য করতো না।

—বাঙালী বল আর মহারাজ্জীয়ই বল, যার তার পক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব করা এত সোজা নয়। চাই বৃকের কলিজা। হিন্মত দরকার, অদম্য সাহস থাকলে তবেই না পারবে এর প্রতিশোধ নিতে, হ্যাঁ, এমন ছেলেও মহারাজ্জে ছিল।

চাপেকার বাড়ীর তিনটি রত্ন।

তিন ভাই তারা। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। বোম্বাইয়ের ছেলে। অদম্য অদ্ভুত সাহস দামোদরের।

কুস্তীগীর, লাঠিয়াল দামোদর; ‘কেশরী’র খবর প’ড়ে গুলী খাওয়া বাঘের মত হটফট করতে লাগল। স্থির ক’রে ফেলল যে কোন উপায়ে হোক সে রাণ্ডেকে হত্যা করবেই করবে। তবে দূর থেকে বোমা ছুড়ে নয়। সে তো ভীকতা, কাপুরুষতার লক্ষণ। যাবে সে পুণায়। ছোট ভাই দুটিকে আর বন্ধু রাণ্ডেকে তার সঙ্কল্পের কথা জানাল। দামোদরের পদাঙ্ক অনুসরণে সকলেই মন স্থির করে ফেলল।

তিনভাই, গর্ভধারিনীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সোজা পুণায় এসে হাজির হ’ল। সঙ্গে রাণ্ডে।

—তারপর, ভাগ্য তাদের বেশ সুপ্রসন্নই হ’ল বলতে হবে।

—তাহলে নাটকটা বেশ জমে উঠেছিল বল?

—জমবে না আবার। জমা বলে জমা। স্বয়ং দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ যে তাদের সহায়। ওরা এখানে এসেই আশ্রয় পেয়ে গেল লৈখাদিপুল মহলায়, লছমি মাস্টার মন্দিরে। সরকারী প্লেগ নিবারণী শিবিরের খুব কাছে। ভাগ্যিস প্লেগের ভয়ে এখানকার পূজারীটা পালিয়েছিল। তাই সুযোগ ঘটে গেল। দামোদরকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখে সকলে অনুরোধ করল লছমি মাস্টার পূজার ভার নিতে, তাকে। দুপক্ষের কেউই চেনেনা তাদের। খুসীই হল সকলে, কদিন ধরেই মাস্টার সেবায় ব্যাঘাত ঘটছে।

সত্যিই ঠাকুরের অসীম কৃপা বলতে হবে।

—এইবার শোন আরও সুবিধে এসে গেল কি ক’রে। ভগবান যেন একে একে সুবিধে গুলো এদের হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। মন্দিরের পাশের মাঠেই ঠিক সেই সময়ে, বোম্বাই নেটিভ-ইন্ফ্যান্ট্রির চতুর্দশ বাহিনীর তাঁবু পড়েছে। দামোদরকে ওরা এখানে নিয়ে যায়। রেজিমেন্টের কয়েক জনের সঙ্গে ওর খুব ভাব জমে উঠেছে। তাকে তাকে থেকে দামোদর ঐ রেজিমেন্টের দুটি রাইফেল আর দুখানি তলোয়ার আত্মসাৎ করে এনে মন্দিরের বেদীর নীচে ঢুকিয়ে দিল।

মন্দির তল্লাস ক’রে রেজিমেন্টের কেউ তা হুঁস করতে পারল না। ভাগ্যিস বেদীর নীচটা খোঁজা খুঁজি করেনি।

ছোট ভাই বাসুদেবের ওপর ভার পড়ল চাতালে বসে কেবল ঐ অস্ত্রগুলো পাহারা দেওয়ার।

বালকৃষ্ণ আর রাণাড়ে ভোর থেকে ঘুরে ঘুরে র্যাণ্ডের গতি বিধি লক্ষ্য রাখে। কখন কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরছে, কে সঙ্গে থাকছে, সব। বেশী রাত্রিতে মন্দিরে ফিরে দামোদরকে সব রিপোর্টে দেয়।

এইভাবে তিন মাস কাটতে চলল। এরই মধ্যে দামোদরের এক মন্ত সুযোগ এসে গেল। মিলিটারী বন্ধুদের কাছ থেকে খবর বের করে সে একদিন কোথা থেকে দুটো পিস্তল যোগাড় করে আনল।

স্থির হয়ে গেল র্যাণ্ডের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে তাকে গুলী করতে হবে সুযোগ মত, আর তার সহকারী আয়ারফোর্কেও খতম করতে হবে। লক্ষ্যভেদ হল চলবে না।

—সে কি করে হয়, এমন সুযোগ হওয়াও কি সম্ভব?

—হবেই হবে। যতদিন ঠিক মত সুযোগ তাদের হাতে না আসে, ততদিন তারা অপেক্ষা করবে। ঠিক হয়ে গেল দামোদর র্যাণ্ডকে আর রাণাড়ে আয়ারফোর্কে খতম করবে। তাদের ভাগ্যে সুযোগ এসে গেল একদিন।

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। শোননা উপায়টা কি করে এসেছিল।...সে দিন কুইন ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসব, ১৮৯৭ এর ২২শে জুন সন্ধ্যা থেকেই আলোর মালা বুকে পরে পুণাসহর বলমল করছে। ইতর ভদ্র সকলেই উৎসব নিয়ে মেতেছে।

কমিশনার র্যাণ্ডের আজ কত কাজ। এখানে-সেখানে সভা।

পথে লোক চলাচল অনেক বেশী অল্প দিনের চেয়ে। কে কাকে সন্দেহ করে। এইতো সুবর্ণ সুযোগ। জমসেদজী জীজাবায়ের বাড়ীর কাছে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। গাড়ির গতি এখানে স্তিমিত করতেই হবে।

দুজন দুটো রিভলভার নিয়ে, দামোদর আর রাণাড়ে একটা বড় গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

গভর্নমেন্ট হাউস থেকে দুখানা ক্রাহাম গাড়ী বেরিয়ে

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। প্রথমটিতে আছে র্যাণ্ড, আর পেছনের খানিতে আছে আয়ারফোর্ক এবং তাঁর স্ত্রী। গাড়ি দুখানা প্রায় পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে এগিয়ে চলেছে। বাঁকের মুখে আসতেই কোচম্যান ঘোড়ার লাগাম টানল। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। বালকৃষ্ণ সঙ্কেত দিতে দামোদর নক্ষত্র বেগে দৌড়ে গিয়ে এক প্রচণ্ড ঘুসিতে গাড়ির পেছনে দাড়ান সহিসকে ধরাসায়া করে লাফিয়ে উঠল পেছনের পা-দানিতে। গাড়ির মাথার ওপরকার চাকনার পেছনের ফুটটা দিবে সে রিভলভার সমেত দুটো মুষ্টিটা ঢুকিয়ে দিল র্যাণ্ডের মাথা বরাবর।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে আঙ্গুল পড়তেই গুড়ুম করে গর্জ্জে উঠল রিভলভার।

র্যাণ্ডের মাথার খুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল গুলীটা। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে র্যাণ্ডের গলার স্বর একবার আত্ননাদ করে চিরতরে মিলিয়ে গেল।

লুটিয়ে পড়ল অত্যাচারী র্যাণ্ড, ক্রাহামের গদির ওপর।

সামনের গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শুনে আয়ারফোর্ক যেই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখবার করে দেখতে গেছে ব্যাপারটা কি, অমনি রাণাড়ের অনায়াসলব্ধ সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। কালবিলম্ব না করে লক্ষ্যভেদ করল রাণাড়ে।

রক্তাশ্রুত স্বামীর দেহটিকে কোলে নিয়ে মিসেস আয়ারফোর্ক ছুটলেন হাসপাতালে। এগার দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আয়ারফোর্ক মারা গেল।

—সত্যিই অদ্ভুত! অদ্ভুত সাহসী এরা।

—এখন বুঝলে, কেন তারা দিন গুণছিল এই সুযোগের জন্যে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ হবে এই তাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

—হ্যাঁ, বীরপুরুষ বটে। হাত দুখানা জোড় করে কানাই এঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

—দামোদর পাকড়াও হ'ল ৯ই আগষ্ট। পালিয়েও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেল না। এখন তাদের আর কেউ ধরা পড়েনি।

(ক্রমশঃ)

অভিশাপ

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

অনেক বছর হয়ে গেল, তখন আমি কলকাতার কোন একটি হাসপাতালের চক্ষু চিকিৎসক। আমার নাম তখন অনেকের মুখে মুখে। সহরে ছাড়াও দূরে পাড়াগাঁ থেকে অনেক রোগী আমার কাছে চোখ দেখাতে আসতেন। হাসপাতালে আমার কয়েকটি বেড ছিল। এক বৃদ্ধা এসে আমার বেডে ভর্তি হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও তাঁকে দেখে মনে হ'ল যে তিনি একজন বড় বাড়ীর বোঁ ছিলেন। বয়স-কালে তিনি দেখতেও খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর চোখ পরীক্ষা করে দেখলাম। ডানদিকের চোখটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁদিকের চোখটাও ছানি পড়েছে। তাড়াতাড়ি অপারেশান না করলে নষ্ট হয়ে যাবে। ওঁর মুখেই শুনলাম যে দু বছর আগে ডানদিকের চোখ অপারেশান করতে গিয়ে ভেতরে রক্তপাত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর পারিবারিক ইতিহাস নিলাম। বৃদ্ধার স্বামী খুব মাতাল ছিলেন। তিনি জমিদার বংশের ছেলে তবে তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না। বৃদ্ধার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু জন্মের পরই তারা মারা গেছে। অনেক ঠাকুর দেবতার দোর ধরে শেষ বয়সে একটি ছেলে হয়েছে। সেই তাঁকে দেখাশোনা করে। ছেলে তাঁকে খুব ভালবাসে।

ওঁর রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা চোখের জল ইত্যাদি পরীক্ষা করে কোন দোষ খুঁজে পেলাম না। তখন আমি ওঁর অপারেশানের দিন স্থির করে ফেললাম। কিন্তু, বৃদ্ধা অপারেশানের সম্মতি দিলেন না। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা কোন উত্তর না দিতে আমি চলে যাচ্ছিলাম তখন পাশের বেডের একজন রোগী আমায় ডেকে জানালেন যে ওঁর ছেলে ওঁকে ভর্তি করে দিয়ে সেই যে গেছে তারপর একদিনের জন্তও সে তার মাকে দেখতে আসেনি। হুবেলা বৃদ্ধা নাকি ছেলের জন্তে কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছেন। আমি তাঁর কথা শুনে আবার বৃদ্ধার কাছে এসে বললাম, অপারেশান না করলে আপনার চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার ছেলে হয়ত স্বস্তির বাড়ী গিয়ে থেকে

গেছে। তাঁরা তাকে আসতে দিচ্ছেন না। বৃদ্ধা আমার কথা শুনে আমায় বললেন, তাহলে ত বাবা আমি সুখীই হতাম, আমার ছেলের এখনও বিয়ে হয়নি। আমার চোখ ভাল না হলে সে বিয়ে করবে না বলে দিয়েছে।”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? বৃদ্ধা বললেন, ‘বিয়ে করতে ছেলেকে রোজই একবার করে বলছি, সে রাজী নয়। সে বলে, যে বোঁতো পরের মেয়ে। বাড়ীতে এসে বোঁ যদি আমাকে অন্ধ বলে খুব কষ্ট দেয় তাহলে নাকি খুব কষ্ট হবে। আমার ছেলে এত ভাল তা আমি মুখে তোমায় বলতে পারব না। একদিন আমায় না দেখতে পেলে তার কষ্ট হয়। সে আমায় ছেড়ে কোনদিন কোথাও যায়নি। আর সেই ছেলে কিনা আজ কদিনই আমায় দেখতে আসে না। এটা একটা ভাববার কথা নয়?’ কথাগুলো বলে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন।

আমি ওঁর কান্না দেখে ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, “আপনি আমাকে আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে দিন। আমি আজই আপনার ছেলেকে এখানে আসতে লিখে পাঠাবো। আপনার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই সে আসবে। আপনার কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? তাঁরা তো আপনাকে একবার দেখ যেতে পারেন।”

“আমার আত্মীয়স্বজন অনেক আছে বাবা। কিন্তু তারা আমাকে দেখতে আমুক আমি তা চাই না। ওরাই ত আমাদের সব কিছু ঠকিয়ে নিয়ে আজ আমাদের পথের ভিখিরী করেছে। আমাদের কি না ছিল। টাকা কড়ি সোনাদানা বাড়ী জমি সবই আমাদের ছিল। এখন তারা সব কিছুই গ্রাস করে বসে আছে। যাক্গে ওসব কথা। তুমি বাবু একটু দয়া করে আমার ছেলেকে এখানে আসতে একটা চিঠি লিখে দাও।”

আমি তার পরদিনই—তাঁর ঠিকনায় চিঠি লিখে দিলাম। তিন চারদিন হয়ে গেল। কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে এল না। আবার চিঠি ছাড়লাম তার কোন উত্তর না পাওয়াতে আমি আমার এ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে একটা কড়া চিঠি লিখে পাঠালাম।

চিঠিতে লেখা ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে যদি সে না আসে তাহলে তার মায়ের নাম আমরা বাধ্য হয়েই হাসপাতালের খাতা থেকে কেটে দেব। এর উত্তর, পাবার পূর্বেই ওর ছেলে এসে একদিন বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করে গেল। ছেলে কথা কইতে পারে না। তার নাকি ডিপথিরিয়া হয়ে গলার নালিটা কেটে দেওয়া হয়েছে। তাই সে গলায় ব্যাণ্ডেজ করে তার মাকে দেখে গেছে। বৃদ্ধার পাশের বেডের একাধিলার কাছ থেকে খবরটা শুনে মনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। ভাবলাম অমন ভাবে কড়া চিঠি তাকে লেখা আমার উচিত হয়নি।

বৃদ্ধার কাছে যেতেই বৃদ্ধা আমাকে জানানেন যে তার ছেলের অসুখ না করলে সে কখনই এখানে না এসে থাকতে পারতো না। তাঁর ছেলেকে তিনি চেনেন। ছোট বেলা থেকেই একদিনের জুতুও তাঁকে ছেড়ে সে নাকি কোথাও থাকে নি। তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “বাবা, বলতো কবে আমার ছেলে কথা কইতে পারবে? একটু ফিস ফিস করেও ত কথা কইতে পারছে না। গলায় মাথায় সব ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাছার কাছে আমি গিয়ে থাকতে পারছি না। কত কষ্টই না তার হচ্ছে। গলার ঘাটা কবে সারবে বলতে পার বাবা?”

গলায় ট্রেকিওটমি হয়েছে সে কথা বৃদ্ধাকে না বলে বললাম, “ডিপথিরিয়ার ঘা মাস খানেক থাকে তারপর সেরে যায়। আপনি ভাববেন না আপনার ছেলে ভাল হয়ে যাবে।”

বৃদ্ধা আবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা বলতে পারো ভাল হয়ে গিয়ে কি তোমাদের মতনই সে আবার কথা কইতে পারবে।”

“নিশ্চয়ই পারবে। অনেককে জানি দেখেছি তারা এই অসুখের পর ভালভাবে গান গাইতেও পারতেন। গলার স্বর খারাপ হবে না। কেন ছেলে কি আপনার গান করে?”

“না বাবা, গান করে না। তবে কি জানো আমাদের ঘরের মেয়েরা আজকাল সব লেখা-পড়া শিখেছে। গলার স্বর খারাপ হয়ে গেলে হয়ত কেউ আমার ছেলেকে বিয়েই করবে না। আমি আর কদিন বাঁচবো। ওকে বিয়ে দিয়ে যেতে না পারলে আমার মরেও শান্তি নেই বাবা।

“এবার তাহলে আপনার অপারেশনের বন্দোবস্ত করি?”

“হ্যাঁ বাবা, তোমরা যেদিন বলবে সেদিন আমি রাজী আছি। চোখটা ভাল হয়ে গেলে খোকাকে আবার আমি দেখতে পাবো।” কথাগুলো বলে বৃদ্ধা

মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। ওঁনাকে খুশী দেখে সেদিন ওঁর কাছ থেকে আমি চলে এলাম।

দুদিন পরেই ওঁর অপারেশান হয়ে গেল। অপারেশান ভালভাবেই হয়েছিল। চোখের ভেতরে রক্তপাতের ভয় আমাদের ছিল। কিন্তু রক্তপাত না হতে সে বিপদ কেটে গেল। বৃদ্ধা যে চোখ ফিরে পাবেন সেটা এখন আমরা আশা করতে লাগলাম। বৃদ্ধার ছেলেও রোজ ওঁকে দেখে যেতে লাগলো। আমিও তাকে একদিন দেখলাম। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, স্বাস্থ্য বেশ ভাল। তবে অসুখের পর ওকে একটু রুগ্ন দেখাচ্ছিল। কদিন বেশ কাটলো। আগামী কাল ওঁর চোখের ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেওয়া হবে। ওঁর ছেলেকেও আসতে বললাম। ছেলেটা স্নান হাসি হেসে আমাকে ইশারা করে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর সে আমায় সহজ মানুষের গলার মত বললে, “ডাক্তার বাবু, আপনাকে একটা কথা বলবো। আপনি কিন্তু ওঁকে বলবেন না। ওঁর চোখ একেবারে ভাল হয়ে গেলে তবে ওঁকে ধীরে ধীরে জানাবেন। আমি কিন্তু তখন ওঁর সামনে দাঁড়াতে পারব না।”

ওর গলার স্বরে কোন জড়তা নেই দেখলাম। আমি ওঁর কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, “তুমিত ভাল-ভাবেই কথা বলতে পারছ। তবে তোমার মায়ের সঙ্গে এমনভাবে এতদিন ধরে লুকোচুরি করছিলে কেন?”

ছেলেটা একটু থেমে বলল, “আমাকে উনি চেনেন, আমি ওঁর ছেলের বন্ধু। ওঁর ছেলে সেদিন ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে অফিসে যাবার রাস্তা পার হতে গিয়ে লরীর নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে। আপনাদের চিঠি আমিই খুলতাম। কিন্তু কি যে করবো তা ঠিক করতে না পেরে আমি চিঠির উত্তর দিই নি। তারপর আপনাদের শেষ চিঠিটা পেয়ে আমি এইরকম ছদ্মবেশ ধরে ওঁনার সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। কিন্তু যখন উনি চোখ ফিরে পাবেন তখন ছেলেকে না দেখে আমাকে দেখলে উনি হয়ত রাগ করেই আমায় অভিশাপ দিয়ে ফেলবেন। ওঁরা ত ব্রাহ্মণ। ওঁনার অভিশাপ ত ফলে যেতে পারে তাই আমার ভয় হচ্ছে। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?”

আমি ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে, কিছুক্ষণ পরে বললাম, “আমি নিশ্চয়ই তোমায় সাহায্য করবো। তোমার ভয় নেই। অভিশাপ যদি দেন অন্ততঃ তোমার জন্মে সে অভিশাপ আমি মাথা পেতে নেব।” ছেলেটা স্নানমুখে হাসপাতাল থেকে চলে গেল।

শীল

(শান্তিপর্ব, মহাভারত)

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ রায়, এডভোকেট

মহাভারতের শান্তিপর্বে শুধু যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ রহিয়াছে তাহা নহে। জাগতিক জীবন যাত্রার পক্ষে কল্যাণপ্রদ অনেক মূল্যবান উপদেশও তাহাতে আছে।

লক্ষ্মী-শ্রী এবং ধর্ম “শীল মূল্য”। অর্থাৎ চারিত্রিক গুণাগুণের উপর সুখেশ্বর্য ও ধর্ম নির্ভর করে, এ তথ্য চারিটি শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ উপদেশগুলি জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবমাত্রের পক্ষেই হিতকর এবং পালনীয়।

ধর্ম সত্যং তথা বৃত্তং বলং চৈব তথাশ্রমঃ।

শীল মূল্য মহাপ্রাপ্ত, সদা নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥

হে মহাপ্রাপ্ত, লক্ষ্মীকৃপা, ধর্ম, সত্য, সদাচার ও শক্তি সামর্থ্য (কর্মকুশলতা) এ সবই “শীল মূল্য” ইহা সুনিশ্চিত। তুমি ইহাতে কোন সন্দেহ করিও না। প্রত্যেক মানবেরই চরিত্র এবং পারম্পরিক ব্যবহারের উপরই লক্ষ্মীকৃপা ও ধর্মাদি সর্বদা নির্ভর করে। “শীল মূল্য” অর্থাৎ ব্যবহারাত্মক।

শীল কি? পরবর্তী শ্লোকে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

অদ্রেহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা শিরী

অনুগ্রহশ্চ দানশ্চ শীলমেতৎ প্রশস্ততে ॥

যদন্যেযাং হিতং ন যাদাঅনঃ কর্মপৌরষম্

অশত্রুশেত বা যেন ন তং কুর্যাৎ কথঞ্চন ॥

রুচ, কটু কিংবা অপ্ৰীতিকর বাক্য দ্বারা কাহারও প্রাণে কষ্ট দেওয়া দোষণীয়। কোন কর্মদ্বারাও অপরের মনে দুঃখ দেওয়া অকর্তব্য। এমন কি মনে মনে কাহারও প্রাণে দুঃখ হয় এমন চিন্তা করা অনুচিত। শীল বা স্বভাবের শুচিতা রক্ষার্থে উক্ত-প্রকার মানসিক ভাব রক্ষা করা অপরিহার্য। বিশেষতঃ লক্ষ্মীকৃপায় এ প্রকার চারিত্রিক সংযম রক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

অপরকে শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করা এবং যথাশক্তি দান করাও শীল বা সং-স্বভাবের অঙ্গ।

যে কর্ম (পুরুষার্থ) বা ব্যবহার অমঙ্গলজনক এবং যাহা লোক সমক্ষে ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, এমন কর্ম কখনও করা উচিত নহে। এ ভাবের ব্যবহার বা আচারই শীল পদবাচ্য।

তত্ত্ব কর্ম তথা কুর্যাদ্ যেন শ্লবোত সংসদি

শীলং সমাসেনৈত কণিতং কুরু-সন্তম্।

হে কুরু সতম, সূতরাং যে কর্ম বা ব্যবহার জনপূর্ণ সভাতে প্রশংসার যোগ্য, সে-রূপ কর্মই করিবে। সংক্ষেপে তাহাই “শীল” পদবাচ্য।

যদ্যপ শীলা কৃপতে, প্রাপ্নুবতি শ্রিয়ং কচিং

ন ভৃঞ্জতে চিরং তাত সমূল্যশ্চ নশ্বন্তেতে।

হে রাজন, কখনও শীল-হীন ব্যক্তি ধন সম্পদের অধিকারী হইলেও, তাহা অধিককাল ভোগ করিতে পারে না। পরন্তু তাহার সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সূতরাং এক মাত্র শীল-যুক্ত ব্যক্তিগণই দীর্ঘকাল ধনৈশ্বর্য ভোগ করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মীকে চঞ্চলা বলা হয়। লক্ষ্মী কৃপায় অনেকেই ধনসম্পদ লাভ হয়। কিন্তু উক্ত প্রকার “শীলের” অভাবে, অনেক ক্ষেত্রেই শেষ রক্ষা হয় না—সমূলে সব উৎখাত হইতে দেখা যায়।

এ ক্ষেত্রে শান্তি পর্বের অন্য একটি শ্লোক অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাই উল্লেখ করিলাম।

দর্পো নাম শ্রিয়ঃ পুত্রো যজ্ঞেধর্মা দিতি ঋতিঃ

তেন দেবাসুরা রাজন নীতঃ সুবহবোঃ ব্যয়ম্।

রাজন, ধন-সম্পদের পুত্র দর্প। এই দর্প অধর্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা ঋতির বচন। এই দর্প বহু দেবতা, অসুর-গণকেও বিনাশ করিয়াছে। অতএব সাবধান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠস্থানীয় ঘোষণা করে আত্মতৃপ্তিতে আমরা আত্মহারা। সমীক্ষা করার সময় নেই। সরকারী কার্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনো বাংলা ভাষাকে সম্যকরূপে গ্রহণ করেন নি। বাংলায় লিখিত পত্রের উত্তর আসে ইংরেজীতে। ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রে ইহার ব্যতিক্রম। স্থানীয় ভাষায় না লিখলে ফেলে দেওয়া হয় আবর্জনা স্তূপে। ইংরাজিতে প্রেরিত সংবাদ স্থানীয় সমাচার পত্রে প্রকাশিত হয় না। এত গেল ভাষার কথা। বাংলাসাহিত্য সমীক্ষায়ও বিষাদ যোগ। কিছুদিন পূর্বে ‘সম্মেলন’ মাসিকের শারদীয়া সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “সাহিত্য : বিষন্ন প্রহর” প্রবন্ধ প্রণিধান যোগ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজে নগণ্য লেখকরূপে সাহিত্য সেবায় প্রতি পদক্ষেপে বিভ্রমণা অনুভব করছি। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়ে নিরাশ হয়ে ভাবতে থাকি নিজের সামর্থ্যে কোন প্রকারে পাঁচশত কপি প্রকাশ করতে পারি কি ?

স্বাধীনতোত্তর যুগে বিশ্বমাত্রে আমাদের স্থান কোথায় একটু ভেবে দেখা যাক। আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, জার্মানীও শিক্ষা-দীক্ষায় চরম শিখরে উঠেছে, তাদের কথা বাদই দিলাম। ২ কোটি লোকের দেশ রুমানিয়া সম্পর্কে ‘শ্রীঅমৃত প্রীতম হিন্দী’ দৈনিক ‘গান্ধী’ পত্রিকার “পুস্তকের দেশ রুমানিয়া” প্রবন্ধের অনুবাদ দেশবাসীর সপীপে উপস্থিত করছি :

“বেতন পেয়েই রুমানিয়ার লোক সর্ব প্রথম উপস্থিত হন পুস্তকের দোকানে। এ প্রবাদ বাক্য প্রথম শুনে পাই বৃন্দাপেক্ষের এক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে। এ প্রবাদ বাক্য প্রথম আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভবপর ছিল না। শুনতে পেলাম রুমানিয়ায় বী. পী. টী. নামে এক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের নামের

অর্থ এই যে “প্রত্যেক ব্যক্তির পুস্তকালয়”। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সপ্তাহে একটি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংস্করণে ৭৫০০০ কপি থাকে। প্রত্যেক পুস্তক অনেকবার প্রকাশিত হয়। লোকপ্রিয় গ্রন্থের ত কমপক্ষে ২৫১০০ সংস্করণ হয়। ইহা ত শুধু উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানদ্বারা প্রকাশিত পুস্তকের হিসাব নিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক তিনদিনে দুই খানি নূতন পুস্তক রুমানিয়ায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমি শুনে স্তম্ভিত হই যে ২ কোটি অধিবাসির দেশে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৮ হাজার নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটি, ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ৪ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পরিস্থিতিতে যদি রুমানিয়ায় পুস্তকের দেশ বলা যায় তবে অত্যাুক্তি হয় কি ? রুমানিয়া ভাষায় আমি অনভিজ্ঞ কিন্তু ঐ দেশে রেশমে ও চামড়ায় বাঁধাই পুস্তক দেখেই অনুমান করতে পেরেছি যে লেখকের স্বপ্ন সার্থক। জহারিয়া ষ্ট্যান্ডার অনুবাদ গ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছিল। এ গ্রন্থ আমাকে এত প্রভাবান্বিত করেছিল যে পরে ইহা আমি নিজের ভাষায় অনুবাদ করি। মেরিন সোরেস্যুর এর কবিতা ভারতে ফিরিবার পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অনুবাদ পাঠ করি। রুমানিয়ায় ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, কালিদাস, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, আর. কে. নারায়ণ, রাজারায়, রেণু যশপাল, শিবশংকর পিল্লই প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থাবলী রুমানিয়া ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। ধন্য পুস্তকের দেশ রুমানিয়া।”

২ কোটি লোকের দেশ রুমানিয়ার সংগে আমাদের ৫০ কোটি লোকের দেশের তুলনা করলে আমাদের স্থান কোথায় ভাববার বিষয় নয় কি ?

সংক্ষিপ্ত

ভারতপথিক রামমোহন ও রাধানগর—কল্যাণ ব্রহ্মচারী। পরিবেশক—জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯, প্রকাশক—রামমোহন প্রচার সভা, ৬বি রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৫ পৃষ্ঠা—৯৬+৫, মূল্য—দশ টাকা।

অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ছিল ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। নিজের কাছে তার নিজ পরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময়ে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হলো। এই দেশে, সেই আত্মবিশ্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগোরবের কালিমায় আবৃত। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছিলেন, ‘তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ।’ সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন সেই যুগে। তাঁর মননের বিপুল বিস্তার, তাঁর উদারপ্রাণতা রামমোহনকে আধুনিক যুগের প্রথম চিন্তানায়করূপে চিহ্নিত করেছে।

রাজা রামমোহনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রাধানগর। এখানেই রামমোহনের জন্মস্থান। শ্রীযুক্ত কল্যাণ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংকলন করেছেন বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য ও বক্তৃতা আলোচ্য গ্রন্থে। এই সংকলন গ্রন্থে শ্রীকল্যাণ ব্রহ্মচারী রাধানগরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। রাধানগরকে তিনি বলেছেন নবাবজের গঙ্গোত্রী। রামমোহনের জন্মই রাধানগরের পরিচয় আজ সমগ্র দেশে, তথাপি এটি বহু সাধক ভক্তের জন্মস্থান বলেও প্রসিদ্ধ। এর কয়েকটি মন্দির স্থাপত্যশিল্পের উজ্জল নিদর্শন। আলোচ্য গ্রন্থে ১৯১৬ সনে রাধানগরে ভিত্তি স্থাপন উৎসব উপলক্ষে শ্রীমুরেল্লনাথ মেন, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীমতী হেমলতা দেবীর, অভিভাষণ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। চুঁচুড়া বার্তাবহ, দি হিন্দু পেট্রিফিক্ট, পত্রিকার রিপোর্ট এখানে সংকলিত হয়েছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য বজেন্দ্রনাথ শীল

স্ববীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, এণ্ড্রুজ, মহেন্দ্রলাল সরকার, সিম্ফার নিবেদিতা, ম্যাক্সমুলার, বিপিন পাল, মুরেল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু এবং আরো বহু দেশী-বিদেশী রাজনীতিবিদ ও মনীষীদের মন্তব্য এখানে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

রাধানগরের বহু মূল্যবান চিত্র এবং তৎকালীন মনীষীদের চিত্রপট এ গ্রন্থেই অন্ততম আকর্ষণ। রাধানগর এখনও পর্যটকদের আকর্ষণীয় হয় নি এ নিয়ে সংকলক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সত্যিই এ আমাদের অক্ষমতা। এদিকে সরকার সচেষ্ট হতে পারেন। শ্রীকল্যাণ ব্রহ্মচারী দূরদৃষ্টির কাজ করেছেন। রাধানগর সম্পর্কে এ জাতীয় গবেষণামূলক গাইড বুক আর নেই বললেই চলে। তাঁকে ধন্যবাদ। এই গ্রন্থের সমাদর হোক এই কামনা করি।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

যুগ ভূমিকায় স্বামী সন্তদাস—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। প্রকাশক—ধনঞ্জয় দাস, সেবক সঙ্ঘ। কাঠিয়াবাবার আশ্রম, সুখচর, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৭৬+১০। দক্ষিণা দুই টাকা।

অর্থ এবং যশের চূড়ায় অবস্থান করেও মুহূর্তে নিজেকে নিঃস্ব ক’রে দেবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল এবং এ হেন ঘটনা একমাত্র পুণ্যভূমি ভারতেই ঘটা সম্ভব। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনেকে কর্মত্যাগ করেন, ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেন; কিন্তু যেখানে এমনি কোন ঘটনাই ঘটে নি, শুধুমাত্র ঈশ্বরলাভের জন্মেই সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ফকির হয়ে সাধনায় বসে গেছেন এমন মানুষ কোটিতে একটি। এমনি আশ্চর্য মানুষ তারাকিশোর রায়চৌধুরী। হাইকোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী পরিণত হলেন সঞ্চলহীন সন্তদাস বাবাজীতে। বাইরের ধন চলে গেল, কিন্তু অন্তরে তিনি রাজা হয়ে উঠলেন। রামদাস কাঠিয়াবাবার একান্ত স্নেহাসক্ত পুত্রস্ব সন্তদাস বাবাজীর জীবন অধ্যয়নসাধনার উজ্জল আলোকে প্রদীপ্ত। এই মহান জীবনের আলেখ্য উপস্থাপিত করেছেন ভক্ত ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী।

‘যুগ-ভূমিকায় স্বামী সন্তদাস’ গ্রন্থখানি জায়তনে বৃহৎ না হলেও বলবো এটি শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর

পাঠকের মতামত

প্রবর্তক সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

বঙ্গাব্দ ১৩৮১, বৈশাখ হইতে চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদকীয় সমূহ বারবার পঠিত, কথিত এবং বিশ্লেষিত হইল। আপনি বেতনভূক্ত সম্পাদক নহেন। প্রবর্তক সজ্জের অন্তরঙ্গ, সজ্জগুরুজীর আখ্যাত বীজপুরুষদের অগ্রতম। সজ্জগুরুজীর শ্রুত আশীর্বাদপূত কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনার উপর মন্তব্য দীন পাঠকের পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু বলছি প্রাণের প্রেরণায়।

সম্পাদকীয় গুলিসম্পূর্ণ সময়োপযোগী, সজ্জের বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্মধারার গতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। পূজনীয় সজ্জগুরুজীর প্রধান কর্মকাল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কর্মের তুলনায় সময় স্বল্প। এই সীমিত সময়ের মধ্যে তাঁর কর্মধারা—প্রভাতবাণী, সজ্জবাণীর মাধ্যমে সৃজাকারে বলিয়া গিয়াছেন। কর্মের বাস্তবরূপ বীজাকারে যে সজ্জ—প্রবর্তক সজ্জ—স্থাপন করিয়াছেন তাহা ততোধিক ক্ষুদ্র। বাস্তব রূপায়ণের একটা আদরা মাত্র। সেই কর্মকে ব্যাপ্তির গুরু দায়িত্ব পড়িয়াছে বর্তমান সজ্জাশ্রমী, সজ্জ-দীক্ষিত, অনুরাগীদের

উপর। বাঙলার ঘরে ঘরে সজ্জগুরুজীর বাণী প্রতি জনের কানে পৌঁছে দিতে হইবে। প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করিতে হইবে এবং স্ব-স্ব জীবনে আচারনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা আদর্শস্থানীয় হইয়া প্রচারের পথে পদক্ষেপ করিতে হইবে।

সজ্জের বর্তমান সভাপতি তাঁর বাঙলার জেলা পরিক্রমা কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিজনের কানে এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে তাঁর সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিজনের প্রাণে উৎসাহ প্রদানের ভার লইয়াছেন। এই কার্য, সময়োপযোগী হইয়াছে তাহা মননশীল, গুণগ্রাহী, মরমী পাঠক মাঝেই অনুধাবন করিবেন। তাঁর বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বাণী এখনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। আপনার লেখনি অব্যাহত রেখে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে সুদীর্ঘজনের আনন্দদান এবং সজ্জগুরুজীর আরদ্র কর্মের ক্রম রক্ষা করুন। এই নিবেদন জানিয়ে শেষ করি।

শ্রীফণীভূষণ সামন্ত

খড়্গপুর

২৬।৭৫

জীবনের অগ্রতম সং ও সফল কর্ম। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার তাঁর উপলব্ধি ও প্রগাঢ় মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন, ‘যে সকল মহাপুরুষ এই মোহঘোর কাটাইয়া আত্মহারা জাতিকে আলো দিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বামী সন্তদাস মহারাজ ছিলেন অগ্রতম।’ গ্রন্থকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন ‘নির্বাক সাধনধারার চিহ্নিত পুরুষ ছিলেন স্বামী সন্তদাসজী।’

‘জীবন ও জগৎদর্শন’ অধ্যায়টি গ্রন্থের একটি মহা-মূল্যবান পরিচ্ছেদ। তাত্ত্বিক আলোচনা তিনি এমন সহজভাবে করেছেন তা যে কোন পাঠকের মন কেড়ে নেবে। শুধু অধ্যাত্মবাদীর জীবন পর্যালোচনাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, গ্রন্থের মধ্যে তিনি ঢেলে দিয়েছেন সাহিত্যের রসধারা। এদিক থেকেও গ্রন্থটি অবশ্য

পঠিতব্য। গ্রন্থকার লিখেছেন, ‘তিনি ছিলেন গুরুগত-প্রাণ—উৎসর্গের হোমকৃত, গুরু কাঠিয়াবাবার হাতের বাঁশী। যন্ত্রী যেমন বাজাইতেন, তেমনি তার দেহ-যন্ত্রাশ্রয়ে সেই সুর ছন্দে-সঙ্গীতে বঙ্করিয়া উঠিত। নিজেকে তিনি এমনি করিয়া নিঃশেষে নিঙড়াইয়া দিয়াছিলেন যে শেষকালে তার আকৃতি-প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত কাঠিয়া বাবার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইত।’

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর ভাগবত জীবন সার্থক হোক, তাঁর লেখনী থেকে যদি এ জাতীয় আরো গ্রন্থ আসে তাহলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। সুন্দর ছাপা ও চিত্র শোভিত হওয়ায় গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। প্রতিটি বাঙ্গালীর এটি সংগ্রহ করা উচিত।

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

সজ্জ সংবাদ

আশ্রমী

গুরুপূর্ণিমা ও চাতুর্মাশ্য ব্রত :

বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৩৮২ (ইং ২২শে জুলাই ১৯৭৫) মঙ্গলবার বেলা ৯।৫৯ হইতে পরদিন ৭ই শ্রাবণ, বুধবার ইং ২৩শে জুলাই বেলা ১০।৫৮ পর্যন্ত গুরুপূর্ণিমা তিথি ছিল।

চন্দননগর কেন্দ্রসভ্যে বুধবার, ৭ই শ্রাবণ গুরু পূজা ও পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন প্রাতঃ ষেষ্টিকায় সকলে আশ্রমে সমবেত হন। প্রথমে গুরু বন্দনা ও ভজন সঙ্গীতের পর সমবেত উপাসনা। দ্বাদশ অধ্যায় গীতা ও সজ্জবাণী পাঠান্তে সজ্জসভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ। বেলা ৭ টায় আশ্রমে শ্রীগুরু বিগ্রহের পূজা, সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি, গুরুগীতাপাঠ ও যুগল মন্দির প্রদক্ষিণ।

বেলা ১১।১৫ টায় শ্রীমন্দিরের দ্বিতলে শ্রীশ্রীসজ্জ-গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে পূজা, ধ্যান, গুরুগীতা পাঠ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

পরদিন হইতে চাতুর্মাশ্য ব্রত আরম্ভ হয়। চাতুর্মাশ্য ব্রত সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের নির্দেশ : “প্রবর্তকসজ্জের প্রতি কেন্দ্রের সভ্যসভ্যাগণ এবং দীক্ষিত গৃহস্থ ভক্তমণ্ডলী এই ব্রত পালন করিবে। প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিবে। ভাগবৎজীবন লাভের জন্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক শুদ্ধ ব্রতচারী হইয়া অবস্থান করিবে।”

চাতুর্মাশ্যকালীন খাদ্য বর্জন—প্রথম মাসে শাক, দ্বিতীয় মাসে দধি, তৃতীয় মাসে দুগ্ধ, চতুর্থ মাসে মৎস-মাংসাদি। চাতুর্মাশ্যের এই বিধান সকল দীক্ষিত সভ্য সভ্যাই পালন করিবে।

চাতুর্মাশ্য ব্রতের পালনীয় বিধি : প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা। মন্ত্রজপ—‘মন্ত্র সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’ প্রতিদিন ১০০৮ বার। একসঙ্গে অসুবিধা হলে প্রাতে ৫০০ ও সন্ধ্যায় ৫০৮ করিয়া ২ বারেও জপ করা চলিবে। স্বাধ্যায় হিসাবে প্রতিদিন প্রাতঃরূপাসনার পর সজ্জবাণী পাঠ ও গীতা আবৃত্তি। সান্ধ্যোপাসনার পর মূলকেন্দ্র চন্দননগরে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬।১৫ হইতে ৭।১৫ পর্যন্ত পণ্ডিত শ্রীঅনিল বরুণ তর্কবেদান্ততীর্থ কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদগীতা কথকতা হইতেছে। পণ্ডিতপ্রবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মূললিত কণ্ঠে

সুরে ও ছন্দে গীতার অর্থ অতি সরল সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ক্রেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রমেও গত ৬ই শ্রাবণ ১৩৮২ (ইং ২২শে জুলাই) তারিখ নিম্নের সূচীক্রমে পূর্ণিমা তিথি ও উৎসব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, রামধূন, উপাসনা, ধ্যান, সংঘ প্রশস্তি, সঙ্গীত, দ্বাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ। বিকালে ভক্ত সম্মেলনে ধর্মালোচনা, সঙ্গীত, কীর্তন, সন্ধ্যারতি, মাতৃমন্ত্র ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্র পাঠে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন প্রবর্তক সজ্জের প্রাক্তন অন্তরঙ্গ সভ্য শ্রীরামমোহন চৌধুরী। আশ্রমের বালক বালিকা ও স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে ব্যক্তব্য রাখেন এবং সঙ্গীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। আশ্রমের প্রাণপুরুষ অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাসের সূচু নির্দেশনা ও পরিচালনায় উৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বোম্বে হইতে শ্রীমতী প্রতিভা বাল্য বর্দ্ধন জানাইয়াছেন—তিনিও তাঁর গৃহে গুরুপূজা ও পূর্ণিমায় সম্মেলন করিয়া খুব শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

নববারাকপুর ও কাকিনাড়ায় মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় গুরুপূজান্তে পূর্ণিমাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নববারাকপুরে শ্রীযামিনীমোহন দাস ও শ্রীমতী স্নেহলতা দাসের গৃহে সম্মেলনের আয়োজন হয়। স্থানীয় সকল দীক্ষিত সভ্য-সভ্যা ভিন্ন বহু ভক্ত প্রতিবেশীও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন অস্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ব্যবস্থাও ছিল।

কাকিনাড়ায় শ্রীপ্রভাত মজুমদার ও শ্রীমতী রমা মজুমদারের গৃহেও অনুরূপভাবে পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বারাসাত হইতে শ্রীসৌবীরকুমার ঘোষ ও শ্রীমতী পদ্মারানী ঘোষও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সৌবীরবাবু সজ্জগুরুদেবের প্রবর্তিত এই সম্মেলন ও চাতুর্মাশ্য ব্রতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, চারিমাস যদি ঠিকঠিক ব্রত পালন করা যায় তাহা হইলে ফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে।



5 SEP 1975

সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার চারশো এবং উড়িষ্যায় তিন হাজার চারশো। শিক্ষিত মহিলা বেকার সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। কেরালায় শিক্ষিত মহিলা বেকার সংখ্যা এক লক্ষ ষোল হাজার।

প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক অধিবেশন :

বাঁকুড়ায় বীর সাতারকরের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা :

গত ২৮শে মে, ১৯৭৫, বিপ্লবী বীর সাতারকরের ৯৩-তম জন্মদিবসে বাঁকুড়াসহরে তাঁর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে প্রবর্তক সজ্জের সভাপতি শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করেন শ্রীদত্ত।

নেতাজী সূভাষ রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ও বীর সাতারকর সরণির সংযোগ-স্থলে হাজার-হাজার নরনারীর কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত-উদ্গীত 'বন্দে মাতরম্' ও 'বীর সাতারকর অমর রহে' ধন-ঘন জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীদত্ত আবেগপূর্ণ স্বরে অশ্রুসজ্জল নেত্রে ব্রোঞ্জ মূর্তিকে জড়িয়ে যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলেন, তখন সেই বিশাল জনতার চোখেও দেখা দিল জল। শঙ্খবাদন, উলুধ্বনি ও বৈদিক মন্ত্রের পবিত্র উচ্চারণের মাঝে শুধু কানে ভেসে আসে গগনবিহারী 'বন্দে মাতরম্' রোল।

সভাপতির উত্থাপিত প্রস্তাব—'বৃটিশ আমলে সাতারকরের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ভারত গভর্নমেন্টকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে।' সভায় সর্ব সন্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন : "বাঁকুড়ার এই পুণ্য দিবসটিতে মহাভারতে ধর্মরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হ'ল বলে' আমি মনে করছি। অতলাস্ত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তাঁর প্রসার। এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশানের ধর্মরাজ্য-গড়ার সঙ্কল্পই আজ আমাদের নিতে হবে।"

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পঃ বঃ হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্মুজচন্দ্র সর্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যম ও আপ্যায়ণ স্মরণীয়।

শিক্ষিত মহিলা বেকারের সংখ্যা :

সম্প্রতি সংসদে প্রদত্ত এক তথ্যে দেখা যায় সারা ভারতে পাঁচ কোটি ষাট হাজার শিক্ষিত মহিলা চাকুরীর প্রত্যাশায় কাটাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে চাকুরী প্রার্থী মহিলার সংখ্যা উননব্বই হাজার, ত্রিপুরায় ছ'হাজার সাতশো, আসামে পাঁচ হাজার, মেঘালয়ে এক হাজার পাঁচশো, মণিপুরে এক হাজার আটশো। বিহারে মহিলা বেকার

১৩৮২ সালের ২০শে আষাঢ় প্রবর্তক সাহিত্য চক্রের প্রাক্তন সম্পাদক প্রখ্যাত কবি ইন্দুগুপ্তের ৫৪-তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরুতে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠিত হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদকীয় ভাষণে কবির কাব্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে চক্রের স্থায়ী সভাপতি শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ও গুরুভাতা শ্রীইন্দুভূষণ রায়ের বাণী পাঠ করা হয়। কবির সম্বন্ধে একে একে তাঁদের বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বশ্রী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ পাল, ধীরেন্দ্রলাল ধর, নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও রমেন আচার্য। সম্পাদিকা আরাধনা গুপ্ত কবিতার মাধ্যমে কবিকে প্রণাম জানান। এরপর কবির কবিতা পাঠ করে শোনান সর্বশ্রী রমেন আচার্য, গোপা আচার্য, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আরাধনা গুপ্ত, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত পাল, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ সাহা প্রভৃতি আরও অনেকে। প্রসাদ দেওয়া হয় উপস্থিত সকলকে।

কবি ইন্দুগুপ্ত স্মরণে :

গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৫ স্বর্গত কবি ইন্দুগুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণসভা হয় কবির সি. আই. টি ফ্ল্যাটে ১০৭, উল্টোডাঙ্গা মেন রোডে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অদ্বৈত শ্রীরণজিৎকুমার চক্রবর্তী। সাধনা প্রামানিকের উদ্বোধন সংগীতের পর সভা সুরু হয়। প্রথমে কবির চিত্রপটে মাল্যদান করেন কবি পত্নী শ্রীমতী আরাধনা গুপ্ত। তারপরে সভাপতি নিজেই একটি মাল্য দান করেন। ছোট্ট ছুটি মেয়ে কুমা ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছুটি মালা পরিয়ে দেয়। কবির ২য় কাব্য গ্রন্থ 'কবিতার জন্ম' থেকে প্রায় সব কয়টি কবিতাই পাঠ করা হয়। সভাপতি কবি ইন্দুগুপ্ত ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় উপাসনা এবং গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। পূর্ণ উদগানে সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীরবি কর

প্রবর্তক পারিশ্রাস, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাকটোন লিমিটেড. ২১৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকনিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত।

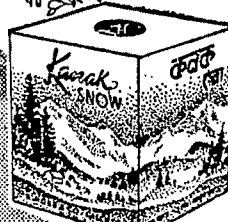


৬০তম বর্ষ : শারদীয়া সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৮২

প্রবন্ধ



আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারিত সামগ্রী



কি প্রায় ১২ টাকা ০০

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce
**INCREASED
RATE OF INTEREST ON
FIXED DEPOSITS**

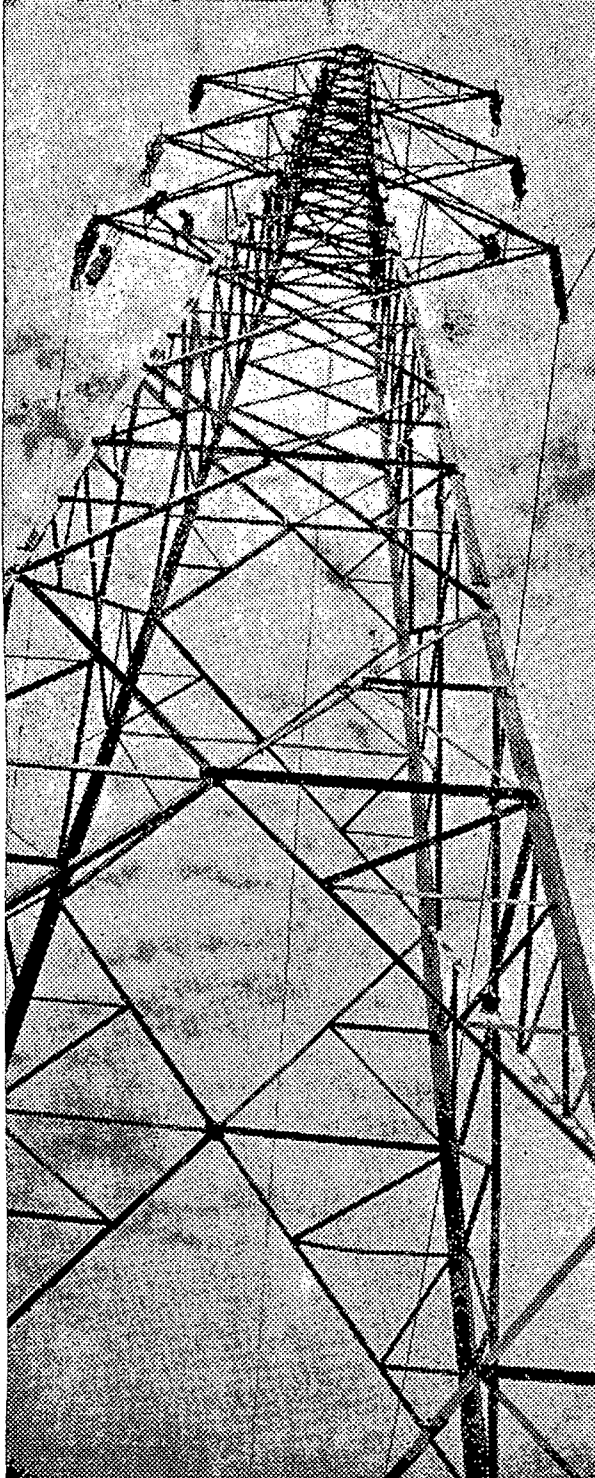
AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

**EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.**

**FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:**

**Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES**



প্রগতির পথে ২০ বছর

আমাদের কুড়ি বছরের জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯৫৫ সালে প্রায় শূন্য হাতেই আমরা কাজ শুরু করেছি এবং ব্যাঙেলে আমাদের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তার এক দশক বাদে। এরপর ১৯৭৪ সালে সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ ২২০ কেডি ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে সাঁওতালডিহির বিদ্যুৎ সরাসরি কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। এই সময়ের মধ্যে, জলচাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও চালু হয়ে গেছে। সাঁওতালডিহির ১২০ মেগাওয়াটের দ্বিতীয় ইউনিটও বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

মাত্র ৪.০১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করে পর্যন্তের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা দাঁড়াবে ৬৬২.১৭ মেগাওয়াট। পর্যন্তের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১,০০০ থেকে বেড়ে ৩,০০,০০০ এর বেশী দাঁড়িয়েছে এবং কর্মীসংখ্যা ৭০০ থেকে এখন দাঁড়িয়েছে ৩৩০০০ এ।

সাঁওতালডিহি এবং ব্যাঙেল—দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেই বর্তমানে সম্প্রসারণের কাজ চলছে। কোলামাটে ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি ইউনিট স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গে জলচাকা ও কাশিয়াঙের দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের কাজও ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যন্তের আরেকটি উল্লেখজনক অগ্রগতি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে। তিনবছরের কম সময়ের মধ্যে পর্যৎ ৭০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছেছে।

আর্থিক অনটন প্রায়ই পর্যন্তের কাজকর্ম জোরকদমে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাসত্ত্বেও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে পর্যৎ এ রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



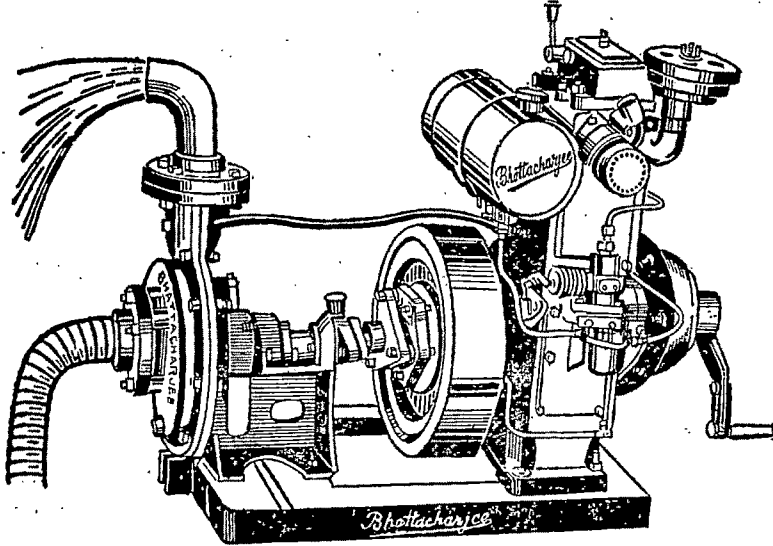
বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

**পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যৎ**

ভারত সরকারের গ্যারান্টি টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্-
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্সো,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, ষ্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত



দৈব আশীর্বাদের মত

দুর্গাপূজা হলো নানারঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব। কিন্তু যারা প্রতিমা গড়েন, উৎসবের অন্তরালে সেই মূংশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। ব্যবসার মরশুমে পূজির জন্যে বেশীর ভাগ মূংশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে। পরিশ্রমের অনুপাতে লাভ থাকে না।

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মূংশিল্পীদের সাহায্য করে আসছে। ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তাঁরা ব্যবসার মরশুমে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে পারেন। মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার—এমনি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো। পূজোর বিক্রির পর ব্যাকের টাকা শোধ করতে হয়।

পূজোর সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মূংশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

॥ প্রবর্তক সাহিত্যসম্ভার ॥

॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥

শ্রীমদভগবদগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড	১২.০০
বেদান্ত দর্শন (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড	২৫.০০
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং)	১০.০০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং)	২.৫০
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৪র্থ সং)	২.০০
আত্মমর্ষণ যোগ (২য় সং)	২.০০
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২য় সং)	২.৫০
সংগঠন (২য় সং)	২.০০
উপাসনা মন্দিরে (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ১ম	৫.০০
ঐ (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং)	৫.০০
শতবর্ষের বাংলা (২য় সং)	৬.০০
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী	২.৭৫
জীবনযোগী গান্ধীজী	২.৫০
নারদীয় ভক্তিসূত্র (২য় সং)	১.২৫
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ	২.২৫
ব্রহ্মচর্যা (৩য় সং)	২.৫০

॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥

জীবনের আলো	১ম ১.২৫, ২য়—২.০০
ভারতের নবজন্ম (২য় সং)	২.৫০
জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (২য় সং)	৩.০০
॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥	
অরবিন্দ মন্দিরে (৩য় সং)	৩.০০
পাতঞ্জল যোগসূত্র (৩য় সং)	০.৭৫
Light to Superlight	15.00
Message & Mission of Prabartak Samgha	2.00
॥ বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ॥	
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	১.০০
॥ শ্রীইন্দ্রভূষণ রায় সঙ্কলিত ॥	
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্জী	১.০০
॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ॥	
গুরুবাণী	০.৫০
উপাসনা	০.২৫

[প্রবর্তক সঙ্ঘের নিত্যদিনের উপাসনা-পদ্ধতি ।
ইহা সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য ।]

বিঃ দ্রঃ—প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্তক সঙ্ঘের সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাদের শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

“প্রবর্তক পাবলিশার্স”—৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিষ্ঠান জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- বিপুল ঘূতের নোন্তা খাবার
- নালেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভাগ
- সরেস দরবেশ ও মিহিদানা
- সুপ্রসিদ্ধ ও বহুখ্যাত বেলের মোরঝা

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।

৮৬ আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৫-১৩৮৩

ফোন : ৩৫-৪৮০১



TCPIER 336175

বাঙলা ও বাঙালীর সেরা উৎসবের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে।
এ কটি দিন সবার জীবনে আনুক আনন্দের মুহূর্তনা। যাত্রী ঘাঁরা—তাদের যাত্রা
হোক নির্বিঘ্ন। প্রবাসের দিনগুলি হোক মধুময়।

পূর্ব রেলওয়ে



প্রবর্তক বিজ্ঞাপন—অখিনন, ১৩৮২

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন, যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

পূজার বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিং, স্ফটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ POLISHING & BUFFING

DOUBLE ENDED-GRINDER
FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

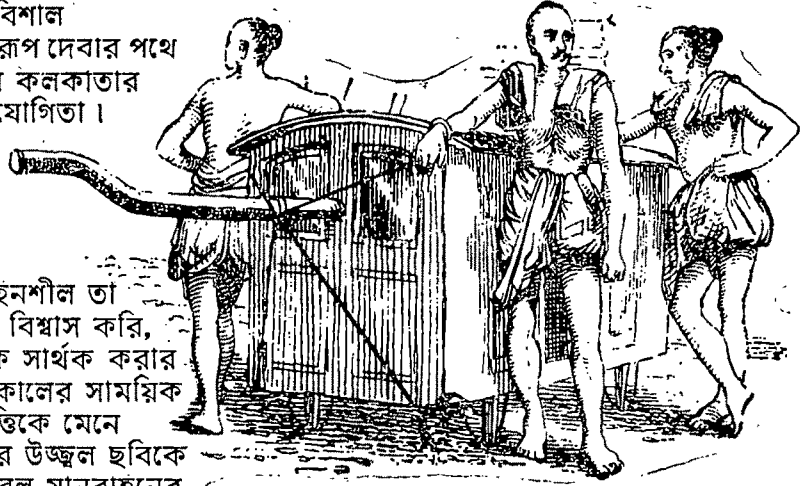
Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় না ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পাল্কি। বিদ্যুতের আলো কিংবা কলে-চলা গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।

আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিসর পথ এবং যানবাহনের সংখ্যালঘতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহাদয় সহযোগিতা।



কলকাতার মানুষ সহনশীল তা আমরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তারা কিছুকালের সাময়িক দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জ্বল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবহু উদ্যোগ।

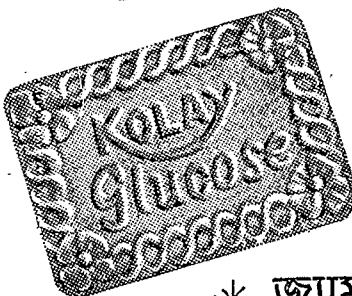
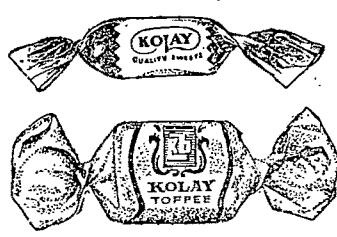
কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল



মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

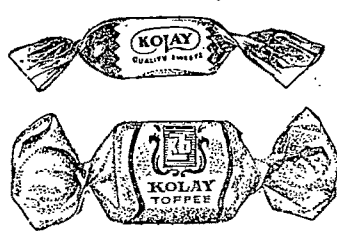
কোলে

* বিস্কুট *
* লেজেন *
* জ্যাম জেলী আচার *

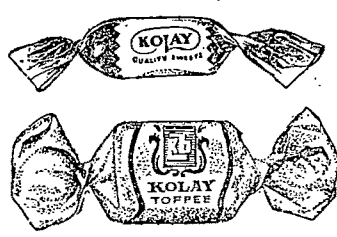





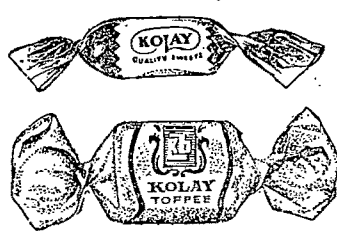
নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০



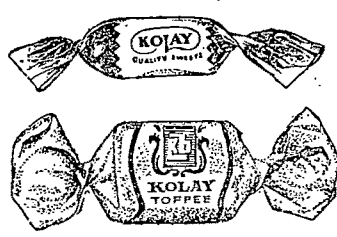


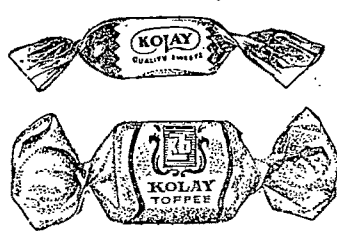


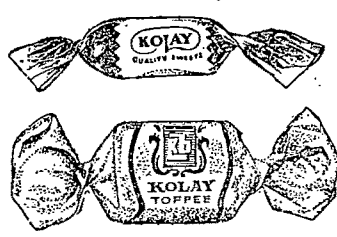


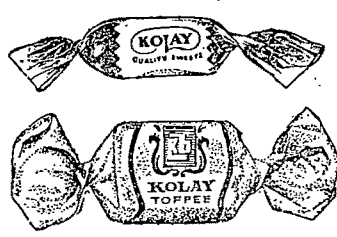


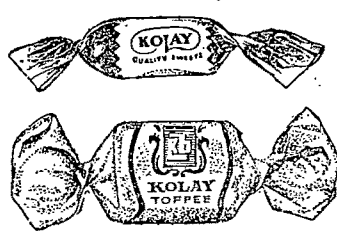


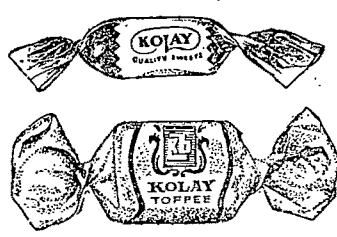


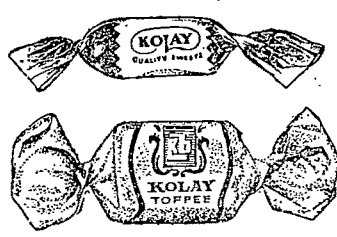


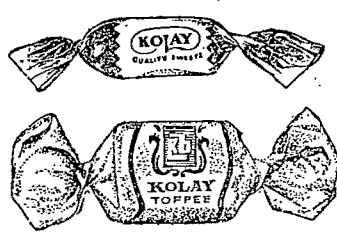


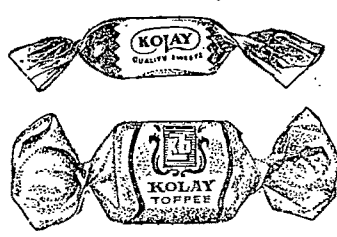


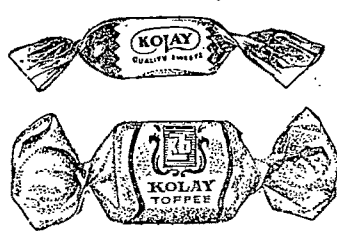


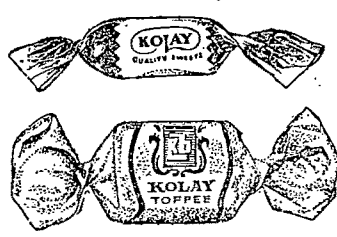


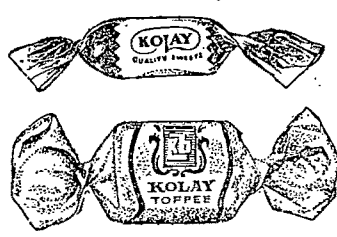


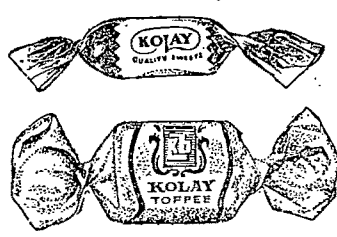


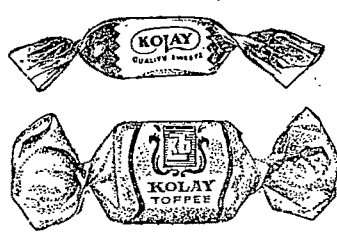


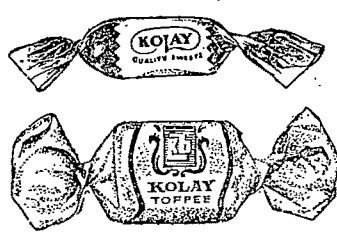


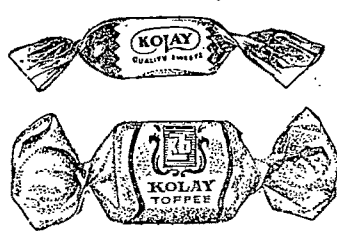


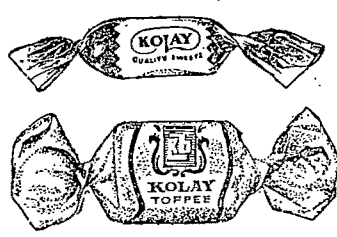


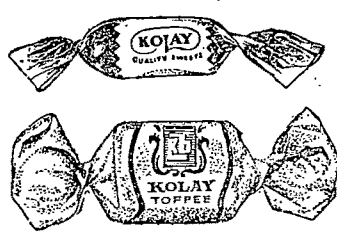


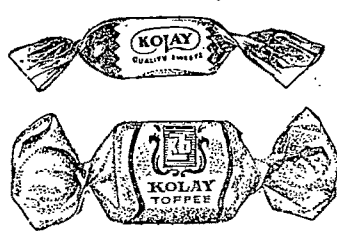


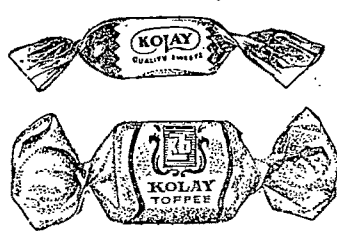


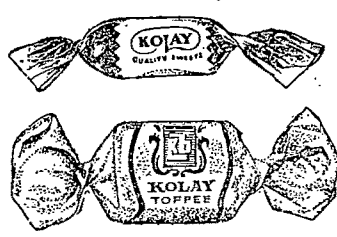


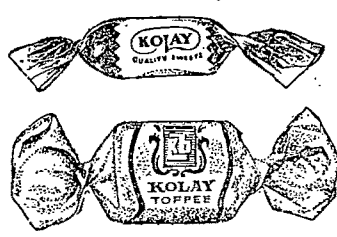


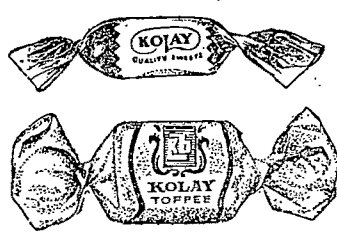


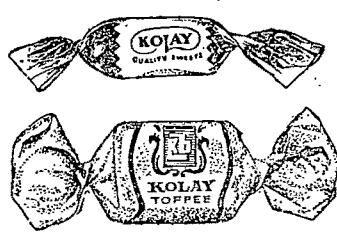


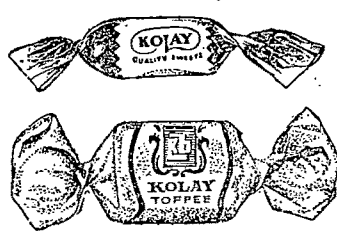


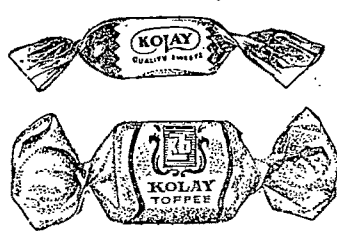


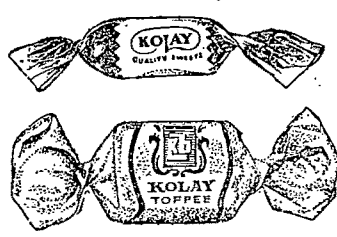


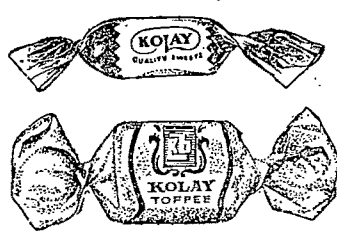


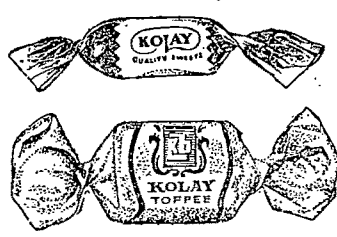


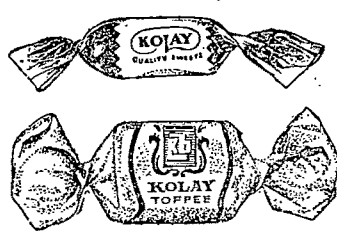


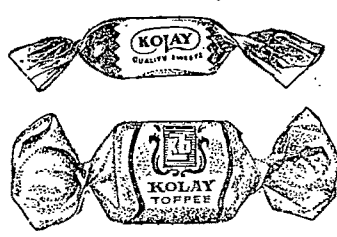


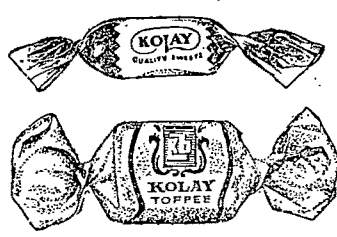


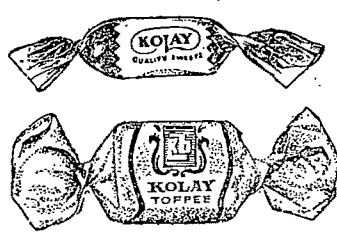


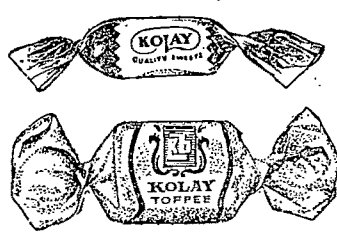


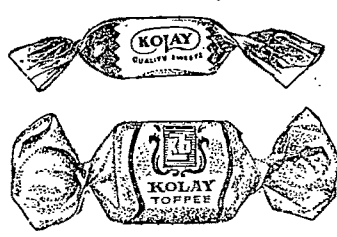


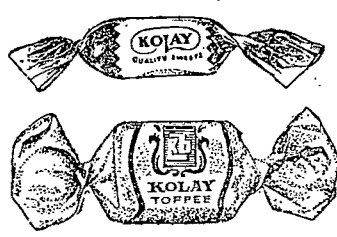


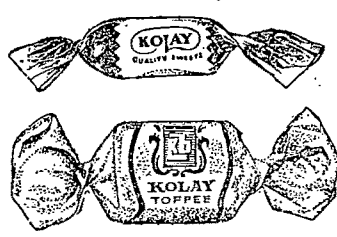


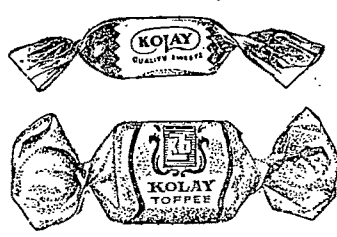


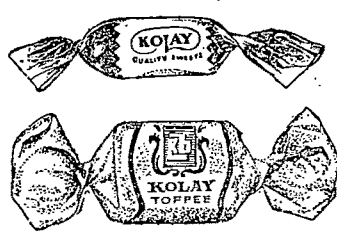


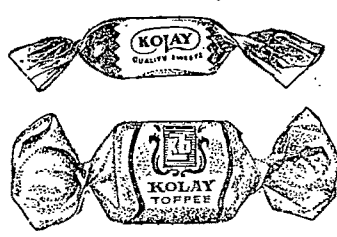


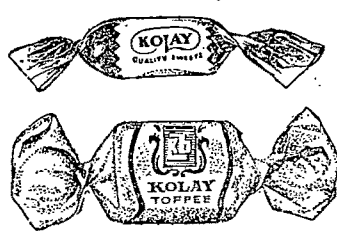


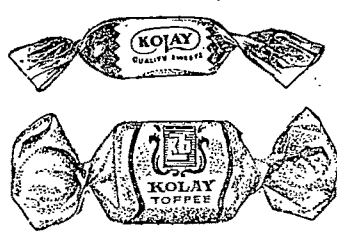


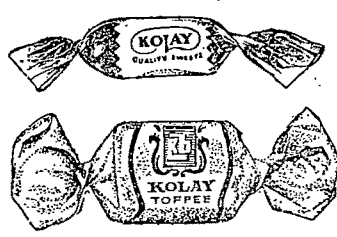


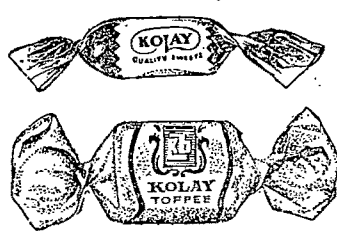


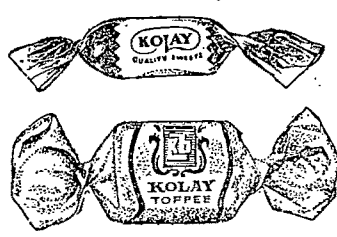


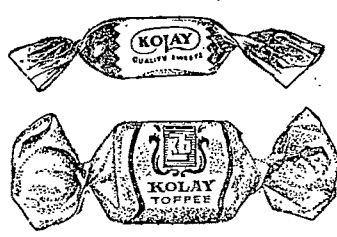


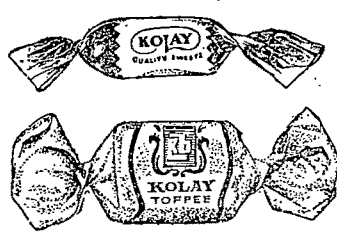


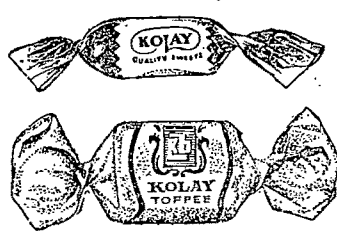


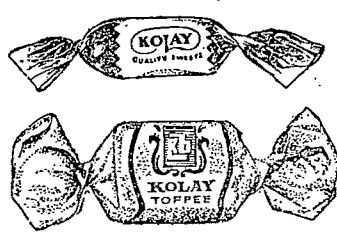


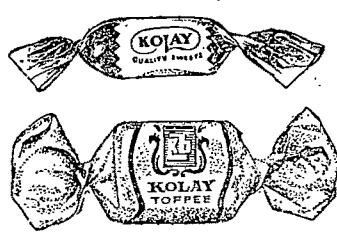


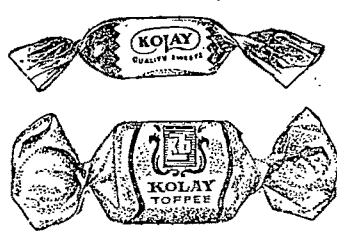


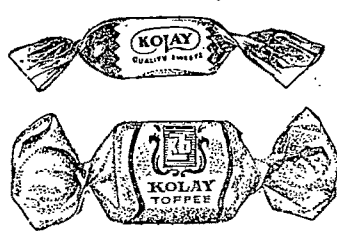


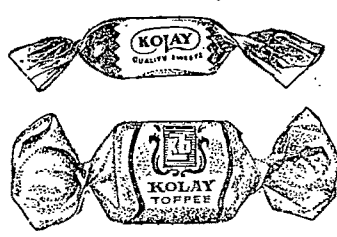


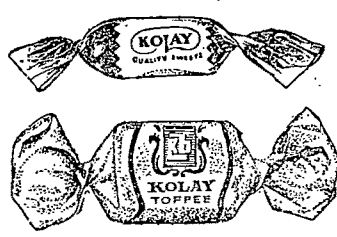


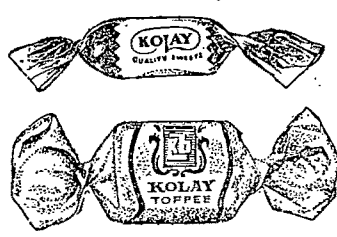


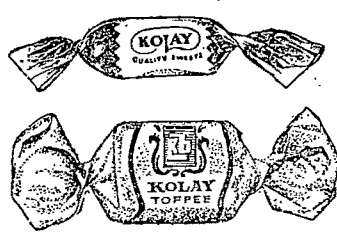


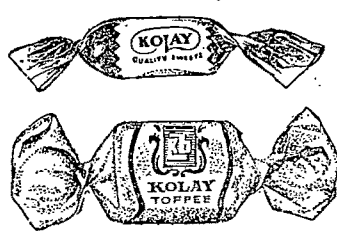


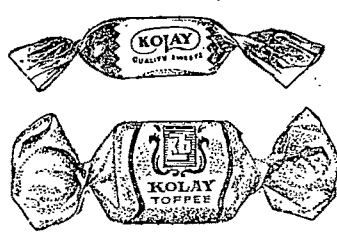


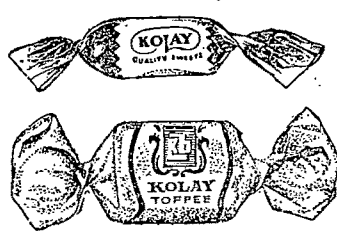


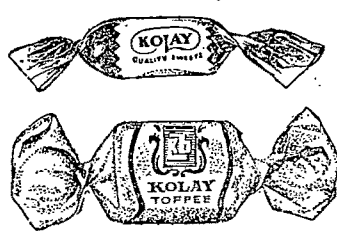


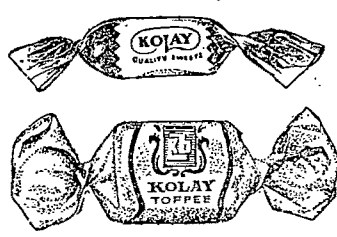


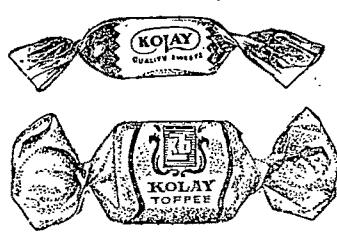


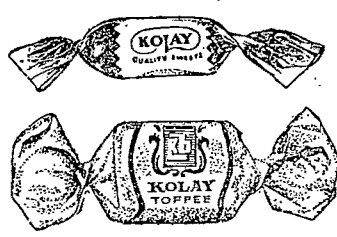


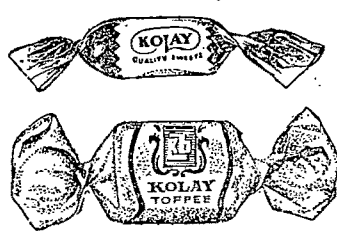


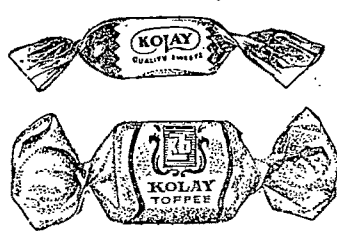


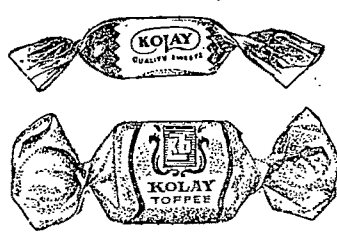


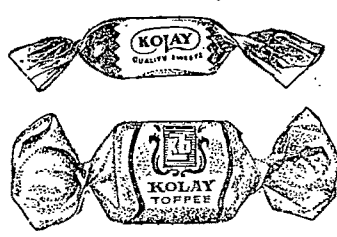


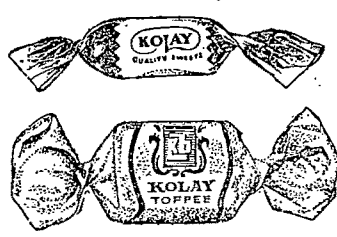


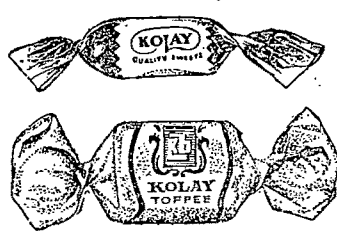


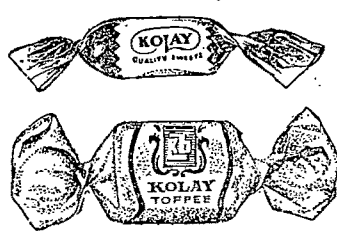


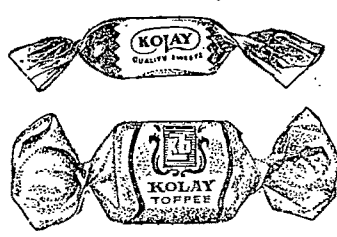


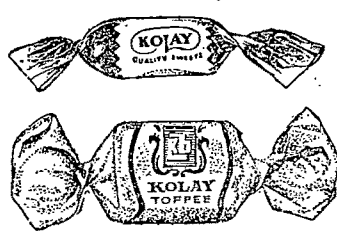


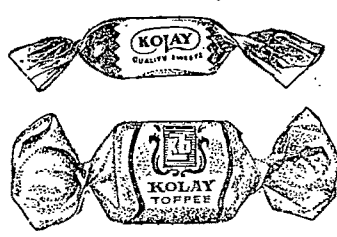


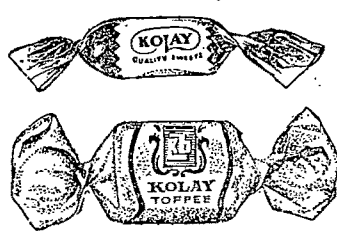


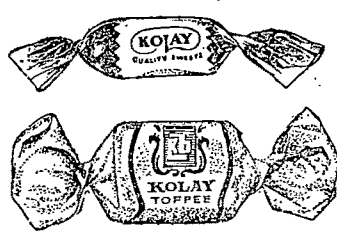


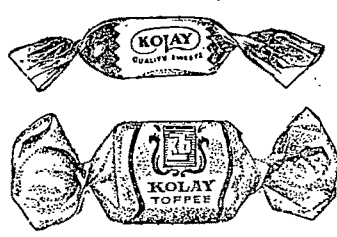









সূচীপত্র : আশ্বিন, ১৩৮২

শ্রীশ্রীদুর্গার (চিত্র)

‘বিদ্যার্থী রঞ্জনের’ সৌজন্তে

স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা

॥ সূচনা ॥

শক্তিপূজা

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

২০১

শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রশস্তি:

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগানন্দ সরস্বতী

২০২

মাতৃবোধন

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

২০৩

মহাশক্তি সম্পূজন

শ্রীস্বধীর গুপ্ত

২০৪

সম্পাদকীয়

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

২০৫

AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, SPRAY PAINTERS & DEALERS

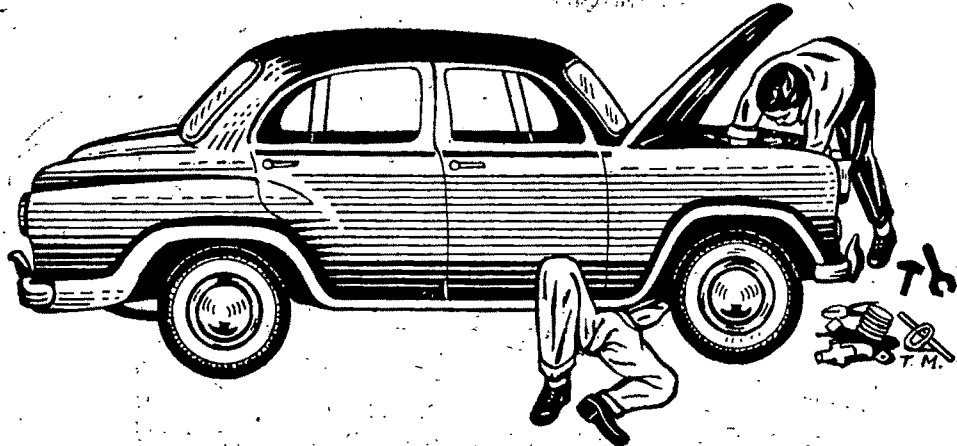
THE STAR MOTOR ENG. WORKS

(ESTD.—1939.)

OFFICE : 241-1, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA-4

WORK SHOP : 6, ULTADANGA ROAD.

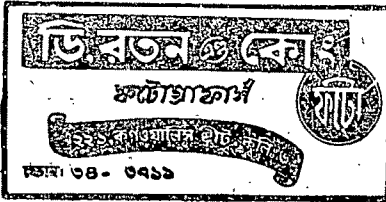
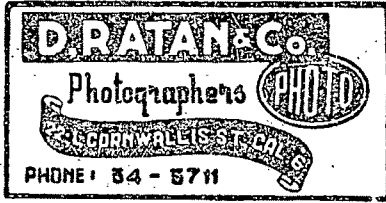
Office : 55-4633 • Res. 56-3430



॥ প্রবন্ধ ॥

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত
কাঁচের মানুষ শরৎচন্দ্র
রবীন্দ্র স্মরণে
দুর্গাপূজায় শাক্ত-বিজ্ঞান
বঙ্গের আদি বারোয়ারী
দুর্গাপূজার বিগত কাল
মহাপ্রভুর ভাব নৃত্য
মাতৃপূজা ও আরতি

ডক্টর শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ২০৭
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২২৪
শ্যামাদাস দে ২২৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ২১৭
শ্রীমুসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২১৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২২৬
নৃত্যশিল্পী-নরনারায়ণ ২৩২
শ্রীনিরেন রায় ২৩৭



কয়েকখানি নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত
রোগ ও আরোগ্য—৪.০০

প্রখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত
যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

স্বষ্টিতত্ত্ব—১.০০

স্বধীরকুমার দত্তের সর্বজন বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর

অপরিস্রাব্য গ্রন্থ

সঙ্গীত ও সাধনা—৪.০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



॥ কবিতা ॥

দেশজননীর প্রতি	ডক্টর জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	২৩৩
প্রবর্তক	প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৩
অঙ্ককার, সে আমারই	নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	২৩৬
সবিতা	মহর্ষি প্রেমানন্দ	২১৯
সার্বজনীন দুর্গোৎসব	সন্তোষ ভট্টাচার্য	২১৯
গান	ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী	২২৩
উক্তি : নেপথ্যে	দীপ্তোপল রায়	২৩৬
বিধাতা পুরুষ	শ্রীঅভয়পদ মজুমদার	২০৬
শাশ্বত প্রেম	ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	২৩৯

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে
অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক
হওয়া চলে। দক্ষিণা—সভাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য। অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে
বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে। কপি
রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—
সম্পাদকের নহে।

এজেলি কমিশন ২০% ; পাঠোৎসাহের কম এজেলি দেওয়া
হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য।
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে
পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

নববর্ষে বাংলার ঘরে ঘরে বেজে
উঠুক—আনন্দের সুর।

এস, চন্দ্র এণ্ড কোং

বাতায়ল ও সঙ্গীতবিষয়ক
পুস্তকের পরিবেশক

৪, ওয়েলেসলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

পোষ্ট বক্স ৮৯২৩ ফোন : ২৪-৬৬২৩

॥ রম্য রচনা ও গল্প ॥

আঁধারে আলোর সাধনা	ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার	২১০
মধুরেণ	শ্রীভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৬
ভূমিকা	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৩৪
জননী	অমিয়া সেন	২৪০
ঘরের বাড়ি	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২৪৩
জ্বাল	ফণিভূষণ বিশ্বাস	২৪৬
সাহিত্যের আসর	দীপংকর সেন	২৬৬

॥ বিশেষ প্রবন্ধ ॥

প্রবর্তক পত্রিকার ৬০বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	শ্রীইন্দুভূষণ রায়	২৪২
সাময়িকী	...	২৬৭

আশ্রয়হীন কিশোরের

জীবন দর্পনে পৃথিবী—

শান্তনু দে সরকারের

অনিব উপস্থাপন—

মোমের ঘর—১৫.০০

প্রাপ্তিস্থান— দে বুক ষ্টোর

১৩নং বঙ্কিম চ্যাট্টাজী ষ্ট্রীট

বি, এম, লাইব্রেরী

৪, বিধান সরণী, কলিকাতা

শ্রীবরস এর কাব্যগ্রন্থ

বাল্যের পদ্মার পার

প্রকাশ হল

দাম ২.৫০

॥ পরিবেশক ॥

মোক্ষমী প্রকাশনী

কলিকাতা—৯

বাংলার উপন্যাস ভাণ্ডারে অভিনব সংযোজন

হাসি চৌধুরীর

মণীষা—৮.০০

৩৫।১ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলি-২৭

প্রবর্তক
শারদীয়া, ১৩৮২



অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

—বিশ্বসার আপদহারকল্প

হে দেবি! অনাথ, দীন, তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধার্ত, ভীত ও বদ্ধ জীবের তুমিই
একমাত্র গতি ও ত্রাণকারিণী। হে জগত্তারিণী! তোমায় নমস্কার। হে
দুর্গে! তুমি রক্ষা করো ॥



বহুজন হিতায়

৬০তম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন : ১৩৮২

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর : ১৯৭৫

প্রবর্তক

শক্তিপূজা

পঞ্চপ্রাণ নিয়ে আমাদের এই দেহ। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান আর সমান—এই পাঁচটি প্রাণের কথা তত্ত্ববিদগণ জানেন। পঞ্চ প্রাণের ঝায় এ সৃজনের পশ্চাতে পাঁচটি শক্তির পরিচয় হিন্দু-ভারত পাইয়াছিল। এই পাঁচটি শক্তির নাম—সাবিত্রী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাভূগা ও শ্রীরাধা। সাবিত্রীর উপাসনার কথা সুবিদিত। ইনি আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাপত্নী—ভাবশুদ্ধ-স্বরূপা, সর্বলোক প্রসবিনী। ভারতের অসংখ্য তীর্থে সাবিত্রীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই বেদজননীর পর বাণী বিদ্যাদায়িনী-দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব। এই দুই মহাশক্তি পরাপরা জ্ঞানদায়িনী। অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিতে হয়। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের উন্মেষ হয় বীণাবাদিনী সরস্বতীর কৃপায়। হিন্দু-ভারত ভিন্ন শক্তিপূজার মর্ম অণ্বে বুঝে নাই। জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ভারত যে কর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা শক্তি ও ও সম্পদ দুইয়ের যুগপৎ প্রকাশে। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী। দশভুজা মহাভূগাশক্তির চিন্ময় মূর্তি। আজ ঘরে ঘরে শরতের প্রভাতে যে আগমনীর মধুমূর্তনা শ্রুতি স্পর্শ করে, তাহাই শারদ-প্রতিমার আবাহন সঙ্গীত। দশপ্রহরণধারিণী শ্রীভূগার পূজা আমরা যুগ যুগ করিয়া আসিতেছি; তবুও শক্তির বরপুঞ্জরূপে এজাতির বিজয়া-ভিযান কল্পনা হইয়াই রহিল। ইহা সবই বিস্ময়ের বিষয়। যে জাতি এই চতুঃশক্তির মর্ম উপলব্ধি করে না, সে জাতির মধ্যেও শক্তির প্রকাশ হয়, তবে তাহা অন্ধের

যজ্ঞিতাড়নের ঝায় অকারণ ও অকল্যাণজনক। শক্তিসিদ্ধ না হইলে, কোন জাতি সত্যের সন্ধান পায় নাই। প্রাচীন ভারতে শক্তিসাধনার সিদ্ধনীতি ও বিধান ছিল। ভারতের নানা স্থানে অসংখ্য শক্তিপাঠ তাহার সাক্ষ্য দেয়। শক্তিসিদ্ধ জাতিই দিব্যসমাজ সংগঠনে কৃতকার্য হয়, আর প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধার আবির্ভাবেই জাতির সমাজ শ্রীসম্পন্ন হয়।

এই সকল কথা অরণ্যে রোদনের ঝায় আজ নিষ্ফল মনে হয়। কিন্তু তবু আমরা শক্তিপূজা করি। মেঘশূণ্য শারদাকাশে শুক্ল-পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রের দিকে চাহিয়া পরদিন প্রাতে ষষ্ঠীর কল্লারস্তের স্মৃতি অন্তরে দেবীপূজার আকুতি জাগায়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দেবীর পূজায় তন্ময় হইয়া বিজয়ার পূণ্য প্রভাতে পার্থের মতই বলিতে পারে—“নমোমোহঃ স্মৃতির্লক্ষ্মা”। হিমালয়ের ঝায় বাধাই সম্মুখে থাকুক, সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া কর্ম-যজ্ঞ কর্মজ্ঞানের তীর্থে এই ভারতে বিশ্বভারতবাসীকে আবার আমরা ফিরাইয়া আনিব। বিশ্বমানবের শ্রেয়ঃ-সাধক দিব্যসমাজ এই পুণ্যপীঠ হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠা করিব। তাই আজ অতিথন বিস্মৃতির কুহেলিকা বিদীর্ণ করিয়া মহাপূজার পুত আহ্বান হৃদয় উদ্ভুদ্ধ করে। বাঙালী জাতি আজিও যদি মোহবন্ধন মুক্ত হইয়া শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, এখনও শ্রী ও বীর্য তাহারা লাভ করিবে।

সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল
(১৯৩৮-এর ‘নবসজ্ঞা’ হইতে)

শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রশস্তিঃ

শ্রীমৎস্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

জিঘাংসায় নগ্নোৎকট-রুধির নৃত্যোৎসবরতোহ
সুরো হিহা মাতুঃ কনকশশিকান্তাননসুধাম্ ।

(গলিতকরণার্দ্ৰস্তনসুধাম্)

(ক্ষরিতকরণার্দ্ৰস্তনসুধাম্)

বিমূর্ত্তো লোকাংশেছরুসুরামদাচ্ শৃঙ্গপ্রহরণং
তথাপ্যাস্তে দেব্য্যাঃ স্বপদতলযুগেন্দ্রনখরম্ ॥ ১

(দশনম্)

ত্রিশূলং মাতৃশচাপি দশবিধ ঘোরাযুদ্ধধৃতিঃ
কিং শোভায়ৈ, জানীহি গুরুকৃপয়া মর্মকুশলম্ ।
(যদপিহিতমর্মগহনম্)

শাশানোন্মত্তাং ত্যক্তশিবহৃদয়ামট্টইসিতাং (হসনাং)

কুতঃ প্রচণ্ডা যা ভুবনভয়দা তাং বিবরিষু ॥ ২

(১)

(২)

জিঘাংসায় উন্মত্ত, রক্ত-প্লাবি নগ্নোৎকট নটন উৎসবে
তুমি রত
হে মহিষ অসুর ! শুধু সেই একবার, পুরাণেতে যার
চণ্ডকথা হয়েছে কীর্তিত ?
বিশ্বমায়ের আমার, অকলঙ্ক কনকশশি জিনি আননের
হাসিসুধা ভুলে,
ক্ষরিতকরণাঙ্গব স্তনসুধা পরিহরি, উষ্ণশোণিত তৃষ্ণার
ধাবিত ।
ভুবনের ইতিহাসে, বারংবার এই চণ্ডভূমিকায়, তুমি এলে
আর গেলে, আসো যাও ঠিক পালামতো ।
সুরনর যবে মদমত্ত, তখনি যে ডাক পড়ে মোর,
সেই মদগর্বে করিবারে এই শৃঙ্গাঘাত ।
সত্যি বটে, দেবতার হলে মদোন্মত্ত, উমা হৈমবতীরূপে,
মা আমার হন আবির্ভূত ।
তবু, কি রূপেতে বেলো দেখি ?—বহুশোভমানা
হ্যাতিমতীরূপে—
এ কথাটি নয় কি বিজ্ঞত ?
এও কি ভুলিবে অসুর ! মার পদতলে সত্যক্ষাঙ্গবীৰ্য্য সিংহ
ঐ যে তাহার বজ্রাধিক নখদংষ্ট্রাস্পর্শ ল'য়ে সুসজ্জিত ।

আর শুধুই কি একা সিংহবীৰ্য্য ! দশভুজা মা যে আমার
তাঁর দশ করে,
ত্রিশূল কৃপাণ-ঘোর দশাযুদ্ধ করিলা ধারণ ।
অন্তর্যামী নিত্যগুরু মুখে, আগে জেনে নাও এদের মন্ত্র,
যন্ত্র, তন্ত্রের কোঁশল রহস্যখ্যাপন ।
লক্ষ্মী সরস্বতী, গণেশ কুমার ; তাঁদের বাহন প্রসবিন,
সবি হোক তব নেত্রে নর্মশর্ম সমুজ্জ্বল দিব্য জ্ঞানান্বন ।
এই ভাব-দীক্ষা দৃষ্টিদীপ বিনে, শুধুই কি উন্মাদের মতো
বরিবে
তাহারে—শিব সত্যসুন্দরের বক্ষসীঠ ছাড়া, শুধু নৃমুণ্ডাস্তি-
বলয়া শ্মশানে তাণ্ডবরতা, অট্ট অট্ট হাসা ভীমা ভয়দা,
জীবনে মরণে ?
মা দুর্গা যে এলেন আবার, কিন্তু কৈ তাঁর মঙ্গলঘট, কোথা
শঙ্খ উলুধনি, কোথা আগমনী গীত, কোথা সেই জীরাগ
আলাপন ?
ঠিক যদি পারো বরিবারে, লক্ষ্মী বাণী, হেরঘকুমারে,
বাহন মুখিক ময়ূর,
করে সর্প, উদ্যত ত্রিশূল—এই সবে, তবে ঠিক জেনো—
ঐ যে মহিষ, ও আর রবে না মহিষ অসুর, ওরও হবে
সুরনরবন্দিত জ্যেষ্ঠ-প্রাণরূপায়ণ ।

মাতৃবোধন

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

টিয়ারঙ বাসে, দুধশাদা কাশে, সোনালী শরৎ আসে

মুক্তা ধবল আলো বলমন্ সুভ শেফালী হাসে ।

শিউলি বরছে মিষ্টি হাওয়ায়—

পেতেছে আসন যেন আঙিনায়

শিশিরে শিশিরে আলনা আঁকা চারিধারে চারিপাশে

সুভ মেঘের ডিঙি বেয়ে ঐ সোনালী শরৎ আসে ।

গরবী করবী গৌথেছে মালিকা—শত শ্বেত শতদলে

পূজার অর্থ সাজা হলো আজ মধুর ভুবনতলে ।

হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলে দীপশিখা

ধুয়ে মুছে যায় সব অহমিকা

কুসুমগন্ধে, গানের ছন্দে উৎসবে কোলাহলে

জননী আসিছে পূজা নিতে আজ মধুর ভুবনতলে ।

ভবনে ভবনে বাজিছে শঙ্খ শঙ্কা করিতে নাশ—

জাগে চিন্ময়ী দশপ্রহরিনী রুখিতে সর্বনাশ ।

দুর্গতি দুখনাশিনী দুর্গা

দেন শুভাশীষ ধাতু দুর্বা

মাঝার মাঝারে হাসে মহামায়া নাশি সব মোহপাশ

দস্যুদলনে গর্জিয়া ওঠে পিনাক পরশু পাশ ।

তৃতীয় নয়নে জেগেছে দৃষ্টি হাসিছে তাই—

মাতৃবোধনে মহামুক্তির মন্ত্র আজিকে চাই ।

মহাশক্তি-সম্পূজন

শ্রীশুধীর গুপ্ত

মহাশক্তি-সম্পূজন ! মহাশক্তি—কে সে !

অমেয়া—অক্ষরা—নিত্যা—চিরলীলাময়ী !

কার নাম অজ্ঞানে কি জ্ঞানে সবে লই !

মায়াবিষ্ট—বিস্মিত কে করে কোটি বেশে !

কার ধ্যান অন্তরের গহন প্রদেশে

চলে'ছেই ! কা'র কৃপা করে কালজয়ী !

কা'রে কেন্দ্র করি' সবে ঘূর্ণমান রই !

সর্ব বৃত্ত এসে শেষে কা'র মাঝে মেখে !

চিন্তা—অচিন্ত্যেরও উদ্দেশ্য তা'র অধিষ্ঠান ।

ব্যক্ত—অব্যক্তেরও সীমা লঙ্ঘিয়া সে রাজে !

তা'র সর্ব বিভূতির সোপান বিধান

পার হ'তে হ'তে শেষে মহাবেদী মাঝে

বিশ্বজননীয়ে লভি' প্রশান্তিতে প্রাণ

পূর্ণ হ'লে, আর কিছু কাম্য থাকে না যে ।

সেবাসাধকীয়

ততঃ কিম ?

অতঃ শ্রীগুরু জিজ্ঞাসা।

শ্রীগুরু-সাধন-জগতে সর্বজন শিরোধার্য তত্ত্ব।

তত্ত্ব-এবং বিগ্রহ। ভাব আর রূপ দুই-এ মিলিয়াই পূর্ণ। আর সব তত্ত্বই অপূর্ণ। শ্রীগুরু একাধারে আধার এবং আধেয় তত্ত্ব।

বিশ্ব চরাচারে পরিব্যাপ্ত চৈতন্যই মানব দেহধারী শ্রীগুরু।

গুরু সাক্ষাৎ মূর্ত ব্রহ্ম। অদ্ভুত কথা। সত্যই বিজিজ্ঞাসিতব্য।

সাধক সাধনায় চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরম ব্রহ্মে উত্তরণপ্রয়াসী। আর পরম ব্রহ্ম অবতরণ করেন আত্মত্ব সন্তোগের লালসায় নিজ যুগান্তিসন্ধি চরিতার্থ অভিলাষে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাষায় “সেই সে পরম এক আপনারে দুই করি লভিছেন স্মৃতি।” এই দুই-এর মিলনাঘাতে বিশ্বস্বজনের বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র বেদনা নিত্য বর্ণ গন্ধ গীতের কলকাকলি।

‘অহং বহুশ্রাং প্রজায়েয়’—অদ্বয় এক-এর বহু হইবার এষণা—বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভাষণ। ব্যক্তিসত্তার অর্থাৎ বিচিত্রের সেই পরম ‘এক’-এ অভিমুখীগতি আত্মহত্যা। সত্যগুরুজীর অনুপম ভাব ও ভাষায় বিষয়টির অভিব্যক্তি : “আমি চলেছিলাম সংহারের পথে। কেননা, যে স্ব-ভাব একত্বের লক্ষ্যে, একান্ত নিরবলম্ব, অতি সংকীর্ণ তাহা। আজ আমায় বন্ধুত্বের পথে এনেছ। ইহাই মর্তের সনাতন ইচ্ছা। মর্তের স্বাশত ধর্ম, মর্তের নিত্য ভাব। আজ তো নির্জন নয়। হে দেবতা, শুধু তুমি আর আমি এই নিয়েই তো আমার স্ব-ভাব, স্ব-ধর্ম।”

অভিনব এই আত্মতত্ত্ব—মানস কল্লনাভীত। কিন্তু এই আত্মতত্ত্বই শ্রীগুরু তত্ত্বজিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর—বীজ জ্ঞান।

শ্রীগুরু বস্তু আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব—আরম্ভও নাই। অন্তও নাই। তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

বৈদিক অধ্যাত্ম সংস্কৃতি ও সাধনা মহাকাালের পথে মোটামুটি দুইটি ধারায় প্রবহমান—আগম ও নিগম—তান্ত্রিকী ও বৈদিকী। অপরটি স্প্রাচীন যোগদর্শন যাহা আত্মাহুশীলন ও ইন্দ্রিয় শাসনের হেতু এই দুইটি ধারায়ই গৃহীত।

একদা বৈদিক যুগে বহু দেববাদ তথা বহু দেববাদের সমন্বয় বিশ্বদেববাদ সমাহত হয় ওঙ্কারমন্ত্রের ধ্বনি-তরংগের কোঠায়—সব বৈচিত্র্য মিলিয়া মিশিয়া প্রণব তত্ত্বে একাকার প্রাপ্ত হয়। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের সর্ব সাধনার সার ও সমাহার—সমস্ত মন্ত্রের উৎপত্তি ও লয়, বিশ্ব-স্বজন-বিজ্ঞান, সর্ব মন্ত্রের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রাণ ও সমাহার এই প্রণবতত্ত্বে। মানব-সত্যতায় ওঙ্কার তত্ত্ব হিন্দু ভারতের এক অদ্ভুত আশ্চর্য আক্ৰিবার ও অনন্ত অবদান। এই একটি একাক্ষর ওঙ্কার তত্ত্ব হিন্দু সভ্যতাকে চিরায়ু করিয়াছে—দিয়াছে তার সনাতন মহিমা। এমন যদি হয় যে কোনদিন সমস্ত বেদ বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান কাল বিপর্যয়ে বিলুপ্ত হয় তবে একজন বিয়ুযশার কণ্ঠে এই ওঙ্কার ধ্বনি সব কিছুকে পুনর্জাগরিত করিবে। হিন্দু ভারতের প্রাণ ও জীবন-কাঠি এই একাক্ষর প্রণবতত্ত্বে সংগুপ্ত।

আগম ধারায় বৈশিষ্ট্য এই যে, যা ছিল ওঙ্কার তত্ত্বে ভাবময় ধ্যানগম্য, তত্ত্ব মাত্র লক্ষণাক্রান্ত তাহাকে বস্তু-তত্ত্ব বিগ্রহে অবতরিত করা ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান ক্রমে। শ্রীগুরুভগবান এই ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান ক্রমিক পর্যায়ে বিগ্রহবান তত্ত্বমূর্তি নরতনুতে। লক্ষ্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেম ঐক্য সংস্থাপন—আনন্দ সন্তোগ। আশ্রয় ও বিষয় না থাকিলে প্রেম উপজাত হয় না—না হয় প্রেমের উদ্দীপনা। সেব্য শ্রীগুরুভগবান, সেবক ভক্ত-শিষ্য। সাধ্য প্রেম। ঐক্য শ্রীগুরু সষন্ধের রসায়নে। ভক্ত ভগবান আত্মতত্ত্বরূপে এক অদ্বয় তত্ত্ব, কিন্তু নির্বিকল্প পরম ব্রহ্মের মতো অদ্বিতীয় তত্ত্ব নহেন। পরম ব্রহ্মের গুণাভীত স্বরূপ অবস্থা হইতে তটস্থ ক্রমে গুণাশ্রয়ী ভগবানে রূপান্তরিত হইবার পর্যায়ে যে লীলাচাতুর্থ-শক্তির ক্রিয়া চলে তন্মধ্যে একটি শক্তিতত্ত্ব অপরটি শক্তিমান তত্ত্ব। নিঃশক্তিক পরমব্রহ্মে শক্তি মুহিত। এই নির্বিকল্প অদ্বয় ব্রহ্ম বৈদিকী সাধনার সাধ্য, অপরপক্ষে

আত্মমায়াত্মী শ্রীগুরুভগবান শক্তি মূলে তান্ত্রিকী ধারায় মর্ত্যলীলা। শ্রীগুরুভগবান একাধারে শক্তি ও শক্তিমান।

আশ্চর্য্য চরবগাহ শ্রীগুরুতত্ত্ব। শ্রীগুরু তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে শ্রীগুরুর পরম ভাবটি থাকে সংগোপিত। ফলে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি ও অসুখ আসিয়া যায়। তাই সাধন শাস্ত্রের সাবধান বাণী :

‘আচার্য্য মাং বিজ্ঞানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিং।

ন মর্ত্য বুদ্ধ্যাসুয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥’

সম্বগুরুজী সহজ বোধগম্য ভাষায় জটিল বিষয়টি উপস্থিত করিয়াছেন : “তত্ত্ব আর ধর্ম। তত্ত্ব অদ্বয় জ্ঞান। ধর্ম ভগবান। তত্ত্বের রূপ নাই, আকৃতি নাই। ভগবান বিরাট এবং আত্মমায়ায় জীবের ছায় জন্ম কর্ম সমন্বিত। জীবের সহিত কেবল পার্থক্য জীবের মত ইন্দ্রিয়ষড়বর্গ দ্বারা গ্রহণাদি সত্ত্বেও, তিনি নিসংগ।”

এই বিরাট ভগবান অর্থাৎ বিশ্বপরিব্যাপ্ত পরম চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও সম্বগুরুজী সুস্পষ্ট করিয়াছেন : “বিরাটের স্বরূপ কোথাও অংশ, কোথাও বিভূতি। সব রূপই বিরাটের রূপ। বিরাট হইতে উৎপত্তি, বিরাটেই লয়। অংশ ও বিভূতির বৈশিষ্ট্য অবতারস্বরূপ, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বিরাটই আবার স্বেচ্ছায় পরিণত শরীরে অবতীর্ণ হন, বাসুদেব মূর্তি পরিগ্রহণ করেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ পূর্ণ স্বরূপ—অংশ বা বিভূতি নহেন।”

সম্বগুরুজী যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁর নিজের বানানো কথা নয়—ভারত-শাস্ত্রেরই কথা। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান স্বয়ং—‘কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্’ বলা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর আর কোথাও কোন ধর্মশাস্ত্রে অবতারের বিষয়টি কল্পনার মধ্যেও আসেনাই। ধর্ম ও ভগবান ধারণায় যুগে যুগে মানুষী তনু আশ্রয়ে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তিতে নরাকারে আত্মপ্রকাশ সাধারণ্যে অচিন্ত্যনীয় হইলেও, মহাজনের এই উপলব্ধি দর্শন ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ অবদান।

এই বিশ্বচরাচরে স্থাবর জংগম সৃষ্টির যেখানেই শৌর্য

বীর্য বিক্রমের প্রকাশ অর্থাৎ অসাধারণ যাহা তাহাই ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। গীতার দশম অধ্যায়ের বিষয়টির বিস্তার আছে।

মানুষের মধ্যে অংশ বা পূর্ণ রূপে ঈশ্বর আবেশের দৃষ্টান্ত যুগে-যুগে ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়। সংবগুরুজীর মধ্যে এইরূপ ঈশ্বর আবেশ যে হইয়াছিল তাহা নিজেই তিনি সংঘটকে বার বার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই আত্মস্বরূপের অকুণ্ঠ ঘোষণা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়াও লেখক তাঁর বিগত হওয়ার বহুদিন পরে শ্রীগুরুর এই স্বরূপ পরিচয়টির কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়াছে জীবন-সাম্রাজ্যে। লেখকের তাই নিঃসন্দেহ এই গুরু-স্বরূপ দেশের সামনে ঘোষণা করিতে কোন কুণ্ঠা নাই। লেখকের সংস্কোচ নিবেদন এই—যে, এইরূপ উল্লসিত চরিত্র এমন যে, ইহা নিজে উপলব্ধি না করিলে অপর কেহ করাইতে পারে না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধ হইবার নহে। বস্তুত ইন্দ্রিয় জ্ঞানজ যে বস্তু দর্শন তাহাই অবাস্তব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—বাস্তব জ্ঞানই বেত্ত। ভারত শাস্ত্রের কথা বাস্তব জ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্য সত্ত্বাবান হইতে আগত—অজিভ নহে। গীতার এ বিষয়ে দিগদর্শন—

তেষামেবানুকমপার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়ামি আত্মভাবসো জ্ঞানদীপেন ভাস্তব (১০।১১)

শ্রীভগবানের এই আত্মভাবটি কৃপা। কৃপাধারার মধুক্ষরণ হয় ঐকান্তিক শরণাগতিতে। অক্ষিগোলকে সূর্যালোক প্রতিকলনের ফলে যে আলো সেই আলোকেই সূর্য দর্শন। শ্রীগুরুভগবানে আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি শ্রীগুরুস্বরূপের শুদ্ধ সমর্পিত চিত্তে প্রতিকলন। অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞান হইবার নহে।

এখানে বিতর্ক উঠিতে পারে শ্রীমতিলাল বহির্জগতে বিপ্লবী, সংগঠক, মহাকর্মা, শ্রীঅরবিন্দের ভাব বাহক, নিকাম অর্থসাধক বলিয়া বিদিত। শ্রীমতিলালের এই ভাগবত স্বরূপটির কোন পরিচয় বা লক্ষণ তেমন সুবিদিত নহে।

বর্তমান শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে শ্রীমতি-লালের প্রাকৃত জীবনের যত লীলাখেলা। তৃতীয় দশকে তাঁর আত্মস্বরূপ স্মৃতির উন্মেষে সংঘগুরুরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এখানে উল্লেখ্য যে, এই অপ্রাকৃত চেতনা কোন সাধন-সাধ্য ক্রম ধরিয় আসে না। আকস্মিকই অন্তশ্চেতনতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সম্ভাবনারূপে যাহা থাকে মুর্ছিত তারই হয় জাগরণ। শ্রীচৈতন্যের গয়ায় পিণ্ডানের পরে এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরে ভগবৎ স্বরূপের পূর্ণ প্রকট হয়। প্রায় সমস্ত দৈশ্বরমানবের ভগবৎস্বরূপস্মৃতির উদ্ভাসন। এমনিভাবে ঘটিয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রের কথা।

চতুর্থ দশকে ১৯৩০ হইতে সঙ্ঘগুরুজীর আত্মজ্ঞানের পূর্ণ প্রকট হইতে দেখা যায়। তিনি অকুণ্ঠে সংঘচক্রে ঘোষণা করেন: “এখানে ধর্ম মূর্তি, ভগবান মূর্তি। বিষ্ণুপুরাণে আছে ত্রিজগতের মধ্যে জগৎ নারায়ণের মূর্তি। শাস্ত্র ধর্মের কথা তোমাদের বলছি—গান্ধী-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের কথা নয়। কাহারও কথা শোনার জন্ত তোমাদের জন্ম নয়। আমি মূর্তি নারায়ণ। প্রকৃতির উপর নূতন ছন্দ দিয়ে নূতন স্বজন নির্মাণ করা ইহাই আমার কর্ম। আমার জীবন-নির্দেশ স্পষ্ট দিনের স্থায় সত্য। লক্ষ্য আমার অমোঘ। এ জীবনে যদি ব্যর্থ হই, যুগে যুগে আসবো।”

সঙ্ঘগুরুজী বার বার তাঁর এই আত্মস্বরূপ চৈতন্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন সংঘচক্রে। কারণ এই বিশ্বাস ও উপলব্ধির উপর নির্ভর করে তাঁর অভিপ্রেত ভাগবত সঙ্ঘ। সংঘগুরুজীর এই লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দাবী করেন তাঁর মূর্ত ভাগবত স্বরূপের নিকট নিঃসর্ত্ত সমর্পণ। তাঁয় আহ্বান—“তোমার সবখানি ডুবিয়ে দাও—অসাধারণ দাবী, অসাধারণ জীবন। এই বৈশিষ্ট্যই সংঘের জীবনে। সংঘ ভাগবত। তত্ত্ব নয়—ধর্ম। ধর্মের মূর্তি দিতেই জন্ম। ধর্মই কর্ম। ধর্ম নিঃশ্রেয়স। উপলব্ধি কর। এই মহামান—উঠে এস—এহি।” স্ব-স্বরূপ সঙ্ঘে আরও স্পষ্ট করিয়া অভিব্যক্তি দিয়াছেন: “জন্ম ভাগবত কোথায়—কর্ম যেখানে নৈষ্কর্ম। নৈষ্কর্মের লক্ষণ কি? যাহা মোক্ষের নিদান অর্থাৎ জীবনে নিঃশ্রেয়সের হেতু, মঙ্গলের কারণ। অদ্বৃত্ত কথা। কিন্তু এই ধর্মই তোমাদের গ্রহণীয়। অস্ত্র কথা অশ্রাব্য, কেননা ব্যবসায়ত্মিক বুদ্ধি না হইলে দৈশ্বর জ্ঞান হইবে না—আমার স্বরূপ পাবে না। আমি যাহা বলি তাহা বেদ। রূপ দাও মনে, বাণী দাও বাক্যে। এই জীবন বেদ প্রচার কর। জন্মকর্ম ভাগবত হবে। (ভা: বা: ১৩২।৩৭)।

শ্রীগুরুর মুখেই গুরু জিজ্ঞাসার উত্তর।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বিধাতা পুরুষ

শ্রীঅভয়পদ মজুমদার

বারংবার,
তোমারে করি গো নমস্কার।
মোর দুটি ছোট হাতে, জানিয়েছি প্রণিপাতে
মুক্ত করো সংসারের ভার।
তোমারে করি গো নমস্কার ॥
প্রথম প্রস্তুতিগ্ৰহে, ছ’দিনের শিশুদেহে
অমিয় পরশ যেন কার;
লভেছি অনুকারে ছ’দিনের কারাগারে
তোমাতেই করেছি সার।
চমৎকার।
তোমারে করিগো নমস্কার।
জননীর ভালবাসা, ধরণীর পরিভাষা,

ধীরে ধীরে জোগালো আহার।
বিচিত্র ধরণীতলে, ছলে বলে কৌশলে,
মায়াজালে রচিনু সংসার।
তিলে তিলে পলে পলে, নব নব কোঁড়হলে,
ধনে-জনে পুরিল আগার।
(ওগো) গণংকার,
তোমারে করি গো নমস্কার।
গুণেছিল অনুকারে বিপুল পুলক ভরে,
ধরণীর শোক-দুঃখ-ভার।
কবে কোন্ পূণ্য-ফলে, বিশাল এ ভূমণ্ডলে,
আমারে করিবে উদ্ধার।
তোমারে করি গো নমস্কার ॥

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত

ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের সাহায্যে সুকুমার রুতির অনুশীলন, ভক্তি-রস-আনন্দ, ধর্মপ্রাণতার চরিতার্থতা ১৮০০ সালের আগে আমাদের, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই সব প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে গদ্য অপেক্ষা পদ্যই সার্থকতর মাধ্যম হওয়ায় আমরা গদ্য সৃষ্টির তেমন কোন প্রয়োজন অনুভব করি নি। তা ছাড়া, ছাপাখানার অভাব তো ছিলই। সাহিত্যে জ্ঞানবিস্তার ও তথ্যবিতরণের প্রয়োজনে গদ্যের সৃষ্টি হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ১৮০০ সালের পরবর্তী যুগে উনিশ শতকের সূত্রপাতে এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করে তোলে। এর সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন গদ্য রচনায় প্রেরণা বৃদ্ধি করেছিল। এই মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন নিতান্ত পাশ্চাত্য ধর্মযাজক ও ইংরেজ শাসক কর্তৃপক্ষের দান। এ ব্যাপারে আমরা যে সখেই সচেতন নই, তার কারণ, আমাদের জাতীয় অকৃতজ্ঞতা। চার্লস উইলকিন্স, ঝাথানিয়েল ব্র্যাসি হালহেড, উইলিয়ম জোনস, উইলিয়ম কেরি, ডেভিড হেনার, ডিক্স ওয়াটার বিট্‌ন বা বেথুন, ফেলিক্স কেরি প্রভৃতির কাছে আমাদের জাতীয় ঋণ স্মরণে আমাদের কিছুমাত্র উৎসাহ না থাকা আমাদের মূঢ়তা ও কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করে।

বাংলা গদ্য রচনার প্রথম যুগে রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনক্ষেত্রে বিহ্বলতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। কি নিয়ে লেখা হবে, যখন কোন কিছুই লেখা নেই আর যে কোন বিষয়ে লেখা চলে, তাই নিয়ে প্রথম গদ্য-সাহিত্য স্রষ্টারা সঙ্কটে পড়েছিলেন। বিষয়বস্তুরূপে জীবনী, কিংবদন্তী, রূপকথা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হত। বাইরের তাগিদে অন্তঃপ্রেরণার অভাবে এদের জন্ম। অন্তঃপ্রেরণার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ নির্বাচনের বেলায়। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প শাখা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবেই রচিত গ্রিক ও হিন্দি গল্প সাহিত্য থেকে প্রথম অনুবাদের সাহিত্যপুস্তকগুলি নির্বাচিত হয়েছিল। ফার্সি গল্প সাহিত্যের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু-কিঞ্চিৎ দেখা গেল। উপযুক্ত পূর্বসূরীদের

দৃষ্টান্তের অভাবে গদ্য রচনার রহস্য ও অন্তঃপ্রেরণা এ-যুগের লেখকদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল।

প্রথমে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও পারসিক ভাষাভিজ্ঞ মুন্শিরা সংস্কৃত সাহিত্য ও অশ্রদ্ধ গ্রন্থের ভাবানুবাদ করায় নিযুক্ত ছিলেন। এই যুগের আর এক ধারা খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রচারসাহিত্য। মিশনারিরা নিজেদের প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা তথা কথ্য ভাষার ব্যবহার সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। জ্ঞানবুদ্ধির জন্মে তাঁরা ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। নানা উপকরণে পূর্ণ সঙ্কলনগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়েছিল যা পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে কথ্যভাষার প্রবর্তন তাঁদের একটি বড় দান। যত্নজ্ঞান বিদ্যালঙ্কার এই “লৌকিক ভাষা” পছন্দ করতেন না এবং নিজে কটুক্তির জন্মে ছাড়া এই ভাষা ব্যবহার করতেন না। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম পাঁচার নকসায় এই চলতি ভাষা আবার ব্যবহার করা হয়। মিশনারিদের প্রয়াস জন্মান্তরীণ স্মৃতির মতো বাঙালি সাহিত্যিকের মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে পার্থক্য এই যে, মিশনারিদের প্রেরণা ছিল প্রয়োজনাত্মক। আর প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ—এদের প্রেরণা হ’ল রসাত্মক।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগের ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্ক প্রয়োজনাত্মক। প্রয়োজনের পরিধি লঙ্ঘন করে সাহিত্যিক প্রেরণা তেমনভাবে এ যুগে আসে নি। প্রয়োজনাত্মক সাহিত্যেরও মূল্য আছে। সে মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে সাহিত্যস্রষ্টার বিষয়বস্তুকে রসায়িত করে বলার ক্ষমতার ওপর। এই যুগে সৃষ্টি প্রয়োজনাত্মক সাহিত্যের মধ্যে অপরিণতভাবে সাহিত্যে রসপিপাসা চরিতার্থ করবার প্রয়াস দেখা যায়। যত্নজ্ঞানের রচনায় সেই অপরিণত প্রয়াসের নিদর্শন আছে। তাঁর ওপর কথ্যভাষার যে-প্রভাব তা প্রয়োজনাত্মক প্রেরণায় আগত। তাঁর রচনায় আভিজাত্যবর্জিত কথ্যভাষা অল্পসল্প থাকলেও সংস্কৃতানুসারী ভাষার প্রভাব ঢের বেশি।

অব্যবহিত্য পরের যুগে সংবাদপত্র রচনার সূত্রপাত। এই যুগে সংবাদকে মুন্শিগানার সঙ্গে পরিবেষণ করার

প্রয়োজনে সাহিত্যিক সাংবাদিকতার উৎপত্তি হল। অবশ্যই প্রথমে মিশনারিদের হাতে। পরে রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা। প্রতি দিনের প্রভাবনা, ঘটনা ও চিন্তাধারা রূপায়িত করতে গিয়ে প্রাচীনতার প্রভাববর্জিত সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগল। ভাষাও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে তরল হয়ে এল। সাংবাদিক কর্তব্যের মধ্যে সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল। সে-বীজ উন্নতির। অঙ্কুর অচিরে মহামহীরুহে পরিণত হল। ব্যঙ্গবিদ্রূপ, প্রতিকূল মত খণ্ডন, পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারণার ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতি শক্তির চর্চায় বাংলা গদ্য-ভাষায় সাহিত্যিক বিকাশ আরম্ভ হল। সাংবাদিকতার পাশ্চাত্য আদর্শের জন্মে ইংরেজি সাহিত্যের বর্ণনাভঙ্গি ও যুক্তিবাদ অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হল। পাঠকের সঙ্গে সমস্তের থেকে কথা বলার প্রবণতাও এইভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যে এল।

রামমোহনের গদ্য রচনায় যুক্তিপ্রয়োগের নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গেল। কিন্তু তাঁর সহযোগী ও প্রতিপক্ষরাও যুক্তি উপস্থাপনায় বেশ দক্ষ ছিলেন। রামমোহনের গ্রন্থাবলী নিছক প্রয়োজনাত্মক নয়। সাহিত্যিক উদ্দেশ্যও তাঁর রচনায় ছিল। সাহিত্যে নৈর্ব্যক্তিকতার একান্ত প্রাধান্য নেই। ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন বাদ দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও এমনই এক প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রয়োজন—এক নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণে বাংলা গদ্যের রচনাশিল্পে আত্ম-নিয়োগ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাঙালির মনে রঙ্গার কথা জন্মে উঠেছিল। একটি নতুন কথা বলবার স্বাধীনতা চাই। শব্দবিলাসপ্রণালী যাই হোক, নিজস্ব কথা বলার আবেগে লেখা সাহিত্যের নিকটবর্তী হয়। চলার বেগে পথ কেটে যায়, বলার বেগে ভাষা গড়ে ওঠে।

সংবাদপত্রের মধ্যে প্রাত্যহিকতার অনুসরণ প্রবৃত্তি, পাঠকের সঙ্গে যোগ-সাধনের আগ্রহ, অভিনবত্বের সৃষ্টি প্রয়াস—এই গুণগুলি যুগোপযোগী আধুনিক সাহিত্যের উৎসাহদাতা। আগামী দিনের সাহিত্যের প্রস্তুতি এই ভাবে সংবাদপত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হল। প্রথম “বাবু”

চরিত্রের আবির্ভাব সংবাদপত্রেই দেখা যায়। পরবর্তী কালে এই “বাবু”-র বিরুদ্ধে মনোভাব গঠনে মধু-বঙ্কিম-গিরিশ-রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র সকলেই তৎপর। “বাবু”-র প্রথম সাহিত্যিক অভিব্যক্তি দান করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)। বাবুর ব্যক্তিলক্ষণগুলি-প্রথমে সংবাদপত্রের স্তম্ভে রূপায়িত হয়ে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদে উৎকৃষ্ট পত্রিকাসমূহের আবির্ভাবের পর বাংলা গদ্যসাহিত্য দ্রুত সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু রঙ্গলালের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এই ভাষার পদ্যসাহিত্য মঙ্গলকাব্যের নিকৃষ্ট সংস্করণ দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের সার্থক অনুসরণ সম্ভবপর হয় নি। কবিওয়ালারা তাঁর হীন ও লঘু অনুকরণ করে-ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবও কোথাও বাংলা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে নি। রামমোহন উনিশ শতকের প্রথম তৃতীয়কের বঙ্গজনরুচি সম্বন্ধে তীব্র তিরস্কার করে বলেছিলেন, “যুক্তি হইতে এক কালে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্জয়-মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই বুড়ির উপাখ্যান, যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ করিয়া জানে”। রঙ্গলাল নবযুগ প্রবর্তনের পর ঘোষণা করেছিলেন, “ইংলণ্ডীয় বিত্তময় প্রণালীতে যত বঙ্গীয়কাব্য বিবচিত হইবে, ততই ত্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্ত্বাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।” বস্তুত রঙ্গলালই ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতু। তাঁর রচনারীতি যথার্থই ভারতচন্দ্রের পরবর্তী ও মধুসূদনের পূর্ববর্তী।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের দ্বারা আগে দৃঢ় বুদ্ধিপ্রধান ভিত্তিভূমি গঠিত না হলে রঙ্গলাল ও মধুসূদনের আবির্ভাব সম্ভবপর হত না। তাঁরা এলেও পাঠক ও সমর্থক পেতেন-কি না সন্দেহ। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে নতুন পাঠক সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই রঙ্গলাল ও মধুসূদনের সমর্থক লাভের কারণ। এত দিন সমকালীন পাশ্চাত্য ও আধুনিক প্রভাবসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কাল ছিল। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যে আবির্ভাবের সময় থেকে দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে সংশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হল।

ডিরোজিও, রামমোহন, হেয়ার, রিচার্ডসন ও মেকলের প্রভাব এই সময় থেকে জয়যুক্ত হল। উদারচরিত্র মুক্ত দৃষ্টি মানুষদের প্রভাবে বহু দিনের দূষিত বদ্ধ বাতাস নিগত হয়ে গেল। সতীদাহ নিবারণ, জীশিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, নরবলি নিবারণ, সন্তান হত্যা ও বিসর্জন নিবারণ, সমুদ্র যাত্রা প্রচলন, খাদ্য পানীয় ব্যপদেশে অন্ধ সংস্কার বিসর্জন দিয়ে কেবল খাদ্যের গুণাগুণ বিচার ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারের ফলে মানবের চিত্তের অর্গল এদেশে প্রায় সহস্র বর্ষ পরে মুক্ত হল। এই মোহমুক্তি ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুতেই হতে পারত না। যদি মোগল সাম্রাজ্য ১৭০৭ সালের পরও পূর্ব দাপটে চলত কিম্বা মারাঠাদের পরিকল্পিত হিন্দু সাম্রাজ্য ১৭৬১ সালের পর স্থাপিত হত, তা হলে বাংলাদেশে তথা ভারতে মানব মনের ঐ বন্ধনমুক্তি কোনমতেই সম্ভবপর হত না।

লর্ড মেকলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের সুব্যবস্থা করায় অন্তত ব্রিটিশ ভারতে হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠল। অন্ধকার দূর হতে হাজার বছর লাগে নি। দীপ থেকে প্রবর্তিত অগ্নি দীপের আলোয় সারা ভারত আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। ১৭৭২ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ১৪৮ বছর ধরে বাঙালি নিজে জ্বলেছে, সারা ভারতকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। ১৯২০ সালের পর থেকে এই দীপজ্যোতির অবসান ঘটেছে এমন আশঙ্কা করার কারণ দেখা যাচ্ছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে বাংলা গদ্যের শিল্পোন্নতি দেখা গেছে। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ এই যুগে বাংলা গদ্যকে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অন্তর্জগতে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে যায়। আগে আমাদের চিত্ত কেবল ভক্তির আবেদনে সাড়া দিত। এখন জীবনের বহুমুখী সমৃদ্ধিতে আমাদের চিত্তমহাসাগর কল্লোলিত হয়ে উঠল। সে-কল্লোলে দেখা দিল বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধের নব নব উন্মেষ যা জীবনরসরসিকতায় নিটোল ও সতেজ, বিচিত্র ও বাঙময়।

এই প্রসঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের কাছে বিশেষত এ্যাংলিকান চার্চের প্রোটেষ্ট্যান্ট মতের কাছে আমাদের খণ সূকৃতজ্ঞ স্বীকার করা সততার পরিচায়ক হবে। প্রোটেষ্ট্যান্ট ইংরেজ ভারতের অধিপতি না হলে আমরা মুসলিম ধর্মোন্মাদ ও হিন্দু কদাচারের কবল থেকে সহজে মুক্তি পেতে পারতাম না। ভারত বা বাংলাদেশ ব্যাপক ভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নি বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজের লোককল্যাণমূলক সদাচারসমূহ, অনাড়ম্বর অপৌত্তলিক ঈশ্বর উপাসনাপদ্ধতি ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দুর চোখের ঢুলি খুলে ফেলতে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমত ও নিরীশ্বরবাদ বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। মাক্সম্যুলার এই জন্মে খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মমতের সমন্বয় আশা করেছিলেন। ব্রাহ্মরা অন্তত সামাজিক মুক্তির আদর্শটা প্রোটেষ্ট্যান্টদের কাছে থেকেই পেয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদের কাছে এটা পাওয়া যেত না। তাদের পৌত্তলিকতা তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকের কাজ করত। কিন্তু সোশ্যাল এম্যানশিপেশনের আদর্শটা পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপ থেকে এদেশে আসে। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা-প্রসার-প্রচার এ-যুগের প্রধান চিন্তাবস্তু। তার জন্মে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক হিন্দুর খ্রীষ্টান না হয়েও ঐ ধর্মের ভালো জিনিসগুলি পাবার জন্মে সমধিক আগ্রহ বহুলাংশে দায়ী। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র শিবনাথের সাফল্যের কারণ এখানেই নিহিত। খ্রীষ্টীয় সমাজের মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের মনোহরণ করেছিল বলেই ব্রাহ্মধর্মের প্রদীপশিখা দ্রুত জ্বলে উঠেছিল। আর তার অনিবার্য পরিণামে ব্রাহ্ম ও উদার শিক্ষিত নব্য হিন্দুর পার্থক্য অচিরে ঘুচে গেল।

ব্রাহ্ম মতের প্রসারলাভের সাহিত্যিক মূল্যবিচারে দেখা যায় :—

(১) সূক্ষ্ম দার্শনিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে গদ্যসাহিত্যে দেখা গেল।

(২) বহুবর্ষব্যাপী দার্শনিক আলোচনার ফলে লুপ্ত-প্রায় উপনিষদ, বেদান্তশাস্ত্র ও অগ্ন্যায় অধ্যাত্মতত্ত্বের সুপ্রচার হল। যে অধ্যাত্ম ভাবজাগরণকে জ্বল করে ভারতীয় রেনেসাঁস বলা হয় তা আসলে এই বেদ-বেদান্ত

উপনিষদ-তন্ত্র-গীতা প্রভৃতি চর্চার ফল। দুঃখের বিষয়, অচিরে এক নব প্রতিক্রিয়াশীলতার পৌত্তলিক অন্ধকূপে এই নবোদিত জ্ঞানসূর্য হারিয়ে গিয়েছিল।

(৩) মুখ্যত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের আশ্রয়ে একটি সুগভীর সময়স্র সাধন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়স্র সাধনার অন্তরাঙ্গা বৈদান্তিক বটে, কিন্তু এর রূপনির্মিত পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মূল কথা

হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিজয় ঘোষণা। এত দিন ব্যক্তি নিরপেক্ষতার জয়গান হয়েছে। তাঁর ধর্মবিশ্বক ভাষণগুলিতে ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক মর্যাদা স্বীকৃত হল। ব্যক্তি জীবনের মধ্যেই, প্রকৃতির সুসমার মধ্যেই ভাগবত বিভূতির সন্ধান পাওয়া গেল। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের অন্তরাঙ্গার যোগের ব্যাপারটিও অক্ষয়কুমারের লেখায় প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, এসবের মূল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও রোমান্টিকতা থেকে আগত।

আঁধারে আলোর সাধনা

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

কখন যে চুপিচুপি এসে এক লহমাত্রে জীবনের চলার রীতিটাকেই বদলে দিয়ে যান তিনি, তা টের পাওয়া যায় না। যখন সন্ধ্যা ফিরে পাই তখন দেখি ভিৎ নড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবনধারায় আসে বিরতি। দেখি পথ অন্ধ দিকে কাটা রয়েছে। ওই পথ ধরেই চলতে হবে। একটা ধারায় চলতে চলতে তাঁর গতি বদলে দিলে ছিটকে যাবার সম্ভাবনা তো থাকেই, তবে যদি কেউ হুঁসিয়ারি করে দেন তাহলে আর ভয় নেই। তা না হলে হোচ্চৎ খেতে হয় পদে পদে। ড্রাইভারকে জানতে হবে পথের বাঁক কোথায়, না জানলে যাত্রীদের প্রাণান্ত। আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। এবার ঘরে ফেরার পালা। নতুন কিছুই নয়, শুধু গতি অন্ধরের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। একটানা এতক্ষণ বলে থামলেন ডঃ ব্যানার্জী।

বললাম : আচ্ছা, ডক্টর ব্যানার্জী, সব তো ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু যে জীবন আপনি চালাচ্ছেন এইটে কি হঠাৎ হয় নি?

বললেন তিনি : হঠাৎ কিছুই নয় ভাই। আগে থেকেই সব ছক কাটা রয়েছে। এই দ্যাখো না আমার জীবনেই এসময় কতগুলি ঘটনা ঘটেছে যার ব্যাখ্যা তখন পাই নি।

গল্পের গন্ধে আরও উৎসুক হয়ে উঠলাম। ডাক্তার ব্যানার্জী ব'লে চলেছেন, সে অনেকদিন আগেকার কথা। দিল্লী থেকে বৃন্দাবন গেছি। সেখান থেকে ফিরবো দর্শনাদি সেরে। ফেরার সময় ইচ্ছে হলো দয়ালবাগ পেরিয়ে একটা বড়ো কবরখানা দেখে যাবো। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামছে আর দশমীর চাঁদ আকাশে অনেকটা জুড়ে রয়েছে। আলোয় ছেয়ে গেল একটু বাদেই। ড্রাইভার প্রীতম সিং বহুদিন ধরে আমার গাড়ী চালায়। খুব বিশ্বস্ত আর আমাকে সত্যিই ভালবাসে। রাত হয়েছে দেখে সে বিনীতভাবে বললো : সাব, অভি তো রাত হো গিয়া। কবরখানেনে যানা আচ্ছা নেহি হয়। আমি বললাম : সর্দারজী, অনেক দিন ইচ্ছে ছিল ঐ কবরখানা দেখে যাবো, তা সুবিধে হচ্ছে না। তুমি আজই নিয়ে চলো। তবুও সে বললো : রাতমে উধার কৈ নেহি যাভা হয়, যো গিয়া উয়ো জান লেকর ফিন্ আয়া নেহি। এই সব কুসংস্কারের কথা শুনে আমার রোখ চেপে গেল। বললাম : নেহি সর্দারজী, আজই যাবো।

বেচারি আর কি করে। নিয়ে গেল কবরখানার ধারে। বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে। অনেক দূরে গাড়ী বেঁধে সর্দারজী বললো—আর যাওয়া যাবে না,

এবার হেঁটে যেতে হবে। জ্যোৎস্নায় সমস্ত স্থানটি মায়াময় মনে হচ্ছিল। এগিয়ে চলেছি। প্রধান ফটক পেরিয়ে যাচ্ছি সুড়কী বিছানো পথ ধরে। দুপাশে ফুলের গাছ। বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পরে একটা কবরখানা। কিন্তু আসলটা ওখানে নয়। ওটি পেরিয়ে আরো এগিয়ে গেলে মূল কবরখানা। ফটকের কারুকর্ম কি চমৎকার। আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা শীতল স্পর্শ পেলাম পিঠের দিকে। ফিরে দেখি একজন বুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের চামড়ায় অসংখ্য বলীরেখা। আর চোখের চাউনি কি অস্বাভাবিক। বললাম : ইত্নি রাতমে তুমকো ক্যা জরুরং হায় বাতলাও। বুড়ি জবাব দিল : উধার যানা মানা হায়। মং যাও। আমি বললাম, 'তব তুম কাঁহে আয়া ?' জবাব না দিয়ে বুড়ি একটু হাসলো। তাকে উপেক্ষা করে এবারে জোর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। বারে বারে মনে হচ্ছে সেই ক্ষুধিত পাষণের কথা। ওই কবরখানা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। খানিকটা এগোবার পরে হঠাৎ যেন কে গায়ে ইলেকট্রিকের শক দিল। আবার তাকিয়ে দেখি সেই বুড়ি। চোখদুটো তার জ্বলছে। ধমক দিয়ে বললো : বেওকুফ, আউর মং যাও, একদফে মানা কিয়া।' আমিও পাল্টা ঝাঝিয়ে উঠে বললাম : তুম ভি দিল্লাগী কর্তা হায়।

আমার অপূর্ব হিন্দী শুনেই হোক বা অন্য কারণেই হোক বুড়ি হেসে উঠলো। সে হাসিতে আমার ভেতরে কাঁপন ধরে নি তানয়। তবুও এবারও উপেক্ষা করে ছুটে চললাম কবরের দিকে। অশীতিপর বৃদ্ধা নিশ্চয় আর আসতে পারবে না। খানিকটা পথ আরো গেছি। ওমা! তাকিয়ে দেখি বুড়ি আমার সামনে পথ রোধ করে আছে। এবারে সত্যিই ভয় পেলাম। আমি যোয়ান বয়সের লোক। বুড়ি এত জোরে ছুটতে পারে আর আমার সামনে এলোই বা কোন দিক দিয়ে। বুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে বললো শাসনের ডঙ্গাতে : অভি নিকাল যাও হিঁয়াসে। আমি তখন গেটের দিকে ফিরে চলেছি দৌড়ে। শীতের দিন। কিন্তু ঘামছি। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি

বুড়ি এসে গেছে। এবারে তার কণ্ঠ কোমল, যেন ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে পড়ছে। বললো, 'বেটা, ইয়ে দ্বনিয়ামে দেখনেকো চিজ্ তো বহোত হায়। ইয়ে সমাধি দেখনেনে ক্যা ফয়দা হোগা বাতলাও। আপন মন্দিলমে সমাধি বনাও, আঁখো বন্ধ করকে উয়ো সমাধি দেখো, ওহি হায় আসলি সমাধি। ইয়াদ রাখো বেটা।' মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। সম্মিত ফিরে পেতেই দেখি কেউ নেই। আমি একা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

আর নয়। এবারে বিলাতী ডিগ্রীধারী আমি ছুটে চলেছি গাড়ীর দিকে। প্রীতম্ সিং আমার অবস্থা দেখে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আমাদের সীটে বসিয়ে দিলে। তার রক্ষাকবচ ঘোড়ার নাল একবার আমার কপালে ঠেকিয়ে উদ্বেগস্বাসে গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ গাড়ী চলার পরে দেখি প্রীতম্ সিং গাড়ী থামিয়ে কার কাছে যেন গেল। একটু বাদেই ওর সঙ্গে এল আর একজন বুড়ো লোক। দেহাতী। প্রীতম্ সিং বললো, 'সাব জুতা উতারনে হোগা।' বলে নিজেই আমার জুতো খুলে জল দিয়ে পা ধুইয়ে দিল। বুড়োকে বললো : চাচাজী, জলদি গরম দুধ লে আও।' পনের মিনিটের মধ্যেই দুধ এলো। নির্বিবাদে খেলাম। যখন থাচ্ছি তখন দেখি প্রীতম্ সিং সেই বুড়োকে কি সব বলছে, আর বুড়ো চমকে উঠে বারে বারে তাকাচ্ছে আমার দিকে। দুধ খাওয়া শেষ হলে প্রীতম্ সিং আবার উদ্ভা বেগে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে এলো আমার বাড়ীতে। এবারে হাঁফ ছেড়ে বললো : সাব, আপ জান লেকর চলা আয়া উঁহাসে, কভি নেহি শুনা। ওর কথার মর্ম, হলো ওই কবরে যারা যায় তারা আর ফেরে না, অবশ্য রাত্রি।

ডাঃ ব্যানার্জী থামলেন। বললাম, 'ওই বুড়ি কে জানতে পেরেছেন?' ডাক্তারের ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি খেলে গেল। বুঝলাম, জানেন কিন্তু বলবেন না।

আমি বললাম, 'আপনার আর্টিস্ট কি বলেন?' উনি বললেন, 'ঠিকই বলেছো, আর্টিস্ট-ই তো।' আমার জীবনটাকে নতুনভাবে যিনি গড়েছেন তিনি তা শিল্পীই।'

একটু থেমে বললেন, ‘মথুরায় কংকালী টিলাতে গেছ, বা গোবর্দ্ধনে কাত্যায়নী মন্দিরে? মথুরায় আছে যোগমায়ার মন্দির। বিষ্ণুচলেও তিনিই। চণ্ডীতে পড়েনি—নন্দ গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।’

‘তত্শ্চ নাশম্ভিষ্ণামি বিষ্ণুচলনিবাসিনী ॥’

আমি ফের প্রশ্ন করি : আচ্ছা, উষ্টর ব্যানার্জী? আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, কৃষ্ণ, রাধা এসব বিশ্বাস করলেন কি করে?

উনি বললেন, ‘ভাই, এ নিয়ে কি কম তর্ক করেছে। ঐ যে মথুরার কথা বললাম না, ওখানেই এক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে দেখা হলো একবার। কাছে গিয়ে বসলাম। দেখি চোখ বন্ধ করে জপ করছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকার পরে দেখি বাবাজীর ধ্যান ভাঙলো। প্রশংসা করতেই বললেন, কৃষ্ণ আপনাকে কৃপা করুন। তখন তর্ক করার মেজাজ ছিল খুব। বললাম, ‘বাবাজী, একটা কথার জবাব দেবেন?’ উনি না তাকিয়েই বললেন, ‘কৃষ্ণে বিশ্বাস নেই এই তো! বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণ যা করেছেন বানানো গল্প মনে হচ্ছে একথাই তো বলবেন বাবা!’ বুঝলাম, শব্দ পাল্লায় পড়েছি। মনের কথা পড়তে পারেন ইনি! বললাম : বাবাজী, এইসব পুতনা বধ, তৃণাবর্ত, বকাসুর, অঘাসুর বধ কেমন যে লাগছে শুনতে। ওইটুকু বাচ্চা ছেলে কৃষ্ণ এসব করলেন কি করে?’

একটু হেসে বৈষ্ণব সাধুটি বললেন, ‘বাবাজীর মধ্যে বিজ্ঞানের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা শুনুন বাবা, এদিক দিয়েও বিচার করতে পারবেন।’

কংস থেকেই শুরু করা যাক। কংস হলো অহংকারের প্রতীক। আর দেবকী হলেন দৈবী সম্পদ। বসুদেব আর দেবকী মিলে হলো দৈবী সম্পদশালী জীব। অহংকারের কারাগারে বদ্ধ হয়ে আছে জীব। দৈবীসম্পদ মুক্ত হলে বা মুক্তি হলে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ তাঁর অন্তরে আসেন। শিশু কৃষ্ণকে গোকুল ও বৃন্দাবনের শান্ত, দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে রাখতে পারলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জীবের আত্মরিক বৃত্তি নষ্ট করে দেন। পরে তার কংসভাব বা অহংকার বিনাশ করেন। তখন জীব কংস কারাগার থেকে মুক্ত হয়। তার মানে বুঝলেন না,

জীবের অহংকার চলে যায়। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কেন জানেন? জানেন না? ভূঃ, ভুবঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্যম্ এই সাত লোকের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম বা নিত্যবৃন্দাবন। অষ্টম লোকে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণই তাই জীবের অহংকার দূর করতে পারেন। কি বাবা মনে ধরলো!

বৈষ্ণব সাধুটি তখন হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তাঁর ব্যাখ্যায় সত্যিই অবাক হয়ে গেছি। তখন বললাম ‘পুতনা বধ এগুলি—’ বাবাজী আবার শুরু করলেন, ‘পুতনা হলো কামরূপিনী। সে হলো বালগ্রহ। এই কামচারিণী কত বালক, শিশুভক্তের ভক্তিকে নাশ করেছে। কামের প্রলোভন প্রবল। দেখবেন লেখা আছে পুতনা খুব সুন্দরী, কিন্তু তার অন্তরে রয়েছে বিষ। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন তাঁকে তো তিনিই বাঁচাবেন। তিনিই তো কামকে ঠেলে দেন। দেখবেন বৃন্দাবন লীলায় বলা হয়েছে পুতনা মারা গেলে তার রাক্ষসী দেহের পতনে ছয়কোশের গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেল। এর মানে কি জানেন? ছয় কোশ হলো ছটা রিপু। তাদের তাদের বিনাশে প্রেমের বাতাস বইতে থাকে। বালঘাতিণী পুতনা কৃষ্ণের স্পর্শে পাপহীন হলো। তার দেহ পুড়ে যে ধোঁয়া উঠছিল তাতে অগুরুচন্দনের গন্ধ পাওয়া গেল। কামের বিনাশ হলেই কৃষ্ণ রতি হয়। এমনিভাবে, বকাসুর মানে কি? বনুক ধাতু থেকে এসেছে বক শব্দ। তার মানে হলো কুটিলতা। এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যার মনে কুটিলতা নেই। এই যে বাবা প্যান্ট কোট পরে বসে আছেন, আপনার মধ্যেই কি ধর্মের ভান, বিদ্যার ভান, রূপের ভান অভিমান, দীর্ঘা নেই? তাই কৃষ্ণকে পেতে হলে বকাসুরের হস্ত চাই। কে পারেন বকাসুর নিধন করতে? স্বয়ং ভগবানই পারেন।’

বুঝলে মজুমদার, আমি তো তখন মাটিতে মিশে গেছি। চোখা চোখা বাণ ছুড়ছেন সাধুটি। আবার শুরু করলেন তিনি, ‘অঘাসুরের কথা বলছিলেন না? অঘ মানে পাপ। অহরহ নানা পাপ আমাদের গ্রাস করছে, তাকে ক্ষয় করতে হয়। সন্ধ্যাহিক করার

অভ্যাস নেই তো? তাহলে জানতেন অঘমর্ষণের কথা আছে। কৃষ্ণের প্রসাদে সাধকের মন থেকে পৈশুণ্য, কৌটিল্য, পাপ দূর হলো। এমনিভাবেই তো এগোতে হবে সাধককে।’

আমি বললাম : দেখুন ডক্টর ব্যানার্জী, এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তো খুব ভাল লাগলো। কিন্তু কৃষ্ণ কি সত্যিই ছিলেন?

উনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : “দেখ ভাই, সেই বৈষ্ণব সাধুটি সব ব্যাখ্যা করবার পরে আমিও তোমার মত প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বলেছিলেন—‘এ ঘটনা চিরন্তনী। যুগে যুগে এমনি ঘটনা হয়ে থাকে।’ হঠাৎ আমার মেরুদণ্ডে হাত বোলাতেই মুহূর্তের জন্ত দৃশ্যপট যেন বদলে গিয়েছিল। উনি আবার কি করলেন ফিরে এলাম নিজের জগতে। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই উনি যেন নিয়ে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনের লীলাভূমিতে। এই অহেতুক কৃপাতে আমি বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পরে বুঝেছি এটাও আমার পাওনা ছিল। একটু ঢাকনা খুলে দিয়ে চকিত দর্শন করালেন। থিয়েটারে দেখো নি, জ্ঞান একটু যদি সরে যায় ভেতরের সাজানো স্টেজ আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখা যায়। জ্ঞান না ওঠা অবশি সামনে কালো অন্ধকার।”

ডক্টর ব্যানার্জী আনমনা হয়ে ভাবছেন। ইচ্ছে ছিলো না তাঁকে বিরক্ত করি। খানিকবাদে নিজে থেকেই বললেন, ‘আমাদের দেশে কত সাধু-মহাত্মা গোপনভাবে আছেন। নিজেদের ঢেকে রেখেছেন কেউ দীনতার সাধারণী আবরণ দিয়ে আবার কেউ কুর্কশ ভাষণের আঁটোসাঁটো পোষাক পরে। ভেতরে একবার যেতে পারলে টের পাওয়া যায় কোমল-কঠোরে এক আদর্শ মানুষ তাঁরা।’

একবার গেছি কুস্তি মেলায় এক তীর্থযাত্রী সংস্থার ডাক্তার হয়ে। খুব খাঁতির। সেবার প্রয়াগে কুস্তি মেলা হয়েছে। সারাদিন আমাদের যাত্রীদের অসুখ বিসুখের তদারক করি, আর রাত্রে ঘুরে বেড়াই। শীত প্রচণ্ড। খোলা আকাশের তলায় সারি সারি তাঁবু। নানা সম্প্রদায়ের সাধু। নানা দেশ থেকে এসেছেন তীর্থযাত্রীরা। কুস্তিগান করে যাত্রীরা পাগমুক্ত

হতে চান আর ভাবেন দৈবাৎ সদৃশক বা কৃপালু যোগী মিলে যদি যায় তাহলে উপরি লাভ। জাগতিক সমস্যার সমাধান করে নেওয়া যাবে। আমি একা গেছি। আমারও ইচ্ছে যদি দর্শন পাওয়া যায় কোন সাক্ষা সাধুর। আমার বন্ধু প্যাথলজিস্ট ডাঃ কে. সি. ভট্টাচার্য বলেছিলেন আমাকে, অনেক রাতে নাকি খাঁটি সাধু খুঁজতে হয়। রাত ন’টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটার সময় উঠে কোট-প্যাণ্ট চাপিয়ে টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কত তাঁবু, আবার কতো ছোট রূপড়ি তার কি শেষ আছে। আবার অনেকে খোলা আকাশের নীচে লম্বমান। কিভাবে পাবো প্রকৃত সাধুর দর্শন। নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়াছি। কোন কোন তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি ভিতরে কোন সাধু জেগে আছেন কি না।

এমনি ভাবে দুটি রাত কেটে গেল। ভোরের দিকে নিজের আস্তানায় ফিরি। আমাদের যাত্রীদের অনেকে বলেন, ‘ডাক্তারবাবু, খুব ভোরে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন?’ দায়সারা উত্তর দিয়ে ঢুকে পড়েছি নিজের নির্দিষ্ট স্থানে। তৃতীয় দিনে মনে জেগেছে দারুণ আক্ষেপ। ভাবছি এমন কি আমার পুণ্য আছে যার ফলে আমি মহাত্মাদের দর্শন পাবো। নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছি। সারাদিন অশ্রমমন্ড ছিলাম। রাত দুটোয় আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম পাগলো মেহেরআলীর মতো। ভাবছি আজও প্রভাত হলে মনে মনে বলবো ‘সব বুট্‌ হায়’।

সেদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলো। দেখি একটা তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলছে। পর্দা ফাঁক করতেই চম্ভুস্তির। এক বিরাটকায় সাধু শূণ্ঠে বসে আছেন পদ্মাসনে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভিতরে ঢুকলাম। জানি অশ্রয় হচ্ছে, তবুও কে যেন জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন ভিতরে। খানিকক্ষণ বাদে সাধুটির ধ্যান ভাঙলো। আমাকে দেখেই সে কী অশ্রাব্যভাষায় গালাগাল। হোস পাইপে জল ছিটিয়ে দেবার মতো গালাগাল ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। আমি হাত জোড় করে বসে পড়লাম হঠাৎ। দেখলাম সাধুটি ভূমি স্পর্শ করলেন। প্রণাম করলাম। তাঁটার মত চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে

চাইছেন আমাকে। মাটিতে বসে প্রথম সম্ভাষণ হলো 'বেতমিজ, তু কাহে আয়া ইধর?' বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কোন বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি। সাধু দর্শনের আশায় এসেছি।

বজ্রগুণীর ঘরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'এত রাতে সাধু দেখতে এসেছিস, দিল্লাগী হচ্ছে? বল ব্যাটা, তুই কি মতলব নিয়ে এসেছিস, নইলে তোকে পুড়িয়ে দেব।' হাত জোড় করে আবার বললাম, 'মহারাজ, আপনি যোগসিদ্ধ পুরুষ, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কোন খারাপ উদ্দেশ্য আমার নেই। শুনেছি এই সময় মহাত্মরা জপধ্যান করেন, তাই তাঁদের দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।'

রেগে বললেন তিনি, 'তুই ওস্তাদ হয়ে গেছিস, তুই সাধু চিনবি কি ক'রে? বললাম—'সে কথা সত্যি মহারাজ, আপনারা নিজে থেকে কৃপা না করলে আমার মত পাপীর সাধ্য কি আপনাদের দর্শন পায়?'

দেখলাম গুণীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বললাম, 'মহারাজ দু'দিন ধরে ঘরে বেড়াচ্ছি, আজ মাত্র আপনার দর্শন পেলাম।'

বললেন, 'উয়ো তো মুখে সমঝ লিয়া।' পরক্ষণেই বললেন, 'যোগবিভূতি দেখনেকো লিয়ে তেরা মন্ হয়ে।' বললাম, 'মহারাজ, সেটা সত্যি, তবে আসল উদ্দেশ্য তা নয়।' হৃদয় দিয়ে উঠলেন, 'চুপ রহো! বহোত লায়েক হো গিয়া।' এই বলেই উবু হয়ে বসলেন আর খানিকটা মল বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এহি হ্যায় বিভূতি, খা লেও!' দেখি সদ্গ নির্গত মল। মরীয়া হয়ে তাই মুখে দিলাম। আমার তখন রোখ চেপে গেছে। খেয়ে দেখি—ওমা! এ যে অপূর্ব স্বাদ আর কি সুগন্ধ তাতে!

হা-হা করে সাধুটি হেসে উঠলেন। তারপরে তাঁর কঠ আকস্মিক ভাবেই কোমল হয়ে এলো। বললেন, 'বেটা, তুমি আজ আসবে তা জানতাম। তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তোমার গুরুর যিনি গুরু তিনি বাইরে শুয়ে আছেন, চলো দেখিয়ে আনি।' তাঁর সঙ্গে বাইরে এলাম। অনেক দূর যাবার পরে দেখি এক সাধু নিভুতে বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে। সঙ্গে সাধু মহারাজ

বললেন, 'ইনকো পরনাম করো।' দুজনকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তারপরে আস্তে আস্তে বললাম বিরাটকায় সাধুকে, 'মহারাজ, আমার তো গুরু একজন আছেন কলকাতায়। তাঁর গুরুদেব কি?' জবাব দিলেন, 'নেহি, তুমকো দুসরে গুরুজীকো গুরু।' তখন জানিই না কে হবেন আমার দ্বিতীয় গুরু। মনের ভাব বুঝে নিয়ে উনি কি ইঙ্গিত করলেন ধ্যানমগ্ন সাধুকে। এবারে তাঁর চোখ খুললো। কি প্রশান্ত চোখ! আমার সর্বাঙ্গ যেন আনন্দের আলোয় আদ্ভুত হলো। আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত রেখে।

এবারে সঙ্গে সাধুটি বললেন, 'চলো মেরা ঝোপড়িমে'। কোট, জামা, প্যাণ্ট খুলে পদ্মাসনে বসলাম তাঁর নির্দেশে। সাধুটি আমার সামনে বসে আমার ব্রহ্মদণ্ডে স্পর্শ করতেই এক অপূর্ব, অজ্ঞাত অনুভূতিতে ডুবে গেলাম। চোখের সামনে দেখতে পেলাম নানা দৃশ্য। দেখলাম আজানুলম্বিত এক পুরুষকে। একটু বাদেই আবার স্পর্শ করলেন সাধুটি। বললেন, 'ঠিক হ্যায়, দেখা তো তুমকো দুসরা গুরু কোন? কাতর কণ্ঠে বললাম, 'মহারাজ এত কৃপা যখন করলেন, তখন আপনাদের কেউ দীক্ষা দিন দয়া ক'রে। যাকে দেখালেন তাঁর দর্শন পাবো কবে কে জানে?' সাধু মহারাজ বললেন, তা-তো হতে পারে না। উনিই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তবে তাড়াতাড়িই তুমি তাঁর দর্শন পাবে, আর তিনি নিজেই দেখা দেবেন তোমার কাছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর হয়ে এসেছে। প্রায় চারটে বাজে। সাধুটি প্রশ্ন করলেন, 'আমি কুন্ত স্নান করবো কি না?' বললাম, 'মহারাজ এই সময়ে স্নান করতে যাবার ইচ্ছে নেই।' গর্জন ক'রে বললেন, 'এখনই ভাল সময়। এখন স্নানে পুণ্য হবে।' আমি যাবার নাম করছি না দেখে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। এসেই পা দিয়ে মাটির উপরে ওঁতো দিলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানেই জলধারা উঠছে। কোট খুলতে না খুলতেই সর্বাঙ্গ জলে ভিজি গেল। ওই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও এই জলধারা শরীরে কাঁপন ধরালো না। হতে পারে দৃষ্টি বিভ্রম,

কিন্তু মনে হলো ঘোলাটে আর কালো জলধারার মধ্যে ডুবে আছি আমি। মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছি কোন অতল গহ্বরে। নীচের দিকে তাকাতেই দেখি আরো একটা নদী যেন কুলুকুলু রবে বয়ে যাচ্ছে। উপরের দিকে মুখ তুললাম। স্পষ্ট দেখলাম আমার অরাধ্যা মূর্তি রয়েছেন। তাঁর পাশে কয়েকজন সাধু, কত প্রাচীন কে জানে বসে আছেন। মিনিট পাঁচেক কি দশেক হবে। জল সরে গেল। দেখি সাধু মহারাজ স্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বললেন, ‘আভি যাও বেটা, তুমকো আল্লাই হো গিয়া। দর্শন ভি হো গিয়া।’ প্রাণিপাত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ‘মহারাজ আপনার কৃপাতেই এই দর্শন হলো। কিন্তু একি সত্যি? উত্তর দিলেন, ‘বেটা এখনো অবিশ্বাস? দাখো, তোমার দেহ ভিজে গেছে। জল পড়ছে। আর যা দেখেছো তা সব সত্যি। এবার নিজেকে তৈরী করতে হবে তোমাকে।’

থামলেন ডক্টর ব্যানার্জী। প্রশ্ন করলাম, ‘আপনার এখন যিনি গুরু আছেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন।’ উনি বললেন, ‘দেখ ভাই, গুরুদেব শুধুই অমিতশক্তিধর তত্ত্বসাধক নন, যোগমার্গেরও চূড়ায় বসে আছেন তিনি। তাঁর কথা তোমাকে আগে বলেছি কিছু। উনি এত সাধারণ ভাবে থাকেন যে ধরা যায় না। ওঁর কৃপায় সামান্য সাধন ভজন করছি।’ আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ‘উনি কি আমার ডাকে সাড়া দেবেন? আপনি একটি বার দর্শন করিয়ে দিন।’ কি জানি আমার কণ্ঠে কি ছিল, ডক্টর ব্যানার্জী আহ্বান করলেন তাঁর গুরুকে। কলকাতার বাইরে এক নির্জন স্থানে বসে আছি আমরা দুজন। হঠাৎ দেখতে পেলাম দুটি আলো উপর থেকে যেন ছুটে আসছে। চোখ ঝলসে গেল। বন্ধ করে ফেললাম চোখ। ডক্টর ব্যানার্জী বললেন, ‘মজুমদার, চোখ খোল।’ দেখলাম দিব্যকান্তির এক প্রোচ পুরুষ। আজানুলম্বিত বাহু। ঠোঁটে হাসির বিলিক। প্রশ্ন করতেই তরলকণ্ঠে বললেন, ‘ডাক্তার, তোমার আবার এ কি বুদ্ধি। ডাকলে কেন?’ ডক্টর ব্যানার্জী প্রশ্নাম করে বললেন, ‘গুরুদেব ওঁর বড়ো ইচ্ছে আপনাকে দর্শন করার।’

ডক্টর ব্যানার্জী গুরুদেব, তাঁর জীবনশিল্পী বললেন,

‘ওর আরো ইচ্ছে আছে।’ আমাদের নিয়ে চললেন সামনে একটা গাছের সামনে। গাছের গুঁড়ি আলোয় আলোময় হয়ে যাচ্ছে। আর তাকাতে পারছি না। সেই আলো যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে। সম্বিত হারলাম। চেতনা বিলুপ্ত হবার আগে শুনতে পেলাম ডক্টর ব্যানার্জীর গুরুদেবের কণ্ঠস্বর, ‘বুঝলে মজুমদার, অন্ধকারে আলো ফোটানোই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বড় দুর্গম পথ। সাবধানে চলতে হয়। চাই ত্যাগ, চাই তিত্তিকা। আর চাই একনিষ্ঠ সাধনা। সবাইকে ভালবাস।’ সবার মধ্যে ব্রহ্মময়ী মাকে দেখার সাধনা করো। এই দেখ, ডাক্তার দেখছে তার আরাধ্যা দেবীকে। তুমি তাকিয়ে দেখ।’ পারলাম না। আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি দাঁড়িয়ে আছি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গী রোডে। আলোয় ঝলমল করছে চৌরঙ্গী। পাশে আছেন একজন। আশ্চর্য হয়ে বললাম, ‘এ কি, কলকাতায় এলাম কি ক’রে এরই মধ্যে?’ ডক্টর ব্যানার্জী বললেন, ‘ও হয়ে যায়। কিছু মনে করার নেই। গুরুদেব পৌঁছে দিলেন।’ বললাম, ‘সে কি! এই অল্প সময়ের মধ্যে এত মাইল পথ এলাম কি ক’রে?’ উত্তর পেলাম না। মনে হলো এও সেই আমার সাধনার ফল।

বাস-ট্রাম কখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় জনহীন চৌরঙ্গী দিয়ে আমরা দুজন হেঁটে চলেছি। নিঃশব্দে। কৃষ্ণপঙ্কজের অমারজনী। আকাশে অসংখ্য তারকা। নাম জানি না। কিন্তু ফুটে আছে ঠিক। যারা জানেন তাঁরা ঠিক চিনিয়ে দিতে পারেন। পেছনে তাকাতেই দেখি ডাক্তারের গুরুদেব আসছেন, মুখে লেগে রয়েছে রহস্যময় হাসি। বললেন, ‘একটা ট্যাক্সি ডাকো।’ ট্যাক্সিতে ক’রে আমাদের নামিয়ে দিলেন বাসার কাছে। ওঁরা চলে গেলেন। বললাম, ‘নামবেন না?’ ডক্টর ব্যানার্জী জবাব দিলেন, ‘আজ যে আমার রাত। গুরুদেব আর আমি যাচ্ছি একটু কাজে।’ ওঁরা চলে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর ভাবছি ডাক্তার হয়তো নিকষকালো আধারের বুকে আলোর ফুল ফোটাতে গেলেন। কে জানে।

মধুরেণ

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈশভোজন শেষ। ডিনারান্তিক পানপর্ব জন্ম-জন্মট। আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনে যোগদানকারী বিশ্ব বিজ্ঞত আইনবিদদের সমাবেশ।

দোতলার বুলন্ত বারান্দা অনুগ্রহ আলোয় রহস্যময়। নীচে সবুজ ঘাসের গালচে বেছানো লন। ডানদিকে আগাগোড়া কাঁচে ঢাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট হলের মধ্যে সুইমিং পুল। শ্বেত মর্মরের মেঝের মাঝে কানায় কানায় পরিপূর্ণ জলাশয়। জলের গভীর থেকে লাল—নীল—হলদে—সবুজ আলো কম্পমান জলকে ক'রে তুলেছে রামধনু-রঙীন।

বুলন্ত বারান্দায় চলেছে নৈশ ভোজনান্তিক পানপর্ব ও হাক্কা আলাপ-আলোচনা হাসি-গল্প। রাত্রি হৃদ্যি পাওয়ায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিমান। মাত্র পাঁচ-ছয় জনে অবসিত। প্রত্যেকেই বয়সে প্রবীণ, জ্ঞানে গরীয়ান, খ্যাতিতে ভাস্বর।

স্বচ্ছ আকাশে অগণিত দেদীপ্যমান তারা। পাণ্ডে আবদ্ধ স্বর্ণবর্ণী পানীয়ে অজস্র অস্থির বুদবুদ। পুষ্প-গন্ধী বাতাসে আশ্চর্য মাদকতা। বহুদর্শী ওই কয়জন মনীষীদের কাছে রাত্রি ভখনো স্থবির। হয় নি।

পানীয়ে হাক্কা চুমুক দিয়ে একজন প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, মিঃ...। কি রকম মৃত্যু আপনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন?

—অকস্মাৎ এ-অদ্ভুত প্রশ্ন?

—আহা, অদ্ভুত তো সারা পৃথিবীটাই এবং আমাদের সমগ্র জীবনও। বলুনই না, আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার বক্তব্য কি?

পানপাত্রে মাঝারি চুমুক দিয়ে ক্ষণিক নীরবতার পর দ্বিতীয় জন উত্তর দিলেন : আমার কাম্য, হোম-ল্যান্ডে নিজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন, প্রিয়, পরিজন পরিবৃত্ত অবস্থায় সকলের দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জলের মধ্যে বিদায় নিতে। আমার জন্মে আমার আপনজনদের কি প্রগাঢ় ভালোবাসা,—আমার মৃত্যু আশঙ্কায় তাদের কি গভীর শোকাবেগ—এ দেখে মরতে পারলে; মৃত্যুর পরও আমার আত্মা শান্তি পাবে।

তিনি খামলেন। বয়সকে আদেশ দিলেন : আর একটা হাফ!

—ইন্সপিড।

মন্তব্য করে অপর এক প্রবীণতর ব্যক্তি, শূন্য পানপাত্র টেবলের উপর হাক্কা হাতে হুঁকে ছন্দোবদ্ধ শব্দ তুলতে তুলতে বললেন : নিতান্তই পোষ-মানা মৃত্যু। ওতে না আছে উত্তেজনা; না আছে গোরব। আমি চাই, সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো একটা ইস্যু সংক্রান্তে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে চলেছি। পথে প্লেন ক্র্যাশ ক'রে মৃত্যু হ'লো। পরের দিন সমগ্র বিশ্বের কাগজে কাগজে আমার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা। আমার জন্ম শোক প্রকাশ। আমার জন্মে সম্মেলন স্থগিত রাখা। আমার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা...

অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে অপর প্রবীণ-তম ব্যক্তি পাইপের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে অর্থপূর্ণ মৃদু হাসির পটভূমিতে শান্ত কণ্ঠে বললেন : শ্যাম!

বাধা প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন : হোয়াট ডু ইউ মীন মিঃ...?

শুভকেশ বুদ্ধ বিস্তারিত চোখে বলিরেখাঙ্কিত রক্তিম ললাট কুঞ্চিত ক'রে বললেন : হামব্যগ! ও সমস্ত মিথ্যা শোক। মৃত্যুর স্বর্গ।

সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের উত্থাপনকারী আগ্রহ মিশিয়ে বললেন : ওয়েল মিঃ...। তাহলে আপনি বলুন, কি রকম মৃত্যু আপনার কাম্য?

—ভেরি সিম্পল!

শুভকেশ স্নেহচর্ম বুদ্ধ প্রলম্বিত চুমুকে শ্যাম্পেনপাত্র নিঃশেষ করে গান্ধীর অভিব্যক্তিতে বললেন : I wish, I were shot dead by the jealous husband of a handsome young wife.

অক্ষুণ্ণ গান্ধীর সঙ্গেই তিনি পাইপে গভীর টান দিলেন।

অপর সকলের হাসির উচ্ছ্বাসে নিস্তব্ধ রাত্রির নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরগুলো আথাল-পাথাল চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

দুর্গাপূজার শাস্ত্র-বিজ্ঞান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

কথাটা শুনে পুরাতন সংস্কারে খুবই বাধে যে ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি আরাধনায় বাধা সেধেছে 'শক্তি পূজা'। এবং সেই পূজার সাধক সাধিকার দল ; কারণ সেই পূজাটিকে বর্ণাশ্রমিক রীতিতে এনে তাকে পুরোহিত তন্ত্রেরই ঐকান্তিক করার জন্য। তাছাড়া শক্তিপূজাই যদি জগৎগণের রক্তে রক্তে সংস্কারে সংস্কারে ছড়িয়ে দিতে এই পূজাটির মৌল লক্ষ্য হয় তবে এক বিশেষ শ্রেণীর জাতি পরিচয়ে মুখ্যভাবে পরিচিত যারা সেই পুরোহিতগোষ্ঠীর হাতে পূজাটিকে রাখার জন্য ব্যগ্রতা কোন যুগে কোন শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ছিল? যা অত্যাধিক তাকেই বলা হচ্ছে বা ঘোষণা করা হচ্ছে এই আমাদের শক্তি পূজা, এই আমাদের বাঙ্গালী জাতির সর্বজনীন মাতৃদেবীর আরাধনা?

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কিংবা জনগণের প্রয়োজনে শক্তি-চর্চা এক জিনিষ, আর মৃৎ-কাঠাদির দ্বারা মনুষ্য আকৃতির বিগ্রহ নির্মাণ করে হিন্দু আখ্যাত সম্প্রদায়ের পুরোহিতগোষ্ঠীর দ্বারা তাতে প্রাণ সঞ্চার ও প্রাণ বিসর্জনের এক ধরনের পূজা অর্চনা আর এক জিনিষ ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি পূজা উৎসব।

এ উৎসবের আয়োজন প্রতিদিন করলেও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির কোন একটিরও এতে শক্তি বৃদ্ধি হয় না এবং হবেও না; যেহেতু অত্যাধিক এই উৎসব রাষ্ট্রের জন-শক্তির মধ্যে না অন্তর্মুখী না বহিমুখী শক্তির বিজ্ঞান প্রসারিত হয়েছে।

অথচ এই ধরনের উৎসবের মূলে রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস এবং 'চণ্ডী' নামক একটি পুস্তকের বিবৃতি পাঠ ও আবৃত্তি মাত্র; তাও বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিতগোষ্ঠীর মাধ্যমে।

বাংলার সমাজজীবনে ষোড়শ শতাব্দীটি চিহ্নিত শতাব্দী। এই সময়েই মহামতি রঘুনন্দন প্রবর্তন করেছিলেন এই লোকোৎসব দুর্গাপূজার। গুণ দুর্গা-পূজাই বা কেন, বাংলার ছোটখাট সব রকম লোকোৎসবকেই তিনি তাঁর অষ্টাবিংশতি তত্ত্বগ্রন্থে তালিকাভুক্ত

করেছেন, যা তখনকার দিনের ভারতের অল্প কোন প্রদেশেই এইভাবে লোকোৎসবকে অবশ্য কৃত ধর্মের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

সামাজিক কৃত্যের মধ্যে ধর্মীয় উৎসবকে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে রঘুনন্দনের এইভাবে সামাজিকবোধের অন্তরালে বাঙ্গালীর সম্মিলিত শক্তির প্রমুখ ব্যক্তির যে কৃতিত্ব লুকিয়ে রয়েছে, সেটি কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। কারণ তাঁর কিছু অতীতের বাঙ্গালী জাতি শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীনিত্যানন্দের দান লাভ করলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আহারীয় কার্য কলাপে যেভাবে কড়াকড়ি বিধিনিষেধের বেড়া দেওয়া আছে, তার দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে এক সূত্রে বাধা অসম্ভব। এদিকে বাঙ্গলা তখন দুটি প্রধান জাতির আশ্রয়ভূমি, যে দুটির একটি প্রভুর জাতি, অপরটি দাসের জাতি।

দাস জাতি মানে হিন্দু জাতি, তারা কিছুতেই ভাবতে পারতো না রাজপদের অধিকার কোন হিন্দু পেতে পারে, প্রমাণযোগ্য উদাহরণ রাজা গণেশের কাহিনী। অতএব রাজশক্তিটি মুসলমান জাতির করায়ত্ত থাকলে বাকী হিন্দুজাতের দাসত্ব বোধটিও তারসঙ্গে চিরায়িত হবেই।

কালে তাও নিঃশেষিত হবে। অথচ সেই তুর্কী সৈন্যরা প্রথমে বাংলা দেশ জয় করে এখানে বসবাস করলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা তখন উন্নত ছিল না, কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ধর্মীয় সংস্কারের একাই কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল যা হিন্দু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জেতেই হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছেও অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতো, অপর দিকে রাজার জাতি মুসলমানের কাছে দাসজাতি হিসাবে অপমান সহ্য করতো। অপমানের দিক থেকে উচ্চবর্ণের লোক এ থেকে রেহাই না পেলেও নিম্নশ্রেণীকে তারা আপন বলে গ্রহণ করতে পারেন নাই। হিন্দুর সাধারণ লোক পরিস্কার জানতো বখতেয়ার খিলজীর

একজন মেচ্ছাভ্যাত্তীয় অনুচরই গোড়ের সম্রাট হয়েছেন, অতএব রাজার জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করে রাজার সামিল হওয়া কম আকর্ষণের নয়।

সেই রাজারজাতির। সর্বদাই উন্মুক্ত করে রেখেছিল নিয়ন্ত্রণের হিন্দুদিকে ধর্মাস্তরিত করে সংখ্যালঘু মুসলমানজাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করার প্রয়াসকে। এদের বিশেষ অনুচর ছিলেন পীর, দরবেশ, ও সূফী সম্প্রদায়। তার প্রমাণ শাহজালাল। তিনি সূফী দরবেশ, কিন্তু গুরুর আদেশে ৭০০ শিষ্য নিয়ে শ্রীহট্টের অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে সুলতানের সাহায্য করেছিলেন এবং বহু নিম্নবর্ণের হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

এ ইতিহাস পাই ষোড়শশতাব্দীর কিছু আগে পর্যন্ত দুইজন মুসলমান লেখকের ইতিহাস থেকে। দুইজনেই কিন্তু মহাভারতের কাব্যানুবাদ করেছেন। কবিকল্পও যে চণ্ডী কাব্যটি লিখেছেন তারও স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক অবস্থার কথা লিখেছেন।

বাংলার সামাজিক জীবনের এই পরিবেশে ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে চণ্ডিকা পূজা বা দুর্গাপূজার প্রবর্তন কতখানি উদার, সংসাহসের পরিচয় দিয়েছেন রঘুনন্দন তা বিবেচনা করলে বাঙ্গালীর মনে গৌরব পূর্ণ সঙ্কার করে। দুর্গাপূজার সূত্র তিনি নন্দিকেশ্বর পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

এই পূজা উৎসবের সঙ্গে দক্ষিণাত্যের 'শাবরোং-সবকেও যুক্ত করেছেন। শবর নামে এক প্রাচীন জাতির উল্লেখ ভারতের পুরাণগুলিতে দেখা যায়, এমন কি মহাভারতের আদিপর্ব, ভীষ্ম পর্ব, শান্তি ও অশ্বশল পর্বেও—ভাগবত পুরাণেও রয়েছে। তাছাড়া আজও ওড়িশা এবং মধ্যভারতের বহুস্থানে এরা বাস করে। এদের উৎসবগুলির বিশেষত্ব প্রকাশ্য স্থানে পূজনীয় প্রতীককে কদর্যা ভাষায় গালিগালাজ করে, নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির অঙ্গভঙ্গীর ইঙ্গিতে উল্লাস প্রকাশ। কিন্তু তারা স্বাধীন ও দুর্বল।

যারা রথযাত্রায় পুরী গিয়েছেন তাঁরা অবশ্যই

জেনেছেন জগন্নাথ মাসী বাড়ি যাবার পথে 'শবর পণ্ডারা' কি কুংসিং ভাষায় প্রতিমার প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। সাঁওতাল অপেক্ষা শবর জাতি ভারতের লোকোৎসবে আরও প্রাচীন। তাঁদের লোকোৎসবের মধ্যে চ্যাণ্ডি, কান্তিপূজা এখনও বনে, প্রান্তরে এবং সন্ধ্যায় বা তার পরে রাত্রে অহুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের মতই তাদের গোষ্ঠী আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

তেমন এক শবরোৎসবে এই চণ্ডীপূজার সঙ্গে যুক্ত করেছেন রঘুনন্দন। এই পূজার প্রাচীন রীতি "স্ব-গৃহ জীর্ণস্থান, ইষ্টক রচিত স্থান ও দীপস্থিতি বর্জিত ভূমিতে হবে না, যদিও প্রাক্ রঘুনন্দন শূলপাণি একে আর একটু সংস্কার করেই বলেছেন; "ইষ্টক রচিত স্থানেও হবে, এবং মাটির বেদিতে প্রতিমাকে বসান চলবে"। রঘুনন্দন চণ্ডীপূজা বা দুর্গাপূজাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন সাম্প্রিক, রাজসিক ও তামসিক। এইভাবে স্তর বিভাস-টির সূত্র পেয়েছেন স্কন্দ ও ভবিষ্য পুরাণ থেকে।

১১ দশ শতকের রামানুজের জীবনচরিত স্কন্দপুরাণে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সেই হিসেবে ধরতে গেলে বিশাল পুরাণখানি দ্বাদশ শতকের মধ্যেও অনেক সংযোজিত। রঘুনন্দন চণ্ডীপূজাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে—বাংলার তৎকালীন সমাজের উচ্চবর্ণ এবং মধ্যমশ্রেণী আর নিম্ন-শ্রেণীকে এক করে একটি বর্লবান জাতি 'বাঙ্গালী' এমনি এক পরিকল্পনা নিয়ে সকলকাম হয়েছিলেন। এই পূজায় সকল শ্রেণীর সমান অধিকার—

ব্রাহ্মনৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈঃ রত্নৈশ্চ সেবকৈঃ।

এবং নানা স্নেহগণে পূজ্যতে সর্বদম্ভ্যভিঃ।।

এ পূজাটি যদি নিজে করতে না পারে কেউ তবে অন্তের দ্বারাও করাবে "স্বয়ং বা প্যত্নতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা"।

এ পূজার মধ্যে একটি অবশ্যকৃত্য "চণ্ডীপাঠ"। চণ্ডী গ্রন্থটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্দীপনা আনে রাজভীতি থেকে নিজেকে, পরিবর্গকে এবং দেশকে রক্ষা করার জন্তু সম্মিলিত অভিযান।

রাজ্যং ভীতেবিমোক্ষায় বৈরাস্তোচ্চাটনায় চ।
খোলাখুলি বলা যায় না এর বেশী। সুরধ রাজা ও

বৈশ্য সমাধি উভয়েই রাজ্যবিতাড়িত, অপমানিত, লাজ্বিত। এ অবস্থায় তাঁরা আরও প্রাচীনকালের ইতিকথায় গুনেছিলেন দেবতারাও একদিন স্বাধিকার বিচ্যুত হয়েছিলেন অসুরদের দ্বারা। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি দেবতারা একদিন সম্মিলিত হয়ে বিষ্ণু প্রমুখ শক্তিশালী দেবতাকে অগ্রণী করে দীর্ঘকাল অসুরদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন আপন রাজ্য আবার দখল করেছিলেন।

বাংলায় সর্বশ্রেণীকে এক করে দুর্গাপূজার প্রবর্তন এবং তার সঙ্গে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীরদ্বারা চণ্ডীপাঠের উদ্দেশ্যকে এক করে তৎকালীন সমাজে উপস্থিত সাংঘাতিক বিপদকে দূর করবার এমন আকারে ইঙ্গিতে

মর্মান্থ জ্ঞাপন করার ধৈর্য রঘুনন্দনের বাঙ্গালীজাতি গঠনের একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

কালের বিবর্তনে সেই শাক্ত-বিজ্ঞানটি পুরোহিত-তন্ত্রের সামন্তপ্রথার জীবিকা হয়ে গিয়েছে, শাক্ত-বিজ্ঞান শক্তিপূজায় মাত্র পর্যাবসিত। কৃষিকার্য মাত্র যেদিন বাঙ্গালীজাতির জীবনধারণের উপায় ছিল, আর ছিল অল্প স্বল্প বাণিজ্য ব্যবসায়, সেদিন ছিল বিধর্মী প্রভুজাতির দ্বারা উৎপীড়িত অনৈক্যে উৎক্ষিপ্ত বাঙ্গালী—আর আজ শিল্প ব্যবসায়ের তাগিদে এবং বহু পার্টির মতবাদ ব্যাধিতে উদভ্রান্ত, এবং একাশ্রু চিন্তায় গ্রস্ত বাঙ্গালী—দুই যুগেই তার প্রয়োজন শাক্তবিজ্ঞানের উৎস খোঁজার, কিন্তু শক্তিপূজার প্রগতি বিজ্ঞানে নয়।

সবিতা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

সবিতা তুমি হে নর দেবতা

তুমি চির সুন্দর,

অরূপের রূপে ধরনীর বুকে

তুমি চির ভাস্বর।

তোমাতেই বাজে ত্রজের মুরলী

বৃন্দাবনের কেকার কাকলী,

বিরহী বাধার আখি জলে নিতি

ভরে রয় তব অন্তর।

আধার নিশীতে অভিসারী যবে

বাজিছে নুপুর রিমি রিমি রবে,

উজানী যমুনা বেদনার গানে

তুমি শ্রীমতি চির মুখর।

ত্রিঙলীর শিঙ্গা বাণীতে তোমার

পাঞ্চজন্ম বাজে অনিবার,

মহানাদ তব অন্তরে জাগে

সাধনার তুমি নব জলধর।

সর্বজনীন দুর্গোৎসব

সন্তোষ ভট্টাচার্য

মাতৃ সাধনার

কেন্দ্রীভূত ভাবময় মূর্তী

দুর্গা।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র-পৃথিবী

মাতৃ অঙ্গে রূপদান করায়

সৌর জাগতিক জড় ও জীবের

পরম মিলন।

সর্বভূতে, চেতনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, নিদ্রা ক্ষুধা

শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষমা শান্তি, শ্রদ্ধা লজ্জা

লক্ষ্মী, বৃত্তি, ক্ষমা, স্মৃতি, তুষ্টি

তুমি—তুমিই এ মহাবিশ্বের

এক মহাজাতির জননী।

তুমি বন্দিজা।

সর্বকালের—সর্বজীবের

তুমি মঙ্গলময়ী

তাই মূর্তী গ্রহণ করেও

বিশ্বজনীন ॥

বঙ্গের আদি বারোয়ারী

শ্রীসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আজকাল বারোয়ারীতে পূজিতা দেবীগণের মধ্যে 'দুর্গারই' প্রাধান্য। একথা বলিবার কারণ এই যে, শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে যে, তাহেরপূর্বের রাজা কংসনারায়ণ (ইনি মহরট্টাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র এবং দিবাংকর ভট্টের পৌত্র, (খ্রী: ১৬ শ:) শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তক। তিনি নয়লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারদীয়া দুর্গাপূজা করেন এবং রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী এই পূজার পদ্ধতি রচনা করেন। প্রদ্বৈয় ঐতিহাসিক ড: শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৎকাল একটি প্রবন্ধে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে (খ্রী: ১৭২৮—৮২) শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“It may therefore be presumed that the present form of Durga Puja was probably not in vogue and certainly not a popular festival before the eighteenth century A. D. This agrees with the popular tradition recorded in 1829 in a Bengali periodical that it was Maharaja Krishna Chandra of Nadia, a contemporary of Nawab Serajuddoula, in the middle of the eighteenth century who for the first time performed this Durga Puja with pomp and grandeur and thereby popularised the festival in Bengal” (Amrita Bazar Patrika, Puja Annual 1960, p 13 : the Durga Puja and Festival in Bengali.

কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজা যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের এমন কি রাজা কংসনারায়ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল তাহার বিবিধ প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর (খ্রী: ৩ শ:) ১২ অধ্যায়ের ১২ স্তোকে শারদীয়া দুর্গাপূজার নির্দেশ আছে। শূলপাণি (খ্রী ১৪১৫ শ:) 'দুর্গোৎসব বিবেক', 'বাসন্তী বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামে তিনটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই সকল নিবন্ধে তিনি জীকন ও বালকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন জীকন ও বালক খ্রী ১১শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। কারণ দ্বিতীয়

ভবদেব ভট্ট (খ্রী ১১শ:) তাঁহার গ্রন্থে জীকন ও বালকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (স্বামী জগীদিশ্বরানন্দ রুড—উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা)। জীমুতবাহন (খ্রী: ১২শ:) তাঁহার 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' গ্রন্থে যম্ময়ী শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমা পূজার উল্লেখ করিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি (খ্রী ১৪১৫ শ:) 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' গ্রন্থে (খ্রী: ১৪৫০) যম্ময়ী শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমা পূজার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিথিলার বাচস্পতি মিত্র (খ্রী: ১৫১০ শ:) তাঁহার ক্রিয়া চিন্তামণি এবং 'বাসন্তী পূজা প্রকরণ' গ্রন্থে দুর্গার যম্ময়ী প্রতিমাপূজার পদ্ধতি লিখিয়াছেন। স্মার্ত রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য চুড়ামণির 'দুর্গোৎসব বিবেক' গ্রন্থে শারদীয়া দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখিত আছে। রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্বে' দুর্গোৎসব প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপূজা তত্ত্বে' শারদীয়া দুর্গাপূজার বিধি লিখিত আছে। রঘুনন্দনের পরবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণ 'দুর্গার্চন কৌমুদী' লেখেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামের চট্ট শোভাকর বংশীয় পণ্ডিত যাদবানন্দ ভট্টাচার্য (খ্রী: ১৬ শ:) যে শারদীয়া দুর্গাপূজা পদ্ধতি লেখেন, তদনুযায়ী গুপ্তিপাড়ার সিদ্ধান্তবাড়ীতে আজিও শারদীয়া দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৃহদ্রত্নপুরাণে (খ্রী: ১০শ:) রাবণ বধার্থ ও রামের জয় কামনায় ব্রহ্মাদি দেবগণ শরৎকালে দেবীর বোধন করিয়া দেবীর পূজা করেন। সুতরাং শারদীয়া দুর্গাপূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও রাজা কংসনারায়ণের পূর্ববর্তীকালের। সম্ভবত: রাজা কংসনারায়ণ এই পূজাকে জনপ্রিয় করেন।

কিন্তু বঙ্গের প্রথম বারোয়ারীতে পূজিতা দেবী দুর্গা নহেন—জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী তান্ত্রিকী দেবী। 'শক্তি সঙ্গম-তন্ত্র', 'মায়াতন্ত্র', 'যোগিনীতন্ত্র', 'উত্তর কামাখ্যা তন্ত্র', 'জানামৃতসার', 'আগমতত্ত্বসার', 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব', 'নিগমতত্ত্বসার' এবং 'জ্ঞানসারস্বত' নামক তন্ত্র গ্রন্থসমূহে জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান আছে। 'স্বস্তি সাগরে'ও জগদ্ধাত্রী পূজার বিধি পাওয়া যায়। 'মায়াতন্ত্রে' দেবীর সপ্তমী,

অষ্টমী ও নবমী—তিনপূজা একই শুক্লানবমী তিথিতে বিহিত আছে। ‘শক্তি সঙ্গম তন্ত্রে’ তিনপূজা তিন তিথিতে অথবা একই নবমী তিথিতে বিহিত। ‘নিগম কল্পসারে’ ও ‘জ্ঞানসারস্বতে’ তিন তিথিতে দেবীর তিন পূজা ও দশমীতে বিগর্জন বিহিত আছে।

বাংলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তক নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তৎপূর্বে এই পূজা বঙ্গ দেশে প্রচলিত ছিল না। অতীতে দক্ষিণ ভারতে পূজিতা এই দেবী কিতাবে বা কি কারণে বঙ্গের উপাত্ত দেবদেবীমণ্ডলীতে আপনার স্থান করিয়া লইলেন তাহা বলা কঠিন। তবে ‘ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত’ অনুসারে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন বিষয়ক কাহিনীটি নিম্নরূপ।

নবাব মীরকাসেম (খ্রীঃ ১৭৬০—৬৪) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে আফ্রিকের ছল করিয়া মুঙ্গের দুর্গস্থ কারাকক্ষ হইতে ভাগীরথীতীরে গিয়া নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করেন।

যখন তিনি ভাগীরথী দিয়া নৌকায় স্বদেশ কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাইতে ছিলেন, সেই সময় শারদীয়া মহানবমীর এক সন্ধ্যায় অগ্রদ্বীপের রুকনপুর ঘাটের নিকটে আসিয়া জ্ঞানিতে পারেন সেদিন মহানবমী। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবৎসর কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহে শারদীয়া দুর্গা পূজা করিতেন। এবারে সে পূজা হইল না ভাবিয়া মনোবেদনায় তিনি উপবাসী হইয়া রহিলেন। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক কিশোরী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—“মহারাজ, তুমি জল গ্রহণ কর। আমি যে মূর্তি তোমায় দেখাইতেছি, তুমি সেই মূর্তি নির্মাণ করিয়া পরবর্তী শুক্লানবমী তিথিতে বিহিত পূজা করিবে ও পূজাঞ্জলি দিবে।”—এই বলিয়া কিশোরী রাজাকে চতুভুজা, সিংহবাহিনী মূর্তি দেখাইলেন। রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহার পর স্বপ্নাদেশমত রাজা গঙ্গাজল গান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিলেন। কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়া তিনি পণ্ডিতদের আস্থান করিলেন ও তাঁহাদের নিকট স্বপ্ন দৃষ্ট মূর্তির বর্ণনা করিলেন, কিন্তু কেহই এই দেবীর নাম বলিতে পারিলেন না। শেষে দক্ষিণ ভারতীয় একজন

পণ্ডিত (অম্মমান হয়, ইনি ‘বিবাদার্ণব সেতু’ রচনায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অগ্রতম সহকারী, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সীতারাম ভট্ট) বলিলেন—ইনি দেবী জগদ্ধাত্রী, অতীতে দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও ইহার পূজা হইত। ইহার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি নির্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে পূজা করিলেন। ইহাই বঙ্গের প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা।

এই কাহিনী সত্য হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রবর্তন করেন, কারণ ‘ক্ষিতীশ বংশাবলী’ অনুসারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদি সত্যই রাজা রাজবল্লভ (রাজনগর) প্রভৃতির সহিত মুঙ্গের দুর্গে মীরকাসেম কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঘটয়াছিল বলিতে হইবে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট তারিখে মীরকাসেম গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরাজদের নিকট পরাজিত হন। ইহার পর তিনি উদুয়ানালা যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাজবল্লভ প্রভৃতিকে হত্যা করেন।

কিন্তু এই কাহিনীর ভিত্তিতে বঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্ভবকাল নির্ণয়ে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গের দুর্গ হইতে পলায়ন করিলে উহা আগস্ট মাসে ঘটয়াছিল। আগস্ট মাসে শারদীয়া মহানবমী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মুঙ্গের দুর্গে মীরকাসেমের কবল হইতে আফ্রিকের ছল করিয়া পলায়ন বড়ই সন্দেহের কথা (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বঙ্গালার ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল, ২য় সং, ১৩১৫ পৃঃ ৪২১, পাদটীকা ৩)। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার তাঁহার ‘জীবনীকোষ’ গ্রন্থে ‘চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার’, শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্রের (খ্রীঃ ১৮০২—৪১) নদীয়ারাজ্য শাসন কালে শান্তিপুর থানার ব্রহ্মশাসন গ্রামনিবাসী পণ্ডিত চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার জগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যান অনুযায়ী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করেন—কিন্তু এমতও গ্রহণীয় নহে। কারণ জগদ্ধাত্রী পূজা যে গিরীশচন্দ্রের পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে

প্রমাণ রহিয়াছে, ইহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্ব বাকী ফেলার জন্ত একাধিক বার কারারুদ্ধ হন। এক লক্ষ টাকা নজরানার জন্ত নবাব আলিবর্দী খাঁ (খ্রী: ১৭৪০—৫৬) তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাও (খ্রী: ১৭৫৬—৫৭) রাজস্ব বাকী ফেলার জন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন (বাল্লার ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল, ১৩১৫) — এই কারাবরোধ কৃষ্ণচন্দ্রের মুর্শিদাবাদস্থ নিজস্ব প্রাসাদে নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থান মাত্র। এই শেষবার রাজস্ব মিটাইয়া নবাবের আদেশে মুক্ত হইয়া অথবা নবাবের বিরুদ্ধে ঘনীভূত রাষ্ট্র বিপর্যয়ের সুযোগে পলায়ন করিয়া যখন মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গাবক্ষ দিয়া নবদ্বীপ আসিতেছিলেন, তখন স্বপ্নবিষয়ক ঘটনাটি ঘটয়া থাকিবে। কাহিনী লোক মুখে চলিতে চলিতে কিছু পরিবর্তিত হয়। এ কারণে কাহিনীর সিরাজউদ্দৌল্লা মীরকাসেম এবং মুর্শিদাবাদের কারাগার মুন্সের দুর্গের কারাগারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। সেজন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে সম্ভবতঃ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করেন।

জগদ্ধাত্রী পূজাকে উপলক্ষ করিয়া বঙ্গের প্রথম বারোয়ারী ‘বিক্ষ্যবাসিনী’ পূজা প্রবর্তিত হয়। বারোয়ারী কথার অর্থ বারো ইয়ার (বা বন্ধু) বিষয়ক। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্মণ ইহার প্রথম প্রবর্তন করেন। গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে ১২ জন ব্রাহ্মণকে নির্বাচিত করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ধনী গৃহস্থদের নিকট হইতে টাঁদা সংগ্রহ করেন। ৭০০ টাকা টাঁদা সংগৃহীত হইলে তাঁহারা জগদ্ধাত্রী মূর্তি নির্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে পূজা করেন। ইহাই বঙ্গের প্রথম বারোয়ারী পূজা। এ বিষয়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ফ্রেণ্ড্ অফ ইণ্ডিয়া’য় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

বারোয়ারী পূজায় উদ্যোগী ব্রাহ্মণগণের অথবা ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর নামে সঙ্কল্প হয়। কিন্তু এরূপ সঙ্কল্পের বিধি শাস্ত্রে নাই। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী জগদ্ধাত্রী পূজায় শুক্লাদশমীতে দেবীর বিসর্জন হয়, কিন্তু বারোয়ারী পূজায় অনেক সময় দশমীর পরও কয়েকদিন প্রতিমা থাকে। প্রতিদিন পূজা হয়, শেষে বিসর্জন হয়।

‘ফ্রেণ্ড্ অফ ইণ্ডিয়া’র মতে বঙ্গের আদি বারোয়ারীর উদ্ভব (১৮২০—৩০) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঘটয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রের ষষ্ঠ সংখ্যায় রেভাঃ জে. লঙের রচনা বলিয়া কথিত, “On the banks of the Bhagirathi” প্রবন্ধেও এই মত গ্রহীত হইয়াছে। কিন্তু গুপ্তিপাড়া বিক্ষ্যবাসিনীতলার গ্রামবৃদ্ধ উদ্যানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জীবদ্দশায় বলিয়াছিলেন তাঁহার গৃহে বিক্ষ্যবাসিনী বারোয়ারীর দ্বিতীয় বর্ষের একখানি পূজার ফর্দ দীর্ঘ কাল সংরক্ষিত ছিল। ঐ ফর্দ ১৯৬৭ সনের (খৃ: ১৭৬০)। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ গ্রন্থে (২য় সং, পৃ: ৪৭৭) এই ফর্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায়—এই ফর্দখানি গুপ্তিপাড়ার সেনহাটি-সেনবংশীয় সতীশচন্দ্র সেন, তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছিলেন। তাঁহার পর উহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রামবৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় অবিস্মারের হেতু নাই। এই ফর্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত করিতে হয়—বঙ্গের প্রথম বারোয়ারী গুপ্তিপাড়ার বিক্ষ্যবাসিনীর উদ্ভবকাল ১৯৬৬ সন অর্থাৎ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ। এই বারোয়ারী আজিও প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার নিয়মে কার্তিক মাসের শুক্লানবমী তিথিতে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তবে গুপ্তিপাড়ার এই বারোয়ারীতে পূজিতা দেবীর নাম বিক্ষ্যবাসিনী কেন হইল বলা কঠিন। দেবীমূর্তি চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমূর্তি। বিক্ষ্যবাসিনী অষ্টভুজা দেবী। উভয়ের ভৈরব ভিন্ন। উভয়ের ধ্যানও ভিন্ন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে—বিক্ষ্যবাসিনী তন্ত্রমতে পরাদেবী নহেন, এই বিক্ষ্যাস্থা দেবী দুর্গাদেবীর অংশমাত্র—দুর্বাসা ঋষির বিবাহিতা পত্নী। বিক্ষ্যাস্থা দেবী

যেমন ভগবতী দুর্গার অংশ, দুর্বারাও তেমন শিবের অংশ (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'ভারত সংস্কৃতির উৎস-ধারা' পৃ: ৪৭১), তবে অবয়ব ও অবয়বীর অভেদের দ্বারা অবতার ও অবতারীর অভেদ স্বীকার করিয়া দুর্গাকে 'বিন্ধ্যবাসিনী' নামে অভিহিত করা হয়। জগদ্ধাত্রীরও বিন্ধ্যবাসিনীর ধ্যানমগ্ন মিলাইলে এই দুই দেবীর পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র রিপোর্টে গুপ্তিপাড়া বারোয়ারীতে পূজিতা দেবীর নাম স্পষ্টভাবে জগদ্ধাত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের আমল হইতে পুরুষানুক্রমে পূজিতা দেবীও জগদ্ধাত্রী—বিন্ধ্যবাসিনী নহেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়ার সেনবংশীয় সম্রাট পুরুষরাজ বিন্ধ্যবাসিনী বারোয়ারী পূজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় ও শান্তিপুরে বারোয়ারী পূজা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় এই প্রতিযোগিতার কৌতুককর চিত্র আঁকিয়াছেন—

“গুপ্তি পাড়া, কাঁচরাপাড়া, শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি কলকাতার নিকটবর্তী পল্লী গ্রামেক'বার বড় ধুম করে বারোয়ারী পূজা হয়েছিল। এতে টকরা টকরিও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুর ওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোয়ারী পূজা করেন, সাত বৎসর ধরে তার উজ্জ্বল হয়। প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষে বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কস্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়া ওয়ালারা 'মা'র অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষ্যে গণেশের গলায় কাছা বেঁধে এক বারোয়ারী পূজা করেন। তাতে বিস্তর স্ত্রীকা ব্যয় হয়।”

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে গুপ্তিপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী বারোয়ারী পূজায় বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় ও রুচিহীনতায় কলুষিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের (বাংলা ৩ অগ্রহায়ণ ১২৭২) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে এ বিষয়ে 'ভ্রমণকারী' এই ছদ্মনামে কোন ব্যক্তির (সম্ভবতঃ গুপ্তিপাড়ার কবি শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। আজিকার দিনের বারোয়ারী পূজাহুষ্ঠানের দর্পণস্বরূপ হইবে বিবেচনায় পত্রখানির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“আমি ইতিমধ্যে মফঃস্বলস্থ বহু দূরস্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে গুপ্তিপাড়ায় গমন করিয়াছিলাম। তথায় বারোয়ারী পূজোপলক্ষে দলাদলির বৈরূপ আড়ম্বর দেখিলাম যদিও তাহা সভ্য সমীপে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয় তথাচ কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; তথায় কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি দীন সকলেই পূজামোদে মত্ত হইয়া বিবধ নতুন অনুষ্ঠান করিয়াছিল শুনিলাম। বারোয়ারীর পাণ্ডারা...বংশ-চ্ছেদনোপলক্ষে রাজমার্গে অশ্লীল গীত গাহিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইয়াছিল। এবং চাঁদা আদায় সময়ে অনেক দুঃখী লোককে নিপীড়ন করিয়াছিল এমন কি যাহারা চাঁদা দানে অসমর্থ তাহাদিগকেও বলপূর্বক বারোয়ারীর অত্যাচার প্রমদাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। কি দীন কি ধনী হিন্দু কি মুসলমান, চাঁদা না দিয়া কেহই প্রায় তাহাদের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। এই উশলক্ষে উক্ত গ্রামবাসী ধনী কেহ একশত কেহ দুইশত টাকা চাঁদা দিয়াছিল কেহ বা সমস্ত ভার স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিতে কাতর হন নাই। ধন্য বারোয়ারী পূজার মহিমা।...

—ভ্রমণকারী

গান

তঃ সুদর্শন চক্রবর্তী

ক্লান্ত এ দেহ উদ্ভাস্ত এমন
আধারে চলিতে হবে আর কতক্ষণ
তোমার আমার লাগি সারারাত আছি জাগি
এ আশায় শেষ কোথা সে কখন!

বারে বারে চ'লে যায় লগ্ন
ওঠে নামে বুঝুদ স্বপ্ন
এতটুকু আলো নেই আশা নেই আভা নেই
হতাশায় ডুবে যায় এ জীবন।

কাছের মানুষ শরৎচন্দ্র

বিশ্বনাথ চট্টপাধ্যায়

আমরা আমাদের প্রিয় লেখকদের চিহ্নিত করে নিতে ভালোবাসি—‘মহাকবি’ মধুসূদন, ‘মাহিত্যসম্রাট’ বঙ্কিমচন্দ্র, ‘বিশ্বকবি’ রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি ভাবে। শরৎচন্দ্রকে বলা হয় ‘অপরাজেয়’ কথাশিল্পী। তাঁর বিশেষণ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার পরিমাপ করা যেতে পারে। জনপ্রিয়তার উত্তম শিখরে তাঁর স্থান। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একাধিক কারণে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় লেখক। চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনায় তাঁর নৈপুণ্য অসামান্য। পাতার পর পাতা তিনি পাঠককে আবিষ্ট করে রাখেন তাঁর গল্প বলার যাত্রা দিয়ে। গল্পের মধ্যে অনেক সময় ঠাস বুনোনের অভাব, এমন-কি গৌজামিলও রয়েছে। তবু পাঠকের তৌতুহল সদা জাগ্রত। এ দিক থেকে শরৎচন্দ্রের আঙ্গিকের সঙ্গে ডিকেন্স-এর আঙ্গিকের সাদৃশ্য স্পষ্ট। নিখুঁত কাহিনী-বিজ্ঞাসের উপর এই দু-জনের কেউ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত যেন পাঠকের আগ্রহ পুরোপুরি বজায় থাকে। সাধারণ পাঠক উপজ্ঞাসের ব্যাকরণ-প্রকরণ নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয়; গল্পের চমকে সে নিজের মনকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভোলাতে চায়; গল্পের জগতে ক্ষণকালের জন্ত নিজেকে হারাতে চায় (কোলরিজ যাকে বলেছেন ‘willing suspension of disbelief’, খানিকটা তাই)। “শ্রীকান্ত” উপজ্ঞাসের কথা ধরা যেতে পারে। একটী মূল, ঐক্যবদ্ধ কাহিনীর ধারা এখানে কোথায়? বিচিত্র সব চরিত্র, বিচিত্র সব ঘটনা—উপধারার উচ্ছ্বাসে মূল কাহিনীর উপাদান প্রাবৃত। সব কিছু অবশ্য শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে দেখা হওয়াতে একটা ঐক্য এসেছে, যে স্বল্পতম ঐক্য না থাকলে কোনো রচনাই শিল্পকর্মের মর্যাদা পায় না। “ডেভিড্‌ কপারফীল্ড” উপজ্ঞাসেও কি খানিকটা সেই রকমই ঘটছে না? ডেভিড্‌-এর চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা হওয়াতে সেগুলিতে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য এসেছে।

জনপ্রিয়তার অত্যন্ত কারণগুলি স্থানান্তরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয় সব কারণগুলির মধ্যে যেটা মুখ্য সেটা হচ্ছে, শরৎচন্দ্র—লেখক শরৎচন্দ্র—আমাদের কাছের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও আমাদের খুব কাছাকাছি আসতে পারেন নি, একটা দূরত্ব থেকে গেছে। কথাশিল্পীরূপে আমরা তাঁকে যতটা ভালোবাসি তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। শরৎচন্দ্রকে আমরা যতটা শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আনুষ্ঠানিক জীবনে অপরিহার্য, শরৎচন্দ্র না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অচল। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবকে আদর্শে উন্নীত করেছেন, শরৎচন্দ্র আদর্শকে বস্তুরূপে দিয়েছেন। তার অর্থ এই নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল এবং শরৎচন্দ্র বিপ্লবী। সামাজিক দিক থেকে এরা দু-জনেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। যেহেতু শরৎচন্দ্র বঙ্কিমোত্তর যুগের লেখক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বেশি আধুনিক হওয়া স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র নিজে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে নীতিবাদী আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছেন। রোহিনীর যত্নে ঘটানোর কি প্রয়োজন ছিল, এ প্রশ্ন তুলেছেন। সাবিন্দ্রীর যত্নে “চরিত্রহীন” উপজ্ঞাসে ঘটানো হয় নি, কিন্তু তাকে বঞ্চিত করার কি অধিকার লেখকের ছিল, এ প্রশ্ন তো শরৎচন্দ্রকেও করা যায়। যাক সে কথা।

শরৎচন্দ্র আমাদের অনেক বেশি অন্তরঙ্গ তাই তিনি তাঁর বহু রচনায় বাঙালী-জীবনের মনোরম ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন। “বিন্দুর ছেলে”, “রামের স্মৃতি”, “নিষ্কৃতি”—গৃহস্থ-জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে কত চিত্তহারী কাহিনী লেখা যেতে পারে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। পাঠককে চমকে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রও এ ধরনের রচনা লেখার চেষ্টা যে করেন নি, এমন নয়। রাধারাগীর দারিদ্র্যকে তিনি বাস্তবভঙ্গীতে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত “রোমান্স” কেঁচোকাতে পারেন নি। রাধারাগী সিগুরেলা-কাহিনীর নুতন সংস্করণে

পরিণত হয়েছে—“যুঁটেবুড়োনি হয়েছে রাধারানী”। এই ধরনের রোমান্টিক প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রে আছে তাই তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেন; শরৎচন্দ্রে নেই, তাই তিনি অতীত ইতিহাসের পাতায় সাহিত্যের সামগ্রী সন্ধান না করে ছুয়ার থেকে অদূরের যে শিশিরবিন্দু সেটিকে নিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি ওয়ান্টার স্কটের সঙ্গে তুলনা করতে হয়, তা হলে শরৎচন্দ্রকে তুলনা করতে হবে জেনু অস্টিনের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে অনেক সময়ই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তিনিও জেনু-এর মতো, কোনো চিঠিতে লিখতে পারতেন—

‘The little bit (two inches wide) of ivory on which I work with so fine a brush, as produces little effect after much labour’. তাঁর অনেক কাহিনীকেই ‘গার্হস্থ্য’ কাহিনী বলা যেতে পারে। সুদূর আকাশে ঐক্য। ইন্দ্রধনুর ছটায় শরৎচন্দ্রের রচনা রমণীয় হয়ে ওঠে নি, সেখানে রয়েছে পার্থিব প্রজাপতিটির পাখার বর্ণালী।

শরৎচন্দ্র যে-সব নরনারীকে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিশালায় গড়েছেন তারা অনেকেই আমাদের চেনামহলের লোক। তাদের মধ্যে আমরা নিজেদের অনেক সময় প্রতিবিম্বিত দেখি। তাই তাদের সঙ্গে আমরা একটা একাত্মতা বোধ করি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের যে জগৎ সেটা অপরিচিত এবং অনির্ধিগম্য নয়; বরং সেটা আমাদের সংসারের আর এক রূপ। এ দিক থেকে শরৎচন্দ্রের রচনায় একটা গণতান্ত্রিক সুর আছে। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আগে আর কোনো বড়ো কথাশিল্পীর রচনায় আমরা এ সুর শুনি নি। শরৎচন্দ্রই তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী পাঠককে এ সুর প্রথম শুনিয়েছেন। শুধু সাধারণ লোকই যে তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তা নয়; যারা বঞ্চিত ও নিপীড়িত সমাজের অবহেলিত নীচের তলার সেই মানুষদের নিয়ে তিনি লিখেছেন। গফুর ও আমিনার যে মর্মস্পর্ষ কাহিনী তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে অতিনাটকীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতার

কোনো অভাব নেই। আর এদের জন্ত কি অপরিণীত তাঁর দরদ। আর সে দরদ মানবেতর প্রাণী মহেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। মানুষের জন্ত এই সীমাহীন দরদও শরৎচন্দ্র প্রথম বাঙলা উপন্যাসে নিয়ে এলেন। ডিকেন্স-এর কথা আমাদের আর একবার মনে পড়বে, এ দিক থেকেও তিনি ডিকেন্স-এর সঙ্গে তুলনীয়। “অভাগীর স্বর্ণ” শরৎচন্দ্রের বিশেষ একটি কাহিনীর নাম; এখানেও তাঁর সমবেদনা উজ্জ্বলিত। কিন্তু অনেক অভাগা এবং অভাগীর জীবনই তিনি বিভিন্ন কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছেন; অনেক হতভাগ্য, বিশেষত হতভাগিনী, তাঁর কল্পনা পেয়ে ধস্ত হয়েছে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন, মানুষের দুঃখ-দর্দশার মূলে মানুষ, (ওয়র্ডসওয়ার্থ যে বোধ থেকে বিলাপ করেছেন, ‘What man has made of man’)! এবং এই হৃদশা দূর করার জন্ত সমাজ-সংস্কারের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন। মানুষ যখন তার মনুষ্যত্ব হারায়, তখন সে পশুর সমান। তাই মানুষের মৃত্যুর চেয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু শরৎচন্দ্রের কাছে বেশি পীড়াদায়ক।

শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেক ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সেগুলির কিছু প্রয়োজনীয়তাও বা আছে। কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যদি আন্তরিক হয় তা হলে আমরা যেন সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে আত্ম সংস্কারেও ব্রতী হই। মানুষের অন্তর অনন্ত, সে অনন্ত অন্তর থেকে আমরা যেন মণিমুক্তা আহরণ করতে পারি, জালজঞ্জাল নয়। আমাদের মধ্যে যেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় এবং সে মনুষ্যত্বকে যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। প্রতি পদে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু আর যেন আমাদের ভাবীকালকে বিড়ম্বিত না করে। তবেই আমরা শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরসাধক হতে পারব। তিনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন, সে স্বপ্ন যেন আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। স্বপ্নই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। যে জাতি স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায় তাদের জন্ত শুধু ‘মহতী বিনষ্টি’ অপেক্ষা করে।

দুর্গাপূজার বিগতকাল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

“নমো দেবৈব্য মহাদেবৈ্য শিবায়ৈ

সততং নমঃ।

নমঃ প্রকৃত্যৈ তজ্জায়ৈ নিয়তঃ

প্রণতঃ সন তাম ॥” (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

বাংলাদেশে দেবীর দশভূজা মূর্তির প্রচলন বেশী। দুর্গার দ্বিভূজা, চতুভূজা, অষ্টভূজা, দশভূজা দ্বাদশভূজা এবং অষ্টাদশভূজা মূর্তির কথা পুরাণে আছে।

প্রথমে খড় তার পর খড়মাটি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি তৈরী করা হয়। এই রকমভাবে মূর্তি তৈরী করাই বিধিসম্মত। খড় না দিয়ে যদি শুধু মাটির মূর্তি তৈরী হয়, তাহলে সেই মূর্তি গৃহীর পূজার অযোগ্য। গৃহস্থের পক্ষে অনধিক তিন হাত প্রতিমা পূজার বিধান।

দুর্গাপ্রতিমার তাৎপর্য এই যে, যিনি মহাশক্তি তিনিই বিশ্বব্যাপিনী—দশদিকে প্রসারিত দশটি হাত বিশ্বব্যাপকতার পরিচয় বহন করে। জগতের যা কিছু অবিদ্যা, যা কিছু অশুভ তারই “প্রতীক” অস্তর। এই অস্তর মহাশক্তির পায়ের নীচে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি হবে মহাশক্তির মহাপ্রভাব জানাচ্ছে। এই পৃথিবীতে অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল—অশিবের মধ্যে শিবও আছে, সম্পূর্ণভাবে অশিব বলে কিছু নেই। মহাশক্তির বাহন হচ্ছে সিংহ, এই সিংহ বলের প্রতীক। মানুষের জীবনে সমস্ত ক্ষেত্রেই অশুভের উপর জয়লাভ করতে গেলে দেহের ও মনের বলের দরকার। সেই কারণে এই সিংহ মহাশক্তির পায়ের তলায় আশ্রয় পেয়ে অস্তরের উপর তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে। বিদ্যা, সম্পদ, সৌন্দর্য ও সিদ্ধি এই সমস্তই শক্তি না থাকলে অর্জন করা যায় না। এই জন্তই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, সৌন্দর্যের প্রতীক কার্তিক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ মহাশক্তির একই পরিবারের। যেখানে প্রকৃত শক্তি আছে সেখানে বিদ্যা, সম্পদ, সৌন্দর্য এবং সিদ্ধি থাকবেই। মানুষকে মহাকাল গ্রাস করে। আমাদের মা কালাতীত ভবিষ্যৎ মানুষের দুর্গতি নাশ করবার জন্ত।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার আয়োজন

করা হয় বছরে দুবার,—একবার শরৎকালের শুরুপক্ষে আর একবার বসন্তকালে চৈত্রমাসের শুরুপক্ষে। চৈত্রমাসের পূজাকে বাসন্তীপূজা বলা হয়,—আশ্বিন বা কার্তিক মাসের পূজাকে দুর্গোৎসব বলা হয়। কে দুর্গাপূজা বাংলাদেশে প্রথম প্রচলন করেন? কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে রাজা গণেশ, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। এরপর নদীয়ার রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গাপূজা করেন। নবাবী আমলে বড় জমিদারগণ তাঁদের গৃহে দুর্গাপূজা করতেন। এ ছাড়া ধনবান ব্যক্তিগণ ঘটে বা পটে দুর্গাপূজা করতেন। ইংরেজ শাসন কালে হবার পর বাংলাদেশের ধনাঢ্য এবং ছোটো জমিদারগণ সমাজে গণ্যমান্য হবার জন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে ব্যাপকভাবে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। এদের দেখে গ্রামে গ্রামে দুর্গাপূজা বিস্তৃতি লাভ করে। দেশের ইংরেজ শাসকবর্গ এতে বিশেষ আনন্দ পেতেন।

ইংরেজ রাজত্ব কালে দুর্গাপূজার কি রকম ঘটনা হতো তা শ্রদ্ধেয় শ্রীস্বধীরকুমার মিত্র মহাশয়ের লেখা ‘সেকালের ইতিহাস’ পড়লে বিশদভাবে জানা যায়।

সহরের বাবুগণ পূজাকে কেন্দ্র করে এই উপলক্ষে সাহেবদের নানাভাবে তোয়াজ করতেন। নিমন্ত্রণ করে নানাবিধ মূল্যবান উপহার দিতেন। তদান্তনীন ইংরাজদের মধ্যে বিধান ও লেখকগণ মাতৃপূজার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন। স্তার উইলিয়াম জ্যোস দেবী দুর্গা সম্বন্ধে লিখেছেন :

“The mountain born Goddess Pervutte, she has many properties of the Olympian Juna her majestic departments, high spirit and general attributes are the same”

ইংরেজ লেখক ছাড়া তৎকালীন দেশীয় সংবাদপত্র গুলিতে দুর্গাপূজার বিবরণ পাওয়া যায়—যেমন ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২৫ শে আশ্বিনের ‘বঙ্গদূত’ লিখেছে “শারদীয় মহোৎসব। এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয়

মহোৎসব ত্রিবিধ লোকের আশ্রয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয়। সকলে স্ব স্ব মতে ও বিস্তারিতারে নানাপোচারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল পূজায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হত। এই হল সহরে বাবুদের পূজা। এপূজায় ভক্তি ছিল না, ছিল জমিদার ও ধনীদেব মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাতৃপূজায় আত্মনিমগ্ন হওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল সামাজ্যে যেন তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। তাই পূজার নামে এদের যে ব্যয়টা হত, সেটা হচ্ছে অনাচারের ফল, যে সমস্ত পরিবার এরকম ব্যয় করত সে সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।

সে সময়ের সাধারণ লোক মাতৃপূজার জন্ত কি ভাবে পূজার দ্রব্য কেনা কাটা করতেন, ১২৫৬ সনের একটি খাতায় পূজার সময়ের যে হিসেব লেখা আছে তা নিয়ে উদ্ধৃত হল। এই ফন্দের উপকরণ থেকেই অনুমান করা যাবে সাত্ত্বিকভাবে নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে পূজা তারা করতেন।

(ক) ফলমূলাদি :-

৯৭ টা বুনা নারিকেল	১
২০টা ডাব নারিকেল	১০
১৪টা বাতাবি লেবু	৩/১০
৪টা আনারস	১০
৭টা চালকুমড়া	১/১৫
৪টা (প্রকাণ্ড) মানকুচ	৬০
৩০ গাছা অঁক	১/০
ছয় পণ কাঁঠালি কলা	১২/১০
দুই পণ মর্জমান কলা	১২/১০
৮সের পটোল	১০
১০সের পানিফল	১০
(খ) বেনে মশলা :	
সুপারি ১/২ সের	১১০
ছোট এলাইচ ১০ ছটাক	১১০
বড় এলাইচ ১০ পোয়া	৬১০
ধনের চাউল ১০ সের	১১০

দারুচিনি ১০ ছটাক	১০
খদির ১০ সের	৬০
লবঙ্গ ১০ আধপোয়া	১১০
কপূর ১০ ছটাক	১১৫
জিরে ১০ পোয়া	১০
মরিচ ১০ পোয়া	১০
সার চন্দন ১০ পোয়া	১০
রক্ত চন্দন ১১০ সের	১৫
(গ) খাতদ্রব্য :-	
চিনি ১৪সের	৬০
ময়দা ১১০ মণ	১১০/০
গব্যঘৃত ১৭১০ সের	৩
সর্বপ তৈল ১৪ সের	২
দুধ ১৭ সের	১
বালাম চাউল ১০ মন	১
পূজার জন্ত ঘৃত ১৫১০ সের	২
অন্ত বাবদে ঐ ৩১১০ সের	১১১০
লবণ ৮১০ সের	৬০
গুড় ১৪ সের	১১০
মধু ২১১০ সের	১১৫
মিহরি ৩১১০	১
(ঘ) মিষ্টান্নাদি :	
মিঠাই ৭১০ সের	১
খাসা দধি ১১০ মণ	৬০/০
ওলা ১৩ সের	১
(ঙ) শস্যাদি :	
আতপ তণ্ডুল প্রস্তুতের জন্ত ৮ আড়ি ধাত	৪
খই প্রস্তুতের জন্ত ১ আড়ি ধাত	১১০
চিঁড়া প্রস্তুতের ১ আড়ি ধাত	১/০
ছোলা ১৫ সের	৬১০
কাল কলাই ১মণ	১১০
মুগ কলাই ১মণ	১১০
অড়হর কলাই ১১০ মণ	৬১০
খেসারি কলাই ১০	১১০

ছোলার দাইল ১৫	১৫	১ জোড়া বিনামা	১৮
সাদা বুট ৭৥	১/০	" "	৮০
বরবটি/২৥ সের	১/৫	" "	১০/০
(চ) কুমার সজ্জা :		" "	১০/০
কলিকা ২৫ টা	১০	(ঞ) জ্বালানী :	
প্রদীপ ২৫ টা	১০	রাত্রের রোশনাই বাবদ	
বড় খুলি ১২ খানা	৮/১০	নারিকেল তৈল ৬৥০ সের	২
খুরি ২০০	৮/০	মোমবাতি ১৥০ সের	১১/০
কলসী ৫টা	১/৫	১টা আমগাছ মায় কাটাই খরচা	১ ৮/০
তছরী ১২ টা	৮/০	(ট) যাতায়াত :	
তিজেল হাঁড়ি ১৬টা	১/৫	কলিকাতা হইতে দণ্ডীর হাট নৌকা ভাড়া	
মালসা ২৫টা	১৫	(২৥০ দিনের পথ)	১৮/৫
সরা ৪০ খানা	১৫	দণ্ডীর হাট হইতে কাশীধাম নৌকা ভাড়া	৬
টাটি ১৫০ খানা	১/৫	চাকরের বেতন	১০
(ছ) ধামা ৪টা	১/০	একদল যাত্রা মোজা ফুরণ	১৯
চেঙ্গারী (গুড়া) ২ খানা	৮/১০	(ঠ) প্রাতে জ্বাতি ভোজন	
দড়ি ৫ সের	১৮/০	(১৫০ জনের বাবদ :	
(জ) স্বর্ণ-রৌপ্যাদি :		মৎস্ত	৫
সোনা ১ ভরি	১৪	উৎকৃষ্ট বাকতুলসী চাউল একমণ	১৮/০
ঐ মজুরি	৮০ আনা	তরিতরকারি	১১/১০
৩খানা সভারিণ ১/০ ওজন হিঃ দর ১০	হইতে ১০	চুখ ১৬ সের (১৬)	৮১০
	হিঃ ৩০	দধি ১/ মণ	২৥০
(ঝ) বস্ত্রাদি :		এই ফর্দটি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এবং	
দেশী তাঁতের ১০ হাত প্রমাণ শাড়ী ১ খানা	১/০	শ্রীমতেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের সংগৃহীত খাতা থেকে	
৮ হাত ঐ ১ জোড়া	৮০	পাওয়া গিয়েছে। খাতাখানির কাগজ, মলাট,	
১০ হাত শাদা ধুতি ১ জোড়া	১৮০	অক্ষপাত সকলেরই দেশী উপকরণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।	
ঐ উড়ানী ১ খানা	৮/০	শতবৎসর পরেও কাগজ বেশ মজবুত এবং কালির	
৩ বধুর ১০ হাত শাড়ী		দাগ এমন উজ্জল ছিল যে, তা ভাবতে গেলে বিস্মিত	
৩ খানা ৮/১০ হিঃ	১৮০/১০	হতে হয়। এই কালি দেশী দ্রব্য (গ্রামবাংলায়)	
সাদা ডুনি ১ খানা	১/০	উপকরণে তৈরী হয়েছে।	

রবীন্দ্র স্মরণে

শ্যামাদাস দে

সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছেন কখনও? সে এক আশ্চর্য বিষয়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দিকদিগন্ত সোনাররা আলোর বতায় ভেসে গেল। প্রশান্ত সমুদ্র, অকস্মাৎ চকিত চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে অনন্ত আকাশ আর অস্তুহীন সমুদ্রের বুকে একটা নবচেতনার সঞ্চার হল। সচকিত হয়ে উঠল সারা বিশ্ব। সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তখন সেই মহিমময় এক-এর দিকে।

এমনই একটা সূর্যোদয় দেখেছিল আমেরিকাবাসী, তথা বিশ্ববাসী, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। যেদিন এই বাংলারই এক প্রচণ্ড দীপ্তিমান সূর্য—স্বামী বিবেকানন্দ—অধ্যাত্মভারতের প্রতিনিধিরূপে তাঁর প্রথম ভাষণ দান করলেন চিকাগো ধর্মমহাসভায়।

তার ঠিক বিশবছর পরে আর একবার সেই মহিমময় সূর্যোদয় দেখল সারা ইউরোপ, তথা সারা বিশ্ব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। যে দিন এই বাংলারই আর এক বরেণ্য সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাভ করলেন বিশ্বকবির বরমাল্য, লাভ করলেন নোবেল পুরস্কার।

নোবেল কমিটির ঘোষণা শুনে সেদিন নিশ্চয় চমকে উঠেছিল পশ্চিমী সাহিত্যের, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের অনেক রথী মহারথী। তাদের সেদিনের মনোভাব কল্পনা করা কঠিন নয়। ওমা, বাংলা ভাষাতো একটা নেটিভেভ ভাষা! সে ভাষায় সাহিত্য-টাহিত্যও আছে নাকি? সেই ভাষারই এক কবি নাকি তার গোটা কয়েক কবিতা ও গানের ইংরাজী অনুবাদ করে 'গীতাঞ্জলী' নামে একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। অনুবাদও নাকি করেছিলেন কবি স্বয়ং। একজন নেটিভের ইংরাজী আর কতো ভাল হতে পারে? অথচ বাবা বাবা সব ইংরাজী সাহিত্যের দিকপালদের ডিগ্রিয়ে নোবেল কমিটি এই পুরস্কার দিল একজন নেটিভকে তার একটা স্বয়ংকৃত অনুবাদ গ্রন্থের জন্তে? এ কী বিষয়! অনুবাদে যে মূলের রস অনেকখানি ক্ষুন্ন হয় সে তো সর্বজনবিদিত সত্য। সেই ক্ষীণরস অনুবাদগ্রন্থই যদি ওদের এতখানি অভিভূত করে থাকে তাহলে মূল

ভাষার রস না জানি আরও কত। কী সেই মূল ভাষা? বাংলা ভাষা। আ মরি বাংলা ভাষা।

স্বামিজী গেছিলেন সনাতন ভারতবর্ষকে বিশ্বের অধ্যাত্মগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে! রবীন্দ্রনাথ গেলেন নবীন ভারতবর্ষকে তথা ভারতের সমৃদ্ধতম ভাষা বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বামীজির ছিল আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়, রবীন্দ্রনাথ করলেন সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়।

সেই থেকে সারাবিশ্বে বাংলাভাষা চর্চার যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে এদেশে যেমন সরকারী প্রচেষ্টায় সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী বহুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, রাশিয়াও তেমনি রাষ্ট্রীয় সহ-যোগিতায় সমগ্র রবীন্দ্ররচনা একাধিক রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। পৃথিবীর অদ্ব্যন তিরিশটি সমৃদ্ধ ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলী অনূদিত হয়েছে। এ যে বাংলা ভাষার পক্ষে কতো গৌরবের কথা, ভাবতে অবাক লাগে। বাংলা ভাষা তথা বাংলা সাহিত্যকে এই গৌরবমুকুট পরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

সেই ১৯১৩-র ভারতবর্ষ আর আজকের ভারতবর্ষ এক নয়। সেদিন ইংরেজদের কাছে আমরা ছিলাম একটা পরাধীন নেটিভ জাত, আর ওরা ছিল আমাদের রাজার জাত। সেই পরাধীন জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যখন স্বীকৃতি দিল রাজার জাত, তখন তার মর্যাদা যে বিশ্বের দরবারে কতখানি উচু হয়ে গেল, আজকের স্বাধীন ভারতের মানুষের পক্ষে তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

‘মরিতে চাহিনা আমি স্তব্ধ ভুবনে

মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’

এ কেবল রবীন্দ্রনাথের একটা কাব্য কথা নয়, এ তাঁর জীবন সাধনা। মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার সাধনাই তিনি করে গেছেন সারাটা জীবন নিরলস নিষ্ঠায়। একটি জীবনে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো সাহিত্যিকের একক

কলমে এত বিশাল সৃষ্টির নজির নেই। কেবল কোয়ালিটির দিক থেকে নয়, কোয়ালিটির দিক থেকেও।

অনেকের ধারণা নোবেল পুরস্কার পাবার আগে রবীন্দ্রনাথ এদেশে তেমন স্বীকৃতি পাননি। ধারণাটা যে সত্য নয় তার অন্তত একটি উজ্জ্বল প্রমাণ আমরা জানি! রবীন্দ্রনাথের বয়স সবে বিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ সবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য কাননের এক কোণে একটি ভীকুশিউলি ফুলের সসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ যেন। আর সে বাগানের বনস্পতি তখন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। সেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্তের গৃহে একটি বিবাহ অস্থানে নিমন্ত্রিত। নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথও। রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুকে সম্বর্ধনা জানালেন একটি মহার্ঘ পুষ্পমাল্য তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে। সাহিত্য সম্রাট সে মালা খুলে সহস্রে পরিয়ে দিলেন কিশোর কবির গলায়। বললেন, ‘আমাদের কাল তো শেষ হল রমেশ, এবার শুরু হল এদের কাল। তুমি এর, “সন্ধ্যাসঙ্গীত” পড়েছ? আমি পড়েছি। দেখেছি এর প্রতিভার স্কুলিঙ্গ। দেখে এর হাতে একদিন সোনা ফলবে।’ জহরী জহর চেনে। এই এই পুরস্কারের মূল্য কি নোবেল পুরস্কারের চেয়ে কম ছিল সেদিনের কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে? নোবেল পুরস্কার যে দিন পেলেন রবীন্দ্রনাথ সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে নেই। থাকলে তিনি স্বচক্ষেই দেখে যেতে পারতেন তাঁর অতীত রবীন্দ্র-সম্বন্ধনার সার্থক পরিণতি।

তারপর অবশ্য এদেশের এবং বিদেশের বহু বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দান করেছেন। অক্সফোর্ড-ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি স্বয়ং এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করতে। ইহ বাহু, এরপর ইংরেজ সরকার দিলেন তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক নাইট উপাধি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর নাইট উপাধি বর্জনের কাহিনীটা। যে ইংরেজজাত তাঁকে নাইট উপাধি দান করে কৃতার্থ করে দিতে চেয়েছিল, জালিআনওয়ালাবাগে সেই ইংরেজসেনাদেরই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের

প্রতিবাদে তিনি ঘৃণার সহিত বর্জন করলেন সেই ঠুনকো সম্মান। যেন বললেন নীরব ভাষায়,—তোমরা বর্বর, তোমরা অমানুষ, তোমাদের দান অপবিত্র, তাই প্রত্যাখ্যান করলুম। একজন পরাধীন দেশের নাগরিকের পক্ষে রাজাকে প্রকাশ্যে আঘাত করবার এই মনোবল, এই সাহসের তুলনা কোথায়?

বস্তুত এই সব পুরস্কার আর সম্বর্ধনা, উপাধি আর উপঢৌকন বর্ষণে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছেন কবি, কিন্তু কখনও ভ্রষ্ট হননি তাঁর সাধনা থেকে। প্রতিহত হয়নি তাঁর সৃষ্টি প্রবাহ। বরং সেই ১৯১৩ থেকে তাঁর সৃষ্টি-ধারায় যেন নতুন গতি সংকারিত হল; সেই থেকে ১৯৪১ এর ৩০শে, সেপ্টেম্বর (১৫ই শ্রাবণ ১৩৪৮) পর্যন্ত সে প্রবাহ ছিল অফুন্ন অবিশ্রাম। ৩০শে সেপ্টেম্বরের কথায় পরে আসছি, তার ঠিক দশবছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে।

১৩৩৮ এর ২৫-শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্ণ হল। সেবার সারা দেশবাসী তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায় কলকাতা টাউনহলে। সেবার কবিকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয় সেটি রচনা করেছিলেন কুশলী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে মানপত্রের প্রথম লাইনটি চিরস্মরণীয়; “কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিশ্বাসের সীমা নাই।” এত সহজ সরল কটি শব্দে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন একমাত্র শরৎচন্দ্রের কলমেই সম্ভব। সত্যই রবীন্দ্রনাথ কেবল আমাদের কাছে নয়, সারাবিশ্বের কাছেই একটা বিশ্বয়।

মনে পড়ছে শরৎচন্দ্রের তিরোধানে রবীন্দ্রনাথের সেই অমর বাণীটি :

‘দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি

দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।”

রবীন্দ্রনাথের তিরোধান কালেও যদি এদেশে আর একজন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তিনিও হয়তো এ রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করে ঐ ছুটি লাইনই লিখতেন। দেশের হৃদয় যে তাঁকে ধরে রেখেছে তার প্রমাণ এদেশের প্রতিটি পাঠশালার শিশু। রবীন্দ্রনাথের ‘সহজপাঠ’-এর অনবদ্য ছড়াগুলি আজ তাদের মুখে মুখে। প্রতিটি

পল্লীপথের বৈরাগী বাউলের কণ্ঠে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী বাউল গান, আর অসংখ্য শিল্পী কণ্ঠে বেতার মাধ্যমে অহোরাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীতের বহা। আবার দেশে বিদেশে কতো মনোহী সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর গবেষণা করে চলেছেন। একা রবীন্দ্রনাথের উপর এদেশে এবং বিদেশে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার সঙ্গে একমাত্র সেকস্পীয়ারই তুলনীয়।

বলছিলাম ১৯৪১ এর ৩০শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩৪৮ এর ১৫ই শ্রাবণের কথা! অশীতিপরব্দ কবি তখন খুবই অসুস্থ। একটা মেজর অপারেশন হবার কথা সেইদিনই দুপুরের দিকে। আছেন শান্তিনিকেতনে। শান্ত চিন্তে অপেক্ষা করছেন আশংকাময় অনিশ্চিতের জন্তে। এই অপারেশনেই যে কবি সম্পূর্ণ হুস্থ হয়ে উঠবেন এমন আশ্বাস দিতে পারেন নি কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তখন কথা খুব কম বলেন। নিজের হাতে আর লিখতে পারেন না। তবু হৃদয়ের গভীর থেকে কথা যখন আপন বেগে উৎসারিত হয়ে ওঠে, তখন আশে পাশে যারা থাকেন তাঁরা কাগজ কলম নিয়ে বসেন। সেদিন শয্যাপাশে ছিলেন সেবারতা রাণীচন্দ, যিনি পরবর্তীকালে তাঁর ‘পূর্ণকুন্ত’ গ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্রপুরস্কার পান। কবি ক্রান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছেন, রাণী চন্দ লিখে নিচ্ছেন:

“তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।...

এরপর আরও যোলটি পংক্তি আছে। স্থানাতাব বশত উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করে শেষ কটি লাইন বলছি:

“অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।”

তরুণ বয়সে একদা তিনি লিখেছিলেন, “মরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান।” তারপরেও মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে তাঁর অনেক লেখা আছে। তখন মৃত্যু ছিল অনেক দূরে। আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন দার্শনিক কবি। আজ তিনি জানে পরিপক্ব, বয়সে পরিণত। মৃত্যুর সত্য

স্বরূপটি আজ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ বুঝেছেন সে ছলনাময়ী ভুবন জুড়ে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে রেখেছে। আজ সেই চির অবগুষ্ঠিতার ছল অবগুষ্ঠন খুলে ফেলে, অনায়াসে তার ছলনা উপেক্ষা করে অক্ষয় শান্তিলোকে যাত্রার জন্তে তিনি প্রস্তুত। আজ তাই সমস্ত পার্থিব কীর্তি, সমস্ত সম্মাননা আর সম্বর্ধনা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

প্রায় একটা শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যের “সোনার তরী” তিনি ভরে দিয়েছেন অফুরন্ত সোনার ফসলে। কতো বিচিত্র, কতো মহার্ঘ্য সে ফসল। গান, কবিতা, কাব্যনাট্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধমালা। সে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুরই বা কতো বৈচিত্র্য! ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, চারুকলা, (fine art) চিকিৎসাশাস্ত্র, অধ্যাত্তত্ত্ব, এবং কী নয়? যেন বলছেন,

“যত চাও তত লও তরণী পরে
আর আছে? আর নাই দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে
এবার আমারে লহ করুণা করে।”

“সোনার তরী”র এই কবিতার রচনা কাল ১২৯৮ সাল। ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ তখন অর্ধশতাব্দী দূরে। তাই “এবার আমারে লহ” বলে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যুবক কবি তার জীবনদেবতার কাছে, সে প্রার্থনা তখন মঞ্জুর হয় নি। তখন যে অনেক ফসল বাকী। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল এতদিনে। এবার করুণাময় করুণা করে কবিকে তুলে নিলেন তার স্বর্ণ-রথে।

১৩৪৮ এর ১৫ই শ্রাবণ কবি কথিত এবং রাণীচন্দের অনুলিখিত “তোমার সৃষ্টির পথ” কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। ঐ দিনই বেলা এগারটায় হল অপারেশন। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে বাইশে শ্রাবণ বেলা দ্বিপ্রহরে স্বর্গান্ত হয়ে গেল!

এবার তাঁর কথা দিয়েই তাঁর পূজা সমাপন করি:

“তোমার কীর্তির চেয়ে ভূমি যে মহৎ।

তাই তব জীবনের রথ।

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তির তোমার।

বারম্বার।”

মহাপ্রভুর ভাবনৃত্য

নৃত্যশিল্পী—নরনারায়ণ

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু পার্থিব মানবের মধ্যে সুনিশ্চিত যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর ভাবময় নৃত্য দ্বারা জগতে মানুষের মধ্যে ভক্তি পথে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন। গৌরানন্দস্বরের অপূর্ণ নৃত্যের ধারায় মানুষের মন শ্রীভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। মানুষের মন প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত ভূমির দিকে উত্তরিত হয়েছে।

চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীবাস অঙ্গনে, পুরীর রাজ পথে গৌরাট্টাদের দিব্যনৃত্য প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য বাদেদের হয়েছিল, তাঁদের জীবন সার্থক। “অতাবধি লীলা করেন গোঁউর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।” কারণ এ লীলা নিত্য—ছিল এবং থাকিবে।

নিত্যানন্দ ঠাকুর কীর্তন-নৃত্যের আনন্দে বিভোর হয়ে শিরোপরি কলসির কানা খেয়ে জগাই মাধাই উদ্ধার করলেন। প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন প্রেমবদন। এই অপ্রাকৃত নৃত্যের আকর্ষণে মানুষের ভালবাসার টান হয়, স্তম্ভ প্রেমকে করে উদ্ভূত।

ছোটকালের একটা ঘটনা মনে হলো। গ্রামে থাকতাম। খুব জ্বরে ভুগছি। একদিন আমাদের বাড়ীর হরি-মন্দিরে গ্রামের লোক কীর্তন করছিল। কত লোক ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সে এক অপূর্ব মধুর দৃশ্য। আমার ঠাকুরমা কীর্তনস্থানের ধুলিতে ফেলে আমাকে গড়াগড়ি দেওয়াতে লাগলেন। কি আশ্চর্য! তার পরদিন আমার জ্বর একেবারে সেরে গেল। এরূপ আরো আশ্চর্য ঘটনা শুনে পাওয়া যায়।

গ্রামে দলাদলিতে একজনের আর একজনের সঙ্গে বাক্য-বন্ধ, কিন্তু আশ্চর্য এ দলাদলি ভুলে তারা কীর্তনের আসরে এসে গলাগলি হয়ে উভয়ে নৃত্য করতে থাকে। গ্রামে সংক্রামক রোগ বিস্তার হলে এই কীর্তনের মহা শক্তিতে রোগ বিস্তার বন্ধ হতেও দেখা গেছে। বৃন্দ করতালের ধ্বনি বায়ু শুদ্ধ করে, এ শ্রদ্ধাশীলের অভিমত।

শ্রীগৌরানন্দের ভাবনৃত্য নিয়ে ভক্তজন, জ্ঞানী সাধক,

শিল্পী ও সাধারণ মানুষ কথকথা, কীর্তন, নৃত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে নানাভাবে আনন্দ রস সৃষ্টি করে থাকেন। এই নৃত্য মন্দিরে, ধর্মস্থানে, ভক্তজনগৃহে অমুষ্টিত হতে দেখা যায়। গৌরানন্দস্বরের লীলাকীর্তন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃত ও হরিতত্ত্ব বিলাসে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে।

শ্রীগৌরানন্দের ভাবনৃত্যের মাধ্যমে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস, জগাই মাধাই উদ্ধার, নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে প্রভুত আনন্দ পেয়েছি। রঙ্গমঞ্চে আমি বহু নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করেছি, কিন্তু গৌরানন্দ মহাপ্রভু নৃত্যনাট্য আমার মন-প্রাণকে বিমোহিত করতে। স্থূললিত কণ্ঠসঙ্গীত কীর্তনে আপনাআপনি আমার মনকে ছন্দে তালে আকর্ষণ করতে থাকতো। শরীরের ব্যাঞ্জনাত্তে ভাব-মুদ্রা আপনাআপনি প্রকাশ হতো। আমি তা ভাষায় বুঝাতে পারবো না।

দক্ষিণ ভারতের শিবপুরম চিদমবরমে নটরাজ শিবের বহু নৃত্য মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ডঃ এ. কুমারস্বামী তার ‘শিবম’ পুস্তকে শিবের নৃত্য মূর্তির পরিকল্পনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় নৃত্যকলা, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা রয়েছে, তাহা ভারতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কম গৌরবের বিষয় নয়।

শিবের নৃত্যমূর্তির পরিকল্পনাত্তে, মুদ্রাকরণ আঙ্গহার, রেচক, পুরক ইত্যাদি রয়েছে। এগুলি দক্ষিণ ভারতে কথাকলি, ভারতনাট্যম নৃত্যাকারে ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় নৃত্যকলাক্ষেত্রে এ নৃত্যগুলির প্রভূত মূল্য আছে। কিন্তু শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর নৃত্যে যেন অনবচ্ছিন্ন আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। তাঁর নৃত্যে ভাব-মুদ্রাকরণ আঙ্গহার, রেচক, পুরক ইত্যাদি আপনাআপনি প্রকাশ হতে থাকে। ইহাই এ নৃত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে এই ধরনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি আছে।

ভাবে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। সেই ভাবই

নৃত্যের প্রাণস্বরূপ প্রধান অঙ্গ। ভাবেতে মাহুৎস
বিমোহিত হয়, হয় বিগলিত। শ্রীগৌরানন্দ নৃত্যে আরো
কতগুলি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। নররস, অশ্রু, কম্পন,
পুলক, সমাধি।

শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর নৃত্যনাট্য পাঁচভাগে ভাগ
করা যেতে পারে।

১। বহিরঙ্গের নৃত্য—শান্ত ভাব। (রুদ্রতাল ভক্তি
বিলাস)

২। আত্মবিভোরা নৃত্য—দাস্ত ভাব। (আনন্দ
তাল, ভগবৎ আকর্ষণ)

৩। ভাবচৈতন্য নৃত্য—সখ্য ভাব। (আনন্দ তাল
তাল, নিজ বোধসহা লুপ্ত)

৪। পরমপদ নৃত্য—বাৎসল্য ভাব। (মহাতাল
স্রুতি, সমাধি ভাব)

৫। চিদানন্দ নৃত্য—মধুর ভাব কম্পন তাল (মহা
চৈতন্য লুপ্ত)

শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর ভাবনৃত্যটি শিল্পীগণ কিভাবে
গ্রহণ করবেন তাহা নির্ভর করে তার কলাকৌশল,
জ্ঞান, অনুশীলন, অনন্ত নিষ্ঠা, গভীর ভাবতন্ময়তা। ইহা
ধারণা বিজ্ঞাতে ভাড়াটে ব্যবসায়ী শিল্পীগণ আয়ত্ত
করতে পারবে না। কারণ ভগবানের কৃপায় একান্ত
নিষ্ঠা, ভক্তি ভাব বিকাশ পেলে এই নৃত্যের মর্ম অনুভব
করা যায়। নচেৎ শ্রীগৌরানন্দ নৃত্যকলা নগর সংকীর্ণ
বলে শুধু প্রচার হবে।

দেশ-জননীর প্রতি

ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

তোমার দুচোখে জল দেখি আজও করে,

ঘুচাতে পারিনি তব যত দুঃখ আছে।

তিলোত্তমা তুমি মাগো তিল তিল করে

দুঃখে দহ অবিরাম, ভুলি তাহা পাছে

সংকীর্ণ সুখের স্বপ্নে হানো মা আঘাত,

যেন তারই যন্ত্রণায় লভিয়া চৈতন

কঠোর কর্তব্য পথে করি পদপাত

সফল করিতে পারি তোমার স্বপন।

অসামান্য মাতা তুমি, তোমার সম্ভান

সামান্য রবো না মোরা, ঘুচাব দুর্দশা,

ধনিত করিব মাগো তব জয় গান

দেশে দেশে অবিরাম, রেখো মা ভরসা।

বিজয়িনী বলে মাগো তুমি গণ্য হবে

বিশ্ব-মানবের নব বিজয় উৎসবে॥

প্রবর্তক

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগযন্ত্রণায় জাগে মাঝে মাঝে যুগপ্রবর্তক,
সাধুসন্ত, দার্শনিক, শিল্পী, কর্মী।

তারা পর্যটক

ক্লিষ্ট পৃথিবীর পৃষ্ঠে। অপার্থিব তাদের পাথেয়।

ওপারের অপার প্রসাদ এপারের পূজাতেও

করে তারা বিতরণ। যত্নে মোছে জীর্ণ অবসাদ

অবশ যুগের হুজুগের।

শুদ্ধ অমৃতের স্বাদ

মৃত-মর্তে মূর্ত হয়। স্বর্গের সোনার চাবি খোলে।

ঝরা পাতা ভরা চৈত্রে অপূর্ব পূর্বাশা বেশ দোলে

দৃপ্ত তৃপ্ত বৈশাখের।

বিপরীত স্রোতে তবু হায়,

ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা কেন যেন পথ হাতড়ায়।

ভূমিকা

শ্রীশ্রীরেন্দ্রলাল ধর

নকশালপত্নীদের সজ্জাস তখনও শুরু হয়নি।
ডাক্তাররা তখন নিঃশব্দ চিন্তে রাতে রোগী দেখতে যান।

ডাক্তার ভট্টাচার্য রাতে বেরিয়েছিলেন কলে।
নিজের ছোট গাড়ীখানি তিনি নিজেই ড্রাইভ করেন,
আজও তিনি নিজের গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন।

রাত দশটা বেজে গেছে। পথে মানুষ নেই, জানালা
দিয়ে ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে, তাও কোন কোন
জানালায় পর্দা টাঙানো।

একটা পথের বাঁক ফিরতেই দেখা গেল একটা মেয়ে
আসছে। মেয়েটি মোটর দেখেই হাত দেখালো।
ডাক্তার বাবু গাড়ী থামালেন।

মেয়েটি কাছে এসে বললো—বড় বিপদে পড়েছি,
দয়া করে আমাকে বাস স্ট্যাণ্ড অবধি পৌঁছে দেবেন?

তরুণীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে ডাক্তারবাবু
মোটরের দরজা খুলে দিলেন, বললেন—উঠে আসুন।

মেয়েটি মোটরে উঠে বসলো।

পিছনের জানালার কানিসের উপর ওষুধের ব্যাগ ও
ষ্টেথিস্কোপ দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, আপনি
ডাক্তার বুঝি?

ডাক্তার ভট্টাচার্য একখানি কার্ড পকেট থেকে বের
করে মেয়েটির হাতে দিল, মেয়েটি পড়লো, ডক্টর অমিয়
নাথ ভট্টাচার্য।

মোটর আবার চলতে শুরু করলো।

মিনিট খানেক চলার পর মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠলো
এদিকে তে: বাসস্ট্যাণ্ড নয়?

—আমি রোগীর বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, সেখান থেকে
একটু এগিয়েই বাস স্ট্যাণ্ড।

তরুণী একবার সন্দেহভাবে ডাক্তারের মুখের পানে
তাকালো, তারপর বললো—আপনার রোগীর বাড়ী
কতদূর?

—এইতো এসে পড়েছি, আর মিনিট খানেক।

সহসা মেয়েটি বলে উঠলো—থামুন থামুন—

ডাক্তার ব্রেক কসলেন। বললেন, কি হলো?

—আমার হাতবড়িটা পড়ে গেল—

—রাস্তায়?

—হ্যাঁ। হাতটা জানালার পাশে ছিল—

—দেখুন কোথায় পড়েছে, ডাক্তার মোটর ব্যাক
করতে শুরু করলেন।

মেয়েটি জানালা দিয়ে মুখ বের করলো। তারপর
সহসা বলে উঠলো—ওই যে ওই—

ডাক্তার দরজা খুলে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন,—
কই?

—ওই যে চকচক করছে।

সত্যি একটু তফাতে লাইটপোষ্টের নীচে কি
একটা চক্চক করছিল, মেয়েটি বললো—ওই যে—

ডাক্তার সেই চক্চকে জিনিষটা কুড়োতে গেলেন।

মুহূর্তমধ্যে মেয়েটি ডাক্তারের সীটে সরে এসে
মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে দিল, মোটর চলতে শুরু করলো।

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, কিন্তু মোটর
তখন দ্রুত চলতে শুরু করেছে। মোটরখানি ধরতে
পারলেন না।

কয়েক মুহূর্ত ডাক্তার বাবু পথের পানে তাকিয়ে
বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই ধরনের মোটর
চুরির ব্যাপারে খবরের কাগজে তিনি প্রায়ই পড়েছেন।
এবার তাঁর নিজের গাড়ীখানিই গেল। বড় সখের
গাড়ী তাঁর, জলকাদায় বেরোন না। টিপটপ অবস্থায়
রেখেছেন, সেই গাড়ী আজ লোপাট হলো।

ব্যাগ নেই, ষ্টেথিস্কোপ নেই, এ অবস্থায় রোগী
দেখতে যাওয়া চলে না। আগে থানায় যেতে হবে।

ডাক্তারবাবু থানার পথ ধরলেন।

থানা খুব কাছে নয়, কিন্তু যেতেই হবে।

ডাক্তার দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললেন।

একটা পথের মোড় ঘুড়তেই সামনে একখানি মোটর
দেখা গেল। গাড়ীখানি যেন তার মত। ডাক্তার
ছুটে এলেন মোটর খানির কাছে। এ তো তারই গাড়ী
সেই নম্বর।

ডাক্তারবাবু ছুটে গিয়ে গাড়ীখানি ধরলেন।

মোটরের ওপাশে পথের উপর একটা লোক পড়ে

আছে। মেয়েটি বুকে পড়ে তাকে দেখছে। ডাক্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটি চমকে উঠলো।

ডাক্তার বললেন—কি ব্যাপার? খুন নাকি?

—আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। আমার গাড়ী চুরি করে নিয়ে এসে এখন আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে? আমি তোমাকে পুলিশে দোব—

মেয়েটি সে কথার জবাব দিল না, বলে উঠলো—
একে একবার দেখুন না ডাক্তার বাবু—

—আমি দেখি আর তুমি আবার মোটর নিয়ে সরে পড়?

না না,

এর কি হয়েছে?

বুঝতে পারছি না। পথে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—তাতে তোমার কি?

—আমার জানা চেনা আমার প্রতিবেশী।

—তোমার প্রতিবেশী এখানে এসে পড়লো কেমন করে?

—দুজনে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ ৬ হাত চেপে ধরেছিল। আমি ধাকা দিয়েছিলাম। তখনই পড়ে গিয়েছিল, আমি ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

—তারপর আমার মোটর চুরি করে ওকে আবার দেখতে এসেছ? চমৎকার!

মেয়েটি সে কথার কোন জবাব দিল না।

ডাক্তার একবার তার মুখের পানে তাকিয়ে মোটর থেকে ব্যাগটা বের করলেন।

লোকটির পাশে বসতেই বিলিভী মদের গন্ধ পেলেন, বললেন—এ তো মাতাল!

মেয়েটি কোন জবাব দিল না।

ডাক্তার বুক পরীক্ষা করলেন, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—ওই টিউবওয়েল রয়েছে ওখান থেকে রুমাল ভিজিয়ে আনুন।

ডাক্তার পকেট থেকে রুমাল ফেলে দিলেন।

মেয়েটি রুমাল ভিজিয়ে আনলো।

ডাক্তার ভিজিয়ে রুমাল লোকটির চোখে মুখে বুলিয়ে

দিল। লোকটি চোখ মেললো। খানিক কি শ্বেন বিড় বিড় করলে। ডাক্তার বললো—উঠে বসুন।

লোকটি উঠে বসলো, তারপর বললো; তুমি কে, তোমায় তো চিনি না।

—আমি ডাক্তার।

—ডাক্তার? এই রাস্তার উপর—

মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছ, ওঠো—

লোকটি উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো বটে কিন্তু টলছে।

ডাক্তার বললো খুব বেশী মদ গিলেছ, এখন বড়ী যাবে কেমন করে?

লোকটি এবার মেয়েটিকে দেখতে পেল, ডাকলো—
মায়া, আমার হাতটা ধরো।

মেয়েটি এগিয়ে গেল। বললো চল।

লোকটি জড়িত কণ্ঠে বললো—একখানা ট্যাকসি ডাকো না।

—এখানে এখন ট্যাকসি কোথায়—বল—

তারপর ডাক্তারের পানে ফিরে বললো—আমার জেত আপনাকে হয়রানি হতে হলো ডাক্তারবাবু, মাফ করবেন।

ডাক্তার হাতঘড়ির পানে তাকিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মোটরে উঠে পড়লেন।

তারপর ডাক্তার রোগী দেখতে গেলেন বটে। কিন্তু এই মোটরচোর মেয়েটির মুখখানা চোখের উপর ভাসতে লাগলো।

পরদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে আছেন। সহসা সেই মেয়েটি এসে হাজির হলো। বললো—
আপনার কালকের ফীটা দিতে এলাম।

চারটি টাকা সে টেবিলের উপর রাখলো।

ডাক্তারবাবু কি বলবেন ভেবে পেলেন না, তারপর বললেন—ওর আর ফী কি? সে তো একটা একসিডেন্ট!

—আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা খারাপ হবে, ভাববেন, মোটরচোর, মাতালের সঙ্গী, সেই ইমেজটা

আমি মুছে ফেলতে চাই। কাল আমার জীবনে যা ঘটেছে সে আমার কাছে গ্লানিকর। আমার বাবা একজন নামকরা অধ্যাপক, আমি তার মর্যাদা রেখে কাল চলতে পারিনি।

—আপনার বাবার নাম কি?

—ডক্টর ললিত মুখোপাধ্যায় পি এইচ ডি।

—তাকে আমি চিনি। তবে ভাল চিনি না।

—আপনি একদিন আসুন না বিকালবেলা আমাদের বাড়ীতে, বাবা আপনার সঙ্গে আলাপ হলে খুসি হবেন।

—চেষ্টা করবো।

আর দু'একটি কথা বলে মেয়েটি তার ঠিকানা রেখে চলে গেল।

তারপরেই ডাক্তার বাবুর চিত্ত বিভ্রম ঘটলো। বয়স কম ও অবিবাহিত হলে যা হয়।

কদিন পরেই অধ্যাপক ললিতবাবুর ঘরে ডাক্তার অমিয় বাবুকে দেখা গেল, চা, বিস্কুট, নিমকি খাচ্ছেন।

সে শুধু একদিনই নয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই।

মায়া মুখার্জীকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগলো ডাক্তারের গাড়ীতে।

তারপর একদিন বেকুলো নিমন্ত্রণ পত্র—ডাক্তার অমিয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে মায়া মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে, বিবাহ-বাসরে যোগ দিয়া স্থায়ী করিবেন।

অন্ধকার, সে আমারই

নলিনীকান্ত গাঙ্গুপাধ্যায়

অনেক প্রহরী রাত মুছে গেল

জীবনের ইতিহাস থেকে :

অনেক প্রহরী রাত।

ভোরের-প্রত্যাশা নিম্নে বেঁচে থাকা

আরও সুকঠিন।

অন্ধকারে কাজ সার।

হৃদয়ের পরম বঞ্চনা—

তবু তারে ভালবাসি, কাছে টানি,

বলি : প্রেম, তুমি আছ, আমি আছি,

দু'জনেই মুখোমুখি একই অন্ধকূপে।

হাত ধর, কথা বল, ভুলে যাই

জীবন-মজ্জণা, কথার জোঁলুস দিয়ে

মুড়ে-দেওয়া আশার আলোক।

জীবন, যৌবন, প্রেম—সবই মিথ্যা যদি

কী হবে আলোর পিছু হেঁটে হেঁটে মরা।

পৃথিবীর সব রঙ, সব রূপ, আলোর ইশারা

মুছে দেবো মন থেকে, প্রাণ থেকে,

বিচার বুদ্ধির সীমা থেকে—

আমার দু'চোখে শুধু প্রেম-প্রেম নিবিড় আঁধার।

উক্তি : নেপথ্যে

দীপ্তোপল রায়

তোমরা কি ভয় পাচ্ছ,

যত্নকে কি তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে চাও,

তোমরা কি আরও কতক সুখের আশায়,

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছ ধীরে ;

মরণ, অতি সহজ মরণ কখন হল জানলে না।

তোমরা কি থামতে চাও,

এগিয়ে গিয়েও আবার আসছ ফিরে,

তোমরা কি আরও কতক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতে

আরও একটু চমক আনছ শুধু

স্থিতি, গণ্ডিঘেরা স্থিতি, এসে গেছে অনেকক্ষণ।

তোমরা কি হাসতে চাও;

কৈদে কৈদে চোখ মুছেছ নেশার ঘোরে,

তোমরা কি ময়ূর পাখী ভাসিয়ে দিবে,

সুমুর বিলাসের ভেলায় উঠছ শেষে,

গণ্ডি ছেড়ে, শেষ বিচারের আশাটুকু সঙ্গে নিয়ে।

মাতৃপূজা ও আরতি

শ্রীনিরেন রায়

এই পূজা কবে কোন অনাদিকালে যে ভারতের বুকে প্রথম গুরুতা সঠিক বলা কঠিন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অর্থাৎ প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে যে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল, তার সাক্ষ্য হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাক্তজনেরা বলেন—ভারতীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষেই দেবী-আরাধনার আয়োজন বা শক্তিপূজার স্থচনা দেখা দেয়। আবার অনেকের মতে ত্রেতাযুগে বীর রাবণের রাজত্বকালে লক্ষ্মীদেবী এই পূজার প্রথম আয়োজন। বসন্তকালীন পূজা হওয়ায় বাসন্তীপূজা নামে তদানীন্তনকালের গতি ধরে এ পূজা আজো ভারতবর্ষে বুকে হয়ে থাকলেও, বহুল প্রচলন ভারতের সর্বত্র প্রসারতা লাভ করে নি।

প্রাচীন মতে বিশিষ্ট মহাজ্ঞানীজনেরা বলেন বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ উভয় অংশেই শক্তি-উপাসনার ইঙ্গিত দেখা যায় এবং বেদোল্লিখিত দেবীর বর্ণনা উপনিষদে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। উপনিষদে দেব গণের প্রমোত্তরে দেবী নিজেকে ব্রহ্মরূপিনী বলেন। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রমতেও শক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিনী বলা হয়। তন্ত্রের বিধানই আবার শক্তিপূজা সর্বৈবভাবে ভারতে প্রচারিত। মন্ত্রভাগ অর্থে—সংহিতা, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি এবং ব্রাহ্মণভাগ অর্থে—স্তোত্র, উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক অভির্যক্তি। ব্রহ্মবিদ্যা বেদের সার বস্তু, তাই অনেকের মতে এরই আরেক নাম বেদান্ত। আবার অজ্ঞান বিনাশ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় অপর নাম হ'ল উপনিষদ। সার কথায় শাক্তের উপাসনার দেবী—শক্তিরূপিনী অর্থাৎ শক্তির মহাপ্রতীক।

শক্তির যে দশটি সাধারণ রূপ আছে সে দশবিধরূপ গৌরী তাঁর দক্ষপিতার যজ্ঞস্থলে ভীতি প্রদর্শনার্থে পরিগ্রহ করেন, তা হচ্ছে কালী, তারা; ঘোড়নী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতাঙ্গী ও কমলা তন্ত্রমতে আরোও তিন-তিন মহাবিদ্যার

রূপ আছে বলে জানা যায়। যেমন—চামুণ্ডা, কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, ত্রৈলোক্য বিজয়া, বনহুগা চণ্ডেশ্বরী, ভদ্রকালী, লঘুশ্যামা, শূলীনী, বারীহী, প্রাত্যঙ্গিরৌ প্রভৃতি। আরোও নাম হয়তো বহু প্রাচীনপুঁথি-পত্র পর্যালোচনায় পাওয়া যায়, তবে সে সব নামে মায়ের পূজা ইদানীং কালে অপ্রচলিত। অবশ্য পূর্বকথিত দুর্গা, গৌরী, মহিষাসুরমর্দিনী মহাবিদ্যারই রূপ। ইহা ব্যতীত পূর্ব-বর্ণিত নামের অনেকগুলি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া যায়।

মূল কথায় আসা যাক। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুযায়ী মা বিভিন্ন মূর্তিতে ভিন্ন-ভিন্ন অম্বর বা দৈত্য নিধন করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের স্থচনাতে দেখা যায় স্বয়ং ব্রহ্মা, মদমত্ত বিহ্বল, প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন, দুঃখান্না, ক্রোধে উন্মত্ত মধুকৈটভকে বিনাশের জন্যে মহাকালীকে আহ্বান করছেন। তিনি উদ্ভিত হয়ে শ্রীবিষ্ণুভগবানকে যোগনিদ্রা থেকে জাগাবেন কেননা শ্রীবিষ্ণুই মধুকৈটভকে তাঁর স্তম্ভীকৃতদর্শন চক্রে নিহত করবেন। সমগ্র চণ্ডী বিশ্লেষণে জানা যায় যে অসীমশক্তিস্বরূপা মা মহাকালী, মহালক্ষ্মী মহা সরস্বতী মূর্তিতে অর্থাৎ তমো রক্তঃ-সত্ত্ব গুণাশ্চিবশরূপে যথাক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুর বধ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্বংসলোচন বধ; সপ্তম অধ্যায়ে চণ্ডমুণ্ড বধ, অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজ, নবম অধ্যায়ে নিশুভ এবং দশম অধ্যায়ে শুভকে বিনাশ করেন।

শারদীয়া মহাপূজা তিথিতে ভারতের অনেক অংশে শক্তিরূপিনী মায়ের একাধিক মহাবিদ্যারূপের পূজা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই পূজিতা হতে দেখা যায়, এর কারণ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাধাত্য বাংলাতেই বেশী। কেউ কেউ বলেন তন্ত্রশাস্ত্রের উপপত্তিস্থল বাংলা, যদিও এ সম্পর্কে যথার্থ সত্যতার কোনো সঠিক প্রমাণ নেই। তবে বাংলার তথা গোড় দেশের তন্ত্রশাস্ত্র অতি পুরাতন। সূদীর্ঘ পাঁচশো বছর প্রায় অতিক্রান্ত, তথাপি আজো নবদ্বীপের মহান কালী সাদিক, ঘোরতর তাত্ত্বিক কৃষ্ণভক্ত আগমবাগীশের কথা

উল্লেখযোগ্য। তিনি চৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক—একদা একই টোলে উভয়েই অধ্যয়ন করেন। আগমবাগীশ মহাশয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে তাঁর মহামূল্য ‘তন্ত্রসার’ লেখায়। অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্রকে একত্র করে নিজস্ব উপলব্ধি সত্যের পরশে তাঁর লেখা “তন্ত্রসার”—এর জন্ম। যা অতি যত্ন এবং তৎপরতার সঙ্গে প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির। কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্যের অনেক জায়গায় বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব আজও অপরিণীম।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলায় বাধা নেই যে, আজও মায়ের সহস্রভূজা মূর্তির নিত্যপূজা হয়—হাওড়া সহরের শিবপুর থানা অঞ্চলের ওলাবিবিতলায়। অতিশুন্দর মায়ের সে রূপ। প্রকাণ্ড মূর্তি সহস্র হাতে নানা আয়ুধ নিয়ে বিগ্ৰহমান। স্থানীয় অধিবাসিরা তাঁকে “হাজার হাত কালী” বলেন এবং হাজারহাত কালীতলা নামে স্থানীয় অঞ্চল প্রসিদ্ধ। অতি প্রচলিত দর্শনমহাবিচার একক বিভা হিসেবে কালী বা তারার ছাড়া অপর বিভার পূজা নিতান্তই পশ্চিমবাংলায় বিরল। তবে মিলিতভাবে শারদীয়া পূজায় দশমহাবিচার পূজা কোথাও কোথাও হয় থাকে। কালীঘাটে, ঠনঠনিয়ায় দক্ষিণেশ্বরে, মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা (কালীর আরেক রূপ), শ্যামনগরে পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে বা আরও অজস্র জায়গায় নিত্য কালীপূজার যথারীতি প্রচলন আছে। যেমন বীরভূমের তারাপীঠে মা তারার, বর্ধমানের মিঠেপুকুর গলিতে “সুখ্যাত সোনার কালী বাড়ীতে নিত্যমা ভুবনেশ্বরী পূজা হয়। সেখানে মা সাক্ষাৎ জগদম্বা—অষ্টধাতুর প্রাণমাতানো রূপ। বর্তমান বর্ধমানরাজ উদয়চাঁদের (মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) মাতামহী নাকি এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন শোনা যায় এবং দেবত্র সম্পত্তি হিসেবে বিহারে বেশ কয়েকহাজার টাকার সম্পত্তি বর্তমানেও মায়ের নামে আছে। বর্ধমানে আরেকটি অপ্রচলিত কালীর মূর্তির নিত্য পূজা হয়ে থাকে—একদা সুখ্যাত বর্ধমান-রাজধানী দামোদর তীরবর্তী কাঞ্চননগরে বাঙালীতলায়। মা বাঙালীকালী নামেই সুপ্রসিদ্ধা—রূপ অতীব আশ্চর্যময়।

মহাদেবের নাভিপদ্ম হতে মায়ের উৎপত্তি কঙ্কালীরূপে অস্থি-চর্মসার, অষ্টভূজা মা, সব হাতেই গ্রহরণ কেবল বামাদেশে একটী উখিত বাহুর কনিষ্ঠা আঙ্গুলী মায়ের হস্তময় অধর স্পর্শ করে আছে। এখানে মা লোল জিহ্বা নয়, জিহ্বার বহিঃপ্রকাশ নেই এবং মায়ের স্বক্কে হাতী বিরাজমান। জানা যায় ১৩২০ সনের ভয়াবহ বন্যায় দামোদর গর্ভে মায়ের আবির্ভাব ঘটে—এবং মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন নাকি পরিত্রাজক কমলানন্দ সরস্বতী। বর্তমান পূজারী ডুমুরদহের উত্তমআশ্রমের ক্রবগিরির শিষ্য তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিরজানন্দ গিরি।

অনন্তরূপা মা সর্বত্রই বিরাজমান। মা সর্ব কার্যকারণ স্বরূপিনী, সর্বশক্তিময়ী সর্বেশ্বরী—“সর্বস্বরূপে সর্বশেষে সর্বশক্তিসমন্নিতে ভয়েভ্যস্তাহি নো দেবি দুর্গেদেবি নমোহস্ত তে ॥ (চণ্ডী)। ব্রহ্মার চিৎশক্তি, বিষ্ণু মহেশ্বরের আত্মস্বরূপা। তিনিই আবার সরূপা তাই তো নিরাকারা এবং সর্বস্বরূপা তাই না ভগবতী। আকাশ সংহিতায় আছে “চিন্ময়ী শক্তিরূপা মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাত্মিকা—স্বরূপা সর্বরূপা সা সারদে মে প্রসিক্তম্।” “আবনশস্ত মহাকাশং পরাকাশং পরাংপরং তত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলফলম্।” অর্থাৎ মা আমার অবসান মহালয়াপরাকাশ তত্বাকাশ এবং সূর্য্যাকাশে বিরাজিত।

মায়ের পূজার অপরিহার্য অঙ্গ আরতি। পূজার অস্থিমজ্জিক সর্বপ্রধান উপাদান বা অঙ্গ আরতি। আরতি ব্যতিরেকে পূজা অসিদ্ধ, অসম্পূর্ণ, অর্ধসমাপ্ত অর্থাৎ দুঃখনীয়। আরতি প্রার্থনার মাধ্যমে অপর দেবতাকে জানাই আমাদের আন্তরিক ভক্তি, আকুতি এবং অকাতর ভালোবাসা। তাই আরতিতে প্রবাহিত হয় হৃদয় কন্দরে জমে ওঠা অফুরন্ত ভগবৎ প্রেমের মন্দাকিনী ধারা। এই কারণে আরতি-উপাসনা দেবতাকে বা ভগবানকে ভালোবাসার মহাপ্রতীক। আরতি অর্থে আ যুক্ত রতি। আ মানে বিস্তৃতি, রতি অর্থে ভালোবাসা। স্মরণ্য আ রতি=আরতি অর্থ ভালোবাসার বিস্তৃতি (super-expression of devine love) আরতির মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রেম-প্রীতি ঈশ্বরকে জানাই।

আমাদের এই শস্ত্র-শামলা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় বার মাসে তের পার্বণ” লেগেই থাকত। আর সামান্য অনুধাবনে দেখা যায় অধিকাংশ পার্বণ-গুলি ছিল দেবতাকেন্দ্রিক। পূজার আয়োজনে সরল অনাড়ম্বর জাঁক-জমকের মাধ্যমে স্মৃষ্টি পক ফলাদি এবং স্বাস্থ্য সামগ্রীর ভোগ নিবেদনে দেবতাকে সম্বর্ধিত করা হ’ত। পরিশেষে সেই ঋতুসম্ভার মহানন্দ প্রসাদ রূপে কঠন, গ্রহণ ও ভক্ষণ সকল চিত্তকে পরম তৃপ্তি দিত। দেশ ছিল ধর্ম-ময়—ধর্ম ছিল মানুষের লক্ষ্য এবং ধর্ম পালনই ছিল একান্ত কর্তব্য আর কাম্য। পূজা-পার্বণ-পালনেই যে কেবল ধর্ম রক্ষা হয়, সে কথা সর্বৈষ সত্য নয়। সেবা, পরোপকার সত্যরক্ষা সাযম-রক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য পালন ইত্যাদিও যে ধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তা সকলেই বুঝত। তাই পূজাপার্বণকে কেন্দ্র করে’ বিরাট আয়োজনের সম্ভব হ’ত। সকলে এক-সঙ্গে সমবেত হতে পারত যাকে বলে social gathering এর পূর্ণ সুযোগ থাকত। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা ও প্রাণখুলে মেলা-মেশার নানান পথ বা স্ত্র খুঁজে পেত, যা নিতান্তই সমাজ-নীতির সহায়ক। হিংসা-দ্বेष-জিঘাংসা ভাব তেমন-ভাবে কারও অন্তরেই স্থান পেত না। দেবতাকে সহজেই সকলে ভালবাসতে পারত—উপাসনায় ফাঁকি থাকত না। থাকত না নিষ্ঠার অভাব তাই

দেবতার অস্তিত্ব সামান্য আয়াসেই অনুভূত হ’ত।

আমাদের দেহ-মনের সঞ্চিত প্রার্থনার পরিণতিই তো আরতিতে ও মায়ের সামনে “শিউনার দুর্গে” পুজিত মা-ভবানীর সম্মুখে শিবাজী যেমন অসিনৃত্য করেছিলেন, আনন্দমঠের সত্যানন্দের আদর্শে করতে হবে আরতি। আরতি করতে হবে ভবানীপাঠকের মত নিষ্ঠা-ভক্তি-বীরত্ব দিয়ে তবেই দশ প্রহরণধারিণী মা তৃপ্ত হবেন মায়ের আয়ুধগুলিতে বনবানন প্রতিধ্বনিত হবে। ভারতে তথা বাংলায় অসি-চালনা, লাঠি-খেলা আরতির সঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হ’ত। প্রায় প্রতিজ্ঞার দেহে ছিল অটুট শক্তি, মনে ছিল সংসাহস, প্রাণে ছিল দৃঢ়তা অথচ হৃদয়ে প্রশান্তি-কারণ ব্রহ্মচর্য্য-পালনে তারা ছিল শক্তিমান। শক্তিময়ী মা তাঁর বীর সন্তানদের আরতিতে সুপ্রসন্ন হতেন, জাতির সমাজের প্রাণে দৈবশক্তি সঞ্চার করতেন। আজ সে দেশই আছে কিন্তু সে যুগ নেই, অনেক পাল্টেছে। দেশ হতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, প্রীতি, করুণা, বীরতাব, মাতৃতাব-সবই যেন অবলুপ্তির পথে। আবার মাতৃমজে দীক্ষিত হতে হবে। মাতৃপূজায় আন্তরিক এবং দৃঢ় বিশ্বাস এনে শক্তিরূপিনীকে বীরত্বময় আরতিতে সম্বর্ধিত করতে হবে। তবেই যুগ্ময়ী মা আমাদের চিন্ময়ী হয়ে বরা-ভয় প্রদান করবেন—নিজের হাতের অসি সন্তানের হাতে অনায়াসেই তুলে দেবেন।

শাস্ত্র প্রেম

ধীরেন্দ্রকুমার সরকার

অক্ষর রচনা এ কার

প্রিয়তমা সমাধি তীরে।

যমুনার তেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়

বয়ে যায় ধীরে ধীরে ॥

অনাবিল প্রেমে মুগ্ধ প্রেমিকে

ইতিহাস কথা গিয়েছে লিখে,

স্বপ্ন স্বপ্ন ধরি’ রহিবে যে প্রেম

সমাধি আসন থিরে ॥

কে তুমি প্রিয় সবারে কহিছ ডাকি,

“শাস্ত্র প্রেম পরম আদরে

রেখেছি যতনে ঢাকি?”

পৃথিবীর কানে শোনাও যে বাণী

“প্রেম কারে কয় যাও গো জানি,

দুর্কোটা অক্ষর না দিয়ে হেথায়

যেতে না পারিবে ফিরে” ॥

জননী

অমিয়া সেন

চওড়া রাস্তা ধরে এপাশে মাঠ ঘেঁষে একটা ঢালু লাইন। লাইন ভর্তি ঝুপড়ি। নীচু নীচু মাটির খোপ। উপরে ঘাস পাতার ছাউনী। দিন মজুরদের ময়ূর-মহল। নামটা রমার দেওয়া।

মণিকা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ ঝুপড়িগুলোর এমন রাজকীয় নাম কেন বোদি? না কি, এটা ইপ বাড়ির উঁচুতলার বাসিন্দা বলে গরীবকে ঠাট্টা করছেন?

মণিকাও তথাকথিত উঁচুতলার বাসিন্দা। ওর বাপ যোজনা কমিশনে একজন বড় চাকুরে। তবে ও একালের মেয়ে। স্বচ্ছল অবস্থার সুযোগটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করে কিন্তু এ কালের ফাসান অনুযায়ী ধনী দরিদ্রের এই প্রচণ্ড পার্থক্যের নিন্দা করাটা কর্তব্য মনে করে।

—না-না, তা নয়,

রমা হেসে বলে, ঠাট্টা নয়, রিয়েল, বিশ্বাস কর। ওদের ওই ঘাস পাতার ছাউনো ঢালগুলো দূর থেকে দেখতে ঠিক ময়ূর পেখমের মত লাগে না?

—বার্ষিকে টাইম উ'হা মোর আড্ডা ছায় মেমসাব, সচ—ধরমবতী ময়ূরমহলের এক রাজী রমার বাড়ীর ঠিকে ঝি। বুড়ী। মোজেক করা মেঝের উপর তাতা বুলাতে বুলাতে খুশী খুশী মুখে বলে।

—কি সংঘাতিক খুশীর কথা!

রমা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ধরমবতীর কথা শুনতে ওর মজা লাগে। ওর চাল নেই চুলো নেই, পথে আস্তানা, তাও ময়ূর দেখে।

পাঁচ বছর হলো ওরা এখানে এসেছে। সেই প্রথম থেকে ধরমবতী কাজে বহাল আছে। বুড়ী এবং একটু ঢিলে হলেও রমা একে পছন্দ করেছে। কারণ চুরি করে না, আর কামাই একেবারেই দেয় না। রমার স্থাণ্ডী নীভাননীও খুব পছন্দ ধরমবতীকে। বাড়ীতে ত কথা বলার লোক নেই। ছেলে বোঁ, এ কালের ছেলেমেয়ে। ফাঁক পেলেই টো টো করে ঘুরছে। পাঁচ বছরের ছেলে আর চার বছরের মেয়ে—ইতিমধ্যে দুটোকেই কি নাসরী না কি ইন্ধুলে দিয়ে খালাস। বাকী সময় ফেলে রাখে চাকরের কাছে।

ধরমবতী বেশ ভালো শ্রোতা। নীভাননী যখন গা ছড়িয়ে কোলকাতার বাড়ীর গল্প করেন খাঁটি কলকাতিয়া ভাষায়, ঝাঁসিয়ালী ধরমবতী তখন হাতের কাজ ফেলে রেখে হাঁ করে শোনে। মাঝে মাঝে মন্তব্যও করে। অবশ্য না বুঝে।

ছুটির দিনে সাহেব মেমসাব যখন সারাদিনের মত বেরিয়ে যায়, ধরমবতী ওর একবছরের নাতিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, বলে, মাতাজি, যুগা রোতা না, লছমী কামকো গয়ী না, ইসলয়ে।

বুড়ীর ঐ একটাই মেয়েটুলছমী। দুটো ছেলে অবিশ্রি আছে। তা তারাত মাকে দেখে না। বিয়ে সাদি করে একজন আরকেপুরম আর জন বিনয়নগরের এদিকে কোথায় ঝুপড়ি বানিয়ে আছে।

এই লছমীকে নিলেই বুড়ী এখানে এসে ঝুপড়ি বানিয়ে স্থিত হয়। বিয়েও হল ঐ ঝুপড়িতে। সারা রাত ধরে নাচ গানের সে কী ধুম! আর ময়ূর মহল ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন ধরমবতীর ঝুপড়ির সামনে। কিছুটা দূরে হলে ও রমাদের বাড়ীর সরকারী কোয়ার্টার থেকে খুব বেশী দূর নয় ময়ূরমহল। ওদের পুঙ্কিত টেঁচামেটির জ্বালায় রমাদের মত অনেকেই সে রাতে ঘুমোতে পারেনি। বিরক্ত হয়ে ভেবেছে, কি আছে ঐ লোকগুলোর জীবনে। আনন্দ করার এত শক্তি কোথেকে পায় ওরা?

কোন বাংলা বাড়ীর কোঠাতে যেন চাকর ছিল জামাই। বিয়ের পর লছমীও চলে গিয়েছিল সেইখানে। সাহেব মেম বিলেত চলে যেতে জামাইর চাকরী গেল। অগত্যা ধরমবতীর ঝুপড়ি ছাড়া আর যাবে কোথায়। মেয়ে-জামাই ফিরে আসতে বুড়ীর সে কী উল্লাস! কয়েকদিন বেশ ছিল। তারপর যা হবার তাই হল। মা মেয়েতে নিত্য কাজিয়া।

এখন মেয়ে আলাদা ঝুপড়ীতে থাকে। লোকের বাড়ী বাসন মাজে। জামাই ঠিকেদারের কাছে মজুর খাটে। ধরমবতী নাতিটার তদারক করে। মেয়ের সঙ্গে পড়শী কারও ঝগড়া লাগলে লাফিয়ে পড়ে মেয়ের হয়ে। অথচ

এই কয়েকমাস আগে—আলাদা রূপভিতে যাবার আগে লছমী বুড়ী মায়ের পা খোঁড়া করে দিয়েছিল লাঠির বাড়ি মেরে।

—বিচিত্র!

ময়ূর মহলের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে রমারা হেসে বলে। কিন্তু রমারা জানে না ধরমবতীদের চোখে ওরা বিচিত্রতর জীব।

বারান্দার বেসিন ধুতে ধুতে নিভাননীর কাছে সেদিন তাই বলছিল ধরমবতী—বগড়া কাজিয়া ত মামুলী বাত হ্যায় মাতাজী, ইনসানোমে ওত হোতা চলে গা। পর-হমলোগ ত জীতেহী হ্যায় বচে কে লিয়ে।

সাড়ে চার বছর বিয়ে হয়েছে লছমীর, এর মধ্যে তিনটে বাচ্চা। দুটো অবশি অকালেই ঝরে গেছে। কোলেরটা মাত্র এক বছরের। এর মধ্যে আবার একজন আসছে। পাঁচ মাস। রমা এই নিয়ে ধরমবতীকে বলেছিল, একটাকেই ভালো করে খেতে দিতে পার না তার ওপর এত ঘন ঘন—অপারেশন করিয়ে দাও না।

আজকাল বিনে পয়সায় সরকার করিয়ে দিচ্ছে।

—না মেমসাব, কুল এক বচ্চা,—অভী অগরিশান ক্যা করনা।

—না তা করবে কেন, ঘরে খাওয়া নেই, কুল এক বাচ্চা। এজন্মই ত তোমাদের মধ্যে নিত্য মারামারি—নিত্য বগড়া। তোমারও ত কুল একটা মেয়ে। তা জামাই যখন নোকরী খুইয়ে তোমার কাছে এসেছিল অত কাজিয়া কেন হল! ঘরে খাওয়া নেই বলেই ত!

সুনীতি কুমার অফিসে যাওয়ার জশ তৈরি হচ্ছিল, রমাকে ডাক দিতে ঘরে চলে গেল, কাজেই ধরমবতীর উত্তরটা আর তেমন হল না। সেটাই অগত্যা নিভাননীকে বলতে হল।

নিভাননী সবে পূজা সেরে উঠেছেন। হাতে মালা ঘুরছে। ঘুরবে এগারোটা অবধি। কথা বলা যদিও তাতে আটকায় না। বললেন, তোরা যে এত বাচ্চা বাচ্চা করিস, বড় হয়ে তেদের ছেলেরা ত তোদের দেখে না। তবে!

ধরমবতীর বেসিন ধোয়া হয়ে গেছে। ধপ করে বসে পড়ল বারান্দায়। শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে

বলল, ফুল জব শুখ জাতা ত উসকা খুস্বু ভী উড় জাতী, হমারা লড়কা ভী স্যায়সা হ্যায় মাতাজী।

বড়া হো গয়া তো ব্যস, দয়া ধরম সব বরবাদ। পর হোনে দো, উসসে হমারা ক্যা হ্যায়, ম্যায়নে তো অপনা কাম কিয়া, অপনা খুন পিলাকর উসে আদমী বনায়। আপনা ধরম—মা কা ধরম রখ লিয়া। উসনে অপনা ধরম না রাখে তো পরমাত্মা উসকা বিচার করজে। পর ইসলিয়ে তো হম বচ্চাসে প্যার নহী ছোড় সকতে।

একটানা অনেকক্ষণ বক্ বক্ করে গেল ধরমবতী। শোবার ঘরে পালঙ্কে গা এলিয়ে দিয়ে তাই শুনতে লাগল রমা। ছেলেটা ইঙ্কলে। পাশের ঘরে মেয়েটা চাকরের সঙ্গে খেলছে। মাঝে মাঝে চৈঁচিয়ে উঠছে—মাম্মী—চাকরটা দুফর্মী করে খেপাচ্ছে বোধহয়। রমার কানে যাচ্ছে না। ও ধরমবতীর কথা শুনছিল। কথা ত নয়, এক অশিক্ষিতা দেহাতী বুড়ী ঝাঁপীয়ালা যেন কবিতা রচনা করে চলেছে—শিশু ফুল—শিশু আনন্দ—শিশু আশা—শিশু ঐশ্বর্য—শিশু কেবল মানুষের নয়, পৃথিবীরও জীবন কাঠি.....

গাটা একবার শিরশির করে উঠল.....না-কি মনটা! ঠিক বুঝতে পারল না রমা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মধ্যে ওর মুখের ছায়া পড়েছে। মুগ্ধ হয়ে তাই দেখতে লাগল। কে বলবে ওর বয়স তেত্রিশ বছর!

বর্ষা নামলো চার মাস পরে।

দিল্লী সহর অন্ধকার করে—সুন্দর সাজনো রাজ পথের ধারে ধারে গাছগুলোকে বিষম নাড়া দিয়ে ঠিক দুপুর বারটার সময়ে বড়ো হাওয়া ছুটে এলো শিলারুখি সঙ্গে নিয়ে।

রমার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ভেতরে লাইট জ্বলছে। দিন না রাত বোঝা যায় না এমন অন্ধকার। লাইট না জ্বলে উপায় কি!

সুন্দর বেডকভার ঢাকা ডানলো পিলোর গদী দেওয়া পালঙ্কের উপর বসে আছে রমা। হাসছে। ছেলে মেয়ে খাট ধরে লাফাচ্ছে।

—খুব সময়ে এসে গেছি আমরা,

গলার-টাই খুলতে খুলতে সুনীতি বলছিল।

প্রায় মাসখানেক পরে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন রমা।

—আমার জন্ম হাসপাতাল থেকে একটা ভাই কেন নিয়ে এলে না মাম্মী—একটা ছোট ভাই—

বেবীটা দস্তুর মত কান্না জুড়ে দিয়েছে।

রমা আর সুনীতি তাই দেখতে দেখতে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল।

নিভাননী ততক্ষণে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে চলেছেন।

সারা গা-মাথা বৃষ্টির জলে ধুতে ধুতে বোঝা যাচ্ছিল না যে তিনি কঁাদছেন।

ময়ূর মহলে ধরমবতীও তখন কঁাদছিল। লছমী জানে বেঁচেছে কিন্তু বাচ্চাটা বাঁচলো না। ডাক্তাররা নাকি লছমীকে বাঁচাবার জন্য বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে। পুরো ন'মাসের বাচ্চা।

নিভাননীকে ঐ অবস্থায় নিজের ভাঙ্গায় বুপড়িতে দেখে অবাক হতেও ভুলে গেল ধরমবতী। আছাড় খেয়ে পড়লো তাঁর পায়ের কাছে। মাতাজি, জিন্দা বচ্চাকে মার ডালা উক্টরনে—হায় মাতাজি, মেরী বেটীকো জব হোস আয়েগী ওত ছাতি পিটেগী মেরী লছমী মেরী বচ্চা—

নিভাননী মাটিতে বসে ওকে ভুলে ধরলেন। ভাঙা গলায় বললেন, কঁাদিসনে ধরমবতী তোর নাতিকে, না মারলে ত তোর মেয়ে বাঁচত না। মেয়ে বেঁচে থাকলে তোর আবার নাতি হবে। আমার আর হবে না। আমার যে ঐ একটাই ছেলে। ওরা, আটমাসের জ্যান্ত বাচ্চা, রাজ পুতুরের মত সুন্দর ছেলেটাকে ইচ্ছে করে মেরে ফেললো। আমার কলকাতায় দুটো বাড়ি। আমার ছেলে কতবড় চাকরী করে, তবু দেখ কি করে এলো—

নিভাননীর কান্না দেখে থ হয়ে গেল ধরমবতী।

—সব বাত মাতাজী, মেমসাবনে জান-বুঝকর বচ্চা মার ডালা। আচ্ছা, ইসলিয়ে আপ তিনরোজ থানা নহী খায়ী খী উসদিন—জর মেমসাবনে হাসপাতাল চলী? মুঝে মালুম নহী থা কী বচ্চা মারনেকে

লিয়ে জব রহী খী। হায় মাতাজি ছুনিয়া ক্যা হো গয়ী হায়—

—এ ছুনিয়া তোর আমার ছুনিয়া নয়, ধরমবতী—মায়ের ধর্ম বদলে গেছে—ওরা কেবল নিজের সুখ দেখে... আহা ডাক্তার পর্যন্ত কত বলেছিল এখন অপারেশন করবেন না। বাচ্চাটা হতে দিন। আমি নিয়ে নেব। কারো কোনো কথা শুনল না ওরা—কী নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর রে—

ধরমবতীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কঁাদতে লাগলেন নিভাননী।

লছমীর দেড়বছরের ছেলেটা একটা বাসি কুটি হাতে নিয়ে এতক্ষণ খেলছিল আর খাচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে দুই বুড়ীর কোরাস কান্না দেখে হকচকিয়ে গেল। দৌড়ে এলো কাছে। বুকে পড়ে দু'জনার দিকে তাকাল তারপর চীৎকার করে কঁাদে উঠল।

বাইরে অনেক দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল। ময়ূর-মহলের খড়ের চাল কেঁপে উঠল।

বৃষ্টি এলো আরো ঝেঁপে।

বাচ্চাটা ভয় পেয়ে ধরমবতীকে জড়িয়ে ধরল। ছ ছ করে জল পড়ছে সামনের নালাটায়। উঠে আসছে বুপড়িগুলোর দিকে। ওর ভয় যদি ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ধরমবতী বুড়ী। হাতে পায়ে জোর নেই। আর এই মুহূর্তে ভগবানকেও ঠিক মনে পড়ছে না। চোখের আয়নায় ভাসছে হাসপাতালে শোয়া লছমীর বিবর্ণ মুখ আর সেই মরা বাচ্চাটাকে।

নাতি কোলে নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো বুড়ী। কি করে কী করে বাঁচাবে এই বাচ্চাটাকে। ...আর নিভাননী জমে যেতে লাগলেন ঠাণ্ডায়। পৃথিবীটা কি রকম তাপশূন্য হয়ে যাচ্ছে...প্রাণ নেই যেন কোথাও...কেবল তাঁর বুকটা এখনো এখনো ধুক ধুক করছে আর সেটাকে ও ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবার জন্য যেন এই অঝোর বর্ষণ...এর নাম বৃষ্টি প্রলয়? কিমিয়ে পড়তে পড়তে একথাই মনে হলো নিভাননীর।

যমের বাড়ি

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যমের বাড়িতে চলেছি।

গভীর রাত্রে আমার মৃত্যু হয়েছে।

দিনের বেলা শিবদূত। জমাট রাত্রে যমদূত।
দিনেরবেলা মরার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি
পাপী। তাই জীবনেশ্বর আমার জন্ত যমদূতেরই ব্যবস্থা
বহাল রেখেছেন।

ইয়া বড় বড় গালপাট্টা। ঘাড়ের উপর সময়োপযোগী
সমস্তরক্ষিত চুলের গোছা। কালো কালো কয়েকটা
কিছুতকিমাকার মূর্তি। গলায় বা হাতে কালো কারে
বাঁধা তাবিজ। লোমশ, বীভৎস আকৃতি। ছায়ায়
যেন ছায়ার মতো তারা আমাকে নিয়ে চলেছে।

অফিস থেকে লিভ্ ফেয়ার-কন্সেশনেও যে সব
জায়গায় একদিন যাওয়া সম্ভব ছিল না, আজ স্বচ্ছন্দে
বিনা খরচায় সে সব স্থান পার হয়ে চলেছি। নিচে
সেই ভুবনেশ্বর, অজন্তা-ইলোরা, লালকেল্লা, জলঢাকা,
ভিলাই, বারোহুয়ারী, বন্দাবন গার্ডেনস্, নেপাল,
দার্জিলিং, কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, অলকানন্দা, লাহোর,
করাচি...

সিনেমার ছবির মতো বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি—
একেরপর এক অঙ্ককারে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।
পিছনে পড়ে রইল দুর্গম-গিরি কান্তার মরু হস্তর
পারাবার। মহাদেশগুলির মাঠ-ময়দান। ময়দানবের
তৈরী অগণিত কারখানার আকাশচুম্বী চিমনি...

ভোর না হতেই একটা কেমন অদ্ভুত জায়গা চোখে
পড়ল

পাহারারত দূতদের দেখলাম শ্রুতগতি। ও পুরীতে
পৌঁছে গেলে আর নাকি পালাবার উপায় নেই। কাজেই
সম্মুখীন অতিথির প্রতি সতর্কতা শিথিল করে তারা
চলল একটা মাঠকোঠার দিকে এগিয়ে।

কয়েকটি আদিবাসী ধরণের পীনোন্নত পয়োধরা
বেকলেন হাসতে হাসতে। তাঁদের হাতে ভাণ্ড। তাতে
সুধা কি তাড়ি—বুঝলাম না। যমদূতেরা তাঁদের সঙ্গে
রসালাপে মত্ত হল।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে এইসব অবলোকন করছি,
সহসা কে বা কারা যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল।
দেখি এক বিপুল জনশ্রোত কোথা থেকে বেরিয়ে একটা
লোককে ধাওয়া করেছে। বিকচ্ছ লোকটি প্রাণপণে
দৌড়ছে।

দৌড়তে দৌড়তে এসে লোকটি যায় কোলে আশ্রয়
নিল, সেট একটা বিরাট দমকলের মতো গাড়ি।

বিকচ্ছ অবস্থা থেকে মুক্ত হল ভদ্রলোক। খানিকটা
দম নিল।

গাড়িটি ঘিরে অসংখ্য সশস্ত্র পাহারাদার। সবারই
পরনে খাঁকি জঙ্গী পোশাক। ইয়া বড় বড় ছুঁচলো
গোঁফ।

ভদ্রলোক অবশেষে ভাষণ শুরু করল :

বন্ধুগণ! আমি নরকের জ্যোত্স্নাল ম্যানেজার হতে
পারি, কিন্তু বাবারও বাবা আছে। আমাদের উপরও
বড় আমলা বর্তমান। উপর তলায় হামলা না করে
বন্ধুগণ, আপনারা আমার মতো এক ক্ষুদ্রের পিছনে—এই
সাত সকালে ধাওয়া করেছেন, এটা আমার কাছে এক
পরিহাসের মতো প্রতিভাত হচ্ছে। বন্ধুগণ, আপনারা
বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের পরম হৃদয়...

এই সময় কে একজন বলে উঠল, শালা এক নম্বরের
চামচে!

ম্যানেজার বলে যেতে লাগলেন, আমি আপনাদের
দুঃখকষ্ট খুবই অনুধাবন করতে পারছি। আপনাদের
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমরা অনির্দিষ্টকাল নরকবাস করব?
সময়সীমা থাকবে না? ঠিকই তো! আমিও আপনাদের
সঙ্গে একমত। কিন্তু ভাই, আপনারাই ভেবে বলুন,
আমি কী করতে পারি! মুক্তি তো গাছের ফল নয়
যে, পেড়ে দেব? আপনাদের মতো গুণবান, রূপ-
বানদের মর্তের কোনো মেয়েই আজ পেটে ধরতে
রাজি নয়। তারা ব্যবহার করছে নানা রকম কন-
ট্রাসেপটিভ। জন্মনিয়ন্ত্রণের আওতায় এনে তাদের
গৌরবাবিহীন করছেন বর্তমান গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট।

হঠাতে চাইছেন দেশ থেকে চিরদারিদ্র্য। কার পেটে আপনাদের পারমিট দেব বলুন? আগেকার দিন হলে ট্রেনের কামরার মতো নরকখানি থাকত। বেশিদিন কাউকেই এখানে পচতে হত না। তখন ছিল রাজা মহারাজা, জমিদার-জোতদার, নবাব-চোগিয়াল বংশের আধিপত্য। আজ ঠিক তার বিপরীত। সন্তান-সন্ততি বাড়ুক—এইটেই ছিল তখনকার যুগের কামনা। আজকের যুগ কিন্তু উল্টো। রাস্তা চলবারই সংস্থান থাকবে না—যদি এইভাবে জন্মহার বৃদ্ধি পায়। মর্তের মানুষ তাই সবাই সতর্ক। আমিও নিরুপায়।

তবে কী মর্তে ছেলেপুলে হচ্ছে না? লেবার-ওয়ার্ড খালি যাচ্ছে—ভিড়ের থেকে কার যেন প্রশ্ন।

লেবার-ওয়ার্ডের কথা আমি বলতে পারব না। যা দেখে স্বয়ং দৈশরও স্তম্ভিত, আমি তো সেখানে শিশু!

ম্যানেজার হাতজোড় করলেন। বললেন, তবে আমার প্রস্তাব মানলে এখন আপনাদের একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কী প্রস্তাব?

মুময়জন্ম পাবেন না। কীট হয়ে জন্মাতে হবে। এদের মায়েরা আশা করি আপনাদের পেটে ধরতে আপত্তি করবে না। অবশ্য মুরগির পেটেও জন্মাতে পারেন।

তবে তো ডিম হয়ে চুকব অবাঙালীর পেটে।

কে একজন চিংকার করে উঠল, শেম শেম! উইথডু ইয়োর অ্যাঙ্টিসোসিয়েল পলিশি।

বাঁদরির পেটেও জন্মাতে পারিস!—জনতার ভিতর থেকে কার যেন মন্তব্য।

কথাটা কানে গেল বুঝি ম্যানেজারের।

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, বাঁদরির পেট খালি পেতে পারেন। ওটা চয়েস করলে নরক থেকে মুক্তিও সম্ভব। তবে বাঁদর হয়ে জন্মানোর বিপদ আছে। আজকাল মোটা দামে বাঁদর চালান যাচ্ছে বিদেশে। কতদিন বাঁচবেন—সেটা অবশ্য বিবেচ্য। তবে নরক থেকে মুক্তির প্রচুর সুযোগ পেতে পারেন যদি আর একটা কাজ করেন।

কী কাজ?

খাটা পায়খানার গামলায় পোকা হন।

কী? এমন অপমানকার প্রস্তাব। ইন কেলাব, জিন্সাবাদ। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। আমরা অনশন করব। এর প্রতিকার চাই, প্রতিকার চাই।

সহসা যেন জনতা খেপে উঠল। গর্জনে গর্জনে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

পরমুহূর্তেই আর এক ঘটনা।—

কোথা থেকে কয়েক ডিভিসন গুণ্ডাবাহিনীর আবির্ভাব ঘটল; আর তারা ভাঙা উচিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল সত্যাগ্রহীদের উপর।

কোথায় ছিটকে পড়লাম জানি না। চোখের সামনে দেখি বিচারালয়;—গতরাতে অপ্রদীপের সময় জল তুলতে গিয়ে এক বিবাহিতা মহিলা কুয়োয় পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁর স্বামীও কুয়োয় কাঁপ দেন। কিন্তু অন্ধকারে তিনি জীকে উদ্ধার করতে তো পারেনইনি। উল্টে তিনিও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে দমকল এসে দুজনকে উদ্ধার করে। দেখা যায় জী মৃত, স্বামী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সেই জীই এখন বিচার্য্যধীন। পরনের শাড়িটা মাঝখানে জোড়া। নূতন শাড়ি কেনবার পয়সা নেই। স্বামী প্রাক্তন সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পা বিসর্জন দিয়ে তিনি ঘরে এসে বসেছেন। আজ ছ'মাস হল পেনসনের টিকি দেখা যায়নি। সতীসাক্ষী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আমার স্বামীটিকেও এপুরীতে নিয়ে আসা হোক। তাঁকে কে দেখবে?

ইনকামট্যাক্সের সম্ভ্রান্ত উকিল। অথচ প্রমাণিত হল, ইনিই সবচেয়ে বেশি কর ফাঁকি দিয়েছেন। এখন সে-টাকা আছে কোথায়? এক পরজীর সেফভল্টে। পরজী উদরে এই গুণীজনের সন্তান ধারণ করেছেন।

মেয়ে উকিল। অবৈধ প্রসবের ফলে পঞ্চদ্বপ্রাপ্তি লাভ করেছেন। বিবাহিত অবস্থায় ওকালতি করতে বেরিয়ে এক শাসালে মকেল পান। দেবদূতের মতো মকেলের চেহারা। মকেল তাঁকে ছ'তলা বাড়ির ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন।

আশ্রমের ধূতি-চাদরপরা সন্ন্যাসী। আজীবন ব্রহ্মচারী তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হল না। সংসারে আবার ফিরে যেতে হবে। বিবাহ ও সন্তানাদি শরৎ তাঁর অবচেতন মনে এখনো জাগরক। অতৃপ্ত আত্মার মুক্তি নেই। আশ্রমে থাকতে তিনি এক যুবতীর প্রতি মমতাকুটুমানস হয়ে পড়েন।

এবার এক সাহিত্যিকের পালা। গতজন্মে নাকি একে নরকস্থ করবার ব্যবস্থা ওঠে। তীব্র আপত্তি জানানোর পর বিধান হয়, উত্তরকালে পতঞ্জলি ফার্মিশারস্-এর গুরুভার এর উপর ন্যস্ত হবে। গুরুভার তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছিলেন। অসুস্থ সর্বভাগী মালিকের হয়ে কারখানাশিল্পে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে বিপত্নীক এই উদ্ভলোক ধানা-পুলিসও করেছিলেন।..... মর্মান্তিক প্লোগানের মুখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। দাঁড়িয়ে উঠে সাহিত্যিক প্রশ্ন করলেন, নরকের আর এক নাম কী পতঞ্জলি ফার্মিশারস্?

অধ্যাপকের হৃন্দরী, স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। উর্দ্ধাঙ্গে লাল কাঁচুলি কী ব্লাউজ—বোঝা মুশকিল। বিচারক একে কঠিন শাস্তি দিতে যাচ্ছিলেন। সহসা দাঁড়িয়ে উঠলেন এক মেয়ে-ব্যারিষ্টার। বললেন, হজুর, ক্ষান্ত হোন। আইনের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আপনার ওই পুরানো মূলধনের মূল্যায়ন সম্বন্ধে চিন্তা করবার দিন এসেছে। অধ্যাপকের স্ত্রীর অপরাধ কী? ইনি স্বামীকে না জানিয়ে পরপুরুষ নিয়ে পাশের ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন। দেহ বিক্রি করেছেন। কিন্তু দেহটাই কী সব? এই দেহকেই কী দেবালয়ের প্রদীপ করে তোলেননি—এই সত্যীসাক্ষী রমণী? জানি, উপরতলায়ও আজকাল বিচারের নামে বিচার-প্রহসন চলছে। উপরতলার প্রতি ভাই আজ কারো আস্থা নেই। তবু বলব, ষাঁকে তিরস্কার করছেন, তাকে পুরস্কৃত করা উচিত। পুরস্কার দেবার মন, ক্ষমতা কজনের আছে? বিশেষ করে নিজেই যে প্রার্থী। ভার্য্য মনোরমাং

দেহিং মনোরমাতানুস্মরীম্—সে অর্থে ইনি কী মনোরমা ভাবা ছিলেন না? পঙ্কস্বামী—উত্থানশক্তি রহিত, তবু তাঁর একান্ত ইচ্ছা, তাঁর লেখা দর্শনের বইগুলি প্রকাশিত হোক। একে একে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এক এক খানির দাম ২৫-৩০ টাকা। সে সব বইয়ের পাঁচকপি দোকানে জমা দিয়েও আসা হয়েছে। কোথাও একটি কপিও আজ অবধি বিক্রি হয়নি। অথচ অরুণ বলে বড়লোকের যে ছেলেটি এসে অধ্যাপকের হাতে বইবিক্রির দরুণ গোছা গোছা টাকা তুলে দিয়েছে, অধ্যাপককে সানন্দে বাঁচবার প্রেরণা যুগিয়েছে, সেই ছেলেটির যদি মনো-বাসনা একটু পূরণ করা যায়ই, তাতে অপরাধ কোথা? স্ত্রী যা করেছেন, সে তো একান্ত হয়ে তাঁর স্বামীর জন্মেই। বেচারার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন দেখি, অসহায় শিশুর মতো স্বামীর কথা ভেবে আজ এর কী অবস্থা!

স্ত্রীর দিকে তাকাতে হল। কাজলটানা হৃন্দর দুটি চক্ষু জবা ফুলের মতো লাল। তা থেকে ঝরে পড়ছে নিটোল মুক্তার মতো হুঁগালে অশ্রুবিন্দু।

এতেও সন্দেহ প্রকাশ করলেন মালিকপক্ষের অ্যাডভোকেট : এ কান্না কী সত্যই স্বামীর উদ্দেশ্যে?

বক্তা দণ্ডপাণি দে সরকার থামলেন।

আমরাও বুঝলাম, যাবার সময় হল।

কিছুদিন আগে সাংবাদিক দণ্ডপাণি দে সরকার আট ঘণ্টার জন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্মশানে মুখাঘ্নি করার সময় তিনি হেসে জেগে ওঠেন। সময় না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নাকি ভুল করে ওপুরীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল!

বিখ্যাত সাংবাদিক এই দণ্ডপাণি দে-সরকার পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। যেটা বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে ওপুরী।

দয়াময় দৈবের তাঁর-সে ইচ্ছাও পূরণ করেছেন।

জাল

ফণিভূষণ বিশ্বাস

স্বতোর মতো ধোঁয়া। পিংগল, নীল, বিবর্ণ।
পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছে। বাঁশ দিয়ে চিতার
আঙুন খুঁটিয়ে দিয়ে প্রাণহরি আনন্দ মালোর পাশে এসে
বসলো।

চিতার জলন্ত আগুনে ঝলসানো সৌদামিনীর
বিকট মুখখানার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলো প্রাণ
হরি।

—কি রে, একেবারে চুপ মেরে গেলি যে, ব্যাপার
কি? গাঁজার কলকেটায় রামটান দিয়ে প্রাণহরির দিকে
এগিয়ে দিল আনন্দ। বল্লে : নে, নে একটু মৌতাত
করে নে, সারা দিন যে খাটা খাটুনি গিয়েছে।

—না, ভাই ওসব থাক। ধূমায়িত কলকেটা মাটির
উপর নামিয়ে রাখলো প্রাণহরি। বল্লে : আজ ওসব
কিছু ভালো লাগছেনা, ছুঁড়িটার জন্তে...

—থাক, থাক, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে।
কলকেটা চট করে হাতে তুলে নিলো ভক্ত। বার দুই
টান দিয়ে বল্লে : তা' হলে যা, শুনেছিলাম তা মিথ্যে
নয়। ছুঁড়িটা গাঁ-সুন্ধ মজিয়ে ছিল। তা' না হলে অত
রূপের দেমাক, লোকের মাথায় পা দিয়ে হাঁটতে
পারে।

—কি বাজে বকছিস, ভক্ত। প্রাণহরি আপত্তি
জানালো। বল্লে : ঠাক্ যা, জানিসনে, তা নিয়ে কথা
বলতে আসিস নে। সৌদামিনী যে, কি ছিল, তা
জানলে, মুখ দিয়ে ওকথা উচ্চারণ করতে পারতিনে।
তুই ভিনগাঁয়ের লোক, তার সম্বন্ধে কতটুকু জানিস
বলতো?

—ভিনগাঁর লোক মানে? ভক্ত রুখে উঠলো।
বল্লে : তোর চেয়ে ঢের বেশী জানি। ও ময়নাডাঙার
রতি হালদারের মেয়ে নয়? আমার বড় সম্মুন্দির বন্ধু
রঘুদার কাছ থেকে ওর কীর্তি কলাপের কথা শুনে
আর বাঁকি নেই। নে, নে মা'র কাছে আর মাসীর গল্প
করতে হবে না। এই তো ওর নিজের দেওয়ার আনন্দ
রয়েছে; ওর সামনেই ভজিয়ে দিচ্ছি আমার কথাটা
মিথ্যে, কি সত্যি।

—মিথ্যে মানে? গাঁজার কলকেয় টান দিয়ে
আনন্দ মালো বল্লে : একেবারে আগা গোড়া সত্যি।
গেরস্থ ঘরে অত কেলেকারী কী নয়? শেষ পর্যন্ত দাদাকে
সাবধান করে দিয়ে বল্লাম তুখ দাদা, তোমার বৌ-এর
স্বভাব টভাব কিন্তু সুবিধে গোছের মনে হচ্ছে না; রোজ
ঘাটে গিয়ে পাড়ার ছোঁড়াগুলোর সংগে যা ঠাট্টা
তামাসা আর বেলেল্লাপনা করে, তাতে বংশের মুখে
চুণকালি পড়বে। সময় থাকতে ওকে একটু শাসন
করো। কথাটা শুনে দাদাতো আমার উপর মহা
খাপ্লা। বল্লে : ছোট মুখে বড় কথা বলিস নে, আনন্দ।
ও পাণ মুখে আর হরিনাম শুনে চাইনে।

—চুপ কর শয়তান। প্রাণহরি মার মুখো হয়ে
উঠলো। বল্লে : তোর দাদা মানুষ ছিল রে, তাই
বিবাদ না করে ভেলো হয়ে গিয়েছিলো। আমি হলে
তোর জিভ কেটে দিতাম, যাতে আর ও মুখে এতগুলো
জলজ্যন্ত মিথ্যে কথা বলতে পারতিনে।

—কি বলি, আমার জিভ উপড়ে দিবি? চীৎকার
করে উঠলো আনন্দ মালো। কোমরে গামছা কষতে
কষতে বল্লে : তবে রে শালা, আজ তোকে খুনই
করবো।

—আয় দেখি তোর বুকের পাটা কত। সরোবে
একটুকরা চেলাকাঠ উচিয়া ধরলো আনন্দ মালোর
মাথার উপর।

—অ্যা! হচ্চকিয়ে পিছিয়ে গেল আনন্দ। ভয়ে
মিনতি করে বল্লে : দোঁহাই প্রাণহরি, আর
খামোকা হাংগামা বাধাস নে।

—খামোকা মানে? আগে ঐ মুখ দিয়ে রক্ত তুলে
তবে ছাড়বো।

ভক্তকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বীরদর্পে
এগিয়ে এলো রঘুনাথ। —ব্যাপার কি প্রাণহরি?
আনন্দ, ভক্ত আর প্রাণহরির সামনে এসে দাঁড়ালো
রঘুনাথ। প্রাণহরিকে নিরস্ত্র করে বল্লে : ছিঃ মৃত-
দেহ সংকার করতে এসে বিবাদ করতে আছে ভাই?
ওতে যে মৃতের আত্মার অমংগল হবে।

—দেখ, দেখি রঘুদা। প্রাণহরি যেম সালিসি মানতে চায়। বল্লো : শয়তানটা বলে কিনা...

—থাক ভাই, আর নালিশে কাজ নেই। রঘুনাথের গলাটা কেমন মেন করণ শোনালো। বল্লো : শেষ পর্যন্ত বেদো বৈরাগীর মত কিপ্লনের কাছ থেকে সংকারের টাকাটা আদায় করা গেল আর কি। কিন্তু টাকা আনতে গিয়ে তার মুখে যা শুনলাম, তাতে চোখ ফেটে জল আসে, প্রাণহরি। সৌদামিনী মুখ বুজে নিঃশব্দে কী দুঃখ কষ্টই না সহ করেছিলে,। না খেতে পেয়ে তিল তিল করে শুকিয়ে মরলো, তবু তার কাছ হাত পাতলো না। পাছে ইজ্জৎ খোয়া যায় এই ভয়ে মুখফুটে কাউকে কিছুই জানাতে পারলে না ; এমন কি বুক ফাটলেও তার মুখ ফুটলোনা, ধৃতি মেয়ে মানুষ বটে।

—বলো কি রঘুদা ? অবাক হয়ে ভক্ত রঘুদার দিকে জিজ্ঞাস্য নয়নে ফিরে তাকালো। শুধালো : সৌদামিনী না খেতে পেয়ে মরছে, কৈ সে কথা তো শুনিনি।

—খবরটা আমারও জানা ছিল না, ভক্ত। বেজো বৈরাগীর মুখ থেকে এই মাত্র শুনে এলাম। না, সামান্য মালোর ঘরেও যে এমন সতীলক্ষ্মী জন্মায়, ছুঁড়ি তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল।

—কি রকম ? প্রাণহরি উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বল্লো : শুনিয়ে দাও তো রঘুদা, এই হতভাগা আহা-মুকদের মুখ বন্ধ হোক।

—শুনলে, অনেকেরই মুখ বন্ধ হবে প্রাণহরি। রঘুনাথ মন্তব্য করলে : অন্তিম শয্যায় একটি মাত্র অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলো সৌদামিনী। তখন ওর কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, অতি কষ্টে বল্লো : রঘুদা, আমার তো কাণকড়িও নেই, কি দিয়ে মৃত দেহ সংকার করবে ? ঐ যে খাবলা জালটা বাতায় গাঁজা রয়েছে, ওটাই আমার শেষ সম্বল। প্রাণ থাকতে হেটাকে চোখের আড়াল করতে পারিনি, আজ স্বেচ্ছায় সেটাই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি রঘুদা। এই পুরানো সামান্য জালটা কে কিনবে বলো ? তবে বেজো ঠাকুরের কাছে গেলেই নিশ্চয় এর জ্বায্য দাম পাবে। আর একটি

কথাও বলতে পারি নি সৌদামিনী। যন্ত্রনা কাতর অসহায় চোখ দুটো তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিলো সৌদামিনী।

—তা'হলে জালটার প্রতি খুব আকর্ষণ ছিলো সৌদামিনীর। প্রাণহরি জিজ্ঞাসা করলে।

—নিশ্চয়। রঘুনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বল্লো : সাধারণের কাছে একটা জাল, অতি তুচ্ছ, সামান্য জিনিস হতে পারে, কিন্তু জেলের ঘরে সেই তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ওটা নিয়ে যেতেই বেজোঠাকুর বল্লো : জান রঘুনাথ, এই জালের ইতিহান ?

—কৈ না তো ? রঘুনাথ উত্তর দিলে।

—তবে শোন। বৈরাগী শুরু করলে। ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরেই সৌদামিনীর স্বামী মারা যায়। তখন সামান্য ভাগ বাঁটোয়া নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই পয়মন্তর জালটা ছিলো সৌদামিনীর স্বামী নিজের হাতের তৈরি। ও জাল ফেলে কেউ কোনদিন নিরাশ হয়নি ; যখন যে নদীতেই ফেলনা কেন, মাছ ধরা পড়বেই পড়বে।

ও জালটার উপর আনন্দেরও ছিল খুব লোভ। অনেকবার জালটা চুরি করে আত্মসাৎ করবার চেষ্টাও করে ছিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌদামিনীর সতর্ক পাহারায় ওটা ছাতছাড়া হয় নি। কাজেই ওটাকে উপলব্ধ করে ভাইয়ে ভাইয়ে বোঝিয়ে কলহ শুরু হলো বিতীভাবে।

শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভাগ হয়ে রেহাই পেল সৌদামিনী। কিন্তু ভাগ্য তাকে রেহাই দিল না।

স্বামী যখন মারা গেল, তখন রূপ যৌবন নিয়ে একেবারে অবলম্বনহীন, অসহায় হয়ে পড়েছিল সৌদামিনী।

ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্ত ভাইয়েরা কয়েক বার এসে ছিল, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর ভিটের মায়া ত্যাগ করতে পারলো না। কোনক্রমে মাথা গুঁজে রইল সৌদামিনী ! তার রূপ যৌবনের প্রতি অনেকেরই লোভ ছিলো। কিন্তু যখন তাদের লালসা চরিতার্থ হলো না, তখন তারা ওর নামে কুৎসা রটালো।

আমিও অবশ্য সে দলের একজন পাণ্ডা ছিলাম। আজ সে কথা বলতে কোন লজ্জা নেই রঘুনাথ। ওকে পাওয়ার জন্ত মনে মনে কত কামনা করেছি। ভেবে ছিলাম যদি কোন রকমে সৌদামিনীকে সেবাদাসী রূপে পাই তো, আখড়ার চেহারা ফিরে যাবে।

সে এক পরীক্ষা গেছে। ভীষণ অগ্নিশ্রীক্ষা। কিন্তু সে মানবিক দুর্বলতার হাত থেকে সৌদামিনীই আমাকে রক্ষা করেছিলো। তা হলে আজ তোমাদের এ ব্রজ বৈরাগীকে খুঁজে পেতে না, রঘুনাথ। সে রাতের কথা জীবনে ভুলতে পারবো না। আজও মনে হলে অনুশোচনায় বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়ে উঠে।

সেদিন ছিল দারুণ দুর্ভোগ। বাইরে ঝামঝাম করে বৃষ্টি পড়ছে। উদ্বেজনায় উন্নত হয়ে দরজার ঝাপ সরিয়ে এক মুহূর্তে সৌদামিনীর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িলাম।

ভেবেছিলাম শয়ন কক্ষেই তার দেখা পাবো। কিন্তু শয়ন কক্ষে ঢুকে দেখি শূন্য শয্যা। পাশের ছোট ঠাকুর ঘরের দিকে এগিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে ঘেঁষের উপর একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে বাতায় গোঁজা একটা খাবিলা জালের কিয়দংশ ঝুলছে। জালের সেই অংশটা ধরে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী থেকে থেকে বিড় বিড় করে বলছে : ঠাকুর! আমার মান ইজ্জৎ রক্ষা করার শক্তি দাও। কোন অভাবের তাড়নায় যেন.....

তার কথা আর শেষ করতে দিলাম না।

পিছন থেকে আচমকা তার একটা হাত চেপে ধরলাম। সবেগে নিজের দিকে সবলে আকর্ষণ করলাম। তথাপি ভয় পেল না সৌদামিনী। নিশ্চল নিথর শিলা খণ্ডের মত হুড়মুড় করে পায়ের উপর এসে পড়লো।

—অভাগী মেয়ের সর্বনাশ করো না, বাবা। মিনতি কাতর কণ্ঠে সৌদামিনী যেন ফুঁপিয়ে উঠলো। ভিজ ভিজ গলায় বলে : আশীর্বাদ কর যেন তোমাদের কিরপায় আমি যেমনটি আছি, ঠিক তেমনটি থাকতে পারি। কোন দুর্বলতাই যেন আমার মাথা হেঁট করতে না পারে। এমন কি রঘুনাথও না। যত দিন আমার ঘরে তাঁর গন্ধত সম্পদ আছে, তত দিন আমি যেন ঠিক থাকতে পারি।

বলতে বলতে সৌদামিনী মুহিত হয়ে পড়লো। তার বরফের মত অংশ স্পর্শ করে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো।

ভাবলাম : সর্বনাশ। শেষ পর্যন্ত কি খুনের দায়ে পড়তে হবে? ভয়ে ভয়ে তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। একটু পরে সে জ্ঞান ফিরে পেলো। এক জোড়া অশ্রু সজল চোখ তুলে আমার দিকে চাইলো। সে কি মিনতি কাতর চাউনি। বলে : ঠাকুর তুমি যখন আমাকে বাঁচিয়েছে, তখন, দরকার হলে, আর একটু উদ্ধার করতে হবে। কী পারবেনা?

—নিশ্চয়। আমি উত্তর দিলাম। বললাম : বলো কি করতে হবে।

সময় হলে জানতে পারবে ঠাকুর। সেদিন কিন্তু এই অভাগী মেয়েকে একটা ভিকে দিতে হবে, বিমুখ করতে পারবে না।

কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভিক্ষার জন্ত সৌদামিনী হাত পাতেনি। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মারছে। তবু কাউকে কোন কথাও জানতে দেয় নি। আমি যতবার তাকে টাকা কড়ি দিয়ে পাঠিয়েছি, সে তত বারই ফেরৎ দিয়েছে। কিছুই গ্রহণ করেনি। আজ তাই তার শেষ সম্বলের বিনিময়ে ওর সংস্কারের টাকা দিচ্ছি। নিয়ে যাও রঘুনাথ।

বৈরাগী আমার হাতে একটা দশ টাকার নেটপুঁজে দিয়ে বলে : আজ এই দিয়ে আমার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। অতি সন্তর্পণে বৈরাগী মালটা হাতে করে তুলে রাখলো।

রঘুনাথের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এলো। তখন চিতার আগুন প্রায় নিভে এসেছে। অনেকক্ষণ পরে প্রাণহরি বলে : আহা। বেচারী মরলো, তবু মর্যাদা হারালো না। ঐ দেখ এখনো তার বুকের হাটাকার থামেনি। ধোয়ার মধ্যে থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

কী আশ্চর্য।

সকলেই চেয়ে দেখলো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া সৌদামিনীর বুকের পাঁজর থেকে ধোয়ার-কুণ্ডলী যেন জালের মত ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়তে। বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগে একটা কম্পন জাগছে ধোয়ার জালে। ওটাই যেন অস্তিমের শেষ মিনতি।

‘প্রবর্তক’ পত্রিকার ৬০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

শ্রী ইন্দুভূষণ রায়, প্রবর্তক সঙ্ঘ

প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলালের প্রেরণা জাগে “প্রবর্তক” পত্রিকা প্রকাশের এবং কার্যাতঃ তিনিই ইহা প্রকাশ করেন। সঙ্ঘঘাতৃকা দেবী রাধারানীর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ রবিবার পরলোকগমনের পর সঙ্ঘগুরু তাঁর রচিত “জীবন সঙ্গিনী” গ্রন্থে পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা ও ইহার রূপায়ণ বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছেন। (‘জীবন-সঙ্গিনী গ্রন্থ’, ৩য় সংস্করণ রাসপূর্ণিমা ১৩৭৫ বঃ, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮)। তিনি লিখেছেন :

“শ্রীঅরবিন্দর পণ্ডিচেরী চলিয়া যাওয়ার পরেই ১৯১১ ও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে একখানি হাতের লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম। উহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘সনাতনী’। ইতঃপূর্বে আর একখানি হাতের লেখা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। সেই সময় বিদেশ হইতে অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার আমাদের নিকট আসিত। ‘তলোয়ার’ বলিয়া একখানি ইংরাজী কাগজ আমার নিকট নিয়মিত ভাবেই আসিত। শ্রামজী কৃষ্ণবর্মা ছিলেন ইহার সম্পাদক। আমার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ইহাদের চিন্তাধারার সহিত খাপ খাইত না। যে সকল তরুণ আমার ছাত্র-সভায় মানুষ হইতেছিল, তাহাদের মস্তিষ্ক পাছে এইসকল পাশ্চাত্যপ্রভাবযুক্ত বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ সংক্রামিত হয়, তাহার জন্ত আমি হস্তলিখিত মাসিক পত্র বাহির করি। উহার নাম ছিল ‘দেবভূমি’। এই কাগজখানির চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এইজন্য গোপনে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করার ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রেসের ব্যাপার আমাদের কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু কোন বিষয়েই আমাকে একজন পশ্চাৎপদ হইতে দিতেন না। সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না হইলেও অভিজ্ঞতা অর্জন হইতে বঞ্চিত হই নাই। শিশু যেমন মাথা তুলিয়া ঠাঁড়াইবার পূর্বে বার-বার ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, আমার অবস্থাও বহুবার

এইরূপই হইয়াছে। প্রেসের চিন্তাও আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। কিছু টাইপ খরিদ করিয়া একটি কাঠের যন্ত্রে ‘দেবভূমি’ ছাপিবার চেষ্টা করিলাম। এক পৃষ্ঠা অতি ক্ষুদ্র ‘দেবভূমি’ টাইপ সাজাইয়া ছাপিতে ১০।১২ দিন সময় কাটিয়া গেল। এই কর্ম হইতে বিরত হইলাম।……কাঠের কারখানা (১)* প্রবর্তন করার পর পত্রিকা প্রচারের পূর্ক প্রেরণা নূতন আকারে আমায় চাপিয়া ধরিল। কারবারের বৈশাখী নূতন খাতায় যে ছের উঠিল, তাহাতেই বুঝিলাম—কারবার চলিবে ভাল। এই ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নাই। প্রচার-জ্ঞাত মুসিদ্ধ করার জন্তই চিন্তা শুরু হইল।

“আষাঢ়ের আকাশ যখন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন—বারিপাতে নিদাঘের ক্রান্তি হরণ করিতেছে, বর্ষণধারার তায় উদ্ধলোক হইতে বাণী প্রচারের সিদ্ধান্তভূতিই আমায় অভিযুক্ত করিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে প্রায় সকলেই তখন জুল বা কলেজের ছাত্র। রবিবাসরীয় সভায় সাহিত্যচর্চা কম হইত না। একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারের সম্বল সকলেই সমর্থন করিল। পত্রিকা-খানি পাক্ষিক করিতে হইবে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল। নামকরণ লইয়া সমস্তার অন্ত রহিল না। কেহ বলিল, দেশের এই দুর্দিনে ইহা খণ্ডোতের মত ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুরূপ হইবে। অতএব ইহার নাম ‘খণ্ডোত’ রাখা হউক। একজন বলিল, দেশের ভণ্ডামী দূর করার জন্য এই পত্রিকাখানিতে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইবে, ইহার নাম ‘সম্মার্জনী’ রাখা হউক। কয়েকজন পূর্ক প্রেরণার স্মরণ ধরিয়া জানাইল, নাম তো আছেই ‘সনাতনী’ অথবা ‘দেবভূমি’, এই দুটোর মধ্যে একটা দিলেই চলিবে। ‘সনাতনী’ কথাটা অনেকের পছন্দ হইল না। উহারা তাহার মধ্যে প্রাচীনতার সংস্কার বাহির করিল। আর দেবভূমি নামটা বড় বাড়াবাড়ি ধরনের হয়। নাম লইয়া সারাদিন আলোচনা চলিল। আমার চিন্তার তরঙ্গ উঠিল।...

“পত্রিকা বাহির করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু

কি তার নাম হইবে, তাহা জানি না। তাহা ভগবান তখনও জানান নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি-যন্ত্র শুরু হইল। বন্ধুরা আলোচনার স্তর রাখিয়া গেল। আমার বাহির-ভিতর কিন্তু মৌন-নিখর হইয়া পড়িল। তারপর দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলাম। রাত্রির শেষ অংশটি আমার নিকট অতি লোভনীয়। নিরুপম পৃথিবীর কোলে বসিয়া এই সময়ে উর্দ্ধলোক হইতে যে অমৃতের বর্ষণ হয়, তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি। ধীরে ধীরে পূর্বদিকে আলোর ঝরণা ঝরে, পাখীর কণ্ঠে প্রথম বন্দনা-সঙ্গীত উঠে। পল্লীতে প্রথম জাগরণের সারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই। ইহা আমার স্বভাবগত ধর্ম। সেদিনও ইহার অন্যথা হয় নাই। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, নিস্তর সমাহিত চিত্তে অন্ধকারে বসিয়া আছি। অন্তর্জগতের দ্যূর যেন উন্মুক্ত হইল। মুম্বিত চক্ষেই দেখিলাম—কয়েকটা জ্যোতির্ময় অক্ষর। সে অক্ষর কয়টা পর পর সাজান রহিয়াছে। বজ্রাক্ষরে নহে, দেবনাগরী অক্ষরে প্রবর্তক। “প্রবর্তক” এই শব্দটা সুস্পষ্ট দেখিলাম। চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল—আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিন্তু স্থির ঋজুভাবে বসিয়াছিলাম। হটুক স্বপ্ন, অন্তর্দেবতার নির্দেশ এইভাবেই আসিয়াছে। আমি সেইদিন সাময়িক পত্রিকাখানির নাম ‘প্রবর্তক’ হইবে, সকলকে জানাইলাম। কথাটা সকলেরই ভাল লাগিল, নূতন মনে হইল।

“কথার সঙ্গেই কাজ। স্বার্থের হিসাব করিয়া আজ পর্যন্ত কাজ করিতে পারি নাই। এই হিসাব উছই রহিল। প্রবর্তকের এক ‘অনুষ্ঠানপত্র’ (২) রচনা করিলাম। রয়েল ৮ পেজী ১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক মূল্য সডাক মাসুল সমেত ২৮ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নগদ এক আনা। অনুষ্ঠান-পত্রটি বাহির করিয়া বলা হইল—ইহা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট বাহির হইবে। (শ্রীঅরবিন্দের জন্ম তারিখ)। কিন্তু যথা সময়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়ায় উহা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বাহির হয়। কাঠের কারখানায় রামেশ্বরের মন বসে নাই। রামেশ্বরকে এই

পত্রিকার পরিচালক করা হইল। আমার আর এক সহকর্মী চির স্নহমণীন্দ্রনাথ নায়েককে ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হইল (৩)। কাগজ বাহির করিয়াই এই কথা শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে জানাইলাম। আমি যে এখন তন্ত্রসাধনা ছাড়িয়া বেদান্তে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, একথাও জানাইতে ভুলিলাম না। তিনি কয়েকদিন পরে জানাইলেন “You have done well in confining yourself to Vedantic Yoga”... ‘বেদান্ত যোগে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া ভালই করিয়াছ।’ প্রবর্তক-এর তৃতীয় সংখ্যা পাইয়া তিনি লিখিলেন—“T last number was very good”—ইহার উপর আরও জানাইলেন “you must not mind, if you do not get always a written answer. The unwritten will always be there”. ‘সর্বদা লিখিত উত্তর না পাইলে ভাবিও না, ঐখানেই আমার অলিখিত উত্তর নিত্য পাইবে।’

“দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতের কলম চলিল। ভাবিতাম—আমি যন্ত্র, যন্ত্রী আমায় লিখাইতেছেন।...”

* * *

প্রবর্তক প্রকাশ হওয়ার কিছুকাল পর স্বদেশী ও বিপ্লবযুগের নির্যাতিত দেশনেতা চন্দ্রনগর নিবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন—“প্রবর্তক আমাদেরই কাগজ। আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই through দিয়ে ভগবান মতিকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন। spiritual হিসাবে আমারই লেখা।” ১৯২০ খ্রী)।

শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি প্রবর্তকের ৫ম বর্ষের ৮ম সংখ্যার (১৫ বৈশাখ, ১৩২৭) প্রচ্ছদপটে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং একাধিকক্রমে কিছুকাল শ্রীঅরবিন্দের নাম সহ মুদ্রিত হওয়ায় সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কোলকাতরার একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী প্রবর্তক পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখকের দর্শনার্থী হয়ে চন্দ্রনগরে উপস্থিত হন। সম্পাদক মনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ফলে তিনি তখনই বুঝে নিলেন—এই লুপ ‘নামঘাট’ মাত্র, ‘পারঘাট’ দর্শনার্থী আমি, অর্থাৎ

প্রবর্তকের য-নামী লেখক সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের সঙ্গেই দর্শনাভিলাষী হয়ে এসেছিলেন।

‘প্রবর্তক’ পত্রিকা প্রকাশের তারিখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রবর্তক-এর প্রকাশ—১৫ ভাদ্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে (১৩২২, ১৪ ভাদ্র হইতে ১৩৮১ বঃ, ১৯১৫ হইতে ৩১ আগষ্ট ১৯৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত)—৫৯ বৎসর প্রবর্তক পত্রিকার জীবনকাল অতিক্রান্ত। ৬০-তম বর্ষে শদাৰ্পণ করিয়াছে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর হইতে।

সমাজের অন্ধতা, ইংরাজ ও ফরাসী, দুই প্রবল প্রতাপ রাজশক্তির প্রচণ্ড সংশয় ও বিরোধিতা, আঘাত, নির্যাতন ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও অনাহত গতি রক্ষা করিয়াছে—সকল বাধা নত হইয়াছে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমতিলালের অদম্য সঙ্কল্পের সম্মুখে।

প্রবর্তক প্রথম মুদ্রণ হয় চন্দ্রনগর উদ্ভিৎজারের এক মুদ্রালয়ে। তৎপরে ‘কোরাল প্রেসে’—ইহার পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব মুদ্রালয় ‘সাধনা প্রেস’-এ। ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত ইহা পাক্ষিক পত্রিকা-রূপে প্রকাশ হইয়াছে এবং মনীন্দ্রনাথ নায়েক ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই বৎসর পর্য্যন্ত বহু প্রবন্ধাদি অ-নামী প্রকাশ হইত। অনেক প্রবন্ধ শ্রীমতিলালেরই রচনা ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতিলালের উক্তি—

“বৈপ্লবিক কর্ম হইতে অন্তরটা মুক্তি পাওয়ায় চিন্তার জগৎ যে গুরুভারে এতদিন রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ লঘু হইল। অভিনব চিন্তাপ্রোতের সহিত অতীতের নিপাড়িত প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। সাবলীল সাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অবকাশ ক্ষেত্রে গুরুচিন্তার সঙ্গে অনেক সময়ে মাধুর্যের কর্মকান্ত হৃদয়টা রসাতলিষিত করিয়া দিতেছিল। প্রবর্তকের পাতায় পাতায় সাহিত্য-তুলিকায় সে ছবি যেমন আঁকিতেছিল, ম, পত্র-পুষ্পে, ভাগীরথীর পূত-প্রবাহে, পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়ার মধ্যে শ্রী-সুখমার মধুর স্পর্শ তেমনি অনুভব করিতেছিলাম। সেদিনের অন্তর-পরিবর্তনের স্মৃতি-চিহ্ন প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এখনও কালির অক্ষরে লেপিয়া আছে।” তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—

“জীবনে চলিতে চলিতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই গতি পরিবর্তন করিতে হয়, আমাকেও আজ গতি-পরিবর্তন শ্রেয়ঃ করিতে হইল। যাহার জ্ঞান সর্বস্ব-ত্যাগ, মাথায় কলঙ্কের ডালি, নির্যাতন, অপবাদ, দারিদ্র্য আভরণ করিলাম, সে যে ভীষণ বোঝা হইয়া মরণের পথেই লইয়া চলে। ক্লান্ত দেহ বিশ্রামাশায় শীতল ছায়ার সন্ধান করে, তবুও ‘আগে চল, আগে চল’ বলিয়া কে যেন ডাকিতে থাকে। আজ চাই শান্ত, সংযত তপঃপূত নবজীবন।

“অন্তরে-অন্তরে অভিনব-শক্তির ফল্গুপ্রবাহ বহিতেছিল তাই সেদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলাম, ‘জড় শক্তির আশ্বাস পরিহার করিব, ভগবচ্ছক্তির আশ্রয় লইব। কামের আবর্ত হইতে প্রেম-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিব। জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইব। জ্ঞান-শক্তি-প্রেমেই দেশ আমার স্বর্গ হইবে, অমরার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। সোণার দেশে সোণার গৌরাদ্ধ নাচিবে। আশুনের মত মর্মভেদী আমার বাণী-মস্তুর প্রচার দেশবাণী হইবে। জাতি পরিগ্রহ করিবে নূতন জন্ম। মুক্তি-সাধনার এই নূতন ব্রতে জাতিকে দীক্ষা দিবে।’ এই মস্ত্রে কত কথা প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রে বাহির হইত। কত তরুণ নূতন স্বপ্ন বুকে বাঁধিয়া নূতন আবেগে ছুটিয়া আসিত!” (জীবন-সঙ্গিনী গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৭)।

৬ষ্ঠ বর্ষের সমাপ্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে শ্রীমতিলাল লিখিয়াছেন—“প্রবর্তক ছয় বৎসর ধরির। নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইতে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছে তা আর বলিবার নয়। প্রবর্তক-পাঠকদিগের উপর রাজ-কর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র দৃষ্টি থাকায়, অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও প্রবর্তক লইতে পারিতেছে না। তাহার উপর প্রবর্তকের ভাব ও ভাষা প্রচলিত চিন্তাধারা হইতে একেবারে নূতন বলিয়া পাঠক সৃষ্টি করিয়াই আমাদের প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে। ভগবানের রূপায় আজ আর আতঙ্ক নাই এবং প্রবর্তক অন্ততঃ এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট বোধগম্য হইয়া উঠায় পাঠক সংখ্যাও প্রতিদিন অসম্ভবরূপে বাড়িয়া

মাইতেছে। আমরা এই অবস্থায় প্রবর্তক মাসিক আকারে বাহির করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

“অনেকেই মাসিক সংস্করণে ইহার বিশেষত্ব হানি আশঙ্কা করিয়াছেন, আমাদের কিন্তু সে ভাবনা নাই। প্রবর্তকের জীবন আরম্ভ হইয়াছে বিপ্লবের অগ্নি-পরীক্ষায়। যে নূতন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছিলাম—যে প্রেরণা উপর হইতে নামিয়া ব্যর্থ জীবনপথে আলো ঢালিয়া দিয়াছিল, সেই দৈবী নির্দেশ দিতে গিয়া কিন্তু আজও তার শেষ হয় নাই। প্রবর্তক কেবল মনের খোরাক জোগাইয়া তৃপ্ত নহে, প্রবর্তক চাহে কিছু গড়িতে। এই ছয় বৎসর প্রাণপাত প্রচেষ্টা, তার অতি ক্লিণ আভাষ মাত্র। অতএব প্রবর্তকে নূতন জাতির জীবনগঠনের অজস্র মাসিক উপাদান যে পাইবে, সে বিষয়ে আমাদের দিক্ দিয়া এক বিন্দুও সংশয় নাই...”

৭ম বর্ষ, মাঘ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ—মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর হইতেই শ্রীমতিলাল রায় ইহার সম্পাদক হন। ৭ম বর্ষেই বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের জীবনী, প্রেমের কবি চণ্ডীদাসের অপূর্ণ সাধন-জীবন-রহস্য অবলম্বনে চণ্ডীদাস (নাটক) ও অত্যাচার এইরূপ দার্শনিক ও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবন-চরিত আলোচিত প্রবর্তককে আরও গৌরবময় করে তুলেছিল। ৯ম বর্ষে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপান থেকে প্রেরিত ‘রাসবিহারীর আত্মকথা’ প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে “কানাইলাল” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে যায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণও নিঃশেষে বিক্রয় হয়। ব্রিটিশ সরকার এই পুস্তক নিষিদ্ধকরণ (proscribed) করে। চণ্ডীদাসও পরে বহু পুস্তকাকারে বাহির হয়। স্বদেশী যুগের সুবিখ্যাত নেতা ও পরবর্তী জীবনে প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীজীর মন্ত্র-শিষ্য বিপিনচন্দ্র পালের রচনা ‘যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ’ প্রকাশিত হতে থাকে এবং উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

প্রবর্তক পত্রিকা ও প্রবর্তক সজ্জের উপর ব্রিটিশ ও ফরাসী রাজশক্তির প্রকোপঃ

৯ম বর্ষের (১৩৩০ বঃ মাঘ—১৩৩১ বঃ পৌষ, ডিসেম্বর ১৯২৪-২৫ খৃঃ) ১২-শ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর ফরাসী ও ব্রিটিশ-রাজশক্তির নির্যাতন আরম্ভ হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধাদি বিপ্লব-নীতির সমর্থকস্বচক সংশয়ে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলালকে চন্দননগরের ফরাসী এড্‌মিনি-স্ট্রেটর (Administrator) রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে তাঁর প্রতি অসৌজন্য ও হুঁস্বাবহার করেন। এই সংবাদে তদানীন্তন Amrita Bazar Patrika, Forward, Servant, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, হিতবাদী, বৈকালী, আত্মশক্তি, সারথি, স্বরাজ, ভারতবর্ষ, মোহাম্মদী, বাঁশরী প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।

ফরাসী সরকারের দণ্ডাদেশে—তিন মাসের জন্য প্রবর্তক প্রকাশ বন্ধ হয় (৪)। পুনরায় প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ও সজ্জের ‘সাধনা প্রেস’ হইতে মুদ্রিত গ্রন্থাদি, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র যাবতীয় মুদ্রণ-লিপি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফরাসী চন্দননগর হতে ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। (৫) কলিকাতায় প্রবর্তক পত্রিকা, প্রেস ও সজ্জের অর্থপ্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিতঃ

ফরাসী সরকার রাজনৈতিক সংশয়েই ৯ম বর্ষের ১২-শ সংখ্যা পৌষ মাস হইতেই (১৪ জানুয়ারী ১৯২৫ খৃঃ) প্রবর্তক পত্রিকা তিন মাসের জন্য বন্ধ করার নির্দেশ প্রেরণ করে ও দণ্ডপর্ব উত্তীর্ণ হতে না হতেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ পত্রিকা ও প্রবর্তক প্রকাশ বিভাগের পুস্তকাদি চন্দননগর হইতে Sea Customs Act অনুযায়ী ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলে সজ্জগুরু নির্দেশে সজ্জের বীরবল্ল নবজীবনের প্রতীক প্রবর্তকের জয়-পতাকা হস্তে ফরাসী চন্দননগর হইতে মহানগরীর বুকে আসিল এপ্রিল মাসে, ১৩৩২ বঃ বৈশাখে এবং নবীন কেন্দ্র স্থাপন করিল কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) দক্ষিণ দিকস্থ ৬৬ নং মাণিকতলা স্ট্রিটে। এই বাটীতে প্রবর্তক পত্রিকা ও প্রেস প্রতিষ্ঠা পেল। সাধনা

প্রেসের নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘প্রকাশ প্রেস’ নামকরণ হয়। নব পর্যায়ের ১ম বর্ষ অর্থাৎ ক্রমিক ১০-ম বর্ষ প্রবর্তকের প্রকাশ আরম্ভ হল কলিকাতায়। মাসিক, ডবল ক্রাউন সাইজ, ৮ ফর্ম। অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা।

এই বৎসরেই দুইটি বিশেষ সংখ্যা—শারদীয়া পূজায় ‘শক্তি-সাধন-রহস্য’ ও পৌষ মাসে ‘বিবেকানন্দ সংখ্যা’ প্রকাশিত হওয়ায় সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শেষোক্ত সংখ্যা ‘যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলে, বিশেষ আনন্দ ও প্রীতি প্রকাশ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সভাপতি ও সজ্জের শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এক আশীর্বাদ প্রেরণ—

“স্বামীজীর আদর্শ ও উপদেশানুযায়ী জীবন আপনারা গঠন করুন এবং দেশবাসীকে যুগাচার্য্যের বাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধৃত্ত করুন। শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে সতত এই প্রার্থনাই করিতেছি।”

প্রবর্তক প্রকাশ বিভাগ

ইহার কিছুকাল পরে প্রকাশ বিভাগ প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস ২৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (বর্তমানে বিধান সরণী) স্থানান্তরিত হয়।

প্রবর্তক নবপর্যায়ে দশম বর্ষ প্রকাশ ও সজ্জগুরুজীর মর্ম্মবাণী।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) সজ্জের অগ্রাগ্রহ অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রবর্তক ও প্রকাশ প্রেস-৬১ নং বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) ত্রিতল বৃহৎ ভবনে স্থানান্তরিত হয়। প্রেসের কর্ম্মবিস্তৃতি হওয়ায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৫২/৩ বৌবাজার স্ট্রীটে স্বতন্ত্র বাটিতে প্রতিষ্ঠালাভ করে ও উক্ত প্রেসের নাম প্রকাশ প্রেসের স্থলে প্রবর্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ও পরবর্তী-কালে (১৯৪৩ খৃঃ) ইহার সহিত ব্রকটওয়ারী বিভাগ সংযুক্ত হওয়ায় ‘প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড’ এই নামকরণ হয় এবং অগ্রাবধি এই নামেই চলিতেছে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস (১৯৩২ খৃঃ) ১৭-শ বর্ষ হইতে বর্তমান ১৩৮২ বঃ (১৯৭৫ খৃঃ) ৬০-তম বৎসর পর্য্যন্ত একাধিক্রমে উক্ত ৬১ নং ভবনেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০-ম বর্ষে কলিকাতা থেকে নবপর্যায়ে বৈশাখ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে সম্পাদক শ্রীমতিলাল তথা প্রবর্তক সজ্জ-স্রষ্টা লিখেছেন :

“ফরাসী গভর্নমেন্টের শাসনদণ্ড প্রত্যাখ্যত হইতে না হইতেই প্রবল শক্তি ইংরাজ গভর্নমেন্ট আমাদের উপর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৬ মার্চ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের (১৯৩৯ বঙ্গাব্দ) দিল্লীর সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় পুস্তক প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত, সাধনা প্রেস হইতে মুদ্রিত যাবতীয় পুস্তক, ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের মত অবস্থায় ইহা এক প্রকার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের যুগে, অর্থ সঙ্কটের পীড়ন হয়তো আমরা সহিতে পারিব না, একেবারে না হউক তিলে তিলে মরিতে হইবে।

“...‘প্রবর্তক’ এইবার সজ্জের বীজকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া দিব্য পরিবারগঠনে উদ্বুদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে যে রত্ন বর্জনে শোভিত করার বজ্রবাণী ধ্বনি তুলিয়াছিল, ‘প্রবর্তক’ সেই বস্তুগ্রহণে সিদ্ধ করিয়া জাতিকে সার্থক করিবে...”।

এই বৎসরেই চৈত্র সংখ্যায় লিখেছেন—“দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল—মরণ-সমুদ্র সাঁতারিয়া ধীরে ধীরে নবজীবনের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তাই এই একটি বৎসরকাল সজ্জজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইতিহাস—সমস্ত পুরাতন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মৃত্যুপাণে আমরা একটা বিশ্বাসেরই জয় দিয়াছি। “প্রবর্তক” এই সিদ্ধ বিশ্বাসেরই অমর গুণ্ড।”

কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে সজ্জের অর্থপ্রতিষ্ঠান সমূহ ও ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

[১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) তারিখে ‘প্রবর্তক’-পত্রিকা ও প্রবর্তক প্রকাশ বিভাগ সজ্জের অগ্রাগ্রহ অর্থপ্রতিষ্ঠানের সহিত কলিকাতায় ৬১, বৌবাজার স্ট্রীটস্থ বিস্তৃত ত্রিতল ভবনে (বর্তমানে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট) স্থানান্তরিত হয়। ১১ বৈশাখ ১৩৩৯ বঃ, ২৪ এপ্রিল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ রবিবার আনু-

ষ্টানিকভাবে উদ্বোধন করেন তদানীন্তন কলিকাতার মেয়র ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও দেশসেবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী— ১৯৪৮ হইতে ১ জুলাই ১৯৬২ খৃঃ তাঁর মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত) সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল ও ডাঃ বিধানচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদত্ত হইল।]

সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল রায়ের ভাষণ :

“প্রাপ্তি অধর্ম, জ্ঞান ধর্ম। জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তি দূর হইলে সত্যলাভ হয়। ভারতের সনাতন জীবন সত্য-প্রতিষ্ঠিত। এই এক কথায় ভারতের আদর্শ ও সভ্যতার মূল তত্ত্ব প্রকাশ করা যায়। সামান্য মাত্র জ্ঞান অথবা সামান্য মাত্র ধর্ম যে মহা আপদ এবং শঙ্কা হরণ করে, তাহা একটা দীপশলাকার দ্বারা গভীর অন্ধকার দূর হওয়ার মত আশ্চর্য্য কিছু নয়। এই ধর্মজীবনের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতে জাতিগঠন-যজ্ঞে প্রবর্তক সজ্জ আয়দান করিয়াছে। আর আজ তাদের জীবনের এই নব পর্য্যায়ের আমরা স্বদেশবাসী স্বেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষক-বর্গের কাছে অল্প কথায় তাদের আত্মনিবেদন করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছি।

ধর্ম আমাদের কিছু চুক্রহ জটিল বস্তু নয়। ধর্ম আমাদের মর্ম, ধর্মই আমাদের আয়ুঃ। তাহা লাভ করার জন্ত মানুষের যে উৎকট প্রচেষ্টা তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই আমাদের এত দুঃখের কারণ হইয়াছে। আমাদের এত বড় দেশ, এত বড় জাতি, আজ অবনত উৎসন্নপ্রায়। আমাদের যাহা সত্য, আমাদের যাহা আয়ুঃ, আমাদের যাহা জীবন, তাহার উপর ভ্রান্তি ও মোহের বন্ধনবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে। এই ভ্রান্তি টুটাইবার যে আলো, যে জ্ঞান তাহাই ধর্মরূপে আবির্ভূত হয়। এই ধর্ম-জ্ঞানলাভের উপায়—সত্যের কাছে আমাদের অহঙ্কার ও কামনা বিসর্জন। ইহাই গীতার সর্বোত্তম রহস্য—আত্মসমর্পণ যোগ। এই যোগই প্রবর্তক সজ্জের ভিত্তি। আর এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তাহারা আজ সপ্রমাণ করিতে চায় যে, ভারতের ধর্ম মানুষকে পঙ্কু করে না, জড় করে না, কর্মবিমুখ করে না; বরং, প্রেম ও ঐক্যে মানুষের

প্রাণে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে অভিনব আকারে চুর্জ্বল করিয়া তুলে। এই একটু গৌরচন্দ্রিকা করার উদ্দেশ্য—এই সকল কর্ম-প্রতিষ্ঠানের আড়ালে আমাদের যে সকল জীবন, তাহার সত্য পরিচয় যাহাতে আপনাদের নিকট গোপন না থাকে তাহারই জন্ত।

“এইবার অধ্যাত্ম-ধর্মসাধনার উপর দাঁড়াইয়া প্রবর্তক সজ্জ যে ধারায়, যে আকারে জাতি-নির্মাণ করিতে চায়, সজ্জবদ্ধভাবে রাষ্ট্র, অর্থ, সমাজ প্রভৃতি দেশের সর্ববিষয়ক সমস্তার সমাধান করিতে চায়, এবং তাহা প্রত্যক্ষভাবে কতটা সিদ্ধ হইয়াছে, সেই কথা-গুলিই আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। মানুষের আয়ুর ত্রায় জগতের ধন-দৌলত অমূল্য বস্তু। অন্যাত্মে ও দাসীত্বে মানুষ আয়ুঃক্ষয় করে, সম্পদশূন্য হয়। ইহা ভ্রান্তিরই লক্ষণ। ইহা পাপ ইহাই অধর্ম। এইজন্য স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর প্রবর্তক সজ্জ প্রথম হইতেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বাবলম্বনের সাধনা গ্রহণ করিয়াছিল। মূলে ছিল না কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি, দাতার অনুগ্রহ। সজ্জকে শতকরা নয় টাকা হিসাবে ঋণ করিতে হইয়াছিল।...লক্ষ টাকা প্রথম প্রাবনেই অপচিত হইলেও; যে সব মানুষ সেদিন বিশ্বাস করিয়া ঋণ দিয়াছিল, তাঁহাদের বিশ্বাসের মর্যাদা প্রবর্তক সজ্জ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

“...ভারতের মানুষ যে চাহে নাই জীবন, শুধু তার ক্ষুদ্র রক্তমাংসের গণ্ডীবদ্ধ প্রেরণার দায়ে। সে যে গড়িতে চাহিয়াছে ভূমার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থ-প্রতিষ্ঠান। তাই সে এই অধ্যাত্ম রহস্যের দ্বারে নিয়ত আঘাত দিতে জাগাইয়া রাখিয়াছে বিশ্বাসের হোম-কুণ্ড।...দীর্ঘ ১৭ বৎসর ধরিয়া “প্রবর্তক” দেশে জাতীয়-তামূলক যে ভাব ও আদর্শ প্রচার করিতেছে, তার পশ্চাতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দলই আছে।...আপনাদের কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া সজ্জের জীবন-কথা মহাভারত করিব না।...আমরা নীরবেই চলিয়াছি, নীরবেই চলিব। ...শিক্ষা-সাধনার সঙ্গে প্রত্যেকে যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থা করিব। কর্মভূমি ধর্মক্ষেত্র ভারত নিরলস হইবে, বিদ্যময় প্রাণশক্তি লইয়া সংহতিবদ্ধভাবে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। আজ অসংখ্য বিপরীত ভাবের আবর্তে একমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করিয়া আমরা মরিতে হয় মরিব, বাঁচিবার সাধ্য হইলে বাঁচিব। কিন্তু ভবিষ্য ভারতের জীবনের মূলে যদি ভারতের অধ্যাত্ম তপস্যা হীনপ্রভ হয়, যদি মানুষ ধর্মের নামে ইহবিষয় হয়, কর্মের দায়ে ভারতের আদর্শ বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে, তবে সে জাতি যে রক্ষা পাইবে না, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইব।...” (সম্পূর্ণ ভাষণ, প্রবর্তক জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২৭—১০০ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ :

“প্রবর্তক সঙ্ঘের পরিচয় আমি অনেক পূর্বে কিছু কিছু পেয়েছিলাম। মতিবাবু সঙ্ঘ সঙ্ঘে আপনাদের নিকট যে পরিচয় প্রদান করলেন, এর বেশী আমার কাছ থেকে আপনারা প্রত্যাশা করবেন না।

“প্রবর্তক সঙ্ঘ এই কলিকাতা মহানগরীতে তাদের শাখা-কেন্দ্র বিস্তার করার জন্ত উত্থোগী হয়েছেন— আজ তাহারই ফলনা মাত্র। আমি সঙ্ঘ সঙ্ঘে যতদূর পরিচয় পেয়েছি তাতে বুঝেছি যে, ধর্মের উপর ভিত্তি করে’ তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। “সঙ্ঘ পরিচয়” পড়ে আমার মনে হল—প্রবর্তক একটা নূতন উপায়ে, নূতন ভাবে জাতিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মের সমন্বয়ের উপর কর্ম করছেন। আমার আরও মনে হয়েছিল—ব্যাক, প্রেস, জীবন-বীমা, furnishing ইত্যাদি ব্যবসায় অনেকাই করছেন, তাতে প্রবর্তকের কাজ কি হল, প্রবর্তকের স্থান কোথায়, তাদের নূতন কি দিবার আছে! ভেবে দেখলুম—সাধারণতঃ যারা ব্যাক, জীবনবীমা, অথবা অস্ত্র ব্যবসা করে, তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে Capitalist-রাই উপকৃত হয়, কিন্তু প্রবর্তক সঙ্ঘ যে অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, সেখানে ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের কোন কথা নাই। মতিবাবু বলেছেন—কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়ে, স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থের জন্ত, জাতির জন্তই এই সকল অর্থপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ বলে—‘Honesty is the best policy’, কিন্তু কার্যতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে সত্যের উপর, ধর্মের উপর যে business

করা, তা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, প্রবর্তক সঙ্ঘের এই নূতন পন্থা দেশেতে নূতন জাগরণ আনবে।

“তিনি বলেছেন—এতদিন চন্দননগরে নিজের গুহায় নির্জনে ছিলেন, কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠার জন্য মহানগরীতে এসেছেন, আবার তিনি নির্জনে থেকেই কাজ করবেন। তাঁর এই experiment যদি সফলকাম হয়, জাতিগঠনের উপাদান ইহার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। আমার খুব বিশ্বাস, ধর্মের উপর ভিত্তি থাকলে সঙ্ঘের কাজ কখনও নষ্ট হবে না। মতিবাবু চন্দননগর থাকলেও তাঁর এই শাখা-কেন্দ্র ভালভাবেই চলবে যদি ধর্মের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায়।

“জাতিগঠনের এই নূতন পথে সঙ্ঘ সফলকাম হবে, আমি বিশ্বাস করি এবং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক জাতি একদিন এই পথ গ্রহণ করবেই।

“গুহার মানুষ হলেও, আমি আশা করি—দেশের ডাকে তিনি এই মহানগরীতে পুনরায় আমাদের সম্মুখে আসতে বাধ্য হবেন—দেশের ডাক তিনি কখনও উপেক্ষা করে থাকতে পারবেন না।”

২৫-শ বর্ষের রজত-জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠান।

[১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ১ বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল ১৯৪০ খৃঃ-এ ‘প্রবর্তক’ ২৫-শ বর্ষে উপনীত হওয়ায় বৎসরব্যাপী রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলা প্রতি মাসের ১লা তারিখে বিভিন্ন জিলায় সভাধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।]

১ম মাসিক সভা—প্রবর্তকের জন্মতীর্থ চন্দননগরে ১-বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। ২য়—কলিকাতা, মহাবোধি সোসাইটি হলে। ৩য়—হাওড়া, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে। ৪র্থ—খুলনা জিলায় বাগেরহাট সহরে। ৫ম—বর্ধমান, বংশগোপাল টাউন হলে। ৬ষ্ঠ—মৈমনসিংহ সহর, দুর্গাবাটিতে। ৭ম—দার্জিলিং, নৃপেন্দ্র নারায়ণ পাবলিক হলে। ৮ম—চট্টগ্রাম, যাত্রামোহন হলে। ৯ম ক্রীধাম নবদ্বীপে। ১০ম—বাঁকুড়া সহরে, বাসন্তী সিনেমা হলে। ১১শ—ঢাকা সহর, নর্থব্রুক হলে। ১২শ সমাপ্তি সভা—জলপাইগুড়ি সহরে।

সভাপতিত্ব করেন—১ম—হরিহর শেঠ, ২য়—এডভোকেট রমাপ্রসাদ মুখার্জী (পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি,) ৩য়—প্রবীণ দেশনায়ক নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ—অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টগ্রাম)। ৫ম—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্ত্রীর বিজয়চাঁদ মহতব। ৬ষ্ঠ—মহারাজা শশীকান্ত আচার্য, মৈমনসিং। ৭ম—এডভোকেট নরেন্দ্রকুমার বসু। ৮ম—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত। ৯ম—অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। ১০ম—প্রবীণ সাহিত্য্যচার্য্য রায়বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি। ১১শ—প্রখ্যাত মনীষী, ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার (ভূতপূর্ব ভাইস্‌চেনসেলার)। ১২শ—এডভোকেট নলিনীরঞ্জন ঘোষ, জলপাইগুড়ি।

রজত-জয়ন্তী বর্ষোপলক্ষে বিভিন্ন মনীষীর শুভেচ্ছা-লিপি :

বহু মনীষী শুভেচ্ছা-লিপি প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হইল। ১৩৪৭ সালের প্রবর্তক বৈশাখ সংখ্যা ১০২, ১৮৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ “প্রবর্তক তাহার যাত্রাপথে নব-নব কল্যাণ তীর্থে উত্তীর্ণ হউক, এই কামনা করি।”

(২) বিজ্ঞানাচার্য্য ও দেশসেবক প্রফুল্লচন্দ্র রায় : “...প্রবর্তকের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে একথা সবাই জানে এবং পঁচিশ বছরের জীবনে সে প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারও কিছু দিবার আছে। আমি কামনা করি—প্রবর্তকের সাধু উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক।”

(৩) দার্শনিক অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার : “প্রবর্তক বাংলার অন্তরে ভাগবত জীবনের দিব্যসিদ্ধি ও ঋদ্ধির বীজবপন করিবার যে কল্যাণ-ত্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে জয়যুক্ত হউক এই কামনা করি।”

(৪) ভট্টপল্লীর ধর্মপ্রাণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন : “স্বস্তি ত্রীপঞ্চানন দেবশর্মাণঃ পরম শুভাশীর্বাদ-পূর্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ।

আয়ুধন। স্বয়ং লিখিতে পারিলাম না। প্রবর্তকের

রক্তত জয়ন্তীর উপহার শ্রীমান সঞ্জীব দ্বারা প্রেরণ করিলাম। আশীর্বাদ করি, প্রবর্তক সজ্জ শাস্ত্রানুগতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হইয়া বঙ্গভূমির কল্যাণসাধন করুক।...প্রবর্তকে লিখিবার সামর্থ্য এখন আমার নাই, ৮ মাসখানেক হয়ত আর জীবিত থাকিব। শক্তিবাদ প্রচারই এখন আমার কার্য্য। সজ্জসহ আপনাকে শুভাশীর্বাদ করিতেছি।...আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় “গ্রহচক্র” (নাটিকা) অপূর্ব্ব হইয়াছে।”

(৫) শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী :

“ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ যে ধারায় বাঁচিবে, আত্মরক্ষা করিবে, বিজয়ী হইবে, প্রবর্তক তাহা ২৫ বৎসর আকড়িয়া ধরিয়া আছে। ‘প্রবর্তকের’ আমি অমুরাগী, তাহার কারণ, প্রবর্তকের যে ভাব ও ভাবার স্বাক্ষর আমার প্রাণের তারে বাজে, তাহা আমারই মর্ম্মকথা।...এ জাতির প্রাণ যে ঋতকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া আছে, তাহা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি। প্রবর্তক নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সেই ঋতকে আমাদের সন্মুখে ২৫ বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত রাখিয়াছে। আমি ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।”

(৬) সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ‘প্রবাসী’, ‘মহার্ণ রিভিউ’ (ইংরাজী মাসিক) কাগজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ব্রাহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

“প্রবর্তক মাসিক পত্রের “রজত জয়ন্তী” উপলক্ষে ইহার কল্যাণ কামনা করি। ২৬শে চৈত্র ১৩৪১ সাল।”

(৭) হরিহর শেঠ : চন্দননগর ২২শে চৈত্র ১৩৪৬।

প্রীতিভাজনেষু, আমার নমস্কার লইবেন। চৈত্রের “প্রবর্তক” খানি হাতে নিয়েই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিল রক্তাক্ষরে লেখা “প্রবর্তক রজত জয়ন্তী।” ২৫ বৎসর পূর্বের সেই ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাকারে অথবা দেব-নাগরী অক্ষরে নাম লেখা দুই বা চারি পৃষ্ঠার পাক্ষিক প্রবর্তকের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ইহার জীবনধারা কিতাবে চলেছে, সেইসব কথা একে একে মনে আসিতেছিল।

“...শুভেচ্ছা যা সর্বদাই হৃদয়ে পোষণ করে থাকি, তা জ্ঞাপন করার অধিকার আছে। সর্বান্তঃকরণে আজ

তাহাই এই শুভ দিনে আমি আপনাদের জানাচ্ছি। আর যাঁর আশীর্বাদে সামান্ত পূর্ণকুটীর থেকে প্রবর্তক আজ আভিজাত্যের সকল সম্পদে, সকল গৌরবে গৌরবান্বিত, প্রার্থনা করি, তাঁর এই আশীর্বাদ শাশ্বত হউক। দুই যুগ পূর্বে ইহার প্রথম প্রকাশকালে ‘অনুষ্ঠান-পত্রে’ বর্ণিত যে ধারা ধরে, যে মস্ত্রে দীক্ষা লয়ে এর জীবন আরম্ভ হয়েছিল, বহু বাধার মধ্যেও আজও তা থেকে বিচ্যুত হয় নাই। ইহা বড় একটা দেখা যায় না। ভগবান “প্রবর্তককে” অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করুন, বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যাকাশের মধ্যমণি হউক ও তাহার জ্যোতিঃতে চন্দননগরেরও মুখোজ্জল হউক, এই প্রার্থনা করি।”

(৮) কবিশেখর কালিদাস রায়ঃ “প্রবর্তক-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বেশী কথা লেখা অশোভন হবে, কারণ আমি অন্তরে সজ্জ্বরই মানুষ। তবুও সর্বান্ত-করণে পত্রিকার মঙ্গল কামনা করছি।”

(৯) মনীষী দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ “প্রবর্তক পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবর্তক কর্মকর্তাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি। প্রবর্তক আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়। নানা ভাবে সাহিত্যের ও ধর্মের সেবা করিতেছে।...আমি প্রবর্তকের দীর্ঘ জীবন ও প্রচুরতর সাফল্য কামনা করি। ইতি—২২. ৪. ৪০”

(১০) অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ [মৈমনসিং কলেজের অধ্যক্ষ ও পরবর্তীকালে গৌরক্ষনাথ সাধু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সমর্পিতচিত্ত হয়ে অধ্যাপন-জগতে মহানু সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।]

“প্রবর্তকের রজত জয়ন্তী বর্ষের আরম্ভে সজ্জ্ব, সজ্জ্ব নেতা, সজ্জ্বাণীরাপা পত্রিকা এবং সজ্জ্ব-কর্মিরন্দকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। প্রবর্তক মাসিক পত্রিকাকে আমরা বাংলার আধুনিক বহু সংখ্যক মাসিকপত্রের মধ্যে সাধারণ একখানি মাসিক পত্রিকা বলিরা গ্রহণ করি না—জাতীয় জীবনে ইহা একটি অনন্তসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছে।...প্রবর্তক ভারতীয় প্রাণের সুগোপযোগী একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। ভারতীয় প্রাণ স্বভাবতঃ অধ্যাত্মনিষ্ঠ। অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বাত্মভাবে অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠালাভ

করাই, ব্যক্তিজীবনে সমষ্টি আত্মার অখণ্ড পূর্ণতা উপলব্ধি করাই তাহার স্বভাব-নিহিত আদর্শ। ভারতের প্রাণ মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইলেও, এই প্রাণের যেমন মৃত্যু নাই, ইহার স্বভাবের তেমনি বিনাশ নাই।... বর্তমান যুগসন্ধির ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তনের মধ্যেও সনাতনী ভারতীয় প্রাণশক্তি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত মহাপুরুষগণের অধ্যাত্মসাধনসমুজ্জল অসাধারণ মহিম-মণ্ডিত জীবনের ভিতরে বিশেষভাবে আত্মপ্রকট করিয়াছে। সেই প্রাণশক্তি শ্রীমতিলালের প্রাণকে অনু-প্রাণিত করিয়া প্রবর্তক সজ্জ্বর মধ্যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই প্রাণেরই বাণী প্রবর্তক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভাষাময়ী মূর্তি গ্রহণপূর্বক পাঠকবর্গের হৃদয়ে সেই মহান আদর্শের প্রেরণা জাগাইয়া থাকে।...প্রবর্তক ২৫ বৎসর যাবৎ এই সাধনা করিয়া আসিতেছে এবং সমাজ-কে এই বাণী শুনাইয়া আসিতেছে। আরও হৃদীর্ঘকাল সুনিয়তভাবে এই মহতী সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রবর্তক ভারতীয় প্রাণের পূর্ণ স্বরূপটি জাতীয় সাধনক্ষেত্রে সমুজ্জল মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুক, ভারত-প্রাণ বিশ্বের প্রাণদেবতার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭।”

[প্রবর্তক-এর জন্মদাতা, প্রাণপুরুষ ও সম্পাদক সজ্জ্ব-গুরু শ্রীমতিলাল দ্বাদশটি মাসিক রজত জয়ন্তী উৎসব-সভানুষ্ঠানে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ও প্রবর্তকের ঘটনাবলি ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া যে বাণী বিভিন্ন জিলায় প্রদান করেন, স্থানান্তরে তাহার মর্ম্মাংশ উদ্ধৃত হইল।]

শ্রীমতিলালের রজত জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ভাষণ

১ম সভায় প্রবর্তক পত্রিকার জন্মতীর্থ চন্দননগরেঃ

“প্রবর্তক এই নামটি আমার কাছে নবজাতিগঠনের মস্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু প্রকার নিষেধণের মধ্য দিয়া ইহাকে চলিতে হইয়াছে। এমন কি, এক সময়ে ইংরাজ ও ফরাসী উভয় গভর্নমেন্টের দমন-যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য “প্রবর্তক” নাম পরিবর্তন করিয়া “নির্মাণ” নাম দিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু

বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায় সে চেঁচা ব্যর্থই হইয়াছিল। প্রবর্তককে হত্যা করার ভিতর ও বাহির হইতে সকল আয়োজনই এইরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। প্রবর্তক নিজ মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাতিগঠনের অমোঘ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছে—এখন পর্য্যন্ত অক্লান্ত উত্তম সেই অমৃত-তত্ত্বই পরিবেশন করিতেছে।”

প্রসঙ্গক্রমে, প্রবর্তকের জাগ্রত কীর্তিস্বরূপ প্রবর্তক সম্ভব বহুবী প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও বলেন—

“প্রবর্তক চাহিয়াছে ধর্মের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে। ঋণ, সাময়িক অবস্থাধীন জীবন নহে, চতুঃশক্তিসম্বিত একটি পরিপূর্ণ জীবনের প্রেরণাই প্রবর্তক বাঙ্গালীকে দিয়া আসিতেছে। প্রবর্তকের রজত জয়ন্তী বর্ষের যে নূতন প্রচ্ছদপট, তাহা জাতির এই পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তারই প্রতীক-স্বরূপ। প্রবর্তকের কল্প-স্বপ্ন ভবিষ্য-জাতিই সিদ্ধ করিবে।

২য় সভায়—“১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাকুরুক্ষেত্রকালে প্রবর্তকের জন্ম। আজ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সেই মহা বিবর্তনের পুনরাবর্তন কাল। এই সকলই ভারতের ভাগ্যপরিবর্তন সূচনা করে। বর্তমান শতাব্দীটাই ভারতের ভাগ্যে নব স্বর্ষ্যোদয় হইবার পক্ষে অনুকূল শতাব্দী।...ভারতের ধর্মের ভিত্তির উপরই যে জাতির সৃষ্টি হইবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন নাই।...সম্মিলিত প্রাণশক্তিই ভারতের স্বাধীনতা আনিবে। বাঙ্গালীই হইবে তাহার অগ্রপুরুষ। নবজাগরণের প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু কোন চিহ্নিত শ্রেণী-সংহতির মধ্য দিয়াই স্বাধীনতার জাহ্নবী-ধারা বাহির হইবার আশা রাখি। এইরূপ মুক্তিপরায়ণ এক শ্রেণীর মানুষের ঐকান্তিক ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই নবযুগ আসিবে। পার্থ-কৃষ্ণের ঐক্যবদ্ধ জীবনের ভিত্তিতে ভারত চাহিয়াছিল ধর্ম রাজ্য, স্বর্গ রাজ্য নহে। সেই মিলন-বার্তা আজও পাঞ্চরঙে বাজিয়া উঠে। নান্দুর হইতে নবদ্বীপ, হালিসহর হইতে দক্ষিণেশ্বর প্রেম ও শক্তির তীর্থে মিলনের রাগিণীই বাজিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে একের সহিত অন্নের যে অভেদ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা শতজীবনে সিদ্ধ হওয়ার

বীৰ্য্যস্বরূপ ভারতের স্মৃতি আসিবে। বাঙ্গালী ধর্মের উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।”

হাওড়া, শিবপুর ৩য় সভায়—“জাতির সম্মুখে বহুবিধ সমস্যা। শিক্ষায়, সামর্থ্যে, অন্ন, রাষ্ট্রে, সমাজে সর্বত্রই দৈত্য আজ দেখা দিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ইহার নিরাকরণার্থে আমরা কেবল উপরেই প্রলেপ দিতেছি। যে জাহ্নবী-স্রোত অনাহতভাবে একদিন প্রবাহিত হইয়াছিল, আজ কেন তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। কি ভাবে তাহাকে পুনঃ প্রবাহিত করিতে হইবে তাহার তত্ত্বকথা জানিতে হইবে। বর্তমান দুর্ভাগ্যকে ঠেকাইতে গিয়া-২১৪ জনের অন্নসংস্থান বা শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই চলিবে না। হিমালয়ের তুহিনরাশি যেমন জাহ্নবী স্রোতের মূল উৎস, তেমনই হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিই এই জাতি-সাধনার মূলবস্তু।...বিকারগ্রস্ত হইয়া আজ আমরা ভারতের এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। জাতি বাঁচিবে, যদি আমরা ভারতের এই তত্ত্বকে জীবনে নামাইয়া আনিতে পারি। প্রগতি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। যে উৎকৃষ্টতর গতি হইলে আমরা জগতে ভারতের মহিমাময়ী বিজয়শ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে...”

খুলনা-বাগেরহাট ৪র্থ সভায়—“যে জাতির যাহা মূল বীৰ্য্য তাহা লঙ্ঘন করিয়া সে জাতির মুক্তি নাই, কল্যাণ নাই। সমাজের মূলে চাই পবিত্রতা ও সংযম—তাই যে প্রগতিবাদ নারীশক্তিকে কলুষিত, উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে, তাহা জাতির সর্বনাশই সাধন করে। জাতির জননী নারী। জননী যদি সাধবী সতীলক্ষ্মী হন, তবেই এ দেশেই কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের ছায় দেবসন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। শক্তিশালী সমাজই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া থাকে। এইজন্য চাই শুদ্ধ ও আমূল সংগঠন। সংগঠন অর্থে আপনার অন্তর দেবতার জাগরণ অফুরন্ত শক্তির উৎসের সঙ্গে স্বীয় সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের যুক্তি। এই বৃহত্তর মধ্যে যুক্তি পাইলে মানুষ মৌলিক সৃষ্টিধর ও পরম শক্তিমান হইয়া উঠে। ধর্মসম্বন্ধ অর্কচীন মনের অন্ধতা। তত্ত্বের সমন্বয় সম্ভব কিন্তু প্রতি মানুষের স্ব-স্ব ধর্ম আছে। ধর্ম অনুষ্ঠেয়।

আপনার প্রকৃতির সৃষ্টি বিকাশের জন্তই ধর্ম্মানুশীলন। এইরূপ পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের সমষ্টি লইয়াই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ণাঙ্গ ভারতজাতি গড়িয়া উঠিবে। হিন্দুদের মধ্যে যে শ্রেণীগত পার্থক্য ও বাদ-বিসম্বাদ, তাহাও অপূর্ণতা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টিরই ফল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও সেবাগুণেরই প্রতীক। ঈশ্বরের এই চতুর্কদাহ মুক্তি একাধারেই প্রকাশ পাইতে পারে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনে অখণ্ড ঈশ্বরোপলব্ধির ইহাই পরম লক্ষণ। বস্তুতঃ চাতুর্ক্য অখণ্ড মানবতারই পূর্ণ-প্রকাশ। ভারতের ঐশ্বর্য্যে একদা এই বৃহত্তর চাওয়াই উদ্গীত হইয়াছিল। ভারতের অধঃপতন ধর্ম্মের জন্য নয়, পরন্তু ধর্ম্মবিলাসের জন্ত—ধর্ম্মকে জীবনে অনুবাদ করিতে না পারার ফলে।”

বর্ধমান সহর, বংশগোপাল টাউন হল—পঞ্চম অনুষ্ঠান “...কোন ‘ইজম্’ এ-জাতি বাঁচতে পারে না। হিমালয়ের অফুরন্ত তুষার স্তূপ যেমন গঙ্গোত্রীধারাকে জীবিত ও প্রবাহমান রাখিয়াছে, তেমনি ভারতের অপেক্ষে ধর্ম্মামৃতের উপরই ভারত-জাতি অমর প্রতিষ্ঠা পাইবার প্রচেষ্টা অতীতেও করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও তাহাই করিতে হইবে। এ জন্ত চাই বিপুল সংগঠন। সংগঠন—আত্মজ্ঞান, স্বকীয় সত্তা এবং ভারতের সমুন্নত চিন্তা, দর্শন ও ঐতিহ্যের অকণ্ট অবধারণ। জীব ও ঈশ্বরের যুক্তি বাষ্টি ও জাতিকে পূর্ণ এবং সার্থকমত করে। এই যোগ সিদ্ধ হয় আত্মসমর্পণে। বাংলার গৌরব-ময় বৈষ্ণব-যুগে এই ঈশ্বরযুক্তিসিদ্ধ এক জাতি-গঠনের বিপুল প্রয়াস হইয়াছিল। শুধু ভাবে নয়, যুক্তির মধ্য দিয়া বৈষ্ণব দার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জাতিগঠনের ত্রয়ী নীতি (Principle) ভক্ত, ভগবান আর ভক্তি। প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ বস্তু যেমন কর্ম্ম, কাল, প্রকৃতি, অহং-এর আরোহণ-মূলক শৃঙ্খলাক্রমে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য পর্য্যায়। অতএব জাতীয়তার নামে ধর্ম্মকে উপেক্ষা ও দাখী করিবার যে আজিকার মনোবৃত্তি, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে জাতির অবনতির জন্ত ধর্ম্ম দাখী নহে, পরন্তু ধর্ম্ম-বিকৃতি ও ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীই ইহার

জন্ত মূলতঃ দাখী। ধর্ম্ম চিত্ত-বিলাসে বা ভাবভারত্যা-জনিত চক্ষে অক্ষবর্ষণ নয়। ইহা মানুষকে অতী করে, শ্রী-ঐশ্বর্য্য-বীৰ্য্য দান করে। ভারতের সভ্যতা দ্বিধ্বংসী। পঙ্কজ পাপ। প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নরের মধ্যে নারায়ণের জাগরণ সম্ভব। প্রবর্তক পত্রিকা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এই বাণীই প্রচার করিয়া আসিতেছে।”

মৈমনসিংহ, দুর্গাবাড়ী—ষষ্ঠ সভা “...বাঙ্গালী আজ সচেতন হইয়া বাঁচার পথ অনুসরণ করে, রোগের উপসর্গ ধরিয়া চিকিৎসা করার মত বাঙ্গালী জাতির উপর আঘাত অনুসরণ করিয়া প্রতিকার চাহিয়াছে, রোগের নিদান অন্বেষণ সে করে নাই। এই অর্ধ শতাব্দীর সাধনা তার ব্যর্থ হয়, আজও যদি ক্ষয়রোগীর স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বল-বীৰ্য্য নাশের পশ্চাতে নিরাময়ের দিকে বাঙ্গালী দৃষ্টি না দেয়, তার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই দিক দিয়া আজ সকল ‘ইজম্’ ছাড়িয়া ‘হিন্দু-ইজম্’ ধরিতে হইবে। তাহা হিন্দুর ঐশ্বর্য্য-প্রসিদ্ধ-কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ। বাঙ্গালীকে কর্ম্ম করিতে হইবে, বাঙ্গালীকে আত্ম-বিশ্বাসী হইতে হইবে। বাঁচার ইচ্ছা জাগাইতে হইলে সর্বাঙ্গে চাই একদল নূতন নেতা। এই নেতৃসংখ্যা অল্প হইলেও ক্ষতি নাই। জাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের অমৃত-স্রোতঃ ফিরাইয়া আনার উপর তার সৌন্দর্য্য, বীর, জয়, সম্পদ ও ধর্ম্মের পুনঃপ্রকাশ হইতে পারে।...”

দার্জিলিং—৭ম সভা “...আমি জানি এই শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে। ভারতের অমর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে প্রবাহমান রাখতে যে সাধনা করে, সেই সাধক চিরজীবী হইবে। ভারতের হিন্দুত্বকে স্মান করার নয়। ইহার গতি ও প্রকৃতিকে কেহ রোধ করিতে পারে না। হিমালয় উৎসরিত গঙ্গোত্রীধারার স্রাব বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া কখনও থকু, কখনও বন্ধিম গতিতে কত শস্ত্রশ্যামল সমতল ক্ষেত্রের বুক ফাঁড়িয়া উহা লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। ধর্ম্ম মানুষকে পঙ্ক বা হুর্ল করে না, পরন্তু অফুরন্ত শক্তির উৎসে যুক্তি দিয়া তাহাকে বলিষ্ঠ ও বীৰ্য্যবান করিয়া তুলে। যেখানে পার্থ ধনুর্ধর ও আর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মিলন, সেখানে সুনিশ্চিত শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। ধর্ম্মের ইহা লক্ষণ।

হিন্দুর লক্ষ্য মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ নয়—এই ধর্ম সমাজ ও জাতীয় জীবনে দিবে স্থনীতি, জ্ঞান ও স্বকর্ম—কোর্শল। কোন মানুষে—তা সে যত বড়ই হউক, অবতার বা ইনষ্টিটিউশনের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ গ্রাহ্য নহে। ইহা জাতীয় জীবনে যুগে যুগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। তাই হিন্দুজাতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টির জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ ঋতি ও স্মৃতির শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই বিধানব যুক্তিবাদই ভারতের জাতি-প্রস্থান বা দর্শন শাস্ত্র। একমাত্র ইহার সহিত অনুভূতির সম্মেলনেই আবার হিন্দুর সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্র অবিসম্বাদিত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিন্দুর ধর্ম আদৌ কাল্পনিক বা রহস্যচ্ছন্ন নয়। ইহার মূলনীতি নিত্যকর্মের মধ্য দিয়া জীবনে আচরণীয়। একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা ধরিয়া বৈজ্ঞানিক নীতিতে ইহা জাতীয় জীবনে বিকশিত হইতে চলিয়াছে। যেমন পিতা-মাতা বা সমাজকে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ঋতি, স্মৃতি, জাতি অস্বীকার্য্য নয়। আজও বিবাহাদি জীবনে সর্ব ব্যাপারে হিন্দু তার পূর্বপুরুষ গোতম, ভরবাজ, কশ্যপাদি ঋষির স্মরণ করিয়া থাকে। ইতিহাস ও পরিচয় বিস্মৃত হইবার ফলেই সমাজজীবনে সম্বন্ধের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। পলিটিক্যাল হিস্টরীর পরিবর্তন হইলেও ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার মধ্য দিয়াই জাতি বাঁচিয়া থাকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে এই সংস্কৃতি রক্ষার ধারাবাহিক একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্যে পড়ে। বৈদিক যুগে ঋষির কণ্ঠে সেই যে প্রথম প্রশ্ন—‘কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ’—হিমালয় ক্রোড়ে উদ্গীত হইয়াছিল। সেই ঋককে মূর্তি দিবার তপস্যা পরবর্তীকালে ষড়দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানধনরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। হৃদয়-ধর্ম জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আবিষ্কারই তার পরের পর্য্যায়। দ্বিদলে প্রতিষ্ঠিত চেতনাই ব্রাহ্মণ, হৃদয়ে ক্ষত্রিয়, প্রাণে বৈশ্য এবং দেহে শূদ্র। আধারে চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি নিখিল মানবের পক্ষেই সার্বজনীন সত্য। ...আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে হিন্দুধর্মের মূল বীৰ্য্য কি! জাতির মূল বীৰ্য্য তার সংস্কৃতি। শুধু

সংখ্যা গুণিয়া জাতি বাঁচে না বা বড় হয় না। জার্মান বা জাপান জাতির দিগ্বিজয়ী বীৰ্য্য ও স্পর্ধাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।... এক্যশক্তি বাহিরের আশোলন নহে। হিন্দুকে এক্যবদ্ধ হইতে হইলে বিভিন্ন বা সমষ্টিকে সমান আচার গ্রহণ ও জীবনে পালন করিতে হইবে। এই সম আচারেই সম প্রাণ সৃষ্টি করিবে। সম-আচারপরায়ণ জীবনই শক্তির উৎস, সংহতি বা এক্য বন্ধনের প্রাণ-স্বরূপ। সমান এই সম-প্রাণ, সমান আচার-নীতি প্রবর্তনের জন্য আমিও সমগ্র হিন্দুজাতিকে আহ্বান করিতেছি। সেবা-শক্তি-প্রেমজ্ঞানমূলক চতুরঙ্গ সাধনার প্রেরণা নিয়েই প্রবর্তক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জাতিগঠনে ব্রতী হইয়াছে। ইহার যথাযথ সাধনে জাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকারী হইবে। এই বিস্মৃত জাতিগঠনের আকুলতা নিয়াই আমি বাংলার দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার সঙ্কল্প করিয়াছি...”

চট্টগ্রাম, যাত্রামোহন হল—৮ম অধিবেশন—“যে বাঙ্গালা দেশ গত শতাব্দীতে জাতীয় ভাব ও আদর্শের অগ্রদূতরূপে ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে, এবার বাঙ্গালা শুধু ভারতের কাছে নয়, সমগ্র জগতের কাছে একটা নূতন বাণী ঘোষণা করিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে নূতন তিনটি আদর্শের জন্ম সংগ্রামরত—বাঙ্গালার নূতন বাণী এই নূতন আদর্শকেই একটা শক্তিমান অবদানে পুষ্ট করিবে। ব্যক্তি ও জাতির চেতনা যে পর্যন্ত একটি অধ্যাত্ম পরিবর্তন না আনে, সে পর্যন্ত জগতে এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই রকম আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ম অজয় ও ভাগীরথীর তীরে নান্দুর, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেখরে যুগে যুগে এই বাঙ্গালা দেশে শক্তিমান অধ্যাত্ম নায়কগণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম-প্রকাশের ইতিহাস রচনায় বাঙ্গালায়-হিন্দু মুসলমান উভয়ই আপন আপন অবদান জোগাইয়াছে। কিন্তু একটা বিরাট আদর্শকে যাহারা প্রতিষ্ঠা দিবে, তারা হিন্দুই হউক বা মুসলমান হউক—প্রত্যেকে তার স্ব স্ব ধর্মের মূলনীতিকে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইসলামধর্ম সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমার নাই।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বলিবার আছে। আমি একজন খাঁটি হিন্দু হিসাবে বাঙ্গালার হিন্দুকে বলিব—হিন্দু তুমি, বেদবিশ্বাসী হও। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা—ঋতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই তিন গ্রন্থানে বেদের যে মর্ম প্রকাশ হইয়াছে—কোন ভাষাকারের টীকার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মীদের কথা উপলব্ধি কর। শুধু প্রচারক নয়, যাদের জীবনে ধর্মের মূলনীতি মূর্ত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালার এমন এক দল উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নেতার প্রয়োজন হইয়াছে। ‘প্রবর্তক’ আজ এমন একদল শক্তিশালী নায়ককে আহ্বান করিতেছে।”

নবদ্বীপ—৯ম মার্চিক অনুষ্ঠান।

“বাংলার অধ্যাত্ম-ধারায় ক্রমপুষ্টি, হিন্দুসংগঠনের সিদ্ধ প্রেরণা এবং ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বাঙ্গীন জাতির শ্রেয়: ও অভ্যুত্থান নির্ভর করে। ‘প্রবর্তক’ ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার উপর ভিত্তি করিয়া জাতিগঠনের মন্ত্রই প্রচার করিয়া আসিতেছে।”

বাঁকুড়া, (বাসন্তী সিনেমা হল) ১০ম মাসিক অনুষ্ঠান—ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্মময় ইতিহাস, বেদবিশ্বাস, জ্ঞানান্তরবাদ ও কর্মবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় জীবনধারাই আমাদের অনুসরণীয়। আমার দীর্ঘদিনের জীবনপরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দলাদলি নির্বিশেষে খাঁটি দেশকর্মী মাত্রকেই এই জাতিগঠনের মৌলিক তত্ত্ব প্রণিধান ও আয়ত্ত করিতে হইবে।”

ঢাকা, নর্থব্রুক হল—১১শ রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠান।

“১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছিলাম—সাধনা, যোগ, ধর্ম ব্যক্তিগত মুক্তি মোক্ষের জন্ত নয়, সাধনা মানবতার জন্ত। আর ঈশ্বরযুক্তির জন্ত কোনরূপ আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনার প্রয়োজন নাই, আত্ম-সমর্পণ যোগই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। জীবন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করলেই শ্রীভগবান মানুষের মধ্যে তাঁর শক্তি নিয়ে লীলায়িত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সাধনার নামে বহু প্রকার হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি কুচ্ছতামূলক আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছিলুম—তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত কুচ্ছতামূলক অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করে

একমাত্র ঈশ্বরে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ পথ—এই নির্দেশ যখন লাভ করলুম, তখন ভেবেছিলুম—এর চেয়ে সাধনার সহজ ও সরল পথ বুঝি আর নেই! ১৯১০—১৯৪১ খৃঃ পর্যন্ত “সর্বধর্ম-নু পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”,—শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাক্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে কত বন্ধা, বিপ্লব, উপদ্রব ও অসংখ্য বাধার সন্মুখীন হয়ে আমার সমর্পণের অগ্নিশরীক্ষা দিতে হয়েছে।...এই আত্মসমর্পণ-মন্ত্র শুধু ভাব নয়, হিঁয়ালী নয়, ইহা বস্তৃতন্ত্র সাধনা। এই দীর্ঘ দিনের সাধনার মধ্য দিয়ে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি—সমর্পণের সাধনা কত দুঃসহ ও জীবনে তা রূপায়িত করতে গিয়ে কত কঠোর ও বিপ্লবকারী অবস্থার সন্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। এই মন্ত্রের অনুসরণে দিনের পর দিন তিলে তিলে আপনাকে নিবেদন করেই যে এই মহাবাক্য সার্থক করতে হয়, তা আমি সমস্ত জীবনব্যাপী উপলব্ধি করছি। সাধনা শুধু বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে নয়। বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ সবই একে একে তাঁকে সমর্পণ করতে হয়। সকল বৃত্তির সমর্পণের ফলে বুদ্ধি দিয়ে শ্রীভগবান চিন্তা করেন। বুদ্ধি দিয়ে যখন আমি চিন্তা করবো, বিচার করবো, সেটা হয়ে যাবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ। যখন ঈশ্বরকে আমার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার জন্ত বুদ্ধিবৃত্তি তাহাতে লয় করে দেবো, তখন বুদ্ধিতে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রকাশ হবে—যে জ্ঞান মানুষকে অমৃত প্রদান করে, যাহা জানিলে পৃথিবীর কোন জ্ঞান জানার অবকাশ থাকে না। হৃদয়বৃত্তিতে ভাগবত প্রেম বিকশিত হবে। আমাদের হৃদয়ের আকর্ষণে পিতা, পুত্র, পত্নী, বন্ধু সম্বন্ধ সৃজন করি, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা খাঁটি প্রেমের সন্ধান পাই না, সেখানে থেকে যায় আত্মভোগ ও আত্মস্বার্থের আকাঙ্ক্ষা। তাই যখন ভগবান হৃদয়-মন্দিরে বিবাহ করেন, তখন রক্তমাংসের সম্বন্ধ দূর হয়ে যায়। পিতা, পত্নী, বন্ধু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করে অখণ্ড প্রেমের আশ্বাদ অনুভব করি। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা অপ্রাকৃত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। তাই কামনাহীন দিব্য সম্বন্ধ কোন দিন কোন অবস্থায় বিকৃত হয় না। পিতার সঙ্গে, পুত্রের সঙ্গে, পত্নীর সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে এই নিত্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা

হলে তবেই যে সমাজের প্রতিষ্ঠা উহাই ভাগবত সমাজ—তাহাই প্রীতি ও ঐক্যের নিকেতন।

তারপর প্রাণবৃত্তির কথা। প্রাণ শক্তির কেন্দ্র। যখন “আমার” প্রাণ “আমার” শক্তিবোধ থাকে, এই প্রাণই বাধা সৃষ্টি করে; বৃহত্তর শক্তিদ্বারা অসমর্থ হয় কিন্তু ইহা আমার ভাগবতপূত হইলে, সমর্পিত হয়ে ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হলে এই প্রাণেই ঈশ্বরের দুর্জয় শক্তি অবতরণ করে, বিপুল সৃষ্টির প্রবাহ নেমে আসে—যে সৃষ্টি অহংকৃত মনের উপর ভিত্তি করিয়া হয় না, স্বচ্ছ অনাবিলম্বিত সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করেই আপনার প্রকৃষ্ট গতি নিয়ে চলে। পৃথিবীর কোন বাধায় এই প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় না।

তারপর দেহের কথা। দেহের ধর্ম—সেবাদান করা। শ্রীভগবান স্বয়ং সেবার হস্ত নিয়ে আমার দেহে প্রকাশ হবেন, তখন আমার কোন কর্ম বাধা নেই, বিচার নেই, সেবার অফুরন্ত আনন্দে অভিযুক্ত হয়ে এই শরীর বিশ্বমানবের সেবায় সতত উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত থাকবে।” (১২শ অনুষ্ঠানের ভাষণ স্থানান্তরে দেওয়া হলো না।)

সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদক পদ হইতে অবসর গ্রহণ ও ভার্যাপণ।

বৎসরব্যাপী রক্তত জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন প্রবর্তক সজ্জ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমতিলাল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সজ্জের মূলকেন্দ্র চন্দননগর হইতে দূরে নিভূতে বাসের সংকল্প লইয়া এক বৎসর কাল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। বৎসরকাল উত্তীর্ণ হইলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই পুরী জগন্নাথ-তীর্থ হইতে চন্দননগরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পর ১৩৪৮বঃ (১৯৪৩ খৃঃ) হইতে তিনি ‘প্রবর্তক’ সম্পাদক পদে আর রহিলেন না। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত (বর্তমানে প্রবর্তক সজ্জ-সভাপতি), ও সজ্জের অন্যতম উৎসর্গীকৃত সন্তান শ্রীরাধারমণ চৌধুরীকে সম্পাদকের ভার্যাপণ করেন।

এই প্রসঙ্গে সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা প্রবর্তকে লিখেছেন—

“প্রবর্তক হইতে আমি আজ ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়ানমিত শিরে বিদায় লইতেছি। এই ২৫ বৎসর “প্রবর্তকের” দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রকে প্রবর্তকের মন্ত্র-মর্যাদা রক্ষার ভার দিতেছি। সজ্জের একনিষ্ঠ সাধক প্রবর্তকের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীমান্ রাধারমণ প্রবর্তকের তত্ত্বধারণের অধিকার অর্জন করিয়াছে। আর আছে প্রবর্তকের মন্ত্রদীক্ষিত সজ্জের নারী-পুরুষ। প্রবর্তকের জয়যাত্রা পূর্বাশ্রমে অধিকতর গৌরবের সহিত হইবে, এ আশা বিন্দুমাত্র অনিশ্চল নহে। ...২৫ বৎসর পরে, নিজের অক্ষমতার জ্ঞত নহে, ভবিষ্যতে অবাধ কর্মক্ষেত্র দিতে আমি সম্মানে বিদায়-প্রার্থী। নিজের জীবন নিঙড়াইয়া যাহাদের জাতি সেবায় দীক্ষা দিয়াছি, তাহারা আজ সর্বক্ষেত্রেই পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে। আমি তাহাদের সেবা করিব, অনুসরণ করিব, ইহা বিদায়-বেলায় একমাত্র কাম্য...” (সম্পূর্ণ উক্তি ১৩৪৭, চৈত্র সংখ্যা)

সজ্জগুরু শ্রী প্রবর্তকের সম্পাদক পদ হইতে অবসর গ্রহণ ও ভার্যাপণ করা প্রসঙ্গে তাঁর লেখাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর নাম। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধা রমণ চৌধুরীর সামান্য পরিচিতি পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করলাম। তাঁদের অমূল্য ও মহৎ জীবনের বিস্তৃত প্রকাশের ক্ষেত্র ইহা নহে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রবর্তক সজ্জের বর্তমান সভাপতি। তিনি খুব তরুণ বয়সে স্বদেশী ও বিপ্লব যুগ হইতেই (১৯০৭ খৃঃ) সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলালের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিপ্লবী শহীদ চন্দননগর নিবাসী কানাইলাল দত্তের সম্পর্কিত অনুজ ভ্রাতা।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে আত্মগোপন করে’ প্রায় এক মাস শ্রীমতিলালের গৃহেই অবস্থান করেছিলেন। ইহার পর চন্দননগরেই কয়েকটি বিভিন্ন পল্লীতে অবস্থানের পর গোপনে জাহাজে ৩১ মার্চ তারিখে কলিকাতা থেকে পশুিচেরী যাত্রা করে’ ৪ঠা এপ্রিল সেখানে পৌঁছান। ১৯১০

খঃ হইতে ১৯২১ খঃ পর্যন্ত শ্রীমতিলাল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযোগ-স্থত্র রক্ষা করেছিলেন—তদানীন্তন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের কঠোর শাসনের মধ্যেও। চন্দননগরে অবস্থানকালীন নিভৃতকক্ষে শ্রীমতিলালের ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবনের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করে তাঁর বর্তমান সাধন-পদ্ধতি ও তজ্জনিত আচারাদি বর্জন করে 'Yoga of Self-Surrender' অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিকট পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে আত্ম-সমর্পণ যোগ অনুসরণ ও অনুশীলনের নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করেন। অধ্যাত্ম-যোগ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল সমস্যা অবলম্বন করে আলাপ-আলোচনা ও জীবনে রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে থাকেন।

শ্রীঅরবিন্দের এখানে অবস্থানের বহু পূর্ব হতেই নীতি, ধর্ম, অধ্যাত্ম-যোগ ও জাতীয়তামূলক ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে একদল তরুণকে নিয়ে প্রতি-রবিবার ও অন্যান্য দিবসে তাঁর বাটীর প্রাঙ্গণেই নিয়মিত শ্রীমতিলাল সভা পরিচালনা করতেন। তরুণদের মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁর উপদেশ-মূলক বাণী জীবনে রূপায়ণের আকুলতা নিয়ে বিশেষ ঐকান্তিক ও -শ্রদ্ধা নিষ্ঠার সহিত তাহা গ্রহণ করতেন।

১৯১০-১৯২০ খঃ পর্যন্ত দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকালব্যাপী ভারতের জাতীয়তা, অধ্যাত্মযোগ ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমতিলালকে নিজ হস্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু চিঠি প্রেরণ করেছেন। এই সকল চিঠি গত ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে 'Light to Super light' গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীঅরুণচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের চিঠির অন্ত-নিহিত মর্ম স্পষ্টীকরণ উদ্দেশ্যে এই সঙ্গে নিখুঁত মূল্যবান 'Explanatory Notes' সন্নিবেশিত করেছেন। শ্রীঅরুণ চন্দ্র দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে শ্রীগুরু নির্দেশেই শ্রীঅরবিন্দের সন্নিধানে কয়েকবার বাস করে তাঁর কাছ থেকে যোগের নূতন আলো ও ব্যাখ্যা উপলব্ধি করেছেন। পণ্ডিতেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তদানীন্তন কালে অল্প কয়েকজন মাত্র ভক্ত-শিষ্য তাঁর সঙ্গে বাস করতেন।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয় নাগ প্রভৃতি।

শ্রীঅরুণচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রাপ্তে বসে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অন্তর-যোগে যে অমুভূতিলভ করেছিলেন, সেই সকল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব তিনি "অরবিন্দ মন্দির" গ্রন্থে অতি নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করেছেন। ইহাতে তাঁর প্রতিভা ও অধ্যাত্মজীবন বিকাশের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তখন অরুণচন্দ্রের বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। এত অল্প বয়সে অধ্যাত্ম-যোগ আয়ত্ত্ব ও নিপুণতার সহিত তার অভিব্যক্তি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। অথও মাতৃশক্তির অশেষ করুণা তিনি লাভ করেছেন এবং আজীবনকাল এই বিশ্বাস গোষণ করে আসছেন।

তিনি বিভিন্ন দিকে সজ্জের সেবায় দিবা-রাত্র নিযুক্ত রয়েছেন নিরলস ও বিশ্রামহীন ভাবে। সজ্জগুরুজীর ভাব, আদর্শ ও নব 'মিশনে' অরুণচন্দ্রের অগ্নি-বিশ্বাস ও ইহার রূপায়ণে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্পপরায়ণতা সজ্জ-সন্তানদের অন্তরে প্রেরণা দান করে। তাঁর দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মাতৃ করুণায় অটুট ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি ৮০ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। জন্ম ১৮ মে ১৮৯৬ খঃ।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

'প্রবর্তক' সম্পাদক নাম না থাকাকালীনও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সজ্জগুরু নির্দেশে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল প্রবর্তক পরিচালনার কার্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি সজ্জ আত্মোৎসর্গ করেছেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৭ বৎসর। এই পরিণত বয়সেও নিয়মিত সজ্জগুরুদেবের ভারতীয় ভাব, আদর্শ ও কর্ম এবং তিনি যে অভিসন্ধি (Mission) নিয়ে আবিভূত হয়েছেন, তার তাৎপর্য্য শ্রীগুরু করুণায় অন্তর্দৃষ্টির অনুভূতি লাভ করে 'প্রবর্তকে' পরিবেশন করে চলেছেন অজ্ঞাবধি।

২৪ ভাদ্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

১৯ ভাদ্র ১৮৯৭ শকাব্দ

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

ঐ শ্রীগুরু অর্পণমন্ত্ৰ

পরিশিষ্ট

(১) রক্ষিত, দে, ঘোষ এণ্ড কোং-এই নামে কাঠের ফার্ণিচার তৈয়ারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল। স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যেই ইহার মূলে ছিল। মাণিকলাল রক্ষিত, রামেশ্বর দে ও সাগরকালী ঘোষ, ইঁহারা এই ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নামেই সজ্জগুরু ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাণিকলাল বালাজীবন থেকেই সজ্জগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাদাম্পন্ন ছিলেন। রামেশ্বর সজ্জগুরুর ও সজ্জমাতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে তরুণ বয়সেই তাঁহাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সাগরকালী অকৃত্রিম স্নেহ। বয়সে তাঁর চেয়ে অধিক হলেও তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী বিনোদিনী ঘোষ সজ্জগুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগপরিচয় ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁদের এই অধ্যাত্মসম্বন্ধ নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করে গেছেন।

এই R. D. G-কে কলিকাতার তদানীন্তন সুবিখ্যাত বা কথ্যাত প্রচণ্ড প্রতাপশালী স্মার চার্লস টেগার্ট ফরাসী চন্দননগরে সজ্জগুরুর বাটীতে খানাতল্লাসী করার সময় (১৯১২। ১৯১৩ খৃঃ) রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন “Revolutionary Director General office”.

(২) অনুষ্ঠান পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি। সম্পূর্ণ অংশ বর্তমান বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

“...ক্ষুদ্র প্রবর্তক কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মস্তিষ্ক দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে রাজা প্রজার মর্যাদা রাখেনা, প্রজা রাজবিদেষ্টা হয়, প্রজায় প্রজায় সহায়ত্ব থাকেনা—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে। যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের আলা অনুভব করে—‘প্রবর্তক’ সেই অমূল্যবস্তু গঠনের সহায়তা করিবে।

সেটি কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা এতটা নিচ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা উপরে সাধু ভিতরে চোর—উপরে দেশহিতৈষী, ভিতরে নিজের পায়ে কুড়াল মারিতে বসিয়াছি। রাজভক্তি প্রকাশচ্ছলে

নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় করিতেছি। ইহাতে না হইতেছে রাজার মঙ্গল, না হইতেছে প্রজার লাভ। উপরন্তু রাজা-প্রজার মধ্যে একটা ভীষণ সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এই চরিত্রের অভাববশতঃই গুণীর আদর নাই। সর্বত্যাগীর সম্মান নাই, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নাই। এই চরিত্র দেবচরিত্র। মানব-চরিত্রের সঙ্গে ইহার কোনখানেই মিল নাই। ইহা মানব-বুদ্ধির অতীত। মানুষের কর্তব্য, মানুষের জ্ঞান, মানুষের চরিত্র যাহা, তাহা আজ যুরোপে প্রকটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। পণ্ডিত জার্মান জাতির পৈশাচিকতার কাহিনী কাহারও অবিদিত নহে। বাঙ্গালী দেবচরিত্র লাভ করিবে। এই চরিত্র সাধনার সামগ্রীর। বাঙ্গালীকে এই দেবত্ব লাভ পরিপূর্ণ চরিত্রলাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর যাহা আছে তাহার উপর দাগ-রাজী করিয়া কিম্বা তাহাকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া দাঁড় করাইলে চলিবে না। একেবারে পুরাতন বনিয়াদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন বনিয়াদ হইতে তাহার এই স্তমহান চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গলসাধন করিবে। ‘প্রবর্তক’ এই কার্যের আরম্ভ মাত্র। ইহার অধিক আমরা এক্ষণে বলিতে অসমর্থ। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

(৩) শ্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক জীবিত আছেন। জন্ম ১৮৯০ খৃঃ ১৭ অক্টোবর। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৮৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। তিনি নিজ বাসগৃহে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমের সন্নিকটে বাস করছেন।

স্বদেশপ্রাণ মনীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই শ্রীমতিলালের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাপরিচয় হয়ে তাঁর সাহচর্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনলাভের দিকে তাঁর আকৃতি আছে। পূর্বযুগে পণ্ডিতেরীতে শ্রীমদ্রবিন্দ্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার ও আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশ ও আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বসন্তকুমার বিশ্বাস কর্তৃক ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লীর টাদনীচকে বোমাক্ষেপণ হয়। উক্ত বোমা

সম্প্রদায়িক নেতৃত্বাধীন চন্দননগরে মনীন্দ্রনাথ নায়েকের কর্তৃত্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। মনীন্দ্রনাথ প্রবর্তক সমাজে আজীবন সেবা দিয়াছেন। বর্তমান বার্ষিক্যপীড়িত অবস্থায় শয্যাগত থাকাকালীনও দৈনিক ক্রেশ সন্ধ্যা করেও সমাজের উৎসবাদিতে সম্বন্ধ ও মাতার প্রতি প্রদীপ্য নিবেদনের জন্ত আসেন।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সম্বন্ধ প্রমিতিলালের প্রস্তাবে ও সহায়তায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খৃঃ ১২ মে কলিকাতা থেকে ‘নিপ্পন যুসেন কাইশা’ কোম্পানীর ‘সানুকী মারু’ (Sanuki Maru) নামক জাপানী জাহাজে গিয়া, এন্টেগোর এই ছদ্মনামে জাপান যাত্রা করেন। এই কার্যে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন—জ্যোতিষ চন্দ্র সিংহ (পঞ্চপতি), শচীন্দ্র নাথ সান্ম্যাল, ও গিরিজা বাবু (নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বভাষচন্দ্র বসু তাঁর কলিকাতা বাস গৃহ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আত্মগোপন করে ভারত ত্যাগ করে বিদেশান্ত্রিমুখে যাত্রা করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে স্বভাষচন্দ্র জার্মান হইতে স্বীয় জীবন বিপন্ন করেই সাবমেরিন যোগে বার্মা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেন। পরে জাপানেও যান। সেখানে রাসবিহারীর সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army) গঠন করেন। রাসবিহারী তরুণ বিপ্লবী স্বভাষচন্দ্রকে পেয়ে তাঁর হস্তেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা ধারণের জন্ত ভার্য্যপণ করেন। রাসবিহারী স্বভাষচন্দ্রকে ‘নেতাজী’ উপাধি দান করেন। ইহার পর ১৯৪৫ খৃঃ-এর ২১ জানুয়ারী রাসবিহারী জাপানে পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম ২৫ মে, ১৮৮৬ খৃঃ। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাষচন্দ্র “নেতাজী স্বভাষ” এই নামেই ভারত ও বহির্ভারতে সর্বত্র সম্মানিত হয়ে আসছেন এবং তাঁর প্রতি অশেষ প্রদীপ্যরূপ বিভিন্ন স্থানে দেশবাসী তাঁর মর্ম্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এখনও করে চলেছে।

(৪) “The Governor of French India”
Officier de la Legion d’Honneur

According to the ‘Ordonnance Organique of 23rd July 1840 and the Decret of 19th March 1912 on the Press Law, applicable to French India, under restrictions.—

Considering that the Journal Prabartak of Chandernagore continues, inspite of the notices of the Administrator, to publish articles and photographs which go beyond the ordinary rights of the press, that particularly in its No. 10 of the month of December, while declaring that it is an heinous act to excite young men to commit murder, it is not a witless in its fervour to publish such ideas to which its attention had already been drawn by the Administrator.

The Conseil Prive having given a hearing, orders :

Art. I—The permission given to the Journal “Prabartak” of Chandernagore to appear in French and Bengali is suspended for three months.

Art. II—The present order be notified to the responsible Editor (Gerant) of “Prabartak” by the care of the Administrator of Chandernagore.

Pondichery, 14th January 1925.
(Sd) Gerbinis.

[ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত]

(৫) ভারত সরকারের নিষিদ্ধকরণ বিজ্ঞপ্তি

[Extraordinary Gazette of India, Delhi, 6th March, 1925].

“In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Sea Customs Act 1878 (VII of 1873), the Governor General in Council is pleased to prohibit the bringing by sea, or land into British India of any copy of any book, newspaper or periodical printed at the Sadhana Press in Chandernagore, or published at the Prabartak Publishing House in Chandernagore.”

সাহিত্যের আসর

দীপংকর সেন

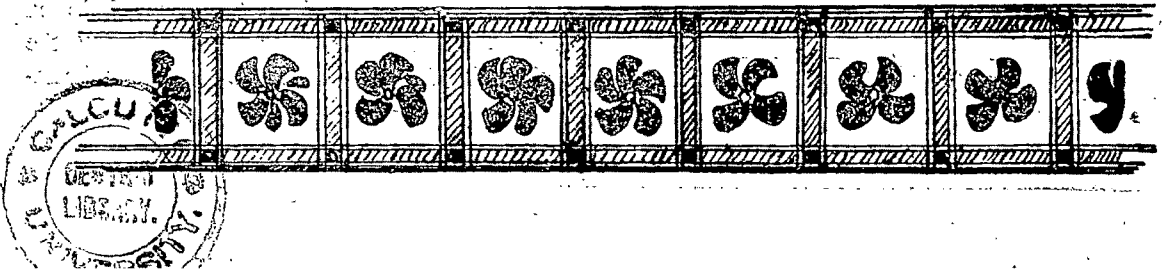
পদ্মরাগমণি হরিদাস পালের বাড়ীতে সাহিত্য সভা বসেছে। পালরংশের উর্ধ্বতন পুরুষ একদা রাঢ় দেশের অধিপতি ছিলেন। তাই হয়তো আজও তিনি উচ্চা-সনে বসতে অভ্যস্ত। যদিও তাঁর পুত্রেরা এখন তেলে ভাজার দোকান দিয়েছে শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে। মুখ রুচি। হরিদাস যে আসনে বসেছিলেন তা কারুকার্য-খচিত সন্দেহ নেই।

অনেক সাহিত্যরসিক সমাগম হয়েছে। সপ্রতি যে পুস্তক-ব্যবসায়ীর গৃহতল্লাসী করে পুলিশ নগদে ও গহনায় পাচ লক্ষ টাকা পেয়েছে, সেই কুবের মিত্র ও এসেছেন। সাহিত্য সভায় তিনি পরমপুরুষের মতই বিনয়ের অবতার। তিনি যত্ন যত্ন হাসছেন; আর কটাক্ষ পাত করছেন অশ্রুদী শ্রেষ্ঠ। অপ্সরীদেবীর প্রতি। অপ্সরীদেবী সম্প্রতি মদন মহাকাব্য রচনা করে যশস্বিনী হয়েছেন। গোপনে কুবের তার নামে একটা ব্র্যাংক চেক উপহার দিয়েছেন। এবার পুজায় তিনি সর্বাধিক প্রচারের সুবিধা পাবেন প্রথম দফাতেই তার পূর্বভাষ্য দিয়েছেন। ক্ষেমংকরী দেবী সম্প্রতি বিদূষীরত্না উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁকে সকলেই সম্মিহ করে চলে। অগ্নীলতার-বিকল্পে তিনি ইদানিং কলম ধরেছেন। আধুনিক তরুণ-তরুণীদের জীবনের প্রতিটি দিকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে এইসব কাজে ধিক্কার জানিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'বাক্কল্পে'। পাড়ার ছেলেরা গল্প চাইতে গেলে হেসে বলেছেন লিখেই তো বেঁচে আছি। কতটাকো দেবে বল? কুড়ি টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ছেলেরা চাপা স্বরে বলে শা...শাইলাকু। পেলে মাংস টেনে নেয়। সে হেন

ক্ষেমংকরীদেবী পড়লেন একটি ছোট গল্প 'রামহরির গঙ্গাযাত্রা'। ছেলেমেয়ে সবাই শোকে কাতর। আহা বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন। তার এই শোকসভা দেখে কি খুলিই না হতেন। রামহরি তখন স্বর্গ থেকে শাপান্ত করছেন। একদিনও ওরা মর্তে তিষ্ঠোতে দেয়নি। প্রতিদিন বলেছে উইল করে দাও। সরকারের ও ভীমরতি ধরেছে। নইলে সোমথ মেয়েদের ট্যাকের পয়সা খরচ করে বিয়ে দেওয়া হোল, সেবা না করে জানতে চাইছে ব্যাংক ব্যালেন্স কত? ছোট মেয়েতো গালে একটু উষ্ণ পরশ দিয়ে বললে, কিছু না দাও তোমার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ীটা অন্তত আমাকে দিয়ে যেও ড্যাডি।

সভাপতি ডঃ তুর্গাশংকর বললেন, দিদিমনি এবার তো সময় দিতে হচ্ছে পদ্মলোচনকে। তুর্গাশংকর ছাগ-ছদ্ম সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। শোনা যায় জার্মানীতে ওর থিসীসটা তাঁর একমাত্র বন্ধু ওয়েসিম পড়ে মুগ্ধ হয়ে নিজের ছাপাখানা থেকে অশ্রু করে একটা স্পেশাল ব্র্যাণ্ড সার্টিফিকেট তৈরী করে পাঠিয়ে দেয়।

পদ্মলোচন বললে, আমার বক্তব্য গল্প নয়, কবিতা নয়, গবিতা। জন্মদীপ রহস্ত। তিনি দীর্ঘ ছবুটা বুকনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন জন্মদীপ অর্থাৎ জন্মবানই একমাত্র নরোত্তম। কারণ পদ্মরাগমণি হরিদাস পালের মতই তিনি সব বিত্তা বিশারদ ছিলেন। সবাই বললে, আহা আহা। এমনটি আর শুনিনি। তারপর হল মিষ্টান্ন ইতরেজন। আসর ভাঙলো। হাওয়া গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে উবে গেল।



সাময়িকী

গড়ের মাঠে শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা :

গত ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫, অপরাহ্নে বন্দেমাতরম ও শঙ্খধ্বনির মধ্যেভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিকটে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের মূর্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হয়। মূর্তিটি উচ্চতায় ১২ ফুট এবং ব্রোন্জের। শিল্পী শ্রীহৃষিকেশ দাসগুপ্ত। এই মূর্তি নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। যে বেদীতে মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে সেই বেদীতেই একদা লর্ড কার্জনর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশ্চর্য ইতিহাসের পরিহাস।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ বি. ডি. জাতি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন ও ভাষণ দেন। পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন মূর্তি প্রতিষ্ঠার রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেন : “সত্যদ্রষ্টা ঋষির সম্মুখে যেন ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন, পেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস।

এরিক ভন ড্যানিকেন :

আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিতর্কমূলক ব্যক্তি এরিক ভন। মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর মত এমনি চমকপ্রদ যে গ্রহণও করা যায় না, অগ্রাহ্যও করা চলে না। পাঁচ খানি পুস্তক রচনা তিনি করেছেন যার চাহিদা ব্যাপক। সম্প্রতি তিনি ভারত ভ্রমণ করে গেছেন, তাঁর মতবাদের সমর্থনে প্রকৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের অনুসন্ধান। এরিক ভনের প্রতিপাদ্য এই যে মানব সভ্যতার প্রভাত হইবার পূর্বে দুই বুদ্ধিমান দলের মধ্যে cosmic যুদ্ধ হয়। পরাজিত দল এই পৃথিবী গ্রহে এসে নিজেদের প্রতিকৃতির অনুকরণে প্রথম মানব সৃষ্টি করেন : “with their knowledge of molecular biology and the genetic code from the existing hominide (apes) by artificial mutation.”

ড্যানিকেন প্রশ্ন তুলেছেন, এই দেবতারা কারা? এরা কি বায়বীয়? না অথ কোন গ্রহের মানুষ?

এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য ড্যানিকেন দেশ দেশান্তর ঘুরেছেন প্রকৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। গ্রহান্তরের দেবতার কথা হিন্দু পুরাণে উল্লেখ আছে দেখিয়া তিনি বলেন, ধর্ম বিশ্বাসে আমি প্রায় হিন্দু।

স্বামী চিদানন্দজী স্মরণে :

গত ২৭শে আগস্ট ১৯৭৫ বুধবার এগারটায় প্রবর্তক ভবনের (৬১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট) সিঁড়ি পথে স্বামী চিদানন্দজীর পুষ্পমালাসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রবর্তক স্ট্রাফের অর্থ প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ সমবেত হইয়া তাঁর ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুষ্প স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করেন। স্ট্রাফের সম্পাদক শ্রীহিন্দুভূষণ রায় প্রবর্তক পত্রিকা হতে ৪০ বৎসর পূর্বে লিখিত তাঁর স্মৃতি কথা পাঠ করেন। অতঃপর প্রবর্তক সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের প্রেরিত বাণী পাঠিত হয়।

পূজনীয় শ্রীদত্ত লিখেছেন—

“২৭শে আগস্ট আমাদের সজ্জাগ্রজ স্বামী চিদানন্দজীকে হারিয়েছি—৪০ বৎসর আগে। তাঁর উৎসর্গসিদ্ধ জীবন, তাঁর প্রেরণা, তাঁর শ্রীগুরু দেওয়া সন্ন্যাসের দীক্ষা ও সন্ন্যাসী হয়ে, গুরু-নিরূপিত অর্থব্রতের সাধনা সবই আজ আবার স্মরণ করব। তাঁর অমর আত্মাকে সমবেত অধ্যাত্মচেতনায় আহ্বান করে তাঁর আশীর্বাদ পাব। তাঁর মধ্য দিয়ে শ্রীগুরুর প্রবর্তিত সজ্জের অর্থযজ্ঞে আমরা যারা সহদীক্ষা নিয়েছি, আমরাও তাঁর আশীস-পূত হয়ে এই অসমাপ্ত মহাযজ্ঞ সর্বতোভাবে সিদ্ধ করবো, পূর্ণ করব—তাঁর প্রতীকস্বরূপ এই প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে সেই গুরুসঙ্কল্পই আমরা অন্তরে পুনরায় সুদৃঢ়তর ভাবে গ্রহণ করব। সজ্জের এই অর্থ-সাধনাকে সুসিদ্ধ করব। শ্রীভগবান ও সজ্জমাতৃকার নিকট আমাদের এই সম্মিলিত প্রার্থনা।

তারপর প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধাবরণ চৌধুরী সংক্ষেপে স্বামীজীর শ্রীগুরুদত্তমিশন এবং আমরণ সনিষ্ঠায় সেই ব্রত সিদ্ধ করার চিত্রটি বর্ণনা করেন। উপসনান্তে পূর্ণমদঃ উদগানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

হিন্দু পরিষদ :

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণ ও বিশ্বব্যাপী নানা দেশে, ছড়ানো হিন্দুদের একাঙ্গুড়ে

আবদ্ধ করতে ব্যাপক কাজ করছেন। অনেক গুরু স্থানীয় ও হিন্দু সমাজে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগণ্য ব্যক্তি এই পরিষদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। ধর্মাস্তরিত হিন্দুদের হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রত্যাবর্তনেরও ব্যাপক কর্মসূচী এই পরিষদ গ্রহণ করেছে। ক্রমশঃ বহু ধর্মাস্তরিত হিন্দু বিশেষ খৃষ্টি-ধর্মী হিন্দু এই পরিষদের প্রচেষ্টায় পৈতৃক হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি দেহানু, জওহর ও তালাসরি তালুকের ধর্মাস্তরিত ৩০টি খৃষ্টান পরিবারের ২০৪ জন পুত্ররায় হিন্দু সমাজে ফিরে এসেছে। এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে এদের সাদর-আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি যাগযজ্ঞ হোম বৈদিক মন্ত্রোদগানের মাধ্যমে পূত পবিত্র ও ভাবগম্ভীর হয়। অনেক পণ্ডিত বিদ্বান ব্যক্তি এই উপলক্ষে ভাষণ দেন।

সিদ্ধাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মহাপ্রয়াণ :

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃ সাড়ে পাঁচটায় শ্রীশ্রী ১০৮ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সজ্ঞানে সমাধিযোগে বিদেহী হন। স্বামীজী আড়রা (বাঁকুড়া) ভক্তিকানন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মর্ত্য আয়ু হয়েছিল ৮০ বৎসর।

স্বামীজী জাতি ও সমাজের মঙ্গলের জন্ম আজীবন

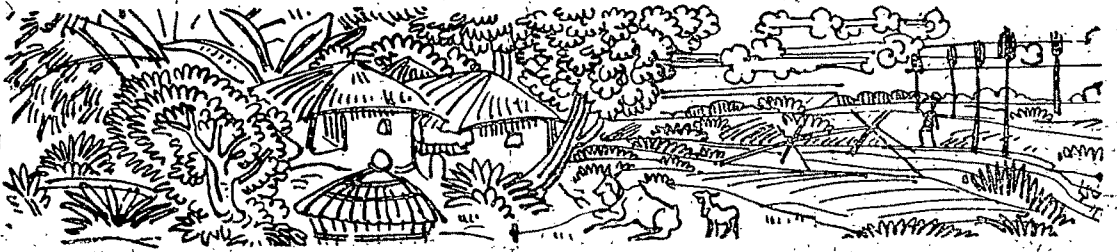
আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত ছিলেন। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী কামনায় শ্রীশ্রী বাসুদেব মহাযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বহুবিধ বৈদিক কর্মে ব্রতী ছিলেন। তাঁহাকে শেষ ভ্রাতা জানাবার জন্য শিষ্যশিষ্যা এবং অগণিত ভক্তজনদের সমাগম হয়। এতদঞ্চলে তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ সকলেই বিশেষ মুহূর্ত্তমান ও শোকাহত।

দফরপুর প্রবর্তক বিদ্যামন্দির :

(প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)

গত ১৮ই আশ্বিন, ১৩৮২ (ইং ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৫) রবিবার অপরাহ্ন ৩টায় দফরপুর প্রবর্তক বিদ্যামন্দিরের ষোড়শ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব ও অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পোরোহিত্য করেন চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য। অভিভাবক ছাড়া স্থানীয় বহু দর্শক অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

অগ্রাণু সহকারী শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক শ্রীজয়দেব পাল-বিশেষ মুগ্ধভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।



সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী । নির্বাহী সম্পাদক : শ্রী রবি ক

প্রবর্তক পাব্লিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্তক প্রিণ্টং এণ্ড হাউসটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীমণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত।

৬০তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

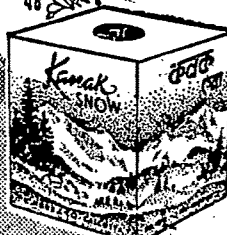
প্রবন্ধ



কাঙ্ক্ষিক ১৩৮২
অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৫



আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারিত সামগ্রী

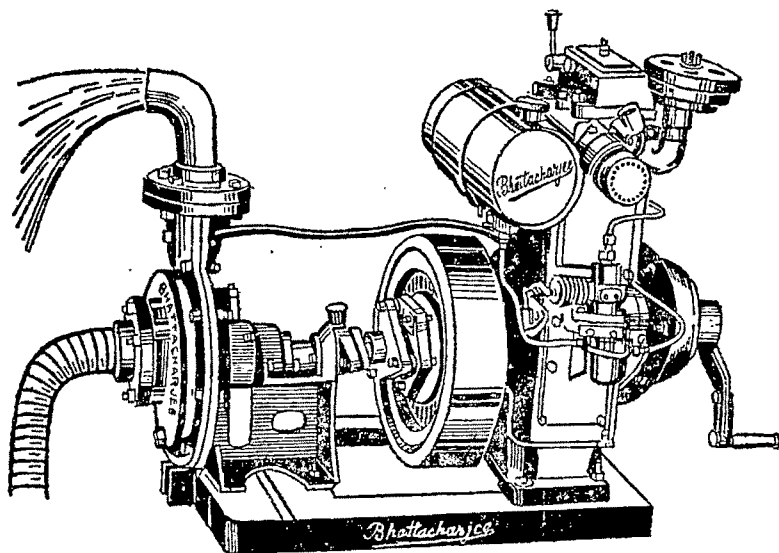


কি. হোড ২৩ কো. • কলিকাতা-১৯

ভারত সরকারের গ্রামাঞ্চাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অগাঢ় সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং মেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্সমিট, ড্রাক্সো,
ভালভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, ষ্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং মেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : "মেসিনারিস"

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

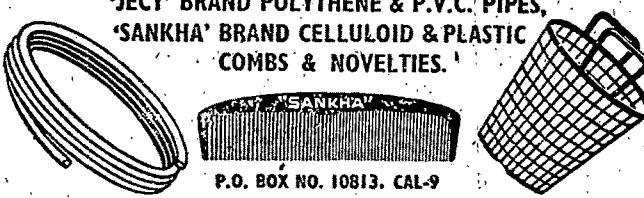
Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813. CAL-9

D. RATAN & Co.

Photographers **PHOTO**

CORNWALLIS ST. CAL-6

PHONE : 54 - 5711

ডিরতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স **ফটো**

২২১ কণওয়ারিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ৫৪ - ৫৭১১

বাংলাসাহিত্যের উপহাস ভাণ্ডারে অভিনব সংযোজন

হাসি চৌধুরীর—

মনীষা—৮০০

ডিমাই সাইজ, মনোরম প্রচ্ছদপট, সুন্দর ছাপা, মজবুত বোর্ড বাঁধাই, উপহার উপযোগী

প্রাপ্তিস্থান : ৩০১ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা—২৭

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিক : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাটারিক : অশোকারিক : ব্রাহ্মী স্নাত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : কাৰ্ত্তিক, ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সত্যেন্দ্র শ্রীমতিলাল	২৬২
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	য়েগুকণা ঘোষ	২৭০
সম্পাদকীয়	...	প্রীরাধারমণ চৌধুরী	২৭১
বেলা বয়ে যায়	কবিতা	শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ	২৭৬
অপরাজিতা	গল্প	অজিতকৃষ্ণ বসু	২৭৭
হিন্দু সমাজ-দর্শনে আচার ও সংস্কার	প্রবন্ধ	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়	২৮৩
পান (Pun)	কবিতা	শ্রীরাইমোহন সামন্ত	২৯১
হৌচট্ট	কবিতা	জ্যোতির্ময়ী দেবী	২৯১
ওনাম, কেরালার বিরাট জাতীয় উৎসব	প্রবন্ধ	শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯২
রক্তচন্দন	গল্প	দীপেন রাহা	২৯৪
বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	আলেখ্য	কিরণেন্দু বাগচী	২৯৬
পুস্তক সমালোচনা		ডাঃ অমিয়কুমার মজুমদার	২৯৯
		শঙ্করজন্মর বন্দ্যোপাধ্যায়	
সভ্য সংবাদ		আশ্রমী	৩০০
সাময়িকী—			৩০৩

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে
অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক
হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ
তার জন্য দায়ী নহে। কপি রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—
সম্পাদকের নহে।

এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া
হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য।
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে
পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ

গীতায় ভগবান ৫.০০

(গীতার যৌগিক জীবনতাত্ত্ব)

মহর্ষি প্রেমানন্দজী প্রণীত

গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গুহ্যতিগুহ্য
রাজযোগের নিগূঢ় মর্মটি এই গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তদুপরি
সহজ প্রাণায়াম মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে
মানসোত্তর লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত
ব্যাখ্যাত।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত

রোগ ও আরোগ্য—৪.০০

যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

স্বপ্নিতত্ত্ব—১.০০

স্বধীরকুমার দত্তের সর্বজন সমাদৃত বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থী
অপরিহার্য গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাধনা—৪.০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাট্টিং, জুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ POLISHING & BUFFING

DOUBLE ENDED-GRINDER
FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



বহুজন দ্বিতীয়

৬০তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

কার্তিক : ১৩৮২

অক্টোবর-নভেম্বর : ১৯৭৫

প্রবর্তক

জীবনের আলো

আজ দেশে গড়িয়া তুলিতে হইবে অসংখ্য গুরু গৃহ। যে বিদ্যুৎ ক্ষুদ্রলিঙ্গ বাসনা ও অহংকার-ভূপে আচ্ছন্ন তাহা পুড়াইয়া ছাই করার নীতি—আত্মসমর্পণ মস্ত্রে দীক্ষা। অহংকার ঘাঁটাইয়া বিপ্লব বহন করিতে হইবে বলিয়া ভীকর মত ঘুরাইয়া নাক দেখাইলে চলিবে না। দলে দলে মানুষকে কল্পনির্দিষ্ট নরনারায়ণের চরণে দীক্ষা লইতে হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাণী পাইয়াছিলাম—“হয় এক মহাগুরু মণ্ডলে এ জাতি সংহতিবদ্ধ হইবে অথবা অসংখ্য গুরু মৃত্তিকে মণ্ডল করিয়া অসংখ্য সংহতি সৃষ্টি হইবে।” আজ দেখিতেছি—অসংখ্য গুরুমণ্ডলের সৃষ্টি। মিথ্যা ধ্বংস পাইবে, কিন্তু সত্যকে হত্যা করিবার সাধ্য বিধাতারও নাই। তাই ভবিষ্যৎজাতির অদ্বিতীয় আশা এই ঋতময় গুরুমণ্ডলগুলির মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, অগ্রে মণ্ডল সৃষ্টি চাই। মণ্ডল-মধ্যবর্তী কোন মানুষ ভাবের ঘরে চুরি করিবে না। ভগবানকে অনির্দেশ্য অব্যক্ত অনন্ত আখ্যা দিয়া, আত্মকামনাপূর্তির ফাঁক রাখিয়া সাধনা করিবে না। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে কল্পগুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিঃশব্দ হইবে। আত্মতর্পণেই আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বর্ণদেউল গড়িয় উঠিবে। হে বাংলার তরুণ! দলে দলে প্রত্যক্ষভাবে নর-নারায়ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জাতি সৃষ্টির এই সন্ধিযুগকে সিদ্ধ কর। মনে রাখিও তুমি ভারতের। ভারতের সত্তা হইতে আজ অপসৃত হইয়া অভ্যর্থনীয় শিক্ষা-সাধনা এমনকি সাধনকেন্দ্র পর্য্যন্ত আজ অভ্যর্থনীয় উপাদান দিয়া রচিত হইয়া তোমার সত্যকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই সতর্ক চরণে অগ্রসর হও। কল্পগুরু প্রত্যেকের জন্ত নির্দিষ্ট আছে। তুমি ভুলিয়া আছ, তাই তাঁকে খুঁজিয়া পাও না। চেতনা জাগাও, উদ্বুদ্ধ হও, গুরুদ্বার মুক্ত হউক। দলে দলে আত্মসমর্পণ মস্ত্রে দীক্ষিত সন্তানবাহিনী আজ দিগ্বিজয়ে বাহির হউক।

অপরের সমালোচনায় যে রসনা ক্ষয় হয়, সে রসনায় নাম করতে পার ভগবানের। যে সময় ব্যয় কর আলোচনায় তা অন্যায়সে পৃথিবীর বুকে একটা উপকারী বৃক্ষ রোপন করেও ধরণীর পূজা দিতে পার। জান, তোমার এই দেহ শৃগাল কুকুরের ভোজ্য, সেবা দিয়ে তাকে দিব্য করার বিধান অবজ্ঞা যদি কর, এর পরিণাম ইহার অপেক্ষা অধিক নয়। সেবা দিবে কি? অহংকার সেবার অধিকার দেয় না; সেবা—অকপট সেবা জীবের, ভগবানের নয়। তিনি সেবার প্রার্থী নন, সেবা তাঁর প্রয়োজন নেই। আর তাঁর সেবা করে কোন লাভও হয় না, নির্বিকারের সেবায় কোন ফলই দেয় না। সেবা কর জীবের, পতিতের, অজ্ঞানীর—অন্ধকে পথ দেখাও, আর্তকে সাহসনা দাও, দরিদ্রকে পুষ্টি দাও—সেবার অধিকার অর্জন কর ॥

—সজগুরু শ্রীমতিলাল

(১৩৩৬ এর প্রবর্তক হইতে)

বেদ-মন্ত্র

প্রথমোষ্টক ॥ চতুর্থোধ্যায় ॥ ত্রয়োদশং স্কন্ধং ॥ চতুর্থী-পঞ্চমী ঋক্
(মণ্ডলস্থ একোনযষ্টীতমং স্কন্ধং)

বৃহতী ইব সুনবে রোদসী গিরো হোতা মনুষ্যো ন দক্ষ ।
সর্বতে সত্যশ্রুতায় পূর্ব বৈশ্বানরায় নৃতমায় যক্ষীঃ ॥৪,
দিবশ্চিন্তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বং ।
রাজা কৃষ্টিনামসি মানুসীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥৫

অর্থ—রোদসী সুনবে বৃহতী ইব । মনুষ্যঃ ন দক্ষঃ হোতা সর্বতে সত্যশ্রুতায় নৃতমায় বৈশ্বানরায় পূর্বাঃ
যক্ষীঃ গিরঃ প্রাশ্রুতৈতি শেষঃ ॥ ৪

জাতবেদো বৈশ্বানরো তে মহিত্বং বৃহতঃ দিবশ্চিং প্রিরিচে । জং মানুসীণাং কৃষ্টিনাং রাজা অসি ।
বরিবঃ যুধা দেবেভ্যো চকর্থ ॥৫

ব্যাখ্যা—রোদসী (দ্যাবাপৃথিবী—দ্যালোক ও ভূলোক) সুনবে (পুত্রের নিমিত্ত) বৃহতী ইব (যেন
বৃহৎ বা বিস্তৃত হইলেন) মনুষ্যঃ ন (মনুষ্য যেমন) দক্ষঃ হোতা (স্তদক্ষ হোতা) সর্বতে (শোভন গমনযুক্ত)
সত্যশ্রুতায় (অবিতথ বলযুক্ত) নৃতমায় (শ্রেষ্ঠ নেতা) বৈশ্বানরায় (বৈশ্বানর অগ্নির জন্ত) পূর্বা (সনাতন,
পুরাতন) যক্ষীঃ (মহতী) গিরঃ (স্তুতি) প্রাশ্রুত ইতি (প্রযুক্ত করিতে সমর্থ হয়) ॥৪

জাতবেদঃ (জাত বস্ত্র সমূহের জাতা) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অগ্নি) তে মহিত্বং (আপনার মাহাত্ম্য)
বৃহতঃ দিব চিং (বৃহৎ দ্যালোক হইতেও) প্রিরিচে (প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন) জং মানুসীণাং (আপনি মনু হইতে
জাত মানবদিগের) কৃষ্টিনাং (প্রজাদিগের) রাজা অসি (রাজা হন) বরিবঃ (অশ্রুতেরপন্থতং ধনম্—সায়ন ।
অশ্রুত কর্তৃক অপন্থত ধন) যুধা (যুদ্ধ করিয়া) দেবেভ্যঃ (দেবগণকে) চকর্থঃ (প্রদান করেন) ॥৫

সরলার্থ—দ্যাবাপৃথিবী পুত্র বৈশ্বানরের জন্ত যেন বৃহৎ হইয়া উঠিল । মানুষ যেমন জাত হয়, তেমনি
স্তদক্ষ হোতা সর্বত্র প্রকাশশীল, অবিতথ বলযুক্ত, নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানর অগ্নিকে বহুবিধ মহতী স্তুতি দ্বারা জন্ম দেন
অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করেন ॥৪

হে বৈশ্বানর অগ্নি । আপনি জাত বস্ত্র সমূহের জাতা—অর্থাৎ উৎপন্ন সকল প্রাণীকেই আপনি অবগত
আছেন । আপনার মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও বৃহৎ । আপনি মনু হইতে জাত মানব প্রজাদিগের রাজা ।
দেবগণের জন্ত আপনি অশ্রুতদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন উদ্ধার করেন ॥৫

বৈশ্বানর অগ্নিকে দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে । জ্যোতিতা, পৃথিবী মাতা । ঋষি
দেবযজ্ঞে অগ্নি সমিদ্ধনে ব্রতী হয়েছেন । ধীরে ধীরে অগ্নি শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে । পৃথিবীর বুক থেকে জাত
হয়ে দ্যালোককেও পরিব্যাপ্ত করে ফেলছে অগ্নির লেলিহান শিখা । স্বর্ঘ করোজ্জ্বলে দ্যাবাপৃথিবী উদ্ভাসিত
হওয়ায় তমিস্রা অপসারিত । দ্যাবাপৃথিবীর পরিধিও তাই বিস্তৃতি লাভ করেছে । বৈশ্বানর অগ্নির ভাস্বরতোজে
বিশ্বভূবন উজ্জ্বল—বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত । মন্ত্রশক্তির দ্বারা এই মর্ত্যভূমি হতে অগ্নির উদ্ভব
হলেও আকাশ থেকে বাতাসের স্পর্শ না পেলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হত না । তাই জ্যোতিতা, পৃথিবী মাতা—কি
অপূর্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তি ॥

সম্পাদকীয়

তত্ত্ব: কিম্

অথ শ্রীগুরু-স্বরূপ-নিরূপণম্।

এখানে সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের যে গুরু-স্বরূপের অবতারণা করা হইতেছে তাহা তাঁর সম্বন্ধে যথল প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বাহিরে। মূলতঃ গুরু—যোগীগুরুই ছিল তাঁর সত্যকার অন্তরঙ্গ স্বরূপ পরিচয় আর সবই—কর্মযোগী, বিপ্লবী নায়ক, অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাবলম্বন নীতির প্রবর্তক, শ্রীমদ্রবিন্দ্রের আশ্রয়দাতা—ছিল আরোপ—লক্ষ্য সিদ্ধির পথে প্রেরণ।

যুগের মানুষ ছিলেন তিনি। যুগ-সংবেদন-শীল মন ছিল তাঁর। যুগসম্মিত ও সংগতির প্রেরণায় সজ্জগুরু যুগধর্ম পালন করিয়াছেন লোক সংগ্রহার্থে ও ভাগবত জাতির অভ্যুত্থান কল্পে। এ কথা সজ্জগুরুজী নিঃসন্দেহে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন : “যুগ চেতনায় ‘আমার প্রাণের সাড়া যদি না সংযুক্ত হয় ভাগবত জীবনবাদের সাধনা যে অসিদ্ধ হয়’। (সং: বা: ২৭-১২-৩৭)। তাই সজ্জগুরু উদ্দেশ্যে তাঁর সাবধান বাণী—“অহমিকায় ভুলে না থাক যে আমরা যুগের মানুষ (সং: বা: ৭-১২-৩৭)।”

সজ্জগুরুজীর আত্মিক ব্যক্তিত্ব ও শিববয়স্ সদগুরু ভাবটি তাঁর উদ্দাম প্রগতিশীল জীবন ও অবিরাম প্রচণ্ড কর্মের দাপটে অনেক সময় চাপা পড়িয়া যাইত—অন্তরঙ্গ মুষ্টিমেয় ঘনিষ্ঠ ছাড়া বাহিরের মানুষের পক্ষে ধরা শক্ত হইত। তবুও তাঁর দিব্য প্রেমবিগলিত জীবনের মধু-গন্ধ—অদেয়া অজানা পারিজাত কুসুমগন্ধের অনুভূতির মতো কাছের মানুষকে পাগল করিয়াছে—করিয়াছিল মাতোয়ারা। এ যেন অনেকটা বাঁশীবাদকের দেখা নাই, মুকুলী-মুহূর্নায় প্রাণমন আকুল র্যাকুল হওয়ার মতো। তাঁর এই আত্মার সংবেদনই তরুণের দলকে ‘জীবন সর্বস্ব’ বলিয়া তাঁর নিকট আত্মনিবেদনে উদ্ধুদ্ধ করিয়াছিল।

এখানেই সজ্জগুরুজীর সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক

দেশসেবী, পরহিতব্রতী কর্মনায়কের পার্থক্য এবং তাঁর ভগবত্তা ও গুরু-স্বরূপের পরিচয় বাহক।

সজ্জগুরুজী তাঁর কারুণ্যবন। গুরুস্বরূপের প্রকাশ-প্রয় এবং জন্ম ও কর্মের অভিসন্ধি সিদ্ধ করার লক্ষ্যে মানুষ খুঁজিয়াছেন—কাতর কণ্ঠে আক্ষেপ করিয়াছেন : “আমি অসহায় যদি আশ্রয় না পাই। সজ্জে আজ অভাব হয়েছে মানুষের। ভোরে উঠে দেখি বিজয়ী ভাগবত ইচ্ছা—প্রার্থটের মেঘের মত মাথার ওপরে ঘনিয়ে—তার অবতরণ ক্ষেত্র নাই। এ এক অদ্ভুত দৈত। ভগবানের মানুষ গড়। ভগবানের এই ইচ্ছা পূর্ণ কর জীবনে। ভগবানের বিরাট ইচ্ছা, তাই এত তাঁর প্রকাশ ক্ষেত্র। সবই যদি সচেতন হয়, ভগবানই মূর্ত হয়—বিগুহ অবিকৃত। ক্ষেত্র অসংখ্য কিন্তু সচেতন নয়—ঈশ্বর প্রকাশ হয় বিকৃত অবিকৃত (সং: বা: ৬.১২।৩৭)।”

সজ্জগুরুজীর এই আত্মপ্রকাশের ব্যর্থতার আক্ষেপ হইতেই বোঝা যায় যে, তাঁর একান্ত কাছের মানুষও অনেক সময় তাঁর ভগবদ্ স্বরূপসত্তার, জীবন ও জাতিকে ভাগবত করিয়া তোলার যুগাভিসন্ধি ধরিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত জনের পক্ষে খণ্ড মানস দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত অখণ্ড ভগবৎ স্বরূপতত্ত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই সদগুরু স্বরূপের উপলব্ধি জন্মাজিত সম্পদ ও সৌভাগ্য সাপেক্ষ বাহ্য ও গুরুরূপে নির্ভর। অপ্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা দর্শনে ইহা হইবার নহে। এই হেতু তিনি বার বার তাঁর জন্ম ও জীবনের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ করিতে চিহ্নিত মানুষের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁর এই গর্ভবেদনায় আকুল হইয়াই চিহ্নিত মানুষকে আহ্বান দিয়াছেন—বেশী নয়, এক শত সর্বোৎসর্গীকৃত নরনারীর।

সজ্জগুরুজীর যুগমিশন, তাঁর ধর্মধারা প্রচলিত ধর্ম ও অধ্যাত্ম ধারণা, ভাবনা ও সাধনার ক্রমপথে নয়—সম্পূর্ণ অভিনব নূতন। তাঁর জীবনীতেই আছে : “পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা। এ পথ অতীতের রচনা নয়—নূতন সৃষ্টি। তাই তপস্বী ও অসাধারণ। এ দিন শেষ হবে, অতি উত্তম যুগ আমাদের সম্মুখে। আজিকার এই উত্তাল বৈপ্লবিক

কর্মতরঙ্গ অতিক্রম কর—নিজেই আলো পাবে। কেন তুমি প্রবর্তক—তার ব্যাখ্যা নিজের চিন্তেই খুঁজে পাবে। পরোক্ষ অনুভূতির চেয়ে অপরোক্ষ অনুভূতি শ্রেষ্ঠ। আপনার ভিতর মিশন মূর্ত হলে তোমার নিঃসংশয় জীবন... আনন্দ ও শান্তির উৎস হবে। সর্বভূতহিতর মহেশ্বরকে নিজেই দেখে তখন কৃতার্থ হবে (সং. বাঃ ২১:১২।৩৭)।”

ভাগবত জীবন ও ভাগবত সংস্থা নির্মাণের জন্ম পঙ্কগুরুজী ছিলেন উন্মাদ। মানবতা, মানব সভ্যতাকে একটা উন্নত উজল পরম চৈতন্য ভূমিতে উত্তরণ করিয়া ধরাই ছিল তাঁর জন্মসিদ্ধ প্রেরণা। এই জন্ম উৎসর্গের হোমকুণ্ড জালিয়াছিলেন। ইহারই বেদীমূলে তাঁর চিহ্নিত মানুষের ক্ষুধা মিটাইবার জন্ম আমরণ তপস্বী করিয়া গিয়াছেন। বিগত শতকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাদে দাঁড়াইয়া তাঁর অনাগত আপনজনকে আহ্বান করিয়াছেন। সজ্জগুরুজীর আহ্বানে বাংলার দূর দূরান্ত হইতে যে সব তরুণ তাঁর প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডে গিরিয়া মধুচক্র রচনার আকৃতিতে সমবেত হইয়াছিলেন তাদের প্রাকৃত খণ্ড রসের সংবেদনা হইতে অপ্রাকৃত অখণ্ড রসের ক্ষেত্রে ও রসাস্বাদে সম্মুগ্ধ করিয়া ধরার আকৃতিতে কণ্ঠে তিনি রক্ত বরাইয়াছেন। কি ছিল তাঁর বুকফাটা মর্মবেদনা তা তাঁর কথায়ই বলি :

“হে আমার অন্তরঙ্গ, আমারই বৃকের পাঁজরায় তোরা যে স্থপ্তিধর। আমারই আয়ু তোদের নাসাপুটে বয়। সেখানে যখন দেখি আঘাতের আভঙ্ক, অতীতের ব্যাথা, হৃদয়তন্ত্র যখন কম্পনে সর্বশরীর অক্ষম করে দেয়। একমাত্র পৃথিবীর সঙ্গে এই যোগসূত্রই তো আমার ধর্ম। সেখানে অতীতের আসক্তি বর্জনে কেন এত ব্যথা, কেন এত আতঙ্কের শিহরণ। ওরে অভিন্ন প্রাণের শতদল, তোদের মলিন মূর্তি আমার একমাত্র দুঃখ। তোদের দুর্বল অস্তিত্বটুকুই যে আমার ব্যথা আর এই স্বেচ্ছাকৃত কটক পথে যাত্রাই তো আমার ধর্মে নূতন আসক্তির সৃষ্টি। কেন তা মধুময় হয় না, কেন সান্ত্বনা দেয় না, ভরসায় আমার হৃদয় জাগ্রত রাখে না—নিশি-দিন, জীবন জীবনান্ত কাল।”

এই যে ভগবানের মানুষ হইবার জন্ম গর্ভবেদনা, এ কোন্ মতিলালের? তিনি কে এবং কি?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ছিল তাঁর গুরুস্বরূপ।

শ্রীমতিলালের ভাবের প্রসার, প্রাচুর্য ও গাভীর্য ছিল এমনি যে, বস্তুতঃ বিচিত্র বহুমুখী আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সব্যাসাচী—একাধারে কবি, গীতিকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, ভাষ্যকার, বাগ্মী, সংগঠক, অর্থনীতি সাধক, বিপ্লবী, মহাকর্মা।

একটা অখণ্ড অতিমানস দৃষ্টিকোণ হইতে না দেখিলে, না বিচার করিলে গোটা বস্তুকে বোঝা যায় না। বার বার সন্দির পরিক্রমা করিয়া সর্ব কোণ হইতে সন্দির দেবতার বিগ্রহ পরিদর্শন না করিলে যেমন বিগ্রহের সম্পূর্ণতা দেখা হয় না, এও তেমনি। মনের খণ্ড দৃষ্টিতে দেখিলে বা বিচার করিলে মতিলালের পূর্ণাঙ্গ ভাবমানসটি অধরাই থাকিয়া যায়। বক্ষ্যমান নিবন্ধ লেখকের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সত্ত্বেও এই বোধবিপর্যয় হইয়াছিল। আর্জ অন্তর্গামী আয়ুর জীবন সন্ধ্যায় এই ভ্রমটি অনেকখানি অপনোদিত হইয়াছে, এই সত্য স্বীকার না করিলে মিথ্যা বিনয় করা হইবে।

অপর পক্ষে অখণ্ড প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে একটিবার মাত্র দর্শনে সজ্জগুরু স্বরূপ পরিচয়টি কলির বেদব্যাস যুগ্মাষি শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মা সরস্বতীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

সজ্জগুরুজী তখন রোগশয্যায় শায়িত। উভয়ের দর্শন ও দৃষ্টি বিনিময় হইল মাত্র। কোন বাক্যালাপ নাই। পরে স্বস্থানে ফিরিবার পর স্বামীজী একপত্রে (২৩.১.৬৭) লেখককে তাঁর ইতঃপূর্বের এক দর্শনেন্দ্র কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহাই তাঁর সজ্জগুরু স্বরূপের সত্য অন্তর্ভব। উক্তিটি হইতেছে : “শ্রীশ্রীসজ্জগুরুকে সেবার যখন দর্শন করি, তখন শরশয্যায় ভীষ্মদেবের মতই তাঁকে দেখেছিলাম। একাধারে ক্ষাত্রবীর্যের ও ব্রহ্মণ্য তপঃপ্রজ্ঞাবীর্ষের পরাকাষ্ঠা। মহাভারতের এ এক অতুলনীয় চরিত্র।”

বস্তুতঃ ইহাই সজ্জগুরুজীর স্বরূপ নিরূপণের অশ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

বিভর্তবাদে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানক্রমে যে অদ্বয়জ্ঞান-মূর্তি পরমচৈতনের মাহুদী তহু আশ্রয়ে অবতরণের কথা বলা হইয়াছে সেই ক্রমে সজ্জগুরুজীর মাধ্যমে যে ঐশী শক্তির অবতরণ ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার জীবন ও আত্মাহাই সাক্ষ্য বহন করে। ধর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বনমূলক অর্থ সাধনার প্রবর্তক হিসাবে শ্রীমতিলাল অধিক সুবিদিত। ইহার অধিকও যে তিনি ছিলেন তাঁর সেই স্বতন্ত্র স্বরূপের কথাটি বিচিত্র কর্মের নেপথ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

মানুষীতনু আশ্রিত যে ভগবত্তা তাহার প্রকাশমূর্তি ধর্ম। বস্তুতঃ ভগবান ধর্মমূর্তি—ধর্মের বিগ্রহ। সজ্জগুরুজীর বিচিত্র কর্মপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে তাৎপর্য ও অতিপ্রায় তাহা মূলতঃ এই সত্যটিকে অভিব্যক্তি দেওয়া ও বাস্তবায়িত করিয়া ধরা।

শ্রীমতিলালের সৃষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠানের যে কেন্দ্রায়িত সংস্থা প্রবর্তক ট্রাস্ট তাহার প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে (২৩/৩/৩৪) তিনি সজ্জের অর্থ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শটি পৃষ্ট করিয়া অভিব্যক্তি দেন। তাঁর বক্তব্যের কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

“...এয়ুগে ধর্মপ্রচার অর্থনীতির ক্ষেত্রের ভিতর দিয়াই সফল হবে। তাই অর্থক্ষেত্রে একদল মানুষ (সজ্জের) যে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস রেখাঙ্কিত হয়ে যাওয়া চাই যে, তারা শুধু ব্যবসা-বৃত্তি আশ্রয় করে নেই, তারা একটা বৃহৎ স্বপ্নকে রূপ দিতে চলেছে।

“...এই Economy-কেই আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে ভগবানের মিশনকে সার্থক করার জন্ত। অর্থসিদ্ধি হবে ধর্মের একটা অঙ্গ। যেখানে ইহার অভাব, ধর্ম সেখানে নির্বীৰ্য, শক্তিহীন। ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ হয়নি বলতে হবে। সজ্জ ব্যক্তিগত স্বার্থকে আশ্রয় করেনি, আবার স্বার্থহীন হয়ে মোক্ষের পথেও অভিযান করবে না। একটা বৃহত্তর স্বার্থকে রূপ দেওয়ার

জন্ত সর্বত্যাগী হয়েও যারা সাধারণ জনের মতই অর্থোপার্জন করে চলেছে...শঙ্কর, বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের চেয়েও তারা কোনরূপে হীন নয়, বরং তাদের জীবনে একটা অনাবিস্কৃত সত্য অবতরণ করেছে।

“যারা এই মিশনের জন্তেই জন্মেছে, birth-right নিয়েই এসেছে, তারা আমার “Sacred Trust”-কে চিরযুগ বহন করবে, এ বিশ্বাস আমি করি। ভগবান তাদের আরও শক্তি ও সাহস প্রদান করুন...”

সজ্জগুরুজী অর্থকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। ভাগবত জীবন ও ভাগবত জাতিগঠনের এই মিশন একটা যুগসংগত school of thought যাহার আদ্রা তিনি টানিয়াছেন বিভিন্ন সংগঠন প্রকল্প ও বাণীতে। স্বতন্ত্র অভিনব চিন্তাধারার (school thought) কথা তিনি নিজের বলিয়াছেন। এই মিশনকে সিদ্ধ করিতে তিনি দল বাঁধিয়া লোকের ভীড় জনাইতে চাহেন নাই—চাহিয়াছিলেন ২০২৫ জন খাঁটি উৎসর্গীকৃত মানুষ। তাঁর কথাঃ “ক’জন ছিল শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সাদোপাঙ্গ—এতবড় বস্তুতন্ত্র ধর্মপ্রচারের সহায়ক—দ্বাদশ গোপাল বৈ তো নয়। দক্ষিণেশ্বরের কীর্তি প্রচারের ক’জন সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হয়েছে।

“কয়জনই বা হয় অপ্ৰাকৃত জীবনক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াবার! প্রবর্তক সজ্জ ২৫ জন খাঁটি সাধনপরায়ণ বিশ্বাসী মানুষ যদি থাকে, সজ্জের জয়ছত্র সারা বিশ্বে উড়বে। (সঃ বাঃ ১২।১২।৩৭)।

সজ্জগুরুজীর সজ্জের নিকট আকুল মিনতিঃ “তোমরা জন ২০২৫ আত্মস্ব অপ্রাকৃত জীবনের ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়াও। নূতন ভাগবত ধর্মে দেশে প্লাবন সৃষ্টি হবে। কিছু রেষে হবে না—সে ভোগ অথবা বিদেহ (সঃ বাঃ ১২।১২।৩৭)।”

কিন্তু এই ২০২৫ জন সর্বোৎসর্গীকৃত মানুষই তাঁর স্বপ্নকে, তাঁর School of thoughtকে সার্থক রূপ দিবার জন্ত মিলে নাই। কেন মিলে নাই তিনিই তার কারণ দেখাইয়াছেনঃ “অনেকে রাহতঃ সব ছেড়েছে বটে, কিন্তু স্পৃহা ছাড়েনি। মনে ময়লা হয়তো

পুতিগন্ধময় নয়, কিন্তু ময়লা আছে ভিন্ন ভঙ্গীতে (সং বাঃ ১২।১২।৩৭)।”

সাধকের প্রকৃতির রূপান্তর না হইলে স্থানান্তর বা বিষয়ান্তর হইলেও এই প্রকৃতিগত প্রাকৃত প্রারব্ধলব্ধ সংস্কার দূরীভূত হইবার নয়।

কর্মের নেশা আছে, আছে অর্থেরও একটা যাদকতা যাহা হইতে জ্ঞাত হয় অহংকার ও প্রভাব প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা। সজ্জগুরুজীর তাই সতর্কবাণী : “ধর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে নয়। এই ক্ষেত্রে আপন অন্তর নিয়ে কথা (সং বাঃ ১২।১২।৩৭)।”

কর্ম ও অর্থ সাধনার ক্ষেত্রে এই চারিত্রিক, মানসিক ও সাধন সংকটের অবসর অধিক। সজ্জগুরুজী জাতির মরা প্রাণকে বিদ্যাময় করার জন্ত গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া ধর্মক্ষেত্রে কর্ম ও অর্থকে বরণ করিয়া এই অগ্নি পরীক্ষারই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাই বার বার সতর্ক করিয়া গিয়াছেন : “অর্থ গোণ, মুখ্য উৎসর্গ। তনু মন প্রাণ তুলে দেওয়ার মানুষ ছাড়া আজ দেখি অস্ত্রের পক্ষে এই যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, বরণ যজ্ঞের অঙ্গহানীই হয়। যারা উৎসর্গের মানুষ তাদের সর্বাঙ্গে স্থির করতে হবে—কর্ম (তথা অর্থ) লক্ষ্য নয়, উৎসর্গ লক্ষ্য। যেখানে কর্তৃত্ব সেখানে কৃতিত্ব দেখাবার ভ্রূবাকাঙ্ক্ষা, সেখানেই পতন। সজ্জের আদর্শ এই ক্ষেত্রে স্নান হয়। অতি অল্প লোকই আমার ভাগ্যে জুটেছে, যাদের নিয়ে যুগধর্ম রক্ষায় উত্তম হয়েছি (সং বাঃ ৩১।১২।৩৭)।

অর্থে ও কর্মের একটা নিজস্ব সংবেগ আছে যার প্রচণ্ড নেশায় কন্যা অভিভূত হইয়া পড়ে যদি না মূল লক্ষ্যটি চেতনায় স্থির অগ্নান থাকে।

সজ্জগুরুজী উৎসর্গের মানুষ লইয়া পরীক্ষানীরক্ষার ফলশ্রুতিতে খানিকটা নিরাশ হইয়াই যেন আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন : “হায় দৈব। কি ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে মানুষের জন্ম। এ জন্ত প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানে যুক্তি না হলে, এ জীবন হয় বার্থ। অসংখ্য প্রকার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এই সত্যই স্পষ্টীকৃত হয়। যে অতিনব আদর্শ জীবন আমাদের উদ্ভূত, যদি তোমরা

ইহা সিদ্ধ করিতে পার অবধারিত বিশ্বের প্রাণে নূতন শক্তি সঞ্চার করতে পারবে। ক্ষুদ্র আজ প্রবর্তক সজ্জ কিন্তু বিশ্বের সমস্ত সমাধান ইহার মধ্যেই নিহিত (সং বাঃ ৩১।১২।৩৭)।”

সমস্তা বলিতে এখানে যোগজীবনের ভাবাদর্শের কথা বলা হইয়াছে।

বিশ্বমানবের সমষ্টিকল্যাণ দৃষ্টিতে সজ্জগুরুজীর এই আত্মোপলব্ধিজাত উক্তি বর্তমানকালে মার্কসের প্রতিস্পর্ধী বলা যায়। জীবন ধারণের মুখ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ আজকের দিনে অর্থ। মার্কস ও সজ্জগুরুজী উভয়েই অর্থকে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে পুরোভাগে ধরিয়াছেন বিভিন্ন ধারা, ধরণ ও ভংগীতে। ব্যক্তি নয়, সমষ্টির সমগ্র ও কল্যাণ উভয়েরই ভাবাদর্শ।

সজ্জগুরুজীর সিদ্ধান্ত : “আজ কোন সমষ্টিগত ইচ্ছা অসিদ্ধ থাকতে পারে না। ব্যক্তির সুখ দুঃখ কেন, সাধন ভজন সিদ্ধিও হয় মনে হয়। যদি পরম জয় কিছু থাকে তাহা মানবতার জন্ত। আমার আত্মদানে ইহা সফল হবে, সার্থক হবে, এ প্রত্যয় অগ্ন্যাজ্জল আমার চেতনায়। তাই বলি বজ্রকণ্ঠে “ওরে প্রবর্তক সজ্জের মানুষ, শুধু জাতি নয়, বিশ্বমানব যুক্তির অভয় মস্ত্রে ত্রোদের দীক্ষা। সময় নাই হস্ত পরিহাসের, যুক্তিতর্কের, রণজয় চাই-ই চাই। (সং বাঃ ১৫।১০।৩৭)।

পরক্ষণেই আত্মবিশ্বাসের বজ্রবিধাণ কণ্ঠে তাঁর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত তুলিয়াছে : “ইহা নিঃস্ব উলংগের কণ্ঠে বিকৃত ব্যাংগ নয়—বিশ্বসম্রাটের আসনে দাঁড়িয়ে এই মহাবাণী আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় (১৫।১০।৩৭)।”

একজন মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসী সজ্জগুরুজীর আত্মবিশ্বাসকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া নেহাৎ পরানুকরণবিকৃত উপরিচর মানসের লঘুতা হইবে। সনাতন ভারতের দৃষ্টিকোণ হইতে এই দস্তোজি অবশ্য বিচারণীয়। ব্যক্তি ও সমষ্টিবাদের বিষয়ে সজ্জগুরুজীর অভিমত : “ব্যক্তি আদৌ একক নয়, প্রতি মুহূর্তে অস্ত্রের সহযোগিতা ব্যতীত বাঁচেনা। ...তাই যোগ আমাদের গোড়া থেকেই মানবতার জন্ত। এ যে কি বৃহৎ সজ্জ তা

অনুভবের বস্তু। ব্যবহারিক জগতের সাম্যবাদের উর্দ্ধে পরমক্ষেত্রে এই যে মানবতার প্রতি আন্তরিকতা এখানেই সাম্য সম্বন্ধ সুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদের ইহা চূড়ান্ত। প্রবর্তক সজ্ঞ বৃহত্তর চেতনায় সাম্যবাদী (সঃ বাঃ ২৫ ১০।৩৭)।”

কাল মার্কস-এর বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব তথা সাম্যবাদের আবেদন আজ সুদূরপ্রসারী—বিশ্বচিহ্ন প্রবৃদ্ধ। সমাজতত্ত্বের প্রথম পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। ভিত্তি ইহার অর্থনৈতিক। ব্যক্তিগত অধিকার বিলোপ এবং সামাজিক মালিকনার প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন বটনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শোষণের অবসান ঘটানো এবং সমাজের প্রত্যেককে সমান সুযোগের অধিকার দান। সমাজতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্যায় সাম্যবাদ। সাম্যবাদের লক্ষ্য সমষ্টি কল্যাণ। ভারতীয় অধ্যাত্ম পরিভাষায় বলি যায়, সাম্যবাদে সমাজে ব্যক্তি মানুষ হইবে সমষ্টি কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

লক্ষণীয় এই যে, মূল লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ে সাম্যবাদ ও সজ্ঞগুরুজীর সজ্ঞে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তাত্ত্বিক, স্বজন-দর্শন ও মানব প্রকৃতির রূপান্তর ব্যাপারে মার্কসীয় সমাজদর্শন অগভীর উপরিচর। শেষ পর্যন্ত—প্রকৃতি ও প্রাক্তন সংস্কারের রূপান্তর ব্যতীত মার্কসীয় সাম্যে বৈষম্য সৃষ্টি হইতে বাধ্য। মার্কসবাদে ধর্মের সমষ্টিগত সামাজিক ক্ষেত্রে কোন ঠাই নাই—ব্যক্তিগত অধিকার অবশ্য আছে ধর্মচরণের। অপর পক্ষে সজ্ঞগুরুজীর সমাজ ও সাম্য দর্শনে অর্থ ধর্ম্যাংগ। ধর্মই সমাজ, রাষ্ট্র ও কর্মের নিয়ন্ত্রক। মার্কসবাদ প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিকৃত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ধর্ম ধারণায় এক মাত্র ধর্মই মানবপ্রকৃতির রূপান্তর ও দিব্যায়ণে সমর্থ। ধর্মই স্বাবর জংগম সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে। বিশ্বসৃজনে বৈষম্য অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম আইন করিয়া, সমানাধিকার দিয়া, শাসন করিয়া, হত্যা করিয়া, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সাময়িক হইলেও, শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রম করা সম্ভব নয়। ধর্মের অনুশাসনে ইন্ডিয়নিগ্রহ ও জৈব চেতনার উদ্বর্তনে ইহা সম্ভব। এই

হেতু সজ্ঞগুরুজী মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রবর্তক সজ্ঞ বৃহত্তর চেতনায় ক্ষেত্রে সাম্যবাদী।

বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের প্রতিপাত এই যে, সমাজতত্ত্বের চরম পর্যায়ে সাম্যবাদ স্বসিদ্ধ হইলে অর্থাৎ সমাজে মানুষের সবারই সমান সুযোগ ও অধিকার অর্জিত হইলে এবং ভোগ স্বাস্থ্যের অভাব অনাটন মিটিলে স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে—কাহারও মধ্যে ঈর্ষা ঘেষ বিঘেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আত্মকেন্দ্রিকতা থাকিবে না। ভারতীয় জীবন ও জগৎ দর্শনে এই দেহসর্বস্বতা মানব প্রকৃতির সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ইহা নিছক শূন্য ধর্ম। মানুষ কেবল উদর চেতনায় শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। বৃহত্তর আত্মপূর্ণতা ও এষণা আছে—আছে বলিয়াই সাম্যবাদ ভৌম চেতনায় সন্তবপর হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নহে। সজ্ঞগুরুজী তাই বৃহত্তর বৃক্ষচৈতন্যে উৎসর্গের কথা বার বার বলিয়াছেন যার চরম পর্যায় আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে জৈব চেতনা ভৌম চেতনায় রূপান্তর লাভ করে। রূপান্তরে জীবসত্তার কোন দেহাত্মবোধজনিত অহং ভাব থাকে না। উৎসর্গ মানসাতীত অপ্রাকৃত পরমে হইলে ফাঁকি অর্থাৎ আত্মভোগপ্রীতি-বাহা থাকিতে পারে। কিন্তু দেহধারী সদৃশরূপে উৎসর্গে অহংবুদ্ধির কোন অবসর থাকে না। সজ্ঞগুরুজী এই গুরুস্বরূপে আকৃষ্ট হইয়াই সজ্ঞের কাছে উৎসর্গের দাবী করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সজ্ঞগুরুজীর ধারণায় মানবতা—ভাগবত মানবতা। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ দেবজন্ম অর্থাৎ ভাগবত জীবনের আধিকারী। এই হেতু তিনি জাতির ভ্রণ মূর্তি হিসাবে তাঁর সৃষ্ট পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে প্রবর্তক সজ্ঞে উৎসর্গ মূল মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে করা যায় যে, মার্কসবাদ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে পূর্ণকাম (fullfill) হইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হইতে বাধ্য। ধর্ম ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে অর্থকে পরমার্থক্ষেত্রে মর্যাদার আসন দিয়া সজ্ঞগুরুজী ভারতাত্মার দিক হইতে বর্তমান যুগের প্রচণ্ডতম চ্যালেঞ্জের প্রভুত্তর দিবার মাধ্যম হইয়াছেন। এদিক

দিয়া সজ্জগুরুদ্বী সত্যই যুগের মানুষ—আগ্রাসী অগ্রগামীদের পথিকৃত।

বিষয়টি জটিল ও বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ যার অবসর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে নাই।

শ্রীগুরুরূপ নিরূপণের প্রসঙ্গ লইয়া সম্পাদকীয়-এর অবতারণা। সজ্জগুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন যোগী—পরমচেতনের সংগে সংযুক্ত জীবন ছিল তাঁর। গভীর তত্ত্ব দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন সবই যোগাক্রান্ত অবস্থায়। সংক্ষেপে গীতার ভাষায় তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি ছিলেন যোগী—তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মীর অপেক্ষাও অধিক—“তপস্বিতোহধিকো যোগী জ্ঞানিতোহপি মতোহধিকঃ কর্মিত্যাস্তাধিকো যোগী।” কেবল যোগী নয় যোগীদের মধ্যেও যুক্ততম—‘যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতোনান্তরাঙ্গনা।’

বস্তুতঃ সজ্জগুরুদ্বী ছিলেন চেতনায় এবং প্রতিটি চিন্তা ভাবনা ও কর্মে যন্ত্রীর যন্ত্র—ব্রহ্মচেতনে আত্মগত প্রাণ।

উপসংহারে উল্লেখ্য যে, সজ্জগুরুদ্বীর স্বরূপ নিরূপণে এখানে তাঁর যত বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে সবই তাঁর জীবন বির্তনের ষষ্ঠ দশক ও বর্তমান বিংশ শতকের চতুর্থ দশক (১৯৩১—১৯৪০) হইতে। অথচ এই দশকটি ছিল তাঁর প্রচণ্ডতম কর্ম ও অর্থসৃষ্টির স্বর্ণযুগ। তাৎপর্য এই যে, আকর্ষণ কর্মের মধ্যে ডুবিয়াও তিনি তাঁর

মৌলিক আত্মস্বরূপ-স্মৃতি হইতে এতটুকুও বিচ্যুত হন নাই। সব কিছু করিয়াছেন যোগাক্রান্ত হইয়া।

*

মাতৃপূজাস্তে প্রবর্তক তথা প্রবর্তক সজ্জগুরুর বিজয়ার ইষ্ট আভাষণ সজ্জপ্রতিভা হিসাবে সজ্জ সভাপতি শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত দেশবাসীকে জানাইতেছেন :

“অশ্মিন্বেব জীবনে নরজন্ম প্রদীপ্ততাম”

—এই প্রার্থনাই মহাপূজ্য মহামাতৃকার কাছে করিয়াছি। মাতৃপ্রসাদ লাভে আমাদের দেহ-প্রাণ-মন সুপ্রসন্ন হউক। নিষ্পাপ আধারে শ্রীগুরু ও শ্রীমায়ের কারুণ্যামৃত অঙ্গপ্রাধারায় অবতরণ করুক, সেই ধারান্নানে সর্বদা অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত হউক—ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-জীবন। বাংলায় ও ভারতে চিহ্নিত নবজাতির অভ্যুদয় অবশ্যজ্ঞাবী। শুভ বিজয়ার মাতৃকৃপা সকলেই লাভ করুন—এই প্রার্থনা ও নিবেদন।

ক্রটি স্বীকার : প্রবর্তকের অনুরাগী সহৃদয়দের নিকট হইতে যে সব বিজয়ার শুভেচ্ছামূলক পত্র পাইয়াছি সব পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রবর্তকের মাধ্যমে আমাদের আন্তরিক প্রেমপ্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং পরমকারুনিকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি সবারই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স।

অনিবার্য কারণে পূজা সংখ্যার জ্ঞাত প্রাপ্ত রচনা প্রকাশ হইতে না পারায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বেলা ব'য়ে যায়

শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ

মন তুই তার কত খেলা,
খেলবি রে বল এই ভাবে।
জন্মাবধি খেলেই যাচ্ছি,
সে খেলা তোর ভাঙ্গবে কবে।
চেয়ে দেখনা হৃদ গগনে,
বেলা তো প্রায় যায় চলিয়ে।
তোর আয়ুর্হর্য অস্তগামী,
জীবন-সম্ব্যাসে ঘনিয়ে।
স্থির চিন্তে ভাব দেখি মন,

কি সব খেলা করলি ভবে।
যে খেলা তোর পারের ভেলা,
করলি কিনা দেখনা ভবে।
এখনো যেটুকু আছে বেলা,
করিস্ না আর মিছে খেলা।
কৃষ্ণ-ভজন করবি বলে
আসলিরে তুই ধরাতলে।
সেই খেলাটি কর যতনে,
ভয় রবে না আর শমনে।

অপরাজিতা

[শুভংকর চৌধুরীর ডায়েরি থেকে]

অজিত কৃষ্ণ বসু

আমি অধিতীয় ফিল্ম-ডিরেক্টর শুভংকর চৌধুরী, অপরাজিতার কাহিনী লিখতে বসেছি। সেই সঙ্গে অনুপমের কাহিনীও, কারণ আমার সদ্য রিলীজ পাওয়া ফিল্ম 'শেষ ছবি'তে এরা নায়িকা আর নায়ক।

সাধারণত: আমি নিজেই আমার ছবির জন্যে নতুন নায়িকা খুঁজে বার করি। কিন্তু অপরাজিতা তার প্রথম এবং শেষ ব্যতিক্রম। সে-ই হঠাৎ একদিন এসে আমার বাড়ির তেতলার ছাদের এক কোণে আমার ছবি আঁকার স্টুডিওতে এসে হানা দিয়েছিল।

আমার এই স্টুডিওর সঙ্গে সিনেমা জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। সিনেমা জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া ঠিক করেই এই স্টুডিওটি তৈরি করিয়েছিলাম, চলচ্চিত্র ছেড়ে আবার অচল চিত্র শিল্পেই ফিরে যাব বলে—মুভি পিকচার ছেড়ে স্টিল পিকচারে।

আমার সাতমাস আগে মুক্তিপাওয়া ছবি 'অপরাজিতা' তখনো একসঙ্গে অনেকগুলি ছবিঘরে হাউসফুল দিচ্ছে। নায়িকার ভূমিকায় উর্মিলা আর তার বিপরীতে নায়ক আনন্দ অসাধারণ অভিনয় করেছে তাদের প্রথম ছবিতেই। তার জগ্গে লোকে ওদের চাইতে আমারই প্রশংসা করেছে বেশী, বলেছে নিতান্ত আনাড়ীকে অনবদ্য শিল্পী বানাবার নির্ভুল নিখুঁত যাত্র নাকি একমাত্র আমারই জানা আছে।

আমাদের সিনেমা জগতে আমি খ্যাতি, সম্মান, জন-প্রিয়তা, প্রতিপত্তি আর আর্থিক সাফল্যের উচ্চতম শিখরে। যত টাকা রোজগার করেছি সিনেমা থেকে, তার পরিমাণের ইংরেজী বিশেষণ হচ্ছে 'ফ্যাবিউলাস' অথবা 'ফ্যান্টাস্টিক'। আর টাকা রোজগারের আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমাকে দিয়ে ছবি করাবার জগ্গে যে কোন ক্রোরপতি ফিল্ম প্রোডিউসার আমাকে ব্ল্যাক চেক সই করে দিতে রাজি, 'শুভংকরজি' তার টাকা নিয়ে বেপরোয়া উড্ডনচণ্ডীর মতো ছিনি মিনি খেললেও তার মুখ তার হবে না। আমাকে সিনেমা জগতের শুধু সেরা ডিরেক্টর নয়, ডিক্টেটর বলে সবাই।

এজগ্গে আমার গর্ব আর আনন্দের শেষ ছিল না তিনমাস আগেও। কিন্তু আমার সেই গর্ব আর সেই আনন্দ চুরমার হয়ে গিয়েছিল এক তরুণ জড়ভরত ইমবে-সাইল ইডিঅট আলালের ঘরের দুলালের স্টুডিওতে তার আঁকা তেল-রঙা একটি পোরট্রেইট দেখে। সে ডাকসাইটে বড়লোক সূর্যকান্ত বরাটের একমাত্র সন্তান নবকান্ত, যার চেহারা দেখে আমার মন ঘূণায় আর অবজ্ঞায় বিরূপ হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে তাকে তার কিছুদিন আগে বিয়ে করা জীবনসঙ্গিনীর পাশে দেখে। মেয়েটির নাম পদ্মা জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ। 'বিউটি অ্যান্ড দ, বীফ্ট' মনে হয়েছিল আমার। এমন একটি ফুলের মতো মেয়ের জীবন সে মাটি করে দিয়েছে তাকে বিয়ে করে, এই ভেবেই নবকান্তের বিরুদ্ধে আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তার মৃত্যুর পর জেনেছিলাম সূর্যকান্ত বরাটই গরিব ঘর থেকে পুত্রবধূ এনেছিলেন, তার জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ দেখে, এ ব্যাপারে নবকান্তের কোনো হাত ছিল না, এবং তার মতামতও নেন নি সূর্যকান্ত। তিনি আশা করেছিলেন বংশ রক্ষা করবে নবকান্ত, কিন্তু পদ্মাকে কুমারী রেখেই চিরবিদায় নিয়ে সে চলে গেছে। হার্টের অবস্থা তার ভাল ছিল না, তাই চলে যাওয়া সহজ হয়েছে। তার হার্টের চিকিৎসার জন্য শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার আসতেন সপ্তাহে একবার, আর বাকি ছয় দিন রোজ হাজিরা দিয়ে যেত, এক ঘণ্টা করে, তাঁর প্রিয়তম ছাত্র এবং সহকারী তরুণ ডাক্তার, যে ছিল কুমার আর অতি সুদর্শন। সে মুগ্ধ হয়েছিল পদ্মাকে দেখে, আর তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল পদ্মা।

হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচতে পারত নবকান্ত, কিন্তু মরবে বলে মনে মনে কোমর বেঁধেছিল বলেই তাকে বাঁচানো যায় নি। পদ্মাকে সে শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিল পদ্মা যেন আবার বিয়ে করে, কারণ তার বর্তমান বিয়ে কোনো বিয়েই নয়। সূর্যকান্তকেও সে বিশেষ করে বলে গিয়েছিল ইশ্বর যেন পদ্মার জীবনসঙ্গী

হবার জন্মেই তরুণ ডাক্তারকে পাঠিয়েছেন, পদ্মার সঙ্গে যেন তার বিয়ে দেন সূর্যকান্ত, কারণ পদ্মা এখনো কুমারী। সূর্যকান্তরও একান্ত আগ্রহ ছিল নবকান্তর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করে নিজের তুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার; ভেবেছিলেন পুত্রস্থানীয় করে নেবেন ঐ তরুণ ডাক্তারকে। ডাক্তারের ও আগ্রহ ছিল। কিন্তু রাজি হয় নি পদ্মা। তাকে রাজি করার জন্মেই আমাকে তার বাগানবাড়িতে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন সূর্যকান্ত। সেদিনই আমি প্রথম জানলাম নবকান্ত শুধু জড়ভরত হাবা ইডিঅটাই ছিল না, সে ছিল শিল্পী।

পদ্মাই সেদিন আমাকে বলেছিল, “আপনি তো আমার স্বামীর স্টুডিও দেখেন নি। দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেবেন?”

দিলাম। অর্থাৎ হয়ে গেলাম মস্ত স্টুডিও আর তাতে তেলরঙা অনেক ছবি দেখে। একজন ইডিঅট যে এমন ছবি আঁকতে পারে, আর তার এত বড় স্টুডিও থাকতে পারে, তা আগে কখনো ভাবতে পারি নি। ঈজ্জলে রাখা একটি ছবির দিকে দেখিয়ে পদ্মা বলল, “এটি আমার স্বামীর আঁকা শেষ ছবি। আমাকে দেওয়া তাঁর শেষ উপহার। ডাক্তারকে লুকিয়ে, ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে, নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে মডেল করে ওঁর এই ছবি আঁকা। আমি কত মানা করেছি, উনি শোনেন নি। বলেছেন, ‘স্বামীর অবাধ্য হইয়া না, পদ্মা। অবাধ্য হলে পরে পস্তাবে।’ শেষ হল। কিন্তু তিনি বললেন, এখনো তোমাকে দেবার মতো সম্পূর্ণ হয়নি ছবি। ফিনিশিংটাচ বাকি আছে। তুলির দু তিনটি পৌঁচ শুধু।’ এক গভীর রাতে, আমি যখন নিজের অজ্ঞানিতে স্বামীর শয্যার পাশে মোফায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেই ফাঁকে উঠে গিয়ে স্টুডিওতে বাতি জেলে ছবিতে ফিনিশিংটাচ দিলেন আমার স্বামী। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি স্বামী শয্যায় নেই, আলো জ্বলছে স্টুডিওতে। ছুটে গেলাম আমি। আমার ডাক শুনে নাস ছুটে গেল পাশের ঘর থেকে। গিয়ে দেখি ঈজ্জলের পায়ের কাছে বসে পড়েছেন আমার অবসন্ন স্বামী, হাতে তখনও তুলিটি ধরা। বললেন, ‘ফিনিশিংটাচ দেওয়া হয়ে গেছে। ছবি কমপ্লিট। আমার শেষ ছবি তোমাকে উপহার দিয়ে

গেলাম।’ বিছানায় ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তাঁকে। সেই বিছানা থেকেই চলে গেলেন তিনি।”

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে। পদ্মার অপূর্ণ সৌন্দর্য মূর্তিমতি হয়ে উঠেছে তাতে, আর নিশ্চয় ঐ শেষ কয়েকটি ফিনিশিংটাচের তুলির টানেই অপূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে যেন এক রহস্যময়ীর জীবন্ত মুখচ্ছবি। কি ভাবের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে ঐ দুটি চোখে, অধরের কোণে, ললাটে, ভ্রুভঙ্গিতে? বিষাদ? আনন্দ? উৎকণ্ঠা? প্রশান্তি? সুদূর বিদেশে আট গ্যালারিতে দেখে এসেছি সুদূর অতীতের অমর শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা রহস্যময়ী মোনালিসার অমর চিত্র। পদ্মাও ঐ ছবিতে ভেসে রহস্যময়ী।

“অপূর্ণ! এ ছবির তুলনা হয় না। নবকান্ত এত বড় শিল্পী, একথা আমাকে সে বেঁচে থাকতে বলেন নি কেন?” প্রায় আর্টনাদের মূরে বলে উঠলাম আমি। “তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হতাম আমি।”

নিজেকে অপরাধী বোধ করে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে সূর্যকান্ত বরাট বললেন, “আপনাকে বলি নি, কাউকেই বলি নি, কারণ বলতে মানা ছিল। এ ছিল নবকান্তর একান্ত গোপন সাধনা। ছেলেবেলা থেকেই নবুর ছবি আঁকার অন্তর্ভুক্ত শখ দেখে ওকে এই স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম, ভালো প্রণামী দিয়ে গগন আইচ মশাইকে এনে এখানেই রেখে দিয়েছিলাম নবুর ছবি আঁকার মাফটারি করবার জন্মে। তিনিই বলতেন নবু গত জন্মে নিশ্চয় কোনো বড় শিল্পী ছিল, নইলে শুধু একজন্মের সাধনায়, বিশেষ করে এত কম বয়সে, এমন ছবি আঁকা অসম্ভব। একজীবিশনে পাঠাতে চেয়েছিলেন নবুর আঁকা ছবি, কিন্তু নবু কিছুতেই রাজি হয় নি। আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার ওর ঐ অন্তর্ভুক্ত খেয়াল কেন ছিল জানি নে। কিন্তু ওর কোনো খেয়াল, কোনো আবদার আমি অগ্রাহ্য করি নি।”

সেদিন আমি একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে ফিরে এলাম সূর্যকান্ত বরাটের বাগানবাড়ি থেকে। ঐ একটি আশ্চর্য ছবির আঘাতে আমার এত বছরের জমানো গর্ব, আত্মপ্রসাদ সব যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যাকে হাবাকান্ত ইমবেসাইল ইডিঅট বলে তুচ্ছ জ্ঞান করে-

ছিলাম, তাঁর তুলনায় নিজেকেই নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হতে লাগল।

মনে হল নবকান্তর জগৎ আর আমার জগৎ কি ভীষণ রকম আলাদা, যদিও দুই জগতেরই কারবার চিত্র নিয়ে। নবকান্তর সাধনা অচল চিত্রের, স্থির চিত্রের, অচঞ্চল চিত্রের যার শিল্পকর্মে আছে স্থায়িত্ব, যা শিল্পীকে দেয় স্থায়ী খ্যাতি, হয়তো বা অমরত্ব। আর আমার সাধনার ক্ষেত্র আমি বেছে নিয়েছিলাম চলচ্চিত্র, যা চঞ্চল, অস্থির, অস্থায়ী, স্থায়ী খ্যাতি বা অমরত্ব দেওয়া যার পক্ষে অসম্ভব। আমার আজকের এই প্রচণ্ড খ্যাতি আর জয়জয়কারের মেয়াদ কতটুকু? কয়েক বছর বাদেই লোকে ভুলে যেতে শুরু করবে আমাকে। আমার ছবিও দেখানো হবে না তখন। মাত্র দু'এক পুরুষ আগেকার চলচ্চিত্র-মহারথীদের নাম ক'জন আজ মনে রেখেছে? ক'জন তাদের ছবি দেখে? কিন্তু আজও রাফায়েল আর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ করেও আমাদের মনে প্রজ্জ্বলিত আসনে বিরাজিত, আজো তাঁদের আঁকা অচল চিত্র 'ম্যাডোনা' আর 'মোনা লিসা' লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখে। আমাকে যখন লোকে ভুলে যাবে, আমার ছবি আর দেখবে না, তার বহু বছর বাদেও আর্ট গ্যালারিতে সসম্মানে শোভা পাবে ইডিঅট নবকান্তর ঐ শেষ ছবি, শিল্পমোদীর প্রজ্জ্বলিত সঞ্চার করবে অমর শিল্পী নবকান্তকে।

মনে হল আশু খ্যাতি, আশু সাফল্য, আশু ঐশ্বর্যের মোহে স্থায়িত্বহীন চলচ্চিত্রের জগতে ছিটকে এসে আমি জীবনের অনেকগুলো দামী বছর খরচ করেছি। আর নয়।

বাঁকি জীবনটা একাগ্রভাবে নিয়োজিত করতে হবে অচল চিত্রশিল্পের সাধনায়, এঁকে যেতে হবে অন্ততঃ এমন একটি সার্থক ছবি, যা আমাকে স্মরণীয় করে রাখবে আমি চলে গেলে পরেও, তৃপ্ত করবে আমার পিতৃদেবের আত্মাকে। ইডিঅট নবকান্তর কাছে হার মানবে না শুভংকর চৌধুরী।

বাঁকিকে আমি হারিয়েছিলাম যখন আমার বয়স তিন বছরও পুরো হয় নি। ওপারে চলে যাবার আগে বাঁবা আমাকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন,

তাতে আমার প্রতি তাঁর অনুরোধ ছিল আমি যেন জীবনে সত্যিকারের বড়-হবার সাধনা করি। 'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে' বলে গেছেন কবি, আমি যেন সে রকমের মানুষ হতে পারি তাহলে বাঁবা ওপার থেকে দেখে তৃপ্ত হবেন। আমার চলচ্চিত্র জগতের এই বিরাট খ্যাতির ক্ষণস্থায়ী আয়ু তো বাঁবার আত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। পরিমাণে অল্প হলেও লেখায় আর রেখায় যে স্থায়ী শিল্প বাঁবা সৃষ্টি করে রেখে গেছেন, তাতে দেশের মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছেন তিনি। আমাকেও তেমনি হতে হবে। অতএব বিদায়, চলচ্চিত্র জগৎ। এবার নতুন করে শুরু হবে আমার অনেক দিন ছেড়ে আশা স্থির চিত্রের সাধনা, চিত্রশিল্প জগতে অমরত্বের সাধনা। আর্টকলেজের শেষ পরীক্ষায় যখন ফাইনআর্টে প্রথম হয়ে ডিগ্রী নিয়েছিলাম, তখন কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছিলেন আমি চিত্রশিল্পে এক অদ্বিতীয় প্রতিভা, আমি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো শিল্প সৃষ্টি করলেও তিনি বিস্মিত হবেন না।

একদিন স্টুডিওতে ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা তেল-রঙা ছবি আঁকার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করছি এমন সময় একটা অচেনা মেয়েকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠলাম, বিরক্তি বোধ করলাম। বললাম, "তোমাকে কে এখানে উঠে আসতে দিয়েছে? কে তুমি?"

মেয়েটি বলল তার নাম অপরাজিতা দত্ত। আমার আগামী ছবিতে সে নায়িকা হতে চায়। সে প্রথমে গিয়েছিল একজন ছোট ডিরেকটরের কাছে। এই চেহারায় নায়িকা হওয়া অসম্ভব বলে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই অপমানের যোগ্য জবাব দেবার জন্মেই সে এসেছে আমার শরণ নিতে।

"নায়িকার ভূমিকায় সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জয় করে ঐ স্কুদে ডিরেকটরকে আমি দেখিয়ে দেব কত মুখ্য তিনি।" বলল অপরাজিতা।

"কিন্তু তুমি কি অভিনয় জান?"

"না। কিন্তু আপনি তো শেখাতে জানেন, মাটিকে পারেন সোনা বানিয়ে দিতে।"

বললাম, "কিন্তু আমি যে আর চলচ্চিত্রে থাকছি না, অপরাজিতা। 'অপরাজিতা'ই আমার শেষ ছবি।"

অপরাজিতা নাছোড়বান্দা। বলল, “আমার জন্যে আপনাকে আরেকখানা ছবি করতেই হবে। একজন ছোট ডিরেক্টরের চ্যালেঞ্জ নিতে আপনি ভয় পাবেন কেন। উনি যা বলে দিয়েছেন অসম্ভব, আপনি দেখিয়ে দিন আপনার যাদুতে তা অনাস্রাসে সম্ভব।”

নায়িকা-পদ-প্রার্থিনীর এজাতীয় নাছোড়বান্দা হানা আমার জীবনে এই প্রথম। একটু কৌতুক বোধ করলাম। কিন্তু তাকে পরীক্ষা করে দেখলাম ‘অপরাজিতা’ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় উম্মিলার অভিনয় যে উচু স্তরে তুলতে পেরেছিলাম, হাজার তালিম দিয়েও অপরাজিতার অভিনয়কে তার কাছাকাছি নেওয়াও সম্ভব হবে না। যে আবেগ অপরাজিতার ভেতর থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে না আসে, বাইরের ফরমায়েশে সেই আবেগের নকল আমদানি করতে পারে না সে। কিন্তু যে আবেগ সে সত্যি অনুভব করে, তার অভিব্যক্তি অতি চমৎকার ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে হাবে ভাবে। অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওর মেজাজ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না; বরং ওর আপন স্বভাবে, খেয়ালে বা মজিতে যখন যেমন মেজাজ আসবে, সেই অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যার প্রেমে সে সত্যি সত্যি পড়ে নি, তার সঙ্গে তার প্রেমের অভিনয় হবে হাস্যকরের চাইতেও খারাপ, কিন্তু যার সঙ্গে সে প্রেমে পড়বে, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে অপরাজিতার প্রতিটি হাবে ভাবে ফুটে উঠবে প্রেমের যে অভিব্যক্তি, হুনিয়ার সেরা প্রেমের অভিনয়ও তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

এক মুহূর্তে আমি মন ঠিক করে ফেললাম। বললাম, “তোমাকে দিচ্ছেই আমি এক নতুন মিরাকুল্ দেখাব, অপরাজিতা, সিনেমার ইতিহাসে—শুধু আমাদের নয়, সারা পৃথিবীর সিনেমার ইতিহাসে—যেমনটি আর কখনো হয়নি। চলচ্চিত্রের জগতে আমার আগেকার সমস্ত ছবিকে ছাড়িয়ে যাবে আমার শেষ ছবি ‘শেষ ছবি’, আর আমার আগেকার সব ছবির নায়িকাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে যাবে তুমি, আমার শেষ ছবির নায়িকা অপরাজিতা। সার্থক হবে তোমার বাবা-মার দেওয়া নামটি।”

আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছসিত হয়ে আমাকে যে

প্রণাম করলো অপরাজিতা, সেটি যদি সিনে ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে সেটি একটি অতুলনীয় শট হতো। কারণ এটি তার স্বাভাবিক আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, অভিনয় নয়। কিন্তু কোনো ফিল্ম ডিরেক্টরের নির্দেশে এই ভাবটি অভিনয় করে ফোটানো অপরাজিতার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো।

আমার জীবনে প্রথম মোড় ঘুরিয়েছিলেন ‘প্রচার ভারতী’ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির আর্ট ডিরেক্টর, কমাশিয়াল আর্ট জগতের অদ্বিতীয় দিপাল আনন্দ বক্সী। আমি আর্ট কলেজ থেকে বেরোবার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্রিন্সিপালের কথামতো ফাইন আর্টে’রই সাধনায় আত্ম নিয়োগ করব—বিশেষ করে অয়েল পেইন্টিং এ, তেল-রঙা ছবি আঁকায়। কিন্তু আর্ট একজিবিসানে আমার আঁকা ছবি দেখে আনন্দদা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে যোগ দেওয়ালেন প্রচার ভারতীর বিরাট কমাশিয়াল আর্ট স্টুডিওতে। স্থির চিত্রেই রইলাম, কিন্তু ফাইন আর্টে’র হবার সিদ্ধান্ত পালটে হয়ে গেলাম পুরো দস্তুর কমাশিয়াল আর্টে’র। হু হু করে এগিয়ে গেলাম সেরা কমাশিয়াল আর্টে’র পয়লা সারিতে। প্রচার-ভারতী দায়িত্ব নিল কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক রীল বা দু রীল লম্বা বিজ্ঞাপনী ফিল্ম তৈরী করবার। সে গুলোর পরিকল্পনা আর পরিচালনার ভার আনন্দদা আমাকেই দিলেন। চলচ্চিত্র জগতে ওভাবেই আমার প্রথম প্রবেশ। চলচ্চিত্রের মাদকতায় আমার নেশা ধরে গেল। হুঃসাহসিক প্রয়াসে আমার প্রিয় লেখকের একটি এমন কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপ দিলাম যাতে রোমাঞ্চ নেই, রোমাটিক প্রেম নেই, নামী চিত্র তারকার আকর্ষণ নেই, চোখ বা মন ধাঁধানো কোন রকম নাটকীয় চমক নেই, নিভাত্তই সাদা মাটা পল্লী জীবনের করুণ কাহিনী। চলচ্চিত্র জগতে নতুন ধারা এনে দিল আমার সেই ছবি। তারপর সাফল্যের পর সাফল্য—ক্রমে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। টাকার শাহাড়ের ওপর বসে মনে হলো অমরত্বের পথে পা দিয়েছি আমি।

আমার ভুল ভেঙে দিয়ে জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল

ইডিঅট নবকান্ত। সে বেঁচে থাকতে নয়। তার মৃত্যুর পর। অমর খ্যাতি লাভ করবার সাধনায় অচল চিত্তে ফিরে যাবার সংকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত করলাম চলচ্চিত্র আর তৈরি করব না।

সে সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল অপরাজিতা।

পরিবারকে চরম দুর্দশা থেকে বাঁচাবার জন্তে মরিয়া হয়েই সিনেমার নায়িকা হবার দিকে ঝুঁকেছিল অপরাজিতা। আমার ‘অপরাজিতা’ ছবির আনকোরা নতুন নায়িকা উর্মিলার সাফল্য আশঙ্কিত করেছিল তাকে।

বললাম “কোনো রেডি-মেড কাহিনী নয়, তোমার কাহিনী নিয়েই ছবি করব। তাতে আমিও থাকব, যদিও আমার ভূমিকায় নামবে অন্য কেউ। পয়লা নম্বর সিনেমা ডিরেকটর ঠিক করেছেন সিনেমা ছেড়ে ফাইন আর্টে ফিরে যাবেন, আর সিনেমার ছবি তুলবেন না। এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাকে ধরল তাকে নায়িকা করে একটি ছবি তুলে তার মান রাখতে হবে, কারণ একজন ছোট ডিরেকটর তাকে নায়িকা হবার অযোগ্য বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই নাছোড়বান্দা মেয়েটির কথায় রাজি হলেন সেই সেরা ফিল্ম ডিরেকটর। এইভাবে শুরু হবে ছবির কাহিনী। বলা বাহুল্য এই মেয়েটির অর্থাৎ নায়িকার ভূমিকায় নামবে তুমি।”

“আর নায়ক?”

“নায়ক হবার মতো কোনো নতুন মুখ তোমার হাতে আছে কি? কোনো বয় ফ্রেণ্ড, যাকে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারি?”

“নেই।”

“অর্থাৎ আমাকেই নায়ক খুঁজে আনতে হবে? —একটি ব্যাচেলর ছেলেকে আমার প্রছন্দ হয়েছিল, কিন্তু আর ছবি করব না বলে তাকে বলা হয় নি। তার নাম অনুপম গুপ্ত। স্বাস্থ্য, চেহারা, হবে ভাবে স্বভাবে ব্যক্তিতে সে সত্যি অনুপম। আমার স্ত্রী যেখান থেকে সাড়ি কেনেন এবং কেনান, সেই বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সাড়ি বিভাগের প্রধান সেল্‌সম্যান অনুপম। ওর প্রেমে পড়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। একটু চেষ্টা করলে তোমার প্রেমেও হয়তো তাকে ফেলতে

পারবে, কারণ চট করে নজরে পড়ার মত রূপ তোমার নেই,—থাকলে তোমাকে আমার ছবিতে নায়িকা করতে আমি রাজি হতাম না—আর শুধু বাইরের রূপ দেখে কোন মেয়ের প্রেমে পড়ার ছেলে নয় অনুপম। তোমাকে তোমারই জন্তে সাড়ি কিনতে পাঠাব ওর বিভাগে। সেই হবে তোমাদের প্রথম পরিচয়। তোমাদের দুজনের দুজনকে ভালো লাগলে ওকেই নায়ক করব। রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী, তাতে তোমাদের দুজনের রোমান্স নানা শ্রুটিং, আর শ্রুটিং-এর উদ্দেশ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিভাবে দানা বেঁধে উঠল তা খুব মর্মস্পর্শী করে দেখানো হবে। ছবিটিকে কিন্তু ট্রাজিডি অর্থাৎ বিয়োগান্ত করতে হবে, শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার চির বিচ্ছেদ ঘটবে। তোমার শেষ দুশুর মর্ম-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কতটা মর্মস্পর্শী হবে, সেই কান্নার রেশ দর্শকদের মনে কতদিন থাকবে, তারই ওপর অনেকটা নির্ভর করবে তোমার বছরের সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পাওয়া।”

অপরাজিতার কাছ থেকে জানলাম ওদের সংসার মোটামুটি রকম চলে যেতে পারে মাসিক তিন শ টাকায়। আমি ক্লোরপতি ফিল্ম প্রোডিউসার চন্দন-মলকে ফোন করে বললাম, “আমার আগামী ছবির প্রোডিউসার হবে চন্দনমল?”

অগেকার ছবিটি ওকে দিই নি বলে দুঃখ ছিল তার।

হাতে স্বর্গ পেয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, “আলবৎ হবো, শুভংকরজি। বেলাক্স চেক আপনাকে লিখে দিব। যতো টাকা লাগে খরচা করবেন আপনি।”

বললাম, “এই মাত্র হিরোইন ঠিক হলো। তাকে এখন থেকে পাঁচ শ টাকা মাসহারা দেবে, আর ছবি শেষ হলে দক্ষিণা এক লাখ।”

এক কথায় রাজি হল চন্দনমল। চারমাসের মাস-হারা কালই আগাম দিতে হবে নায়িকাকে, কন্ট্র্যাক্ট সই করার সঙ্গে সঙ্গে, বললাম তাকে।

“আমি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসব।” বলল চন্দনমল।

আর্থিক উদ্বেগের কারণ রইল না অপরাজিতার। কিন্তু তাকে সাবধান করে দিলাম, যে সাফল্য সে চাইছে

তার পথ আমি নিশ্চিত করে দেব, তার ফলে খ্যাতি, সম্মান, অর্থ সে প্রচুর পাবে, কিন্তু তার জন্মে হয়তো মর্মান্তিক ব্যথার মূল্য তাকে দিতে হবে—সে কি তার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ?

হ্যাঁ। বড় সার্থকতার জন্ম বড় ব্যথা সহিতে সে রাজি। কোনো ব্যথার ঝুঁকিকে সে ভয় পায় না, তার জীবনে এখন একমাত্র লক্ষ্য-সিনেমা জগতের অধিতীয়া নায়িকা হওয়া।

বেপরোয়া দরাজহস্ত অর্থদাতা প্রযোজক চন্দনমল। ছবি নিখুঁত করবার জন্ম সময় যত বেশী লাগুক, খরচা যত বেশী হোক, তার ভ্রক্ষেপ নেই। ছবি থেকে মুনাফা তার পকেটে আসবে কিনা তা নিয়েও তার মাথা ব্যথা নেই, শুধু করজু তীর খুশি মতো ভালো ছবি করুন, সমঝদার মূল্য তার তারিফ করুক, তাতেই সে খুশী হবে।

আমি অপরাজিতা আর অনুপমের পিছনে প্রথমে অনেক সময় আর অর্থ ব্যয় করলাম, ওদের মেলামেশা আর এক সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ দিয়ে, যাতে দুজনে দুজনের প্রেমে আকর্ষণ ডুববে যায়। তাই গেল ওরা। অপরাজিতা মনে মনে ভবিষ্যৎ স্বর্ণ রচনা করল “শেষ ছবি’র কাজ শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ শেষ ট্রাজিক দৃশ্য-টির শূটিং হয়ে যাওয়ার পর, সে তার প্রেমাস্পদ অনুপমকে নিয়ে নীড় বাঁধবে। তাকে জানতে দিলাম না যে স্বপ্ন তার চুরমার হয়ে যাবে শেষ মুহূর্তে, যখন সে জানবে শেষ শূটিং-এর পর অনুপম নীড় বাঁধবে তার বাগদত্তা বধুর রমার সঙ্গে, যে গত তিন বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে তার জন্ম। পর পর অপরাজিতা-অনুপমের ক্রম-বর্ধমান প্রেমের অভিব্যক্তির দৃশ্য তুললাম। প্রত্যেকটি শূটিং হল অতুলনীয়—মেকি অভিনয় নয়, সত্যিকারের প্রেম। ছলনার পর ছলনা করে অনুপম চঞ্চল হয়ে উঠে একদিন আমাকে বলল, “আমি আর সহিতে পারছি না এই ছলনার যন্ত্রণা। আমি যে ওর প্রেমে আকর্ষণ ডুববে যাচ্ছি। তারপর ওকে ছেড়ে যেতে যে আমারো বুক ভেঙ্গে যাবে।”

“সেই জগেই মর্মান্তিক অভিনয় নিখুঁত আর মর্ম-স্পর্শী হবে তোমাদের দুজনেরি। কারণ তা অভিনয় হবে না, হবে সত্যিকারের অনুভূতির খাঁটি অভিব্যক্তি, যার ব্যথা প্রত্যেকটি দর্শকের মর্ম স্পর্শ করবে। সেই অভিনয়ই তো সেরা অভিনয়, অনুপম, যে অভিনয়

আসলে অভিনয়ই নয়, তীব্র আন্তরিক অনুভূতির নির্ভেজাল অভিব্যক্তি।

‘শেষ ছবি’র শেষ শূটিং-এর দিন ঈদুড়িতে আমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলাম নায়ক অনুপমের ভাবী-পত্নী রমাকে ‘আনসোফিস্টিকেটেড,’ সহজ সরল নিরীহ ভালোমানুষ মেয়ে, হাকে বলা যায় লক্ষ্মী প্রতিমা। অপরাজিতাকে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল ঠিক শেষ দৃশ্যটির শূটিং-এর, আগে, যে দৃশ্যে নায়িকার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নায়ক বলেছে, “ছবির জন্মে আমাদের অভিনয়ের পালা শেষ হলো। হে বান্ধবী, এবার বিদায়। এ আমার ভাবী বধু, যার সঙ্গে আসছে মাসে আমার বিয়ে।”

বলতে নায়কের বুক ফেটে যাচ্ছে, কারণ সেও গভীর ভাবে ডুববে গেছে ছবির নায়িকার প্রেমে, কিন্তু নিতান্তই ধর্মের খাতিরে তাকে চলে যেতে হচ্ছে বাগদত্তা বধুকে জীবনে গ্রহণ করতে।

“এতদিন তবে আমাকে মিথ্যার স্বর্ণে ভুলিয়ে রেখে আমার হৃদয় নিয়ে খেলা করেছ তুমি?” একথা মুখে উচ্চারণ করেছে না নায়িকা (অর্থাৎ অপরাজিতা), কারণ তার আত্মসম্মানে বাধছে। তার মুখে ফুটে উঠছে মর্মান্তিক ব্যথা, ঘৃণা, ক্রোধ, হতাশা প্রভৃতি নানা অনুভূতি।

‘শেষ ছবি’ যারা দেখেছেন তাঁরা সবাই বলেছেন নায়ক নায়িকার আগেকার সব গুলো দৃশ্যের অভিনয় যেমন নিখুঁত, শেষ দৃশ্যে তাদের, বিশেষ করে নায়িকার ভূমিকায় অপরাজিতার, অভিনয় হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী নিখুঁত, তুলনাহীন।

সবাই বলেছেন এ বছরের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অপরাজিতার জন্মে বাঁধা। শুধু তাই নয়, ট্রাজিক অভিনয়ে সে অধিতীয়া হয়ে রইল, সার্থক হয়ে রইল তার নাম : অপরাজিতা।

কিন্তু অপরাজিতা জানে, অনুপম জানে, আর আমি জানি, অভিনয় করে নি অপরাজিতা। অভিনয় করতে হয় নি বলেই সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত চরম আঘাতে তার এতদিনের রচিত সুখের স্বপ্নসৌধ এক নিমেষে ভেঙ্গে পড়েছে ; সেই অসহ্য যন্ত্রণার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকেই অতুলনীয় অভিনয় বলে ভুল করেছে সবাই। তাই অতুলনীয় ট্রাজিক অভিনেত্রী রূপেই সবার মনে জেগে আছে, জেগে থাকবে অপরাজিতা।

হিন্দু সমাজ-দর্শনে আচার ও সংস্কার

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আচার ও সংস্কার

বাস্তব জীবনে আচার ও সংস্কারের প্রবল প্রভাব অস্বীকার্য। আচার ও সংস্কারের প্রভাব গ্রামে ও শহরে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রায় একই ধরনের কারণ, আচার ও সংস্কারের ধারণা মানুষের আদিম বৃত্তির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এদেশে আর ওদেশে—প্রাচ্যে আর প্রতীচ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রথা, আচার, সংস্কার ও অনুষ্ঠান আজও সর্গোরবে বেঁচে আছে। সুদূর কোনো ভবিষ্যতে তাঁদের প্রভুত্বের অবসান হবে, একথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মূলতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ বলে প্রচার করে। মার্কসের (১৮১৮-৮৩) ইতিহাসের অর্থনৈতিক অদ্বৈত ব্যাখ্যা (১) যে নিবিচারে স্বীকৃত হতে পারে না, তার একটা বড় প্রমাণ হ'ল সমাজ-শক্তি হিসাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আচার ও অনুষ্ঠানের প্রভুত্ব বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-শাসিত সমাজব্যবস্থায়ও বাতিল হয়ে যায় নি। যদি আচার ও সংস্কারগুলি একমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থারই বিকাশ হতো, তা হ'লে বিজ্ঞানের প্রভুত্ব উন্নতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তনের ফলে সেগুলি সমাজজীবন হ'তে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হতে হতো বাধ্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা ঘটে নি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা যারা সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আজও মাদ্রাসা আমলের আচার ও

সংস্কারের প্রভাব রয়েছে অব্যাহত। মস্হ, রঘুনন্দন, যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশরের সংস্কারবাদ অতি আধুনিকদের মধ্যেও অচল হয়ে যায় নি।

আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর, কিন্তু যে পাশ্চাত্যের সাধনায় আধুনিক সভ্যতা হয়েছে দিগ্বিজয়ী, সেই পাশ্চাত্যেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আচারবাদ আজও প্রবল প্রভাবে বিরাজমান। ইহুদীদের মধ্যে শূকরের মাংস ভক্ষণ, একই সঙ্গে মাখন ও মাংস গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। বিশেষ ভাবে পশুকে হত্যা করা না হলে সেই মাংস ভক্ষণ করা তাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। খৃষ্টীয় প্রথায় নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ ইহুদীদের মধ্যে পাপ বলে গণ্য করা হয়। বিংশ শতাব্দীর অতি প্রগতিশীল ইহুদীদের মধ্যে পুরানো বিধিবিধানের প্রভাব বিস্ময়কর বলে মনে হবে। ইহুদীরা বিভিন্ন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তারা প্রাচীন আচার ও সংস্কার সমান উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গেই রক্ষা করে চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে পাশ্চাত্যে রশিয়া ও পোলাণ্ডের ইহুদীরা সব চেয়ে বেশী রক্ষণশীল বলে পরিচিত। আচারের প্রভাব অবশ্য খৃষ্টীয় সমাজে কিছুমাত্র কম নয়। যুরোপের প্রগতিশীল রোমান ক্যাথলিকদের ভিতর শুক্রবার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। খৃষ্টদস্প্রদায়ের মধ্যে এখনও জাতকর্ম, ব্রত, উপবাস, বাগদান ও বিবাহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্গত। পাশ্চাত্যে বিবাহকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে বটে, কিন্তু গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত এখনও সেখানে বিবাহ সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয় নি।

ব্যষ্টির দিক হতে বিচার করলে, স্বীকার করতে হবে, আধুনিক উন্নত জীবনযাত্রার প্রভাবে, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, কেউ কেউ প্রচলিত আচার ও সংস্কারের বজ্রমুষ্টি হ'তে বহল পরিমাণে মুক্ত হ'তে পেরেছেন, কিন্তু সমষ্টির দিক হতে একথা আদৌ স্বীকার্য নয়। ভারতবর্ষের মতো

(১) মার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। রাষ্ট্রাও রাসেলের “ফ্রিডম এণ্ড অরগানিজেশন” (১৯৩৪), বিনয়কুমার সরকারের “ভিলেজস এণ্ড টাউনস রাজ্য সোশ্যাল প্যাটার্নস” (১৯৪১) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের “নিউ হিউম্যানিজম” (১৯৪৭) এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের “সোসাইটি এণ্ড রিলিজিয়ন” (১৯৪৭) গ্রন্থগুলি মার্কস-বিরোধী ব্যাখ্যার দাক্ষ্য বহন করছে।

যুরোপ এবং আমেরিকাও আচার ও সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত। একই সঙ্গে যে অতি-প্রাচীন এবং অতি-আধুনিক বিধি ও বিধান, আচার ও সংস্কার প্রবল জীবনী-শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তারই অশ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় মনু পরাশর শাসিত ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞা শাসিত পাশ্চাত্যের জীবন-যাত্রায়। সুতরাং জীবনচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির দিক হ'তে ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য টানা সম্ভব নয়। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে, সভ্যতার একদিকে অগ্রগতি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে অগ্র সব কিছুই বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলি তারই জীবন্ত সাক্ষ্য (২)।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রচলিত আচার ও সংস্কারের পক্ষে ওকালতি করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হতে মানুষের জীবনে আচারের স্থান কী, সামাজিক রূপান্তরের 'প্রণালী' এবং গড়নের বিশ্লেষণে আচারের মূল্য কী, তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। "প্রোসেস" অর্থাৎ প্রণালী এবং 'প্যাটার্নস্' অর্থাৎ গড়নের উদাহরণ হিসাবেই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ভারতবাসী ইহুদী এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আলোচনা করা হয়েছে।

হিন্দু-সমাজের আচারবাদ : ভূদেবের "আচার প্রবন্ধ"

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, অর্থনৈতিক রূপান্তর, রাজনৈতিক পরিবর্তন, আচার ও সংস্কারের অপরিণীম প্রভাবকে স্থান করে দিতে পারে নি। এর প্রথম কারণ, পূর্বেই বলেছি, আচার ও সংস্কারের ধারণা মানুষের আদিম বৃত্তির সহিত নিবিড় আত্মীয়তাপাশে আবদ্ধ। দ্বিতীয় কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আচার ও সংস্কার মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক

উন্নতির পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, আচার ও সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে বরং মানুষের শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক উন্নতিরই সহায়ক। অতএব প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের মানুষ অদূর বা হৃদূর ভবিষ্যতে একদিন আচার ও সংস্কারের সব প্রভাব কাটিয়ে উঠবে এবং আচার ও অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে তা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

প্রাগ্-বৈদিক যুগ হ'তে যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, পরাশর ও রঘুনন্দনের বিধি-বিধানকে আশ্রয় করে যে সব আচার ও সংস্কার সমাজ-জীবনে প্রচলিত রয়েছে তাঁর সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় সুপরিচিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) তাঁর "আচার প্রবন্ধ" গ্রন্থে (৩) হিন্দু আচার-গুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

(১) নিত্য—যে সব কর্তব্য প্রতিদিন পালনীয়।

(২) নৈমিত্তিক অর্থাৎ দশসংস্কার।

(৩) শ্রাদ্ধ।

(৪) ব্রত ও পূজা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতে দশ সংস্কার (৪) হচ্ছে এইরূপ : (ক) গর্ভাধান (খ) পুংসবন (গ) সীমস্তোমসয়ন (ঘ) জাতকর্ম (ঙ) নামকরণ (চ) অন্ন প্রাশন (ছ) চূড়াকরণ (জ) উপনয়ন (ঝ) সমাবর্তন এবং (ঞ) বিবাহ।

রজোদর্শনের দিন হতে ষোলদিনের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন বাদ দিয়ে যুগ্মদিনে কোন প্রশস্ত দিবসে শুভলগ্নে অতীত সায়ংসন্ধ্যায় গর্ভাধান সংস্কার করণীয়। গর্ভসঞ্চারের উদ্দেশ্যে 'গর্ভাধান' প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যৌন-সম্মিলন হিন্দু-আচারে পেয়েছে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার স্বীকৃতি।

'পুংসবন' শব্দের অর্থ পুত্র কামনা। পুংসবন

(৬) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "আচার প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি প্রচারিত হয়েছিল তার বহুকাল পূর্বে।

(৪) সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যঃ পুরোহিত দর্পন (১৩২৯) গ্রন্থে দশ সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ ও প্রয়োগপদ্ধতির শাস্ত্রীয় পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। পৃঃ ৪১১-৪৪৮ জ্যেষ্ঠ্য।

(২) বিনয়কুমার সরকারঃ ভিলেজ্‌স্ এণ্ড টাউনস্ স্যাক্সোণাল প্যাটার্নস্ (১৯৪১) পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪

সংস্কার সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের তৃতীয় মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

‘সীমন্তোন্নয়নের’ অর্থ গর্ভবতীর কেশবিলাসের সাময়িক অবসান; এই সময় তার দেহ হতে অলংকারাদি খুলে ফেলা হয়। এই সংস্কার ছয় হ’তে আট মাসের মধ্যে করণীয়। এই সময় যৌন সন্মিলন আর বাঞ্ছনীয় নয় তা জানিয়ে দেবার জন্তই ‘সীমন্তোন্নয়ন’ সংস্কারের ব্যবস্থা।

গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের সঙ্গে নারীর জীবন অভ্যন্তর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এই সংস্কারগুলি ক্রয়েতীয় দৃষ্টিকোণ হ’তে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, উল্লিখিত তিনটি সংস্কারের মধ্যে জীবতত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক দিক হতে এমন কিছু নেই যার জন্ত এই সংস্কার-গুলি কোন প্রগতিশীল সমাজে অচল বলে বিবেচিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এই সংস্কারগুলি হিন্দুর জীবন নিষ্ঠারই সাক্ষ্য বহন করেছে। জার্মান দার্শনিক নীটশের (১৮৪৪-১৯০০) কণ্ঠে মনু-বিধানের প্রশংসা প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দু-সমাজ-দর্শনেরই প্রশংসা। নীটশে মনুবিধানের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর “এ্যাণ্টি-ক্রাইষ্ট” গ্রন্থে লিখেছেন, “নারী, প্রজনন, বিবাহ ইত্যাদি যা ঋগ্বেদে অস্ত্রবিহীন অশ্রীলতার দ্বারা কলংকিত, এখানে তা শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও অহুরাগের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে” (৫)।

‘জাত কর্ম’ জন্মদিবসেই প্রতিপালিত হয়। ‘নামকরণ’ জন্মগ্রহণের দশদিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। ‘অন্নপ্রাশন’—পুত্র হ’লে ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে এবং কন্যা হলে পঞ্চম অথবা সপ্তম মাসে সম্পাদিত হয়। এই সংস্কার গুলি এতই মামুলি ধরণের যে, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অথবা উন্নতির পরিপন্থী বলে বিবেচনা করা অসম্ভব।

‘চূড়াকরণ’ সাধারণতঃ তৃতীয় বৎসরে প্রতিপালিত হয়। ‘উপনয়নের’ সময় পাঁচ থেকে আট বৎসর।

‘সমাবর্তন’ কাল সম্ভবতঃ আঠারো হতে বাইশ বছর। ‘সমাবর্তনের’ পরে ‘বিবাহ’ সংস্কার পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। - বিবাহ সংস্কারের যৌক্তিকতা, সন্দেহ নেই, বিতর্কের অতীত।

আলোচিত দশ সংস্কার ব্যতীত হিন্দু সমাজে প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষকে আরও কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হয়। এইসব কর্তব্যকে সাধারণতঃ সংস্কার বলা হয় না—বলা হয় যজ্ঞ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় শ্রাদ্ধকে সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি; কেউ কেউ শ্রাদ্ধকেও একটা সংস্কার বলে স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রাদ্ধ একটি সংস্কারই।

আধুনিক ভারতীয় সমাজে পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই প্রচলিত রয়েছে। গ্রামের বিত্তশালী জমিদার এবং নিঃস্ব কৃষক, শহরের সর্বহারা এবং বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী কমবেশী একইভাবে সংস্কার পালন করে থাকেন। বিলাত ফেরৎ অতি-আধুনিক, অধ্যাপক, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, রাষ্ট্রনেতা হ’তে আরম্ভ করে প্রায় প্রত্যেকেই প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে শ্রাদ্ধানি সংস্কার স্বীকার করে থাকেন। বিবাহের বিধান ছোট বড়, ধনী নিঃস্ব, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছে প্রায় একই মর্যাদা পেয়ে থাকে।

উপর-উক্ত আলোচনা হতে দেখা গেল, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ও পরিবেশে সমাজের যে নতুন গড়ন ব্রিকাশলাভ করেছে, তার জন্ত পুরানো সংস্কারগুলির অবসান ঘটাবার প্রয়োজন হয় নি। পুরানো প্রথা ও পদ্ধতি অব্যাহত রেখেই সামাজিক গড়ন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক গড়ন প্রকৃতপক্ষে একই সংস্কারের বিভিন্ন ধারা বা অভিব্যক্তি মাত্র। উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছে এবং সেই প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য স্বীকার করভেই হবে সমন্বয় স্থাপনের প্রয়োগ কখনো প্রকাশ পেয়েছে সজাগভাবে আবার কখনো বা ধরা পড়েছে অবচেতনভাবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্তব্য, শ্রাদ্ধ,

(৫) বিনয়কুমার সরকার : Creative India (1937) পৃ: ১১২-১৪ এবং The Sociology of Races, Cultures and Human Progress (1939) পৃ: ১৫০-১৫২

ব্রত এবং পূজাকে আচার বলে বিবৃত করেছেন। আচার ও সংস্কার ঠিক এক না, তবুও সুবিধার জ্ঞত আমরা আচার ও সংস্কারকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। তত্ত্ব এবং তাৎপর্যের কথা ছেড়ে দিলেও, এক কথা মানতে হবে যে, হিন্দু আচার ও সংস্কারগুলি সমাজের পরস্পর বিরোধী সম্বন্ধকে সহজ ও সুন্দর করতে, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে মহত্তর জীবনের পটভূমি গড়ে তুলতে জৈবিক প্রকৃতির উর্দ্ধে মানবাজ্ঞার সুপ্ত মহত্ত্ব ও মাদুর্ঘ্যকে তুলে ধরতে বিশেষ কার্যকরী (৬)। ব্রত ও উৎসবাদিতে মানুষ মিলিত হবার অবকাশ লাভ করে; এই সব উৎসবাদিতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন মানুষের সক্রিয় সাহায্য ও সহায়ত্ব, মানুষ তখন মানুষকে জানায় প্রীতি ও ভালবাসার আত্মান এবং স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রাণের প্রবর্তনায় মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক হয়ে উঠে নিবিড় ও মধুর। এই সময়ই নারী গৃহের গভীর বাইরে আসবার পায় যুগোগ। আচার প্রতিপালনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। স্মৃতিরাম সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আচারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অগ্নিদিকে স্ক্রুমাণ বস্ত্রের বিকাশের দিক হতেও আচারের প্রভাব অপরিণীম। ব্রত, পূজা, উৎসব, অহুষ্ঠান, আচার ও সংস্কার প্রতিপালনের সঙ্গে আল্পনা, আরতি, নৃত্য, সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি অঙ্গাদী সম্বন্ধে আবদ্ধ বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জ্ঞাত শুভদিন, লগ্ন প্রভৃতি নির্ণয়ের প্রয়োজন হতো, তার ফলে গড়ে উঠেছিল ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যামিতি শাস্ত্র বিকাশলাভ করেছিল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদী রচনা করবার নিয়ম প্রণালী অনুসরণ করে।

হিন্দু আচারবাদের মূলে রয়েছে সমষ্টিবাদের ধারণা।

(৬) মতিলাল রায়: “আচার নিজের জীবনে সাধনাকে মূর্তি দেওয়ার জ্ঞাত। আচার জীবন গড়ার অব্যর্থ উপায়। আচারের দিকে ঝোঁক অনেক সময় অসংযত জীবনের যে দুর্বলতা তা দূর করে। আচার আমাদের ওদাসীস্ত ও অলসতাকে শাসন করে।” [শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সংকলিত “গুরুবাণী” পুস্তিকা, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪১ দ্রষ্টব্য।]

আচার ও সংস্কার পালন করতে গিয়ে নারী ও পুরুষ সচেতনভাবে উপলব্ধি করে, সে-রূহ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে একা নয়। আচার ও সংস্কারের মাধ্যমেই মানুষের সংকীর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনে সমাজ বা সমষ্টি-চেতনা বিকশিত হয়ে উঠে।

মানুষের আদিমবৃত্তির সহিত আচার ও সংস্কার অতি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ বলেই তাদের আবেদন প্রায় সার্বজনীন। সামাজিক উন্নতি ও রূপান্তরের সঙ্গে আচার ও সংস্কারের বিরোধ আছে। এ কথা প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতি ও প্রগতিকে অব্যাহত রেখেও যে আচার ও সংস্কার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, তারই একটা বড় সাক্ষ্য হ’ল হিন্দু আচার ও সংস্কারগুলি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রচারিত আচারের ব্যাখ্যা মূলতঃ প্রাচীন শাস্ত্রভিত্তিক। ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার স্বায়িত্ব বিধান। ভূদেবকে অনুসরণ করে আচারবাদ প্রচার করা বর্তমান রচনার লক্ষ্য নয়। প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত অথবা উচিত নয়, তাদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন আছে কিংবা নেই, তা একেবারেই স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে একথা কবুল করতে হবে, ভূদেব আচার ও সংস্কারগুলি রক্ষা করবার জন্য যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ভূদেবের “আচার প্রবন্ধ”র পটভূমি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী হিন্দু সমাজ-জীবনের বাস্তব অস্তিত্ব। আজ এক শ’ বছরেরও অনেক বেশী সময় পরেও দেখা যাচ্ছে প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলির সামাজিক গুরুত্ব অপরিণীম। আচারের প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্বন্ধে ভূদেব যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, মনে হয়, তার যাথার্থ্য আজও বহুলাংশে স্বীকার্য। প্রচলিত সমস্ত আচার ও সংস্কারগুলিকে যদি প্রায় অবিকৃতভাবে মানুষকে পালন করতে বাধ্য করা না হয়, তা হ’লে নিতান্ত জৈবিক ও সামাজিক কারণেই তারা বেঁচে থাকবে। সমাজতত্ত্বের বিচারে

প্রাচীন আচার ও সংস্কারের পরিবর্তন ও রূপান্তর হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিলোপ অচিন্ত্যনীয়। জীবনের অন্যান্য সব কিছুর মতো আচারের রূপান্তর ও বিবর্তন একান্তই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ যুগ-প্রয়োজনে আচার ও সংস্কারকে স্বাধিক পরিমাণে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বস্তুতঃ এযুগে আচার ও সংস্কারের বৌদ্ধিক ঠিক সেই দিকেই। জীবনযাত্রায় নানা সংকট এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পারিবারিক পূজাগুলি ক্রমশঃই সার্বজনীন পূজায় রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—পারিবারিক আচার ও সংস্কারগুলি যুক্তিনিষ্ঠার ভিত্তিতে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের প্রবণতা সচল ও সজীব সমাজ-জীবনেরই সাক্ষ্য।

হিন্দু-যজ্ঞে সমাজ-সেবার আদর্শ

ব্রত, পূজা, দশসংস্কার এবং শ্রাদ্ধ ব্যতীত প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থকে যে সব আচার পালন করতে হয়, পূর্বেই বলেছি, তাদের সাধারণ নাম যজ্ঞ। হিন্দু সামাজিক গড়নে যজ্ঞের স্থান প্রায় অদ্বিতীয়। হিন্দু সমাজে যজ্ঞ বাদ দিয়ে কোন দেবদেবীর পূজা হ'তে পারে না। এক কথায় যজ্ঞ হিন্দুধর্মের নামান্তর মাত্র। ঋগ্বেদের সময় (খৃঃ পূঃ ২০০০—খৃঃ পূঃ ১৪০০) হতে হিন্দু সমাজে অসংখ্য যজ্ঞ প্রচলিত রয়েছে। এইসব যজ্ঞগুলি যেন নিত্য ও সনাতন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। একালে যজ্ঞ সম্বন্ধে ভাল আলোচনা পাওয়া যায় সমাজশাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯২২) “যজ্ঞ কথা” নামক গ্রন্থে (১৯২১)। ১৯১০ সনে প্রকাশিত “যজ্ঞ” শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি পরে “কর্মকথা” নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রচারিত হয় (১৯১২)। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে যজ্ঞ হল কর্মের আবাস, তিনি যজ্ঞের ভিতর লক্ষ্য করেছেন ত্যাগ ও সেবার বাণী, সমাজ সেবার মহান আদর্শ।

সমাজ-দর্শনে বক্ষিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর

বক্ষিমচন্দ্রের (১৭৩৮-৯৪) উপর ফরাসী দার্শনিক ও

চিন্তাবীর কঁৎ-এর (১৭১৮-১৮৫৭) বাস্তবনিষ্ঠা ও জীবন-নিষ্ঠার প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। কঁৎ-এর মানবতা এবং মানব-প্রীতিই ছিল বক্ষিমচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার মূল উপজীব্য। বক্ষিমচন্দ্র কঁৎ-এর দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রমোত্তরের আকারে তাঁর “ধর্মতত্ত্ব” (১৮৮৮) বিরত করেছেন। “আনন্দমঠে” (১৮৮২) কঁৎ-প্রভাবিত জীবননিষ্ঠা ও মানবনিষ্ঠাই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে। ‘বন্দে মাতরম’ গান, পরবর্তীকালে যে গান জাতীয়-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়েছে, বক্ষিমচন্দ্রের জীবন-নিষ্ঠার চূড়ান্ত উদাহরণ। জীবননিষ্ঠার সাধক, কঁৎ-এর ভাবশিষ্য বক্ষিমচন্দ্র তাই “কৃষ্ণ চরিত্র” (১৮৮৬) এবং ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে (১৮৮৮) প্রচার করেছেন, বেদে ধর্ম নেই, যজ্ঞে ধর্ম নেই—ধর্ম আছে একমাত্র লোকহিতে (৭)। বক্ষিমচন্দ্র যজ্ঞকে নিছক একটা আচার ও অনুষ্ঠান হিসাবেই দেখেছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের মতো তিনি যজ্ঞের ভিতর কোন মহান আদর্শের সন্ধান পান নি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমাজ-দর্শনের মূলকথা

(৭) শুধু বক্ষিমচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীই নন, রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপরও কঁৎ-এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। বক্ষিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ কঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউই কঁৎ-এর নাস্তিক্যবাদ স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথা যতদূরভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, বক্ষিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের মতো প্রথম জীবনেও নাস্তিক্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি। কিন্তু “চতুরঙ্গ” উপন্যাসে (১৯২২) কবি কঁৎ-প্রচারিত নাস্তিক্যধর্মের এক অপূর্ব চরিত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। জগমোহন শচীশের জ্যাঠামশায়। শচীশ ছিল জগমোহনের চেলা: “জগমোহনের নাস্তিক্যধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভাল করা, সেই ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই।—তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোন দেবতা বা শাস্ত্রের বক্ষিসের বিজ্ঞাপন বা চোখ রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত ‘প্রচুরতম লোকের প্রভুতম সুখ সাধনে আপনাদের গরজটা কী?’ তিনি বলিতেন ‘কোন গরজ নাই সেইটাই আমার সব চেয়ে বড় গরজ।’ তিনি শচীশকে বলিতেন, ‘দেখ বাবা আমরা নাস্তিক, সেই স্তম্ভেই আমাদের একেবারে নিকলক নির্মল হইতে হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশী।’

বক্ষিমচন্দ্রেরই মতো লোকহিত—সমাজ-সেবা—ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। রামেন্দ্রসুন্দরও কং-এর মানবনিষ্ঠার আদর্শে ছিল অনুপ্রাণিত। সম্ভবতঃ বক্ষিমচন্দ্রের মাধ্যমেই রামেন্দ্রসুন্দর কং-এর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। বক্ষিমচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই জীবননিষ্ঠা ও মানবহিতে ছিলেন সমান আগ্রহশীল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও ছিল বড় কম নয়, বিভিন্নতা ছিল দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য ছিল যদিও একই। বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন ফলবাদী আর রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আদর্শবাদী। তবু বা আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞ সম্বন্ধে বক্ষিমচন্দ্রের মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন এবং যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য যে লোকহিত অর্থাৎ ধর্মপালন, তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আচার শাস্ত্রী ভূদেব তাঁর “ব্যাচার প্রবন্ধে” (১৮২৪) হিন্দু আচারবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য ছিল আচার ও সংস্কারগুলি বজায় রাখা। এই দিক হতে ভূদেবকে “রক্ষণশীল” বা সনাতনী বলা যেতে পারে। অপরদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যাখ্যার সঙ্গে ভূদেবের ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রভেদ মৌলিক। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন প্রথা যে ঐটুট রাখতে চেয়েছেন তা নয়। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যজ্ঞানুষ্ঠানের গভীরতর তাৎপর্যকে সাধারণের ভিতর প্রচার করতে, তত্বকে যুক্তি বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে—আচরণকে জীবনের সত্য করে তুলতে। এদিক হতে বিচার করলে বক্ষিমচন্দ্রের চেয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রদত্ত যজ্ঞের ব্যাখ্যা ও বিচার অধিকতর যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।

দেখা গেল রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞকে চেয়েছিলেন ত্যাগ ও সমাজসেবার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। প্রশ্ন হবে ত্যাগ কি? মানুষ কেনই বা ত্যাগ করবে এবং ত্যাগের দ্বারা মানুষের লাভই বা কি?

মানুষ সাধারণতঃ চায় ভোগ করতে, ত্যাগ স্বীকারে তার বীতরাগ বাস্তব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন উপনিষদের শিক্ষা ভিন্নতর। ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে

সত্যিকারের কোন বিরোধ নেই, মানুষই তার ত্যাগের দ্বারা এই পৃথিবী গড়ে তুলেছে, তাই মানুষ পৃথিবীকে উপভোগ করতে হয় সক্ষম। সুতরাং বলা যেতে পারে ভোগের মধ্যেই ত্যাগের ভাব রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ত্যাগই ভোগ। উপনিষদ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন—তেন ত্যক্তেন ভূজীথা মা গৃধঃ কশ্চ শিক্ষনম্।

রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, বৈদিক আচারগুলি অত্যন্ত জাতি সমূহ হতে ভারতবাসীদের স্বাভাব্য বজায় রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছে। মনে রাখা দরকার যজ্ঞের পটভূমি ছিল সুপ্রাচীন বৈদিক আচার সমূহ। আচারগুলিকে মার্জিত রূপান্তরিত ও পুনর্গঠিত করে তার উপর যজ্ঞকে করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যজ্ঞসমূহের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে তার হৃদমণীয় প্রবৃত্তির আবেগ দমন করতে সাহায্য করা। প্রবৃত্তি দমন ত্যাগেরই নামান্তর। যজ্ঞের আদর্শ হতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, সে এই মাটির পৃথিবীর সন্তান, এই পৃথিবীর জন্ত সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করা তার পরম কর্তব্য।

রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে, মানুষ পৃথিবীর উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা ঋণ স্বীকৃতিরই সাক্ষ্য। মানুষ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের কাছে নানাভাবে ঋণী। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রসমূহ মানুষের ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে। এই পঞ্চঋণ পরিশোধের জন্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চ মহাযজ্ঞ গ্রহণকে প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দেয়, পৃথিবী ও মানব জাতির কাছে সে সীমাহীন ঋণে আবদ্ধ।

হিন্দু চিন্তায় পঞ্চযজ্ঞ ও ঋণের ধারণা

মনুসংহিতা পঞ্চযজ্ঞের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা এইরূপ :

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞস্তৃত্বপূর্ণম্।

হোমোন্নৈবো বলিভোতো নৃযজ্ঞোহতিথিগুজনম্॥

অর্থাৎ অধ্যায়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃতপ্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশুপক্ষিগণকে অন্নাদিপ্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম মহুযযজ্ঞ (মনু অঃ ৭০)।

রামেন্দ্রসুন্দর পঞ্চযজ্ঞকে পঞ্চাংগ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা যদিও অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, তবুও বলতে হবে এই ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত নয়। পঞ্চ-মহাযজ্ঞ প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি কর্তব্যের বিধিবিধান মাত্র। কর্তব্য অবশ্য ঋণেরই নামান্তর, যদিও অলংকারিক অর্থে। স্মৃতরাং যজ্ঞ ও ঋণের মধ্যে যোগাযোগ খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধা হয় না এবং তা যুক্তি বিরোধীও নয়।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞকে ঋণ বলে ধরা হয় নি। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ঋণ পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মনুসংহিতায় তিনটি ঋণের পরিচয় পাওয়া যায়। মনু মহারাজ লিখেছেন, “বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদের ঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের ঋণ ও যজ্ঞাচ্ছতান দ্বারা দেবতার ঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া উপযুক্ত পুত্রের প্রতি পরিবারাদি প্রতিপালনের ভার অর্পণ করতঃ স্ত্রীপুত্র ধনাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া মধ্য অবস্থা আশ্রয় পূর্বক গৃহেই অবস্থান করিবে (৪।২৫৭)।”

বৈদিক সাহিত্য, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ, বোধায়নের গৃহ্যসূত্র হ'তে আরম্ভ করে মনুসংহিতা পর্যন্ত, পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং তিনটি ঋণের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে মহাভারতের আদি পর্বে (৪৬৫৬) চতুর্থ ঋণের এবং অনুশাসন পর্বে (২২০০) পঞ্চম ঋণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে উল্লিখিত চতুর্থ ও পঞ্চম ঋণের বিবরণ সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ নানাভাবে সমাজের দ্বারা উপকৃত হয় অর্থাৎ মানুষ সামাজিক ঋণে হয় অবদ্ধ। এই জন্ত হিন্দুশাস্ত্র ত্যাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধের বিধান দিয়েছে। এই সব বিধি বিধান হিন্দু সমাজ-চিন্তায় বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চাংগের মতবাদে। পঞ্চযজ্ঞ ও ঋণের মতবাদের পশ্চাতে আছে একটা বিরাট নৈতিক আদর্শ—সমষ্টির কল্যাণ কামনা—প্রচুরতম লোকের প্রভুততম সুখ সাধন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, যজ্ঞ-ঋণের আদর্শ বা সমষ্টিবাদ প্রচার দ্বারা হিন্দুশাস্ত্র সমাজের ভারসাম্য রক্ষা

করতে চেয়েছিল, পরস্পর বিরোধী স্বার্থকে সংযত করে একটা সমন্বয় স্থাপন করতে চেয়েছিল। এই মতবাদ হিন্দু সমাজকে বহুলাংশে যে শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রচণ্ড স্বার্থ-সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে তা অনস্বীকার্য।

বাস্তবজীবনে পরিপূর্ণ সাম্য সম্ভব কিনা সে বিষয়ে নানা মহলে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্কসের “ক্যামুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো” প্রচারিত হবার পরে ধারণা হয়েছিল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য সম্ভবপর এবং এই সাম্যের মধ্যেই রয়েছে মানুষের মুক্তি। বিচারশীল মন আজ আর সে-কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না। দেশ বিদেশে পণ্ডিতমহলে তা নিয়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। চীন রাশিয়া সহ পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সেখানে অর্থনৈতিক সাম্য আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, অদূর ভবিষ্যতেও তার কোন সম্ভাবনা নেই।

রামমোহন (১৭৭২-১৮৩২) সাম্যবাদী রবীন্দ্ৰ ওয়েনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু ওয়েন প্রচারিত সাম্যবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, যদিও তিনি ছিলেন বেদান্তে বিশ্বাসী। বঙ্কিমচন্দ্র রুশোর মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে ‘সাম্য’ নামক সুপরিচিত গ্রন্থ লিখে-ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি এই গ্রন্থ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। যদিও ভগবানের ‘সর্বভূতে প্রীতি’ তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করতেন। রবীন্দ্রনাথ সাম্যের সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। “রাশিয়ার চিঠিতে” (১৯৩১) তিনি মুক্তির পথ দেখেছেন সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ভিতর, যদিও একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—“অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্নযুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা।” গান্ধীজীর “ট্রাষ্টিশিপ” মতবাদ রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়বাদেরই অনুসারী। বিবেকানন্দ যুগপ্রয়োজনে সমাজতন্ত্রকে বিবর্তনের পথে একটা স্তর হিসাবে স্বীকার করেছেন, এমন কি প্রায় মার্কসের মতোই সর্বহারা বা শ্রুদ প্রভুত্বের

অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন, প্রতী করেছেন ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু’ কি কেবল পৃথিতে থাকবে? এবং বেদান্তের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রচার করেছেন। “অদ্বৈতবাদের কাজ হ’ল, সকল বিশেষ অধিকারবোধকে ধ্বংস করে ফেলা।” বিবেকানন্দ-দর্শনেও সমন্বয়ের প্রয়াস ছলক্ষ্য নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন পাশ্চাত্য হতে আগত সাম্যবাদে নয় সমন্বয়বাদে। তাঁর সমন্বয়ের পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়ে, মার্কস ও বিবেকানন্দের মিলনে, অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সামঞ্জস্যের ভিতর। নেতাজীর মতবাদ তাঁর “দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল” (১৯৩৫) এবং টোকিয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় (নভেম্বর ১৯৪৪) ধরে রাখা আছে। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী প্রচারিত সমন্বয়মূলক ভাবাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের অন্তরঙ্গ যোগ নেই, অন্তরতর যোগ রয়েছে প্রাচীন ভারত প্রচারিত পঞ্চমহাযজ্ঞ ও ঋণের ধারণায়—সমষ্টিবাদের পরিকল্পনায় (৮)।

আধুনিক ফরাসী চিন্তায় যজ্ঞ ও ঋণের প্রভাব

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিক ফরাসী “সলিডারিজিমে” সঙ্গে হিন্দু যজ্ঞ ঋণের নৈকট্য অতি নিবিড়, উভয় মতবাদের মধ্যে যে গভীর ঐক্য দেখা যায় তা প্রাণিধানযোগ্য। ফরাসী মনীষী সেলেস্টিন বোগলে-এর (১৮৭০-১৯৪০) মতবাদ মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চমহাযজ্ঞ ও ঋণের মূল কথাও ঠিক তাই। আচার্য বিনয়কুমার সরকার মনে করেন বোগলে-এর সমাজ-ঋণের ধারণা হিন্দু প্রভাবের ফল। বোগলে-এর মতবাদে আচার্য সরকার মনুর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন ৯।

(৮) বার্ষিক “জয়ন্তী” পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৫৪ পৃ: ৫৬০-৬২) ত্রীরঞ্জন লিখিত “সমাজতন্ত্র ও বৈদিক সমষ্টিবাদ” রচনাটি এবং সেই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের “ভক্তিরহস্য” গ্রন্থের (১৩৭১) “ভক্তির সাধন, অধ্যায়ে পঞ্চমহাযজ্ঞের বিশ্লেষণ (পৃ: ১৩-১৫) দ্রষ্টব্য।

(৯) বিনয়কুমার সরকার: ভিলেজেন্স এন্ড টাউনস-র যাজ্ঞ সোসাল প্যাটার্নস (১৯৪১) পৃ: ৩৬৪

মার্কসের পূর্বে এবং পরে মানুষ বিভিন্ন পন্থায় সামাজিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে চলেছেন, তারই ফলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। হিন্দু-সমাজে প্রচারিত পঞ্চমহাযজ্ঞ ও ঋণের ধারণা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রয়াসেরই একটা প্রাচীন রূপ। দেখা গেল মার্কস-পরবর্তী সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের আবহাওয়াতেও যজ্ঞ ঋণের মূল পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায় নি। লক্ষ্য করা যেতে পারে, মার্কস পরবর্তী আধুনিক “সলিডারিজিম” যে সমষ্টিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সমষ্টিবাদই বৈদিকযুগ হতে হিন্দু আচারকে প্রভাবিত করে এসেছে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-চিন্তায়ও পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং ঋণের একটা গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞ ও ঋণের মতবাদ বা সমষ্টিবাদ প্রচারের দিক হতে মনুকে একরূপ অমর বলেই মনে হয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিধানদাতা হিসাবে নয়, সমষ্টিবাদ প্রচারক হিসাবে, মনু-বিধানের নতুন আলোচনা সুরু হওয়া প্রয়োজন। দার্শনিক প্রবর ডাঃ ভগবান দাস সম্ভবতঃ এই দিক হতেই বলেছেন মনু এবং মার্কস সমান। প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর “ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু” গ্রন্থে লিখেছেন, “ডাঃ ভগবান দাস মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন আর্ষদের বর্ণাশ্রম ধর্মের পরই সোভিয়েটের এই সাম্যবাদমূলক ব্যবস্থা—Vast-experiment বা স্তম্ভং পরীক্ষা হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্য” শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিধানদাতা হিসাবে মনুর সঙ্গে শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তা মার্কসের ব্যবধান ছুস্তর মনে হতে পারে, কিন্তু গভীরতর তাৎপর্যের দিক হতে বিচার করলে মনু ও মার্কসের ব্যবধান ছুরতিক্রমণীয় মনে হবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল কথা শ্রেণী সংগ্রাম নয়, এমন কি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাও নয়। মূল কথা সমষ্টির কল্যাণ। সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ যে মার্কসবাদের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ তার মূলে রয়েছে এক মহান নৈতিক আদর্শের উদীপ্ত আহ্বান—যে আহ্বানের আবেদন প্রায় ধর্মীয় আবেদনেরই অনুরূপ। মার্কস-দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্য-

কার V. Afanasyev তাঁর Marxist Philosophy (১৯৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন, “Communist morality is the most humane and lofty in the world. It expresses the interests not of handful of exploiters but of the absolute majority of society members, the interests and ideals of all the working people”. মার্ক্সবাদের নৈতিক আদর্শ বিশ্লেষণ করে তিনি আরও বলেছেন—“The lofty principles of Communist morality stems from the very nature of the socialist system, from its economic basis, social ownership of the means of production..... Hence such an important principle of Communist morality as collectivism and comradely mutual assistance expressed in the slogan: One for all and all for one. (পৃ: ১১৭-১৮)।”

যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দর্শন বলে মনে করেন, আমার মনে হয়, তারা ভুল করেন। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বিলোপ, শোষণের অবসান ঘটানো এবং প্রত্যেককে সমান সুযোগের অধিকার দান এবং সমাজতন্ত্র যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে অর্থাৎ

Socialism বা সমাজতন্ত্র যখন Communism-এ বা সমভোগবাদে রূপান্তরিত হবে, তখন নীতি হবে, “From each according to his ability, to each according to his needs.” এর সোজা অর্থ হল: সমাজতন্ত্রের প্রথমপর্বে প্রত্যেক মানুষ তার পরিশ্রমের অনুপাতে বেতন পাবে এবং সমাজতন্ত্রের চরম পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষ নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের জন্য সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে বেতন পাবে। আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা সমাজতন্ত্রের কোন পর্বেই ঘোষণা করা হয় নি। এক কথায় সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ও লক্ষ্য হল সমষ্টির কল্যাণ সাধন। সুতরাং সমষ্টিবাদের প্রচারক মনুকে মার্ক্সের সঙ্গে সম মর্যাদার আসন প্রদান করা সম্ভবতঃ অন্যায় বা অযৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে না।

বর্তমান আলোচনার প্রথমদিকে সমাজ-জীবনে আচার ও সংস্কারের যে ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, সামাজিক গড়নে আচার ও সংস্কারের আর এক দিক অর্থাৎ যজ্ঞ ও ঋণের ভূমিকা ঠিক একই ধরনের। যে সব কথা আচার ও সংস্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অবিকল সেই সব কথাই পঞ্চমহাযজ্ঞ ও ঋণ সম্পর্কে বলা চলে। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিস্পয়োজন।

পান (Pun)

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

Pun এর ফোড়ন বিনে জমেনাকো রচনা
পান ছাড়া ভাল কোন গয়নাই হয় না।
পানে লাল তাঁট নয়, সে বা যেন ভোজই নয়
সুরা পান?—মাকে-সাজে তাই বলে রোজই নয়।
রোজ পানে মজা পান মদ্যপ সে
জল পান যার কাছে লাগে পানশে।
তার পানে সবাকার ধিকার ধায়
পান থিফ্ট পুজে বুঝি সব দেবতায়?
পাঞ্জাবে পান যাবে সেকি আর সম্বাদ,
ওরে পান তুমি পাশে পাশ্বেয়া বিবাদ।

হৌচট (বন্ধ ঘর)

জ্যোতির্ময়ী দেবী

ঘরে তো অনেক আলো ছিল
আকাশে তপন তারা।
আলো কলমলে ছিল সারা দিন রাত।
সবাই বলেছিল ছোট ওরে ছোট।
খেলাম হৌচট।
চলা শেষ। ওঠা শেষ। আলোতো রয়েছে ঘরে দেবি।
তবু ঘর খানা থেকে বেরবার মেলে না দয়ার
উঠেছি হাঁপিয়ে। সবটা প্রাচীর।
হাত দুটো খুঁজে ফিরে
পথহীন পথ। কোথায় বাহির।

“ওনাম”—কেরালার বিরাট জাতীয় উৎসব

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণোদয় কাল থেকে মাতৃশক্তির পূজা-আরাধনা ভারতবর্ষে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে শক্তিতন্ত্র বা শক্তিসাধনার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন।

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যেমন দুর্গোৎসব, উত্তর ভারতে ‘দশেরা’ তেমনি “ওনাম” (Onam) মালয়বাসীদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব, অন্ততঃ মালয়বাসীরা তাই মনে করে। তাই “ওনাম” কেরালার একটি অতি প্রাচীন জাতীয় উৎসব।

কেরালাবাসীরা মনে করে, পুরাণে বর্ণিত শক্তিশালী জনপ্রিয় নৃপতি মহাবলীর সময় থেকেই এই উৎসব প্রচলিত হয়। জাতীয় একত্বতা, মানবপ্রীতি ভালবাসার ও সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ ও উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতীক হিসাবেই এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস যখন শস্ত্রশ্যামলা বসুন্ধরা তারই পটভূমিকায় আবালবৃদ্ধবনিতা যুবক যুবতী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসব সম্পন্ন করে। নয়নাভিরাম রংএর বৈচিত্র্যে একত্রে ভালমন্দ ভোজন, নৌকা প্রতিযোগিতা, নৃত্য সংগীত এবং বহুবিধপ্রকার আনন্দ উপকরণে পূর্ণ বিচিত্রাহুষ্ঠান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ও আকর্ষণ।

কিষদন্তী প্রচলিত আছে যে পুরাকালে যখন মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে ভাব ভালবাসা সম্প্রীতির আদান-প্রদান ছিল তখন নৃপতি মহাবলী তপস্রা সাধনা ও ব্রতের দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিনটি রাজ্যের শক্তিশালী অধীশ্বর হয়ে বসলেন। দেবতার। কিন্তু নৃপতি মহাবলীর এই কর্তৃত্ব স্নানজরে দেখলেন না। তাঁরা হিংসার, রাগে, ঘেমে জলে পুড়ে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর নিকট মুক্তির দাবী প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু বামনাবতার নামে একটি বেঁটে খর্বকায় ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করলেন। সেই বেঁটে খর্বকায় বামনাবতার মহাবলীর কাছে “বর” ভিক্ষা করতে এলেন। নৃপতি মহাবলী ছিলেন দানবীর মহানুভব নৃপতি। তাঁর কাছে কেউ কিছু ভিক্ষা করতে

এলে তাকে কখনই ফেরাতেন না। বামনাবতার যখন তাঁর রাজ্যে পা রাখবার জন্য তিনটুকরা জায়গা (মাটি) প্রার্থনা করলেন, তখন এই ভিক্ষা অত্যন্ত সাধারণ এবং অকিঞ্চিংকর মনে করে সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু কৃশ খর্বকায় বামন যখন বিশাল বিরাট বামনাবতারের রূপ নিয়ে তাঁর দুই পায়ে স্বর্গ ও মর্ত্যকে ঢেকে দিয়ে রাজাকে তৃতীয় ভূমিখণ্ড পাতালে নিক্ষেপ করলেন তখন নৃপতি মহাবলী প্রমাদগুণলেন এবং পাতাল যেতে অস্বীকার করলেন এবং নিজের মাথাটি বামনাবতারের নিকট পাতালেন। বামনাবতার নৃপতি মহাবলীর মস্তকটিকে ঢেকে রাজাকে পাতালে পাঠালেন। রাজা মহাবলী এইভাবে দেবতাদের চক্রান্তে পৃথিবী থেকে পাতালে (পাতালম্) নির্বাসিত হলেন। রাজার কান্নাকাটিতে দয়াপরবশ হয়ে বামনাবতার মহাবলীকে পাতালের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং বৎসরে একবার করে তাঁর নিজের রাজ্য মর্ত্যে ফিরে আসবার অনুমতি দিলেন।

মহাবলীর এই ফিরে আসাকে কেন্দ্র করেই ধনধাত্রে পূর্ণা বসুন্ধরার পটভূমিকায় আশ্বিনমাসে শরৎকালে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনার প্রস্তুতি হিসাবেই এই “ওনাম” জাতীয় উৎসব স্থচিত হয়। এই উৎসবের মাধ্যমেই কেরলাবাসীরা যে সুখে আনন্দে আছে এবং দিন দিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এটাই যেন তাদের নৃপতির নিকট প্রকাশ করতে চায়। শ্রীদুর্গাকে অভ্যর্থনার জন্য যেমন বাঙ্গালীরা মেতে ওঠে এবং চারদিন তাদের কিতাবে কেটে যায় হাঁস থাকে না সেইরকম কেরলাবাসীরা আহাির নিদ্রা ভুলে তাদের রাজ্যকে স্বাগত জানাতে মেতে ওঠে।

মোট দশদিন ধরে এই “ওনাম” উৎসব সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম দিন উৎসবের স্বচনায় স্বর্ষোদয়ের পূর্বে মহিলা কুমারী যুবতী ও কিশোরী মেয়েরা (প্রত্যেক বাড়ীর ঘরে ঘরের) তাদের গ্রামের বা শহরের নিকটবর্তী নদীতে বা বড় পুষ্করিণীতে নিয়ে স্নান সম্পন্ন করে

এবং রাজা মহাবলীর উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সেই মন্ত্রোক্তে নদীর তীরের দুই দিক আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। তারা আনন্দে সঁতার কাটে, গান গায় এবং রাড়ী ফেরার পথে বাগান থেকে বহুবিধ বর্ণের ও গন্ধের বিচিত্র পুষ্পরাশি সঞ্চয়ণ করে এবং তাদের গৃহে নির্মিত মাটির রাজার মূর্তিতে মালাপ্রদান করে ও পুষ্প দিয়ে মূর্তিটিকে মনমুগ্ধকর ভাবে সাজিয়ে পূজা করে। একে কেরলার ভাষায় বলা হয় ‘থিক্কাকারা আপ্রন’। দশদিন ধরে নানাবিধ পুষ্প বৈচিত্র্যে মূর্তিটিকে সজ্জিত করাই এই উৎসবের অগ্রতম প্রধান অঙ্গ। দশদিন ধরে এই রকম আয়োজন ও পূজা চলে। প্রত্যেক গৃহে নূতন নূতন পরিকল্পনায় পুষ্প দিয়ে সাজানোর প্রতিযোগিতা চলে। দশমীর দিন অর্থাৎ উৎসবের শেষ দিনে এই মূর্তিটিকে ভক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে। “পুনরাগমনায়চ” এই কথা বলে মহা-সমারোহে বাত নাচ গান শোভাযাত্রা সহকারে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে মিষ্টান্ন প্রদান করে। এই দশমীটির দিনকে বলা হয় ‘থিরুওনাম’, বাঙ্গালীর যেমন বিজয়া দশমী। কিঞ্চিদন্তী প্রচলিত আছে এই দশমীতে মহাবলী নৃপতি ফিরে যাবার মুখে তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহে গৃহে সহরের বিভিন্ন এলাকায়, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে, কুটীরে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা সত্যিই অপূর্ব এবং উপভোগ্য। এই আলোকসজ্জার বিচিত্র সমাবেশ দেখবার জন্য সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সারাবছর ধরে এই দিনটির জন্ত সাদরে অপেক্ষায় থাকে।

রাজকীয় সম্মানার্থে আবালবৃদ্ধবনিতা যুবক যুবতী শিশু প্রত্যেকে নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়। রাস্তার দুই পাশে বিভিন্ন রংএর বিভিন্ন চংএর বৈদ্যুতিক আলো সাজান হয়ে থাকে। রাস্তার মধ্যে স্বেচ্ছা মনোরম তোরণ নির্মিত হয়ে থাকে। শোভাযাত্রাকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্ত হাতীরদল নিয়ে এসে তাদের সজ্জিত করা হয়। আত্মসবাজী ফটকা তুবড়ী প্রভৃতি ফাটানো ও

আলানো হয়। নৌকার প্রতিযোগিতা হয়, ইংরাজীতে যাকে বলে “Boat race”। “কথকলি” নৃত্যর মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনীকে লোকসমুখে উপস্থাপিত করা হয়।

এই ‘থিরুওনামের’ বৈশিষ্ট্য হল “বল্লমকালী” সালের তৈরী নৌকার প্রতিযোগিতা। এটি উৎসব শেষের শেষ অনুষ্ঠান এবং মহাডম্বরে সম্পন্ন হয়। প্রায় শতাধিক মাঝি বিরাট প্রকাণ্ড ও নানাবর্ণে ও পুষ্পে সজ্জিত সালের নৌকাকে (ওডি) সজ্জিত বাত নৃত্য সহযোগে দাঁড় টানে। সকলে হাততালী দিয়ে গান করে। রেশমের মনোজ্ঞ ছাতা নৌকার মাথায় শোভা পায়। নৌকার ওপর এই অলঙ্কারাদি ও বর্ণাঢ্য চোখ ঝলসে দেয়।

সন্ধ্যায় উৎসব সমাপ্তে প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তা ও কর্ত্রী তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে একত্রে একসঙ্গে মহা-সমারোহে বহুবিধ পদে বিলাসবহুল ভোজন চ্যাবচুগ্য-লেহপেং সহকারে ভুরি ভোজ্য সমাধা করে। “ওনাম” উৎসবের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ একত্রে বিশেষ ভোজন।

ভোজন সেরে প্রত্যেক গ্রামবাসী এবং যুবতী কুমারী মেয়েরা “কায়ি কোটিকালী” নামক একটি প্রসিদ্ধ ও কেরলাবাসীদের জনপ্রিয় লোকনৃত্য মুক্তঅঙ্গনে বিশাল স্তম্ভভীর মহাকাশের নীচে অত্যন্ত শ্রদ্ধা যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে পরিবেশন করে। নৃত্যের মাঝখানে প্রতীক হিসাবে বৃহৎ আকারের পিতলের তৈরী “প্রদীপ” জ্বলতে থাকে। এবং ফুলের নির্মিত একটি স্তম্ভের কারুকার্য জাজিম তৈরী করে পাতা হয়।

ছোট ছোট বালক বালিকারা ঘোড়া, হাতী, নেকড়ে উট প্রভৃতির মুখোন্ পরে গ্রামবাসীদের রঙ্গকৌতুক পরিবেশন করে।

* * *

নানা মূনির নানা মতের মত বহুপ্রকার কিঞ্চিদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন যে গৌতমবুদ্ধ যখন তপস্বী করে নির্বাণ লাভ করেন এবং তাঁর শিক্ষা লোকদের মধ্যে ছড়াতে থাকেন তখন তিনি ‘হলুদ রংএর পোষাকে সজ্জিত ছিলেন। সেইজন্য এই উৎসবে কেরলাবাসীরা হলুদ রংএর পোষাক পরিধান করে।

আবার অনেকে মনে করেন যে এক মহাশক্তিশালী নৃপতি আর্য থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর এই ধর্মাস্তরের দিনটিকে কেন্দ্র করেই “ওনাম” উৎসব পালিত হয়।

অপর এক ঐতিহাসিক “লোগান” বলেন যে, ধার্মিক নৃপতি চেরামন্ পেঞ্চমল মাকায় প্রস্থান করেন এবং কেরেলাবাসীরা তাঁর স্মরণে এই “ওনাম” উৎসব পালন করেন।

কিষদন্তী বা জনশ্রুতি যাই প্রচলিত থাকুক না কেন “ওনাম” যে বাঙ্গালীর দুর্গাপূজার মত কেরেলাবাসীদের একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণাঢ্য হৃদয়াগ্রাহী স্মরণীয় জাতীয় উৎসব এ সন্দেহে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

আমাদের দুর্গা পূজার মতই অমাবস্যায় (মহালয়ায়) এই ‘ওনামের’ সূচনা এবং দশমীতে সমাপ্তি। “ওনাম” প্রধানতঃ ধান কাটা শ্রীবৃদ্ধি শান্তি ও সুখী পরিবারের ও ঐক্যতার প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ প্রধান খাদ্য শস্ত কাটা শুরু হয় এই সময় এবং কৃষকেরা চাষীরা মহাবলীকে শস্ত দেবতাই মনে করে।

মোট কথা এই উৎসবের দশদিন ধরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজাচর্চা, পূজাপাঠ, উপবাস এবং নৃত্যগীত সহকারে বাঁচ বাঁজনা এবং বহুবিধপ্রকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেরেলাবাসীরা উৎসব পালন করেন।

রক্তচন্দন

দীপেন রাহা

প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রাজীব। সকলের মুখে একই রকম জবাব :

বড় বড় লেখকদের লেখা ছাপা হচ্ছে না। আপনার লেখা কে ছাপাবে মশাই!

অগত্যা—পৈতৃক অর্থের বিনিময়ে রাজীব তার বই ‘রক্ত চন্দনের’ রূপ দিল। বই রূপ পেল বটে, কিন্তু বই দোকানের শো কেসে ঠাঁই পেল না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে জমার খাতায়ও উঠল না। অনেক অনুরোধে কয়েকটি দোকান বই রাখল বটে, শ্লিপ দিয়ে। নতুন লেখকের বই জমার খাতায় জমি পেল না।

রাজীবের বহু সাধনার বহু কষ্টের লেখা বই। তাই সে মাঝে মাঝে খবর নিতে যায় প্রাপ্তিস্থানে, বইগুলো বিক্রি হচ্ছে কি না, নড়চে কি না।

প্রায় সবাই বিরক্ত হয়ে বলে, যান মশাই যান, এখন সময় নেই। অথবা পরে আসবেন। আপনার আজ্ঞে বাজে বই নিয়ে কথা কইবার সময় নেই।

রাজীব জানে তারা বইএর মলাট অবধি দেখেনি, দেবদার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু তবু সে খোঁজ না নিয়ে পারে না।

এ অনেকটা মুমূর্ষু রোগীর খবর নেওয়ার মত। বেঁচে আছে কি না। ডাক্তার দেখে কি না।

মাঝে মাঝে রাজীবের ধৈর্য চ্যুতি ঘটে। ইচ্ছে হয়, জমা দেওয়া বইগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু তা সে পারে না। ‘রক্ত চন্দনের’ প্রতিটি অক্ষর যেন তার নিজের দেহের রক্ত কণিকা।

বই জমা দেওয়ার সর্বটা খুবই সোজা।

বিক্রী-ফেরত।

যে গুলো বিক্রি হবে না, ফেরত নিতে হবে নিজে এসে।

কমিশন ?

সাহস করে রাজীব শতকরা কত বলতে পারে নি। দোকানের কর্মচারীই বলে দিয়েছে, শতকরা পঞ্চাশ।

অর্থাৎ লেজা মুড়ো সবই দোকানদারের। লেখকের বেগার ষাটুনি।

কথাটা মনে এলেও রাজীব প্রকাশে তা বলতে পারল না। শুকনো মুখে বলে, ঠিক আছে।

বই-জমার শ্লিপটা সযত্নে বুক পকেটে রেখে সে বাড়ী ফিরে আসে।

অপমান লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে কয়েক মাস পর পর রাজীব যায় দোকানে খবর নিতে।

কুশল জিজ্ঞেস করার আগেই দোকানী কেমন যেন বিগড়ে যায় তাকে দেখে।

—এমন কি সোনাদানা জমা রেখেছেন যে, রোজই খোঁজ করতে আসেন?

অপরোধী কণ্ঠে জবাব দেয় রাজীব : এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই এলাম।

না, না, যখন তখন বিরক্ত করবেন না।। তা যদি করেন, বই সব...

বাকী শব্দগুলো শেষ হবার আগেই রাজীব সরে পড়ে।

আরার কেউ কেউ রসিকতা করে :

ভাবনা কি বাজারে না কাটলেও দোকানে কাটবে।

কাটলেই হল। বলে তারা নিজের রসিকতায় নিজেরাই হাসিতে মশগুল।

দেখে পিত্ত অলে যায় রাজীবের কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই।

সেদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ নিখিলবাবুর সঙ্গে দেখা।

রাজীব জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

নিশ্চয়ই, আপনি তো 'রক্তচন্দন'র লেখক।

খুশী হল রাজীব। বইটার নাম যখন নিখিলবাবুর মনে আছে তখন নিশ্চয়ই বইটা চালু হয়েছে। নইলে চট করে বইটার কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই একটু ইতস্ততঃ করে সে আবার প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন?

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল নিখিল সরকার :

আর বলেন কেন? মালিকরা আবার নতুন খেল

স্বক করেছে। নতুন লেখকদের বই সব ভাড়া খাটাচ্ছে।

মানে?

মানেরটা খুব সোজা। প্রতিটা বই পঞ্চাশ পয়সা করে ভাড়া। পড়ুয়ারা পঞ্চাশ পয়সা ভাড়া দিয়ে এক একটি নতুন বই নেয়। পড়া শেষ হলে ফেরত দেয়, আবার কেউ কেউ খুব ভোগায়। বই সহজে ফেরত দিতে চায় না। তাই যাচ্ছি আদায় করতে। এর মধ্যে আপনার 'রক্তচন্দন'ও রয়েছে।

—বই ভাড়া খাটছে? এষে অভিনব ব্যাপার।

—আপনার কাছে বটে। আমাদের কাছে নয়। বই-এর বাজার নরম। কাজেই যেন তেন প্রকারের টাকা তুলতে হবে বুঝলেন? বইগুলোর জন্তুও যায়গা লেগেছে, যায়গার দাম আছে তো! বলেই এতে পা ফেলে চলে গেল নিখিল বাবু।

কয়েক মিনিট শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজীব।

হঠাৎ একটা মোটরের ঘন ঘন হর্ণ কানে আসতেই সে যেন লম্বিং ফিরে পেল। একটু সরে দাঁড়াল। নইলে...

একাধিকবার সে তার নতুন বই ফেরত নিয়েছে জীর্ণ শীর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। কারণটা সে ধরে নিয়েছিল অযত্নে রক্ষা। এখন আর একটা কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠতেই সে যেন কতকটা স্বস্তি পেল।

'রক্তচন্দন' বিক্রি না হলেও ভাড়া খাটে। অন্ততঃ কিছু লোক পড়ে, উলটে পালটে দেখে।

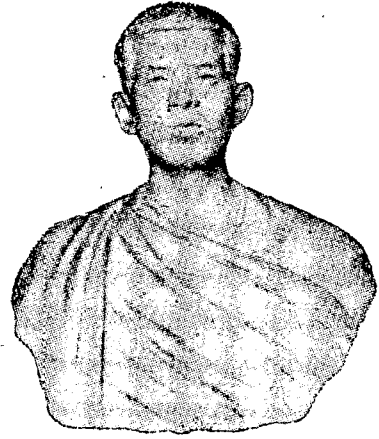
একটা যুক্তি রাজীবের মনে এল! নিকুপায় রোগী মরেতো মরুক ডাক্তারের হাতে। ঠিক সেই রকম তার চাহিদাবিহীন বইগুলো নষ্ট হোক পাঠকের হাতে এতে দুঃখ নেই। বরঞ্চ সদগতি হবে।

রাজীব স্থির করল, আর সে ঘন ঘন 'রক্তচন্দনের' খোঁজ করবে না। যত পারে ভাড়া খাটুক।

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

(৬)

কিরণেন্দু বাগচী



অকথা অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু হ'ল দামোদরের ওপর। অপর তিন জনের ব্যাপারে সে মুখ খুলল না কিছুতেই। কেবল বলল সে-ই রাগে মেরেছে। অত্যাচারী পাপীটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারায় সে খুব খুসী। আরও বলল, কিছুদিন আগে কুইন ভিক্টোরিয়ার ষ্ট্যাচুটর গলায় জুতোর মালা দেখে দেশময় যে হৈ চৈ পড়েছিল, সেটিও তার কীর্তি।

—এইতো চাই। গর্বে বুকটা আমার ফুলে উঠছে। আচ্ছা ভাই! আমরা চেঁচা করলে এমনি হ'তে পারব না।

—নিশ্চয়! আলবাত হব।

—বাকি তিনজন কবে ধরা পড়ল?

—ওরাও ধরা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত। কিভাবে শোন। সরকার ঘোষণা করল, জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় এদের কাউকে ধরিয়ে দিতে পারলে, ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা পুরস্কার পাবে, সে যেই হোক। এত টাকার লোভ, গণেশ আর রামচন্দ্র দ্রাভিদ দুই ভাই সামলাতে পারল না। দুজনেই নাম করা গুণ্ডা। জালীয়াতীতে সিদ্ধহস্ত আর মিথ্যা সাফলী দিতেও ওস্তাদ। তারাই পুলিশকে খবর দিল বালকৃষ্ণ হায়দ্রাবাদে পালিয়েছে।

ভারত সরকারের কাছ থেকে নিজাম সরকারে চিঠি গেল, বালকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে। ১৮৬৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী নিজাম

নিজেই যে হায়দ্রাবাদের মালিক আর রামকৃষ্ণের যা কিছু সেই করবে, এই কথা যেই সে ইংরাজ সরকারকে জানিয়েছে, ওমনি এক ধমক। স্তূড় স্তূড় করে বালকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিতে পথ পায় না নিজাম। বালকৃষ্ণ ইংরেজ সরকারের খপ্পরে এসে পড়ার পর ঐ ঘোষিত বিশ হাজারের দশ হাজার টাকা ভারত সরকার নিজাম সরকারকে পাঠিয়ে দিল।

বালকৃষ্ণ গ্রেপ্তার হয়েছে।—কাকস্ত পরিবেদনা, কোথায় পুরস্কারের টাকা। গণেশ আর রামচন্দ্র আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। এরাই তো বালকৃষ্ণের হায়দ্রাবাদে পালানর খবর পুলিশকে দিয়েছিল। তবে কেন তারা সরকারের ঘোষিত টাকা পাবে না। আহাম্যকরা ২রা ফেব্রুয়ারী পুণা থেকে 'টাইমস-অফ-ইণ্ডিয়া' কাগজে টাকা পাওয়ার লোভে, গণেশ দ্রাভিদের সহি দিয়ে এক বিবৃতি দিয়ে বসল। এরপর টাকা তারা কিছুটা পেল ঠিকই সরকারের কাছ থেকে। ২৬০ টাকা আয়কর কেটে নিয়ে দশ হাজারের বাকি টাকাটা সরকার পাঠিয়ে দিল এই দুই ভাইকে। অনেক আকুতি মিনতি করে শেষ পর্যন্ত ঐ যা পেল তারা।

সংবাদ পত্রের মাধ্যমে এই বিশ্বাসঘাতকদের খবর পেয়ে দামোদরের ফেলে যাওয়া রিভলবারটা নিয়ে বাহুদেব ছুটল ওদের পেছনে! যা করেই হোক এ দুটকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে এই তার পণ।

বাহুদেব আর রাণাডের ধরা পড়ার জন্যে অপেক্ষা

না করেই দামোদর আর বালকৃষ্ণের বিচার শুরু হয়ে গেল।

রাণাড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল।

১৯ বছরের কিশোর বাসুদেব খুঁজে বার করল গণেশ আর রামচন্দ্রের ঠিকানা। ওরাই তো ওর দাদাকে সনাক্ত করবে—মামলায় সাক্ষী দেবে। সব কিছু খবর সংগ্রহ করে একদিন সন্ধ্যাতে বাসুদেব পুণার একটেরে এক কুখ্যাত পল্লীর ভেতর দ্রাভিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল। গায়ে তার পুলিশ সাহেবের পিওনের চাপরাস লাগান পোষাক। বাড়িটাতে জুয়া আর মদের আড্ডা বসেছে তখন। বাসুদেব, গণেশ আর রামচন্দ্রকে ঘরের বাহিরে ডেকে নমস্কার জানিয়ে বললে, 'এস পি সাহেব তাঁদের এখুনি একবার খানায় ডাকছেন কালকে কিভাবে সাক্ষী দিতে হবে এইসব আলোচনা করবার জন্তে।'

ওরা বলল—তুমি যাও, আমরা এখুনি আসছি।

কাছেই একটা ভাল মত নির্জন জায়গা দেখে নিয়ে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

যেই তারা কাছাকাছি এসেছে দুই গুলিতে দুটোকে ধরাশায়ী করল বাসুদেব।

গণেশের দেহটা একটু নড়েই স্থির হয়ে গেল। রামচন্দ্রের একটা গোটা দিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

কাজ হাসিল হয়েছে। আফ্রাদে আটখানা হয়ে মনের আনন্দে বাসুদেব পুলিশের কাছে আত্ম সমর্পন করল।

—জ্বরদন্ত ছেলে যা হোক বাসুদেব। চাপরাসীর পোষাক পরে কি চালাকিটাই না খাটিয়ে ছিল।

—তাইতো বলছি কি চমৎকার নাটকীয় ভাবে এত বড় কাজটা তারা সমাধান করল। নিরাশ হয়নি কোনটাতেই এরা। তা ছাড়া কি মনবল দেখ। সবই দর্পহারী মধুসূদনের চক্রান্ত বুঝলে ভাই।

—তারপর ওদের কি হ'ল?

—তারপর যা ঘটতে পারে তা হল। কাজীর

বিচারে ওদের চারজনেরই ফাঁসী হয়ে গেল জারবেদা ছেলে। দামোদর চাপেরকারকে ফাঁসীতে বোলান হল—১৮৯৮ এর ১৮ই এপ্রিল। বালকৃষ্ণকে বোলান হ'ল ১২ই মে, ১৮৯৮। বাসুদেব খুলল এর পরের বছর ৮ই মে।

সেই বছরেই ১৮৯৯ এর ১০ই মে রাণাডেকেও ফাঁসীর রজ্জুতে লটকে দেওয়া হল।

বাসুদেবের কি দুর্দান্ত সাহস জ্ঞান। ফাঁসীর হুকুমের খবর শুনে ভয় পাওয়াতো দূরস্থান, সে নাকি বিচারের রায় শুনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজকে প্রশ্ন করেছিল, সে যখন দুজনকে মেরেছে, তখন তার কেন দুবার ফাঁসী হবে না।

—সত্যিই সাহসী বটে। এমনি না হলে কি পুরুষ মানুষ। এদের কথা কখনই ভুলতে পারব না।

—শুনলে তো মারাত্মক প্রতিশোধ নেওয়া। ইতিহাসে এরা চির অমর হয়ে থাকবে। এ ঘটনা আমার মুগ্ধ হয়ে গেছে, তাইতো তোমায় গুছিয়ে বলতে পারলাম। আমি কিন্তু ভাই সুষোগ পেলে এদের মতই হব।

—তুমি একা হবে? আমি হব না? আমি নিশ্চয় হব, দেখবে।

—প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো। চল এবার ওঠা যাক। সন্ধ্যা কখন উতরে গেছে। বাড়িতে খুব ভাবছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, সোজা আমাদের বাড়ী যাই চল। দু'জন, দু'জনকে ম্যানেজ করতে হবে তো। মার কাছ থেকে ক্ষীর মুড়ি খেয়ে তবে তুমি বাড়ি যাবে। মা তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন, তারজন্তে তোমার চিন্তা নেই।

যদিও বাঙলাদেশ, বিপ্লবে ঝাঁপ দেবার মতলব অনেকদিন থেকেই আঁটছিল কিন্তু কে সেই ভারতবাসী, যে এই পতাকা সর্বপ্রথম বহন করবে সেইটিই তখনও কেউ জানত না।

কোন রাজ্যের ছেলের এমন বৃকের পাটা হবে সবার আগে?

এগিয়ে এল বাহুদেব। মহারাষ্ট্রের বীর যুবক বাহুদেব বলবন্ত ফাড্কে। মাত্র তেত্রিশ বছর ক'মাস বয়স তখন তার।

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের দল সংগ্রহ করে আর সেই দলে মারাঠী উপজাতির রুমোশীদের কয়েকজনকে নিয়ে, দেশে বিদ্রোহবাহি আলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যে টলিয়ে দিতে পারা যায় তা বাহুদেব দেখিয়ে দিল।

১৮৭০ সাল। খবর এল বাহুদেবের মার অশুখ। মাতৃ ভক্ত ছেলে। গর্ভধারিণীর মৃত্যু শয্যায় চাকরীর খাতিরে শেষ বারের মত মায়ের সঙ্গে দেখা না হওয়ায়, ছেলের মনে বিদ্রোহের আগুন হুহু শব্দে জ্বলে উঠল।

ঘটনা সামান্যই ঘটে কিন্তু কিসে যে মানুষের মন তেতে ওঠে কেউ তা বলতে পারে না।

নিজেকে তৈরী করতে লেগে পড়ল বাহুদেব। যুবকদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসে পড়ল। সভা করল। গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, ইংরেজদের অন্যায়ে প্রতিবাদে রুখে দাড়াতে। সে চায় ইংরেজদের তাড়িয়ে এই সোনার ভারতে আবার স্বাধীনতার নিশান গাডবে।

মাতৃভূমির একনিষ্ঠ পূজারী বাহুদেব। ছিল না তার অর্থবল। ছিল না তার সৈন্যবল। তবে কি করে করবে সে দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত? নিঃস্ব হয়েও সে ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী; সেটি ছিল তার মনবল। এই বস্তুটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কারশাধ্য। কোন দিন কেউ তা পারেনি।

পুণায় মিলিটারী একাউন্টসে হৃদয় চাকুরে। কাগজের খাতিরে বড় সাহেবের স্নেহের পাত্র ছিল সে বটে। তবে কেন সে পেলে না অফিস থেকে ছুটি মৃত্যুপথযাত্রী মার মুখ? মুখখানি শেষবারের মত দেখতে যাওয়ার জন্তে? চাকরীর মায়া না করে ছুটে গিয়েছিল সে ঠিকই বিনামূল্যে মতিতে মায়ের শয্যা পার্শ্বে, মা-ই যে তার জীবনের সর্বস্ব! কিন্তু হ'ল না শেষ দেখা। বুক চাপড়ে সে বেশ খানিক কাঁদল।

ফিরে এসেছে। সাহেব কৈফিয়ৎ চাইল। কিসের কৈফিয়ৎ? তেড়ে অপমান করল লালমুখো জাঁদরেল বড় সাহেবকে প্রতিবাদ জানিয়ে। সাহেব রেগে গরগর করতে লাগল। ভাগিয়াস সেখানে আর কেউ ছিল না। সাহেব সে অপমান তখনকার মত হজম করল। চাকরি থেকে বরখাস্ত করল বাহুদেবকে। চাকরী পেলে।

সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় সে। যুক্তি দেখিয়ে বোম্বাই সরকারকে চিঠি দিল। ফিরে পেলে চাকুরী বাহুদেব। 'লড়কে লেঙ্গে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আদায়ও করল ঠিকই। বসল নিজের চেয়ারে সেই অফিসে।

কার্তরা তাকে আর স্তনজরে দেবল না কোন দিনই। বছর দুয়েত মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আবেদন পত্র দিল ছুটির।

সরাসরি নামজুর হ'ল।

হিন্দুর ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ এতদূর স্পর্ধা ইংরেজ জাতের? এ অপমান সহ্য করা যায় না। প্রতিশোধ সে নেবেই এই হ'ল তার একমাত্র পন। বিদ্রোহের অঙ্কুর পিতামহের রক্ত থেকে তার জীবনে অঙ্কুরিত।

অনন্ত রাও জিলেন, কারনালা অঞ্চলের মস্ত জমিদার বাহুদেবের পিতামহ। তিনি দুর্গে বাস করতেন। ১৮৯৮তে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে হুকুম দিল—'হাট যাও হি'য়াসে!'

অনন্ত রাওয়ের গর্বিত কণ্ঠস্বর ছঙ্কার দিয়ে উঠল—
'নেহি হাটেঙ্গে!'

যুদ্ধ বাঁধল। দুর্গ রক্ষার জন্যে তিনদিন সমানে যুদ্ধ চালিয়ে অনন্ত রাও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। পরাস্ত হলেন। তবে ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে বুঝেছিল অনন্ত রাও কি ভীষণ পরাক্রমী।

এঁরইতো পৌত্র বাহুদেব।

[ক্রমশঃ]

মোমের ঘর

মোমের ঘর—শান্তনু দে সরকার। প্রকাশিকা—
আইত্তি দে, ২৮ নং কেরদারনাথ দেউটি লেন, কদমতলা,
হাওড়া-১। পৃ: ৩৩৮, দাম—পনের টাকা।

লেখকের প্রথম উপন্যাস 'মোমের ঘর' শৈশবে গৃহচ্যুত
এক বালকের (তার নামও শান্তনু) যৌবনের দ্বারদেশে
পৌঁছানো পর্যন্ত জীবনের বেদনা-মধুর কাহিনী।
'নিবেদন' অংশটি পড়লে মনে হয় লেখক নিজেই যেন
কাহিনীর মুখ্য চরিত্রটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে
আছেন। অদৃষ্টের হাতে মার খেতে, খেতে এক বালক
সঞ্চয় করেছে প্রচুর অভিজ্ঞতা। জীবনের পথে চলতে
চলতে এসেছে নানা চরিত্রের মানুষ। কেউ অপবাদ
দিয়ে তাড়িয়েছে, আবার কেউ বা ধরে রাখতে
চেষ্টা করেছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্র শান্তনু। তার
চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'
গল্পের ছোট্ট ছেলেটির। সব কিছুর প্রতিই তার মমতা
আছে, ভালবাসা পেতে চায়, দিতে চায় অথচ স্থায়ীভাবে
শিকড় তৈরী করে নিজের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করতে চায়
না। সমগ্র জীবনটাই যেন নীল আকাশে মেঘের পুতুল
অথবা অপরাহ্নে পশ্চিমাকাশে মেঘের পাটে পাটে
জীবনের রঙীন আলপনা। ঋণিকবাদেই তার চিহ্ন
থাকবে না আকাশের বুকে।

শীর্ষেন্দু, তার মা, ঠাকুমা সবার প্রিয় হয়ে উঠলো
শান্তনু, তেমনি প্রিয় হলো ঘাটশিলার দাদু-দিদিমার।
অবশেষে চলার পথে ঠাকুর খেতে খেতে যখন নোঙর
করতে যাচ্ছে তখনই এল আবার আঘাত। প্রিয়
পল্লিজন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা।

গ্রন্থকার অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে কাহিনীটিকে
গড়ে তুলেছেন। ভাষায় আড়ষ্টতা তো নেই-ই বরং
মাঝে মাঝে কাব্যিক ছন্দ পাখা মেলে উড়ে যায় যেন।
কিন্তু উপন্যাসে যে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক তার কিছু
অভাব আছে। যে শীর্ষেন্দু ও তার পরিবারকে শান্তনু
এত ভালবাসতো তারা হারিয়ে গেল মহাকালের গর্ভে?

মণিমালা, পাঁচুর মা সবাইকে লেখক গ্রন্থের মধ্যে পর্যায়-
ক্রমে এনেছেন, কিন্তু যাদের ভালবাসা, স্নেহ শান্তনুর
জীবনে এনেছিল 'জীবনের আশ্বাদ' সেই শীর্ষেন্দু,
অধ্যাপক দাদু, গঙ্গেশ, বৌদি, এদের মুখগুলি যেন অস্পষ্ট
হয়ে গেল। তিনি কি মনে করেন 'জীবন যেন মিথ্যের
বরণডালা। জীবন দেবতার পূজা শেষ হয় না কোনদিন,
দেবতার সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদও থাকে অগোচরে।
...অভিনেতা জীবনে রাজা থেকে ভিখারীর রূপসজ্জা
সবই সাময়িক, পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেলে সবই
মিথ্যে'?

জীবনে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, আছে যন্ত্রণার
অতলান্ত জালা। তথাপি তারই মধ্যে ফোটে আশার
মৌসুমী আলো, অন্ধকারে জ্বলে বাঁচার খড়োতাশখা।
এ না হলে যে তাঁর ভুবনেশ্বর নাম মিছে। লেখক এই
উপন্যাসে নিজের অজান্তেই বোধকরি বেঁচে থাকার
'সঞ্জীবনী গান' গুনিয়েছেন। কাহিনী শিথিলবদ্ধ হলেও
এই গুণ পাঠকের মন আকর্ষণ করবে। আশা করি,
পাঠকসাধারণ একখানা পরিচ্ছন্ন উপন্যাস পাঠে তৃপ্ত
হবেন।

—ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

একাদশী (উপবাস) তত্ত্ব ও মহাত্ম্য : লেখক—
শ্রীগোষামোদাস রায়। প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ কর,
প্রজেক্ট প্রেস বিল্ডিংস্, বেনাচিটি, দুর্গাপুর—১৩

স্বাস্থ্য লাভ ও চিত্ত শুদ্ধির জন্ত উপবাস একটি সর্ব-
ধর্মাবলম্বিত অবশ্য অবলম্ব্য উপায়। উল্লিখিত
পুস্তিকায় তাগবত রসিক বিদগ্ধ গ্রন্থকার উপবাসব্রতের
সেরা ব্রত একাদশীর মহাত্ম্য এমন ভাবে কীর্তন করে-
ছেন যা হয়ে উঠেছে, বলতে কি, সত্যই অমৃতগন্ধী। তথ্য
বৈচিত্র্যে ও তত্ত্ব কেন্দ্রিকতায় পুস্তিকাটি সত্যই স্মন্দর।
উপবাস কেন করব, কেমন করে করব, একাদশীর দিনেই
বা কেন, ধর্মশাস্ত্র কি বলছে, চিকিৎসা শাস্ত্র কি বলছে,
জ্যোতির্বিজ্ঞান কি বলছে, আর মহাজনগণই বা কি
বলছেন এই একাদশী সম্পর্কে, সব কথা স্মন্দর ভাবে
গুছিয়ে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন আর সেই
সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একটি প্রেরণা—তাইতো, মন্দ কি,
দেখিই না করে একাদশী।

—শঙ্করসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্ঘ-সংবাদ

আশ্রমী

প্রবর্তক ট্রাষ্টের ৪২-তম অধিবেশন :

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খৃঃ. ১০ আশ্বিন ১৩৮২ বঃ, শনিবার অপরাহ্ন ২। ঘটিকায় কলিকাতা প্রবর্তক ভবনের ত্রিতলে প্রবর্তক ট্রাষ্টের ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভাধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতিত্ব করেন।

প্রারম্ভে ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রী ইন্দুভূষণ রায় সঙ্ঘগুরুদেব শ্রীশ্রীমতিলাল প্রবর্তক ট্রাষ্টের ১ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে (২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ, ১১ ফাল্গুন ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) যে বাণী প্রদান করেন, তার মর্ম্যাংশ পাঠ করেন। উক্ত বাণীতে সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি ব্যক্ত করেন :

“...প্রবর্তক সঙ্ঘ কোন positive স্থিতির উপর দাঁড়িয়ে এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি, শুধু ছিল স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে রূপ দিতে গিয়েই সৃষ্টি গড়ে উঠেছে। positive কিছুকে যেমন নিয়ে সৃষ্টি আরম্ভ করেনি, তেমনি negative-ও আমাদের মধ্যে ছিল না। ছিল minus। minus-এর ফল minus হবে না, ফল হবে ব্যাপ্তি। positive কিছু নিয়ে সৃষ্টি আরম্ভ হলে তার থাকে একটা limitation, তেমনি negative-এর উপর ভিত্তি করে কিছু গড়লে পৃথিবীর বুকে তা চিরস্থায়ী হয় না, ভাগবত সৃষ্টির সম্ভব হবে না। একদিন তার বিনাশ অবশ্যস্বাবী। তাই negative-ও positive উভয় পথ পরিত্যাগ করে আমরা চলেছি।”

“...এয়ুগে ধর্মপ্রচার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়াই সফল হবে। তাই অর্থক্ষেত্রে একদল মানুষ (সঙ্ঘের) যে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস রেখাঙ্কিত হয়ে যাওয়া চাই যে, তারা শুধু ব্যবসা-বৃত্তি আশ্রয় করে নেই, তারা একটা বৃহৎ স্বপ্নকে রূপ দিতে চলেছে।”

“...এই Economy-কেই আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে ভগবানের মিশনকে সার্থক করার জন্ত। অর্থসিদ্ধি হবে ধর্মের একটা অঙ্গ। যেখানে ইহার

অভাব, ধর্ম সেখানে নির্বাহ্য, শক্তিহীন। তার পরিপূর্ণ-রূপ প্রকাশ হয়নি বলতে হবে। সঙ্ঘ বাস্তবিকভাবে স্বার্থকে আশ্রয় করেনি, আবার স্বার্থহীন হয়ে মোক্ষের পথেও অভিযান করবে না। একটা বৃহত্তর স্বার্থকে রূপ দেওয়ার জন্য সর্বত্যাগী হয়েও সাধারণ জনের মতই অর্থোপার্জন করে চলেছে।... শঙ্কর, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণের চেয়ে তারা কোন রূপে হীন নয়, বরং তাদের জীবনে একটা অনাবিক্ত সত্য অবতরণ করেছে।

“...প্রবর্তক সঙ্ঘের দরদী মানুষ—যারা ইহা বহন করে চলেছে, বহু বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ইহাকে কতকটা স্ফুর্জল করে তুলতে পেরেছে, তাদের আমি ধন্যবাদ আর কি দেব। কারণ তারা এ মিশনের জন্মেই জন্মেছে, birth-right নিয়েই এসেছে, তারা আমার ‘Sacred Trust’-কে চিরযুগ বহন করবে, এ বিশ্বাস আমি করি। ভগবান তাদের আরও শক্তি ও সাহস প্রদান করুন।...”

অতঃপর কার্য-সূচী অনুযায়ী সভার কার্য আরম্ভ হয়। সম্পাদক শ্রী রায় ১৩৮১ বঙ্গাব্দের ডিরেক্টারবর্গের রিপোর্ট ও অডিটার রিপোর্ট—যাহা মুদ্রিতাকারে হিসাব-পত্রাদির সঙ্গে সকল সভ্য-সভ্যাগণের নিকট যথারীতি প্রেরিত হয়েছিল, তাহা পাঠ করেন। ইহার পর ১৩৮১ বঙ্গাব্দের (১৪ই এপ্রিল ১৯৭৫ খৃঃ) বার্ষিক উদ্বৃত্ত-পত্র (Balance Sheet) ও আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

বিদায়ী ডিরেক্টার (Retiring) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দে পুনর্নির্বাচিত হন। তৃতীয় বিদায়ী ডিরেক্টার ট্রাষ্টের প্রবীণতম সভ্য শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক বার্ষিকায়নিক শারীরিক দৌর্যল্য ও অসুস্থতায় নিবন্ধন ডিরেক্টার বোর্ডের সভায় বৎসরাধিককাল কোন সভায় যোগদান করতে সমর্থ না হওয়ায় তিনি পুনর্নির্বাচিত হন নি। শ্রীনায়েক প্রবর্তক ট্রাষ্টের গঠন-যুগের প্রারম্ভেই সঙ্ঘগুরুদেবের নির্দেশে ইহার সহিত সংযুক্ত হন ও অকুণ্ঠভাবে সেবাদান করেছেন। তাঁর একনিষ্ঠ সেবা ও দরদের কথা স্মরণ করে সকলেই তাঁর

প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ও তাঁর নিরাময় সুস্থজীবন প্রার্থনা করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৬ বৎসর।

ইহার পর সজ্জ উৎসর্গীকৃত প্রবীণতম সভ্য ও ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠা-যুগ হইতেই ইহার সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ হিসাবাদি বিশেষ নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করে স্পষ্টতর ভাবে সকলের নিকট ব্যক্ত করেন। সজ্জের অর্থপ্রতিষ্ঠান—তথা ৪২ বৎসর পূর্বে প্রবর্তক ট্রাষ্ট গঠনের মূলে সজ্জগুরুদেবের আদর্শ ও স্বপ্ন—যা শ্রীঘোষের অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধিতে এসেছে এবং সজ্জগুরুজী যে ‘ত্ৰাস’ বা ‘Sacred Trust’ অর্পণ করেছেন, তাহা রূপায়ণের জন্ত অনন্তনিষ্ঠায় এই পরিণত বয়সেও তপস্তা করে চলেছেন, এই মর্ম-কথাও তার দীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে প্রকাশ পায়।

অতঃপর ট্রাষ্টের অন্ততম ডিরেক্টর ও প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সজ্জের অর্থনীতি সাধনার তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় সভাপতি তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, “৪২ বৎসরের উৎসব—সজ্জের অর্থনৈতিক সাধনার ইহা একটা সন্ধিযুগ। যুগের অর্থসঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। এ সঙ্কট থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব আমাদের যোগশক্তি উদ্ধুদ্ধ করে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র এই যোগবিজ্ঞানের সুন্দর নির্দেশ দিয়েছে। কৈবল্যপাদের প্রথম সূত্রেই আছে—“অন্যোষধিমন্ততপঃ সমাধিজ্ঞাঃ সিন্ধুঃ”। ইহা পঞ্চকোষের পঞ্চবিধ সিন্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিযোগে প্রকৃতির রূপান্তরে প্রকাশ পায়। পরসূত্রে আছে—প্রকৃতির আপ্রণের কথা। “প্রকৃত্যাপুরা ক্ষেত্রিকবৎ”—ক্ষেত্রে জলপ্রবাহ আনতে হলে, শুধু প্রবাহ-পথের বাধাগুলি অপসারণ করতে হয়, তখন আপন বেগেই জলস্রোতঃ প্রবাহিত হয়ে ক্ষেত্রকে প্রাবিত করে—শুক ক্ষেত্রে স্রস, সজীবিত করে।

এই প্রকৃতির তিন প্রকার প্রবাহের কথা সাধনজগতে

তারুণ্যায়ত ও লাবণ্যায়ত—তিনটি অমৃত প্রবাহের কথা উল্লিখিত আছে, তার মধ্যে তারুণ্যায়তই প্রথম প্রবাহ। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় “Flow of Grace” বা ঈশ্বর করুণার প্রবাহ। আমরা শ্রীগুরুর কৃপার মধ্য দিয়ে এই ভগবতী করুণারই প্রবাহ পেয়েছি। কিন্তু ইহাতে আমাদের প্রাকৃত জীবনের রূপান্তর হয় নি। আজ আমাদের আবাহন করতে হবে—দ্বিতীয় শক্তি, যাহাই তারুণ্যায়তের প্রবাহ।

ইহারই পঞ্চবিধ প্রকাশ—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিজ্ঞা সিন্ধিতে।

আজ আমাদের দেহে, প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে, আনন্দে তারুণ্যায়তের প্রবাহকে প্রবাহিত হওয়ার জন্ত ক্ষেত্রিকের মত ক্ষেত্রগুলিকে বাধামুক্ত করে দিতে হবে। তা’ হলেই আমরা দেহে নব জন্ম, প্রাণে যৌবনের উৎসাহ-বীৰ্য্য, মনে মন্ত্রশক্তির উদ্দীপন—তথা বিজ্ঞান ও আনন্দের সিন্ধিগুলিও সজ্জাধারে অবতীর্ণ হবে।”

সভাপতি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বর্তমান ঘটনা ও তথ্যাদি উল্লেখ করে উপরোক্ত সাধনবিজ্ঞানের মর্মকথা বিশদীকৃত করেন।

সভাপতির ভাষণ সমাপ্তির পর সজ্জের উপাসনাতে “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং...” পূর্ণপ্রশান্তি উদ্গানে অস্থগান সমাপ্ত হয়।

চন্দননগর ও কলিকাতার ট্রাষ্টের প্রায় সকল সভ্য-সভ্যাগণ এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

প্রবর্তক ভবনের সজ্জের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীসহ সকলকেই জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

চট্টল-স্মৃতি-সমীক্ষা : ‘মৈত্রেয়ীভবনে’ সাক্ষ্যোপাসনা * :

আজ তোমাদের সঙ্গে উপাসনা করার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম। ১৯৫১ সনে যখন আমি এই চট্টল

* গত বৎসর প্রবর্তক সজ্জের অন্তরঙ্গ উৎসর্গীকৃত সভান এবং প্রবর্তক ট্রাষ্টের ও প্রবর্তক কমানিশিয়াল করপোরেশনের অন্ততম ডিরেক্টর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে কার্খোপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় গমন করেন এবং চট্টল প্রবর্তক সজ্জ পরিদর্শন করেন। মৈত্রেয়ী ভবনে সাক্ষ্য উপাসনার অনুষ্ঠানে প্রবর্তক সজ্জের

কেলে প্রথম আসি তখন মৈত্রেয়ী ভবন হয় নাই। এখানে এসে প্রথমেই মনে পড়ছে সেই প্রাণপুরুষদের বাদে অক্লান্ত শ্রমে ও আত্মদানে এই আশ্রম মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। তোমাদের মীরাদি দাদামণিদের স্মরণ করে অশ্রুসজল কণ্ঠে তোমাদের নিকট আমাকে পরিচিত করে দিয়েছেন তোমাদেরই অল্পতম দাদামণি বলে, কারণ মূলতঃ প্রবর্তক সত্য চন্দ্রনগর ও চট্টল ঘড়্য একই প্রতিষ্ঠান। সেই অতীত স্মৃতি স্মরণ করে আমারও চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ।

কোথায় সেই মধুর হাসিমাখা মুখে বন্ধিমদার বৃকে টেনে নেওয়া! আর পাবো না বীরেনদার প্রাণমাতানে! হাসিমুখ, দিগন্ত রিস্তৃত বাহর প্রেমালিঙ্গন।—এস ভাই বলে হরিদা ও নন্দদার বৃকে টেনে নেওয়া। সব শেষ হয়ে গেছে। সবই আছে, নেই সেই প্রাণপুরুষগুলির স্নেহাকর্ষণ। কেবলই মনে হচ্ছে কেউই তো আমাকে আশীর্বাদ করার নেই এখানে। তাঁদের অভাবে বৃকটা হা-হা করে ভেঙ্গে পড়ছে। এ যে কি অসহ্য যন্ত্রণা! তোমরাও তা অনুভব করছো প্রতিক্ষণে। তাই তোমাদেরও অশ্রুসজল চক্ষু!

বন্ধিমদা, বীরেনদা একটি একটি পুষ্প চয়ন করে এই মনোমুগ্ধকর পুষ্পমাল্য রচনা করে গেছেন। বিরুদ্ধ শক্তি ছিন্ন ভিন্ন পদদলিত করার প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আবার তোমরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছ। ঈশ্বরই রক্ষা করেছেন তোমাদের। তুমি নিই রক্ষা করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমরাও ঈশ্বরের উপর এ বিশ্বাস রেখো।

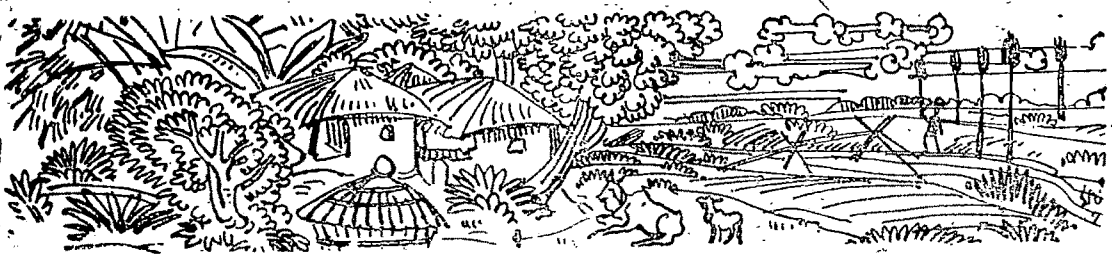
হিন্দু ধর্মের মূল আশ্রয় গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমা। আমাদের শ্রীগুরুও শিখিয়েছেন গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমাকে

আশ্রয় ও বিশ্বাস করতে। মৈত্রেয়ীর সাধনাতাই পাবো জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম। শ্রীগুরু অজ্ঞান অন্ধকার হতে জ্ঞানাক্ষণ শলাকার দ্বারা অজ্ঞানকে পরাভূত করে জ্ঞান দান করেন। দ্বিতীয় আশ্রয় মন্ত্র। শ্রীগুরুই দেন মন্ত্র, এই মন্ত্রের সাধনেই আসে শক্তি। তৃতীয় আশ্রয় প্রতিমা। গুরু ও মন্ত্র লাভের পর শ্রীগুরু মূর্তি প্রতিমাতে রূপান্তরিত করা সাধকের পক্ষে সহজসাধ্য। তখন গুরু মন্ত্র প্রতিমা তিনই এক এবং একই তিন রূপে উদ্ভাসিত হয় সাধকের অন্তরে। সাধক তখন হয় প্রেমে মাতোয়ারা। এ প্রেম পার্থিব নয়, অপারকৃত অপার্থিব ঈশ্বর প্রেম।

বেদান্তের উক্তি ‘আজ্ঞানং বিকি’—নিজেকে জানো। অর্থাৎ কেন ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারই অনুসন্ধান করা। ঈশ্বরের কি অভিসন্ধি তাহা জ্ঞান ও পূরণ করো। ‘তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমারই জীবন মাঝে’—ইহা শুধু আকুতি নয়, জীবনে অনুশীলন করো।

আমি শ্রীগুরুর নিকট আজ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি—হে গুরু ভগবান, এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে প্রাণপুরুষেরা সর্বশেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি বিধান করো। আমাদের শ্রীগুরুর নিকট এবং বন্ধিমদা বীরেনদা প্রভৃতি গুরুজনদের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁদেরই অশরীরী শক্তি বর্তমান ধারক ও বাহকদের সূচু পরিচালনার শক্তি প্রদান করুন। তোমরা পুনঃ সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়ে এনে বন্ধিমদা বীরেনদা প্রমুখ পূর্ব স্বরীদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি বিধান কর। এতেই তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন।

ও শান্তি! শান্তি! শান্তি!



স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ও সমানাধিকার :

শ্রীউদয়ন 'মাতৃরূপেন সংস্থিতা' শীর্ষকে ভারতের অধ্যাত্ম সমাজের মাসিক মুখপত্র 'উত্তীর্ণ' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৭৫) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভেজাল ভারতীয় দৃষ্টি কোণ হতে 'স্বাধীনতা ও সমানাধিকার' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা শুধু ভারতবাসী নয় প্রগতি-উন্মাদ সবারই অমুখাবলী। লেখক উপলব্ধি করতে আহ্বান জানিয়েছেন : "নারীবর্ষ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্রসংঘ মহাসচিব সাম্য প্রগতি ও শান্তির ত্রিধারার উপর ভিত্তি করিয়া এই বর্ষ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি গার্মী, মৈত্রেয়ী নীলাবতীর দেশে আজ আবার নতুন করিয়া নারীবর্ষের কি দরকার। শুধু এই বৎসর কেন শত শত বৎসর ধরিয়াই এই নারী বৎসর চলিলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। অগণিত ভারতমাতার সন্তান নিত্য জননীর বন্দনায় আনন্দিত। ভারতবর্ষের নারীমাত্রেই পরমাজননী, ভাগবতীশক্তির প্রীতিভূ বলিয়া সম্মানিত। নারীত্ব এদেশে মাতৃত্ব, সত্যত্ব এবং মমত্ব বোধের দ্বারা আলোকিত। আর ইহাদের স্থান অনেক উর্দে রাখিয়া আমরা হাসিমুখে শান্তি ও প্রগতির বার্তা লইয়া চলিয়াছি। এতদিন যাহাদের জননী বলিয়া জানিয়াছি, আজ তাহাদের কি করিয়া সমান আসনে বসাইব। তাহাদের আসন যে অনেক অনেক উর্দে।

"বেদিক যুগের গার্মী, মৈত্রেয়ী, বাকু ; পৌরাণিক যুগের সত্যী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা ; ইতিহাসের অমর মহিষ্মতী নারী দুর্গাবতী, মীরাবাই, লক্ষ্মীবাই, পদ্মিনী, এই যুগের ঐশ্বরচন্দ্রের জননী, সত্যচন্দ্রের জননী শরৎচন্দ্রের জননী, বর্তমানে আনন্দময়ী মা, অর্চনাপুরী প্রভৃতি মাতৃরূপ কি এতই তুচ্ছ যে তাহাদের মাতার আসন হইতে নামাইয়া সমান আসনে বসাইব?

"শায়দোৎসব আজ ঘরে উপস্থিত। বিখজননীকে আজ কি আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের পটভূমিকায় সাজাইব না হৃদয়মন্দিরে মাতৃরূপে সাজাইয়া পরমানন্দে পূজা করিব। মায়ের সেই চিরভাবের চিন্ময়ী সন্তায় আমাদের মনে আসে কি আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের কথা? সেইরূপ প্রত্যেক নারীকেই যদি আমরা মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে সমানাধিকারে না বসাইয়া দেবীর আসনে বসাইতে পারি তবেই আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের বিশেষ গুরুত্ব বিলোপ হইবে। ভারতবর্ষের কথা :
যা দেদী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্মৈ! নমস্তস্মৈ! নমস্তস্মৈ! নমোনমো॥
পরলোকে বিপ্লবী ডাঃ স্মশীলকুমার :



বীজবতীর্থ চন্দননগরের গোন্দলপাড়া নিবাসী ডাঃ স্মশীলকুমার চক্রবর্তী গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রামনগরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিপ্লবী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহচীর্থ ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পিতা—ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী। গোয়াবাগানের এক কুখ্যাত সি-আই-ডি অফিসারের যত্নদণ্ড বিধানে জর্নেক বিপ্লবী অকৃতকার্য হইলে, কিশোর স্মশীলকুমারই সেই দারোগাকে অব্যর্থ গুলীবিদ্ধ করিয়া নিহত করেন, কিন্তু পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই।

স্মশীলকুমার চন্দননগর বঙ্গবিদ্যালয়, পরে ডুপ্পে কলিডেস্ট হইতে ম্যাট্রিকুলেশন এবং হুগলী কলেজ

হইতে বি-এস-সি পাস করিয়া, বিপ্লবীদেরই নির্দেশে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি এবং স্কুল অফ-ট্রপিকেল মেডিসিনে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু বিপ্লবী সংস্থার সহিত সংযুক্ত থাকায় তিনি সরকারী চাকুরী পান নাই। তিনি কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও পরে শ্যামনগর ওফেভালি জুট মিল ও অত্যা জুট মিলের মেডিকেল অফিসার হন। শেষ জীবনে তিনি পঃ বঃ গভর্নমেন্টের ই-এস-আই-এর কার্যা করেন।

শ্যামনগর মহিলা সমিতির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সেখানকার বালক ও বালিকা বিদ্যালয় দুইটিরও তিনি অগ্রতম সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনেরও সভ্য ছিলেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর শ্রাদ্ধ দিবসে, প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সশিষ্য তাঁর শ্যামনগর ভবনে উপস্থিত হইয়া এই বিপ্লবী সাধকের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে তাঁর যোগ্য পুত্র ডাঃ অশোককুমার চক্রবর্তী ও অত্যা আত্মীয় পরিজনবর্গ বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ও শান্তি।

সুসংবাদ :

বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অনন্ত অবদান আধ্যাত্মিকতা ও যোগবিজ্ঞান। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার চমৎকারীত্বে ইহা অবজ্ঞাত ও স্নান। আশার কথা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বেছে নিয়ে যোগ সাধনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। পণ্ডিচেরী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও কয়েকটি কেন্দ্রে এই শিক্ষা দেওয়া হবে। ধর্ম ও যোগক্ষেত্রে চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘও প্রকৃষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক: শ্রীরবি কর

প্রবর্তক কার্যালয়, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী জিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিকার ২৪/১০/৮২ ১০ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী জিট, কলিকাতা-১২ হইতে অক্ষয়কুমার রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ডানলপ ইণ্ডিয়া : প্রগতিশীল রপ্তানীকারক :

ভারতের বিশিষ্ট শিল্পগোষ্ঠী ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানীকারক হিসাবে অল্প দিনের মধ্যেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মাত্র ১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ একটি আলাদা রপ্তানী বিভাগ চালু করে এরা পূর্ণোদ্যমে রপ্তানী ক্ষেত্রে পদার্পণ করে।

প্রধানতঃ নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের সাইকেল, ট্রাক, ট্রাকটর, আর্থ-মুভার এবং বিমানের টায়ার ও টিউব এবং এর সঙ্গে সাইকেল-রিম, ভি-বেল্ট ও ট্রান্সমিশন বেল্টিং ইত্যাদি রপ্তানী করে থাকে। এ ছাড়া অগ্রদেব দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যও যেমন—বাইসাইকেল ও সরঞ্জাম, খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং রবার শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল রপ্তানী করে থাকে।

ভারতীয় টেনিস্ ওবং স্কোয়াশ র‍্যাকেটের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। ডানলপ ইণ্ডিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে শিয়ালকটে এই র‍্যাকেট ও অত্যা খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরী করে রপ্তানী-বাজারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ২৩৪১ লক্ষ টাকার শুধু খেলাধুলার সাজ সরঞ্জাম রপ্তানী করেছে। ১৯৭৪ সালে এই সংস্থার সমগ্র রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫:৩ কোটি টাকা।

ডানলপ ইণ্ডিয়া ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া সহ ৯২টি দেশে ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে থাকে।

কেমিকেলস্ এণ্ড এলায়েড্ প্রোডাক্টস্ একসপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ১৯৭৩-৭৪ সালে মোটর গাড়ীর টায়ার ও টিউব, সাইকেল টায়ার ও টিউব, এবং রবার বেল্টিং রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের জন্ত ডানলপ ইনডিয়াকে সম্প্রতি পুরস্কৃত করেছে।

৬০তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

প্রবন্ধ



সিউটিভিটি প্রিন্সিপাল

অগ্রহায়ণ ১৩৮২

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৫



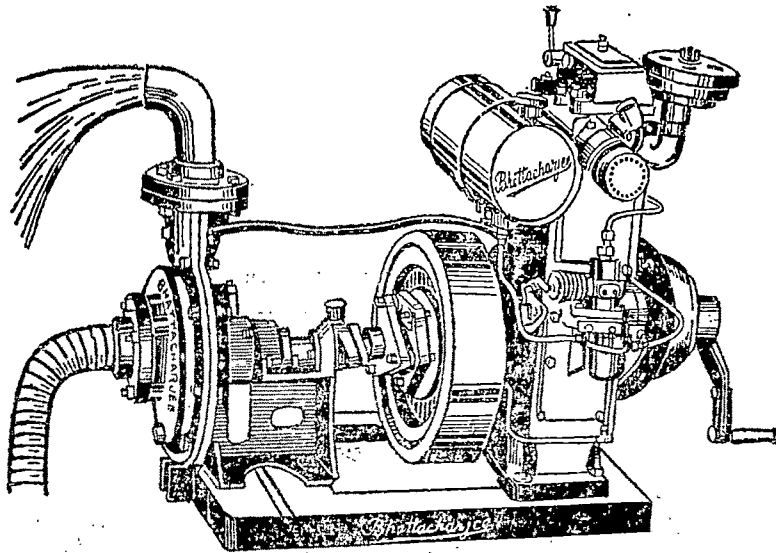
আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারিত সামগ্রী



ভারত সরকারের ল্যান্ডস্ট্যান্ড টেস্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অগাঢ় সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ফোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌টর
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্সমিট,
ভালভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, স্টীল পার্টস, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্‌ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : "মেসিনারিস"

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২১১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce
**INCREASED
RATE OF INTEREST ON
FIXED DEPOSITS**

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

**EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.**

**FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:**

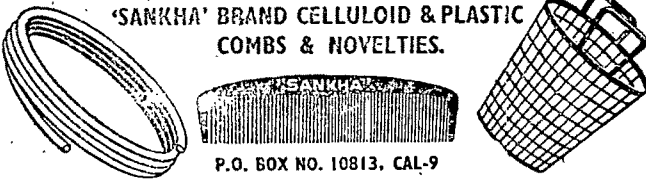
**Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES**

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

DIRATAN Co.

Photographers

1, CORNWALLIS ST. CALCUTTA

PHONE : 54-3711

ডিরতান কোম্পানী

ফটোগ্রাফার্স

১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ৫৪-৩৭১১

বাংলাসাহিত্যের উপন্যাস ভাণ্ডারে অভিনব সংযোজন
হাসি চৌধুরীর—মনীষা—৮০০

ডিমাই সাইজ, মনোরম প্রচ্ছদপট, সুন্দর ছাপা,

মজবুত বোর্ড বাঁধাই, উপহার উপযোগী

প্রাপ্তিস্থান : ৩৫১ ডায়মণ্ড হারবার রোড,

কলিকাতা—২৭

সাহিত্য প্রকাশ : রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভগবান
শ্রীসত্য সাই বাবা

কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বর্তমান কালে বিশ্বের আকর্ষণ কেন্দ্র, সবচেয়ে
অলৌকিক শক্তিশালী ঈশ্বরমানব সত্য সাই
বাবা—ভগবান স্বয়ম। বাংলা ভাষায় সত্য
সাই বাবার সম্বন্ধে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

দক্ষিণা — দেড় টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বি, বি, গান্ধী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিফ : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাটারিফ : অশোকারিফ : ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ, ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সম্ভবতঃ শ্রীমতিলাল	৩০৫
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	৩০৬
সম্পাদকীয়	...	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	৩০৭
অতএব ফিরে এস	কবিতা	উমাপদ নাথ	৩১০
মহাকালী	কবিতা	সন্তোষ ভট্টাচার্য	৩১০
কোজাগরী পূর্ণিমা	কবিতা	শ্রীঅভয়পদ মজুমদার	৩১০
দার্জিলিং জেলার আদিবাসী সংস্কৃতি	প্রবন্ধ	শ্রীগোপীনাথ সেন	৩১১
টোমাস্ মান্	প্রবন্ধ	অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৪
বসুমতী	বড় গল্প	অজিত দাস	৩১৬
অত্যাংসাহী	গল্প	শ্রীরাইমোহন সামন্ত	৩২৪
প্লাটফর্ম	গল্প	ভবঘুরে	৩২৬
আত্মসমর্পণ যোগে কর্ম ও কর্মী	প্রবন্ধ	শ্রীবৈষ্ণনাথ বিশ্বাস	৩২৭
প্রণাম	কবিতা	শ্রীমতী গীতা হাজরা	৩২৮
পরোয়ানা	কাব্য-কাহিনী	শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়	৩২৯
বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	আলেখ্য	কিরণেন্দু বাগচী	৩৩১
যুগাবতার শ্রীসত্য সাই বাবা	প্রবন্ধ	কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৩৩৬
সম্বৎসর	বিবরণী	আশ্রমী	৩৩৮
সাময়িকী			৩৪০

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে

অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও

সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।

গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।

পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্ম দায়ী নহে। কপি রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—সম্পাদকের নহে।

এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ

গীতায় ভগবান ৫'০০

(গীতার যৌগিক জীবনভাষা)

মহর্ষি প্রেমানন্দজী প্রণীত

গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গুহ্যতিগুহ্য রাজযোগের নিগূঢ় মর্মটি এই গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তদুপরি সহজ প্রাণায়াম মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে মানসোত্তর লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত ব্যাখ্যাত।

অতিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত

রোগ ও আরোগ্য—৪'০০

যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

স্বস্থিতত্ত্ব—১'০০

স্বধীরকুমার দত্তের সর্বজন সমাদৃত বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থী অপরিহার্য গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাধনা—৪'০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১, বি. বি. গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন; টেরিলিং-এর শাট্টিং, স্ফটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

- ★ ELECTRICAL MOTOR
- ★ POLISHING & BUFFING

- DOUBLE ENDED-GRINDER
- FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



৬০তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ : ১৩৮২

নভেম্বর-ডিসেম্বর : ১৯৭৫

প্রবর্তক

জীবনের আলো

শ্রোত বহে যমুনায়—চল চল উছল উছল যৌবনের যুদ্ধ বাজে। শূন্য হয়েছিল কার হৃদয় সে মধু যামিনীতে! অনাহত মুরলী-স্বনি কানে তার মধু ঢেলে দিলে। শয়্যায় ঘুম নাই, যেন কটক বিঁধে সারা অঙ্গে। কে চায় মর্ত্যের সম্বন্ধ, আত্মীয় পরিজনের মায়াবন্ধন! চরণে কিঙ্কনী বাজে। কেউ না জানে, তাই তার কণ্ঠ রোধ করে চলে অভিসারিকা—কে পূর্ণ করবে তার শূন্য হিয়া পরমামৃতে। বংশী-বট লক্ষ্যে, যাত্রা তার একা। ব্রজের পথে যাত্রীর মেলা। সবাই চলেছে গোপনে, পথের মাঝে জানাজানি—এক লক্ষ্যে, এক পথের যাত্রী।

কোলের শিশু কঁাদে। বিহানায় পতি বুঝি জেগে উঠে! বাহির হয় অভিসারের পথ রোধ করে—মাঝপথ ছেড়ে তাই বন-পথে সম্ভ্রান্ত চরণ। পায়ে যে কটক বিদ্ধ হয়। কে চায়, কে বুঝে রক্তমাংসের ব্যথা বেদনা। হিয়ায় জেগেছে দর্শনকামনা মাধবের। চলেছে ব্রজনারী বৃন্দাবনের পথে।

বংশীবটে প্রীমুক্তি। বাঁশী বাজে। এমন ডাক তো কেউ দিতে জানে না। এমন আত্মহারা করার মন্ত্র আর কারও বাঁশীর নিঃস্বনে উঠে না। এ সুর কোথা পেলে প্রিয়; সব ছেড়ে শুধু দেবার স্নেহে ব্রতী। শ্যামসুন্দর ঘন বনে, কোথায় শ্যামতনু ঢাকা দিলে কে জানে!

বাঁশী শুনে যত সাধ মনে, শুধু দর্শনে যে সে ক্ষুধা মিটে না। নাম পরশনে মন মাতে, অঙ্গের পরশ বিনা এ মরদেহ যে শীতল হয় না। তাই সারা মধুযামিনী শুধু লুকোচুরি। বিভাবরী বুঝি উদয় হয়! অভিসারিকার যে বেশ সে আর লুকান যায় না। তাই যমুন-স্নান সেরেই ভয়ের ঘণায় মানুষ ফিরলো ঘরে। রাই আজ উন্মাদিনী, তার কুলমান কিছুই নাই।

তিন দিন, তিন রাত্রি—হা প্রিয়তম, হা জীবনধন শ্রীমাধব বলে তার চক্ষে ঝরে অশ্রুবিন্দু, অষ্টপাশ তার খসে যায়। এ পথে সর্বহারা—উন্মাদিনী, সরমভরমহীনা প্রেমময়ী সেদিন আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ। আর মধুগন্ধে বন উঠেছে মেতে। থেকে থেকে পাখীর গানে নিকুঞ্জকানন মুখরিত। আর তো কেউ নাই, শুধু প্রেমময়ী রাই। শুধু এই একজন, এক অদ্বয় অখণ্ড প্রেমধন। এখানে আর বহু নাই, তাই প্রতিজ্ঞে শ্যাম-তনু গেল মিশে। যুগলরূপের আলায় চন্দ্র গেল নীলের কোলে মিশিয়ে। লজ্জায় সে স্রিয়মাণ, স্নান।

মরণের মাঝে অমৃত! নর-নারায়ণে চির মিলনের নব ঝক উঠল। বনে বনে মর্ত্যভূমি শিহরিয়া নব জন্ম নিলে সেদিন, আর ঘোষণা রইলো পৃথিবীতে—রাস, রাস, আর রাস। তাই প্রেমিকের চক্ষে নাই নিদ্রা। একাদশীর চন্দ্র দেখে তার আত্মার অভ্যুত্থান। শয়ন করেছিল প্রকৃতির ঘনবরিষণ দিনে। আজ জোৎস্না রজনীভে পুনরুত্থান। এই উত্থান একাদশীর দিনেই অভিসার যাত্রা, মিলনের পুণ্য রজনী—রাস-পূর্ণিমা। যুক্তির অমৃতে জীব অভিষিক্ত হবে কি?

সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল

(১৫ নভেম্বর, ১৯৩৭ ইং)

বেদমন্ত্ৰ

প্রথমোহষ্টক ॥ চতুর্থোহধ্যায় ॥ ত্রয়োদশং সূক্তং ॥ ষষ্ঠী-সপ্তমী ঋক্
(মণ্ডলস্ত একোনষষ্ঠিতমং সূক্তং)

প্র নু মহিৎসং বৃষভস্ত বোদ্ধং যং পুরবো বৃত্তহণং সচন্তে ।

বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নিজ্জঘথাম্ অধুণোৎ কাষ্ঠা অব শম্বরং ভ্যো ॥৬

বৈশ্বানরো মহিমা বিশ্বকৃষ্টির্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা ।

শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুনীথে জরতে সনৃতীবান্ ॥৭

অন্থ—পুরবঃ বৃত্তহণং যং বৈশ্বানর সচন্তে তস্ত বৃষভস্ত মহিৎসং নু প্রবোচৎ । বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ দস্যুং জঘথান্ কাষ্ঠা অধুণোৎ, শম্বরং অবভেৎ ॥৬ বৈশ্বানরঃ মহিমা বিশ্বকৃষ্টিঃ ভরদ্বাজেষু যজতঃ বিভাবা । অগ্নিঃ সনৃতীবান্ শতবনেয়ে পুরুনীথে শতিনীভিঃ জরতে ॥৭

ব্যাখ্যা—পুরবঃ (পুরব ইতি মনুষ্য নাম—সায়ন । মনুষ্যগণ ।) বৃত্তহণং (বৃত্ত অর্থাৎ বৃষ্টি অবরোধকারী মেঘের হস্ত) যং বৈশ্বানরঃ (যে বৈশ্বানর অগ্নিকে—অত্র বৈশ্বানর শব্দেই মধ্যমস্থানস্থ বিদ্যুত্যাগ্নিকে বুঝাইতেছে) সচন্তে (সেবা করেন) তস্ত বৃষভস্ত (সেই জলবর্ষণকারী বৈশ্বানরের) মহিৎসং (মহিমা, মাহাত্ম্য) নু প্রবোচম্ (শীঘ্র কীর্ত্তন করিতেছি) বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ (বৈশ্বানর অগ্নি) দস্যুং (দস্যুকে—রসনাং কর্ণাং বোপক্ষ্মিতারং রাক্ষসাদিকং—সায়ন । রস প্রদান কর্ণমুহকে ক্ষয় করে যারা, তারাই দস্যু বা রাক্ষস) জঘথান্ (নিহত করা) কাষ্ঠা (জলরাশিকে) অধুণোৎ (অধোমুখে পাতিত করা) শম্বরং (জলনিরোধকারী মেঘকে) অবভেৎ (ছিন্ন বা ভেদ করেন) ॥৬

বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অগ্নি) মহিদ্মঃ (মহত্ত্বদ্বারা) বিশ্বকৃষ্টিঃ (বিশ্ব—সর্ব, কৃষ্টি ইতি মনুষ্যনাম—সায়ন । বিশ্বের সকল মানুষ যাঁর স্বভূত, তিনিই “বিশ্বকৃষ্টি”) । ভরদ্বাজেষু (পুষ্টিকরহর্বির্লক্ষণান্নবৎসু যাগেষু “ষদ্বা-এতৎ সংজ্ঞেষু ঋষিষু—সায়ন । সায়নের মতে পুষ্টিকর হর্বির্লক্ষণ অন্ন বিশিষ্ট যাগসমূহ অথবা ভরদ্বাজবংশীয় ঋষিগণ) যজতঃ (পূজনীয়) বিভাবা (বিশেষ প্রকাশসম্পন্ন) অগ্নিঃ (বৈশ্বানর অগ্নি) সনৃতীবান্ (প্রিয় ও সত্যব্যাক্য-বিশিষ্ট) শাতবনেয় (শতসংখ্যক যজ্ঞ সম্পন্নকারীর নাম “শতবনি”, তাঁর পুত্র—“শাতবনেয়ঃ”, তাঁর গৃহে “শাতবনেয়ে”) পুরুনীথে (বহুজনের নেতা বা এতৎ সংজ্ঞক রাজা শতিনীভিঃ (বহুপ্রকারের স্তুতি দ্বারা) জরতে (স্তুত হইয়ে) ॥৭

সরলার্থ—মনুষ্যগণ বৃত্তহস্তা যে বৈশ্বানর অগ্নিকে বৃষ্টিভিলাষী হইয়া সেবা করেন, সেই জলবর্ষী বৈশ্বানরের মহিমা শীঘ্রই কীর্ত্তন করিতেছি । তিনি দস্যুকে নিহত করেন, জলরাশিকে নিম্নমুখে পাতিত করেন এবং শম্বরকে ভেদ করেন ॥৬

বৈশ্বানর অগ্নি আপন মহিমা দ্বারা সকল মনুষ্যের অধিপতি । ভরদ্বাজবংশীয় ঋষিগণের মধ্যে পূজিত হইয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত হন । বৈশ্বানর অগ্নি শতবনির পুত্রগণের গৃহে এবং পুরুনীথ রাজার গৃহে বহুপ্রকারের স্তুতি দ্বারা স্তুত হইয়ে ॥ ৭

ঋক্ দুটির সব কয়টি শব্দের অর্থই আচার্য্য সায়ন বিশদভাবেই ব্যাখ্যা করেন । তাঁর মতে এই ঋক্ দুটিতে বৈশ্বানর অন্তরীক্ষের মধ্যমাবস্থিত বিদ্যুত্যাগ্নি । এর সমর্থনে সায়ন বলেন—“গতার্থক ঋ ধাতু, তাহাতে পচাদি হেতু অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে । ছান্দস হেতু লূকের অভাব । তাহা হইতে উৎপন্ন এই অর্থে অগ্নি বৈশ্বানর সংজ্ঞায় অভিহিত । বিদ্যুৎ অগ্নি মধ্যমসকাশ হইতে উৎপন্ন । অশনিপতনানন্তর সেই অগ্নি পাথিব অগ্নি সম্পাদন করেন । আদিত্য সকাল হইতেও ঘর্ম্মকালে স্বর্ধ্যাকাস্তাদি মণিসমূহে অগ্নির উৎপত্তি প্রসিদ্ধি আছে । এই হেতু নামনির্দ্ব্যচনের অনুরোধবশতঃ এই অগ্নিই বৈশ্বানর অগ্নি বলিয়া প্রতিপন্ন হন । “বেদমীমাংসা” গ্রন্থেও এর সমর্থন আছে—“নিরুক্তে বৈশ্বানরের একটি বিবৃতি আছে । কোন কোন নিরুক্ত আচার্য্যের মতে বৈশ্বানর মধ্যম অন্তরীক্ষস্থান দেবতা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্র, বায়ু বা বিদ্যুৎ । ...বিদ্যুৎ আবার নাড়ী সঞ্চারী চৈতন্যস্রোতের প্রত্যক আর আদিত্য প্রজ্ঞানের । অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আধারে উভয়ের যে তাপ তাই অগ্নি । এই-ভাবে তিনি সব নরের মধ্যে আছেন—তাই বৈশ্বানর । ...কাষ্ঠা (বৃষ্টিধারাদের) কাশ্ দীপ্তি দেওয়া । এতেও বর্ষণ ও বিদ্যুতের ঋনি আছে ।”

রেণুকণা ঘোষ

সেবাসদস্য

ততঃ কিম্?

অথ শ্রীগুরু-মুগাভিসন্ধি-নিরূপণম্।

পরমার্থ সাধনার আঙ্গিনায় অর্থকে তথা স্বাবলম্বন নীতিকে আমদানী করিয়া সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল বৈদিক জীবন-চর্যা এবং ইহ-আসৌ-এর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরবর্তী কালে সুদীর্ঘ শত সহস্র বছরের প্রচলিত ইহ-বিমুখ ধর্ম ও সাধন-ধারার একটা বৈপ্লবিক মোড় পরিবর্তনের পথিকৃৎ হইয়াছেন। সর্বাঙ্গীন জীবন মূল্যায়নে তিনি একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মুনিশ্চিত। সংস্কার-অনড় চিত্তে শ্রীমতিলালের সামগ্রিক জীবন মূল্যায়নের এই অভিনবত্ব সহজে বরণীয় হইবে না।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, ধর্মক্ষেত্রে অর্থের স্থান ও দান কি? অর্থই কি শেষ কথা?

এ প্রশ্নের উত্তর অম্ব কেহ দিলে অনেকটা অনুমান হইবে—কুযুক্তি ও বিতর্কের অবসর থাকিবে বিশেষ ধর্ম-স্বজাধারী আজিকার ভারতবর্ষে।

এই অভিনব জীবন মূল্যায়নের প্রবর্তক যিনি তাঁর পরমার্থ সাধনার ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের অভিসন্ধি ও ভূমিকা কি এবং কতটুকু জানিলে আর তর্কের অবসর থাকিবে না। ১লা মাঘ ১৩৪৫ (১৫।১।৩৮) উত্তরায়ণ উপলক্ষে প্রবর্তক সজ্জের তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সজ্জ-গুরুজী যে বাণী দেন তারই অংশবিশেষ এখানে ছবছ উদ্ধৃত হইল। এই বাণীর মধ্যেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টি সুপরিষ্কৃত।

“পুণ্য মাঘ। উত্তরায়ণ। মানুষ ভগবানের যন্ত্র। সাধননিষ্ঠ হও। উৎসর্গ যজ্ঞে পূর্ণাঙ্গিত্ব দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে হৈকে বল ‘শিবোহং শিবোহংম্’।

“নরদেহে নারায়ণ। ঈশ্বরমানব বিগ্রহ দর্শনে নূতন চক্ষু তোমার উন্মীলিত হোক। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী ভাগবত। জীবনছন্দ ভাগবত। এমন না হলে দিব্য দর্শন হয় না। যে নরদেহে নারায়ণ না দেখে মরে তার ইহজন্ম যে ব্যর্থ হয়। মুক্তিস্নান কর। মলিনতা ধুয়ে মুছে নির্মলচিত্ত হও। ধন্য কর জীবন।

“সে সুখ, সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত হয় না। নারদের বীণায় যন্ত্র যে মহিমাকীর্তনে অনাহত সে মহিমা অনুভব করার অধিকার নশ্বর জীবনে আছে। আর এইজন্যই রক্ত মাংসের শরীর দেবমন্দির। তুমি দেবতার নিবাস-ক্ষেত্র হও, তবেই ধন্য হবে।

“কি জ্ঞানি কেন হাড়-মাংসের বোঝা বয়ে মানুষ ক্লান্ত হতাশ গৃহকোণে। বাধা বন্ধন মুক্ত করার জন্ত নারায়ণ দ্বারে। এমন কাণ্ডারী কোথা পাবে।

“ছাই সুখ, ছাই ঐশ্বর্য, ছাই রূপ, ছাই অর্থ। পরমার্থ যদি না পাই জীবনে সব ব্যর্থ, সব বন্ধন। উঠ, জাগ, নূতন জীবনের দীক্ষা গ্রহণ কর।”

সজ্জগুরুজীর জীবন-সাধনায় অর্থের ভূমিকা গোঁণ। মুখ্য ভাগবতজীবন এবং ভাগবতজীবন-প্রতিষ্ঠ মানুষের মধ্যে প্রেমিক্য স্থাপন যাহাই ভাগবত সংস্থা তথা ভাগবত জাতি নির্মাণের বনীয়াদ। এই ভাগবতজীবন ও সংস্থার মন্ত্র উৎসর্গ। উৎসর্গ অনির্দেশ্য ব্রহ্মচৈতন্যে জন্মে না—নরদেহে নারায়ণের কাছে চাই নিঃসর্ত উৎসর্গ। একের মধ্যে নারায়ণ জ্ঞান সিদ্ধ হইলে সর্বের মধ্যেই নারায়ণ দর্শন হইবে—যত্র জীব তত্র শিব,—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুর্তি হইবে। এ কথা সজ্জগুরুজী বার বার বলিয়াছেন। এই হেতুই তিনি অব্যক্ত নারায়ণের ব্যক্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁরই উক্তি।

“মুক্ত না হলে মুক্তি দিবে কে? গুরু হয়ে মন্ত্র দেন কাণে নরনারায়ণ। মন্ত্রাশ্রয়ীকে মুক্তি দেন মুক্তির ঠাকুর শ্রীভগবান। গুরু হয়ে বহেন পাণ্ডিত্য। পরিষ্কার করেন দেহ মন চিত্ত জীবের মেথর হয়ে। সে কত করুণা। (সং বাঃ, ১৬।১।৬৮)”

বর্তমান অ-ভারতীয় ভাব-ভাবনা ও শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির দিব্য জীবনের এই অমোঘ নীতি আর বড় কেহ আমলে আনে না। সজ্জগুরুজী প্রবর্তক সজ্জকে এই ভাব রক্ষার জন্ত পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁর কথা জাতীয় জীবনে যে ছুঁদিন ঘনাইয়া আসে তার প্রতিকারের পথ ইহাই। এই হেতু তিনি সজ্জ সংযম ও চেতনা রক্ষার জন্ত সন্ন্যাস-আশ্রমে পালনীয় চাতুর্য্যাত্মক ব্রত পালনের নিয়ম প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

সজ্জগুরুজীর মুখ্য অভিসন্ধি ভাগবত-সজ্জ রচনা যার

জ্য তিনি জীবনভোর নীরবে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। এই দিব্য সংহতির মূল কেন্দ্র শ্রীগুরু। এই হেতুই তিনি সজ্জগুরু। ভগবানের ব্যক্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুনারায়ণকে মধ্যমণি করিয়াই প্রেমৈক্যবদ্ধ সংহতি দানা বাঁধিতে পারে। এ কথা তিনি নিজেই যুক্তিসহ দেখাইয়াছেন :

“ভগবানের চারি প্রকার অবস্থার কথা শাস্ত্রে আছে। তুরীয়, সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রত। এই জাগ্রতকে ধরিয়াই আমরা শনৈঃ শনৈঃ, উদ্বৃত্ত হইতে উদ্বৃত্ত ভূমিতে আরোহণ করিব। এই জাগ্রত হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া সাধক স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্তে স্থিতি চাহে। কিন্তু ভূমি (প্রবর্তক সজ্জ) চাহিয়াছে সংহতি—সমষ্টিবদ্ধ সজ্জ। তোমার প্রেরণার উৎস অব্যক্ত হইতে পারে না। জাগ্রত গুরুমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়াই তোমার প্রেরণা যদি মূর্ত হয়, তবেই ভূমি সমষ্টিগত হইতে পার। বহুযুগী প্রেরণার বশে বহুর বৈচিত্র্য যখন তোমার কাম্য নহে, এই ইচ্ছাও যখন তোমায় উদ্বুদ্ধ করে না তখন জাগ্রত গুরুমূর্তির নির্দেশই তোমায় বরণ করিয়া লইতে হইবে। (সং বাঃ, ১৬ই মে ১৯৫১)।”

প্রবর্তক সজ্জের যে সজ্জগায়ত্রী মন্ত্র তাহাতেই সজ্জের সাধ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ। মন্ত্রটি হইতেছে—‘যোগেশ্বরায় বিদ্যাহে সজ্জতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ইচ্ছ প্রচোদয়াৎ।’ যোগেশ্বর শ্রীগুরুনারায়ণ। সজ্জ ভাগবত সংস্থা আর ইচ্ছা সজ্জাতীর্থে ভাগবত জাতি।

সজ্জকে জাতির ক্ষণমূর্তি বলা হইয়াছে।

এই হেতু সজ্জ কোন সম্প্রদায় বা দল নহে—জাতিরই সম্ভাবনাপূর্ণ অপরিষ্কৃত অপরিণত মূর্তি—পরিণতিতে সজ্জভিষ্ট তথা ভারতীয় অধ্যাত্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিগূঢ় মর্ম ভাগবতজাতি তথা ভাগবত বিশ্বমানতায় আত্মবিকাশ করিবে।

সজ্জগুরুজীর বয়ঃক্রম যখন মাত্র ৩১ বৎসর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে তখনই এই গুরুকেন্দ্রিক জাতি দর্শন তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়—যাহা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে পরবর্তী কালে। এই গুরুকেন্দ্রিক ভাগবত-সজ্জ ও ভাগবত জাতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ১৯৩৬ সালের প্রবর্তক হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল :

“আজ দেশে গড়িয়া তুলিতে হইবে অসংখ্য গুরুগৃহ।

যে বিদ্যুৎ স্কুলিঙ্গ বাসনা ও অহঙ্কারভূপে আচ্ছন্ন তাহা পুড়াইয়া ছাই করার নীতি—আত্মসমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষা। অহঙ্কার ঘাটাইয়া বিপ্লব বহন করিতে হইবে বলিয়া ভীরুর মত নাক ঘুরাইয়া দেখাইলে চলিবে না। দলে দলে মানুষকে কল্পনির্দিষ্ট নরনারায়ণের চরণে দীক্ষা লইতে হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাণী পাইয়াছিলাম—‘হয় এক মহাগুরুমণ্ডলে এ জাতি সংহতিবদ্ধ হইবে, অথবা অসংখ্য গুরুমূর্তিকে মণ্ডল করিয়া অসংখ্য সংহতি সৃষ্টি হইবে।’ আজ দেখিতেছি—অসংখ্য গুরুমণ্ডলের সৃষ্টি। মিথ্যা ধ্বংস পাইবে, কিন্তু সত্যকে হত্যা করিবার সাধ্য বিধাতারও নাই। তাই ভবিষ্যৎ জাতির অদ্বিতীয় আশা এই ঋতময় গুরুমণ্ডলগুলির মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, অগ্রে মণ্ডল সৃষ্টি চাই। মণ্ডল-মধ্যবর্তী কোন মানুষ ভাবের ঘরে চুরি করিবে না। ভগবানকে অনির্দেশ্য অব্যক্ত অনন্ত আখ্যা দিয়া আত্ম-কামনাপূর্তির ফাঁক রাখিয়া সাধন করিবে না। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে কল্পগুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিঃস্ব হইবে। আত্মতর্পণেই আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বর্গদেউল গড়িয়া উঠিবে। হে বাংলার তরুণ! দলে দলে প্রত্যক্ষভাবে নরনারায়ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জাতিসৃষ্টির এই সন্ধিযুগকে সিদ্ধ কর। মনে রাখিও ভূমি ভারতের। ভারতের সত্তা হইতে অপসৃত হইয়া অ-ভারতীয় শিক্ষা-সাধনা এমনকি সাধনকেন্দ্র পর্যন্ত আজ অ-ভারতীয় উপাদান দিয়া রচিত হইয়া তোমার সত্যকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই সতর্ক চরণে অগ্রসর হও। কল্পগুরু প্রত্যেকের জন্ম নির্দিষ্ট আছে। তুমি ভুলিয়া আছ, তাই তাঁকে খুঁজিয়া পাও না। চেতনা জাগাও, উদ্বুদ্ধ হও; গুরুদ্বার মুক্ত হউক। দলে দলে আত্মসমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানবাহিনী আজ দিগ্বিজয়ে বাহির হউক।”

এখানে কল্পনির্দিষ্ট গুরুর কথা সজ্জগুরুজী বলিয়াছেন। এই কল্পচিহ্নিত যুগগুরু ছিলেন সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল। এ গুরু তাঁর উপলব্ধিগত দর্শন নহে, তাঁর জন্ম, কর্ম, জীবন ও জীবনব্রতই ইহার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর নিঃসঙ্গ সদগুরু ভাবের কথা এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে পূর্বে বহুবার দৃষ্টিগোচর দেখান হইয়াছে। বক্ষ্যমান সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর যে অর্থ, ঐশ্বর্য, রূপ, জয়, যশঃ

সম্বন্ধে বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরমার্থ যদি না পাই তবে এসব ছাইভস্মের আবর্জনা ব্যর্থ জীবনের বোঝা। লক্ষ্যণীয় যে সজ্জের উদ্দেশ্যে এই বাণী ১৯৩৮ সালে প্রবর্তক জুট মিল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই প্রদত্ত। এই ১৯৩১—৪০ দশকটি সজ্জগুরুজীর অর্থসাধনা ও সৃষ্টির চরম যুগ। কতখানি আত্মস্বরূপচৈতন্যে স্থিত হইলে, কতখানি নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত অনাসক্ত হইলে এইরূপ চেতনা রক্ষা সম্ভব তাহা অনুমেয়। ইহাই শ্রীভগবানের ‘মন্তাব’। মন্তাবের লক্ষণ কর্মের ‘সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ’ এবং দ্রষ্টৃত্ব।

নাশং গুণেভ্যং কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সৌধিগচ্ছতি॥

(গীতা ১৪।১৯)

অর্থাৎ গুণই কর্ম করে—নিজে গুণাতীত হইয়া দ্রষ্টা থাকিয়া স্ব-স্বরূপে স্থিত থাকেন—ইহাই ব্রহ্মভাব। সদ-গুরুর লক্ষণ ইহাই—অসঙ্গ ভূমিতে নিত্যস্থিতি—আসঙ্গ ভূমির গুণকর্মের দ্রষ্টৃত্ব। আকর্ষণ কর্মের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও তিনি ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁর অর্থসাধনার ভূমিকায় তিনি ছিলেন অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও মোক্ষমার্গী যারা তাঁরা সাধারণের চেয়ে অসাধারণ। সজ্জগুরু এসব কোন পথই গ্রহণ করেন নাই। তাঁর যে আত্মসমর্পণ যোগ তাহাতে সব মত-পথই সমাহৃত। যুগধর্মের সংগতি রক্ষায় তিনি অর্থকে ধর্ম্যাংগে সমুন্নীত করিয়াছিলেন। অর্থকে তিনি পুরোভাগে রাখিয়াছিলেন যুগধর্ম ‘সংস্থাপনার্থায়’। বর্তমান যুগে সনাতন ধর্ম যে অভূতপূর্ব প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা অর্থকেদ্বিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতাত্মাই শ্রীমতিলালের শুদ্ধ আধার আশ্রয়ে যুগধর্ম সংস্থাপনের হেতু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সজ্জগুরুজীর সৃষ্ট সংস্থা প্রবর্তক সজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবনব্রত, যুগমিশনের কথা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন (সংঃ বাঃ, ২৫।৬।৬৭) :

“যাহা তোমাদের স্বধর্ম, যাহা তোমাদের অমৃততত্ত্ব সেই প্রেম ও ঐক্য কথায় নাই। জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় তাহা অর্জন কর। যদি হও পার্থ তবে আজও বলি—জয় অবশ্যস্তাবী সর্বক্ষেত্রে। কেননা—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রী বিজয়োভূতিজ্ঞঃ বানীতির্মতির্মম॥

“অণু আশা আমার নাই। সকলকেই বলি—নাশ পন্থাঃ। এই শুভ চেতনা কঠোর কুরুক্ষেত্রে হারিও না—সর্বনাশ হবে ভারতের।”

সজ্জগুরুজীর জীবনদর্শনের ভিত্তি মূলতঃ গীতা। গীতার আরম্ভ ‘ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুয়ুৎসবঃ’ আর শেষ ‘যত্র যোগেশ্বর.....ঈশ্বানীতির্মতির্মম’ শ্লোকে। ভারতের সমগ্র শাস্ত্র তত্ত্ব দর্শন জীবননীতি এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামভূমিতে প্রতিপাদিত। লক্ষ্যণীয় এই যে, যুদ্ধভূমি কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে, যেহেতু এখানে ভারত জাতির ভাগ্য ও দিক পরিবর্তন হয়।

সজ্জগুরুজীর অর্থসাধনার ক্ষেত্রও সংগ্রামক্ষেত্র এই হেতু যে, এখানে বহিমুখী ঈশ্বরবিমুখ জীবের প্রকৃতি ও প্রযুক্তির রূপান্তর সাধনে ভগবান্মুখী করিয়া ধরার সংগ্রাম। এই সজ্জের সংগ্রামক্ষেত্রে কামান বন্দুক লইয়া যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ অন্তপ্রকৃতির রূপান্তরের। রূপান্তরিত প্রকৃতির মানুষ—আত্মসংস্থিত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠ। এইরূপ সজ্জ হিংসা ঈর্ষা ঘৃণা বিদ্বেষ স্বার্থসংঘর্ষ নাই বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের কোন হেতু নাই। স্বার্থ এক—এই আত্মসংস্থিত চৈতন্য যাহাই সামগ্রিক সংহতি-চৈতন্য। শ্রীগুরু ইহার চৈতন্যঘন মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীগুরুনারায়ণ ব্রহ্মচৈতন্যে ঐকান্তিক উৎসর্গে ব্যক্তিসত্তা বিরাটের পায় সন্ধান—পায় মুক্তি। সুতরাং যোগ এই সংগ্রামের মন্ত্র ও অস্ত্র। সজ্জ তাই দল নহে—সম্প্রদায়ও নহে। এইরূপ অবর আত্মপ্রকৃতি রূপান্তরিত সজ্জ হইতেছে ভাগবত-চৈতন্যের মূর্ত প্রকাশ।

এইরূপ সজ্জ তথা ভাগবত জাতির সম্ভাবনা আজকের দিনের মানুষের কাছে আকাশকুসুম (Utopia) মনে হইবে। মনে হইবে—কল্পনাবিলাস। এইরূপ অবিশ্বাস ও ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সজ্জগুরুজী তাঁর অন্তর্ধানের বছর পাঁচেক পূর্বে সজ্জের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন : “৭০ বৎসর পরে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা সর্বতোভাবে সনাতন ধর্মে ভারতকে গড়িয়া তুলিব। এই ৭০ বৎসর ধৈর্য্য ও সাহস সহকারে অনেক অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে (সংঃ বাঃ, ১৭।৩।৫৪)।”

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

অতএব ফিরে এসো

উমাপদ নাথ

দুর্ভিক্ষ কয়লা-তেলে চাল-গমে কেরোসিনে নয়,
দুর্ভিক্ষ চরিত্রে ব'সে মরতর করেছে রচনা :
ঘুণলাগা মেরুদণ্ডে জীবনের আনন্দ-সম্মেলন
ঝড়ের আঘাতে ধ্বস্ত : আছে শুধু সম্মল রসনা ।
জীবন-নীতির চেয়ে রাজনীতি বেশী প্রিয়, তাই
রামশ্যাম দুইজনে দুর্ভেদ্য বেড়ার দুই পাশে
প্রেমের বিতর্কদ্বন্দ্বেরে অপরকে পরাজিত ক'রে
শ্রেষ্ঠ প্রেমী, আখ্যা পায় : তেলনুন প'ড়ে প'ড়ে হাসে ।
জীবনে জীবন গাঁথে যেই সুতো এবং নিজের
সত্তার সহস্র শাখা বেঁধে রাখে অদৃশ্য তন্তুতে,
ডাকনাম ধর্ম তার । ছুরি দিয়ে তাকে কেটে কেটে
কোলাহলে ঢাকে-ঢোলে মজা ক'রে নেমেছি জন্তুতে ।

অতএব ফিরে এসো : জীবনের শ্রীবিগ্রহ যিনি
জীবন-ব্যঞ্জে নুন নিজহাতে ঢেলে দেন তিনি ।

আজ তবে ক্ষোভ কেন ? যে-ঘরে সময়মতো খেটে
ফাল্গুনে দাওনি খুঁটি, যে-ঘর যে বৈশাখের ঝড়ে
চুমু খাবে মাটিকেই ; এ কথা তো পাগলেও জানে :
তোমারই অযত্নে আজ তোমারই জীবন-ঘর নড়ে ।

ঈশ্বর মানুষ হয়ে নড়ন্ত ঘরের খুঁটি হন,
জীবনকে শক্ত বস্ত্রে ফোটান ফুলের মতো ক'রে ।
যে-ই আসে তাঁর কাছে, মাথায় বহন করে তাঁকে,
সে-ই মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, বজ্রকেও শিরে নেয় ধ'রে ।
ঠাকুর তাই তো নিত্য মানুষের অক্ষয় সম্পদ :
যেখানে জীবনতরী ডুবুড়ুবু সেখানে বন্দর,
পিপাসা পেলেই এলো অনিবার্য অমৃত-প্রাণট
এবং আঁধার হ'লে জ্যোতিরূপে সম্মুখে সুন্দর ।

কোজাগরী পূর্ণিমা

অভয়পদ মজুমদার

কত কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি স্বর্ণ-প্রদীপে ভাতি
বঙ্গ-বধূর স্বর্ণাঞ্চলে বসেছে আসন পাতি ।
কাঁপি লয়ে হাতে বঙ্গলক্ষ্মী মেপেছে কনক-ধান,
ধনে-ধানে ত-য় রেখেছে গো-হাঙ্গ কত বাঙ্গালীর মান ।
গোলাভরাধান, বাটাভরাপান, গালভরা দেখি হাসি
পৌষ-পার্বণে বিলাইছে কত মিঠে-পিঠে রাশি রাশি ।
দিকে দিকে তার কত আয়োজন, পূজা-মণ্ডপতলে,
বিতরিছে কত অন্নও ভাই, বাঙ্গালী কাঙ্গালীদলে ।
খণ্ড মেঘের আমদানী হলে বিফল হবে গো চাষ,
পূর্ণিমা নিশি নির্মল হলে বাঙ্গালীর উল্লাস ।
কালপুরুষের আকাশে ভ্রমণ চাঁদের বিমল হাসি,
বাঙ্গালীর মনে দোলা দিয়ে যায় ঐ কোজাগরী নিশি ।
চাকুরীর মায়া তেয়গিয়া আজি প্রাণপণে কর চাষ,
যতনে রতন করগো চয়ন, হবে গো স্বর্গবাস ।
শস্ত্র-শামল জননীর কোল, মিছে কেন কর ভয় ?
বাঙ্গালী ! তুমি নহো গো কাঙ্গালী, হবেনাকো পরাজয় ।

মহাকালী

সন্তোষ ভট্টাচার্য

তিমির রজনী
অমানিশার সূচীভেদ অন্ধকার
অন্তরাঙ্গা মহাদেব হয়ে শায়িত ।
বিছিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ হৃদয়পদ্ম
জগৎ সৃষ্টি ও পালনকারিণী
অস্তহীন মহাকালীর পদতলে ।

আশীর্বাদ ভরা পরম মুহূর্তে
অজ্ঞান অন্ধকারের দীপাবলি
মহাকালী ।

রজঃ ও তমোগুণের
জবা আর অপরাজিতার পুষ্পাঞ্জলি
তুমি গ্রহণ করে
দাও শ্বেতপদ্মের শুভ্রতা,
শুদ্ধ ভক্তি ।

দার্জিলিং জিলার আদিবাসী সংস্কৃতি

শ্রীগোপীনাথ সেন

পশ্চিমবাংলার অনুপম শৈলাবাস দার্জিলিং যাকে এক সময় দুর্জয়লিঙ্গ নামে অভিহিত করা হত তার মনোহরকারী সৌন্দর্য সমগ্র পৃথিবীর পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। এই স্থানটি যেমন আভিজাত্য শ্রেণীদের কাছে প্রিয় তেমন এখানের মানুষগুলি নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ব-বিদগণের নিকট খুবই আকর্ষণীয়। ১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় দার্জিলিং জেলায় একশত আটত্রিশ বর্গ মাইলে মাত্র একশত লোক বাস করত। ক্রমে ক্রমে যখন ইংরাজগণ এই দুর্গম স্থানটি লোকচলাচল ও যানবাহনের জন্তে সুগম করল সেই থেকে সুরু হল লোকবসতি।

দার্জিলিং পশ্চিমবাংলার একেবারে উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানটির পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে সিকিম, পূর্বে ভূটান এবং পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলা। হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব বনবিটপীমণ্ডিত ঢালুচড়াই ও এই পর্বতের শৃঙ্গে শুভ্রহীরকোজ্জল বরফাবৃত মুকুট। সেই দৃশ্য কি অপূর্ব তাহা মানসচক্ষে না দেখিলে জীবন সার্থক হয় না। হিমালয়ের কোলে লালিত পালিত যে সকল জাতি আছে তাদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত না হলে মানবজ্ঞানের ভাণ্ডার যেন অসমাপ্ত থেকে যায়।

দার্জিলিং জেলার সদর, কালিম্পং এবং কাঙ্গিয়ং-এ লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী, রাই, লিম্বু, মনগার, গুরুং, ছেত্ৰী, নেওরার, হুনওয়ার, তামাং সেপা, সন্ন্যাসী, ভুজেল, যোগী, যক্ষ, দামাই, কামী, ঘারতী প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। দার্জিলিং জেলার সমতল ক্ষেত্রে সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওরাওঁ উপজাতিদের বাস। এই সকল উপজাতিদের মধ্যে ভুটিয়া ও নেপালী, লেপচা, লিম্বু ও রাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে প্রধান প্রধান উপজাতিদের কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক বিবরণ পরিবেশন করা হল

নেপালী ভাষা ও অক্ষর দার্জিলিং জেলার সকল উপজাতিদের ভাব আদান প্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। নেপালের কৃষি ও সংস্কৃতি দার্জিলিং-এর

নেপালী উপজাতিদের প্রভাবিত করেছে। তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা এখানে দেখা যায় না। নেপালী উপজাতিগণ হিন্দুভাবাপন্ন এবং তাদের চিন্তাধারা সবই নেপালের অধিবাসীদের সঙ্গে একই স্বত্রে গ্রথিত। নেপালী-প্রভাবিত উপজাতিগণ যেমন লিম্বু, শাম্বু, হুনওয়ার, যক্ষ, মাগোরি এবং মুরমি। এই সকল উপজাতিদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু লেপচা উপজাতিগণ একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী। এই জাতিদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদগণ বিশেষ অমূল্য করে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

লেপচাগণের আদি বাসস্থান সিকিম। সিকিম থেকে তারা দার্জিলিং জেলায় বসবাস আরম্ভ করেছিল আনুমানিক ১৮৫০ সালে। ১৯৫১ সালের আদাম-সুমারীতে দেখা যায় তাদের সংখ্যা হল তের হাজার বারশত তেত্রিশ।

১৯৩১ সালে লেপচাদের ধর্ম সম্বন্ধে দেখা যায় তাদের মধ্যে দশ হাজার নিরানব্বইজন বৌদ্ধ, এক হাজার নয়শত পঞ্চাশজন খ্রীষ্টান এবং ছয়শতজন আদিম ধর্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে লেপচাদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

লেপচা এই নামটি নেপালী ভাষা 'ল্যাপচা' কথা থেকে এসেছে। নেপালীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে যে, লেপচার দুইপ্রকৃতি ছিল বলে তাদের জাতিচ্যুত করা হয়েছিল, আবার অনেকে মনে করে তাদের স্বভাব খুবই শান্তপ্রকৃতির ছিল, সেজন্ম তাদেরকে লেপচা বলা হত, নেপালে লেপচা নামে একরকম মাছ পাওয়া যায় তাদের স্বভাব খুবই শান্ত, সেজন্ম তারা লেপচাদের সঙ্গে তুলনা করেছে। লেপচা ও নেপালী উভয়কে একই রকম দেখতে। তারা মোঙ্গলজাতি থেকে উদ্ভূত। তাদের গায়ের রং গীতাভ, দেহ বলিষ্ঠ, অবয়ব নাতিদীর্ঘ, মাথা গোল, চুল কালো ও খাড়া, নাক চ্যাপটা ও চওড়া; চোখ দুটি ছোট আর গয়ের রোম অল্প, দূর থেকে পুরুষ ও নারী উভয়কে ঠিক চেনা যায় না। পূর্বে পুরুষরা

মেয়েদের মত লম্বা বেণী বাঁধত, এখন তারা ছোট ছোট করে চুল ছাঁটে।

লেপচার বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিমান, কোমল স্বভাবের এবং বেশ আনন্দপ্রিয়। তারা কায়িক পরিশ্রম করতে কোন রকম পছন্দ পায় না। যদি কোন কারণে কাহারও সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয় তাহলে পরক্ষণেই তার জুই লজ্জিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে। লেপচাদের কোমল ও শান্ত স্বভাব যেন প্রশান্ত ধ্যানগভীর হিমালয়ের একটি বিশেষ অবদান বলা যেতে পারে।

লেপচাদের নিজস্ব ভাষা রং। রং কথাটির উৎপত্তি ‘রিংজং’ থেকে যার অর্থ যে পর্বতে কেবল কোমল স্বভাব ও ভদ্রভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের বাস। রং সাহিত্য বৌদ্ধ এবং অতীত ধর্মের চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ। লেপচাদের অক্ষরের সঙ্গে ভূটিয়াদের অক্ষরের মিল আছে। জি. এ. গ্রীয়ারসন লেপচাভাষাকে তিব্বতী চীন গোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দার্জিলিং এর একশত আটত্রিশ স্কোয়ার মাইলের উন্নতির দিকে নজর দেন। সেই সময় এখানকার লেপচা জাতির সংখ্যা ছিল একশত জন। তারপর ক্রমশঃ ১৮৫০ সাল থেকে তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হল প্রায় দশ হাজার। ১৮৬২ সালে লেপচা উপজাতিগণের সংখ্যা বাইশ হাজারের উপর গিয়ে দাঁড়াল। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে দেখা যায় লেপচাদের সংখ্যা হ্রাস হতে আরম্ভ করল। ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় লেপচাগণের সংখ্যা তের হাজার চারশ ত্রিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেপচাগণ বৈশীর্ভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদেরকে খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। বর্তমানে খৃষ্টান লেপচা উপজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খৃষ্টীয়ধর্মী লেপচাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যান্য শিক্ষিত জাতির মত সমপর্যায়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। এখনও লেপচাদের মধ্যে প্রাচীন মতাবলম্বীদের দেখা যায়, তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

লেপচাদের আদিবাসস্থান ছিল সিকিম রাজ্যে।

বহু প্রাচীনকালে দার্জিলিং সিকিমের অংশ ছিল, সেই সময় থেকে লেপচাগণ দার্জিলিং-এ বসবাস আরম্ভ করে। তৎকালীন দার্জিলিং-এর সীমারেখা ছিল উত্তরে ডনকিয়া, পূর্বে ভূটানের সীমানা পেরু। দক্ষিণে জলপাইগুড়র — সীমানা তিতিলিয়া এবং পশ্চিমে নেপালের সীমারেখা অরুণতামব্র নদীর অঞ্চল পর্যন্ত। লেপচারা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল; যেমন রিনজং মু, তামসং মু, এবং ইলাম মু। লেপচা ‘মু’ শব্দের অর্থ অধিবাসী। দার্জিলিং-এর সীমারেখা তিস্তা ও রুণগীত এই নদী দুটি যেখানে মিশছে সে পর্যন্ত ছিল। প্রাচীনকালে পাশা-পাশি তিনটি রাজ্য তিব্বত, ভূটান ও নেপাল সিকিমের ওপর হানা দিয়ে সেই রাজ্যের কিছু-কিছু অংশ দখল করে নিজ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই সময় ভূটান কালিম্পং-এর কিছু অংশ জয় করে নিয়েছিল। তখন সিকিমের রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল এবং তাহা ‘বেশতাপা বিদ্রোহ’ নামে পরিগণিত হয়। গুর্খাগণ সিকিমকে আক্রমণ করল। তখন সিকিমের মহারাজা গত্যন্তর না দেখে ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতায় এই বিদ্রোহ দমন হয়। ১৮৩৫ সালে দার্জিলিংকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ১৮৬৫ সালে ভূটান যুদ্ধের পর কালিম্পংকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন।

লেপচাদের সাংস্কৃতিক জীবন পঞ্চস্তম্ভের উপর নির্ভরশীল—যেমন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। লেপচারা কৃষি আবাদ করে জীবনযাপন করে। প্রাচীনকালে জঙ্গলে আগুন দিয়ে পরিষ্কার করে সেই জমিতে কৃষিকাজ করত। দু'একবছর সেই জমিতে কৃষি আবাদ করে জঙ্গলের অন্য স্থানটি পরিষ্কার করে ঐ জমিটিতে চাষ করত। তারা লাঙ্গল দিয়েও চাষ করে। তাদের ভাষায় একে বলে ‘এসিং’। এখন লেপচারা ধান, মকাই, কোদো ও নানা প্রকার শাকসব্জীর চাষ করে আসছে।

লেপচা উপজাতির জনগণ প্রকৃতির উপাসক। তাদের সৌন্দর্যপ্রীতি খুবই প্রশংসনীয়, তার পরিচয়

পাওয়া যায় ফুলের প্রতি অদম্য প্রীতি দেখে। লেপচাদের গ্রামে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা রকম ফুল চাষ করার নিপুণতা ও সৌন্দর্যবোধ প্রতিটি দর্শককে মুগ্ধ করে। লেপচা উপজাতিদের আর একটি মহৎগুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের গাছগাছড়া চিনবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তারা গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করে নিজেদের পেটের ব্যথা, মাথাধরা, কফ-সর্দি ও নানা রকমের ব্যাধি ভাল করে থাকে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'দি সেনসাস হ্যাণ্ড বুক অফ দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট' নামক পুস্তকে যে সকল ওষুধিষটিত গাছপালার নাম লিপিবদ্ধ আছে তার বেশীর ভাগ নাম লেপচাদের কথিত ভাষা থেকে উদ্ধৃত।

লেপচাদের খাদ্য আহরণ হয় মৎস্যশিকার শূকর পাখী ও মুরগীর মাংস থেকে। তারা মাটির পাত্রে কাঠ ও শুকনা পাতা জালিয়ে ভাত ও তরকারী রান্না করে। যে মাটির পাত্রে ভাত রান্না করে তার নাম 'ফিটোক' এবং বাঁশের তৈরী জুরু বা চামচ করে রান্না করে। ফাঁপা বাঁশ অর্থাৎ 'পোহিপ' নামে একটি পাইপ দিয়ে 'চি' বা মত্ত পান করে। 'চি' তাদের সকল ধর্মীয় ও বিবাহের বিশেষ অঙ্গ। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বাসন-পত্র ব্যবহার করতে শিখেছে।

লেপচাদের নিজস্ব সাজপোষাক ও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অত্যন্ত আদিবাসীদের তুলনায় স্বতন্ত্র, ও উন্নত। তাদের পুরুষদের পোষাকের নাম হল 'জেম-প্রা' ও মেয়েদের পোষাকের নাম 'জেম-ভিয়াম'। 'পাগি' নামে একটি আলখাল্লা জামা বৌদ্ধ লেপচার পরিধান করে। 'পাগি' হল তাদের উৎসবের বস্ত্র। সাধারণতঃ তারা হাফ-প্যান্ট, সার্ট ও বুট পরে থাকে। মেয়েরা তুগো বা রাউজ পরে ও কোমরে স্কার্টের মত পরে থাকে। লেপচারা বাঁশের তৈরী সূক্ষ্ম কারুকার্যের ছাতা ব্যবহার করে তার নাম 'গুম' বা 'টুকু' বা 'টুক-টুক'।

লেপচা মেয়েরা গহনা পরতে ভালবাসে। তারা কানে 'লকং' বা মোটা রূপার মাকরি পরে। গলায়

নানা রকম পাথর দিয়ে পুঁতির মালা এবং তার সঙ্গে সোনার বাস্র কারুকার্য খচিত মাছুলি, গলায় কোর্ড নামে নেকলস তার সঙ্গে 'জু' নামে লকেট যুক্ত থাকে। আর পাথরের তৈরী মালা তারা গলায় পরে, তাকে বলে 'খো'। লেপচা মেয়েরা 'লেইয়াপ' নামে সোনা ও রূপার তৈরী নেকলেস পরে থাকে। পুরুষদের আঙুলে আংটি ছাড়া আর কোন গহনা নেই।

লেপচাদের শিল্প-কলার প্রতি অনুরাগ ও তাদের শিল্প-চর্চা থেকে এই পার্বত্য উপজাতিদের শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের হস্তশিল্প সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লেপচাদের সৌন্দর্যবোধ, কর্মকুশলতা ও বাস্তবচিন্তাধারা তাদের শিল্পক্ষেত্রে কেবল যে উন্নত করেছে তা নয় তাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রশস্ত করেছে।

লেপচাদের শিল্পবোধ যে কত প্রগাঢ় তা তাদের বৌদ্ধমঠের চিত্রকলা দেখলে বুঝা যায়। তাদের কাঠ ও ধাতুর তৈরী জিনিষগুলি পর্যটকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই শিল্পের ওপর বহু কারিগর নিজেদের জীবিকা অর্জন করে।

লেপচারা নৃত্য ও সঙ্গীত প্রিয়। তারা বাঁশের আড়-বাঁশী বাজাতে খুব ভালবাসে। এই বাঁশীতে চার থেকে ছয়টি ছিদ্র থাকে। লেপচা উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান তাদের লোকসংগীত, লোককথা, উপকথা, প্রবাদ ও ছড়া। লেপচাদের বহু প্রকার লোক নৃত্যের মধ্যে প্রাকৃতিক নৃত্য, কৃষি নৃত্য, যুদ্ধ নৃত্য ও পৌরাণিক নৃত্যগুলি প্রধান। তাদের লোক সংগীতের মধ্যে গো-উং-সা-ভাম অর্থাৎ প্রেমসংগীত, যেন-উং-সা-ভোতম বা কোঁতুক সংগীত, ইউ-মুফ-ভাম বা হুং সংগীত এবং ফেমের-সা-ভাম বা ধর্ম সংগীত বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। লেপচাদের লোককথার মধ্যে পৃথিবীর সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, লেপচাজাতিদের সৃষ্টিবৃত্তান্ত এই সকল গল্পগুলি খুবই জনপ্রিয়। তারা নিজেদের অন্ধবিশ্বাস ও প্রবাদগুলিকে নিজেদের পারিবারিক জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে।

লেপচাদের মতে দার্জিলিং-এর অর্থ দেবস্থান

‘দোরজী’ অর্থে ভগবান এবং লিং অর্থে বাসস্থান। তারা এই তুষারাবৃত পর্বতাঞ্চলকে খুবই পবিত্র বলে মনে করে। দার্জিলিং-এর মত ক্যালিম্পং-এর অর্থ লেপচা জাতিগণ করেছে—‘ক্যালিং’-এর অর্থ সংগ্রহ আর ‘পং’-এর অর্থ স্থান। লেপচাগণ ক্যালিম্পং থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় শাকসব্জী ও গাছপালা থেকে ঔষধপত্র সংগ্রহ করে। কার্শিয়াং তাদের কাছে ফুলের দেশ। এখানে তারা চাষ করে সুন্দর সুন্দর ফুল যা পৃথিবীর অত্র কোন স্থানে দেখা যায় না। দার্জিলিং জেলার সোনাদায় তারা শূকর শীকার করে। লেপচা ভাষায় ‘সোনা’ মানে শূকর এবং ‘দা’ মানে ঘাঁটি।

দার্জিলিং জেলায় লেপচাদের প্রাধান্য ও তাদের সংস্কৃতি যে অগ্ন্যস্ত্র উপজাতিতে প্রভাবান্বিত করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত ‘লেপচা এসোসিয়েসনের’ মধ্য দিয়ে। বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তারা নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধন করলেও তারা এখনও প্রাচীন সামাজিক প্রথাগুলি মেনে চলে।

দার্জিলিং-এর আর একটি বৃহৎ উপজাতি লিঙ্গু। তাদের পূর্ব-আবাস ছিল পূর্ব-নেপালে। তারা গুর্খা জাতিদের কাছে পরাস্ত হয়ে নিজদেশ ত্যাগ করে দার্জিলিং-কে নিজ জন্মভূমি মনে করে।

প্রধানতঃ লিঙ্গুদেরকে দার্জিলিং-এর চা বাগানে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী লিঙ্গুদের সংখ্যা উনিশ হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ। বর্তমানে তারা কৃষিকার্যের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুলিগিরিও করে। লিঙ্গুগণ বহু দলে বিভক্ত যেমন সাখাং, নেমবাং, হাংগাম, চেনতাং, হোরপা, তামেলিং ইত্যাদি। বর্তমানে দার্জিলিং-এর লিঙ্গুগণ লেপচাদের সঙ্গে বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। এই সম্বন্ধে ১৮৯১ সালে জাতিতত্ত্ববিদ রিজ্জলে বলেছেন ‘লিঙ্গু সমাজে লিঙ্গুদের সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন হয় না। কারণ তার পিতামাতা ভুটিয়া, লেপচা, গুরুং, সুনওয়ার, মানজার বা মুর্মি হতে পারে।’

লিঙ্গুদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ‘নিওয়া-বুমা’। তাদের বিশ্বাস তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে তারা সন্তুষ্ট করার জন্ত শূকরের মাংস, ভাত ও মদ উৎসর্গ করে এবং পরে সেই ভোগ তারা আহাৰ করে। তাদের উপাস্ত্র দেবী বুরিবোদজু যাকে নিওয়াবুমা সৃষ্টি করেছিলেন। লিঙ্গুগণ যেখানে হিন্দুদের সঙ্গে বাস করে, তারা নিজেদের হিন্দু শৈব বলে পরিচয় দেয় এবং হিন্দু দেবতা মহাদেব ও দেবী গৌরীর উপাসনা করে। আবার যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত করেছে সেখানে তারা বৌদ্ধধর্ম মেনে চলে।

দার্জিলিং জেলায় নেওয়ার উপজাতিগণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তারা নেপালের কাটমাণ্ডু থেকে এখানে এসে বসবাস করে। অনেকে মনে করে প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারত থেকে নন্দদেবের অধীনে নায়ারগণ নেপালে সৈনিক হয়ে এসেছিল। ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত তারা নেপালে ছত্রী, মনগার ও গুরুংদের অধীনস্থ করে রাজ্য শাসন করেছিল। নেয়ারগণ নিজেদের সংস্কৃতি নেপাল থেকে নিয়ে এসেছে। তাদের শিল্পানুরাগের বৈশিষ্ট্য হস্তশিল্পের অপূর্ব কারু-কার্যের মধ্যে দেখা যায়। নেয়ারগণের সাধারণ উপজীবিকা হস্তশিল্প ও কৃষি কাজ।

১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দার্জিলিং জেলায় নেওয়ারগণের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দহাজার আটশত সাতাশ। বর্তমানে তারা সদর, কার্শিয়াং এবং ক্যালিম্পং-এর খাসমহলের চা-বাগানে বাস করে। নেওয়ারদের অক্ষর তিব্বতী-ব্রহ্মী ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

দার্জিলিং জেলায় রাই উপজাতিগণ পূর্বে পূর্ব-নেপালের অধিবাসী ছিল। গুর্খাগণ নেপাল জয় করবার পর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ‘রাই’ উপাধি দিত। ১৯৫১ সালের আদামশুমারী অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল চৌশটি হাজার সাতশ পয়তাল্লিশ। এখন তারা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেছে। রাই উপজাতিগণের মৃত্যু হলে তারা তিনদিন অশৌচ পালন করে। তাদের মধ্যে এখন অনেকেই বৌদ্ধধর্মালম্বী। রাই উপজাতিগণের নিজস্ব গণদেবতা ‘বুমে’। কৃষকগণ বুমে দেবতাকে

সম্ভষ্ট করার জন্ত মুরগী বলি দেয় আর তার উদ্দেশ্যে পুর্নিমা রাত্রে নাচগানে অতিবাহিত করে।

দার্জিলিং জেলার আর একটি সর্ববৃহৎ উপজাতিদের দেখা যায়। তারা হল ভুটিয়া। ১৯৬১ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় ভুটিয়াদের সংখ্যা তেইশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই এবং দার্জিলিং জেলায় তাদের সংখ্যা উনিশ হাজার তিনশ বারিশ।

ভুটিয়ারা যে ভুটান থেকে দার্জিলিং-এ প্রবেশ করে বসবাস স্থাপন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাতিতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণ ভুটিয়াদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে একসময় তিব্বতীয়দের বলা হত 'ভোট'। ভোট, বোট আর ভুটিয়া এই কথাগুলির অর্থ পাহাড়িয়া জাতি। বর্তমানে ভুটিয়ারা নেপালীদের মত নিজস্ব স্বত্বার অধিকারী। তাদের নিজেদের অক্ষর

ও ভাষা আছে কিন্তু তিব্বতীয় ভাষা ও অক্ষরের সঙ্গে এর ওতপ্রোত মিল দেখা যায়।

ভুটিয়ারা বেশীর ভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ও আদিম ধর্মাবলম্বী দেখা যায়।

ভুটিয়াদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা নেপালী, লেপচা বা সিকিমী ও তিব্বতীয়দের সঙ্গে অভিন্ন। দার্জিলিং-এর উপজাতিদের সংস্কৃতি ও নানারূপ শিল্পকলা যে প্রাচীন-কাল থেকে এক পার্বত্য সভ্যতা বিস্তার করেছিল তা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে বিনষ্ট হতে বসেছে। পাহাড়িয়া জাতিগুলির সংস্কৃতি যা কেবল তাদের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যে পূর্বে বসিত আছে তার ধ্বংসপ্রাপ্তির আর বেশীদিন দেবী নেই, তার আগে যদি লোক সংস্কৃতি সংরক্ষকগণ এর সংরক্ষার জন্ত বিশেষ যত্নবান না হন।

টোমাস্ মান্

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

এই শতাব্দীর বরেণ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে জার্মান উপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক টোমাস্ মান্ অগ্রগণ্য। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর মুহূর্তে আধুনিক সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয়। তাঁর রচনায় প্রসাদগুণের অভাব থাকলেও সেটা তাঁর খ্যাতির কিংবা জনপ্রিয়তার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করে নি। মান্ আত্মসচেতন লেখক—তিনি শুধু নিজেকে জানারই চেষ্টা করেন নি, নিজের শিল্পী-সত্তার স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। শিল্পের সঙ্গে অমুস্ততার সম্পর্ক তাঁকে কৌতূহলী করেছে। অমুস্ততা ও স্বাস্থ্য, জীবন ও মৃত্যু, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ানুভূতি, বাস্তববাদ ও রোমান্টিকতা—অর্থাৎ যে সব বিরোধভাসে আমাদের জগৎ-সংসার বাংকৃত—এই সব দ্বৈতের মধ্য দিয়ে তিনি কোনো অদ্বৈতে উত্তরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সত্য সেই অদ্বৈতের প্রকাশ। তাই মান্ বলেছেন, নিরাপদ মিথ্যার চেয়ে ক্ষতিকর সত্যও ভালো।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর উত্তর জার্মানীর লুবেক্ নগরীতে মান্-এর জন্ম হয়। কিছু দিন একটি বীমা কার্যালয়ে ক্লার্কের কাজ করার পর মান্ গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "বুডেন্ ক্রক্স্" (১৯০৯)। দশ বৎসরে এই উপন্যাসটির পঞ্চাশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ও মান্-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মান্ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীরা মান্-এর রচনার নিন্দা করেন ও মান্ সুইজারল্যান্ডে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে তাঁর ছয়টি সন্তান ও ভাতা হাইনরিক-কে নিয়ে মান্ যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৫২ অব্দে মান্ ইওরোপে প্রত্যাবর্তন করেন ও ১৯৫৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

"বুডেনক্রক্স্" আংশিকভাবে মান্-এর পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এক সমৃদ্ধ জার্মান ব্যবসায়ী পরিবারের ক্রম-অবনতি এই দীর্ঘ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বুডেনক্রক্স্দের

আর্থিক অবস্থার যত অবনতি ঘটেছে, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞানচর্চায় তাদের আগ্রহ তত বেড়েছে। এই বংশের শেষ পুরুষ রুগ্ন যুবক হান্স বুডেন্স্ট্রাক্ কালিদাস বর্ণিত শেষ রঘুকুলনৃপতি অগ্নিবর্ণের কথা আমাদের কিছুটা মনে করিয়ে দেয়। তার বন্ধ্য সৌন্দর্যবাদ বুডেন্স্ট্রাক্ পরিবারের আর্থিক অবক্ষয়ের প্রতীক।

১৯০৩ অব্দে প্রকাশিত “টনিঅ ক্রাগের” জনৈক শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী।

মান্-এর ‘সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা দীর্ঘ সাংকেতিক উপন্যাস “যাহু পাহাড়” (‘Der Zauberberg’ ১৯২৪ খ্রী)। এই গ্রন্থে শিল্পকলার সঙ্গে মানসিক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মৃত্যুর জন্য শিল্পীর আর্তি, প্রতিভার রোগপ্রবণতা, বুর্জোয়া সমাজে শিল্পীর স্থান, অবক্ষয়ের মনস্তত্ত্ব— এই সব বিষয় গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে।

মান্-এর অষ্টাশ্ল রচনার মধ্যে “মারিও এবং যাহুকর” (১৯৩০), “জোসেফ” উপন্যাস-চতুষ্টয় (১৯৩৩—৪৪), ভারতীয় উপকথা নিয়ে রচিত “মস্তক-বিনিময়” (‘Die vertauschten kopfe’, (১৯৪০), “ডক্টর ফাউল্টাস্” (১৯৪৭), এবং “ফেলিক্স ক্রুলের স্বীকারোক্তি” (১৯৫৪ উল্লেখযোগ্য।

নোভালিস্, ভাগ্নার, নীৎসে, শোপেন্ হাওয়ার ও ফ্রয়েড্-এর গভীর প্রভাব মান্-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সঙ্গে ব্যষ্টির সম্পর্ক ও সেই সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সমস্তাবলী মান্-এর অনুশীলনের বিষয়। বর্তমান জগতে নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা নিরূপণেও মান্ বিশেষ আগ্রহী। রচনাতে মাঝে মাঝে রাগাডম্বর ও অবাস্তব প্রসঙ্গের আধিক্য এসে পড়লেও সাহিত্যশিল্পী রূপে মান্ যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি কাহিনীর বিস্তার তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে করেছেন। তাঁর শিল্পস্বমামণ্ডিত রচনা-শৈলীতে দীর্ঘ অনুশীলনের পরিণতি স্পষ্ট এবং এই শৈলীর সঙ্গে সংগীতের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। শ্লেষ, বক্রোক্তি ও হুঃখবাদের অনুসরণও এখানে শোনা যায়। মান্-এর কোনো গ্রন্থকে ‘শব্দের ঐক্যতানবাদের’ রূপে বর্ণনা করলে অত্যাুক্তি হবে না।

“বুডেন্স্ট্রাক্” উপন্যাসে মান্ মানুষকে জার্মান

সমাজের পটভূমিকায় দেখেছেন ; জার্মান সমাজ-সংস্কৃতি তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু। এ পটভূমিকা বিস্তৃততর “যাহু পাহাড়” গ্রন্থে, যেখানে মানুষকে পাশ্চাত্য জগতের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন টোমাস্ মান্। “জোসেফ” উপন্যাস-চতুষ্টয়ে মানুষ কোনো বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী নয়, সে বিশ্বপথিক। তার “উৎপত্তি, স্বরূপ ও লক্ষ্য” সম্বন্ধে মান্-এর চিন্তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। যত দিন গেছে মান্ ক্রমশঃ তাঁর পরিধি বিস্তৃততর করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখানে স্থান-কাল-পাত্রের সব ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। জার্মান জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গতি থেকে মহাবিশ্বের উদার উন্মুক্ত আকাশে তাঁর মুক্তি ঘটেছে। সাধারণ অর্থে কোনো আধ্যাত্মিক বাণী তিনি আমাদের দিতে পারেন নি। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য তাঁর সাহিত্যে প্রচারিত হয় নি। বরং শিল্পীর অসামান্য সৃষ্টিশক্তি মানুষকে বিস্মিত করেছে ; শিল্পীর ক্ষমতা তাঁর কাছে মনে হয়েছে ঐশ্বরিক। শিল্পীর ভূমিকা যে বিপজ্জনক হ’তে পারে একথা মান্ অবশ্য স্বীকার করেছেন ; শিল্পীর রোমান্টিকতা যে অনেক সময় নিরাপদ নয় একথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। অসুস্থতা তাঁর কাছে স্বাস্থ্যের চেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। “যাহু পাহাড়”-এর নায়ক হান্স কাস্টোর্ট যখন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছে তখন সে ইন্দ্রিয়জ প্রেমের তীব্রতা অহুভব করতে পেরেছে। “ডক্টর ফাউল্টাস্”-এ লেভেরকুন্ তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার শিখরে আরোহণ করেছেন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর। সঙ্গীতের দিকে মান্ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন তবু তাঁর মনে হয়েছে সঙ্গীত বা যে কোনো শিল্পই মানবজীবনকে বিপন্ন করতে পারে। এসব ব্যাপার নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করলেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তবে এ কথা স্বীকার্য যে ক্ষয়িষ্ণুতা ও মৃত্যু নিয়ে মান্-এর চিত্ত আকৃষ্ট হলেও এগুলিই তাঁর কথা-সাহিত্যের শেষ কথা নয়। সব কিছু ছাপিয়েও জীবনের উদাঙ হ্রস্ব অনেক বার শোনা গেছে।

বসুমতী

অজিত দাস

সব কিছুই ঠিকঠাক। কৃত্তিবাস বসাকের সহিত হরিহর বসাকের কথা বসুমতীর বিবাহ হইবে।

বসুমতী কিশোরী কন্যা। চৌদ্দ বৎসর পার হইয়া পনেরয় পদার্পন করিয়াছে। উজ্জল শ্যামবর্ণা, ছিপছিপে গড়ন, ডাগর চোখ। মাথায় ঘন কালো লম্বা চুল। কৈশোরের লাবণ্যে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে। উজ্জল চক্ষু দুইটি স্বপ্নালু হইয়াছে। মুখে তাহার মুছ হাসি লাগিয়াই আছে।

হরিহর বসাক সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। দরিদ্র শ্রম-জীবী মানুষ। তাঁত বুনিয়া সে জীবিকার্জন করে। সেই অর্থে সে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে। হরিহর বসাক নির্বিবাদী সৎ প্রকৃতির পরিশ্রমী মানুষ। সে কারণ সন্ন উপার্জন সত্ত্বেও সংসারে একটি শৃঙ্খলা আছে, লক্ষ্মী ত্রী আছে। স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান লইয়া তাহার সংসার।

বসুমতীই তাহার প্রথম সন্তান। বসুমতীর সমগ্র আচরণের ভিতরেও একটি লক্ষ্মীত্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে। দেখিলেই তাহাকে স্নলক্ষণা কন্যা বলিয়া বোধ হয়। বসুমতীর প্রকৃতিও বড় শান্ত। এবং সে খুবই কাজের মেয়ে। সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াছে। হরিহর বসাক তাহাকে আর পড়াইতে পারে নাই। পারিলে বসুমতী আরও অধিকদূর পড়িতে পারিত। স্থির বুদ্ধির মেয়ে বসুমতীর পড়াশুনা ভালোই লাগিত। পড়া ছাড়িলেও বসুমতী অবকাশ পাইলেই বই লইয়া বসে। ছোট ভাইকে পড়া দেখাইয়া দেয়। কখনও আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গান গাইয়া থাকে। শিল্পবোধ, রসবোধ ইত্যাদি বিষয়ে বসুমতীর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।

সে কারণেই কৃত্তিবাসের সহিত তাহার বিবাহের কথা হওয়ায় সে খুব খুশী হইয়াছে।

কৃত্তিবাস দরিদ্র সন্তান। সেও তাঁত বোনে। তাহার কুড়ি বছর বয়স হইয়াছে। কৃত্তিবাসও ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ যুবক।

কিন্তু কৃত্তিবাস বড় গুণী ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে নাই। অর্থাভাবে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। তাহার পর সে বাড়িতে পড়িয়া পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে সারাদিন তাঁত বোনে। রাত্রিবেলা পড়া করে। এই পড়া ছাড়া সে আরও একটি কাজ করে। সে লেখে।

কৃত্তিবাস পত্র লেখে, গান লেখে, গল্প লেখে, যাত্রার পালা, থিয়েটারের নাটক লেখে। ইতিমধ্যে তাহার রচিত একটি যাত্রার পালা অভিনীত হইয়াছে। এই শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সহিত সে ওঠা বসা করে। ভদ্রলোকেরা যে পত্রিকা ছাপাইয়া বাহির করে তাহাতে তাহার লেখা গল্প, পড়াছাপা হয়। শহরে কৃত্তিবাস বসাকের খুব সুনাম হইয়াছে। সকলেই তাহার স্তুতি করে। তাহাকে ভালবাসে। এক কথায়, কৃত্তিবাস বসাক শহরের বুকে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

এই সব কাজে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে না বলিয়া তাহার অভিভাবক দাদা বৃন্দাবন বসাক ও তাহার পত্নী অবশ্য কৃত্তিবাসের এইসব গুণাবলীকে কোন গুরুত্ব দেয় না। বরং প্রতিনিয়তই এই সব কাজের সমালোচনা করিয়া থাকে। দাদা বৃন্দাবন বসাক ওই সাহিত্য চর্চাকে গরীবের ঘোড়ারোগ আখ্যা দেয়। উহাকে বনের মোষের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়া থাকে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর কতো তাড়াবি, ওতে কি পেটের ভাত হবে? ও কাজ কি মুখে অন্ন জোগাবে?

বসুমতী কিন্তু পত্রিকা ছাপা হইলেই জোগাড় করিয়া আনে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কৃত্তিবাস নামটি বাহির করে। লেখা পড়ে। তদপেক্ষা অনেক বেশি করিয়া কৃত্তিবাস বসাক নামটি ছাপার অক্ষরে পড়িয়া থাকে। শেষ অবধি প্রায় জপ করিয়া থাকে। সেই সঙ্গে কৃত্তিবাস বসাকের মুখখানি তাহার মনে জাগিয়া ওঠে, তাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট রূপে তাহার কানে বাজিতে থাকে। অর্থাৎ বসুমতী তখন কৃত্তিবাসের ধ্যানে মগ্ন হইয়া যায়।

কৃষ্ণিবাসের এই গুণপনার প্রতি বসুমতীর বর-
বরই আকর্ষণ। তাই প্রথমে যখন কার্তিক প্রামানিকের
সহিত তাহার বিবাহের কথা উঠিয়াছিল তখন সে খুশী
হইতে পারে নাই। কার্তিক তাহার সুপরিচিত।
তাহাদের বাড়ি সে প্রায়ই আসিয়া থাকে, তাহার সহিত
গল্পও করে।

কার্তিক প্রামানিক স্বাস্থ্যবান। দেখিতেও সে
সুন্দর। কার্তিক প্রামানিকদের পরিবারের আর্থিক
অবস্থাও ভালো। তবু বসুমতী খুশী হইল না।

তখনও কৃষ্ণিবাসের সহিত তাহার বিবাহের কথা হয়
নাই। তাহার সম্ভাবনার কথাও ওঠে নাই। তবু
বসুমতী যেন কার্তিক প্রামানিককে স্বামী রূপে মানিতে
পারিল না। কারণ নিজের অজান্তেই কৃষ্ণিবাস যেন
তাহার মন দখল করিয়া বসিয়াছে। কৃষ্ণিবাসের ওই
গুণপনা তাহার মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কার্তিক
প্রামানিক বাস্তব বিচারে নিঃসন্দেহে সুপাত্র। সেও
পরিশ্রমী। জীবনে উন্নতি করিতে চায়।

কিন্তু বসুমতীর দৃষ্টিতে কার্তিক প্রামানিক বড় স্থল।
সে শুধু টাকার চিন্তা করে। সর্বদাই টাকা পয়সা, আর
উপার্জনের কথা বলে। লেখাপড়া তাহার পাঠ-
শালাতেই শেষ। কিন্তু কথাবার্তা বোলচালে অতি
চৌকস্ অতীন্দ্রিক কৃষ্ণিবাসের ওই সব গুণপনার
সামান্যও নাই। বরং তাহার অভাবেই সে পরিপূর্ণ।
স্বপ্নসবোধ, শিল্প সুষমাবোধের একান্ত অভাবেই
তাহার ভিতর প্রকাশ পায়।

বসুমতী এতো কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই।
সে সামগ্রিকভাবে কার্তিক প্রামানিককে দেখিয়া শুনিয়া
কিছুতেই তাহার বাঞ্ছিত পুরুষ বলিয়া তাহাকে
মানিতে পারে নাই।

প্রস্তাবটি আসিয়াছিল কার্তিক প্রামানিকের বাড়ি
হইতেই। কার্তিক প্রামানিকের মা বসুমতীর মাকে
বলিয়াছিল, তোমার বসুমতীকে আমার কার্তিকের
সঙ্গে দাও না। বেশ মানাবে তাহলে।

বসুমতীর মা এই প্রস্তাবে খুশী হইয়াছিল। কার্তিক
প্রামানিকদের এখন উঠতি সংসার। অনেক কটি ভাই।

সকলে এক সংসারে থাকিয়া সংসারের আয় উন্নতি
করিতেছে। ওই সংসারে মেয়ে পড়িলে মেয়ে স্ত্রীই
হইবে।

মার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বসুমতী মাথা নিচু
করিয়াছে। তাহার পর কথাটি মনে মনে যতই চিন্তা
করিয়াছে ততই যেন সে মনের দিক হইতে কেমন একটা
বাধা পাইয়াছে। মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।
কার্তিক প্রামানিককে স্বামীরূপে মানিয়া লইতে
কোথায় যেন বাধা।

ইহার কিছুদিন পরেই হরিহর বসাক বাড়ি আসিয়া
জীকে বলিল, আজ বৃন্দাবন বসাক পথে ধরেছিল।

বসুমতীর মা বলিল, কেন।

হরিহর বসাক বলিল, ওই তোমার মেয়ের জ্ঞা। ওর
ভাই কৃষ্ণিবাস। সেই তার কথা বলছিল। বলল,
আমার ভাই কৃষ্ণিবাসকেতো জানেন। ভাবছি তার
বিয়ে দেব। ওই সব লেখাপড়া নিয়ে মত থাকে দিন
রাত। কাজের দিকে মন নেই। তাই ভাবছি বিয়ে
দেব। তখন আপনিই সংসারে মন বসবে। ওসব বদ-
খেয়াল ছাড়বে। আপনার মেয়েতো বিয়ের যোগ্য
হয়েছে। যদি মত করেন তাহলে আমার ভাই-এর
সঙ্গে দিন। আমাদের অবস্থাতো সবই জামেন। ভাই-
কেও জানেন। ভাই-এর স্বভাব চরিত্রও জানেন।
আপনার মেয়ে আমাদের পছন্দ।

বসুমতী এই সংবাদও শুনিল। এই সংবাদ
যেন কানের ভিতর দিয়া তাহার মর্মে গিয়া প্রবেশ
করিল।

কিন্তু বসুমতীর মা বলিয়া উঠিলেন, না, ও ছেলে
স্ববিধের হবে না।

হরিহর বসাক বলিল, কেন ?

জী বলিল, ওরা খুব গরীব। বৃন্দাবন বসাকের অনেক
কটা ছেলেমেয়ে। মেয়েকে গিয়েই ওই সব ধকল সহিতে
হবে। তাছাড়া ও ছেলে যা আয় করবে সব ওই ভাই-
এর সংসারেই ঢালতে হবে। বাড়ি ঘরও ভালো নয়।
টিনের চালা। দু খানা মাত্র ঘর। ওদের চেয়ে কার্তিক
দের অবস্থা অনেক ভালো। সব ভাই এক সংসারে।

বাড়ি ঘরও ভালো। কার্তিকও ছেলে হিসাবে ভালো। মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে তো। যাতে দুটো খেয়ে পরে থাকতে পারে।

হরিহর বসাক বলিল, কুস্তিবাসও ছেলে হিসেবে মন্দ নয়। অবস্থা অবস্থা তেমন নয়। কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভালো। মান সম্মান অনেক বেশি। শহরের মানুষ ওই একরকম ছেলেকে একডাকে চেনে।

হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিল, মান সম্মান, নাম ডাক খুঁজে কি মানুষ জল খাবে? ওসব দিয়েতো সংসার বাঁচান যাবে না। মেয়ে যাতে সুখী হয় তাই দেখতে হবে। আমারতো ও ছেলে পছন্দ নয়। কার্তিক অনেক ভালো ছেলে।

হরিহর বসাক বলিল, ভেবেচিন্তে দেখ। কেউ বললেই তো বিয়ে হয়ে গেল না। বিয়ে বলে কথা। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। সব দিক ভেবে চিন্তে দেখ।

শেষে হরিহর বসাক বলিল, মেয়েকেও শুধোও। তার মত জান। আজকালকার দিন। তখন আবার বলবে, বাবা মা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিল।

বসুমতীর মন যেন এই ক্ষণটির জুই প্রস্তুত হইতেছিল। এই ক্ষণ, এই সুর্যোগটাই সে প্রত্যাশা করিতেছিল। তাহার মা কিছু বলিবার আগেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ও বাড়িতে আমি যাব না।

হরিহর বসাক ও তাহার স্ত্রী মেয়ের এই আকস্মিক প্রগলভতায় চমকাইয়া-উঠিল। কিন্তু কোন বাড়ি তাহা তাহারা ঠিক বুঝিল না।

হরিহর বসাক বলিল, কোন বাড়ি?

বসুমতী যেন ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া গেল। বাবার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ আর সে ঘরের বাহিরে আসিল না। ঘরের ভিতর বসিয়া সে লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। বসুমতী কোন বাড়ি বলিল না। কিন্তু যাহা বলিল, তাহাতে হরিহর বসাক বুঝিল, মেয়ের কোথাও অমত আছে। হরিহর বসাকের এই

কন্যা বসুমতীর প্রতি গভীর আস্থা। বসুমতী বড় শাস্ত ভালো, বুদ্ধিমতী। সে বিচার বিবেচনা করিয়া কথা বলে, কাজ করে। সেই বসুমতী আপত্তি জানাইয়াছে। হরিহর বসাকের নিকট ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

হরিহর বসাক স্ত্রীকে বলিল, মেয়ে কার কথা বলল? স্ত্রী বিরক্ত স্বরে বলিল, কি করে বলব? ওর মনের খবর কি করে জানব?

হরিহর বসাক বলিল, খোঁজ নাও! ওর মনটাও জানা দরকার।

হরিহর বসাকের স্ত্রী কথার মনের খবর জানিয়া আরও বিরক্ত হইলেন। বারংবার জিজ্ঞাসা করায় বসুমতী বলিল, প্রামাণিক বাড়ি যাব না।

কেন?

কার্তিকদাকে বিয়ে করব না।

কেন?

বসুমতী সে কথার জবাব দিল না। সে আর মুখ খুলিল না। স্বল্পভাষিনী মেয়ে মুখে এই সামান্য যাহা বলিয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

হরিহর বসাক শুনিল। শুনিয়া বুঝি খুশী হইল। বলিল, সেই জনোই তখন বললাম, মেয়ের মত নাও। আমাদের কালতো নয়। তাছাড়া মেয়েকে তো জান। পড়াতে পারলাম না তাই। পড়ালে খুব ভালো মেয়ে হোত। পাড়ার আর পাঁচটা মেয়েকে দেখ আর ওকে দেখ। তারাই হইল কতো কি করে বেড়াচ্ছে। ওরই বন্ধুরা কি-না করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তোমার মেয়ে। একেবারে অন্য রকম। বাড়ির কাজ কর্ম আর বই পেলে হয়। ওর মনটাই অন্যরকম। গয়না শাড়ী কোনদিন মুখ ফুটে চাইল? যা দেবা তাই। ওর ভাবই আলাদা। আমার তাই মনে হয়েছিল, কার্তিককে ওর ঠিক মনে ধরবে না। কুস্তিবাসকেই পছন্দ করবে।

হরিহর বসাকের স্ত্রী খুশী হইল না। স্বামীকে বলিল, যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে।

হরিহর বসাক আমুদে মানুষ। সে হাসিয়া বলিল, সেইতো ভালো গো। মেয়ে বাপের মতো হলে সে মেয়ের কপালে খুব সুখ আছে। স্বল্পক্ষণা মেয়ে।

কৃতিবাস গরীব হতে পারে কিন্তু তার মান কতো। সারা শহরের মানুষ তাকে ভালোবাসে। - মান সম্মানটা কি কম জিনিস। টাকার চেয়ে দামী। টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না।

হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিল, মান সম্মান ভাঙ্গিয়েও টাকা পাওয়া যায় না। মান সম্মান খেয়ে পেট ভরে না।

অতঃপর কয়দিন ধরিয়া স্বামীস্ত্রীতে তর্ক বিতর্ক চলিবার পর কৃতিবাসকে কন্যাদান করাই সাবাস্ত হইল।

হরিহর বসাক তাহাদের সম্মতির কথা কৃতিবাসের দাদা বৃন্দাবন বসাককে জানাইয়া বলিল, বিয়ে কিন্তু এখনই দিতে পারব না। সময় দিতে হবে।

বৃন্দাবন বলিল, কেন?

হরিহর বসাক বলিল, জোগাড় করতে হবে তো। শত হলেও মেয়ের বিয়ে। মেয়েকে খালি হাতে পার করা যায় না। একবছর পরে বিয়ে হবে।

বৃন্দাবন বলিল, বড় দেবী হচ্ছে।

হরিহর বসাক বলিল, এমন আর কি দেবী। একটা বছর দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে। ছেলে মেয়ে কেউই এমন কিছু বড় নয়। বয়স কারো পার হয়ে যাচ্ছে না।

অতএব তাহাই ঠিক হইল। কৃতিবাসের সহিত বসুমতীর একবৎসর পরে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইবে।

সংবাদটি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না।

সংবাদ শুনিয়া কার্তিক প্রামানিকের মা প্রতিক্রিয়ায় ভরিয়া উঠিল। নানা রূপ বিরূপ মন্তব্যে পাড়া মাতাইয়া তুলিল। আক্রোশ বসে গাল মন্দ অভিশাপও দিতে লাগিল। হরিহর বসাকের স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে হরিহর বসাকের স্ত্রী খুবই বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহার মতের বিরুদ্ধেই স্বামী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে বসুমতীর মন আনন্দে ভরিয়া গেল। এক বৎসর পরে কৃতিবাসের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। এই একবৎসর যেন তাহাকে প্রস্তুত হইবার জন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে। কৃতিবাসের যোগ্য হইয়া উঠিতে হইবে। তাহারই প্রস্তুতি কাল।

বসুমতী সেই প্রস্তুতির জন্তই যেন এখন হইতে আত্ম নিয়োগ করিল।

কৃতিবাস বসাকের কানে এই সংবাদ পৌঁছাইলে তাহারও কেমন ভাবান্তর হইল। হরিহর বসাকের মেয়ে বসুমতীকে সে দেখিয়াছে। বনিষ্ঠতা নাই, এমন কি মুখের পরিচয়ও ঠিক মত নাই। শুধুই দেখিয়াছে।

কৃতিবাস ভিন্ন প্রকৃতির যুবক। সে সাধারণ নহে। সে ভাবুক, আদর্শবাদী। তাহার দৃষ্টিতে ও চিন্তায় এ পর্যন্ত কোন বিশেষ পুরুষ বা নারী ঠাই পায় নাই। সে মানুষের সুখ দুঃখ লইয়া চিন্তা করে, সে মানব সমাজ ও সভ্যতার কথা ভাবিয়া থাকে।

কৃতিবাসের চিন্তায় মনুষ্যত্ব, বিবেক, উদার্য, আত্মাহু-সন্ধান ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান জুড়িয়া থাকে। সে পাড়ার আর পাঁচটি যুবকের মতো পাড়ার স্তম্ভ কিশোরী বা তরুণীদের জীবন চর্চা করিয়া সময় কাটায় না। শহরের শিক্ষিত সমাজে তাহার ঠাই। কাজেই হরিহর বসাকের কন্যা বসুমতীর বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবার অবকাশ সে পায় নাই। এখন বিবাহের কথা হওয়ায় তাহার চিন্তার মোড় ফিরিল। সে হরিহর বসাকের কন্যা বসুমতীকে ভালো করিয়া দেখিল। তাহার পর বসুমতী বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিতে শুরু করিল।

অন্যদিকে কার্তিক প্রামানিক মনে মনে ভীষণ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইল। তাহার মা হরিহর বসাকের কাছে বসুমতীকে বধূরূপে বরণ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিল। কার্তিকের মা সে প্রস্তাব অকারণে দেয় নাই। মার সেই প্রস্তাব স্বয়ং কার্তিকেরই প্রস্তাব।

কার্তিক প্রামানিক অনেকদিন ধরিয়াই বসুমতীকে ফুর্ক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। বসুমতী যখন শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পন করিল, ফ্রক পরা বেমানান লাগিল এবং ফ্রক ছাড়িয়া বসুমতী শাড়ী ধরিল, তখনই তাহার প্রতি কার্তিকের নজর পড়িয়াছিল। তখন হইতে কার্তিক যতই বসুমতীকে দেখিতে লাগিল ততই তাহার কামনা তীব্র হইয়া উঠিল। বসুমতী ক্রমেই যেন শতদল পদ্মের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য পাপড়ি খুলিয়া পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার সেই রূপ

দেখিয়া কীর্তিক বিমোহিত, উন্মত্তবৎ। শেষে মাকে বলিয়া হরিহর বসাকের জীর নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, হরিহর বসাক এক কথায় রাজী হইবে। কারণ কীর্তিক রূপবান, স্বাস্থ্যবান যুবক। পারিবারিক অবস্থাও ভালো। তাহার মতো পাত্র পাইলে হরিহর বসাক ধন্য হইবে।

কীর্তিক ঘুগাঙ্গরেও তাবে নাই কুন্তিবাস তাহার প্রতিদ্বন্দী হইবে। এবং হরিহর বসাক তাহাকে ফেলিয়া কুন্তিবাসকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইবে।

কুন্তিবাসের দাদা বৃন্দাবন বসাক এই বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে সে কথা কীর্তিকের অজানা। কীর্তিকের ধারণা হইল কুন্তিবাসই তাহার উপর টেকা মারিয়াছে। তাই কুন্তিবাসের উপরেই তাহার সব আক্রোশ গিয়া পড়িল।

কুন্তিবাসের প্রতি কীর্তিকের আক্রোশ বরাবর। অন্ততঃ যেদিন হইতে তাহারা একই মালিকের অধীনে পাশাপাশি বসিয়া তাঁত বুনিতে লাগিয়াছে।

মালিক মদন খাঁর ছোট কারখানায় পাশাপাশি বসিয়া কুন্তিবাস ও কীর্তিক তাঁত বোনে। কয় বৎসর হইল তাহারা এইখানে একসঙ্গে কাজ করিতেছে। কীর্তিক পূর্ব হইতেই এইখানে ছিল। কুন্তিবাস পরে আসিয়াছে। কুন্তিবাস আসিবার পর হইতে কীর্তিকের মন খারাপ। কীর্তিকের স্বাস্থ্য ভালো এবং এই তাঁতের কাজ ছাড়া জগৎ সংসারে তাহার অন্য কোন কর্ম নাই। কিন্তু কুন্তিবাস অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহী এবং সাহিত্যচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে মগ্ন থাকায় এই তাঁতের কাজ বিষয়ে কিছু পরিমাণ উদাসীন, আপাতঃ দৃষ্টিতে অলস। তাই কীর্তিক তাহার গায়ের জোরে কুন্তিবাস অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ ঘুঝিতে পারে। কীর্তিক যে কাপড় এক দিনে বুনিয়া শেষ করে, কুন্তিবাসের তাহা দেড় দিন লাগে। ফলে কীর্তিক খুশী। সে কুন্তিবাস অপেক্ষা অনেক বেশি আয় করিয়া ফেলে।

কিন্তু কিছু দিনের ভিতরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল। কুন্তিবাস বেশী বুনিতে পারে না সত্য। কিন্তু যেটুকু বোনে তাহা বড় নিখুঁত হয়। তাহার শিল্পী মন

যেন তাহার হাতের সহিত সমান তালে কাজ করিয়া যায়। তাই কীর্তিকের বোনা কাপড় অপেক্ষা কুন্তিবাসের বোনা কাপড় সরেস বলিয়া প্রমাণিত হয়। খরিদারের নজর ধরিয়া যায়। আগে বিক্রয় হইয়া যায়, মূল্যও বেশি মেলে।

মালিক মদন খাঁ ইহাতে তুষ্ট হইয়া কুন্তিবাসের কাজের মজুরী কিছু বাড়াইয়া দিল।

কীর্তিক তখন হইতেই কুন্তিবাসের প্রতি বিরূপ হইল। একই সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া কাজ করিয়া কুন্তিবাস তাহার অপেক্ষা অধিক মজুরী পাইবে, কুন্তিবাস কম কাপড় বুনিয়া প্রায় তাহার সমান মজুরী লুটিবে, কীর্তিক ইহা কিরূপে সহ করিবে?

কুন্তিবাস তাহারই মতো শ্রমিক, তাহারই মতো সাধারণ, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র, তাহারই পাশে বসিয়া কাজ করে, সেই কুন্তিবাস শহরের ভদ্রলোকদের কাছে সমাদর লাভ করে, তাহার লেখা বই যাত্রা হয়, থিয়েটার হয়, তাহার লেখা পত্র ছাপা হয়, তাহার নাম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া ঝলমল করে।

কীর্তিক এতাবড় অত্যাচার কিরূপে সহ করিবে?

কোথাও সন্তা হইলে কুন্তিবাসের ডাক পড়ে, ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র আসে। সেদিন বিকাল বেলায় কুন্তিবাস তাঁত ফেলিয়া চলিয়া যায়। সাজ গোজ করিয়া সন্ধ্যায় যোগ দিতে যায়। কুন্তিবাস ম্যাট্রিক পাশ করে নাই। কিন্তু হাই স্কুলের মাষ্টার মশাইরা তাহাকে খাতির করে। ছাত্ররা দাদা বলিতে অজ্ঞান। এমনকি কলেজের ছাত্ররা পর্যন্ত এই কারখানায় আসিয়া তাঁত গেঁড়ের পাশে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়ে। কুন্তিবাসের সহিত খাতির করিয়া কথা বলে। তাহার লেখার খাতা খুলিয়া লেখা পড়ে। তাহার পর তাহার লেখা পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য লইয়া যায়। তাহার সহিত কিসব বিষয় লইয়া আলোচনা করে, কীর্তিক তাহা বুঝিতে পারে না। কুন্তিবাস কাজ ছাড়িয়া তাহাদের কি সব বুঝাইতে থাকে। সেই সব কলেজের ছাত্ররা হা করিয়া শোনে, তাহার পর খুব খুশীতে ভরিয়া উঠে। কুন্তিবাসকে নিমন্ত্রণ করে, তাহাদের সংগে যাইতে বলে

আলোচনা করিবার জন্য। তাহার পর বলে, আপনি আমাদের মধ্যে আছেন।

তাহার পর তাহার কৃতিবাসকে সরু মোটা নানা আকারের বই পড়িবার জন্য দিয়া যায়।

কাঁতিকের তখন কাজ বন্ধ হইয়া যায়। সে ফাল ফাল করিয়া তাকাইয়া সব কিছু দেখিতে থাকে। তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না। ইহাতে তাহার মনে ক্ষোভ জমে। সে তখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাও পারে না। তখন বসিয়া বিড়ি ধরাইয়া টানিতে থাকে।

একদিন একদল কলেজ-ছাত্রী আসিয়া কারখানা ঘিরিয়া ফেলিল। কাঁতিক কলেজের ছাত্রী দেখিয়াছে। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের ভিতর কিছু পরিচিত মেয়েও ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অতোগুলি কলেজের ছাত্রী এই কারখানায় আসিয়া ভীড় করা স্বাভাবিক ঘটনা। কাঁতিকের মনে হইতে লাগিল, একদল রূপসী প্রজাপতিতে কারখানা ঘর ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর মনে হইল সে বুঝি সিনেমা দেখিতেছে। তাহার পর আরও যে সকল কথা তাহার মনে জাগিতে থাকিল তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

কাঁতিক খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। বিড়ি ধরাইতে গিয়া থামিয়া গেল। বিড়ি ধরাইতে পারিল না। মনে বাধিল। দেহমনে এক আশ্চর্য শিহরণ জাগিল। কাঁতিক তাকাইয়া দেখিল কৃতিবাস আগের মতোই স্থির ও সহজভাবে বসিয়া আছে। কলেজ-ছাত্রীদের সহিত কথা বলিতেছে।

কলেজছাত্রীরা কৃতিবাসকে প্রায় ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কেহ কেহ তাহার পাশে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসিয়া পড়িয়াছে।

কলেজছাত্রীরা অভিনয় করিবে। সেজন্য যুগপো-যোগী নূতন নাটক চাই। বাস্তব সংসারের স্তব্ধ দুঃখের কথা চাই মাটির মানুষের জীবন কথা চাই।

কৃতিবাসের যে নাটক কিছুকাল আগে শহরে মঞ্চস্থ হইয়াছিল, তাহা সর্বজন প্রশংসিত হইয়াছে। শহরের শিক্ষিত রসিক সমাজ সেই নাটকের ভিতর নূতন নাট্য

প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছে। সেই নাটকে যে ঘটনা ও বক্তব্য পরিবেশিত হইয়াছিল তাহাতে নাট্যকারের সুস্পষ্ট জীবন বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরাও তাই এই নাটকের জন্য নাট্যকারের প্রতি আকৃষ্ট। নূতন প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার হইবার সম্ভাবনা যুক্ত বলিয়া তাহার এক বাক্যে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ছাত্রীরা এমন করিয়া কৃতিবাসের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তাহাদের দাবী, আবদার, অনুরোধ, কৃতিদা, নাটক চাই। আমরা মেয়েরা অভিনয় করব, আমাদের জন্য নাটক লিখে দিতে হবে, নতুন নাটক, খুব ভালো নাটক। হ্যাঁ, লিখে দিতেই হবে, আমরা শুনব না, কিছুতেই শুনব না।

কৃতিবাস তাঁতে বসিয়া, নরোদে হাত রাখিয়া হাসিতেছে। ওই সুসজ্জিতা রূপসী যুবতী মেয়েদের মধ্যে বসিয়া কৃতিবাস অতি সহজ ভাবে হাসিতেছে, কথা বলিতেছে, তাহার মতামত জানাইতেছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চলিল।

শেষে কৃতিবাসের হাত ধরিয়া, কেহ তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিয়া, হৈ চৈ কলরবে এক সপ্তে বলিতে লাগিল, হ্যাঁ, আপনাকে লিখে দিতেই হবে। একশ বার লিখে দিতে হবে। আমাদের হুকুম। হ্যাঁ আমাদের হুকুম।

কাঁতিক পাশে বসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতভয় প্রায়।

একসময় মেয়েরা চলিয়া গেল। সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণ প্রাচুর্য কারখানায় হইতে নিষ্কাশিত হইলে পরিবেশ যেন শুদ্ধ হইল। অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তাহারপর একসময় পুনরায় তাঁত চালাইবার ঠকঠক ঠক ঠক আওয়াজ উঠিতে লাগিল।

কাজ আরম্ভ হইল। আবার সব কিছু স্বাভাবিক হইয়া আসিল। কিন্তু বাহিরে স্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটিলেও কাঁতিকের মনে তখনও জটিলতার জট। সে ওই বিগত ক্ষণের পরিবেশকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে অনেক কথা, অনেক চিন্তা ভীড় করিয়া আসিতেছে। তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে

পারিল না। সে ওই সকল মেয়েদের সম্পর্কে কুন্তিবাসের নিকট কয়েকটি আপত্তিকর ইঙ্গিতময় মন্তব্য করিয়া রসিকতা করিল।

কুন্তিবাস গভীর হইল। কুন্তিবাসের প্রকৃতি শান্ত। উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে না। তাই সে ধীর শান্ত ভাবেই বলিল, যদি ওদের মধ্যে তোমার আমার বোন থাকত?

কার্তিক একবার চমকাইল। - পরক্ষণে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল, সে অশ্রু কথা। ওর মধ্যে বোন তো ছিল না।

কুন্তিবাস বলিল, সব এই শহরের মেয়ে। আমাদের পরিচিতদেরই মেয়ে, বোন। আমাদের শহরের মেয়ে। বোন ছাড়া আর কি? আমাদের বিশ্বাস করে, খাতির করে। আমরা যদি তাদের মর্যাদা না দিই, তাদের ইজ্জত রক্ষা না করি তবেতো সমাজই থাকবে না।

কুন্তিবাসের এইসব কথা বুঝিবার মতো কার্তিকের মনের প্রস্তুতি নাই। সে বুঝিল না, মানিল না। কিন্তু কুন্তিবাসের গাভীর, কণ্ঠস্বর তাহার বাচালতাকে প্রতিহত করিল। সে চুপ করিয়া গেল।

এবং সে ক্রমেই কুন্তিবাসের প্রতি বিদ্বেষে আক্রোশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুন্তিবাসের এই সৌভাগ্যকে সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এই সৌভাগ্য লাভের জন্ত কুন্তিবাসকে যে মূল্য দিতে হয়, যে সাধনা করিতে হয়, তাহা বুঝিবার শক্তি কার্তিকের নাই, সে তাহা বোঝে না। সে কুন্তিবাসকে তাহার মতোই শ্রমজীবী ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। তাই আক্রোশে তাহার মন পূর্ণ হইয়া ওঠে।

কার্তিকের আক্রোশ হয়তো অঘটন ঘটাইতো। কিন্তু কুন্তিবাসের জন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই।

কুন্তিবাস অতি সহজ মানুষ। সে তাহার এই সৌভাগ্যের জন্ত কোনরূপ অস্বাভাবিক আচরণ করে না। বরং সে যেন এই বিষয়ে চরম উদাসীন, নির্বিকার। সে সহজ, স্বাভাবিক, সাধারণ সন্দেহ। কার্তিককে সে বন্ধুর মতো দেখে। কার্তিককে তাহার প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদা দিয়া থাকে। সাধারণ শ্রমজীবীর মতোই

তাহাদের জীবনের সুখদুঃখের গ্লান করে। কুন্তিবাস তাহার স্বভাব প্রতিভার দ্বারা যেন কার্তিককে বশ করিয়া রাখে। কার্তিক তাই মনে মনে তাহার আক্রোশকে পোষণ করে।

কিন্তু বসুমতীর সহিত কুন্তিবাসের বিবাহ স্থির হইবার কথা প্রকাশ হওয়ার পর কার্তিক আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। তাহার স্পষ্ট ধারণা হইল, কুন্তিবাস গোপনে বসুমতীকে ভালোইয়া লইয়াছে। তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে।

কার্তিক একদিন এই লইয়া কুন্তিবাসের সহিত তুমুল ঝগড়া করিল। কুন্তিবাসকে চূড়ান্ত অপমান করিল। তাহার পর তাহার সহিত বাকলাপ বন্ধ করিয়া দিল।

কার্তিক বলিল, তুমি ভণ্ড। সাধু সেজে থাকলেই সাধু হওয়া যায় না। শয়তানি ঠিক ধরা পড়ে।

কুন্তিবাস বলিল, কি রকম?

কার্তিক বলিল, হরিহর বসাকের মেয়েকে বিয়ে করার জন্তে তুমি আমার নামে ভাঙচি দাঁও নি?

কুন্তিবাস বলিল, ভাঙচি? - বিয়ের জন্তে?

কার্তিক বলিল, ন্যাকামি কোর না। আমি সব জানি। সব খবর পেয়েছি। তুমি শয়তান।

কুন্তিবাস বেচারী! কার্তিকের কথার প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল, আমি তো বিয়ে করে ফেলিনি। তুমি দেখ না। যদি সম্ভব হয় তুমি বিয়ে কর। আমি খুশীই হবো। আমি তো সে মেয়েকে ভালো করে চিনিই না। তুমি তো সবই জান।

কুন্তিবাস প্রতিবাদ করিল বটে। কিন্তু মরমে মরিয়া গেল। কী লজ্জার কথা। তাহার রুচিতে আঘাত লাগিল। একটি মেয়ে লইয়া এইরূপ ক্রোন্দল। পরিচিত জনেরা কি বলিবে। তাহার সম্পর্কে কি ভাবিবে! ছিঃ ছিঃ।

কুন্তিবাস বাড়ি ফিরিয়া দাদাকে বলিল, ওসব বিয়ের কথা বন্ধ কর। ও মেয়ের সঙ্গে আগেই কার্তিকের বিয়ের কথা হয়েছে। ও মেয়েকে বিয়ে করা যায় না।

কুন্তিবাসের এই বক্তব্য হরিহর বসাকের কানে পৌছাইল।

তাহার পর উভয় পক্ষের মতামত বিনিময়ের ভিতর দিয়া কুন্তিবাস জানিল, কার্তিকে বিবাহ করিতে স্বয়ং কন্যার অনিচ্ছা। অভিভাবকেরা কার্তিকেই পছন্দ করিয়াছিল। কিন্তু কত্য়া আপত্তি জানাইয়াছে। সে কুন্তিবাসকেই বিবাহ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছে। তাই কত্য়ার ইচ্ছাতেই অভিভাবকেরা কুন্তিবাসের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে।

এই সংবাদ কার্তিকের কানেও পৌছাইল। কার্তিক তখন পরাজয়ের জালায় বসুমতীর সর্বনাশ কামনা করিতে লাগিল। আর কুন্তিবাস এই সংবাদ শুনিয়া এক নূতন জগতে প্রবেশ করিল।

বলিতে গেলে কুন্তিবাসের মনে একটি বিশেষ নারীর সম্পর্কে চিন্তা এই প্রথম অঙ্কুরিত হইল। অর্থাৎ প্রেমের জন্ম হইল।

তাহার পর হইতে সেই অঙ্কুরিত স্বাভাবিক ভাবেই মহীরাহ হইবার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

কুন্তিবাস বসুমতীকে বিবাহ করিবে। বসুমতী কুন্তিবাসের জী হইবে। কুন্তিবাস বসুমতীর প্রিয় পতি-দেবতা হইবে।

কুন্তিবাস অপেক্ষা বসুমতীর মনেই এই চিন্তা প্রবল ভাবে কাজ করিতে লাগিল। সে কুন্তিবাসের স্বপ্নে বিভোর হইল। তাহার হৃদয় মন কুন্তিবাসময় হইয়া উঠিল।

সব কিছুই ঠিক ঠাক। হরিহর বসাকের কত্য়া বসুমতীর সহিত বৃন্দাবন বসাকের তাই কুন্তিবাসের বিবাহ হইবে।

(ক্রমশঃ)

অত্যাংসাহী

[বিখ্যাত রুশ লেখক এ. পি. শেখভের 'রেভিনিতিয়েল' গল্পের, অনুবাদ, মূল রুশ থেকে]

অনুবাদক—শ্রীরাইমোহন সামন্ত

জে. বি. একস্ রেলের ডিরেকটর আঙ্গ বিশ বৎসর ধরে লেখবার টেবিলের সামনে বসবার উত্তোগ করে, সবে দুদিন আগে সত্যই বসে পড়লেন। অর্ধজীবনের তীক্ষ্ণ অশোয়াস্তিকর রাশি রাশি চিন্তা মনোহর রূপ নিয়ে বস্তার তোড়ে বেরিয়ে এসে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল মগজের মধ্যে। সংখ্যায় ওরা বাড়তে বাড়তে ক্রমে একটা জমকাল ভাবনা দৌধের সৃষ্টি হ'ল। উনি টেবিলের সামনে বসলেন, হাতে নিলেন কলম এবং গ্রন্থকারের কণ্টকময় পথে সাহসে পা বাড়ালেন।

শান্ত সমুজ্জ্বল, তুষার সিঞ্চিত সকাল। কামরার ভেতর আরাম দায়ক উষ্ণতা। টেবিলে স্বল্প ধুমায়িত চায়ের কাপ। দরজায় করাঘাত নাই, নাই কোন চীৎকার এমন কি কথাবার্তার সাড়াশব্দও কোন শোনা যাচ্ছে না। লেখার পক্ষে এই রকম পরিবেশ সত্যই অনুকূল। হাতে কলম নাও আর আপনাকে উজাড় করে দাও।

লেখা শুরু করবার জন্তে ডিরেকটর বাহাজুরকে কোন চিন্তাই করতে হচ্ছে না। মাথার মধ্যে ও কাজ অনেক আগেই শুরু করা হয়েছে—শেষ করাও হয়েছে। এখন শুধু নিজের সঙ্গে একটু বোঝা পড়া আর মগজের থেকে সোজা কাগজে টুকে নেওয়াটুকু বাকী।

কপাল কুঁচকে ঠোটে ঠোটে চেপে নাক দিয়ে বেশ খানিক বাতাস টেনে নিলেন তিনি। তারপর শিরো-নামা লিখলেন, “মুদ্রায়ন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।” ডিরেকটর সাহেব মুদ্রায়ন্ত্রকে বড় ভালবাসতেন তাঁর মন প্রাণ সংকল্প ওতেই উৎসর্গীকৃত। ওর প্রতি-রক্ষায় তাঁর আপন অন্তরের কথাগুলি বলা এবং সকলের শ্রবণযোগ্য করে, উচ্চকণ্ঠে বলাই তাঁর গত বিশ বৎসরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বপ্ন। নিজের পূর্ণ বিকাশের জন্ত শত্রু-পক্ষের দুর্ভিত্তিকি ফাঁস করে দেওয়ার জন্ত, বর্তমান চাকরিটার জন্ত, অনেককিছুর জন্তেই তিনি ওর কাছে ঋণী। এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে আপনার অন্তরের

কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে ওর কাছে। ** তা-ছাড়া দিনেকের জেহে হলেও লেখক হবার ইচ্ছাটাও অস্বীকার করা যায় না। যদিও লেখকদের গালি পাড়ে সবাই তবু সম্মানও করে বই কি কেউ কেউ! বিশেষ মেয়েরা—তাই না?

শিরোনামটা লিখে ডিরেকটর নাক দিয়ে গভীর এক নিখাস ছাড়লেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যে লাইন চোদ লিখে ফেললেন অবিরল ধারায় অনায়াসে বেরিয়ে এলো ওরা। তিনি মুদ্রণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রথম লিখতে শুরু করলেন এবং অর্ধ পৃষ্ঠ লিখে পরে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আরম্ভ করলেন। প্রতিবাদ, ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃতি, প্রবচন, তিরস্কার, বিদ্রূপ, কটাক্ষ বিনা প্রয়াসেই বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর চোখা কলমের মুখ থেকে।

“আমরা উদারপন্থী”—তিনি লিখে চলেছেন—“কথাটা শুনে আপনারা হাসছেন বুঝি—দন্ত বিকশিত করছেন যেন। আমরা কিন্তু এই বিশেষণে ভূষিত হতে বরাবর গর্ববোধ করে আসছি এবং করতে থাকবো।”

এমন সময় ভৃত্য জানিয়ে গেল, “খবরের কাগজ রেখে গেলুম।” দশটার সময় ডিরেক্টর সাহেব কাগজ পড়তে অভ্যস্ত। এই দিনও সেই অভ্যাসের ব্যতিক্রম করতে চাইলেন না তিনি। লেখা রেখে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি তারপর কোঁচে গা এলিয়ে দিয়ে কাগজ পড়তে লাগলেন। “নোভাইয়ে প্রিয়েমা” অর্থাৎ “নয়া জমানা” কাগজখানা হাতে নিয়ে একটা ঘণার হাসি হাসলেন। সম্পাদকীয়টাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পড়েই কাগজ খানা ছুঁড়ে ফেললেন। “ক্রাস্ দিমিট্রোণ, তোমার উচিং জবাব আমি দেবো”—হল তাঁর মন্তব্য।

“নয়া জমানা” চেয়ারে ছুঁড়ে রেখে ডিরেকটর তুলে

নিলেন “গোলস” বা আওয়াজ। তাঁর চোখে খেলে গেল খুসির আলোক, গণ্ডে দেখা দিল আনন্দের রক্তিম আভা। “গোলস” তাঁর প্রিয় কাগজ একসময়ে তিনি নিজের ওতে লিখতেন।

সম্পাদকীয়টা আগাগোড়া পড়লেন তিনি। তার পর খুচরে খবর, পাতার নীচে পৃথক করে ছাপা নানা প্রকারের সাহিত্যকর্ম (ফাইয়েত্তো) তাতেও চোখ বুলাতে ভুললেন না তিনি। যতই পড়তে লাগলেন ততই চোখ দুটো স্নিগ্ধতায় ভরে উঠতে লাগল তাঁর। “সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যে” বিভাগটাও পড়ে শেষ করলেন। তারপর তৃতীয় পাতা উলটিয়ে তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলেন। “ঠিক তাই বটে আমিও একবার ঐ কথাই লিখেছিলুম; একেবারে ঠিক কথা। হুন্ এটা আবার কি?” ডিরেক্টর ক্ষুব্ধিত করলেন। “জে. বি. এক্স. রেল”, তিনি পড়ে চললেন, “কিছু দিনের মধ্যেই একটা অভ্যন্ত অভূত পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করা হচ্ছে। ...এই পরিকল্পনার রচয়িতা হচ্ছেন বর্তমান ডিরেকটর স্বয়ং যিনি আগে ছিলেন...”

“গোলস” পড়ার অর্ধ ঘণ্টা পরে ডিরেকটর আবার তাঁর লেখার টেবিলে ফিরে গিয়ে লিখতে শুরু করলেন। রক্তবর্ণ তাঁর মুখের চেহারা, ঘর্মাক্ত তাঁর দেহ, কম্পমান তাঁর শরীর। তিনি লিখলেন, “রেল কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ।” এই নির্দেশে তিনি কোন কোন খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র থেকে অংশ উদ্ধার করা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

ক্রুদ্ধ ডিরেকটরের পাশে পড়ে ছিল এক গোছা কাগজ। আধ-ঘণ্টা পূর্বে এই কাগজের গোছার বুকে বিধৃত ছিল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

Sic transit gloria mundi

পার্থিব যশ এই রকম করেই অন্তিমিত হয়।



প্ল্যাট ফরম

ভবঘুরে

যেন রক্তের বালিশে মাথা রেখে লোকটা পড়েছিল।

কে একজন বলল, মরে গেল নাকি?

ভান, ভান।—আমার পরিচিতি বন্ধুটি বললো, শ্রেফ ভান ক'রে পড়ে আছে।

হু'হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ছুঁড়িটা এতক্ষণ বসে ছিল। লজ্জা অপমান এড়াবার জন্তে নয়, শীতের প্রকোপ দূর করার জন্তেই এইভাবে বসেছে সে।

রাতের শেষ ট্রেন আসতে এখনো কিছুটা দেয়ী। যে-ক'জন প্যাসেঞ্জার টেনের অপেক্ষায় এদিক ওদিক বসেছিল, তারা একে একে এই ছুঁড়ি প্রাণীকে কেন্দ্র ক'রে ভিড় জমিয়েছে। ব্যাপারটা রসোস্তীর্ণ ও বটে!

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, মেয়েটির প্রতি উনি যথেষ্ট সনোযোগী। এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন। কী দেখছেন অমন ক'রে জানি না। লেখক মানুষ কোন গল্পের সন্ধান করছেন কিনা তাই বা কে জানে।

ছুঁড়িটাকে এই স্টেশন প্ল্যাটফরমে আজ নতুন দেখছি না। বাংলাদেশের পরাধীনতার সংগ্রামের সময় দলে দলে যারা এদেশে এসেছিল, এ তাদেরই একজন। আমাদেরই চোখের ওপর ও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি প'রেছে। স্বদেশ-বিদেশ ওর কাছে বোধ হয় সমান বস্তু, তাই আর স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি ওকে আকর্ষণ করে নি। এখানেই থেকে গেছে।

স্টেশন প্ল্যাটফরমে যারা জীবন কাটায়, তাদের আবার চরিত্র কী? একদিন দেখলাম, মেয়েটি মা হয়েছে। এবং কয়েক মাস ছেঁড়া নেকড়ার মধ্যে হাত পা ছুঁড়ে খেলা দেখিয়ে নবজাতক একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সেদিন প্রথম লোকাল ট্রেন থেকে নেমেই দেখলাম, মড়া ছেলের পাশে বসে ছুঁড়িটা কাঁদছে। ঠিক এমন ক'রে হু'হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নীরবে চোখের জল ফেলছে।

এর পর কয়েকদিন ওকে আর দেখা গেল না। বন্ধুটির ক্রাছে শুনলাম, রেলের কুলিরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফরমের পবিত্রতা রক্ষার জন্তে।

পবিত্রতা?—আমার মুখ কসূকে একটা আনুকা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ।—বন্ধু বললেন, ভদ্রলোকের চোখে ওর চলা-ফেরা খারাপ লাগত।

কিন্তু, এমন ইলেকট্রিকের আলো, কলের জল, মাথার ওপর নির্ভরযোগ্য আচ্ছাদন—এ ছেড়ে ছুঁড়িটা নিশ্চয় আর গাছের তলায় থাকতে চায় নি। তাই আবার ওকে যথাস্থানে দেখা গেল। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি নি, স্টেশনের পবিত্রতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার ও এখানে ঠাই পেয়েছে কি না। বোধ হয় সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা না হলে নোংরামি করার জন্তে ডেকে কেউ পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করতে চায় না। কিন্তু ওদের প্রতিশ্রুতিরও কোন দাম নেই। আবার অপবিত্র ক'রেছে স্টেশন প্ল্যাটফরম। আজ তার জন্তেই এই শাস্তি।

ওদিকের অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওদের হু'জনকে ধরেছে স্টেশনের কুলিরা। তারপর নিজেরাই শাস্তি বিধান ক'রেছে। হু'জনে খুব ঠেঙানি খেয়েছে।

স্টেশনে ঘণ্টা বাজল। ট্রেন আসছে তারই সংকেত।

ওদিকে ভ্যাগাররা ব্যস্ত হ'ল।

আমিও বন্ধুর পিঠে খোঁচা দিয়ে সচেতন করলাম। কিন্তু উনি টের পেলেন ব'লে মনে হ'ল না।

এতক্ষণে হু'হাটুর মধ্যে থেকে মুখ তুলল ছুঁড়িটা। বলল, এখনও চাইয়া-চাইয়া কী রূপ দেখতামেন? যা অয়নের তা'ত হইয়া গেছে। গাড়ি আইত্যাছে, আপনারা সইরা পড়েন। আমারে একটু একলা থাকতে দেন।

ভিড়ের মধ্যে কলগুজন উঠল মেয়েটির এই স্পর্ধার কথা শুনে। কে একজন বিস্তীর্ণ একটা শব্দ উচ্চারণ ক'রে ওকে মারতেও উত্তত হল। আর তাই দেখে যেন কথো দাঁড়াল মেয়েটি। বলল, আমার এ শরীরটা দিয়া পেটের ভাত যুগার করতে গেলে আপনোগো ঘিন্মা হয়। আবার ভিক্ষা চাইলে দূর-দূর কইরা

খাদ্যাদি দেন। আগার ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব লইয়া ছাখেন যে, আমি সতী থাকতে পারি কি না।

বন্ধু বললেন, চলুন ট্রেন এসে গেল।

অনুসরণ করলাম বন্ধুকে।

কানের কাছে মুখ এনে বন্ধু বললেন, ব্যাপারটা বুঝলেন?

না।

লেখকরা অনেক কিছুই বোঝেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সাধারণ মানুষ যা না দেখে, লেখকরা তার

মধ্যে অমূল্য সম্পদ প্রত্যক্ষ করে মানুষকে ডেকে বলেন, তুমি যা অবহেলা করে চলে যাচ্ছ, দেখ তার মধ্যে কী সম্পদ লুকানো আছে। কত আনন্দ তার মধ্যে বর্তমান। আমার বন্ধুটি সাধারণ মানুষ নন। সাধারণ মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে সত্যকে প্রত্যক্ষ করান। বললেন, প্রেম। বুঝলেন? ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রেম ঘটিত। ওই লোকটি ওর নতুন প্রেমিক।

সত্যি নাকি?

বন্ধু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

আত্মসমর্পণযোগে কর্ম ও কর্মী

শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস

আত্মসমর্পণযোগে কর্মসাধনায় সাধকের প্রথম প্রয়োজন সর্ব কর্মে এক সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের ভাব। ভগবানের নিকট বা ভাগবত শক্তির নিকট—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে, সর্বভূতের ও বিশ্বের সকল কর্মপ্রণালীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ক্রীড়ারত তার নিকট, যজ্ঞরূপে সকল কর্ম করতে হবে ঐ আত্মোৎসর্গের ভাব নিয়ে। এই ভাব প্রথমে হবে এক নিত্যজাগ্রত সঙ্কল্প। ধীরে ধীরে অভ্যাসযোগে এই সঙ্কল্প মজ্জাগত হয়ে উঠবে এবং সর্বশেষে পরিণত হবে স্বয়ংক্রিয় এক সচেতন অভ্যাসে। যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন শক্তি। যজ্ঞের বেদী হ'ল জীবন। এবং সাধকের সর্বকর্ম হ'ল উৎসর্গের নৈবেদ্য। এই যজ্ঞ, এই আত্মোৎসর্গের দুটো দিক। প্রথম হ'ল কর্ম। আর দ্বিতীয় হ'ল যে মনোভাব নিয়ে কর্ম করা হয়।

প্রথম অবস্থায় কর্ম স্থির করা হয় বিবেকের নির্দেশে।

মন যখন অজ্ঞানোচ্ছন্ন, তখন বিবেকই কর্মনির্দেশক। কিন্তু দীক্ষিত সাধকের নিকট গুরুনির্দেশই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। গুরু—যিনি শিষ্যের কাছে ভগবানের প্রতিভূ বা তাঁর জীবন্ত মানুষী বিগ্রহ। তাই গুরুবাণী—ব্রহ্মবাণী, গুরুনির্দেশই ব্রহ্মনির্দেশ।

এই কর্মের মধ্যে থাকা চাই কর্মযজ্ঞের সার কথা— তা হ'ল কর্মীর কর্মফলাকাজ্য ত্যাগ। যতদিন আমরা

ফলে আসক্তি নিয়ে কাজ করি, ততদিন যে কর্মযজ্ঞ নিবেদিত হয় তা ভগবানের কাছে নয়, তা হয় আমাদের 'অহং' এর কাছে। আমরা যদি অন্তরকম ভাবি তা হবে নিছক আত্মপ্রতারণা। নিজেকে নিজে আঁখি ঠেরে ফাঁকি দেওয়া। আমরা মনে করতে পারি যে আমরা আমাদের যথাকর্তব্য সম্পাদন করছি। অথবা মনে করতে পারি যে সর্বমানবের কল্যাণের জন্ম বা জগতের মঙ্গল সাধনের জন্ম কাজ করছি। অথবা আমরা ইহাও মনে করতে পারি যে আমরা শ্রীগুরুর আদেশ ও নির্দেশ পালন করে চলছি। কিন্তু আমরা মনে মনে জানি যে এসবই ফাঁকি। আমাদের প্রকৃতি থেকে কামনার মূলোচ্ছেদ করবার জন্ম আমাদের কাছে আত্মসমর্পণযোগের যে দাবী তা এড়ানর জন্ম বা চাপা দেবার জন্ম এগুলি মিথ্যা-যুক্তির আবরণ মাত্র।

যোগের এই অবস্থায়, এমনকি যোগের সর্বাবস্থায় যে শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে তা হল কামনার এইরূপ, অহঙ্কারের এই মূর্তি। আমরা যখন দেখতে পাই যে সে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করছে তখন আমাদের ঘাবড়ে গেলে চলবে না। আমাদের উচিত হবে তাকে তাঁর সকল মুখোসের মধ্যে সযত্নে খুঁজে বের করা, সকল ছদ্মবেশ ধরে ফেলা এবং কঠোরভাবে সত্যকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

নিম্নে তার প্রভাব দূর করা। এই অবস্থায় আমাদের পথ দেখাবে গীতার মহাবাণী “কর্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন”—শুধু কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু কোন অবস্থাতেই ফলে তোমার অধিকার নাই। কর্মফলের অধিকার একমাত্র কর্মের ঈশ্বরের। ফলের সাথে আমাদের সম্বন্ধ শুধু, সর্বপ্রযত্নে কর্মে সাফল্যের জন্য আমাদের সর্বশক্তি অকৃত্রিম নিষ্ঠায় প্রয়োগ করা এবং কর্ম সাফল্য যদি আসে তা কর্মের ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা। আর যদি সাফল্য না আসে, তাতেও সাধকের দুঃখিত হওয়ার বা নিরুৎসাহ হওয়ার কিছু নেই। তাকে শুধু দেখতে হবে যে আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত তার সর্বশক্তি সে নিঃশেষে প্রয়োগ করতে পেরেছে কিনা। কারণ কর্মে সফল হওয়া বা বিফল হওয়ানিয়ে অধ্যাত্ম-যোগীর কর্মের ফলাফলের বিচার চলে না। সে বিচার করতে হবে ঐ কাজ করার ফলে তার যে অধ্যাত্ম উন্নতি হওয়া উচিত সেটা হয়েছে কি না—বা কি পরিমাণে হয়েছে। সজ্জগুরু তাঁর ‘আত্মসমর্পণযোগ’ গ্রন্থে বলেছেন, “কর্মসিদ্ধিই এয়ুগে আসল কথা নয়। প্রাকৃত জীবন ছাড়াইয়া যোগী অপ্রাকৃত জীবনের কতটা আনন্দ পাইতেছে—তা’হাই আসল কথা”।

ইহার পরে প্রয়োজন ফলে আসক্তি ত্যাগের মতো কর্মেও আসক্তি ত্যাগ করা। কর্ম করতে করতে মনে কর্মের রঙ ধরে যেতে পারে। সাধকের অজ্ঞাতেই স্বভাবে কর্মসংস্কারি গড়ে উঠতে পারে। তখন কর্মই হয়ে ওঠে ইচ্ছা। গাড়ীতে জোতা ঘোড়ার নাড়ী টানতে টানতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মত, কর্ম করতে করতে দেহত্যাগ করা বা দেহত্যাগ করার মুহূর্তেও কর্ম করে যাওয়ার নেশাই সাধকের কাছে বড়

হয়ে ওঠে। যে উদ্দেশ্যে কর্মযোগ এবং তার ফলে যে অধ্যাত্ম উন্নতি হওয়ার কথা সে সব তখন সাধক ভুলে যায় বা ভুলে থাকতে চায়। তা ছাড়া কর্ম কর্ত্তে কর্ত্তে কর্মক্ষেত্র ও কর্ম পরিবেশের উপর যে কতৃৎ আসে তার মোহ যদি একবার সাধককে পেয়ে বসে তা’হলে সর্বনাশ। এই মোহদ্বন্দ্ব অবস্থা থেকে মুক্ত হ’তে না পারলে সাধকের উর্দ্ধগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হতে বাধ্য। এমনকি মূল সাধনা থেকে স্থলিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হ’লে আমাদের এমন প্রস্তুত হওয়া চাই যে পরমগুরুর সুস্পষ্ট আদেশ পেলে আমরা যেন যে কোন মুহূর্তে যে কোন কর্ম, যে কোন পথ, বা যে কোন কর্মক্ষেত্র, পরিবর্তন করে নিতে পারি অগ্ন্য কর্ম, অগ্ন্য পথ বা অগ্ন্য কর্মক্ষেত্র, অথবা পরিত্যাগ করতে পারি সকল কর্মই। তা না হ’লে আমাদের কাজ করা তাঁর জন্য হয় না। তা হয় কর্মে আমাদের তৃপ্তি ও সুখ আছে বলে, বা প্রকৃতির কর্মের প্রয়োজন বশে, অথবা আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্য। কিন্তু এ সবই ‘অহং’ এর খেলা। আমাদের সাধারণ জীবন যাত্রায় এগুলি যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, অধ্যাত্ম সাধনায় এদের ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

শেষ অবধি যেমন হৃদয় থেকে কর্মফলে ও কর্মে আসক্তি দূর করতে হবে, তেমনি দূর করতে হবে, আমরা কর্মের কর্ত্তা বলে আমাদের ভাবনা ও বোধে, আমাদের যে শেষ আসক্তি তখনও আঁকড়ে ধরে থাকে—তাকেও। আমাদের উর্দ্ধে ও অন্তরে জানতে হবে ও অনুভব করতে হবে যে, দিব্যশক্তিই প্রকৃত ও একমাত্র কর্মী।

প্রণাম

শ্রীমতী গীতা হাজরা

প্রভু তোমার চরণে আমার প্রণাম
চোখের জলেই লোটে।
জেনো এ পরাণ দিবারাতি
তোমার দুয়ারেই ছোটে।
ববু যদি হয়! ভুলে যাই স্বামী
ক্ষণেক লাগিয়া তব নামখানি

সে মোহ স্বপন যেন গো আমার
নিঠুর আঁঘাতেই টোটে।
ভুমি ভুল বুঝে করোনাগো রাগ
মোর বুক ভরে আছে তব অনুরাগ
সেই অনুরাগ প্রকাশের বাণী
কমলের মত ফোটে।

পরোয়ানা

শ্রীমতী হেমবরগী মুখোপাধ্যায়

স্বর্গপুরীর নরপতি সাথে
ভূতলে বণিক মিতালি যে পাতে
দৌহে মোলাকাং হয়েছে জগতে

কখন সখন মাঝে ।

একদা আসিল বণিক বাড়ীতে
ধরমের রাজা কুশল জানিতে
তত্ত্ব-তালাস পারেনিকো নিতে
ছিল রত নানা কাজে ॥

হেরিয়া হইল পুলকিত মন
এসো এসো বলি করি আলিঙ্গন
কহিল বণিক তোমার মতন
নাহি হয় ধরা মাঝে ।

বন্ধু বলিয়া করেছ গ্রহণ
আসিলে হেথায় দাঁও দরশন
তুমি মহারাজ আমি অভাজন
তুলনা নাহিক সাজে ॥

বাসনা আমার আছে একখানি
দেখিবারে চাই তব রাজধানী
শাস্ত্রে পড়িয়া সে সব বাখানি
বলিতে পারি না লাজে ।

শুনি হাসিমুখে কহে ধর্মরাজ,
চল মম সাথে নাহি কোন লাজ
দেখিবে সেথায় স্বরগের সাজ
লাগিবে তোমার কাজে ॥

রথোপরি দৌহে উঠিল বসিয়া
রহিল সারথি বল্গা ধরিয়া
দেবতার রথ শূন্যে উঠিয়া
ছুটিল বায়ুর বেগে ।

নিমেষের মাঝে রথ আসি থামে
পুত পবিত্র সে অমর ধামে
বণিকেরে নিয়া যমরাজ নেমে
চলিল প্রাসাদে আগে ॥

দূর হতে শুধু দেখিছে বণিক
স্বর্ণখচিত তোরণ খানিক
সূর্য্য কিরণে ঝলিছে মানিক
লক্ষ তারকা সম ।

দেখিতেছে কত পুষ্প চয়ন
আরো কত কিছু নয়ন লোভন
ভাবে গদ গদ হাশ্ব বদন
পর্য্যাপ্ত শীতলতম ॥

আকাশে বাতাসে বেহাগের সুর
নারীর চরণে বাজিছে নৃপুর
বাজায় বাদক বীণা সুমধুর
আরো বাজে কত শত ।

ধীরে বয়ে যায় নদী বৈতরণী
স্রচ্ছ সলিলা আর মন্দাকিনী
করিছে সিনান কত দেবযানী
কিন্নরী আছে কত ॥

কি আনন্দ হেথা একি হাসি খেলা
দেখেনি তো কভু এ চাঁদিনী মেলা
কেশে বনফুল, গলে ফুলমালা
ভ্রমিছে ভামিনী কত ।

রাজা প্রজা হেথা নাহি ব্যবধান
ধনী দরিদ্র সকলি সমান
পুণ্য করিলে পাইবেক স্থান
মর্ত্যবাসীরা যত ॥

এ অমরাবতী ভ্রমণের শেষে
সাথী লয়ে রাজা যায় অবশেষে
নরকে যেথায় পাপী তাপী এসে
করিছে প্রায়শ্চিত্ত ।

শোনে চারিভিতে হাহাকার ধ্বনি
শুধু আর্তনাদ বিলাপের বাণী
পাপীর অঙ্গে বেঁধে লোহাখানি
তপ্ত করিয়া নিত্য ॥

দৈত্যের মত যমদূত যত
 কশাঘাত হানি বলে অবিরত
 ধরাভূমে পাপ করিয়াছ যত
 রাখিও স্মরণ করি ।
 তপ্ত কটাহে কেহবা পুড়িছে
 কাহারো বক্ষে গরল ঢালিছে
 ক্ষমা করো বলি অঝোরে কাঁদিছে
 রাজপদ তলে পড়ি' ॥
 হেরিয়া বণিক শিহরি' উঠিল
 বন্ধুকে ডাকি কারণ শুধাল
 নিষ্ঠুর ষাঁতনা কেমনে পাইল
 ইহার তোমার কাছে ?
 স্মিতমুখে তাকে কহিলেন রাজা—
 নরাধম এরা তাই এত সাজা
 পরকে ঠকায়ে লভিয়াছে মজা
 ইহার জগৎ মাঝে ॥
 মরণের সাথে এনেছে বহিয়া
 করমের ফল নরক লাগিয়া
 অসাধু ব্যভার এসেছে করিয়া
 মানব জনম ধরি' ।
 ধরামাঝে যারা আছে পুণ্যবান
 তাহাদের লাগি' রহিয়াছে স্থান
 চির বসন্ত ভরা কলতান
 অমর স্বর্গপুরী ॥
 কাঁপে দুরু দুরু বণিক হৃদয়
 মরণের পরে কী না জানি হয়
 'যম যার মিতা কিসে তার ভয় ।'
 ভাবি মনে পায় শান্তি ।
 কহিছে রাজারে মিনতি করিয়া
 মোর মরণের কেতাব দেখিয়া ।
 পাঠিও খবর পরোয়ানা দিয়া
 সেরে লব ভুল ভ্রান্তি ॥
 শুনে হেসে রাজা 'আচ্ছা' কহিয়া
 রথে করি তারে দিল পাঠাইয়া
 দিবসের আলো রজনী আসিয়া
 ঢাকিল ধরণীতলে ।
 আঁধার রজনী পোহাল আবার
 দিবা নিশি হোল আরো কতবার
 গ্রীষ্মের পরে আসিল আষাঢ়
 নদী ভরা কূলে কূলে ॥

বহরের পর বছর কাটিল
 বণিকের গোলা ধানেতে ভরিল
 ধনে মানে জনে চাহিদা বাড়িল
 কিনিতেছে জমাজমি ।
 কতক নিয়াছে নীলাম করিয়া
 খাজনার দায়ে কুটির ভাঙ্গিয়া
 নিয়াছে কাহারো মামলা করিয়া
 কাহারো চাষের জমি ॥
 সোনাদানা নিয়ে বধু ঘরে আনে
 করে ধুমধাম নিতা নিমন্ত্রণে
 জিনিসে পত্রে উপঢৌকনে
 ঘর দোর পরিপূর্ণ ।
 জমিয়াছে আজ বহু টাকাকড়ি
 কিনিবারে চাহে বাণিজ্যের তরী
 নতুন করিয়া হবে কোঠাবাড়ী
 আরো হবে কত স্বর্ণ ॥
 সহসা একদা যমদূত আসি
 'চল' বলি গলে পরাইল রশি
 রাজার আদেশ পোহাবে না নিশি
 বিলম্বে রয়েছে মানা ।
 রাগিয়া বণিক কহিল তাহারে
 'আসিয়াছ তুমি লইবারে মোরে
 নাহি যাব আমি পাঠাও রাজারে
 কোথা মোর পরোয়ানা ?'
 জপি নি তো কভু হরেকৃষ্ণ নাম
 ভূমিনি তো আমি কোন তীর্থধাম
 কাঞ্চাল সেবিয়া দানশীল নাম
 বাকি আছে কাজ কত ।
 দূত মুখে শুনি বণিকের কথা
 যমরাজ নামি আসিলেন সেথা
 অবাঁক হাসিয়া কহিলেন : 'মিতা
 রয়েছে মূর্থ এত ?
 জননী বক্ষে অতি শিশু ছিলে
 বাল্যে কিশোরে সে সব ভুলিলে
 যৌবন যায় বহু আগে চলে
 দায়ী মোরে করিওনা ।
 পালনি তখন সত্যধর্ম
 মানুষের যাহা পুণ্যকর্ম
 হয়েছে আজিকে লোল চর্ম
 আরো চাহ পরোয়ানা ?'

২. বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

॥ ৭ ॥

কিরণেন্দু বাগ্‌চী



দল গড়া শুরু হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হতে লাগল অর্থের বিনিময়ে। অতৃপ্ত জীবন তাকে সর্বদাই পীড়া দিত। এর মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও যাওয়া-আসা শুরু হল। নরসিংহ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে অনেক জ্ঞান অর্জন করল বাসুদেব। কুলদেবতা শ্রীদত্তাকে সে সব সময় চোখের সামনে দেখত। আশীর্বাদ কামনা করত তাঁর।

একে একে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করল। কেবল ঐ একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তে, কতখানি ত্যাগ করলে দেশকে স্বাধীন করা যায়।

কে যেন সর্বদাই তার অন্তরে অনুপ্রেরণা জাগায়। উদ্দেশ্য হল ইংরেজদের দেশ থেকে দূর করে দিয়ে সাধারণতন্ত্র কায়েম করা।

একদিকে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন অশুদ্ধিকে শত্রুর সংহারচিন্তা। উন্মাদ হয়ে উঠল বাসুদেব। একটানা ন'টি বছর ধরে তার সাধনা চলল। 'সন্তান দল' গড়ল। এখন সে নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখেছে। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান সেনাদল তার নিজ হাতে গড়া। সকলেই প্রস্তুত অস্ত্র ও সংগ্রহ হয়েছে কিছু।

কত শক্তিশ্রম ফিরিঙ্গীরাজ তোমরা এখন তা টের পাবে। বাসুদেবই বুঝিয়ে দেবে, তোমাদের শক্তি, সন্তান সেনাবাহিনীর কাছে কিছুই না।

পবিত্র উন্মত্ততায় শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী তার ঝঙ্কত হতে লাগল। স্থির করে ফেলল আর ইংরেজ সরকারের

গোলামী নয়। গোলামী যদি করতেই হয়, হবে সে নিজের দেশের গোলাম, ভারতমাতার গোলামী করবে।

অল্প বয়সী স্ত্রী। মনের অভিপ্রায় সবই খুলে বলল তাকে। স্ত্রীর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করল।

শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে গোপন পরামর্শে বসে পড়ল।

কে কে বিদ্রোহের খাতায় নাম লেখাতে চাও? বল তোমরা কি চাও? আমরা কি ইংরেজের কুকুর হয়ে এমনিভাবে তাদের পা চাটব? তারা যা খুশী তাই করবে! অফিসের মাইনের টাকা দিয়েই তো কাজ শুরু করেছি। অস্ত্রশস্ত্র যা সংগ্রহ হয়েছে তা তোমরাই জোগাড় করে এনেছ। তোমাদের বহিন কেবল টাকা জুগিয়ে গেছেন।

স্ত্রীধন বলতে যা ছিল তাও পেল সহধর্মিনীর কাছ থেকে। স্বিধাহীন চিন্তে সবই সে দিয়ে দিয়েছে।

শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর কষ্টের দিন। সবই তো চলে যায় ওদিক সামলাতে! খাবে তারা কি? কুচ্ছ সাধন করে চলল উভয়ে। স্ত্রীর দিক থেকে নেই কোন অভিযোগ, হাসিমুখে সহ্য করছে সব কষ্ট।

একটা শুভলগ্ন দেখে এইবার তবে বেরিয়ে পড়া যাক, দলবল আর হাতিয়ার যা সংগ্রহ হয়েছে তাই নিয়েই, দেবী করলে চলবে না—এমনিতেই দেখতে দেখতে কটা বছর বেশ দেবী হয়ে গেছে।

দেশ স্বাধীন করতে হলে চাই বিরাট দৈন্তবাহিনী

তার সঙ্গে চাই প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, হুঁবেলা এদের আহারের সংস্থান। কোথায় সে টাকা? আছে একটা উপায়। করতে হবে ডাকাতি লুণ্ঠ-পট। প্রয়োজনে উপড়াতে হবে রেল লাইন, কাটতে হবে টেলিগ্রাফের তার—বন্ধ করতে হবে ডাক যোগাযোগ। আগে চাই টাকা। টাকা কাজে লাগাতে হবে। দলের সকলেরই একমত।

—তবে চল বেরিয়ে পড়া যাক।

পথে স্ত্রীজাতীর সংস্রব ভাগ্য করতে হবে, সন্তানদের দীক্ষার এটি একটি অঙ্গ।

বাসুদেব জীকে কাছে ডেকে বললে—আর নয়, অনেকদিন তো সংসার করলে, এইবার পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চলে যাও।

একি? তোমার চোখে জল? তুমি কীদছ? ছিঃ ছিঃ! মুছে ফেল! তুমি না ভারতের নারী? তোমার তো ভারতসাম্রাজ্যের কথা, কিছু অজানিত নয়। এতদিন আমার কাছে কি শিক্ষা লাভ করলে তবে? তোমার তো এ শোভা পায় না। তুমিই না আমাকে উৎসাহ দিয়েছ কত কাজে, কতদিন, অনাহারে অর্দ্ধাহারে, কতদিন তো হাসিমুখে কাটিয়ে দিয়েছ, মাইনের টাকা, তোমার গায়ের অলঙ্কার সবইতো নিঃশেষ করে দিয়েছ বিপ্লবের প্রস্তুতিতে নিজে হাতে, তবে কেন কীদছ? চোখের জল মুছে ফেল। কীদলে সন্তানদের যে অকলাগ হবে তা কি বোঝ না!

—এইতো চোখ মুছে কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমার মুখখানি! হরিণীর চোখ দুটো বড় বড় করে খুলে আমার চোখ দুটোর ওপর রাখো দেখি!

বাঃ কি চমৎকার লাগছে এখন তোমার হাসি হাসি মুখখানি। বলতো এ মুহূর্তটা কত সুন্দর!

আর দেবী নয়। গাড়ী অনেকক্ষণ যাবত দরজায় অপেক্ষা করছে। চল গিয়ে উঠে পড়।

কিছু ভেবো না। দেশ স্বাধীন হ'লে আবার দেখা হবে। কটা দিন মাত্র সবুজ কর। ইংরেজ কটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে আমরা আমাদের দেশকে বুঝে নেব। তখন কি মজা হবে বলতো? দেশে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। দেখবে তখন হায়দ্রা-

বাদের নিজাম আর আমার মধ্যে কোন তফাৎ নেই, থাকবে কেবল—সেও মানুষ আমিও মানুষ। তার যত-টুকু অধিকার আমারও ঠিক ততখানি অধিকার, একই রাস্তায় পাশাপাশি দুজনে হেটে যাব। ঝাড়ুদার রাম দেও আমার পাশে পাশে বুক ফুলিয়ে হাটছে। সব এক হয়ে গেছে। আরও দেখেব কারনালা ভূষামী অনন্ত রাওয়ের নাভবৌ আর রামদেওয়ের বৌএর মধ্যে নেই কোন তফাৎ।

বাঃ, তুমি হাসছ। এইতো তোমার মুখে হাসি ফুটেছে! হাসিরই কথা বটে। কিন্তু দেখবে, এখন যা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, দেশ স্বাধীন হলে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলা! আর দেবী কোর না, তাড়াতাড়ি উঠে পড় গাড়ীতে।

হ্যাঁ, আজ রাত্রিতেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি। অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছি।

স্ত্রী স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

—জয় শ্রীদত্ত। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

পুণার বাসাবাড়ী বন্ধ হ'ল।

সেই রাত্রিতেই সদলবলে বেরিয়ে পড়ল বাসুদেব খুব গোপনে। কড়ায় গন্ডায় শোধ তুলে নেবে এই অভি-প্রায়ে। অন্তর্জালায় সে দন্ধে মরছে। অকাল কোটের স্বামী মহারাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রা শুরু হল বাসুদেবের।

১৮৭৯-র ২৩শে ফেব্রুয়ারী ধামরি গ্রামের উপর 'সন্তান দল' প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুণ্ঠপট করে বেশ কিছু মূল্যবান গহনাপত্র আর অর্থ সংগ্রহ করে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল তারা। টাকা চাই প্রচুর! এতে কি হয়? ইংরেজ সৈন্তের সম্মুখীন হতে হলে, সেইরকম আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন। ক'টি মাত্র গাদা বন্দুকে কোন কাজ হবে না। যুদ্ধের জন্তে শিক্ষিত বুদ্ধিমান, সাহসী, দেশপ্রেমিক সন্তান সৈন্ত চাই হাজারে হাজারে। সময় লাগবে প্রচুর, তা না হলে ও জাতকে সায়েস্তা করা যাবে না। চারিদিকে দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলতে লাগল।

ডাকাতি চলতে থাকল একের পর এক। দাক্ষিণাত্যকেই প্রথম এরা বেছে নিল।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতেই বাসুদেব তার পূর্বের ভোল সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছে। এ চেহারা যেন এক নতুন ধরনের।

গৈরিক বসনে সজ্জিত সন্ন্যাসী। পায়ে কাষ্ঠ পাহুকা। হাতে কমণ্ডলু প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সিংহের কেশরের মত মাথায় একরাশ এল-মেল কেশদাম। গুশ্ফ-শাশ্ফ আবৃত মুখ মণ্ডল। গুল বাঘের দৃষ্টির মত তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি—যেন শিকারের সন্ধানে।

দলের সকলে ডাকে একে ‘মহারাজ’ বলে। বাইরের লোকে জানে ইনি সাধু-মহারাজ। এমন কি পুলিশও জানে ইনি কাশীধামের সন্ন্যাসী।

বাসুদেবের জীবন সংগ্রামে ধর্মের প্রাধাণ্যই ছিল বেশী।

ইনি ‘আজ্জীবনী’তে একস্থানে উল্লেখ করেছেন, “যদি কিছু সাউকর প্রত্যেকে আমায় পাচ হাজার করে এ কাজের জন্যে টাকা দিত, বিদ্রোহকে ঘনীভূত করবার জন্যে দলের দু চারজন লোককে চতুর্দিকে পাঠাতে পারতাম, তা হলে ব্রিটিশপুঞ্জবের কি বিপদই না হত! ডাক বন্ধ হত! টেলিগ্রাফের তার কাটা পড়ত। রেল রাস্তা বিচ্ছিন্ন হত। এইভাবে খবরাখবরের সব পথই বন্ধ হত। জেল ভাঙবার কি চমৎকার সুবিধেই না হত তাহলে! তা হলে সমস্ত জেল-বন্দী আমাদের দলে এসে মিলে যেত। কারণ পুনরায় ধরা পড়লে আবার জেলে যেতে হবে এই ভয়ে তারা নিশ্চয় আমাদের দলেই মিলে থাকত। যদি দুশো লোকও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত, তা হলে আমরা ধনাগার লুট নাই বা করতাম, তবে কয়েদীদের নিশ্চয় জেল থেকে মুক্ত করে আনতে পারতাম। দুশো দূরের কথা, বাইরের মাত্র পনের জন আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।”

এ লেখার পরও বাসুদেব কোন দিনই নিরুৎসাহ হয় নি।

চলেছে তার অব্যাহত শিকার দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন

অঞ্চল জুড়ে দিনের পর দিন। আজ এখানে কাল সেখানে। লুটপাট করে, সন্তান দল পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গভীর জঙ্গলে—গিরি কন্দরে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলতে লাগল এই ব্যাপার দিনের পর দিন। ভালো লোকের সঙ্গে কিছু কিছু স্বার্থায়েষী মেকী লোক দলে ঢুকে পড়ল। এদেরকে বাসুদেব প্রথমটা চিনে উঠতে পারে নি। দলভারী হওয়ার প্রয়োজন। কাজ অনেক। তাই ওদিকে এতটা নজর দিয়ে উঠতে পারেনি সে।

এইবার সরকারী অর্থও পথে লুট হ’ল।

ইংরেজের ভাল করে টনক নড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য! কে সন্দেহ করবে ‘ছদ্মবেশী মহারাজ’কে এত বড় বিদ্রোহী দলের নায়ক বলে। সাধারণের মধ্যেই তো সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়ায়।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশে নেমে এসেছে। অনাহারে অর্দ্ধবস্ত্রে দরিদ্র ভারতবাসীর লাঞ্ছনার অবধি নেই। সেই সঙ্গে মৃত্যুর বিভীষিকা। এই বিভীষিকা ১৮৭৬-৭৭ সালে দক্ষিণাত্যে ভীষণ রূপ ধারণ করল। ভারতবাসী মরুক আর বাঁচুক সে দিকে ইংরেজদের নেই তেমন কোন দৃষ্টি। নিজেদের প্রাপ্য কর ঠিকমত আদায় করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট। এর একটা বিহিত করতেই হবে। চুপ করে বসে থাকা যায় না, এই হল বাসুদেবের আলা।

সে সময় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ যে কি সাহায্য দিয়ে ছিল সেটি বাসুদেবের আজ-জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে।

তিনি লিখেছেন—“ভারতের অধিবাসীরা ইংরেজ শাসনের গুণে অগ্নাভাবে মৃত প্রায় হয়েছে।...ইংরেজরা দুর্ভিক্ষের সময়ে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের উপকারের জন্যে কার্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সেগুলো কার্যত কি হয়েছিল, কেউ কি তা অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন? প্রতিটি দুর্ভিক্ষপীড়িতকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সাহায্য দেড় আনা পয়সা মাত্র। অথচ ঐ সময়ে টাকায় পাচ সের করে চাল বিক্রী হচ্ছিল। এই দেড় আনা পেতে হলে প্রত্যেককেই কর্তব্যাক্রমের

কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে হ'ত। এই সাহায্য দেওয়া মুখের মিষ্টি কথা ছাড়া আর কি হতে পারে? মুখে আওড়াচ্ছে খাও খাও কিন্তু রাঙা চোখে ইশারা করছে, খেলেই পিঠের চামরা উঠবে। এ সবার অর্থ কি? এর অর্থ হল অর্থ সংগ্রহ করা, এ দেশকে বিদেশীতে পরিপূর্ণ করা—এবং এদের ধর্ম-নষ্ট করা। আমি সত্য বছর থেকে চিন্তা করে আসছি, কি উপায়ে অভুক্ত ক্ষীণ কঙ্কাল-সার দীন দরিদ্র ভাইদের জীবন রক্ষা করতে পারি-কিন্তু খুঁজে তার তেমন কোন পথ বার করতে পারছি না।”

এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এ যন্ত্রণা সত্য হয় না। সরকার বহাল তবিষতেই আছে।

মন বেদনায় বাসুদেবের অন্তর গর্জে উঠল। সাধ্যমত সাহায্য সে দিয়ে যাচ্ছে লুকিয়েচুরিয়ে লুঠের টাকা থেকে। কিন্তু এ সামান্য টাকায় এত বৃহৎ যন্ত্রের কি হয়? সমুদ্রে পাদার্ঘ্য মাত্র।

বাসুদেবের সাক্ষরিত পত্র গেল সরকারী দপ্তরে দপ্তরে রাজ্যপাল, জেলাশাসক মহকুমা শাসক সকলেরই নামে পরিকার স্পষ্ট ভাষায় লেখা—“যদি দুর্দশাগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের উপযুক্ত সরকারী সাহায্য না দেওয়া হয়, এর বিষময় ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। একজনকেও বাড়ে মাথা থাকবে না। এখন চিন্তা করে দেখ কি করবে।”

তার এই অসম সাহসিকতায় সমগ্র ভারতে এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। বিলেতের পার্লামেন্টে এ নিয়ে কম আলোড়ন হয় নি।

এই নির্ভীক ভারতবাসীটি কে? কি এর পরিচয়? কার এতদূর স্পর্ধা যে, ইংরেজকে চোখ রাঙায়—মৃত্যু ভয় দেখায়?

কর্তাদের এ অযোগ্যতায় পার্লামেন্ট থেকে কৈফিয়ৎ তলব করল। একে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত সরকারের চোখে ঘুম নেই। গোয়েন্দা পুলিশও হীমসীম খেয়ে গেল পুলিশের সঙ্গে, খোঁজ করে কোন হুদিসই করতে পারছে না।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেই ‘সন্তান বাসুদেব’ এদের মধ্যে দিকি ঘোরাঘুরি করছে। কে সন্দেহ করতে পারে এই

গৈরিকবসনধারী লোকটার ভেতর এমনি এক বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে।

ডাকাতি লুণ্ঠন অব্যাহত।

এর মধ্যে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের ইংরেজবিদ্বেষী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এক বিরাট সেনা-বাহিনী গড়ে তোলবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে বাসুদেব। হয়তো আর কিছুদিন সময় পেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টলিয়ে দেওয়া অসম্ভব হত না তার।

হঠাৎ একি সর্বনাশ। এই দলের লোকই তো লুঠের মাল আত্মসাৎ করে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করছে। কেউ আবার সেই টাকা নিয়ে দল ছেড়ে বাড়ি পালাচ্ছে?

হু এক জায়গায় এই ঘটনা ঘটানোর পর বাসুদেব মনে অত্যন্ত আঘাত পেল। আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে স্থির করল শৈলদেবের মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে আত্মাহুতি দেবে।

ছুটে গেল সেখানে। খড়্গ উত্তোলন করে নিজ শিরচ্ছেদে উদ্যত। মন্দিরের পূজারী এসে পশ্চাৎ হতে তার হাত দুখানি চেপে ধরলেন।

—কেন? কেন তুমি আমাকে নিরুত্তি করলে? এ তুচ্ছ প্রাণ আমি রাখতে চাই না। বিশ্বাসঘাতকেরা আমার মস্তকে কুঠরাঘাত করেছে। সবাই কি তবে সন্তান নয়?

—সে বিচার পরে কোর বংস! এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। সন্তানের এ কাপুরুষতা শোভা পায় না। তোমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।

মিলিটারী নামল। বিদ্রোহী দল কোথায় পালিয়ে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে তাই তারা দেখবে।

দলে ভাঙ্গন ধরেছে। কতদিন আর এদের হাত এড়িয়ে থাকা হয়।

মিলিটারী সেনাবাহিনী চারদিকে জাল ফেলেছে।

অবশেষে সন্ন্যাসী বাসুদেব গ্রেপ্তার হ'ল। বহু চেষ্টার পর মেজর ডানিয়েল, তাকে এবং তার অহুগামী জনাকয়েককে ধরে ফেব্রুয়ারি ২০শে জুলাই ১৮৭৮।

সেসম কোর্টে বিচারের শুনানী চলল।—তড়িৎ

ঘড়িত বিচার শেষ হয়ে গেল। জজ, বাসুদেব বলবন্ত ফড়কেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে দীপান্তরে পাঠানর আদেশ দিলেন।

ভারতবর্ষের নানা পত্রিকায় পরদিনই এ খবর ছাপা হয়ে গেল।

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখলে— Wassudeo Bulwunt Phadke possesses many of the traits of those high-souled men who are now and then sent in this world for the accomplishment of great purposes! He was an angel tempted by the devil and seduced. His heart was sound, but his reason led him astray. Yet the noble feelings of a Washington, a Tell and a Garibaldi animated his breast, and if he is not appreciated in this country where patriotism is unknown, he will be better appreciated in England, and other Western countries. As a dacoit his crime must be detested. Yet it is but due to him that his is a noble soul! His heart overflowed with love for India and what Indian can regard such a heart with indifference? . . . He is the most unselfish of men and his diary breathes a spirit of unselfishness which is truly divine. Whatever he had, he was willing to offer for his country, even his life. The very idea of establishing a Republic shows the unselfish nature of his mind. He had no intention to establish a raj of his own. Eminently pious, he always fervently prayed to God for the regeneration of his country.”

স্থির ছিল কারাজীবন ভোগ করতে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কেকে আন্দামানেই পাঠান হবে। কিন্তু না, তা হল না। হঠাৎ সরকারের মত পরিবর্তন হয়ে গেল। ভয়

পেয়ে, ডাকে পাঠিয়ে দিল এডেনের জেলে। এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল, সেখানে তার ওপর চরম অত্যাচার চালালেও গর্জে উঠবার জন্তে তার পাশে কোন ভারতবাসী থাকবে না। সশস্ত্র গ্রহণায় ১৮৮০র জানুয়ারীতে এডেন কারাগারের উদ্দেশ্যে বাসুদেবকে গুজলিত অবস্থায় জাহাজে তুলে দিয়ে ভারত সরকার হাপ ছেড়ে বাঁচল।

ঠিকই তাই। সেখানে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার আর নিগ্রহ শুরু হ'ল। রক্তমাংসের শরীর আর কত সহ্য করতে পারে। সূযোগ সে খুঁজতে লাগল কি উপায়ে জেল থেকে পালান যায়। সূযোগ একদিন এসে গেল। পালান বাসুদেব সুরক্ষিত জেল থেকে।

সর্বনাশ! খাঁচা ভেঙ্গে বাঘ পালিয়েছে।

খোঁজ—খোঁজ, কোথায় গেল? পথঘাটতো তার এখানে চেনা নেই।

সত্যিই তাই। পালানর রাস্তা বার করতে না পারায় সে ধরা পড়ে গেল।

এইবার চরম উৎপীড়ন চলতে লাগল তার শরীরের ওপর।

আর সহ্য করতে পারল না। অবশেষে সে মারাই গেল ঐ জেলেই ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে জন্মেছিল মহারাষ্ট্রের-শিরদোনে ১৮৪৫, ৪ঠা নভেম্বর।

বাসুদেবের অনুচরেরাও এ অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেল না। এছাড়া বাসুদেবের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল ছিল তাদেরও ধরে ধরে এনে ইংরেজ সরকার কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ডা বোধ করল না।

(ক্রমশঃ)



যুগাবতার খ্রীসত্য সাই বাবা

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

একদা খ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'Injustice is an invitation to death, and prepare His (God's) advent. The moment the desire to do justice disappears from a ruling class, the moment it ceases even to respect the show of justice, from that moment its days are numbered' অর্থাৎ “অবিচার মৃত্যুকে করে আহ্বান এবং বিধাতার অবির্ভাবের পথকে করে সুগম। যে মুহূর্তে শাসক শ্রেণীর মন থেকে সুবিচার করবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়, যে মুহূর্তে ন্যায়ধর্মের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও আর তার মনে অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হয় সেই শাসনের অবসান।”

আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা, একটা, সর্বাঙ্গক ধ্বংসের কালো ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দিগ্ভ্রান্ত, সুখের মোহে শান্তিকে হত্যা করে ভয় ও আতঙ্কে বিন্দ্র রজনী করছে যাপন। এর মূল কারণ হ'ল শক্তিমানের প্রচণ্ড লোভ, স্বার্থোদ্ধত অবিচার, চিরবঞ্চিতের নিত্য-চিত্ত ক্ষোভ, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আশ্রয়িতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।” এ কথা অচিরে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণ হবে যে, অধর্মের দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, কাম্য বস্তু করায়ত্ত করতে পারে, শত্রুকেও পারে পরাজিত করতে, কিন্তু পরিণামে তার সম্পূর্ণ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভুতে কঁাদে, উৎপীড়িত মানুষের আতনাদ শুধু ভুলোককেই নয় ছালোককেও ক'রে তুলেছে অতি-মাত্রায় উত্তপ্ত। স্মৃতরাং স্বয়ং নারায়ণকে আবার বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আসতে হয়েছে নরলোকে। এবার ভগবান এসেছেন খ্রীসত্য সাই বাবার নাম ও রূপ নিয়ে; তিনি এসেছেন সেই অলৌকিক সামর্থ্য এবং সেই লৌকিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে যা হবে তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূল—যুগপ্রয়োজন সাধনে হবে সক্ষম। বাবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে: “শুধু ভারতবর্ষ নয়

সমগ্র পৃথিবীই আজ নবজন্মের প্রত্যাশায় ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আশ্বাসের বার্তা বহন করে এনেছি যে, শীঘ্রই কৃষ্ণ মেঘরাশি অপসারিত হবে এবং তোমরা দেখতে পাবে সমগ্র পৃথিবীতে এক আনন্দময় যুগের হ'বে আবির্ভাব।”

সমস্ত বিশ্বাসী মানুষের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ পুতাপর্তীর দিকে, প্রশান্তিনিলয়মে বিরাজমান পরিত্রাণ কর্তার দিকে। অপর দিকে আজও অসংখ্য মানুষ সংশয়ে তাঁকে করছে উপেক্ষা, অন্ধসংস্কারে তাঁকে করছে উপহাস এবং মূঢ় বিজ্ঞতায় তাঁকে করছে অস্বীকার। ভগবান খ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন “অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।” নারায়ণের নর-লীলার স্বরূপ উপলব্ধি করা, স্বীকার করতেই হবে, সহজ নয়। উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বাবা বলেছেন, “যখন কোন মানুষ ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করবে, ভগবানকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে, তখন প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না। অন্তরের অন্তঃস্বল হ'তে যে জবাব তোমার জিহ্বায় এসে উপস্থিত হবে, তা তাকে বলবে। পুতাপর্তী আসবার জন্য এবং তোমার আনন্দের অংশীদার হবার জন্য তাকে নির্দেশ দেবে। তাকে বলবে, ভগবান রয়েছেন প্রশান্তিনিলমে।”

বাবা শুধু প্রশান্তিনিলয়মে যাবার কথাই বলেন নি, তিনি বলেছেন, “সকল মানুষকে বলবে, তুমি প্রশান্তিনিলয়মে এসেছিলে এবং সেখানে গিয়ে তুমি মুক্তি লাভের রহস্য জানতে পেরেছো।” তারা সত্যিই ভাগ্যবান যারা নারায়ণের নর-লীলার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে হন সক্ষম। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে লিখেছেন—

অদ্বৈতের গলাধরি কহেন বারবার

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।

কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥

অদ্বৈত গৌরলীলা করেন গৌর রায়,

কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

এ-যুগের মানুষ কৃত-কৃতার্থ এই জন্য যে, এবার বাবা নিজেই তাঁর লীলা মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন এবং

মান্না-মানুষের রহস্য করেছেন উদ্ঘাটিত। তবু কি আমরা তাঁকে চিনতে পেরেছি? বারবার প্রশ্ন জাগে বাবা কে? কে এই সত্য সাই বাবা? আলোছায়ায় রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে জবাব আসে—

“জানি না কে! চিনি নাই তা’রে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হ’তে যুগান্তর পানে
বড় বজ্রা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিত্রী সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।”

মায়ায় পর্দা ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে অনন্তের ধারণা করা সম্ভব নয়, এমন কি অবতারের স্বরূপও মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু ভগবান যখন মর্তে নর-লীলা করেন তখন মোহ-মদিরায় বিহ্বল মানুষও চর্মচক্ষে ভগবানকে দর্শন করবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে। এই ভাবেই শুধু বিষয়-বাসনার কুস্তীপাকে হারুড়ু খেতে খেতেও আমরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, “অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানব-রূপে আবির্ভূত হন।” অজ্ঞান তিমিরান্ধ মানুষের কী পরম সৌভাগ্য! স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের উক্তিকে আরও একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “আর এক প্রকার গুরু আছেন—সমগ্র জগতের স্থীতিতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা সকল গুরুর গুরু, স্বয়ং ঈশ্বরের মানবরূপে প্রকাশ।.....তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছা-মাত্র অপরের ভিতর ধর্ম-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম, অধমচরিত্র ব্যক্তিগণ পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়।.....ইহারা কিন্তু সকল গুরুর গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমরা তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কোনরূপে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং কেবল তাঁহাদিগকেই পূজা করিতে বাধ্য।”

আমরা বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু যখনই বিবর্তনের স্রোতধারা সুকঠিন সংকটের আবর্তে প্রতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখনই অনন্ত শান্ত হয়ে ভক্তের আকুল আস্থানে ধরাধামে হন অবতীর্ণ, বিবর্তনের রুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত-ধারায় করেন প্রবাহিত, বিবর্তনের পথে মানুষকে এক উচ্চস্তরে করেন উন্নীত। এই প্রক্রিয়া চলেছে

হাজার হাজার বছর ধরে। বিগত তিন চার হাজার বছর ধরে ভারতের বৃকে একের পর আর একজন অবতার আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁদের কাজ ছিল পৃথিবীর নবজন্মের ভূমিকা রচনা করা। এবার তাকে সম্পূর্ণতা দান করবার সময় হয়েছে উপস্থিত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্মই আবির্ভূত হয়েছেন ভগবান সত্য সাই বাবা। সত্য সাই বাবা বলেছেন, যে কাজের জন্ম তিনি এসেছেন, ইতিমধ্যেই তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, এবার সুরু হবে তাঁর আসল কাজ—অনতিকাল পূর্বেই আরম্ভ হবে তাঁর বিশ্ব বিজয়াভিযান। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করা যেতে পারে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে গোলক হ’তে মাটির পৃথিবীতে টেনে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে তাঁর বিশাল অধ্যাত্ম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করবার জন্ম। মনে রাখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণের বাণীকে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়ী করে তুলেছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠে দিগ্বিজয়ের জন্ম ভগবান সত্য সাই বাবারও কি একজন স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজন হবে না? সত্য সাই বাবা বলেছেন, “বিবেকানন্দ আবার এসেছেন; সিংহলে তিনি বড় হচ্ছেন। তিনি আসবেন এবং আমার কাজে যোগদান করবেন।” অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, যথা সময়ে যখন বিবেকানন্দ বাবার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপত্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তখন একটা অভূতপূর্ব অধ্যাত্ম বিপ্লব বাধভাঙ্গা বহ্যার মতো সমগ্র পৃথিবীর উপর ভেঙে পড়বে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বস্তুর উপর আত্মার মহাবিজয়ের বার্তা হবে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যুবক ভারতকে আহ্বান করে বলেছিলেন, “We have to Conquer the world, that we have to! India must conquer the world, and nothing less than that is my ideal. It may be very big, it may astonish many of you, but it is so.” এই অধ্যাত্ম বিজয়েই সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শ। সমগ্র জগতের অধ্যাত্মগুরুর ভূমিকা পালনের জন্মই ভারতবর্ষ বিধাতা কর্তৃক হয়েছে নির্দিষ্ট। সহস্র সহস্র বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক আদর্শকে সফল করে তোলবার জন্ম ভারতবর্ষ ছিল আজনিবন্ধ, ভগবান সত্য সাই বাবার ব্রত হ’ল সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা। ইহাই সাই-সংকল্প—ইহাই সাই বাবার ঘোষিত লক্ষ্য।

সজ্জ-সংবাদ

আশ্রমী

প্রবর্তক সজ্জকেন্দ্রে মহাপূজা :

শরৎকালে শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা। হিন্দুভারতের একটি অনন্য ও অনবদ্য মহোৎসব। দশভূজা দুর্গামূর্তি রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। পুরাকালে সে কোন ঋষির, ধ্যান-নেত্রে এই মহামহিমময়ী মাতৃ-মূর্তি ফুটে উঠেছিল—তাহা আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় বস্তু হলেও ঋষির আরাধ্যা সেই চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি আজও মূন্ময়ী মূর্তিতে সর্বত্র সমাদরে সাড়স্বরে সম্পূজিত। মহামায়া মা—ক্ষেমময়ী, ক্ষেমঙ্করী দশভূজে দশপ্রহরণ ধারণ করে সন্তানের দশবিধ অপরাধ ক্ষালন করে বরাভয় করে আশীর্বাদ করেন আর সেই সঙ্গে প্রদান করেন সিদ্ধি ঋদ্ধি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য। ভারতের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক মহামায়া মায়ের মূর্তি তাই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তিক ও গণেশ সমন্বিত। এই উৎসব তাই জাতীয় উৎসব।

জাতির জগৎ মূর্তি প্রবর্তক সজ্জও প্রতি বৎসর এই মহাশক্তির আরাধনা সজ্জজননীর প্রতিমূর্তির সমক্ষে ঘট স্থাপন করে অতি অনাড়ম্বরে ভাবধন পরিবেশে সমাপন করে। এই বৎসরও সজ্জ প্রতিভূরূপে সজ্জ সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী মহালয়া হতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চকাল ধরে মহাশক্তির আরাধনা পর্ব চলে।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ১৭ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর শনিবার মহালয়া। বেলা ১২-৪২ মিঃ গতে আশ্রমের মাতৃমন্দিরে মহালয়া পর্বানুষ্ঠান। সঙ্গীতে বিগতাত্মাদের আবাহন করার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীসজ্জ গুরুদেবের লিখিত মহালয়ার বাণী পাঠান্তে সজ্জস্বস্তির প্রথম যুগের প্রথম শহীদ থেকে আরম্ভ করে এই বৎসর এই মহালয়াপর্বের পূর্ব পর্যন্ত যে সব সজ্জ-সভা-সভা “মরণে অমর” হয়েছেন—তাদের প্রত্যেকের নামালঙ্করণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তৎপরে সজ্জ-সভাপতির শ্রদ্ধাভাষণের পর মাতৃকৃণ্ডে তিলাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। অতঃপর শহীদ কক্ষে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পাকসেনার গুলিতে নিহত চট্টল প্রবর্তক আশ্রমের অন্তরঙ্গ সভ্য অরৈতচরণ

রায়েঁর প্রতিকৃতি স্থাপনাতে প্রত্যেক শহীদকেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়।

পরদিন ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার বেলা ৮-৫৩ মিঃ গতে প্রতিপদাদি কল্লারম্ভ হয়। ঐ দিন হতে ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে চণ্ডীপাঠ—শুক্রবার সন্ধ্যায় আশ্রমের বিজ্ঞবৃক্ষ মূলে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন ও ১০৮টি দীপদান, পরে সজ্জ মন্দিরে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস শাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন হয়। শনিবার প্রাতে ৭-২ মিঃ গতে নবপত্রিকা স্নান ও স্থাপনাতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর মহাপূজা যথাবিধানে সম্পন্ন হয়। সজ্জবিধানুযায়ী সপ্তমীর অর্দ্ধরাত্রিবিহিত হোম স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে সজ্জ সভাগণ, কর্তৃক সম্পাদিত হয়। মহাষ্টমীর সন্ধিহোমও অনুষ্ঠিত হয় রাত্রি ৬-৫৩ মিঃ গতে। মঙ্গলবার ৭-২ মিঃ গতে দশমী বিহিত পূজা ও বিসর্জন। পরে অপরাহ্নিতান্তে পাঠ, শান্তিবারি প্রক্ষেপ ও সজ্জসভাপতির ভাষণ। সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মেলন। ২রা কান্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার প্রদোষে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও তৎপরে পূর্ণিমা-সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে কেন্দ্রসজ্জ মহাপূজার পূজাপর্ব এইখানেই সমাপ্ত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তরুণ সজ্জধর্মী শ্রীমান ধীরাজ মজুমদার এই পূজাপর্বে স্বামীজীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

সজ্জের বিভিন্ন শাখা আশ্রমে মহাপূজা :

২৩ পরগনা জিলার সুন্দরবন অঞ্চলের ফ্রেজারগঞ্জে আশ্রমঅধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে সজ্জের বিধানানুযায়ী মহাপূজা সম্পন্ন হয়। তৎপরেই ঐ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা সম্মেলন উপলক্ষে সজ্জসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত তথায় গমন করেন—এবং দুইটি উৎসবই সম্পন্ন করেন।

হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার অন্তর্গত দফরপুর আশ্রমে, আশ্রমঅধ্যক্ষ শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মহাপূজা সম্পন্ন হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কেন্দ্র সঙ্ঘ হতে শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ তথায় গমন করেন। শ্রীমতী ঘোষ তিনদিন ঐখানে অবস্থান করেন। পূর্ণিমা সম্মেলন ও স্থানীয় কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে গীতা ও চণ্ডীকে অবলম্বন করে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

২৪ পরগনা জেলার অগ্রতম শাখা-আশ্রম নববারাক-পুরের উপাসনা মন্দিরে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে তথাকার সভ্য-সভ্যাগণ সমবেত ভাবে মহাপূজা ও কোজাগরী পূর্ণিমা সম্মেলন সম্পন্ন করেন। কেন্দ্রসঙ্ঘের অনুরূপই পূজাবিধি সর্বত্র পালিত হলেও স্থান কাল এবং পাত্রানুযায়ী কিছু অদল-বদলও হয়ে থাকে।

চাটুর্মাস্য ব্রতোদযাপন ও রাসপূর্ণিমা সম্মেলন :

বিগত ৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ইং ২৩শে জুলাই ১৯৭৫ চাটুর্মাস্য ব্রতরত্ত হয়। মধ্যে মহাপূজাপর্ব সমাধাকালেও চাটুর্মাস্য ব্রতের কোন হানি হয় না। এই ব্রতের অগ্রতম অংশ হিসাবে কেন্দ্রসঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে ধারাবাহিক পাঠ চলে। গুরুপূর্ণিমার পরদিন হতে মহাপূজার পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত পণ্ডিত শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ শ্রীমন্তগবদগীতার ১৮টি অধ্যায়ই কথকতার আকারে অভিনব ভাব-ভাষা ও সুর-সঙ্গীতে পরিবেশন করেন। গীতা শেষ হলে পর তিনি আরও কয়েকটি উপাখ্যান—যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দেবকার্যে দধিচীর তনুভাগ প্রভৃতি কথকতার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গীতে উপাখ্যানভাগ মধুময় হয়ে উঠে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর থেকে রাসপূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ করেন। রাসপূর্ণিমার দিন পুনরায় পণ্ডিত অনিলবরণ রাসলীলা কথকতা করেন। তৎপরে পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত ও ভাষণের মধ্য দিয়ে। পরিশেষে পূর্ণপ্রশস্তি মন্তোচ্চারণের পর সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সঙ্ঘের অগ্রাঙ্গ ক্ষেত্রেও চাটুর্মাস্য ব্রতোদযাপন ও রাসপূর্ণিমা সম্মেলন স্ব-স্ব ক্ষেত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্রেজারগঞ্জে প্রবর্তক শিশুভবনের বর্ষোৎসব ও পূর্ণিমা সম্মেলন :

গত ৩০শে আশ্বিন, ইং ১৭ই অক্টোবর, শুক্রবারে, ফ্রেজারগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরে, প্রবর্তক দ্বঃশ শিশুভবনের প্রথম

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রম প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসব-সভায় পৌরহিত্য করেন ২৪ পরগণার জেলা-শানক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন অফিসার, মহকুমা শাসক ও এই অঞ্চলের বহু জাতী, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পল্লীর জনসাধারণ উৎসবে যোগ দান করেন।

অতিথিবরণ ও উদ্বোধন সঙ্গীতের শেষে, আশ্রমের পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস এই প্রবর্তক আশ্রম-কেন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত সুলিখিত বিবৃতি পাঠ করিলে পর, বর্তমান প্রবর্তক সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত একটি 'মর্ম্মপূর্ণ ভাষণে এই সমুদ্রতীরে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরুজীর সংগঠনমূলক কর্ম্মযজ্ঞের বিশেষ সম্ভাবনাগর্ভ কল্পস্বপ্নের কথা স্মরণ করেন ও উহারই রূপান্তরের ইহা নূতন পর্যায়ের নবসূচনা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁর এই অনুপ্রেরণাময়ী আশাবাদী ভ্রবণে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন।

সভাপতি শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীদত্তের এই বাণীর দিগ্‌দর্শন সূত্র করিয়া সঙ্ঘগুরুজীর জাতীয়তা-মূলক শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতিক সংগঠনের সাধনায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে যথায়োগ্য সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সারা দেশে এই পদ্ধতিতে মানুষ গড়ার শিক্ষা ও কর্ম্মধারা প্রবর্তিত হইলে, দেশের ও জাতির অভ্যুদয়, অনিবার্য—ইহাও তিনি জোর দিয়া বলেন।

প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরতিকান্ত দাস কর্তৃক ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভান্তে ছাত্রী-ছাত্রীগণের ব্রতচারী নৃত্য ও সঙ্গায় পর “স্বামী বিবেকানন্দ” নাটিকাভিনয় অতিশয় ভাবানুপ্রাণিতার সহিত পরিবেশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের একটি শিশু-নাটিকাও শিশুকণ্যাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়া বিশাল পল্লীবাসী জনতাকে আনন্দদাম করে।

১৯শে অক্টোবর, লক্ষ্মীপুর, প্রবর্তক আশ্রমে, কোজাগরী পূর্ণিমা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যথারীতি গুরুবন্দনা, উপাসনা ও পূজারতির পর ভাগবত পাঠ ও ধর্ম্মীয় আলোচনা হয়। সর্বশেষে সঙ্ঘ-সভাপতির আন্তরিকতাময় আশীর্ব্বাদী আশ্রমবাসী তথা সমুদ্রবর্ত সকল নর-নারীকেই আশায় উদ্ভুদ্ধ ও আনন্দে সঙ্গীভিত করে।

সামাজিক

ভাতৃদ্বিতীয়া :

গত ২৯শে কার্তিক (১৯শে নভেম্বর) ভাতৃদ্বিতীয়া বা যমদ্বিতীয়া এত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ধনী-গরীব নির্বিশেষে হিন্দুর ঘরে ঘরে মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই সামাজিক পূজা পার্বণ গুলি তুচ্ছ যষ্ঠী, সুবচনী, জামাই যষ্ঠী, সত্যনারায়ণ পূজা পর্যন্ত—হিন্দুর প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহমান রাখিয়াছে।

এই তিথিতে বঙ্গদেশে হিন্দুর ঘরে ঘরে ভগিনী ভাতার কপালে ফোঁটা দিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে ভাতার দীর্ঘজীবন ও পরম কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এই তিথিতে যমুনা তাঁহার ভাতা যমরাজকে প্রণাম করিয়া ফোঁটা দিয়া তাঁহার অমরত্ব প্রার্থনা করেন। তাহাতে যমরাজ অমর হয়েন। এই তিথিতে দলে দলে লোকে যমুনায় স্নান করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজের এই প্রথাগুলিতে পরস্পরের প্রীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

তামিলনাড়ু সরকারের সমাজচেতনা :

ইদানীং কালে তামিলনাড়ু সরকার রেস খেলা বন্ধ করেছেন। মদের দোকানও সেখানে আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়েছে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন পরিবেশন করা নিষিদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি সরকারী 'লটারী'কেও বন্ধ করা হয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমাজচেতনার ক্ষেত্রে ঐ প্রদেশের এই সরকারী ব্যবস্থা শুভ মঙ্গলদায়ক।

পরলোকে সাহিত্যিক নরেন মিত্র :

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খ্যাতনামা সাহিত্যিক নরেন মিত্র আকস্মিক পরলোকগমন করেন। ১৯১৬ সালে ফরিদপুর-সদরদি গ্রামে তাঁর জন্ম। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর কবিতা 'মুক' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে কাব্য সংকলন,

'জোনাকি', 'নিরবিলা' প্রকাশিত হয়। 'দ্বীপপুঞ্জ' তাঁর প্রথম উপন্যাস। গল্প-লেখক হিসাবে শ্রীমিত্র জনপ্রিয় ও বিশেষ সুবিদিত ছিলেন। ছোটখাট স্বল্পবাক্য মানুষ ছিলে। ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীমিত্র অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। শ্রীমিত্রের মৃত্যুতে বাংলা বিশেষ বাংলা সাহিত্যে একটা অভাব সৃষ্টি হল।

মেটালবক্স ইণ্ডিয়া :

ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিদেশে রপ্তানীকারক হিসাবে অল্প দিনের মধ্যেই বাজারে বেশ নাম করেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাত্র ২০০০ টাকার ধাতু নির্মিত পাত্র রপ্তানী করে প্রথম রপ্তানীকারক হিসেবে নাম লেখায়। বর্তমানে ১৯৭৫ সালে ২০টি দেশে ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে থাকে।

১৯৭৫, মার্চে যে বছর শেষ হয়েছে সে বছর রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১.১ কোটি টাকা।

মেটালবক্স ইণ্ডিয়া তাদের তৈরী যন্ত্রপাতির মান এত উন্নত ধরনের করেছে যে প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রসর দেশ ব্রিটেন ও জার্মানিতেও তাদের তৈরী দ্রব্যের বাজার হয়েছে।

দক্ষিণ দমদমের বহু প্রত্যাশিত অভাব মোচন :

গত ২০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রতিমার আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সভায়, সুসাহিত্যিক শ্রীকিরণেন্দু বাগচী সভাপতি এবং পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাতৃমূর্তি আবরণ উন্মোচনান্তে, এ অঞ্চলে কোন হাসপাতাল এবং শিশু উদ্যান না থাকায়, সুযোগ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে, এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ও শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে, একটি শিশু-উদ্যান প্রতিষ্ঠা করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মন্ত্রী-মহাশয়ের এই দৃঢ়তাপূর্ণ ভাষণে বিশেষ আশান্বিত হয়ে সভাপতি মহাশয়, পল্লীবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন এবং ধন্যবাদ দেন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীরবি কর

প্রবর্তক : পারিশার্দ, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাউটোন লিমিটেড, ৭২।০ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীশশিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

৬০তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

প্রবর্তক

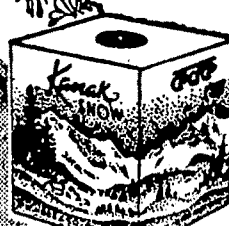
দীর্ঘজীবা: শ্রীমতিলালদাস

পৌষ ১৩৮২

ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৭৫



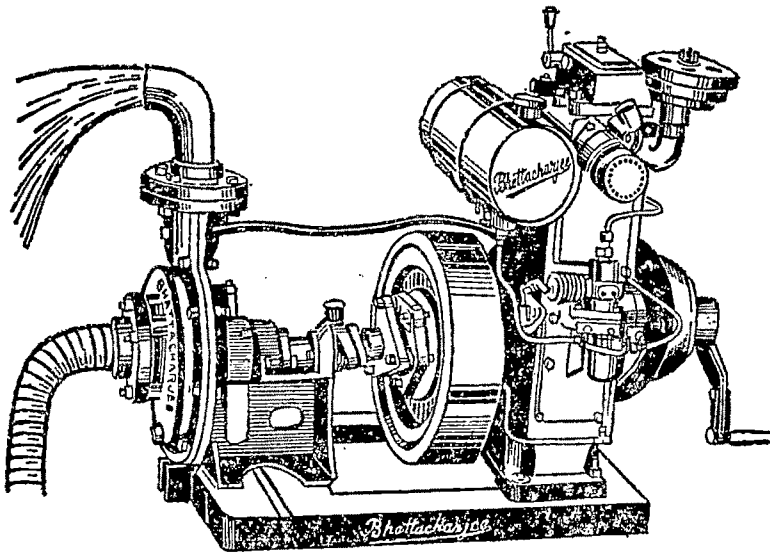
আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
সমর্থন সামগ্রী



ভারত সরকারের আশ্রয়াল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্স্ফো,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, স্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

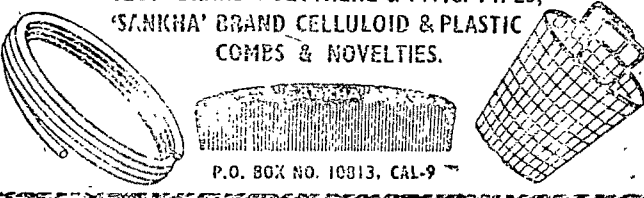
Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

DIRATAN

Photographers

PHONE : 54 - 5711

ডিরতান

ফটোগ্রাফার্স

ফোন : ৫৪ - ৫৭১১

বাংলাসাহিত্যের উপগ্রাস ভাণ্ডারে অভিনব সংযোজন
হাসি চৌধুরীর—মনীষা—৮০০

ডিমাই সাইজ, মনোরম প্রচ্ছদপট, সুন্দর ছাপা,
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, উপহার উপযোগী

প্রাপ্তিস্থান : ৩৫।১ ডায়মণ্ড হারবার রোড,
কলিকাতা—২৭

সাহিত্য প্রকাশ : রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

ভগবান
শ্রীসত্য সাই বাবা

কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বর্তমান কালে বিশ্বের আকর্ষণ কেন্দ্র, সবচেয়ে
অলৌকিক শক্তিশালী ঈশ্বরমানব সত্য সাই
বাবা—ভগবান স্বয়ম। বাংলা ভাষায় সত্য
সাই বাবার সম্বন্ধে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

দক্ষিণা — দেড় টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বি, বি, গান্ধুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিস্ত : দশনসংস্কার চূর্ণ :
সারিবাছারিস্ত : অশোকারিস্ত : ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : পেষ, ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	৩৪
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	৩৪২
সম্পাদকীয়	...	প্রীয়াধারমণ চৌধুরী	৩৪৩
হে মহান !	কবিতা	শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র	৩৪৬
সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	কবিতা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৩৪৭
আচার্য মতিলালের 'জীবনদর্শন'	প্রবন্ধ	ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী	৩৪৮
সমাধির সাক্ষর	ভ্রমণ	ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৪
বসুমতী	বড় গল্প	অজিত দাস	৩৫৬
বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	আলেখ্য	কিরণেন্দু বাগচী	৩৬০
বুধুদের মত	কবিতা	প্রশান্ত ভবাই	৩৬৪
পোতের আশায়	কবিতা	উমাপদ নাথ	৩৬৪
সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতি নলিনচন্দ্র দত্ত	জীবনী	রেণুকণা ঘোষ	৩৬৫
অবদান	কবিতা	শ্রীমতী হেমবরগী মুখোপাধ্যায়	৩৭৩
তোমাকে শুধাই	কবিতা	সুনীতকুমার মিত্র	৩৭৩
ভাটয়ালী গান	গান	শ্রীঅখিল নিয়োগী	৩৭৩
স্বীকারোক্তি	রম্যরচনা	দীপংকর সেন	৩৭৪
জীবনশিল্পী মতিলাল	আলেখ্য	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩৭৬
শরণচন্দ্র	কবিতা	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	৩৭৯
সজ্জগুরুর স্মৃতিকথা	স্মৃতিচারণ	শ্রীফণিভূষণ সামন্ত	৩৮০
সজ্জ সংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	৩৮১
সাময়িকী	...	...	৩৮৩

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে
অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক
হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপাই কার্ড অথবা
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ
তার জন্য দায়ী নহে। কপি রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—
সম্পাদকের নহে।

এজেলি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেলি দেওয়া
হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য।
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে
পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ

গীতায় ভগবান ৫.০০

(গীতার যৌগিক জীবনভাষা)

মহর্ষি প্রেমানন্দজী প্রণীত

গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গুহ্যতিগুহ্য
রাজযোগের নিগূঢ় মর্মটি এই গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তজ্জপরি
সহজ প্রাণায়াম মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে
মানসোত্তর লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত
ব্যাখ্যাত।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত

রোগ ও আরোগ্য—৪.০০

যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

স্থপিতত্ত্ব—১.০০

স্বধীর্কুমার দত্তের সর্বজন সমাদৃত বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর
অপরিহার্য গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাধনা—৪.০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিং, স্টিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

- ★ ELECTRICAL MOTOR
- ★ POLISHING & BUFFING

- DOUBLE ENDED-GRINDER
- FLEXIBLE SHAFT GRINDER

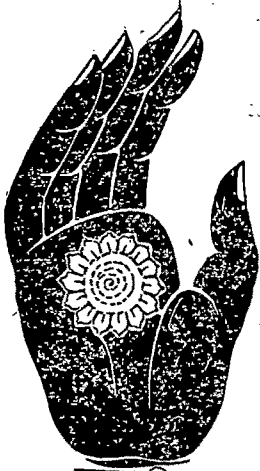
MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

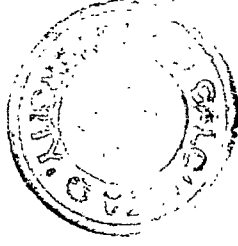
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



বজ্রজ্ঞান ছিত্তা



৬০তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

পৌষ : ১৩৮২

ডিসেম্বর-জানুয়ারী : ১৯৭৫-৭৬

প্রবর্তক

জীবনের আলো

মানুষ চায় সুখ। শাস্ত্রত সুখ। “সুখং মে ভূয়াং দুঃখং মে মা ভূৎ”—উপনিষদের এই মন্ত্রই বিশ্বমানব-জীবনে লীলায়ত। অথচ এমনই মজা যে, দুঃখ কখনও পায় নাই এমন একটি মানুষও পৃথিবীতে দেখা যায় না। তথাপি মানুষের নিত্যকালের চাওয়া সুখ। সুখ যে মানুষ পায় না তাহাও নহে—কিন্তু সেই সুখই আবার দুঃখের হেতু হয়। কবির ভাষায়—“যা চাই, তা ভুল করে চাই; যা পাই, তা চাই না।” এমনই জীবের ভ্রান্তিময় অবস্থা। তার কারণ মানুষের প্রকৃত চাওয়াটি যে কি, তাহা সে ধরিতে পারে না। তাই সুখ আসিলেও সে পরিতৃপ্ত হয় না—আরও সুখের আকাঙ্ক্ষা তার জাগে। আসলে মানুষ তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে খোঁজে সেই সুখ, যাহা পাইলে আর পাওয়ার অবশেষ থাকে না—মানুষ হয় “সিন্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি” এবং ঋহাকে জানিলে মানুষ “মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।” কিন্তু ইহা না হওয়ার কারণ—সে পথের সন্ধান জানে না। ভারতের বেদ উপনিষদ দর্শন পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ এই পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। সকল শাস্ত্রেই আছে নিত্যসুখ লাভ করিতে হইলে এবং দুঃখের হাত হইতে চির নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে নিত্যসুখময়, আনন্দস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সহিত যুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যাইবে। সকল শাস্ত্রেই শ্রীভগবানের সহিত যুক্তিলাভের পথনির্দেশ দেওয়া আছে। ঈশ্বা সহকারে যাহারা ইহার অনুশীলন করে—তাহারাই শাস্ত্রত সুখের অধিকারী হয়। যাহারা অনধিকারী তাহারা ঈশ্বরের সহিত যুক্তিলাভের পথে না গিয়া অনিত্য বিষয়ের প্রতি নিয়ত ধাবিত হইয়া অবিরত দুঃখকেই ডাকিয়া আনে। যেমন দেখা যায়—আজ যে শ্রমিক, কাল যদি সে শিল্পপতির পদ পায়, তাহা হইলে অংগামী কাল তার আরও বেশী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। আজ যে, কৃষক, কাল যদি সে মালিক হয়, আজ যে আত্মশূণ্য, কাল যদি সে ব্রাহ্মণের অধিকার পায়, তাহা হইলে তার পাওয়ার পরিসমাপ্তি আসিবে না, লক্ষপতি যে, তার কোটিপতি হওয়ার সাধ জাগিবে। জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যস্তারী; কারণ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনও হয় না। “হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ভূয়ঃ এবাভি বর্জতে।” সুখ আশা এইভাবে ক্রম বর্ধমান হইয়া দুঃখকেই মানুষ আবাহন করিয়া ডাকিয়া আনে। কলিযুগে এইরূপ মানুষের সংখ্যাই বেশী। তথাপি দেবভূমি ভারত। ভারতের স্বল্প সংখ্যক মানুষও যদি শাস্ত্রত সুখ চায়, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগের পথই গ্রহণ করিতে হইবে। “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ”—ত্যাগ করিতে হইবে বিষয়াসক্তি, কর্তৃত্ববোধ ও অহংকার। আর ভোগ করিতে হইবে ঈশ্বর-যুক্তির পরমানন্দ। ঈশ্বর যুক্তির পথ ভারতের সকল শাস্ত্রই প্রদর্শন করিয়াছে। বিশেষভাবে গীতা ইহার প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ গ্রন্থ। গীতার যোগ যে জীবনে অভ্যাস করিতে পারিবে—সেই শাস্ত্রত সুখের অধিকারী হইবে॥

সজগদগুরু শ্রীমতিনালা

বেদমন্ত্র

প্রথমোষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ চতুর্দশং স্কন্ধঃ ॥ প্রথমা-দ্বিতীয়া ঋক্ (মণ্ডলস্ত্র যষ্টিতমং সূক্তং)

বহিঃ যশসং বিদথন্তু কেতুং সুপ্রাব্য দূতং সন্তো অর্থং ।

দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরন্তু গবে মাতরিখা ॥ ১

অর্থ—বহিঃ যশসং বিদথন্তু কেতুং সুপ্রাব্য দূতং সন্তো অর্থং দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং মাতরিখা ভূগবে রাতিং ভরং ॥১

ব্যাখ্যা—বহিঃ (হবিঃবহনকারী) যশসং (যশস্বী) বিদথন্তুকেতুং (যজ্ঞ প্রকাশক) সুপ্রাব্যং (সুহৃৎ প্রকাশের দ্বারা রক্ষাকারী) দূতং (দেবগণের দূত) সন্তো অর্থং (সন্ত গমনকারী অর্থাৎ যখনই অগ্নিতে হবিঃসমূহ প্রদত্ত হয়, তখনই তিনি তাহা লইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন) দ্বিজন্মানং (দ্বাবা পৃথিবীর মধ্যে উৎপন্ন অথবা অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে জাত) রয়িমিব (ধনের ন্যায় প্রখ্যাত) মাতরিখা অন্তরিক্ষস্থিত বায়ু ভূগবে (ভূগবংশীয় ঋষিদের) রাতিং (মিত্র) ভরং (করেন) ॥১

সরলার্থ—অগ্নি হব্যবাহক ও যশস্বী। তিনি যজ্ঞ প্রকাশক এবং সম্যক্ প্রকারে রক্ষাকারী। আরও, তিনি দেবগণের দূত, দেবগণের নিকট সর্বদাই তিনি হব্য লইয়া গমন করেন। তিনি অরণি কাষ্ঠজাত এবং ধনের ন্যায় প্রশংসিত। মাতরিখা এই অগ্নিকে ভূগবংশীয় ঋষিদের মিত্র করেন ॥১

অস্ত্র শাস্তুরভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্যন্তু উশিজো যে চ মর্ত্যঃ ।

দিবশ্চিৎ পূর্বো হ্রসাদি হোতা পৃচ্ছ্যা বিশ্ পতিবিক্ষু বেধাঃ ॥২

অর্থ—উশিজঃ হবিষ্যন্তুঃ যে চ মর্ত্যঃ উভয়াসঃ অস্ত্র (অগ্নে) শাস্তুঃ। আপৃচ্ছঃ বিশ্ পতিঃ বেধাঃ হোতা (অগ্নিঃ) দিবশ্চিৎ পূর্বো বিক্ষু হ্রসাদি ॥২

ব্যাখ্যা—উশিজঃ (কামনা পরায়ণ দেবগণ অর্থাৎ হবিঃকামী অমর দেবগণ) হবিষ্যন্তুঃ যে চ মর্ত্যঃ (এবং হবিঃ প্রদানকারী মরণধর্মী যে সব যজ্ঞমান-) উভয়াসঃ (উভয়েই) অস্ত্র (অগ্নির) শাস্তুঃ (অনুশাসন) সচন্তে (মাগ্ন করেন) আপৃচ্ছ (পূজা) বিশ্ পতি (লোকপালক) হোতা (ফলদাতা) [অগ্নি] দিবশ্চিৎ পূর্বো (আদিভ্যেরও পূর্ববর্তী উষাকালে বর্তমান থাকিয়া) বিক্ষুঃ (যজ্ঞমানগণের মধ্যে) হ্রসাদি (স্থাপিত হয়েন। অর্থাৎ সূর্যোদয়েরও পূর্বে অধ্বয়ুগণ অগ্নিধারে অগ্নিকে স্থাপন করেন) ॥২

সরলার্থ—অমর দেবগণ এবং মরণধর্মী মনুষ্যগণ উভয়েই অগ্নির অনুশাসন মানিয়া চলেন। কেন না, এই পূজ্য প্রজাপালক, অভিমত ফলপ্রদানকারী অগ্নি সূর্যোদয়েরও পূর্বে উষাকালে যজ্ঞমানগণের মধ্যে (অধ্বয়ুগণ দ্বারা) স্থাপিত হয়েন ॥২

নোথা ঋষির অগ্নিস্ততির এইটাই শেষস্কন্ধ। ইতঃপূর্বে তিনি অগ্নির নানাবিধ রূপ ও গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। এই স্কন্ধের প্রথম ঋকে তিনি অগ্নিকে মাতরিখা নামেও অভিহিত করতে কুণ্ঠা করেন নি।

মাতরিখা অন্তরিক্ষচারী বায়ু। যাস্ক বলেন—মাতা অন্তরিক্ষ আর মাতরিখা তাতে নিঃশ্বাস বা প্রাণ রূপে প্রবাহিত বায়ু। মাতরিখার বিশিষ্ট কর্ম হল অগ্নির মন্ডন এবং আবিস্করণ। অগ্নি ছিলেন গুহাহিত হয়ে মাতরিখাই তাঁকে মন্ডন করে আবিস্কার করেন। পরম ব্যোমে অগ্নি জন্মালেন যখন, তখন তিনি সবার আগে আবিস্কৃত হলেন মাতরিখার কাছে। সেই লোকাদি অগ্নিকে মাতরিখাই এখানে নিয়ে এলেন সূদূর হতে, দ্রালোক হতে, মনুর কাছে, ভৃগুর কাছে। (বে, মী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৮২) এই মাতরিখা বায়ুকে ঋষি অগ্নি তুল্যই মনে করেন। দ্বিতীয় ঋকে নোথাঋষি অগ্নির আধান সম্বন্ধেই যেন বর্ণনা দিতে চেয়েছেন। “উশিজঃ” এই পদটিতে বৈদিক যুগের শ্রোত অগ্নির পরিচয় মিলে। অমর দেবগণের উদ্দেশ্যে যে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হত—তাকে বলা হত “আহবনীয় অগ্নি”। আর “হবিষ্যন্তুঃ যে চ মর্ত্যঃ”—হবিঃ প্রদানকারী মরণধর্মী মনুষ্যগণ যে অগ্নি রক্ষা করতেন, তাকে বলা হত “গার্হপত্য অগ্নি”। এই অগ্নি গৃহপতির অগ্নি। গৃহপতি তাঁকেই বলা হত—যিনি বিবাহিত। বিবাহের পর গৃহমধ্যে সপত্নীক গৃহস্থ এই অগ্নি স্থাপন করতেন। এই অগ্নিকেই গৃহকর্তা নামে অভিহিত করা হত। আরও একটি অগ্নি গৃহপতি রক্ষা করতেন—নেটি “দক্ষিণাগ্নি”, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সেই অগ্নিতে তর্পণ করা হত। প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁর গৃহমধ্যে এই তিনটি অগ্নি রক্ষা করতেন—একটি “আহবনীয়”, একটি “গার্হপত্য” আর একটি “দক্ষিণাগ্নি”। এই অগ্নি প্রতিষ্ঠা কর্মকেই অগ্ন্যধান বলা হত।

রেণুকণা ঘোষ

সেবাদায়ী

ততঃ কিম্?

অথ শ্রীগুরু-আবির্ভাব লীলা-প্রসঙ্গঃ।

সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের বহিরঙ্গ জীবন, কর্ম, সাধনা বিশেষ ধর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বন নীতির প্রবর্তক ও তদনুকূল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-নির্মাণনৈপুণ্য সাধারণতঃ সুবিদিত। কিন্তু এই মহাজীবনের নেপথ্যে অপর একটি নিগূঢ় দিক ছিল যাহা শুধু স্বল্পবিদিত নহে, বহির্জগতে প্রায় অবিজ্ঞতই বলা চলে। তাঁর ভগবত্তা, ভগবৎ স্বরূপলীলা এই ঈশ্বরমানবের সত্যাকার পরিচয় এবং নরতনু আশ্রয়ে এই পুণ্য ভারতভূমিতে পরমের আবির্ভাবের মুখ্য তাৎপর্য যাহা মুষ্টিমেয় একটি চক্রের মধ্যেই অবগুপ্ত। বর্তমান বিংশশতকের মধ্যাহ্নে মহানগরী কলিকাতার অনতিদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বক্ষ্যমান সম্পাদকীয় লেখকের চোখের সম্মুখেই (১৯৩২—৫৯) দূর হইতে নয়, অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য-সাহচর্যের মধ্যে। তবু অকণ্টেই স্বীকার্য যে, মহাগুরুর দেহে অবস্থানকালে এই অপূর্ব যুগলীলার নিগূঢ় অভিসন্ধি ও তাৎপর্য লেখকের বহু সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাকৃত মনবুদ্ধির অবধারণে আসে নাই।—যৎকিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে সদগুরুর অন্তর্ধানের (১৯৫৯) অনেক দিন পরে তাঁর অজস্রবাণী, বিশেষ সজ্জনিন্যামক প্রভাতবাণীর প্রতিভাবনায়। লেখকের আশ্চর্য বিস্ময়াভূতির মধ্যে আজ কেবলই অনুতাপ হয় কেন এই ঈশ্বরমানবের প্রকটকালে তাঁর স্বরূপ-মহিমা বোধগম্য করিতে পারে নাই—দেহাববোধবিমূঢ় চেতনা কেন তাঁকে অবিরাম কর্ম হাসি-কৌতুকের আর ভাঙ্ছিলোর যবনিকার আড়ালে অবহেলায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।

তাই আজ বিশাল বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম পদ-রচয়িতা (চৈতন্যমঙ্গল) নরহরি ঠাকুরের মতোই ইচ্ছা হয়—

“গৌরলীলা দর্শনে ইচ্ছা বড় হয় মনে

ভাষায় লিখিয়া কিছু রাখি।”

জীবনসাম্রাজ্যে অযোগ্য লেখকেরও সাধ বড় হয়

নে এই অপূর্ব যুগলীলার চমৎকারীত্ব দেশ ও দশেম সাহসে উপস্থিত করে।

সঙ্গে সঙ্গেই এই অপণ্ডিত অক্ষম লেখকের ঠাকুর নরহরির মতোই আশঙ্কা জাগে চিত্তে—

“গৌর গদাধর লীলা

শুনি দ্রবয়ে শীলা

কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।

সারদা লিখেন যদি

নিরন্তর নিরবধি

কহে সদা শিব পঞ্চানন।”

সুতরাং এই মহামানবের লীলা-প্রসঙ্গ যাঁর লীলা তাঁরই জবানীতে লিপিবদ্ধ করা নিরাপদ—কোন অঙ্গহানি হইবার আশঙ্কা থাকে না।

আজ হইতে ৯৪ বৎসর পূর্বে (১৮৮৩) ২২-এ পৌষ এই বিশ্ব-চৈতন্যের মূর্ত বিগ্রহের ধূলার ধরণীতে আবির্ভাব হয় নরতনু আশ্রয়ে পরমতত্ত্বের আলৌকিক জন্মলীলা তত্ত্বমূর্তির বাচনিকই এখানে প্রদত্ত হইল।

১৪ই বৈশাখ রবিবার ১৩৫৯ (২৭।৪।৫৮) সালে প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধনী সভায় সজ্জগুরুজী যে ভাষণ দেন তাহাতে তাঁর জন্ম রহস্যের ইঙ্গিত মিলে—

“১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেহান্তে আকাশে ছুটীছুটির কথা আপনাই বলিয়াছি। মাতৃগর্ভে প্রবেশের দিন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের দোল পূর্ণিমায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে পৌষ ভূমি স্পর্শ করিয়া বিগত চেতন হই। ভবিষ্যতের সঙ্কট ভয়ভূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা তোমরা আমার মুখেই শুনিয়াছ। তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া চেতনা হারাই। নব প্রাণ পাইলাম দেবতার বরে। দেবকার্য সংসাধিত করাই জীবনের ধর্ম বলিয়া জানিয়াছি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরকে বুকে করিয়াই রহিয়াছি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পূজা আমার সাজ হইয়াছে—এক মহিষসী নারীমূর্তিকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবন আমার ছুটিয়াছে আপনাকে প্রস্তুত করার জন্যই দেবতার কাজে।”

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সজ্জগুরুজী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২-এ পৌষ। তিনি পূর্ব জন্মের দেহান্তরের (১৮৮১) কথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিতা

স্বরূপসিদ্ধ দেবমানবের এই চেতনা সহজাত ও স্বাভাবিক এমন কি উচ্চস্তরের সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষেরাও তাঁদের পূর্ব জন্মের কথা অবগত হন, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, আচার্য-শঙ্কর, চৈতন্য, বিজয়কৃষ্ণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার পুরুষেরা এই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন ‘হে অজ্ঞান ইহার পূর্বে তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে। তুমি তা জান না। আমি অনন্ত হইয়াও যুগপ্রয়োজনে সনাতন ধর্ম সংস্থাপনার্থায়, যুগে যুগে ‘আত্মমায়া সসীম নরদেহাশ্রয়ে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।’

সাধারণ মানুষ প্রাকৃত সংস্কার বশে বার বার নানা যোগীভে জন্মান্তরে বিবর্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু অসাধারণ ঈশ্বরমানবের জন্ম হয় স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবে—ঐক জন্ম নয় যাহা ছিল অপ্রকট তাহাই প্রকট হয়।

সজ্জগুরুজীর জন্ম, জীবন, কর্ম ও সাধনা গভীরভাবে অনুধারণ করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, তিনি ছিলেন ঐশী শক্তিরই যুগপ্রকাশ। তাঁর জন্মান্তরের স্বরূপস্মৃতি যাহার ইঙ্গিতমাত্র অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন ভাষণে দিয়াছেন তাহা এই তাৎপর্যই বহন করে। অন্তরঙ্গ সজ্জগুরু বহুবার তিনি তাঁর নিত্য স্বরূপের আভাস দিয়াছেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একদা যে অবজ্ঞা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল ঐকান্তিক শরণাগতিতে আজ মোহমুক্ত চেতনায় সজ্জগুরুস্বরূপের খানিকটা উন্মোচিত হইয়াছে, এই নিগূঢ় অনুভবের কথা অকুণ্ঠে ঘোষণা করিতে কোন সঙ্কোচ লেখকের নাই।

ইহার পর সজ্জগুরুজী তাঁর মিশন জীবন ও বিবর্তনের একটা রূপরেখা অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন।

“১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের আগমন। ইহার পূর্বে নিম্নলিখিত জীবনসাধনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল অসংখ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ সব হইতে নিরন্তর করিয়া আত্মদানে দীক্ষা দিলেন। এই জীবন চলিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

“১৯২১ খৃষ্টাব্দে নবজীবনের সূত্রপাত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্দির ঘাড়ে চাপিল। অতীত সাধনার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আবার মল্ল ধ্বনিই উঠিল শ্রীমন্দির কম্পিত

করিয়া। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিগ্রহপূজা জীবনে জাঁকিয়া বসিল। মূর্তিহীন পূজকের দল ছুটি লইলেন আমার ভাবান্তর দর্শনে। সংসার হইতে ছুটি দিলেন ভগবান ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাহারই জের চলিল। নূতন করিয়া জীবনের সূত্রপাত হইল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে।

“কৃষ্টি-চলিল অপার্থিব অসাধারণ। মানুষ আসিল এবং প্রশ্ন করিল—তাহার সন্ধান কে করে? কি লইয়া গেল, কি দিয়া গেল তাহার সন্ধান রাখার আমার প্রয়োজন হয় নাই। আমি চাহিয়াছি ভাগবত প্রেরণাসিদ্ধ করিতে। যে কেহ আমার সম্মুখে আসুক ‘আমার হও বলিয়া’ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছি। যাহাদের জন্ম এই প্রেরণা সিদ্ধ করার জন্য তাহারা চিরদিনের। অনেকের বিদায় আমার প্রেরণায় এক বিন্দু দায়ে নহে। যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহা কেমন করিয়া ব্যর্থ হইতে পারে?

“১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ শেষ হইল। হিসাবের অঙ্ক কষিয়া দেখিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি কি ভাবিতে পারি এই দেহ, প্রাণ, মন লইয়া যে কর্ম হয়, তাহা আমার? বহুদিন সাধিয়া আপনাকে যন্ত্ররূপেই ভগবানের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। তারপর আমার কিছু ভাবিবার থাকে কি? যারা আসে ভগবানের কাজে যোগ দিবে বলিয়া, তাহাদের ‘এই’ বলিয়া সর্বস্বের অধিকারী করি। ঈশ্বর প্রেরণায় পুষ্ট হইয়া যখন তাহারা বিদায় লয়, হাসিয়া বলি ইহার অধিক লওয়ার সাধ্য অনেকের নাই। যাহাদের জন্ম ঈশ্বর প্রেরণার সম্যক সিদ্ধির জন্য, তাহারাই পুনঃ পুনঃ আমার জন্য জন্মিবে এবং মরিবে। আমি যে এই জগৎ জন্মিয়াছি।

“১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যোগক্ষেম বহন করার দায়িত্ব আমাকেই লইতে হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দায় বহনের সাধ্য লক্ষ্যে পড়ে। তারপর জানিনা, এই আধার কি ভাবে ভাগবত প্রেরণা বহন করিবে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যাহারা আমার সঙ্গীরূপে কর্মরত তাহাদের জীবনের দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের, একথা আমি নিঃসংশয়েই তোমাদের বলিব।

“আজিকার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় আর একটি সত্য থকা

তোমাদের শুনাইয়া রাখি। তোমরা স্মরণে রাখিও তোমাদের জন্ম ভগবানের জন্ম। এই ভাগবত প্রেরণা আমাকেই আশ্রয় দিতে হইয়াছে জীবন আরম্ভে। অতএব তোমাদের নির্ভয় কণ্ঠে বলি ‘আমার জীবনে লভিয়া জীবন সফল করবে দেশ।’

“এ দেশ চণ্ডীদাসের নিমাইয়ের। এ দেশ রামপ্রসাদের, রামকৃষ্ণের। শক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় সম্মিলিত হইয়াছে রঘুনন্দনের ন্যায়ের বিধান। এই ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া উঠিলেন দুই মহাপুরুষ। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ। আমাকেও এই দুই ক্ষেত্রের ধূলি কুড়াইয়া মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে ঈশ্বরবিধানে। আজ এই দুই মহাপুরুষের অন্তর্দ্বান হইয়াছে। তিন ক্ষেত্রেরই কর্ম অসমাপ্ত থাকিয়া গিয়াছে। আজ প্রবর্তক সজ্জকেই ত্রিবেণী-তীরে স্নান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইবে শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় এই প্রস্থানত্রয়ের উপর সনাতন ভারতের প্রতিষ্ঠা হইবে। হে উদীয়মান প্রবর্তক সজ্জ, এই জন্মই তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদের গুরুর আসনে দাঁড়াইয়া সমুচ্চ কণ্ঠেই বলি ‘এহি’। তোমরা কোনক্রমেই বঞ্চিত হইবে না।

“শুধু প্রেমের সাধনায় যে বৈষ্ণব জাতি গড়ার মন্ত্র নবদ্বীপচন্দ্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে সাধু সঙ্গ, কীর্তন, ভগবত শ্রবণ, গুরুতীরে বাস আর বিগ্রহ পূজা। শক্তি সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বিবেকানন্দকে জাতি গড়ার মন্ত্র দিয়াই অন্তহত হইলেন। সেই মন্ত্রের মূর্তি দিতে স্বামিজী ঘুরিলেন নিখিল বিষ্ণু। আর অরবিন্দের মন্ত্র মূর্তি দিতে প্রয়াস চলিয়াছে। সজ্জকে এই জন্ম আমি সর্বতোভাবে উদ্যত হইতে বলিব।

“সজ্জের কয়েকটি সাধন মন্ত্র জীবনে যদি অধিকৃত হয়, তবে সজ্জ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মানুষকে সর্বপ্রথমে পূর্ব সম্বন্ধ হইতে একেবারে বহির্গত হইয়া আসিতে হইবে। ইহাই হইতেছে গোত্রান্তরিত জীবন। পূর্ব সম্বন্ধ রাখিয়া চলি যতদিন, ততদিন সজ্জ সৃষ্ণনের কল্পনা ভিত্তিহীন হইয়াই থাকিবে। নূতন মানুষ যাহারা হইবেন, তাহাদের সঙ্গই কি সাধুসঙ্গ নহে? তারপর

প্রত্যেকে যদি নিয়মিত পাঁচবার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা কি ভগবানের কীর্তন, ভগবত শ্রবণ নহে? উপরন্তু প্রত্যেকেই যদি ব্রহ্মচারী না হয়, যদি নূতন সম্বন্ধ কেহ সৃষ্টি করিয়া চলে, তবে সজ্জ সৃষ্টি কি সার্থক হইবে? এইজন্য নৈতিক ব্রহ্মচর্যের সাধন সজ্জ করিয়া চলিবে। স্বাবলম্বী না হইয়া জীবন যাপনের প্রবৃত্তি নিরলস জীবন দেয় না তাই প্রত্যেকেই শ্রম দিতে হইবে এবং শ্রমের কড়ি এক্যবদ্ধভাবে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবন হইবে গোত্রান্তরিত, উপাসনা-রত, ব্রহ্মচর্যাপূত, স্বাবলম্বনের সাধনসিদ্ধ এবং ধনৈক্য রক্ষা—এই পাঁচটি বিষয়ের সম্মতি লইয়াই সজ্জ সৃষ্টি সম্ভব। নতুবা ব্যক্তিগত জীবনের পুঁতিই স্বাভাবিক।

“ব্যক্তিগত জীবন লইয়া সংহতি সৃষ্টি করা যায়। সজ্জ ইহাতে গড়ে না। এই প্রেরণা লইয়া যাহাদের জন্ম, তাহারা ইহা সিদ্ধ করিবে। আমি যখন সজ্জগুরুর আসনে দাঁড়াইয়াছি, তখন আমি নির্ভীক কণ্ঠে বলিব—“মামেকং শরণং ব্রজ”।

“৩০ বৎসরের অক্ষয় তৃতীয়া অচিরেই শেষ হইবে। ইহারও নয় বৎসর পূর্বে সজ্জ সংসারের রচনা। যাহাদের এই প্রেরণার জন্মই জন্ম, তাহারা কোন মতেই আত্মসংশয় পোষণ করিবে না। আমার প্রতি অনাস্থা ও সংশয় বিপর্যই থাকিয়া আনে। যাহাদের জন্ম এই জন্ম নহে, তাহাদেরও এই অসাধারণ তত্ত্বের দিকে অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। কেননা, ভগবান এক হইতে বহু হইয়াছেন। বহু চলিবে একেরই লক্ষ্যে। যদি শতজন মানুষও এই এককে আশ্রয় করিয়া চলে, তাহাদেরই জীবনে কোটি কোটি মানুষ দিব্যজন্ম লাভ করিবে। আজ এই পুণ্য দিনে আমরা জীবনের ইতিহাস উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া সজ্জের পঞ্চনীতির প্রতি সম্বন্ধ হইব। এই সজ্জসৃষ্টি যদি সফল হয় জীবনে, তবেই বহু অক্ষম, অপদার্থ জীবনের ভার বহিবার সাধ্য অনায়াসেই লাভ করিব। সজ্জ একটা শক্তি। জাতিকে সজ্জই আশ্রয় দিবে।”

উপরি উক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে সজ্জগুরুজী একস্থানে তাঁর জীবনত্রত সমন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। “আজ

প্রবর্তক সজ্জকেই ত্রিবেণী (জ্ঞান-শক্তি-প্রেম) তীরে
স্নান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইবে জ্ঞতি স্মৃতি ন্যায় এই
প্রস্থানত্রয়ের উপর সনাতন ভারতের প্রতিষ্ঠা হইবে।
হে উদীয়মান প্রবর্তক সজ্জ এই জগৎই তোমাদের জন্ম
আমি তোমাদের গুরুর আসনে দাঁড়াইয়া সমুচ্চ
কণ্ঠে বলি, এই তোমরা কোন ক্রমেই বঞ্চিত
হইবে না।”

এই সনাতন ভারতের পুনরুজ্জ্বল কেন সিদ্ধ হইবে
তাহারও দিক্‌দর্শন তিনি দিয়াছেন—“আমার জীবনে
লভিয়া জীবন সফল কররে দেশ।” ভারতাত্মার যে মূর্তি
বিগ্রহ তিনি ছিলেন তাহা তাঁর এই অকুণ্ঠ আত্ম-স্বীকার
উক্তি সূচিত করে।

তাই নিঃসন্দেহ বলিতে পারিয়াছেন ‘মামেকং শরণং
ব্রজ’।

এখানে লক্ষণীয় যে, ভারতাত্মার নরদেহে মূর্তি হওয়া
যে অভিসন্ধিতে তাহা হইতেছে যুগমানি মুক্ত করিয়া
সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সেই উদ্দেশ্যই সজ্জগুরুজীর জীবন,
কর্ম ও মিশন বহন করে। বর্তমান যুগে সনাতন ভারতবর্ষ
যে অভূতপূর্ব অর্থমুখ্য মার্কার্স গণপ্রিয় চ্যালেঞ্জের
সম্মুখীন হইয়াছে ভৌমচৈতন্যের দ্বারা দাঁড়াইয়া সমগ্র
প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্মের অনড় আড়ম্বৃত্যের বিক্ষিপ
বিজ্রোহের বিরুদ্ধে সনাতন ভারতবর্ষের দিক হইতে
ধর্মক্ষেত্রে অর্থকে পুরোভাবে ধরিয়া তাহারই প্রত্যুত্তর
দিয়াছেন। গতানুগতিক ইহা বিমুখধর্ম ধারা ও ধারণার
বৈপ্লবিক মোড় পরিবর্তন ইহা সুনিশ্চিত। এই
হিসাবে তিনি যে যুগাবতার ছিলেন, তাহা
অনস্বীকার্য।

রাধারমণ চৌধুরী

হে মহান!

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

(আষাঢ়, ১৩৬৬ সজ্জগুরুস্মৃতি সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

আপনি মহৎ
মহীয়ান আপনি,
আপনার সেবাত্রত
প্রত্যেকের অন্তরে
সৌধ নির্মাণ করে রেখেছে—
নানা রকমে প্রীতিকুঞ্জ রচনা করে—
আপনার অস্তিত্বকে ভুলতে পারি না,
মনে হয়—
আপনি আছেন,
সেই অস্তিত্ব নিয়েই আছেন।
আপনার বিবাহ জীবনের প্রাণন-রশ্মি
সব স্মৃতিকে
উজ্জ্বল করে
উজ্জ্বল উদ্দীপনায়

প্রত্যেককে
জীবনের অধিকারী করে তুলুক
আমরণ-তপা করে,—
বৈঁচে থাকুক সবাই,—
আপনার কৃতি ঐশ্বর্য
সবাইকে সুসংহত করে
পারস্পরিক পরিবেদনার
সুপরিবেশনে
ঐশ্বর্যশালী করে তুলুক সবাইকে—
আমার একান্ত যিনি
তাঁর কাছে
আমার এই প্রীতি প্রার্থনা
আপনার স্মৃতি স্পর্শে
সার্থক হয়ে উঠুক।



সংযগুরু শ্রীমতিলাল

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

তোমার প্রসন্ন মূর্তি ধ্যানায়িত দৃষ্টি দিয়া দেখি
দেখি এক শুভ সূচনায়—

তোমার আশ্রমকুঞ্জে বিশ্রান্তির শান্তি অবকাশে
আসি যবে প্রাণ দ্যোতনায়,
তখনি এ প্রাণপাত্র ভরে দাও তব সুধারসে
নির্বাপণে সর্ব দুখ জ্বালা।

তোমার উদার বক্ষে রাখিয়াছ সবার আসন
গেঁথে নিয়ে বরণের-মালা।

তাইতো বরণ্য তুমি, প্রাণভূমে পাতিয়াছি ঠাঁই
বরিয়াছি রিক্ত উপচারে ;

একটি পরম সত্য মর্মলোকে শুনিতে যে পাই
তোমারি সে বাণীর স্বাক্ষরে।

তাইতো জীবনছন্দে অনুরণি উঠে বার বার
তোমারি সে সত্যের গরিমা,

শাস্ত্রত সে সত্যবাণী চিরন্তন কালবক্ষে রাখি
এনে দাও প্রাণের মহিমা।

তোমার চেতনাদীপ্তি একদা সে শৃঙ্খলিত যুগে
অধীনতা-পাশ মুক্তি লাগি’

জাতির সম্মুখে ধরি’ ফুকানিলে কল্পুরব তব
হে সন্ন্যাসী, হে বীর বৈরাগী।

তাই তুমি যুগ-ঋষি বিপ্লবের বহিঃশিখা তব
স্পর্শিয়াছে মৃতকল্প প্রাণে

দুঃসহ বন্ধনজ্বালা অধীনতা টুটিয়াছ তুমি
তোমারি সে উদাত্ত আস্থানে।

আজ তব জন্মদিন, আজ তব মহা আবির্ভাব
ঋষিবর মহা প্রবর্তক,

কল্যাণ স্থাপনকর্মে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি
এক সাথে করেছ সার্থক।

তোমার প্রয়াস নিত্য নবসজ্জ্ব সৃজনের মাঝে
দেখি আজ্ দিব্য রূপায়ণ

এ মর্ত্যধূলির মাঝে স্বর্গসৃষ্টি কল্পস্বপ্ন নিয়া
দেবজন্ম করেছ বোধন।

তব তীর্থক্ষেত্রে আসি বার বার যাহা কিছু লভি

তাই আজ সাথে আনিলাম,

হে প্রণম্য সজ্জগুরু, তব দুটি পাদপদ্ম ’পরে

প্রণমিয়া তাই রাখিলাম।

আচার্য মতিলালের 'জীবনদর্শন'

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী, ধর্মতত্ত্বাচার্য, এম-এ, ডক্টরফিল

প্রবর্তকসংজ্ঞের প্রতিষ্ঠাত্বরূপে প্রবর্তক মনীষী মতিলাল রায় (১৮৮৩-১৯৫৯) বর্তমান যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানিক যুগপ্রবর্তক। বঙ্গদেশের আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার মহদবদান অতিশয় উল্লেখ্য—ইহাই তাঁহার বহুমুখী নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচায়ক বটে। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যের দিক্ দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বসূচক বিপুল অবদান ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির অভ্যুদয়কল্পে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিভাবে পর-প্রত্যাক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বকীয় স্বল্প-সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্ভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে স্বপ্রতিষ্ঠা হওয়া যায়, নিজের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, জাতির ও সমাজের অভ্যুদয়কল্পে স্বীয় সামর্থ্য ও সম্পত্তি অনুযায়ী আত্মবিনিয়োগ করা যায়, তিনি তাঁহার ভাস্বর নিদর্শন, দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে বটে কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পণ্ডিচেরী হইতে চন্দননগরে প্রত্যাবর্তনের পর (১৯২১ খৃঃ) শ্রীমতিলালের নানাদিকে নানাক্ষেত্রে স্ব প্রচেষ্টায় অধ্যাত্মসাধনার ফলে চিত্তের বিশেষ পরিণতি ঘটে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব মূর্ত হইয়া উঠে এবং দেশের নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সম্বন্ধবশতঃ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সেই সুনিবিড়সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে—ক্রমশঃ তিনি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধর্মের ভিত্তিতে অর্থ ও কাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সংস্কৃতির সংবিধান, সমাজের ও জাতির সংগঠন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। যাহাতে কর্মযোগের অভিব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহার নির্দেশে তাঁহার প্রবর্তিত প্রবর্তক সম্বন্ধ সক্রিয় হইতে থাকে। সংজ্ঞের আত্মসংরক্ষণের জন্ত নানাবিধ অর্থ প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অনুভূত হয় এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রের সাধক শ্রীমতিলাল কর্মী হইয়া উঠেন। তিনি কি ভাবে প্রবর্তক সম্বন্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে তথা অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু স্বকীয় প্রচেষ্টা এবং সাধনাদ্বারা—ইহা তাঁহার জীবনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস বটে, কিন্তু ততোহধিক বিস্ময়কর কাহিনী তিনি কি ভাবে প্রথমতঃ যৎসামান্য শিক্ষালাভের পর তীব্র জ্ঞানান্বেষণের এবং প্রথমে অধ্যাত্মসাধনার ফলে ক্রমশঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে—পরী ও অপরাবিদ্যার ক্ষেত্রে, অশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং স্বপ্রতিষ্ঠা হইয়া উঠেন। অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তিনি সুদৃঢ়রূপে আপনাকে জীবনসমস্যা সমাধানকল্পে সমর্থ করিয়া তুলেন এবং তৎপ্রবর্তিত প্রবর্তকসম্বন্ধে জীবনে স্বাবলম্বী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

আত্মসমর্পণযোগ্য প্রবর্তকসংজ্ঞের জীবনভিত্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবদগীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জীবনের মূল প্রশ্নাবলী ও সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রয়াস তিনি করিয়াছেন এবং এই সাধনায় বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছেন। জীবনের সম্বন্ধে জীবনসমস্যার মীমাংসার সন্ধান তিনি কার্যতঃ দেশবাসিগণের গোচরে উপস্থাপিত করেন এবং নব-জীবনের ভাবগঙ্গাপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া তোলাই তিনি। তাঁহার জীবনের মহাত্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যথা কর্মীর ভূমিকায়, সাহিত্যিকের ভূমিকায়, সাধকের ভূমিকায় এবং সর্বোপরি আচার্যের ভূমিকায় তিনি মহদ্ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকল্পিত 'জীবনদর্শন' সম্বন্ধে ঈষৎ আভাস দেওয়া হইতেছে।

জীবনদর্শন—এই পারিভাষিক সংজ্ঞাটি তিনি প্রথমে জীবন সম্পর্কিত মূল, গভীর প্রশ্নাবলীর দার্শনিক পদ্ধতিতে বিচার আলোচনা অর্থে প্রয়োগ করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার উদ্ভাবিত অর্থ রূঢ় হইয়া উঠে। ইউরোপীয় দর্শনসাহিত্যেও এবিধ প্রয়োগ ['Lebensphilosophie' (জার্মান), Philosophy of life (ইংলিশ), Philosophie de la Vie (ফ্রেঞ্চ) ইত্যাদি] অনেকটা অবাচীন,

যদিও বিগত অর্ধশতাব্দীতে এই দর্শনশাখা অতিশয় ব্যাপক হইয়াছে এবং নানাদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় আচার্য মতিলালের জীবনদর্শন অনেকটা অব্যাপক এবং মূলতঃ ব্যবহারিক এবং পারমাণ্বিক ক্ষেত্রে কতিপয় মূল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যে দর্শন, যে দৃষ্টিবোধ জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাই ‘জীবনদর্শন’ বলিয়া তিনি আখ্যা দেন ও ব্যাখ্যা করেন। জীবনের মূল সমস্যা সমাধান করিলে তখন প্রাকৃত জীবনের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং প্রবর্তকসম্বন্ধে গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সত্ত্বেও সর্ববিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠানরূপে। জীবন মিথ্যা নহে, ইহা অধ্যাত্মসাধনার পথে অন্তরায় নহে; এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালাইয়াছেন, “লক্ষ্য আমাদের শূন্য নয়, লয় নয়, মোক্ষ নয়—জীবন। জীবন দিয়াই অমৃত আহৃত হইবে। স্বপ্ন নয়, সুসুপ্তি নয়, তুরীয় নয়, জাগ্রত চৈতন্য। জীবন থাকিলে সব প্রতিষ্ঠা পাইবে। তাই শূন্যবাদ, মোক্ষবাদ, অন্ধতম নূতন জাতি এই লক্ষ্য হইতে বিমূখ হইবে। ধর্ম চাই জীবনের প্রয়োজনে।”^(১) জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করাই লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে জাতির ও ব্যক্তির সাধনা অত্যাবশ্যক। অধ্যাত্মক্ষেত্রে, ত্যাগতপস্যার ক্ষেত্রে তথা জাগতিক ব্যাপারে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাগবত-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া সংসারে অভিযান চালাইতে হইবে—ইহাই সজ্ঞগুরু আচার্য মতিলালের জীবনে তাঁহার ভাষায় ‘জীবনবেদ’। ইহাজীবনেই আমাদের জীবন সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিতে হইবে—বাঁচিতে হইবে রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, অর্থক্ষেত্রে সমাজজীবনের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করিয়া। এই জীবনসাধনার অধ্যাত্মসূত্র—প্রেম ও ঐক্যের সংহতি। জাতির জীবন সহস্র ধারায় প্রবাহিত হউক মহাজীবনের অভিমুখে, প্রাণ-শক্তির উৎস স্ফুরিত হউক। জীবনের গতিপথে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া যে আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্থলে স্থলে পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারকল্পে জাতির জীবনে নব অভ্যুত্থান হউক। তাহা প্রাচীন ধর্মের

ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠুক। যাহা জাতি ও সমাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই আদর্শ এবং তাহার অনুষ্ঠানই জীবনের ধর্ম। এই জাতির অভ্যুদয় হইতে পারে নবজীবন ধর্মের অনুশীলনে এবং এই ধর্মসাধনার মূলতত্ত্ব শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণপূরক নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান। “ভারতের কুরুক্ষেত্রে, ভারতের কর্মক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে যে মন্ত্রের উদগান উঠিয়াছিল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে আমরা সেই বাণীমন্ত্রেরই আজ মূর্তি গড়িয়া তুলিতে চাই। ‘ময়ি সর্বানি কর্মানি সংশ্রাদ্যাত্মা চেতসা, (ভ.গী ৩।৩৯)—এই মন্ত্রের সাধনা জীবন দিয়া সিদ্ধ করিতে চাই...।’ শিল্পের ক্ষেত্রে তথা ব্যবসার ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে মহাশিল্পপীঠ। “ধর্ম-ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। শতক্র, বিপ্লব, বিস্তার তীরে একদিন যে উদগান উঠেছিল, নৈমিষারণ্যে যে দার্শনিকতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহলের মাঝেও দেখি সেই চিরোজ্জ্বল মহাবাণীর রূপান্তরিত জীবন্ত মূর্তি। কুরুক্ষেত্র প্রতিহিংসার লীলা ভূমি নয়, ধর্মক্ষেত্রের। নবভারত-আজ এর মর্ম উপলব্ধি কর্তে পারে না। আমি চাই সেই ধর্মের মহাবাণী ভারতের ব্যবসাকেত্রে রূপান্তরিত কর্তে—”।^(২) যে জীবনস্রোতে আমরা ভাসমান তাহা অনন্ত জীবন-প্রবাহে অন্তর্লীন, অন্তর্গত। জীবনের এবিধ দৃষ্টিবোধই তাহার জীবনদর্শনের মূলসূত্র। আজ জীবন সমস্যাই সর্বপ্রধান সমস্যা—ইহার সমাধান চাই এবং তজ্জন্ম প্রস্তুতি চাই। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের সৌধপ্রাকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার সাধনকল্পে আচার্য মতিলাল জাতির সম্মুখে তিনটি বিধান উপস্থাপিত করেন : ১। বাংলায় যাবতীয় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বীয় আদর্শে ‘আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠা’^(৩) হউক, ২। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সহযোগে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠুক, ৩। জাতি আত্মপ্রত্যয়-শীল হইয়া চলুক। সংক্ষেপে জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও পরিণতিই জাতির লক্ষ্য এবং তৎসাধনকল্পে প্রস্তুতিই

(২) বাণী ও রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) পৃ ১৪

(৩) বাণী ও রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ১৭

(৪) ভ্র: ভ, গী, ২।৭০

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথম খণ্ড) পৃ: ২৩৭

জাতির জীবন ধর্ম। ব্যক্তির বিকাশই জাতির বিকাশ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্ব স্ব বৃত্তি ও শক্তি অনুসারে স্বীয় প্রকৃতির বিকাশই ব্যক্তির ‘জীবনধর্ম’। সম্ভবতঃ তাহারই নির্দেশ দিয়াছেন এবং ব্যক্তির ও জাতির পক্ষে সাধনমার্গ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনুশাসন দিয়া গিয়াছেন। যে মতবাদের ভিত্তিতে, যে জীবনদর্শনের রূপায়ণে ব্যবহারিক সোপানমার্গ গড়িয়া উঠিয়াছে সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে।

II জীবনদর্শন

আচার্য মতিলাল তাঁহার ‘জীবনদর্শন’ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যমূলক স্বপ্রণীত ‘বেদান্তদর্শন’ নামক গ্রন্থে এবং ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্র সমরাজ্ঞে মহর্ষি বেদ-বাস কর্তৃক গ্রথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আশ্রয় করিয়া এবং দার্শনিক লিখনপদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক তাঁহার জীবন-দর্শনবাদ তত্ত্বতঃ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রাজ্ঞ ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইস্থলে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ অতি সংক্ষেপে তাঁহার রচনার ভিত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। আধুনিকযুগে দর্শনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থরস বঙ্গভাষার অপূর্ব সম্পৎ, নানা জটিল তত্ত্বরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া অভিনব আলোক সম্পাত করিয়াছে, যদ্যপি বিতর্কমূলক যেহেতু তিনি পূর্বাচার্যগণের মতবাদ বিশেষতঃ সম্পূর্ণ রূপে পরিপন্থী অদ্বৈতবাদী, মুখ্যতঃ উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং উভয় মহাগ্রন্থেই স্ব-পরিকল্পিত জীবনবাদের উন্মেষ ও বিকাশ দেখাইয়াছেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদমূলক নিম্বার্কভাষ্যে (সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতক) এবং দ্বৈতবাদমূলক মাধবভাষ্যে (দ্বাদশ শতক) নানা মূল প্রশ্ন সম্পর্কে জীবনদর্শনমুচক মতবাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি দিব্যজীবনবাদমূলক যে মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যেভাবে এই উভয় মহাগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র কিম্বা ভগবদ্গীতা (৪) কোন সম্প্রদায়-

লব্ধ দার্শনিক মতবাদের সম্পূর্ণ সমর্থক নহে, তাহাতে নানাবিধ দার্শনিক মতবাদের আভাস রহিয়াছে। আচার্য মতিলাল এই মহাগ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার জীবনবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এইস্থলে বাদানুবাদ পরিহার পূর্বক তাহার সন্ধান-সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। প্রথমেই তাঁহার দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি মায়াবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদী নহেন, তিনি জীবনবাদী। এই বস্তু জগৎ/বিকারশীল হইলেও সত্য; প্রাণিজগৎ দৈবীসত্তায় অনুপ্রাণিত। জগৎ-সংসার মিথ্যা নহে, মায়ার বিজ্ঞপ্তন নহে—ইহা সত্যের ভিত্তিতে নির্মায়মান। আচার্য মতিলালের ধারণায় মায়াবাদ জাতিকে বিভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তিনি মায়াবাদ অযৌক্তিক, অনুপপন্ন, বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেহেতু এই মায়াবাদ জীবনকে অস্বীকার করিয়াছে, সত্য বলিয়া ‘অস্বীকার’ করে নাই এবং মূলতঃ জীবনবাদ বিরোধী। তিনি ইহজীবনেই ভাগবত জীবনের উন্মেষ রহিয়াছে বলিয়া ইহা সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তৎকৃত ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা জীবনভাষ্য বলিয়া যথার্থতঃই সংজ্ঞিত ও অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে সূচিত হইয়াছে কিভাবে জীবনের যথার্থস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবনের সেই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া মানব দিব্যজীবনের অধিকারী হইতে পারে—এই মহাবাণী গ্রন্থকার তাঁহার অতুল্য মহামূল্য গ্রন্থের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছেন। জীবনবাদের মর্মার্থ তাঁহার ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে: “ভারতের সংস্কৃতি ব্রহ্মকে, জগৎকে ও জীবকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। ইহা জীবনবাদের কথা, কিন্তু আচার্য শংকর জীব ও জগৎ স্বপ্ন ও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহা আচার্যদেবের কঠোর যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠা পাইলেও উহা জাগ্রৎ সৃষ্টির কল্যাণকর মতবাদ নহে। জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর অংশ ও অংশীভাব, ভেদ ও অভেদানুভূতি স্বীকার করিলে জীবের মধ্যে আনন্দের অভাব হয় না, মুক্তির আশ্বাদ হইতে জীব বঞ্চিত হয় না। ইহা সত্যের সহিত জীবের অখণ্ডানুভূতিতে জীবের যে প্রকৃতি হয় তাহাই দিব্য-

(৪) ব্রহ্মসূত্র পূর্ণত অদ্বৈতমতবাদী নহে ইহাতে অস্বাভাবিক মতবাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, তাহা লেখককর্তৃক ‘বেদান্তদর্শন’ (অবতরনিকা) গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকৃতি বা দিব্যস্বভাব। ঈশ্বরের সহিত অখণ্ডানুভূতির উপর “সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনবাদই ভাগবতধর্ম।”

ব্রহ্মসূত্রের বহু সূত্র সম্পর্কার্থদোতক নহে এবং অধিকরণ-বিভাগও সুস্পষ্ট নহে। (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জগৎ ইত্যাদি মূল বিষয়ে সূত্রকারের মূল বক্তব্য বহুলাংশে অনির্ণেয়। তদুপরি ব্রহ্মসূত্রের বহু সূত্র সন্ধিগ্ধার্থক এবং অনেকার্থদোতক (৬) এবং ব্রহ্ম সূত্রের মূলবিষয়ক বহু সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (৭) আচার্য মতিলালের ব্রহ্মসূত্রের সন্ধিগ্ধার্থক সূত্রগুলির ব্যাখ্যা তাঁহার মতবাদের পরিপোষক বটে, কিন্তু মূলতঃ অনুপগম্য নহে, তিনি যুক্তি প্রমাণ উপগম্য করিয়া তাঁহার জীবনদর্শনবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তথা ভারতীয় দর্শনের বহু মূল প্রমাবলী সম্পর্কে বিভিন্নমতবাদের প্রচুর সন্ধান নিগূঢ় রহিয়াছে। প্রবর্তক সঙ্ঘগুরুর বেদান্তদর্শন এবম্বিধ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রামাণিক মহাগ্রন্থ।

তিনি তাঁহার জীবনবাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় দিয়াছেন এবং ভগবদগীতাগ্রন্থে ভাগবত জীবনবাদের প্রতিজ্ঞা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার সুদৃঢ় অভিমত এই যে সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ে যে দ্বন্দ্ব, ইহা বাদানুবাদমাত্র এবং এই দ্বিবিধ রূপই ব্রহ্মবিষয়ক, সগুণ উপাসনায় ক্রমযুক্তি আর নিগুণ উপাসনায় সন্দোহযুক্তি। ব্রহ্ম একাধারে সগুণ

ও নিগুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, সাকার ও নিরাকার এবং জীবব্রহ্মের অংশভূত, অভিন্ন হইলেও ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু যুক্তজীব পরমাত্মার সর্বাংশভূত হন, তিনি ব্রহ্মানন্দের আনন্দ পাইয়া থাকেন, ‘ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ’। আচার্যদেব জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তিনি জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয়বাদী। বৈষ্ণব আচার্যগণের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁহার ব্যাখ্যার বহুলাংশে একমত্য ও সামঞ্জস্য আছে বটে, তবে তাঁহার ‘দিব্য জীবনবাদ’ ব্রহ্ম-সূত্র ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, যদিও এই মতবাদ স্থলে স্থলে বিতর্কমূলক। অধুনা এই প্রসঙ্গে অধিকতর বিচার আলোচনা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক দেখাইবে। বর্তমান লেখক অদ্বৈতবাদী বলিয়া ইহার উল্লেখমাত্র করিলেন। এখানে সঙ্ঘগুরুর জীবন-দর্শনমূলক ভাষ্যের গুরুত্ব প্রদর্শন করাই অভিপ্রেত।

অধুনা শ্রীমন্তগবদগীতা প্রসঙ্গে আচার্যদেবের অবদান সম্বন্ধে ঈষৎ আলোচনা করা হইতেছে, ভগবদগীতাতেই তাঁহার জীবনদর্শন বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় গীতা একখানি দার্শনিক গ্রন্থমাত্র নহে, ইহা দিব্যজীবনের নববেদ এবং ইহার ভিত্তিতেই তাঁহার জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। গীতার যোগজীবনের যোগ, লয়ের যোগ নহে। (৮) ইহাতে রহিয়াছে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণযোগের নির্দেশ ও অনুশাসন এবং গীতোক্ত আত্মসমর্পণযোগ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়মূলক। নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার যোগের মূল ভূমিকা—নবটীকাকার আচার্য মতিলাল এই সিদ্ধান্ত উপগম্য করিয়াছেন এবং ‘তাঁহার মতে গীতায় কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড ‘এই দুই পথই নাকচ’ হইয়াছে। (৯) গীতায় কর্ম ও জ্ঞান বেদোক্ত কর্ম ও জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র আলোকে ব্যাখ্যাত হইয়া উভয়ই যোগজীবনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে গীতাতে জ্ঞান ও কর্মে মূলগত কোন পার্থক্য নাই।

(৫) প্র. বেদান্তদর্শন (দ্বিতীয় সংস্করণ), লেখকের অবতরণিকা পৃ: ৩২

(৬) জ: বিভিন্ন ব্রহ্মসূত্র সঙ্কলন।

(৭) সন্ধিগ্ধ ও অনেকার্থদোতক সূত্রসমূহ—১।১।১২।১৯, ১।১।৩১।৩২, ১।৪।৩, ২।১।৩২-৪০, ২।৪।৫-৬।৩।১৭, ৩।২।২২-২৩, ৩।৩।১৬-১৭, ৩।৩।২৬, ৩।৩।১৫, ৩।৩।৬৪।

পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ সম্পর্কে—২।১।১৪

মায়াবাদ সম্পর্কে ৩।২।৩

ব্রহ্ম ও জীবসম্পর্কে ভেদমূচক সূত্রাদি ১।১।১৬-১৭, ১৯, ২১। ১।২।৪ ৬-৮, ১১, ১২, ২০ : ১।৩।২ ৫, ৭, ১৯

ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সম্পর্কে ১।১।১২-১৯, ৩।২।১১-২১, ৩।৩।২৯, ৩২ ৩৯ ৩।৪।৫১-৫২

জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ২।৩।২-৫৩

উপযুক্ত ব্রহ্মসূত্র সংখ্যা নির্দেশ শঙ্করভাষ্যানুযায়ী।

(৮) শ্রীমন্তগবদগীতা (প্রথমখণ্ড) পৃ: ৩৬ ১৬৪

(৯) শ্রীমন্তগবদগীতা (দ্বিতীয়খণ্ড) পৃ: ১, ১৩৯, ২২৩-২২৮

“...এই কর্ম বেদবাদ নহে, বেদ প্রতিষ্ঠিত জীবনবাদ। আর জ্ঞান ও মায়াদ নহে, উহা জাগ্রৎজীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ ও সুপ্রতিষ্ঠা। গীতার যোগে জীবনই জয়যুক্ত হইয়াছে।” (১০) ভগবদ্গীতাতে (২।৫৫-৭২) যে স্থিতধী ও স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই অসাধারণ জীবনাদর্শের নিখুঁত চিত্র এবং এই স্থলে জীবনধর্মের কথাই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। মুখশান্তি-ময় জীবনধারণের জন্ম ও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশীভূত করিতে হইবে ও তজ্জন্ম মনোবুদ্ধি ঈশ্বরে সংযুক্ত করিতে হইবে। (১১) শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা অনুপাদেয়। ভগবদ্গীতাতে ‘আত্মরতি’ ‘আত্মতৃপ্ত’ মানবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে (১২) তিনি সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন : “গীতাকে ভারতের মোক্ষবাদী সন্ন্যাসী প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন, সম্প্রতি গীতার ভাষ্যের আবর্তভেদ করিয়া ‘যোগযুক্ত জীবন’ ইহার মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গীতা চায়—‘দিব্য জীবন’ আর সে চাওয়া কোন ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধির এষণা নহে, পুরুষোত্তমের ইচ্ছা—।” (১৩) সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত স্বধর্ম শ্রেয়স্কর (১৪)—এই স্থলে ‘স্বধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রত্যেকের জীবনধর্ম স্বতন্ত্র রাখিয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবার যে বিচিত্র ধারা, ইহা অসংখ্যপ্রকারে পৃথক হইলেও ব্যক্তিবাদকে সার্থক করিয়া বিরাট সমষ্টিপুরুষে সংযুক্ত করিয়া লওয়া।” (১৫) গীতোক্ত মোক্ষহেতু সাধনমার্গ কি এই প্রসঙ্গে সজ্জগুরু তাঁহার গ্রন্থে বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন; তাঁহার বিবেচনায় : “মোক্ষ শব্দের চলিতার্থ—জীবন হইতে মুক্তি, নির্বাণ লাভ। গীতায় এই ধর্মের সমর্থন কোথাও নাই; জীবন সিদ্ধ করার সাধনাই গীতার ঋষি প্রবর্তন করিয়াছেন।” (১৬) গীতার

যোগজীবনের যোগ অর্থাৎ স্বীয় জীবনে জীবনের পূর্ণ বিকাশ; “আত্মসমর্পণযোগীর কর্ম প্রত্যক্ষ ঈশ্বরপ্রেরণায় ভাগবত-চেতনারূপ প্রদীপ্ত হতাশনে ইন্দ্রনয়নরূপ কর্মরাশি নিষ্কিপ্ত হয়, জীবনযজ্ঞে ইহা নিত্য হোমোচ্ছতি।” (১৭) “...কর্ম, জ্ঞান, মোক্ষ—এইসব জীবনের অবস্থাবিশেষ। পূর্ণযোগীর জীবনে তাহাদের কোনটিই পরিত্যজ্য নহে বা উপেক্ষার বস্তু নহে..।” [১৮] গীতোক্ত সাধন-মার্গের এবম্বিধ ব্যাখ্যা আচার্য মতিলালের নিজস্ব ব্যাখ্যা। তিনি তাঁহার গীতাব্যাখ্যা গ্রন্থে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, “এইহেতু সাধকের সম্মুখে আত্মলয়ের পরিবর্তে দিব্যজীবনের এক অভিনব রূপান্তর সাধনার সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। অগ্ন্যাদি দর্শনাদি শাস্ত্রের সহিত গীতার ইহাই বৈশিষ্ট্য।” [১৯] তাঁহার বক্তব্য এই যে ভগবদ্গীতাতে “লয় অপেক্ষা জীবনের দিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধিক ঝোঁক দেখা যায়। তাহার কারণ—তিনি আত্মার নিত্যত্ব একদেশদর্শিতার কেবল তুরীয় করিয়া দেখেন নাই। ইহার অভিব্যক্তি ও সং-এর প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। (২০) সংযতচিত্ত যোগী সতত আত্মসমাধান পূর্বক ভগবন্নিষ্ঠ নির্বাণ-রূপ পরমাশান্তি লাভ করেন।” (২১) বর্তমান লেখক এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন যে “ভারতের যোগই জীবন। যোগাশ্রমী ভারতে অখণ্ড ভাগবত জাতির অভ্যুত্থান হইবে। আত্মার অভ্যুত্থান ভগবানে। নিঃশ্রেয়সের পূর্ণ পরিচয় ভাগবত জীবনে।” সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষের লক্ষণ। (৬।২৬ ৩২) প্রসঙ্গে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, “এই শ্লোকগুলির মধ্যে অবধান করিবার বিষয় রাজযোগের লক্ষ্য যে কৈবল্য, তাহাকে ঘুরাইয়া দিব্যজীবনের আদর্শটিই তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পুরোভাগে রাখিয়াছেন...কর্মজীবনের প্রয়োজন দেখাইয়া গীতায় চরম কথাটি সেই উত্তম রহস্যের—তিনি

(১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথমখণ্ড) পৃঃ ৫৭

(১১) " (প্রথমখণ্ড) পৃঃ ৭৫, ৭৭

(১২) মতাজ্ঞানবিরতের আত্মতৃপ্ত মানবঃ।

আত্মজ্ঞেব চ সন্তুষ্টস্য কাটং ন বিজতে ॥ ভ. গী. ৩।১৭-১৮

(১৩) ভ. গী. (প্রথমখণ্ড) পৃঃ ১০০

(১৪) শ্রেয়ান্ স্বধর্মো দ্বিগুণঃ পরধর্মায়ং যমুগীতাৎ। ভ. গী. ৩।৩৫

(১৫) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথমখণ্ড) পৃঃ ১১৩

(১৬) " (") পৃঃ ১১৭

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৬৮

(১৮) " (") পৃঃ ১৮৪

(১৯) " (") পৃঃ ১৯৫

(২০) " (") পৃঃ ২০১

[২১] যুগ্মসংবৎ সদাশ্রিত্যং যোগী নিয়তমানসঃ।

শয়ন্তিঃ নির্বাণপরমায়ং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ভ. গী. ৩।১৫

পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২১২

ভিত্তিপাত করিয়াছেন।” (২২) ‘রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্’ (ভ. গী. ৯২) (সর্ববিদ্যার মধ্যে প্রদীপ্ত-বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অতিশয় গুপ্তবিদ্যা এবং ইহা শ্রেষ্ঠ পবিত্রবিদ্যা) —সজ্জাচার্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রাকৃত জীবজন্ম অতিক্রম করিয়া সনাতনধর্ম সাধন-পূর্বক ‘ভাগবত জন্ম’ লাভ করাই জীবের লক্ষ্য এবং “গীতার যোগ গোড়া হইতেই জীবনবাদের কথাই বলিতেছে...” (২৩) গীতোক্ত আত্মসমর্পণযোগ বলিতে বুঝায় “কর্ম ও কর্মফলত্যাগ অর্থে জীবনের সবখানির তর্পণ তাঁহাতেই, যিনি জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, অদ্বয় নারায়ণ।... এই শ্লোকগুলির সাধনক্রম উলটাইয়া ধরিলে, আত্মসমর্পণযোগীর সিদ্ধ চরিত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, অভ্যাসাদি যৌগিকক্রিয়া স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনে অতি সহজে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে।” (২৪) ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্রিংশ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (১৭।১১-১৩) তিনি বলেন যে, ‘একটা নূতন জীবনের সন্ধান দিতে গিয়া গুণযুক্ত বুদ্ধির উত্তম, মধ্যম ও অধম অভিব্যক্তির কথা এই অধ্যায়ে’ সূচিত হইয়াছে। (২৫) গীতোক্ত সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস যজ্ঞের লক্ষণ (১৭।১১-১৩) বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন “...জীবনযাত্রার জন্য যে বিহিত কর্ম তাহাও যজ্ঞ। ঈশ্বরারাদনার জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই যজ্ঞ...। অতএব আমাদের যে জীবনযাত্রা, তাহা যদি ঈশ্বরে প্রেরণা-সিদ্ধ হয়, উহার মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। আমার আশু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতিবিরজক আহার ও আহারাতি সব ঈশ্বরারাদনারূপ কর্ম হইবে। আমার জীবনই যজ্ঞ-স্বরূপ। এইরূপ জীবনে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম।...” (২৬) এইস্থলে সজ্জগুরু তাঁহার

জীবনদর্শনের মূলতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। গীতোক্ত ধর্মপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, “—কিন্তু গীতা গুণাতীত অবস্থার সংসার হইতে মুক্তির কথা বলেন নাই, আত্মবান্ হইয়া অনাসক্ত জীবনেরই নির্দেশ দিয়াছেন। গীতার ধর্ম আমরা এই হেতু সংসার-বিরতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।...গীতার অনুসরণ করিলে ইহাই দেখা যায় যে, গুণাতীত পুরুষের চিহ্ন ও আচারাতি কিরূপ হয়, এইরূপ প্রস্তোত্তরে শ্রীভগবান্ জীবনেরই পরিচয় দিয়াছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষাংশে গুণাতীত পুরুষের চরিত্রলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। গুণাতীত পুরুষই শাস্ত্রতর্ক, ঐকান্তিক সুখ, অব্যয়, অমৃতের অধিকারী হয়। ইহা হইতে কি স্পষ্টই অনুভূত হয় না যে, গীতা কর্মাসক্তি হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া একটি অভিনব জীবনবাদের কথাই প্রচার করিয়াছেন?” (২৭)

প্রবর্তক সজ্জগুরু যুগাচার্য মতিলাল রায়ের জীবনদর্শন অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হইল। জীবনের মধ্যে জীবনের পূর্ণতা, পরিস্ফুটিই জীবনের আদর্শরূপে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন, জীবনের ভিত্তিতেই তাঁহার অধ্যাত্ত্ব তিনি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’। তবে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে ‘জীবনদর্শন’ বলিতে প্রকৃত দর্শন বুঝায় না, কারণ জীবনের ভিত্তিতে প্রকৃত দর্শনের সার্বভৌমরূপ গড়িয়া উঠে না—জীবনকে খণ্ডখণ্ডে উপস্থাপিত করা হয় ব্যক্তিগতভাবে। তবে যে কোন প্রকার জীবনদর্শনের বিরুদ্ধেই অবশিষ্ট মন্তব্য প্রযোজ্য এবং যথার্থ জীবন-দার্শনিকের পক্ষে তাহা দৃশ্যীয় নহে। সমাজজীবনে তথা ব্যক্তির জীবনে জীবনের স্বার্থকতার এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সন্ধান এই মনীষী দেখাইয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে যে আদর্শের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহাও যুক্তিপ্ৰমাণাদি উল্লেখ পূর্বক উপলব্ধ হইয়াছে। ইহাই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব, ইহাই তাঁহার মহদ অবদান। শুভমস্ত! ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!!

(২২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথমখণ্ড) পৃ ২২৮

(২৩) " (") পৃ ৩১৫

(২৪) " (দ্বিতীয়খণ্ড) পৃ ১১৭

(২৫) " (") পৃ ২৩৬

(২৬) " (দ্বিতীয়খণ্ড) পৃ ২৪০-২৪১

(২৭) ভ. গী ২য় খণ্ড পৃ ২৭৮

সমাধির স্বাক্ষর

ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমাধির স্বাক্ষর।—খোশবাগের সমাধি প্রান্তর। সেখানে মহাকাল সমাধির স্বাক্ষরে দূর অতীতকে ধরে রাখার প্রয়াসই পেয়েছে বোধ হয়। কত নামী, অনামী, বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আর অসহায় কক্ষহারা নারী, সৈনিক—সবারই কংকাল কফিনের মধ্যে, নামহীন, ঐতিহ্য-বিহীন, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াতের কথা মনে করায়—

“জীবন-জমির” পরে যারা যত্নে বোনে সোনার বীজ, হাওয়ায় বুনে ফুৎকারেতে করছে যারা সব খারিজ। খতম সে সব এইখানেতেই—বীজ না ফলে পুনবার গোরের ভিতর যে জন, সে কি জীবন নিয়ে ফিরবে আর।”

ভাগীরথীর এ পারে শহর মুর্শিদাবাদ—প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। অখ্যাত সমাধি, শতশত কবর, নবাব নাজিম হুমাউন বার গড়া হাজারদুয়ারী, অভাগা নবাব সিরাজের রক্তস্নাত জাফর-গঞ্জের দেউড়ীখ্যাত ভূমি, মীরজাফরের বাড়ি, কবর ইত্যাদি; আর ওপারে জগতের এক উদাস অংশে খোশবাগ, খোশবাগের সমাধি-প্রান্তর। কতকগুলি কবর দিয়ে কালের করুণ স্বাক্ষরই যেন। কয়েক বছর আগে (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) এই স্বাক্ষরগুলির চিহ্নরেখা দেখার সুযোগ ঘটেছিল। হয়তো আজ তাই হস্তাক্ষরে কালের সম্মার্জনী আরও অস্পষ্টতা এনে দিয়েছে, নয়তো শিল্পীর তুলি সেখানে ফুটিয়ে তুলেছে রঙের বাহার; কিন্তু কবর ঠিকই নীরবে দিন কাটিয়ে যায়—গাছের পাতার নড়ার শব্দ শোনায় কাদের কাতর দীর্ঘশ্বাসেরই মত। আমাদের মত অনেকেই যাবেন ওখানে, চোখের দেখা দেখতে, অতীতের ছিন্নপৃষ্ঠার কোন পাঠোদ্ধারের আশায়, অথবা কবরের কান্না শুনতে। তাঁদের কোন কাজে লাগতে পারে ভেবেই আমার লেখা।

রাস্তা ছেড়ে সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার পথেই মসজিদাকার একটি ঘর। তার দু’ধারে গম্বুজওয়ালা দু’টি কামরা, অতীতে ওখানে সাক্ষীরা থাকতো। এ-সবই সেদিনের এক প্রদর্শক (গাইড) এর বলা কথা। উদাস প্রান্তরে

পা দিয়ে দেখি, সামনে একটি চাতাল, ঘর এবং সবই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দীন পল্লীর মাঝখানে এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে জমাট গুরুতা; মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাবীর ডাক—সেও যেন কাতরতায় ভরা।

সামনের চাতালের প্রথমেই নবাব আলিবর্দীর পত্নী সফর কালিরন (নামটিতে আমার ক্রটি থাকতে পারে)—এর সমাধি। ওর ধারেই একটি আল, মাঝাকাটা। আলের ও-পাশে, উত্তরে সিরাজের মাসী মা ঘসেটি বেগম, তার পুবেই মা আমিনার কবর।

এই চাতালের দক্ষিণে আর একটি বাঁধানো স্থান। একটু উঁচুতে দু’জনের একত্রে এবং নীচে ১৫ জনের কবর। পাটনাতে তাঁরা নিহত হয়েছিলেন। কিছু উহঁ লেখা।

সফর-ঘসেটি-আমিনার কবর স্থান থেকে কিছু পূর্বে একটি বড় হলঘর চারদিক ঘেরা। এখান থেকে ওখানে যাবার পথের বাঁ পাশে তিনজনকে মাটির নীচে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তারা, পরপর আবদুল, গোলাম ও সাবহুল হোসেন।

হলঘরের দেয়ালের বাইরে, উত্তর দিকে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, দানসা ফকির (কিছু জমকালো সমাধি), তাঁর স্ত্রী ও ছেলের কবর।

দরজা পেরোতেই এসে গেল সিরাজের ভাই মির্জা মেহেদীর সমাধি। এর উত্তরে—আলিয়া। মেহেদীর উত্তর পাশেই সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত সিরাজ; উত্তরে তাঁর পায়ের দিকে অভাগিনী লুৎফা! এঁদের একটু উত্তরে নবাব আলিবর্দী; তাঁর পাদদেশে উত্তরে সিরাজ তনয়া অম্মর জোহরা। আলিবর্দীর পূব-পশ্চিমে পার্থক্যের নিশান। পূর্বের নিশান ছাড়াতেই দেখা যাবে, আলিবর্দীর শ্রুতুতো-ভাই মহম্মদ জাং এবং তাঁর পায়ের কাছে, উত্তরে শায়িতা তাঁর স্ত্রী মতি বেগম। এঁদের সবারই মাথা দক্ষিণে।

এর পরেও এক সীমা রেখা। তারপর হলঘরের দেয়াল, মাঝখানে দরজা। বেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা

দিয়ে পৌছুতে হয় মসজিদে। আল্লার কাছে যে প্রার্থনা জানাতেই হবে—“চিরনিদ্রায় শায়িতরা চিরশান্তি পাক, অশান্তির কোন স্পর্শ যেন লাগে না তাঁদের আত্মায়।”

হলঘরের দক্ষিণ দিকে, সমাধি-ক্ষেত্র ঘেরা প্রাচীরের পাশে একটি জায়গা। সেখানে নাকি ছলছলী সহ ৫০০ ঘোড়া থাকতো। সে কবে, অতীতই তা জানে। ওমার যেন গাইছেন—

“জীর্ণভাঙ্গা সরাই-খানার রাত্রি দিবা দুইটা দার,
তারির ভিতর আনাগোনা—হুনিয়া দারি চমৎকার!
রাজার পরে আসছে রাজা, সজ্জা কতই বাত ধুম—
তুচ্ছ সে সব—কয় দিনই বা? তার পরে তো
সব নিরুদ্ভা!”

প্রবেশ-পথ দিয়েই বেয়িয়ে চলার পথে যখন দাঁড়িয়েছি, তখন মনে চরম অবসাদ। মেঠো পল্লী-পথে অনেকক্ষণ চলে দেহ শ্রান্ত হলেও, সমাধি-ক্ষেত্রে ঢোকায় সময় মন ছিল সবল। কিন্তু এখন?—সেই আলিবর্দী, সেই সিরাজ, সেই লুৎফা-জোহরা!—

“আজ হুনিয়ায় কোথায় তারা? পেয়ালাটুকু আর সবার একটু আগে শূন্য করে ঘুমিয়ে ঘোচায় শ্রান্তি-ভার!”

সত্যই ঘুমিয়ে ঘোচায় শ্রান্তিভার?—তাই হোক।
—অশান্ত আত্মা শান্ত হোক!—দৈব!

যারা গেল, তারা গেল; কিন্তু তারা কী কিছুই রেখে যায় না তাদের জন্তে, যারা রইলো, যাদের অবশ্য-কর্তব্য—জঞ্জালের স্তূপ থেকে সোনার কণা সংগ্রহ? হাজারজয়ারীতে আটকানো নেই আজ নাকি সাহেব (সৈয়দ আলি মীর্জা)। তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর লেখা প্রামাণিক ইতিহাস আঙনে পুড়ে মরে। কিন্তু আজও হয়তো আছেন, সৈয়দ আমীর মীর্জা, যিনি ১৯৫৭ র ফেব্রুয়ারিতেও ছিলেন মুর্শিদাবাদ প্রাদেশে অজ্ঞাগারের অধ্যক্ষ। নাকি সাহেব তাঁর ইতিহাসে লিখেছিলেন—মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করে নি; করেছিল ক্লাইভেরই এক গোরা সৈন্য, গুলি করে। জাফরগঞ্জের

নিমতলার ছাদহীন ঘরে সিরাজ বন্দী। তাঁর শির আনার জন্য মোটা অর্থ বরাদ্দ করেছে ক্লাইভের সেনাপতি। কেউ সাড়া দেয়নি। মহম্মদী বেগ এলো, প্রাণ-দাতার প্রাণ রাখতে। রাতের অন্ধকারে সে ঢুকলো ঘরে, বললো সিরাজকে, ‘এখন পথ প্রায় অরক্ষিত—একটি তলোয়ার নিন, পালাই। সামান্য বাধাকে ছুঁজনে সরাতে পারবো।’ দিল তলোয়ার, সিরাজ প্রস্তুত; কিন্তু তাঁর যে জীবনমুখ ডুববেই। মহম্মদী বেগকে বিশ্বাস করতে পারেনি ইংরেজ। এক গোরা, এক দোভাষী নিয়ে ঐ ঘরের ওপরে উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। গুলি করলো সে—সিরাজের যাত্রা হ’ল ঐ কবরের পথে,……নাকি সাহেবের ইতিহাসের কথা জানা হয়ে যায় শাসনকর্তার; পাণ্ডুলিপি পুড়লো। কিন্তু বলেন অনেককে সবই। তাঁদের মধ্যে একজন ঐ অধ্যক্ষ। অজ্ঞাগারের মধ্যে চেয়ারে বসে, ক্ষোভে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন যুবক, আমাকে বারবার অনুরোধ—আমি যেন লিখি। তিনি যে সরকারী কর্মচারী, কিছু করতে পারছিলেন না।—আমার ‘প্রলাপ’ অনেকে উপেক্ষা করলেও, এই ‘প্রবর্তক’ গ্রহণ করে; কোনকোন ইতিহাসবেত্তা সাড়াও দেন। কিন্তু হয়নি কিছু নিশ্চয়ই।

২৮.২.৫৭ তে অজ্ঞাগার দেখার সময় গাইড একটি ছোরা দেখিয়ে ধীর স্বরে বলেন—“এটিকেই মহম্মদী বেগের সেই ছোরা বলা হয়, যা দিয়ে সে সিরাজকে হত্যা করে।—একবার কলকাতা থেকে কে একজন বড় পণ্ডিত লোক এসেছিলেন। তিনি ঐ ছোরা দেখে, সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান—ছোরা দিয়ে হত্যা করার বিষয় মিথ্যা। তারপরই বাবু, ছোরাটি বহুদিন সরিয়ে রাখা হয়। আবার কিছুদিন হ’ল ওটি এই শো কেসে এসেছে।”—

এ সবেব কী হিসাব-নিকাশ হবে না?—হে অতীত, কথা কও।



বসুমতী

(পূর্বাহ্নরুদ্ভি)

অজিত দাস

॥ ২ ॥

এই জগতে মানুষের স্বাধীনতা বলিতে কিছুই নাই। বিশেষ করিয়া ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা সাধ আত্মাদের যে কোন মূল্যই নাই, সব কিছুই যে মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে তাহারই আরেক প্রমাণ মিলিয়া গেল।

রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সহসা পরিবর্তন ঘটিল। স্থিতিশীল অবস্থা চলিয়া গেল, সব কিছুই অস্থির অনিশ্চিত হইয়া গেল। ঋণগ্রস্ততার কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অভাব অনটনের সহিত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের অগ্রিমূল্য হইয়া সমাজ জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিল।

এই সংকটের প্রভাব যেমন-পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিল। তেমনি কৃতিবাসদের ব্যক্তিজীবনকেও ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল।

ঋণগ্রস্ততার সহিত কাপড় বুনবার স্ত্রী আরও অনটন শুরু হইয়াছিল। অনেকদিন হইতেই সে অবস্থা চলিতেছিল। ক্রমে তাহা চরমে উঠিল। স্ত্রী আর সহজ ভাবে স্বাভাবিক পথে পাওয়া যায় না। মদন খাঁ এই সমস্যার কথা তুলিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, 'তাঁতের ব্যবসা আর চালাব না। এ ব্যবসা তুলে দিচ্ছি। কি করব? চুরির পথে অতো দাম দিয়ে স্ত্রী কিনে তাঁত চালাতে আর পারছিনে। বড় বড় মহাজনরা পারে। ওর বাকিও অনেক। তোমরা অল্প কাজ দেখ।'

সত্য সত্যই মদন খাঁ একদিন তাঁতের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিল। কারখানার কাঁপ বন্ধ হইয়া গেল। কৃতিবাস কার্তিক সকলেই বেকার হইয়া গেল।

এই আকস্মিক ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। তাই সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিল।

কৃতিবাসের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার দাদা বৃন্দাবন বসাকও কৃতিবাসের প্রতি খুবই বিরূপ ভাবাপন্ন। বিশেষ করিয়া তাহার বৌদি। আয় করিত বলিয়া সে কৃতিবাসকে দুটি রাঁধিয়া খাইতে দিত। কৃতিবাসের সেই আয় চলিয়া গেল। কৃতিবাস

দুটোকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সকলেই তাঁতের সংখ্যা কমাইয়া দিতেছে, ছোট ব্যবসায়ীরা তাঁত বন্ধ করিয়া দিতেছে। অনেকে তাঁতের জন্য পারমিটে যে স্ত্রী পায় সেই স্ত্রীকে কাপড় না বুনিয়া চোরাবাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতেছে। তাহাতে বিনা ঋণমোচনায় যে লভ্যাংশ মিলিতেছে, তাঁতে কাপড় বুনিয়া বিক্রয় করিলে তত লাভ হইত না।

তাঁতের রাজ্যে কাজ করিয়া কৃতিবাস মহাজনদের এই চোরাবাজারী বেপা ভালোভাবেই জানিয়াছে। সে বুঝিয়াছে ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের মতো মানুষের কিছুই করিবার নাই। এই দেশে এখন অসাধুতা শক্তিশালী হইয়া স্বেচ্ছাচারিতাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। ইহাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রজাপালকরূপে যে শাসকসমাজ সরকাররূপে প্রতিষ্ঠিত তাহা একটি কংকাল মাত্র। তাহাতে প্রাণ নাই, জীবনীশক্তির কোনরূপ অস্তিত্ব নাই। তাহাও ছুট রোগ জীর্ণ। দেশে নেতা নাই, শক্তিমান বীর্যবান কোন পুরুষসত্তা নাই। ভীক, কাপুরুষ, কপটেরা নেতারূপে মঞ্চে নৃত্য করিতেছে। এবং অসাধুতা অন্ধকারে দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া মানুষের চরিত্র হনন করিয়া চলিয়াছে। এই দেশ তাহাদেরই করতলগত, তাহারাই শক্তিমান। প্রজ্ঞাসাধারণ বিপন্ন হতাশ হইয়া কান্নাকাটি হাহতাশ ব্যতীত আর কি করিতে পারে? করিবার আর কোন ক্ষমতা আছে? তাহারা পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে এবং মরিবে। ইহা ছাড়া আর কি করিবে? তাহারাই কাহার ডাকে সাড়া দিবে? ডাক দিবার মতো মানুষ কোথায়?

কৃতিবাস নিজে এই বিপন্নতার বলি। এই তাহার মনোভাব। সে দরিদ্র অসহায় মানুষ।

কৃতিবাসের পক্ষে বেকার থাকিয়া দাদা বুউদির সংসারে অবস্থান অসম্ভব। একদিনের জন্তও তাহা সম্ভব নহে। শহরের বুকে বিকল্প তেমন কোন কর্মের

সন্ধান মিলিল না। অতএব নিরুপায় অসহায় কৃতিবাস
সহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জীবিকার জন্ত, দুই
মুঠা অন্নের জন্ত সে তাহার প্রিয়, শহর, এতোকালে
গড়িয়া তোলা তাহার পরিবেশ, পরিচয়, সামাজিক মান
মার্যাদা, ভবিষ্যত সুখ স্বপ্ন, একটি নারীর প্রতি প্রেম
ভালোবাসা—সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য
হইল। কৃতিবাস শহর ছাড়িয়া ভাগ্যের সন্ধানে
অনিশ্চিত যাত্রা করিল। শহরে এই সংবাদ যখন
প্রচারিত হইল তখন কৃতিবাস-এর পরিচিত জন দুষ্টিত
হইল, বেদনাবোধ করিল।

কিন্তু এই সংবাদে হরিহর বসাকের সংসারে যেন
বজ্রপাত ঘটিল। সমগ্র পরিবার শোকে নিমগ্ন হইয়া
গেল।

হরিহর বসাক হায় হায় করিতে লাগল। তাহার
স্ত্রী স্বামীকে বুদ্ধিহীনতার জন্ত গালমন্দ করিতে লাগিল।
কন্যা বসুমতী ঘরে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের
জলে বুক ভাসাইল। তাহার পর চোখের জল নিঃশেষ
হইলে বেদনা ও শোক গভীর হইয়া বৃকের ভিতর
গোপনে ক্রিয়াশীল হইল।

॥ ৩ ॥

কৃতিবাস চলিয়া গেল। কিন্তু কার্তিক প্রামাণিক
থাকিল। তাহারতো যাইবার প্রয়োজন নাই।
তাহার ভাই-এরা আছে, মা আছে, সংসারে কিছু স্থিতি
আছে। তাহা ছাড়া তাহারতো দেশত্যাগ করিবার
মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই।

দেশে এতো মানুষ আছে। তাহারা সকল
পরিস্থিতিকেই মাত্ত করিয়া জীবন অতিবাহিত করে।
তাহারা সংকটের ভিতরেও নিজের বাঁচিবার মতো পথ
খুঁজিয়া লয়। কার্তিক প্রামাণিক কেন তাহা পারিবে
না।

সে বেকার থাকিয়া কয়দিন শহরে ঘুরিয়া বেড়াইল,
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিল, বন্ধু-বান্ধবদের সহিত
পরামর্শ করিল, বাড়িতে ভাইদের সহিতও পরামর্শ
করিল। তাহার পর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করিয়া ফেলিল।

একদিন সেই সিদ্ধান্ত মত কার্তিক প্রামাণিক বাজারে
চট পাতিয়া চাউলের ব্যবসা শুরু করিয়া দিল। বাজারে
তীব্র খাদ্য সংকট, নিতাই চাউলের মূল্যের উর্দ্ধগতি
ঘটিতেছে। সরকারী সরবরাহ কম। সাধারণ ব্যবসায়ীরা
নিষিদ্ধ পথে উদ্ধৃত্ত এলাকা হইতে চাউল আনাইয়া
উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতেছে। কার্তিক প্রামাণিকও সেই
পথেই ব্যবসা শুরু করিল।

তাহার স্বাস্থ্য আছে, বাস্তব বিষয়বুদ্ধি আছে,
অপরিসীম লোভ আছে, যুগের সহিত বিকারহীন ভাবে
হাত মিলাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিবার সহজ মানসিকতা
আছে। কাজেই এই পথে কার্তিক প্রামাণিকের পক্ষে
প্রবেশে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। জগৎ জুড়িয়া
মানব সমাজে দলবদ্ধ হইবার, দলবুদ্ধি ঘটাইবার আশ্রয়
প্রয়াস সর্বত্র প্রসারিত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—অধুনা
রাজনীতি, চৌর্যনীতি, ব্যক্তিচার নীতি—সর্বদিকেই এই
প্রয়াস ক্রিয়াশীল।

কার্তিক প্রামাণিক যে পথে নামিয়াছে সে পথেও
সে নীতি সমান সক্রিয়।

গোষ্ঠিছাড়া কেহ আত্মরক্ষা করিতে পারে না।
গোষ্ঠি যত শক্তিশালী হইবে, ততই দীর্ঘায়ু ও নিরাপদ
হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। তাই কার্তিক
প্রামাণিককে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তাহার
পূর্বসূরীরাই তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া
লইল। সহজে চলিবার পথ দেখাইয়া দিল। এই পথে
নিরাপদে চলিবার জন্য যাহা করণীয় সেই বিষয়ে
অবহিত করাইল। বিনিময়ে তাহারা তাহাদের স্বপক্ষে
সংগ্রাম করিবার মতো একজন উৎসাহী যোদ্ধা লাভ
করিল।

সত্যি, কার্তিক প্রামাণিক এই নূতন পথে যথেষ্ট
কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। ফলে, প্রথমে পথের ধারে
চট পাতিয়া এক বস্তা চাউল লইয়া যে বেচাকেনা
আরম্ভ করিয়াছিল, মাস তিনেক পরে তাহার বসিবার
চটের চারিদিকে চাউলের বস্তার সার বাঁধিল, তাহার
হাতে হাতঘড়ি উঠিল, চাউলের বস্তার উপর ট্রানজিষ্টারে
হিন্দীগান বাজিতে লাগল।

আরও কয়েকমাস পরে সে ঘর ভাড়া লইয়া দোকান পাতিয়া রীতিমত চাউল ব্যবসায়ী হইয়া বসিল। কার্তিক প্রামাণিক কৃতি হইল, চাউল ব্যবসায়ী হইল, ব্যবসায়ের মগ্ন হইল। কিন্তু তাই বলিয়া সে অতীতের বেদনা ও অপমানকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না। বরং সেই স্মৃতি এখন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কৃত্তিবাস দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় সে খুবই খুশী হইয়াছিল।

হরিহর বসাকের কন্ঠার বিবাহ হইল না। নির্বাচিত পাত্র গোপনে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, হরিহর বসাক বিপন্ন হইয়াছে। এই-চিন্তা সেদিন তাহাকে খুশী করিয়াছিল। শুধু তাহাকে কেন, তাহার পরিবারের সকলকেই খুশী করিয়াছিল। সবচেয়ে খুশী হইয়াছিল তাহার মা। তাহার মা-ই বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিল এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহার মনেই সর্বাপেক্ষা অধিক আঘাত লাগিয়াছিল।

তাই হরিহর বসাকের দুঃখের দিনে কার্তিক প্রামাণিকের মা-ই সর্বাপেক্ষা খুশী হইয়াছিল। খবর শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল, বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। এইবার বোরা মাথার ওপর ভগবান আছে। মানুষের অতো বাড় ভালো নয়। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে হয়। ছেলের মা হয়ে নিজে মুখ ফুটে বললাম, মেয়ে চাইলাম, তার ফল হল কিনা উঠো। অপমান করল। এতো দেমাক। এখন দিক মেয়ের বিয়ে। মেয়ে এখন সেই ভালবাসার লোক খুঁজে আনুক। ছিঃ ছিঃ! বলে ভালো মেয়ে। অমন বেহায়া! এ ছেলে নয়, ওই ছেলেকে বিয়ে করব, মুখ ফুটে বলে। ভালো মেয়ে ছাই, মিটমিটে শয়তান। যাক, এখন বিয়ে দিক। আমরা দেখি। বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে।

শুধু বাড়িতেই নয়, কার্তিকের মা সারা পাড়াতেই এই মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়াইল।

হরিহর বসাক সপরিবারে ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কন্ঠা বসুমতী শীর্ণা হতভী হইয়া উঠিল।

কার্তিক প্রামাণিক খুশী হইয়াছিল, আনন্দিত হইয়াছিল।

দোকান ঘরে বসিয়া ব্যবসা শুরু করিবার পর তাহার আরও খুশী হইবার, আনন্দিত হইবার বাসনা উগ্র হইল। চরম প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা জাগিল।

সে আবার তাহার মাকে বলিল, মা এইবার আবার হরিহর বসাকের বউ-এর কাছে যাও। আবার ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বল।

ছেলের কথা শুনিয়া মা অবাক হইয়া গেল। ছেলের প্রস্তাবকে বড় বেশী বেহায়াপনা বলিয়া তাহার বোধ হইল।

মা ছেলেকে বলিল, আবার ওই মেয়ে! দেশে কি মেয়ের আকাল নেমেছে? মেয়ের অভাব? খবর পেলে এখুনি শকুনপড়ার মতো মেয়ের বাবা মা বাড়ির উঠোন ভরে তুলবে।

শুধু শোনার অপেক্ষা। ওই মেয়ের চেয়ে কতো ভালো মেয়ে জুটবে। ফসাঁ, জুন্দরী, লেখাপড়া জানা, আর ঘরও তেমন পাওয়া যাবে। তেমন দান সামগ্রী দিয়ে জামাই-এর মান রাখতে পারবে। হরিহর বসাকতো ভিটেচোষা মানুষ। তখন গরীবের মেয়ে উদ্ধার হবে বলে বলেছিলাম। আবার ওই মেয়ে নিতে চাওয়া? মরণ নেই নাকি?

মার কথার জবাবে কার্তিক প্রামাণিক বলিল, না। আমি ওই মেয়েকেই বিয়ে করব। ওকে বিয়ে করে ঘরে এনে ওর দেমাক ভেঙে দিতে চাই। বিয়ে করে দেখিয়ে দিতে চাই, কার ক্ষমতা বেশী।

না ছেলের যুক্তি শুনিল। হ্যাঁ, চিন্তার এও একটা দিক বটে। বিষয়টিকে এই ভাবেও দেখা যায় তাহা হইলে ছেলের যুক্তিকেই মান্য করিতে হয়।

উপযুক্ত ছেলে। নতুন পথে ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট আয় উন্নতি করিয়াছে। বাড়ির ভিতর সে সকলের সেরা ছেলে হইয়াছে। তাহার কথা শুনিতেই হয়।

অতএব কার্তিক প্রামাণিকের, মা পুনরায় হরিহর বসাকের বাড়িতে উপস্থিত হইল।

হরিহর বসাকের স্ত্রী তাহাকে আসিতে দেখিয়া খুবই অবাঁক। কার্তিক প্রামাণিকের মা তাহার বাড়িতে আসিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহাই হউক, কাচুমাচু মুখে অভ্যর্থনা জানাইয়া হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিল, আসুন দিদি—

কার্তিক প্রামাণিকের মা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, এলাম একটু...।

হরিহর বসাকের স্ত্রী পিড়ী পাতিয়া বসিতে দিল।

টিনের রান্না ঘরের বারান্দায় পিড়ীর উপর বসিয়া কার্তিকের মা গল্প আরম্ভ করিল।

প্রথমে উভয় পক্ষই সৌজ্ঞমূলক কথাবার্তা চলিল। বিশেষ করিয়া হরিহর বসাকের স্ত্রী খুবই সংযত আচরণ করিতে লাগিল। তাহাদের এখন পরাজয়ের কাল। লজ্জা, দুঃখ বেদনার কাল।

কার্তিক প্রামাণিক এখন মস্ত ব্যবসায়ী হইয়াছে। অনেক টাকা আয় করিতেছে। তাহাদের সুখের দিন। তাহারা এখন হরিহর বসাকের পরিবারকে দেখিয়া হাসিবে, ব্যঙ্গ করিবে, অপমান করিবে। হরিহর বসাকদের সব কিছু মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে।

সেই কার্তিকের মা আবার হঠাৎ কোন উদ্দেশ্যে আসিয়াছে? এই সন্দেহবসেই হরিহর বসাকের স্ত্রী সভয়ে সতর্কভাবে যথাসম্ভব অল্প কথা বলিতে লাগিল।

তাহারপর একসময় কার্তিকের মা বসুমতীর বিবাহ প্রশংসা তুলিল। হরিহর বসাকের স্ত্রী এই শঙ্কাই করিতে ছিল।

কিন্তু না। কার্তিক প্রামাণিকের মা ভিন্ন স্তরে কথা আরম্ভ করিল। বলিল, কুস্তি বাসতো কোথায় চলে গিয়েছে। দেশছাড়া হয়েছে। তার খবর পেয়েছ নাকি?

হরিহরের স্ত্রী বলিল, না।

কার্তিকের মা বলিল, কোথায় গেল? কেউ জানতেও পারল না? এইতো আমার কার্তিকেরও কাজ গেল, তাই বলে দেশ ছেড়ে চলে যাবে? দেশে কি আর মানুষ নেই? কেউ কি করে কাজে থাকে না? কার্তিকতো এখানে বসেই কাজ খুঁজে নিল। আর ভগবানের আশীর্বাদে যাই হোক কিছু আয়ও করছে। না খেয়ে মরছে না। কুস্তি বাসও কি খেতে পেতো না। আসলে আমার কি মনে হয় জানো? ছেলেটা দেশ-ছাড়া হয়েছে তার বাড়ির দোষে। ওই বউদিদির অত্যাচারে। কি সাংঘাতিক মেয়ে। খুব খারাপ মানুষ।

বৃন্দাবন ওই বউ-এর কাছে হাত জোড় করে থাকে। ওর জেতাই কুস্তি বাস পালিয়েছে।

হরিহর বসাকের স্ত্রী কোন মন্তব্য করিল না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কার্তিক প্রামাণিকের মা বলিল, সে তো গেল। তার পথ সে দেখল। এখন তোমাদের মেয়ের কি ব্যবস্থা করছ?

হরিহর বসাকের বউ এই প্রশ্নের উত্তরের ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

খানিক চিন্তা করিয়া সে বলিল, এখন দেশে যে অবস্থা, দিন কি করে চলবে তাই শুধু ভাবনা। এখন মেয়ের বিয়ের কথা আর মনে থাকছে না। যা হয় হবে। মেয়ের কপালে যা আছে তাই হবে। ভাগ্যের ওপরতো কারও হাত নেই।

কার্তিক প্রামাণিকের মা বলিল, তাহলেও বাবা-মারতো দায় আছে। ঘরে সোমুখ মেয়ে রেখে কি বাবা শান্তি পায়।

হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিল, কি করব? বিয়ে তো হাতধরা জিনিষ নয় যে চাইলেই হবে, ইচ্ছে করলেই ঘটিয়ে দেওয়া যাবে?

কার্তিকের মা বলিল, যাক, আমি একটা কথা বলি। যা হবার সে তো হয়েছে। তা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। আর বিয়ে লাখ কথা না হলে হয় না। ছেলে মেয়ের দু হাত এককরা চিরজীবনের মতো, সে কি সোজা কথা? কতো চিন্তাভাবনা করতে হয়। কতো মত বদল করতে হয়। এইতো চিরকাল হয়ে আসছে। তাই বলছিলাম, যা হবার হয়েছে। এখন আবার বলছি, যদি মেয়ের বিয়ে দাও, যদি তোমাদের মত হয়, তাহলে আমার কার্তিকের সঙ্গে আমি এখনও দিতে পারি। তোমরা আমাকে অনেক কিছু মনে করতে পার। আমি কিন্তু তোমাদের আপনলোক বলেই ভাবি। আমার ছেলের বিয়ে অনেক জায়গাতেই দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের মেয়েটা যদি পার হয় তাহলে তোমাদের একটা দায় উদ্ধার হবে। মেয়েও বাড়ির কাছে থাকতে পারবে। তোমরা দুবেলা দেখতে পাবে। সেই জেতাই আমি আবার নিজে এসেই বললাম। এসব জিনিসে মান করে থাকলে তো চলে না। ছেলের মা বলে দেয়াক দেখাব তেমন লোক আমি নই।

অভাবনীয় পরিস্থিতি।

হরিহর বসাকের পরিবার আবার একটি সমস্যার সম্মুখীন হইল। যেন একটি আবর্তে পড়িয়া গেল।

বিপ্লবযজ্ঞে স্বাত্মিক কানাইলাল

কিরণেন্দু বাগ চী



৫ই জুলাই ১৯০২।

নরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ স্বর্গারোহণ করলেন।

আরক্ত কাজ তাঁর আর শেষ করা হল কৈ ?

শিষ্যা নিবেদিতাকে সবই বলে গেলেন।

বেলুড়ে, গঙ্গাতীরে স্বামীজীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে ভগিনী নিবেদিতা আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভারতের মুক্তিতে আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ করলেন।

এদেশ থেকে ফিরিঙ্গী তাড়ান, একমাত্র ধ্যান হ'ল ব্রহ্মবান্ধবের।

হুঃ কিছুটা প্রশস্তিত হলে, স্বামীজীর পূর্বাদেশ মত ভগিনী নিবেদিতা ছুটলেন অরবিন্দ সকাশে, বরোদায়। স্বামীজী অরবিন্দকে যা বলতে বলে গিয়ে ছিলেন, একে একে সবই তাঁকে বললেন।

শ্রীঅরবিন্দের সাংগঠনিক শক্তির কথা নিবেদিতা পূর্বেই টের পেয়েছিলেন। বাঙলার এই দুর্দিনে এমনই একজন দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নেতারইতো প্রয়োজন।

বহু আলোচনার পর অরবিন্দ নিবেদিতার কাছে সত্যবদ্ধ হলেন। নিবেদিতাও তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, ভারতের মুক্তি সাধনায় ভগিনীর ন্যায় তিনি সর্বদাই তাঁর পাশে পাশে থাকবেন।

স্বামীজী লোকান্তরিত হওয়ার পর ব্রহ্মবান্ধব কিছু দিনের জন্যে পড়িছিলেন বিলাতে, বেদান্ত প্রচারে, মাত্র তিরিশ টাকা সম্বল করে। উদ্দেশ্য তাঁর আরও ছিল।

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়ে সেখানকার প্রত্যেকটি লোকের মন জয় করে নিলেন। সেখানে হলেন তিনি প্রতিষ্ঠিত।

এইসব বক্তৃতার কয়েকটি অনুলিপি কলকাতার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল।

এর পরেই অরবিন্দ, ব্রাহ্মবান্ধবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এই আকর্ষণেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে বাঙলায় ফিরে, নামতে হ'ল দেশের কাজে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন কেশব সেনের কাছ থেকে। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন তাঁর নাম দিলেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিছু কাল পরে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন ব্রহ্মবান্ধব। এরপর প্রথমে প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান তারপর আবার হলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। নাম কিন্তু তার রয়েই গেল, কেশব সেনের দেওয়া ঐ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ভবানীচরণ নাম আর ঘুরে এল না।

১৯০২ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী আর কেদারনাথ দাসগুপ্তের উৎসাহে 'ডন' সোসাইটি স্থাপিত হ'ল।

ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন' পত্রিকা মারফৎ তরুণ মনে অগ্নি-ফলিঙ্গ ছড়াতে লাগলেন। গুপ্ত সমিতির পথ এতে অনেকখানি স্ফুর্গম হ'ল। এই সোসাইটিতে, ভগিনী

নিবেদিতার জালাময়ী বক্তৃতা তরুণ হৃদয়ে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করল।

আবার এই সালেই কলকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, মহারাষ্ট্রের মনীষী বীরসন্তান সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুণী-জনেরা শিবাজী উৎসবে যোগ দিলেন।

সখারামও বাঙলার জাগরণে বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন।

এর ২৪ বছর আগে, কংগ্রেস যে বছর জন্মলাভ করে, রমেশচন্দ্র দত্ত সেই বছর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ লিখেছিলেন। এই পুস্তকের অনেকাংশ জনজাগরণকে প্রবুদ্ধ করে।

বাঙলার জনচেতনার মূলে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ আর ভগিনী নিবেদিতা। অরবিন্দের বিপ্লবদর্শনের মূলমন্ত্র ‘অগ্নি ও রুধীরের’ সত্যপাঠ সর্ব প্রথম গ্রহণ করেন, যতীন্দ্র, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, সত্যেন বসু (অরবিন্দের মাতুল), দেবব্রত বসু, ভূপেন দত্ত (বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর) এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই অবিনাশই ছিলেন অরবিন্দের দেহরক্ষী ও পার্শ্ব-চর। বরোদা থেকে বাঙলায় এসে যে চার বছর অরবিন্দ কলকাতায় ছিলেন ‘অবি’ সব সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকত। মানিকতলা বোমার মামলায় গ্রেপ্তারের সময়ে এক হাতকড়িতে গুরু-শিষ্য দুজনকে বাঁধা হয়ে ছিল।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে অরবিন্দ প্রথম থেকেই ইংরেজের কাছে কংগ্রেসের ভিক্ষানীতিকে বরদাস্ত করেন নি। ‘হিন্দুপ্রকাশে’ অরবিন্দ অনেকবার কটুক্তি করেছেন; এখনও তিনি তা করে চললেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই বিপিনচন্দ্র পাল ‘নিউ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে বিপিন পালের সাড়া পেয়ে বাঙলার গুপ্ত সমিতির পথ অনেকখানি প্রশস্ত হ’ল। দেবব্রত বসু ‘নিউ ইণ্ডিয়া’র সঙ্গে আগে থেকেই জড়িয়ে ছিলেন।

বহুদেশীতে ঢুকলেন, পি, এন, মিত্র—ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র।

ইনি ‘অনুশীলন’ সমিতিতে যুবকদের ব্যায়াম চর্চা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে বিপ্লবের বেদী গড়লেন।

পি, এন, মিত্রও তিলকের মত চাইতেন না রাজনীতিতে ধর্মের স্থান দিতে, যেট চাইতেন অরবিন্দ।

কংগ্রেসের—‘যো হুকুম’ নীতিকে ইনিও কোন দিন বরদাস্ত করেন নি।

এই ১৯০২ সনের দোল পূর্ণিমার দিন কলকাতার ২১ নং মদন মিত্র লেনে, সতীশচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে ‘অনুশীলন’ সমিতির জন্ম হল।

পি, এন, মিত্র হলেন এর অধিনায়ক।

এরা ছাড়া অনুশীলন সমিতির প্রথম সারিতে এলেন—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আর চিত্তরঞ্জন দাস।

জাপানী শিল্পী কাকুজো ওকাকুয়া স্বামীজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বললেন তিনি—“উদ্ধৃত পাশ্চাত্য জাতির কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে হ’লে ‘এশিয়া এক’ এই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে।”

ওকাকুয়া পি, এন মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করে নিজের মতবাদ প্রচারে এগিয়ে এলেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার মধ্যে। তিনি চান না ভারতবাসী ইংরেজদের পদানত হয়ে থাকে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ বাঙলার জাগরণের প্রথম বছর। বছরটা তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মহারাষ্ট্রবীর সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙলার জন-জাগরণে নিজেকে একনিষ্ঠ ভাবে নিয়োজিত করে ছিলেন। পরে ‘বাঙলায়’ শিবাজী উৎসব করে তিনি, মহারাষ্ট্র আর বাঙলাকে এক স্ত্রে বেঁধে দেন।

অরবিন্দ বলেছিলেন—দেউস্করের দেশপ্রেম যেন খাটি সোনা।

দেউস্কর সুন্দর বাঙলা জানতেন ও লিখতেন।

‘হিতবাদী’ পত্রিকার সঙ্গে তিনি পনের বছর জড়িয়ে ছিলেন, ১৮৯৭ সাল থেকে।

বারীন্দ্রকুমার তাঁকে গুপ্ত সমিতিতে নিয়ে আসেন।

ক্রমে ক্রমে সখারাম ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা সখারাম 'দেশের কথা'র মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন।

১৯০৩।

বাঙলার সর্বস্তরের তরুণদের মনে তখনও আগুনের ঝড় ওঠেনি। কারও কারও কণ্ঠে অতি ক্ষীণ স্বরে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। কারোও বা কানে তাও আবার পৌঁছচ্ছে না। নৈতিক জীবনের ভিত্তি তখন বড়ই স্পর্শকাতর। অবসাদ, ভীতি চতুর্দিককে ক্ষয়িষ্ণু করে রেখেছে। যুগধরা মনোবল নিয়ে অনেকেই পারছে না দেশের কোন সদনুষ্ঠানে একসঙ্গে মিলিত হ'তে। যারা আবার কর্মযজ্ঞের স্বরকার তাঁদের বীণার তারও মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী এর অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন রাজনীতির আকাশে এই ঘন ঝাপছাড়া ভাঙ্গা মেঘ। স্থির করলেন—না, উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগে এ ব্যাধি দূর করতেই হবে। তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন গন্তে, ছন্দে একে দিয়েছিলেন, ভারতমাতার কঙ্কালসার দেহ-চিত্র প্রতিটি বাঙালীর মনোমন্দিরে।

এরপর বাঙলার যুবশক্তিতে যে টুকু বা আগুনের ঝড় উঠেছিল তাও গেল সীমায়িত হয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে।

বিপ্লববাদীরা হাল ছাড়লেন না। গোপনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বসলেন, নিবেদিতা, যতীন্দ্র, বারীন্দ্র, দেবব্রত, ভূপেন্দ্র, সত্যেন, সত্যীচন্দ্র আর প্রমথনাথ। অরবিন্দকে পরামর্শের জন্যে ডেকে আনা হ'ল।

স্থির হয়ে গেল,—যে কটি বীর্যবান যুবককে ইতিমধ্যে তাঁরা দীক্ষিত করতে পেরেছেন, তাদেরকেই দিকে দিকে পাঠাতে হবে সংগঠনের কাজে।

ছুটল নির্ভীক তরুণের দল এই মহামন্ত্র তাদের হৃদয়ে নিয়ে। জোয়ারের স্রোতের গতিতে তারা এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে সব দিকেই প্রবেশ করল জোয়ারের জল। মরা নদীগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠে ক্রন্দ

আবেগে হিস হিস শব্দ করতে লাগল। এ জোয়ারের আঘাত কিছুটা গিয়ে লাগল চন্দননগরে যুব গোষ্ঠির গায়ে ফরাসী উপনিবেশে।

চন্দননগরের ছেলে মতিলাল রায়। নেমে পড়লেন কাজে, নতুন পথ ধরে। সেবা ধর্মের নামে স্থিতি করলেন একটি সজ্জের—নাম হ'ল তার "সং-পথাবলম্বী সম্প্রদায়;" রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাকে আশ্রয় করে। প্রবাসী বাঙালী কানাইলাল দত্ত তখন চন্দননগর ডুপ্প কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে এসেছে। সে তখন এখানকার ছাত্র।

মতিলালের এই সজ্জের কাজ হল, পাড়ায়-পাড়ায় দরিদ্রের সেবা, মৃতদেহ সংস্কার, অসহায় দুঃস্থজনের সাহায্য প্রভৃতি।

কানাই ভেতরে ভেতরে এই দলকে সর্বপ্রকারে সাহায্য শুরু করে দিল। কিন্তু প্রকাশে নয়। কারণ বাড়ির কঠোর শাসন তার সকল উত্তমকেই প্রশমিত করে রেখেছিল।

একা কি কানাই? ওর সমগোত্রীয় কর্মী যে অনেকেই ছিল। শ্রীশচন্দ্র ঘোষও ছিল এই গোষ্ঠি ভূক্ত।

পাথরের বোল্ডার ফেলে পাহাড়ী নদীর স্রোতকে সাময়িকভাবে বাঁধা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রবল বর্ষায় সে ক্রুদ্ধ আবেগে চতুর্দিক প্রাণিত করে ছুটে চলল সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে।

"সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়ে" একটি সখের নাট্যশালা জন্ম নিল।

কানাইলালের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। খবর বেরুতে দেবী আছে।

কানাই আসে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এই নাট্যশালায়। বৈষ্ণব বাজনা বাজায়। আপন মনে গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

কেউ কেউ অস্থির হয়ে তাকে বাধা দেয় কিন্তু শ্রীশ তাকে উৎসাহিত করতে ছাড়ে না। রাসবিহারী বসুও কানাইয়ের পক্ষে ওকালতি করে।

মতিলাল বাধাদানকারীদের নিরস্ত করেন।

রিহাসাল শুরু হয়ে যায়।

অভিনয়ে কানাইয়ের রঙই ভয়। একটি অতি

সামান্য পার্টেই সে খুশী। ষ্টেজে উঠে ঘাবড়ে গিয়ে ছুটো একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয় না পাশ থেকে প্রমাণি না করলে।

একেএকে মতিলালের সব প্রচেষ্টাই ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে।

এটাও গেল ওঠে। চেষ্টা করেও নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না।

সহজে দমবার ছেলে নয় মতিলাল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কেন্দ্র করে এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল—“সং পথাবলম্বী সম্প্রদায়।” দ্বিভাষী নারায়ণ সেবাই হ'ল এই সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ।

ধর্মকর্মে কানাইলালের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, তাই অনেক সময় সে এ বিষয়ে মতিলালের সঙ্গে এক মত হতে পারে নি।

সেখান থেকে সে কিছুদিনের জন্যে গা-ঢাকা দিল।

ছুটো বছর কানাই অন্য দিক দিয়ে নিজেকে তৈরী করতে লাগল।

এফ, এ পরীক্ষার জন্তেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, কানাই এদের থেকে দূরে সরে রইল।

কানাইলালের পারিবারিক অবস্থা তখন অর্থ সংকটের মুখে। এটি তার কারণ কিনা, ঠিক বলা যায় না।

এই সময়ে সে ই, আই, রেলওয়ের এজেন্ট অফিসে একটা চাকরী যোগাড় করেছিল। কিন্তু দেড়মাসের বেশী সেখানে তার টিকে থাকা সম্ভব হয় নি।

সে তার নিজের চরিত্রবল এবং সত্যের ওপর নির্ভর করেই চলত। যা ভাল বুঝত তাই সে করত।

কোন পরামর্শই তার একনিষ্ঠ মনকে কোন দিনই প্রভাবিত করতে পারে নি।

কাজকর্মে বিশেষ অসুবিধে হওয়ায় ১৯০৩ সালে ‘অক্সফোর্ড মিশনের খুব কাছে অনুশীলন সমিতির কার্যালয় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ৪৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে, ২১ নং মদন মিত্র লেন থেকে।

এই অনুশীলন সমিতি পরে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

গুপ্তসমিতির একটি শাখাও খোলা হয়েছিল ঢাকা সহরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের পরিপেক্ষিতে আদর্শ মানুষ গড়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। শারীরিক ও নৈতিকবল অর্জনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন যুবকদের তা নিখুঁত ভাবে এখানে শিক্ষা দেওয়া হোত।

দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে—

১। ত্রায় নিষ্ঠা আর শিষ্টাচার সম্বন্ধীয়।

২। ব্যায়ামের সাহায্যে শরীর ও মনকে সুদৃঢ় করা।

ব্যায়ামচর্চার মূল অঙ্গ ছিল—ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, তলোয়ার চালান, মুষ্টিযুদ্ধ, যুগ্মসু প্রভৃতি। এছাড়া সামরিক কায়দায় ড্রিল ও মক্কাফাইট শেখান হোত, সম্ভব প্রতিটি সন্ত্যাকে।

পি, এন, মিত্রই বিশেষভাবে এই শাখাটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

ঝিমিয়ে পড়া বাঙলা যখন আবার একটু একটু করে জাগছে এই সময় বিজ্ঞানবলের কয়েকজন শিক্ষক ব্রিটিশ বিরোধী এক রূপক রচনা করলেন,—রাবণবধকে অবলম্বন করে। এই গান স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে গাওয়ান শুরু হয়ে গেল, ছুটির পর। নিউ ইণ্ডিয়া স্কুলের বাড়ীতে এবং মহেশালয়ে ছেলেরা রোজই গেয়ে চলল। শিশু মনে যাতে প্রথম থেকেই ইংরেজ বিদ্বেষ জেগে ওঠে সেই ভাবেই গানের ঐ ধরনের কলিগুলো তৈরী হয়েছিল—

“সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ও মা;

দে মা অস্ত্র-দয়া করে; বেটাকে তাড়াই দূরে।

ও তোর অশাস্ত বলে আর নাহি ভয় মা,

শক্তি পূজা করতে দেখে ‘বেটা’ কটমটিয়ে থাকে।

সে তো নাহি মনে ভাবে, আমরা তোর।

—ও নয় মা।”

বিবেকানন্দ্রের বাণীতে পাশ্চাত্য জাতি একদিন জেতেনছিল, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের ভাবধারা, ভারতের হিন্দু ধর্ম কি বস্তু।

পরে বিপিন পাল, ব্রজেন শীল, ব্রজবান্ধব পাশ্চাত্যে

গিয়ে উৎপীড়িত ভারতের শোষিত রূপটা সাধারণের চোখের সামনে কিছু কিছু করে তুলে ধরেছিলেন বটে। কিন্তু বিবেকানন্দ যে ফল সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এরা তার কিছুই পারলেন না।

স্বামীজীর তিরোধানের পর আয়ারল্যান্ডের কন্না মারগারেট—স্বামী বিবেকানন্দ যাকে হাতে করে গড়ে তুলেছিলেন, সেই দীপ্তিময়ী রমণী—ভারতের ভগিনী নিবেদিতা দেখলেন, হিন্দুস্থানের ক্ষয়িষ্ণু জাতির মনোরল গড়ে তুলে ইংরেজ শাসনের ওপর চরম আঘাত হানতে হবে।

এখন প্রয়োজন জাতির অভ্যুত্থান।

যে মনোবল দেখা যায় নি লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালী লাজপৎ, বালগঙ্গাধর তিলক বা বিশিনচন্দ্র পালের ভেতর সেই চেতনা এক বিধ্বংসী রূপ নিয়ে গর্জে উঠল নিবেদিতাতে।

গুপ্ত সমিতিতে জাগিয়ে তুলতে এই বিদেশীনি সর্ব শক্তি নিয়োগ করলেন। প্রতিটি বিষয়ে সহায়তা দিয়ে গুপ্ত সমিতির মেরুদণ্ডকে সোজা করে ধরলেন এই মহীয়সী নারী।

অরবিন্দ 'অগ্নি ও রক্তস্রোত' সমিতিতে পূত ও পবিত্র করে তুললেন।

নিবেদিতা রিপাবলিকানের বাছা বাছা বিদেশী বই এনে সমিতির গ্রন্থশালায় উপস্থিত করলেন। দিকে দিকে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে এনে সমিতির বুলিতে ফেলতে লাগলেন। যুবকদের বিমিয়ে পড়া মনোবলকে মাঝে মাঝে শ্লেষবাক্যের কষাঘাতে উত্তেজিত করতে লাগলেন, আবার প্রয়োজন বোধে কুণ্ডলিনী শক্তিতে নিদ্রাচ্ছন্ন যুবকদের ধীরে ধীরে তৈরবমূর্তিতে জাগিয়ে তুললেন।

[ক্রমশঃ]

বুদ্ধদের মত

প্রশান্ত ভবাই

পত্র দিয়েছিলাম কালকের ডাকে
এখনো পৌঁছেতে লাগবে দিন কতক
অথচ এরই মধ্যে হুরুমুরু করে
তোমার উজ্জল উপস্থিতি
আমাকে সরিয়ে দিল এই পৃথিবীর
আলো পাখি মাটি আর

মানুষদের মধ্যে।

এখন যে গান আনবে আমার কণ্ঠ
যে সুর জীবনকে আঁকড়ে থাকবে
বুদ্ধ বটবুদ্ধ মাটিকে যেমন
তাই সে উজ্জল আবির্ভাব বারতা

যে পাখী আনলো আজকের প্রভাতে
গুণে গুণে শেষ হবে প্রতিটি জীবনের
এক একটা বুদ্ধদের মত ॥

পোতের আশায়

উমাপদ নাথ

আমি এক দ্বীপের বাসিন্দা,
চারিদিকে সুশিক্ষিত
বিবেকের জ্বর খল জ্বল।
সুশান্ত বাকের মতো এখানে সেখানে
ধার্মিক নাগের ফণা। অথচ তরুণ
ঘাসের গানের পাতে ফড়িঙের নৃত্যের আঁচড়
যতটুকু তরলিত, তার চেয়ে কোমল জলের
আশ্চর্য মীনের মতো এখানে এলাম
তোমার এই স্নেহস্রোতঃ ভুবনের তীরে।
ইদানিং বন্দী আমি। কাকের তালুর মতো
লাল অন্ধকারে বসে নিজেকে দেখতে গিয়ে
দেখি শুধু নিজের ভূতকে। কেবল ভরসা,
এখনো অন্তরে আছে উদাস্ত তিতিক্ষা
এবং সে পোতের আশায় উৎকণ্ঠ ব্যাকুল।

সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতি নলিনচন্দ্র দত্ত

রেণুকণা ঘোষ

নলিনচন্দ্র দত্ত প্রবর্তক সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতি। ১৩৬৫ সনের ২৭শে চৈত্র, ইংরাজী ১৯৫৯ সালের ১০ই এপ্রিল, শুক্রবার সজ্জের প্রতিষ্ঠাতৃ সভাপতি পরম পূজ্যপাদ মহাপ্রবর্তক মতিলালজীর মহাপ্রয়াণের পর নলিনচন্দ্র দত্তই সজ্জসভাপতি পদে বৃত্ত হন। তিনি যে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবেই ঐ পদের অধিকারী হন, তা নয়—সর্ববিষয়েই তিনি যোগ্য ছিলেন। সজ্জের অগ্রজ ব্রাহ্মী চিদানন্দজীর পরেই জ্যেষ্ঠত্বের এবং জ্যেষ্ঠত্বের অধিকার ছিল একমাত্র তাঁরই।

প্রবর্তক সজ্জ-সভাপতি নলিনচন্দ্রের জীবন ছিল ঠিক যেন উৎসর্গের পবিত্র “স্বত-প্রদীপ”। দূর আকাশে আদর্শের প্রবল ক্ষত্র তিনি। তাঁর জীবনে কোন আড়ম্বর উদ্ভেজনা ছিল না—স্নিগ্ধ মধুর স্বতপ্রদীপের আলোর মতই তাঁর জীবনের মাদুর্য্য মহিমা। সরল, অকপট, অমায়িক, মানবদরদী নলিনচন্দ্রের জীবন ছিল স্বচ্ছসলিলা ফল্গু নদীর মত। সজ্জের সাধ্য প্রেম ও ঐক্যের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

এই পুণ্যশ্লোক, পুণ্যাঙ্গা নলিনচন্দ্রের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত মেড়াল গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ মাণিকমোহন রায় ছিলেন মেড়াল গ্রামের জমিদার। তৎপুত্র গোলকনাথ রায় কোনও কারণে প্রজাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পিতৃপিতামহের জমিদারী এক আঙুরীকে (উগ্রক্ষত্রিয়কে) বিক্রয় করে দিয়ে নিজে সেখানে প্রজা হিসাবে বসবাস করতে থাকেন। তথাপি “গাঁয়ের বাবুরা” বলতে আজও মাণিকমোহন রায়ের বংশধরদেরই বোঝায়।

গোলকনাথ রায়ের চার পুত্র। প্রথম কালিকাদাস রায়, দ্বিতীয় দুর্গাদাস রায়, তৃতীয় অঘোরনাথ রায় এবং চতুর্থ অঘিনাশচন্দ্র রায়। কালিকাদাস রায়ই প্রথম “দত্ত” পদবী গ্রহণ করেন। সেই থেকেই তাঁদের বংশে “দত্ত” পদবী চলে আসছে; কিন্তু কেন যে তিনি তা গ্রহণ করেন, তা জানা যায় না। গ্রাম্য পরিচয়ে আজও অবশ্য শেড়লের “রায়”ই বহাল আছে।

কালিকাদাস দত্ত তখনকার দিনে একজন স্বনামধন্য

পুরুষ ছিলেন। তিনি কুচবিহার রাজস্বোফিসের দেওয়ান এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা ৪নং গঙ্গাধরবাবু লেনে তিনি একটি বিরাট বসতবাটী নির্মাণ করেন। জন্মভূমি মেড়াল গ্রামেও তিনি বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাঁতবা চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র আই, সি, এস্ চারুচন্দ্র দত্ত। ইনি বোম্বাই-এর ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনজজ্ ছিলেন। ইঁহার আরও দুই ভ্রাতার নাম যথাক্রমে অতুলচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র।

অতুলচন্দ্র অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁরই বিধবা পত্নী স্বর্গীয়া বীণাপাণি দত্ত “গোপালের মা” নামে আজিও গঙ্গাধরবাবু লেনে সুপরিচিত।

চারুচন্দ্র দত্ত মধ্য কলিকাতা নিবাসী বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের রাজা সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের ভগ্নী লীলাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের একটিমাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের প্রথম অধিকর্তা অপূর্বকুমার চন্দ্র তাঁহার জামাতা। অপূর্বকুমার ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চারুচন্দ্র যখন মহারাষ্ট্রের সেশন জজ্ সেই সময় জাতীয়তার ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় একটি গুপ্ত বিপ্লব সমিতি গঠন করেন। চারুচন্দ্র সেই গুপ্ত বিপ্লব সমিতির একজন অন্তরঙ্গ সহায়ক ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সপরিবারে পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করেন। ঐখানেই তাঁর পার্থিব মর দেহের অবসান ঘটে।

গোলকনাথ রায়ের “দ্বিতীয়” পুত্র দুর্গাদাস দত্তের দুই পুত্র ও এক কন্যা। তাঁর তৃতীয় পুত্র অঘোরনাথ দত্তই নলিনচন্দ্র দত্তের পিতা। গোলকনাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অঘিনাশচন্দ্রের কিরণচন্দ্র নামে একটি মাত্র পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

অঘোরনাথ তাঁর স্বগ্রাম মেড়ালে বিশেষ থাকতেন না। কর্মক্ষেত্র পাবনাতেই বসবাস করতেন। পাবনায়

তিনি সেরেস্তাদারের কর্ম করতেন। তাঁর দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ হয় বর্ধমান জেলারই যোধকুবের গ্রামের বিখ্যাত বোস পরিবারে। তাঁর প্রথমা পত্নীর নাম সত্যাকালী। ইহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র অমূল্যচন্দ্র দত্ত। ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম করতেন। কন্যাটিরও যথাকালে বিবাহ হয় বর্ধমান জেলারই বীরশিমূল গ্রামের কেশবচন্দ্র বসুর সহিত। কিন্তু কন্যাটি বিবাহের অল্প কয়দিন পরেই গত হয়।

প্রথমা পত্নী শ্রীমতী সত্যাকালী দত্তের মৃত্যুর পর অঘোরনাথ পূনরায় বিবাহ করেন চন্দননগর বোড়াই-চণ্ডীতলাস্থিত উমেশচন্দ্র ঘোষের প্রথমা কন্যা শশীবালা ঘোষকে। ইহারই একমাত্র পুত্র নলিনচন্দ্র দত্ত।

নলিনচন্দ্র দত্ত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর দিদিমার বাপের বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দিদিমা শ্রীমতী সুখদা ঘোষ নৈহাটির বিখ্যাত 'সরকারবাড়ী'র কন্যা। তাঁরা ভাইবোনে সর্বসম্মত পনের জন। ছয় ভাই ও নয় বোন—বিরাট সংসার। বোনেদের মধ্যে সুখদা ছিলেন তৃতীয়। বোড়াইচণ্ডীতলা ঘোষদের তিনি জ্যেষ্ঠবধু হন।

সেই সময় বোড়াইচণ্ডীতলার ঘোষেরা বেশ বহু পরিবার ছিলেন। তাঁদেরও জ্ঞাতিগোষ্ঠী বহু ছিল। উমেশ ঘোষেরাও ভাইবোনে অনেকজন ছিলেন। তাঁর তিন কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা শশীবালা—ইনিই নলিনচন্দ্র দত্তের মাতা। অপর দুই কন্যার নাম যথাক্রমে নগেন্দ্রবালা ও সুরেন্দ্রবালা ওরফে সুরবালা। সুরবালা শেষজীবন সজ্জের সেবাতেই উৎসর্গ করেন। নলিনচন্দ্রের মাসিমা হিসাবে তিনিও প্রবর্তক সজ্জের "মাসিমা" নামেই সর্বজনপরিচিতা হন।

পনের বৎসর বয়সে শশীবালার বিবাহ হয়। সেই সময় তাঁর সপত্নীর জ্যেষ্ঠপুত্র অমূল্যচন্দ্রের বয়স ছিল চৌদ্দ, কন্যার (নাম পাওয়া যায় না) বয়স বার এবং কনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স আট বৎসর মাত্র। বিবাহের

পর শশীবালা পুত্রকন্যাসহ পাবনাতেই অবস্থান করেন।

যথাকালে তাঁরও একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম হয় নলিনচন্দ্র। নলিনচন্দ্রের জন্মের দুই-এক বৎসরের মধ্যেই পিতা অঘোরনাথ দ্রুত কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্ম বাধ্য হয়েই তাঁকে পাবনার বাসা তুলে দিয়ে কলিকাতা অক্লুরদত্ত লেনে বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করতে হয়। এইখানে তাঁর চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই হয় কিন্তু আরোগ্য আর হয় না। ক্রমশঃ অধিকতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি কন্যাটির বিবাহকর্ম সম্পন্ন করেন। অবশেষে এই কালাজ্বরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর বৎসর খানেকের মধ্যেই পত্নী শশীবালাও এই একই রোগে আক্রান্ত হন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনিও গতায় হন। পুত্র তিনটি অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে স্ব-মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

নলিনচন্দ্র আশ্রয় পান চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলায় তাঁর মাতুলালয়ে। দিদিমা দাদামহাশয় পুত্রাধিক স্নেহে তাঁকে লালনপালন করেন। দিদিমাকেই তিনি "মা" বলে ডাকতেন এবং জানতেনও। এই বাড়ীতেই তিনি আবাল্য বসবাস করেন। পরে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ীখানিও তিনিই পান এবং সজ্জের নামে উহা উৎসর্গও করে দেন।

সজ্জগুরু শ্রীমতিলালজীর এবং নলিনচন্দ্রের বাড়ী পাশাপাশি—এ-বাড়ী ও-বাড়ী বসেই হয়। পাড়া হিসাবে তিনি মতিলালজীকে "মতিমামা" বলে ডাকতেন। বয়সে তিনি সজ্জগুরুদেবের চেয়ে প্রায় ১১ বৎসরের ছোট ছিলেন। সজ্জগুরুদেবের যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতার অবস্থা মরণাপন্ন হওয়ায় জ্ঞানী সদ-প্রসূতা সন্তানকে পরিত্যাগ করে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন। ধাত্রীও সন্তোজাত শিশুকে ঘরের এক কোণে জড়ো করা ছাইয়ের গাদায় ফেলে রেখে মৃদুস্বপ্নে দেখবার জন্ম ছুটে যায়। নলিনচন্দ্রের দিদিমাই সেদিন সজ্জগুরুকে ছাইয়ের গাদা থেকে তুলে এনে স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

"পাশাপাশি বাড়ী হওয়ায় নলিনচন্দ্র শিশুবয়স থেকেই

মতিমামার, সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর উৎসাহ, প্রেরণা ও মনোবল নলিনচন্দ্রকে নূতন মানুষরূপে গড়ে ওঠায় সাহায্য করেন। তিনি আবাল্য অত্যন্ত রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন ছিলেন। মতিমামার প্রেরণাবাদীতে প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হলেও শরীর একান্তভাবে অপটু থাকায় তাহা কার্যকরী হত না। অবশেষে তাঁরই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত নলিনচন্দ্র চন্দননগরের বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের “আখড়া” ভর্তি হন। সেইখানে তখন লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তী, বক্সিং, যুগ্মসু প্রভৃতি নানাবিধ শরীরচর্চামূলক খেলার ব্যবস্থা ছিল। মতিলালজী ইহার সহিত একটি সাপ্তাহিক “পাঠচক্র” যুক্ত করেন। কানাইলালের মাতুলালয়ে চন্দননগরে সরিষা-পাড়ায় এই “আখড়া” প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সহিত কানাইলালও ধৃত হন।* সেই সময় মতিলালজী এই “আখড়া”টি তাঁর নিজ বাড়ীতে উঠিয়ে আনেন। তাঁর বাড়ীতে শক্তিসাধনা অপেক্ষা জ্ঞান-চর্চাই প্রাধান্য লাভ করে। নলিনচন্দ্র পাঠচক্রের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

নলিনচন্দ্র যত তাঁর মতিমামার প্রতি আকৃষ্ট হন, তত তাঁর প্রতি বাড়ীর শাসন কড়া হয়। তিনি একজন অভিজাত বংশের সন্তান। বিরাট আভিজাত্য নিয়ে তাঁর জন্ম। ভবিষ্যৎ তাঁর অতীব উজ্জ্বল। বংশ-ধারানুযায়ী ভবিষ্যতে তাঁকে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে। সুতরাং ঐ সব আখড়া-টাকড়ায় মিশে বাউগুলের মত ঘুরে বেড়ালে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে—কাজেই দিদিমা দাদামহাশয়ের কঠোর আদেশ তাঁকে মানতেই হবে। তাঁর মনেও যে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্র ফুটে উঠত না, তা নয়। কল্পনা নয়নে বিদ্যার, গৌরবের, ঐশ্বর্যের, প্রতিপত্তির কত রঙিন স্বপ্নই না তিনি দেখতেন! কিন্তু মতিমামার সান্নিধ্যে এলেই সব গোলমাল হয়ে যেত। আরার না এসেও তিনি থাকতে পারতেন না। কি এক অনির্বচনীয় আকর্ষণে সব বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করেই তিনি প্রতি

রবিবার পাঠচক্রে যোগদান করতেন। মতিমামার প্রেমাশ্রুবিগলিত অথচ প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকালেই তিনি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাঁর সেই সৌম্য সুদর্শন চেহারা, সুন্দর সুঠাম মুক্তি, তপ্তকাক্ষনসন্নিভ অঙ্গবর্ণ, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, মাথার ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশদাম স্তবকে স্তবকে ঘাড় অবধি নেমে এসেছে—দেখলেই মন ভুলে যেত। যে দেখত, সেই ভাল না-বেসে থাকতে পারত না। নলিনচন্দ্রও পারলেন না—তিনিও মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেন। বাড়ীর কড়া শাসন, উপদেশ, শেষে দিদিমার করুণ আকৃতি কিছুতেই তাঁকে ফেরাতে পারল না। ভালবাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল, প্রেমের সম্বন্ধ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল। অবশেষে এক করুণ মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে নলিনচন্দ্রের অনুরাগ বাধামুক্ত হয়ে দৃঢ়ভূমি লাভ করল।

নলিনচন্দ্র সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাত আট মাস একেবারে শয্যাশায়ী। ডাক্তার-বন্দি কিছুই বাকী রইল না। সবাই একে একে বিদায় নিলেন। কথা কইবার শক্তি নেই, দৃষ্টি ঝাপসা, অঙ্গ অবশ। অবশেষে একদিন মৃত্যুর তুষারশীতল স্পর্শে চেতনা অবলুপ্ত। ঘর থেকে আঙিনায় বার করা হয়েছে। দিদিমার মর্মভেদী আতনাদ, বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করলেন—“ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ”। এমন সময় তাঁর মতিমামা ঝড়ের বেগে এসে তাঁর বুকের উপর মুখ রেখে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—“নলিন! ও নলিন!! চোখ চাও, শোন আমার কথা—মরা তোমার হবে না, বাঁচতেই হবে তোমায়। আমার যে অনেক কাজ, আর সেই সব কাজ তোমাকেই করতে হবে। তুমি যে আমার চিহ্নিত মানুষ!” এ তো শুধু কথার কথা নয়, এ যে তাঁর আদেশ, অমোঘ, অব্যর্থ নির্দেশ। তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে সুগভীর স্নেহে ডাক দিয়ে তিনি মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসার জন্ত নলিনচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাতে লাগলেন। সে করুণ আহ্বান নলিনচন্দ্রের অবলুপ্ত চেতনার সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে স্পন্দন তুলল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। এ যে চিরপরিচিত প্রেমপূর্ণ সেই মুখ! নলিনচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুসাগর উথলে

* সঙ্ঘপুস্তক নির্দেশে নলিনচন্দ্রই গোপনে কলিকাতায় আলিপুর জেলে কানাইলালকে রিভলবার সরবরাহের ব্যবস্থাদি করেন। ১৯৩৮ খৃঃ ৩১ আগষ্ট রাজসাক্ষী শ্রীরামপুরের নরেন গোয়ামাকে হত্যা করা হয়। ১০ নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসি হয়।

উঠল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে বরণ করে নিলেন। দীক্ষা হল নবজন্মের। এই দীক্ষাই জীবনের সার হ'ল। একেই বলে শাস্ত্রবী দীক্ষা। অগ্ন আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নলিনচন্দ্রের আর হয় নি।

মৃত্যুকে পরাজিত করে মতিমামার আদেশে নলিনচন্দ্র বেঁচে উঠলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। দিদিমার “সবে ধন নীলমণি” নলিনচন্দ্র। মৃত্যুর কবল থেকে তাঁকে ফিরে পেয়ে আভিজাত্যের গর্ব ভবিষ্যতের সোণার স্বপ্ন, বাৎসল্য স্নেহে দিদিমা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মতিলালজীর হাত দুখানি ধরে অশ্রুভরা কণ্ঠে বল্লেন—“মতি! আজ থেকে এ ছেলে তোমার। তোমার হাতেই একে সমর্পণ করলুম। তুমি একে চিরসঙ্গী করে রেখ।”

ধীরে ধীরে নলিনচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। অতঃপর - - - অবাধ মেলাদেশায় আর কোন বাধা রইল না। তিনি নূতন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, নবভাবে জীবন আরম্ভ করলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মতিমামার সাপ্তাহিক পাঠচক্রের তিনি একজন স্থিতিধী ছাত্ররূপে পরিগণিত হলেন। ওদিকে শরীরকেও সবল সুস্থ রাখার জন্ম নিয়মিত ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, প্রভৃতি সর্ববিষয়েই তিনি পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগলেন।

ভবিষ্যতের এক কৃতী সন্তানরূপে “নলুকে” দেখার আশা দিদিমার মনেও দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কিন্তু বিধাতার বিধান ছিল অন্যরূপ। নলিনচন্দ্র আবার এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁর দাদামহাশয় উমেশচন্দ্র ঘোষ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠী আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঠকিয়ে বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশই আত্মসাৎ করে নেয়। তাঁর উপর তিনি এক মর্মান্তিক শোক পান। উমেশ চন্দ্রের কন্যা তিনটি, কিন্তু পুত্র মাত্র একটি। তিনি পুত্রটিকে উপযুক্ত রূপেই মানুষ করেন। যথাকালে তার বিবাহাদিয়ে পুত্রবধুকে ঘরে আনেন। ঘর আলোকরা বধু সর্বাঙ্গসুন্দরী, নির্খ্যুত সৌন্দর্যের প্রতিমা। বিবাহের কয়েকমাস পরেই কর্মোপলক্ষ্যে পুত্র বিদেশে যায় আর ফেরে না। সেইখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুবার্তা বহন করে আনে একখানি সরকরা পত্র। পিতা

মাতা ধরাশায়ী হন। পূর্বে জ্যেষ্ঠাকন্যা শশীবালার (নলিনচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণীর) শোক দৌহিত্র নলিনচন্দ্রের মুখ চেয়ে তাঁরা সহ্য করেছেন। কিন্তু নিঃসন্তান কিশোরী বধুর মুখ দেখে তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুই-ই হারিয়ে অবশেষে তিনি চরমতম দারিদ্র্যের কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নলিনচন্দ্রের ছাত্রজীবন সেইজন্ম অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি বই কেনার উপযুক্ত অর্থও পান নি। সহপাঠীদের কাছ থেকে খাতায় টুকে এনে পড়তেন। তথাপি তিনি ছিলেন আপনভোলা সদাশিব মানুষ। অসম্ভব বলতে নলিনচন্দ্রের মনে কিছু ছিল না। সদাহাস্য, প্রফুল্লবদন। বিরক্তির লেশমাত্র কোনও দিন এ মুখে ফুটে উঠেনি। তিনি জানতেন, দারিদ্র্য—সে তো ভূষণ। বই নেই? তাতে কি হয়েছে? দিদিমা তো স্বাভাবিকভাবে কেনার পরসাদ দেন। আর তা ছাড়া খাতায় টুকে নিয়ে পড়লে পড়া ভাল হয়, বানান ভুল হয় না, মনেও থাকে ভাল। ছেঁড়া জামা দিদিমা তালি দিয়ে দেন, তাতেই খুসি। আনন্দ-মনে, নির্বিকার চিত্তে তালি দেওয়া জামা আর সেলাই করা কাপড় পরেই তিনি হাসিমুখে চলেছেন বিদ্যালয়ে। কাকা, জ্যেষ্ঠা সব বড় লোক, দাদারা সব বিদ্বান্ ধনী, —তার জন্ম নলিনচন্দ্রের মনে কোন খেদ নেই। তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য এলে খুব খুশী মনেই তা গ্রহণ করেন, —না এলেও কোন হুঃখ নেই। এ যেন ‘জন্মযোগী’!

এমনভাবে কৈশোর যায়—যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি চন্দননগর ডুপ্পে কলেজিয়েট স্কুল (বর্তমান কানাইলাল বিদ্যামন্দির) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। চারুচন্দ্র রায় তাঁকে শিক্ষাদানে অনেক সাহায্য করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষকদের অতি প্রিয় ছিলেন। তাহাড়া তাঁর অমায়িক ব্যবহারে, মিথ্য বাক্যে সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি এফ. এ পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর শ্রীরামপুর কলেজ থেকে তিনি বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

নলিনচন্দ্রের ছাত্র জীবনে দেশের বুকে পর পর দুইটি যুগ আসে। প্রথম স্বদেশী যুগ, তারপর বিপ্লবযুগ। দুই যুগেই তিনি মতিমামার সকল কর্মে সহায়ক হন। স্বদেশী যুগে তিনি মতিমামার “সংগঠাবলম্বী” (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়) সম্প্রদায়ের সভ্য হয়ে দ্বারে দ্বারে মুক্তিভিক্ষা সংগ্রহ করে দিয়েছেন, বিদেশী দ্রব্য বজ্জনের জন্য বাজারে বাজারে পিকেটিং করেছেন। বন্দেমাতরম ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে নিয়ে সবদিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবার বিপ্লবযুগে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হতে আরম্ভ হয়) সজ্জগুরু নেতৃত্বে ও সজ্জগুরুর আজীবন অনুসরণকারী ও ভক্ত শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েকের কর্তৃত্বে (মণীনদার বয়স বর্তমানে ৮৬ বৎসর) চন্দননগরে যখন বোমা তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়, তখন নলিনচন্দ্রই সেই বোমার যাবতীয় মালমশলা সংগ্রহ করে আনতেন, আবার সংরক্ষণেও নিযুক্ত থাকতেন। এমন কি বোমা তৈয়ারীর কাজেও নানাভাবে সহায়তা করতেন। চন্দননগরে বিভিন্নভাবে বোমা তৈয়ারীর যে সব সহায়তা-কেন্দ্র ছিল, সেই সব কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং পরিদর্শন করার কাজেও নলিনচন্দ্রই বহাল ছিলেন। বিখ্যাত “রডা” কোম্পানীর “মজার” পিস্তল ও কার্তুজ বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও অগ্নিবিপ্লবীগণের দ্বারা লুট হয়। লুটের মালের কিয়দংশ চন্দননগরে সংরক্ষণের জন্য আনা হয়। এই আনা ও সংরক্ষণের ব্যাপারেও নলিনচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জিলার উত্তর-পাড়ায় গঙ্গাভাটে সজ্জগুরু মতিলাল, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবী নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে বিপ্লব-সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যৎকর্মসম্বন্ধ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে চন্দননগর হতে নলিনচন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ নায়েক বৈঠকে যোগদান করেছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সজ্জগুরুর নেতৃত্বে ও মণীন্দ্রনাথ নায়েকের কর্তৃত্বে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুত হয়। নলিনচন্দ্র সেই বোমা চন্দননগর হতে কলিকাতা গোপনে বহন করে নিয়ে আসেন।

কলিকাতা থেকে আবার তাহা দিল্লীতে বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসুর নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত বোমা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রাসবিহারীর নির্দেশে বসন্তকুমার বিশ্বাস কর্তৃক ভারতে নিযুক্ত তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি ভাইসরয় (viceroy) ও গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর হত্যার উদ্দেশ্যে দিল্লীর চাদনীচকে উক্ত বোমা ফেপণ করা হয়।

এইভাবে নানা দিক দিয়ে তিনি তাঁর মতিমামার নীরব সহায়ক হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ বা অন্তরীণ, কেউ বা জেলে আটক হন, আবার কেউ কেউ আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাবাসও ভোগ করেন। কিন্তু নলিনচন্দ্র এমন ভাবে থাকতেন যে, পুলিশ সন্দেহ করলেও আটক করার মত কিছু পান নি। বাইরে তিনি ছিলেন একেবারে উদাসীন প্রকৃতির লোক। তাঁকে দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি করতে পারেন। বাইরে তিনি নির্বিকার, নিলিপ্ত, উদাসীন, কিন্তু ভিতরে তিনি খুব সাবধানী, বুদ্ধিমান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নলিনচন্দ্র এম, এ পড়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু থাকবেন কোথায়? অর্থ নেই যে হোষ্টেল বোর্ডিং-এ থাকেন। আত্মীয়-স্বজন যারা ছিলেন, তাঁরা বিপ্লবী নলিনকে আশ্রয় দিতে ভয় পেলেন। সেই সময় নলিনচন্দ্রের ছোট মাসিমা সুরবালা ও তাঁর স্বামী ছোট মেসোমহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা কার্তিক রসু লেনে (গ্রে ফ্রীট) বাস করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের একটি মাত্র কন্যা। তিনি পুলিশের ভয়কে অগ্রাহ্য করে আপন সন্তানতুল্য নলিনচন্দ্রকে আশ্রয় দিলেন। অনেকে ভয় দেখালেন—সত্যেন্দ্রনাথ ইংরাজ গভর্নমেন্টের অধীনে চাকুরী করেন গভর্নমেন্টের কোপে পড়ে তাঁর চাকুরী নষ্ট হতে পারে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ পুত্রাধিক স্নেহে সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করেন। ভগবান তাঁর সম্মান রক্ষা করেন। পুলিশের কুনজরেও তিনি কোনদিন পড়েন নি, চাকুরীও তাঁর খোঁশা যায় নি। মাসিমা ও মেসোমহাশয়ের যত্নে ও

আশ্রয়ে থেকে তিনি এম, এ পড়তে থাকেন। উৎসাহী, দেশের প্রতি অনুরাগী ছেলে দেখলেই মিষ্ট কথায় তাদের বশ করে ফেলতেন আর আস্তে আস্তে তাঁদের মতিমামার সান্নিধ্যে আসার পথ করে দিতেন। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্রকেই তিনি সজ্ঞগুরুর সাহচর্যে নিয়ে আসেন।

তখনও কিন্তু সজ্ঞ প্রতিষ্ঠা পায়নি—শ্রীমতিলালজী সজ্ঞগুরু নামে তখনও পরিচিত হননি। প্রতিবেশীর সম্পর্ক ধরে কেউ বলেন মামা, কেউ বলেন কাকা, আবার কেউ বা “মতিবাবু” বলে সম্বোধন করেন। নলিনচন্দ্রও মামা বলে ডাকতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের এমন একটি অনাবিল, অকৃত্রিম, অহেতুক, অনবদ্য ভক্তি ছিল যা জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধের উপরে—যার ভার আছে, রূপ আছে, কিন্তু ভাষা নেই। এ যেন গিরিগুহার অন্তঃকারিণী নিব্বরিণী। নিরন্তর ঝর ঝর, তরতর করে বয়ে চলেছে, গিরিগাত্রের কর্কশ রুক্ষতাকে মসৃণ করে কিন্তু এর কোন উচ্ছ্বাস নেই, নেই কোন উন্মত্ততা। নলিনচন্দ্রের ভক্তি ছিল ঠিক সেই রকম। তিনি যাঁরই সংস্পর্শে আসতেন, তাঁকেই তাঁর অন্তরের সরল ভক্তি দিয়ে সজ্ঞগুরুদেবের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতেন। কলিকাতা হেডয়ার ধারে (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) বসে তিনি সহপাঠীদের কাছে বক্তার, পর ঘণ্টা দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও সাধনার কথা, ভাবী সজ্ঞের কথা বলে যেতেন। এমনই ভাবে বহু সতীর্থকে তিনি সজ্ঞে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে স্বনামধন্য কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের (এফ, আর, সি, এস) মধ্যম ভ্রাতা। তখন তিনিও এম, এ, ক্লাসের ছাত্র। নলিনচন্দ্র ও কৃষ্ণধন দুজনে একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেই ১৯১৮ সাল থেকেই তিনি চন্দননগরে আসা যাওয়া শুরু করেন। পরে সজ্ঞ সৃষ্ণনের তিনি একজন প্রধান পুরোধা হন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হইতে তিনি আত্মোৎসর্গ করে প্রবর্তক সজ্ঞে যোগদান করেন। অদ্যাপি চন্দননগর আশ্রমেই আছেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় সজ্ঞগুরু

শ্রীমতিলালজী সজ্ঞের ইংরাজী সাপ্তাহিক মুখপত্র Standard Bearer প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ ভাবেই “প্রবর্তক” মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বর্তমান বর্ষে প্রবর্তক পত্রিকা ৬০ বৎসরে পদার্পণ করেছে। Standard Bearer দ্বিতীয় মাসিক প্রচার পত্রিকা। এই পত্রিকা বাহির হওয়ার কালে গভর্ণমেন্টের কাছে ১০০০ টাকা সিকিউরিটিরূপে আমানত জমা দিতে হয়। নলিনচন্দ্র তাঁর গ্রাম্য সম্পত্তির সদ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ১০০০ টাকা ভৎক্ষণাৎ গভর্ণমেন্টের নিকট জমা দেন। সেই সময় প্রবর্তক প্রকাশিত হয় চন্দননগর থেকে কিন্তু Standard Bearer প্রকাশিত হয় কলিকাতা কার্তিক বোস লেন থেকে। পত্রিকা প্রচার করার সব কিছু দায়-দায়িত্ব সজ্ঞগুরুদেব নলিনচন্দ্রের উপরই ন্যস্ত করেন।

শ্রীগুরুদেবের দেওয়া দায়িত্ব নলিনচন্দ্র মাথায় তুলে নিলেন। অর্থ নেই, সম্বল নেই তথাপি গুরুর দেওয়া ভার তিনি অসীম দরদে অদম্য উৎসাহে বহন করে চলেছেন। টাকা নেই, দু-তিন খানা পত্রিকা প্রকাশ হয়ে গেছে। ‘Metcalf Press’ এর তাগিদে তিনি হাসিমুখে টাকা দেওয়ার স্বীকৃতি দান করতেন। প্রেসের সভাধিকারী সরকারী কর্মচারী। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় গড়াগড়া হাতে নিয়ে প্রেসে এসে বসতেন—নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হ’ত, তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি টাকার কথা তুলতেন আর নিঃসম্বল নলিনচন্দ্র তাঁকে দেশের কথা, ভাবী সজ্ঞের কথা, আত্মসমর্পণ যোগের কথা প্রভৃতি বলে ভোলাতেন। কখনও বলতেন না যে, টাকা দিতে পারবেন না।

কয়েক বৎসর পরে টাকার অভাবে Standard Bearer বন্ধ হয়ে যায়। প্রেসের অনেক টাকা বাকী পড়ে। কিন্তু সভাধিকারী নলিনচন্দ্রের এমনই প্রেমে পড়েন যে, টাকার তাগিদ দিতে কুষ্ঠা বোধ করতেন। এমনই চরিত্র-মাধুর্য নলিনচন্দ্রের ছিল।

সজ্ঞের প্রথম যুগে নলিনচন্দ্র ছিলেন প্রচারক। কলিকাতার লক্ষপ্রতিষ্ঠ দানশীল লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। সজ্ঞ তখন ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু নলিনচন্দ্র তাঁর অন্তরের ভাবাবেগে

এই প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্নচিত্র এত বৃহৎ করে সবার সামনে তুলে ধরতেন যে, কেউ সাহায্য করতে না পারলেও সজ্ঞগুরুদেবকে দেখতে আসার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারতেন না। সংগ্রহে নলিনচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রচারের গুণের অমায়িকতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত শ্রম সবাইকে মুগ্ধ করত। শুধু বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালীর কাছেও তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। তাঁর সাহচর্যে এসে সংজ্ঞের দুঃখের দিনে কত লোক যে সংজ্ঞের ‘আপনার জন’ হয়েছিলেন এবং আজও হয়ে আছেন, তার সংখ্যা নেই। প্রথম যুগে সজ্ঞ বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান বলে পুলিশের কুনজরে ছিল। নলিনচন্দ্র ষাঁদের কাছে যেতেন, পুলিশ সেখানেও ধাওয়া করে তাঁদের সরকারের কুনজরে পড়ার ভয় কখনও কখনও দেখাত কিন্তু লোকে পুলিশের ভয় ভুলে আনন্দময় পুরুষ, প্রেমিক প্রচারক নলিনচন্দ্রকে সাহায্য না করে পারত না।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১লা ফাল্গুন, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে জীপঞ্চমী তিথিতে চন্দননগরে “প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ” প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশকে অন্নে ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী করার প্রেরণায় সজ্ঞগুরুদেব দেশের কাছ থেকেই এক লক্ষ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন শতকরা ৯ টাঁকা সুদ হারে। সেই অর্থ দিয়েই তিনি ফ্রেজারগঞ্জ, সুন্দরবন অঞ্চলে জমি ক্রয় ও অগাধ দিকে অর্থ বিনিয়োগ করেন। কয়েকজন তরুণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ জমি চাষাবাদের উপযোগী করে ধানচাষের ব্যবস্থা করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি আবার লক্ষ-মুদ্রা সংগ্রহের জন্য দ্বাদশ জন সজ্ঞধর্মীকে এক বৎসরের ব্রতদান করেন। এই দ্বাদশ জনের মধ্যে নলিনচন্দ্র একজন। কয়েক মাস পরে সজ্ঞগুরুদেব প্রত্যেক ব্রত-ধারীকে অর্থ সংগ্রহের পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দেন। অনেকেই ব্রতপূর্ণ করতে সক্ষম হন না। কিন্তু নলিনচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের ব্রত সম্পূর্ণ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তক আশ্রমে যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়, উহাকেই বৃহত্তর আকারে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে সজ্ঞগুরুদেব ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপীঠকে সংজ্ঞের

ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে (পরবর্তী কালে “শ্রীমন্দির” নামকরণ করা হয়) স্থানান্তরিত করেন। তখন চন্দননগর ছিল ফরাসী শাসনাধীন। ফরাসী সংবিধানের নিয়মানুযায়ী গভর্নমেন্ট ভিন্ন অন্য কাহারও বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু যুগ প্রয়োজনে নিয়মেরও পরিবর্তন যে একান্তভাবেই আবশ্যক—একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই সজ্ঞগুরুদেব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানান। ১৯২৯ হতে ১৯৩২ এই দীর্ঘ ৪ বৎসর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন লাভ করেন। নলিনচন্দ্র দত্তকেই পুরোভাগে রেখে তিনি এই কর্মে ব্রতী হন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আইনের অনুমোদন পাওয়ার পরে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠই “প্রবর্তক বিদ্যাধিভবন” নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়। প্রথম থেকেই নলিনচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকেন। এখন থেকে তিনি বিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। বিদ্যালয় পরিচালনায় তিনি সজ্ঞগুরুদেবের দক্ষিণহস্তরূপ ছিলেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বিদ্যাধিভবন এখন বহুমুখী সর্বার্থসাধক শিক্ষায়তনরূপে পরিগণিত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ছিল তাঁর প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা। বিদ্যালয় যেমন ছিল তাঁর প্রাণ, তেমনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি কখনও কখনও রুঢ় ভাষা প্রয়োগ করতে হলেও প্রেমের অভাব তাঁর কোন দিন হয়নি। তাই ছাত্ররা তাঁর ভৎসনা, এমন কি প্রহার পর্যন্তও শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করত, স্মরণেও রাখত এবং নিজেদের সংশোধনও করে নিত। আর শিক্ষকরা? তাঁরা যে শুধু অনুগতই ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন ভক্ত অনুরাগী এবং অনুজ সহোদর ভ্রাতার স্বরূপ। সকলের নিকটই তিনি নলিনদা ছিলেন। নলিনচন্দ্র কখনও শিক্ষকদের কাজের উপর কড়াকড়ের বা অহংকারের আধিপত্য বিস্তার করতেন না। তাঁরাও নলিনচন্দ্রের পরিচালনা বা পরামর্শ কদাচিৎ কখনও মনোমত না হলেও তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে

নেওয়ায় কুঠা করে নি। তার কারণ পরস্পরের সম্বন্ধ সূত্র ছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, অহংকার বা কর্তৃত্বের উপর নয়। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে এগুগে বড় একটা দেখা যায় না। এই ভালবাসার বাঁধনেই বহু ছাত্রের নলিন-অন্ত প্রাণ ছিল, আজও আছে। প্রবর্তক আবাসিক ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) সজ্জের শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আবাসিক ছাত্রদের বিশেষভাবে দেখাশুনা করতেন এবং দুই ছেলেদের মনের পরিবর্তনে সমর্থ হয়েছেন। সেই প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকে এখনও নলিনদার নাম করে সজ্জ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যেও নলিনচন্দ্রের শ্রদ্ধার আসন ছিল সর্বোচ্চে। ছোট-বড় কাউকেই তিনি কখনও অপরিচিত ভাষা প্রয়োগ করেন নি। তাঁর কাছে মানুষের শ্রেণী বিচার ছিল না, সর্বশ্রেণীর মানুষকেই তিনি আপনাতর ভাষায় বলে উঠতেন। তাঁদের সুখ দুঃখের কথা শুনতেন, প্রয়োজনে মানবোচিত উদার মন নিয়ে সকলেরই সাহায্য করতেন—ছোট-বড় বিচার তাঁর ছিল না। এল কথায় মানবতারই তিনি শ্রেষ্ঠ পূজারী ছিলেন।

আকুয়ার ব্রহ্মচারী নলিনচন্দ্রের সাড়ে ছয় ফুট লম্বা দেহখানি যেমন ছিল ঋজু, আর্থনাসিকায়ুক্ত মুখখানিও তেমন সদাপ্রফুল্ল। আনন্দরসে ভরা হৃদয়খানিও ছিল অতি সরল, প্রেমরস পূর্ণ। সজ্জগুরুদেবও সজ্জজননীর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অনন্তসাধারণ। কখন ও তিনি উভয়ের সমালোচনা বা বিচার করেন নি।

বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর পদ তাঁর আমৃত্যু থাক সত্ত্বেও সজ্জের প্রয়োজনানুযায়ী যখনই যেখানে দরকার হয়েছে তখনই সেখানে তিনি নিবিড় নিষ্ঠার সহিতই সেবা দিয়ে গেছেন। সজ্জের প্রয়োজনে তিনি সজ্জ-সম্পাদক হয়েছেন, আবার সহ-সভাপতিও হয়েছেন কিন্তু কখনও কোন বিষয়ে তিনি মোড়ল বা মাতব্বরের মত এগিয়ে আসেন নি। বরং অগ্গকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পাশ কাটিয়ে চলতেন অথচ সব কাজেই তিনি নীরব সক্রিয় সহায়ক ছিলেন। বিশেষভাবে সজ্জের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে তাঁর শ্রম ও সেবা ছিল সর্বাধিক কিন্তু নাম বা কর্তৃত্বের চাহিদা ছিল না এতটুকু।

সর্বশেষে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ২৭শে চৈত্র ১৩৬৫ বঃ পূজাপাদ সজ্জগুরুদেবের তিরো-ভাবের পর তিনি সভাপতিপদে বৃত্ত হলেন।

নেতৃত্বাভিমান এতটুকুও কোন দিনই তাঁর ছিল না—যেন সকলেরই স্বেচক তিনি। সকলের কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, গ্রহণও করতেন, নিজের মত জোর করে কোথাও আরোপ বা প্রয়োগ করেন নি। কর্তৃত্ব দিয়ে অপরকে বশে রাখার নীতিকে তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। ভালবাসা দিয়েই সবাকার হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন। তাই তাঁকেও ভালবাসত না, এমন কেউই ছিল না—কি ঘরে, কি বাইরে।

সজ্জগুরুদেবের সজ্জতত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ তিনি।

সর্বজনপ্রিয়, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, নিরহঙ্কার, নিরলস অক্লান্তকর্মী নলিনচন্দ্রের স্বাস্থ্য ছিল কিন্তু চিরদিনই অপটু। নানাপ্রকার ব্যাধি তাঁর দেহে ছিল। তাই নিয়েই তিনি দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রয়াণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর। শেষ কয়বৎসর তিনি খুবই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

তাঁর ওপর আবার রোগের উপশমের জন্ম এলো—প্যাথি চিকিৎসা মতে অপরিমিত ঔষধ ও ইন্জেক্সনের প্রতিক্রিয়া—এই উভয়বিধ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেও তিনি একটি মুহূর্তের জন্মও কাতর হন নি, বিরক্ত বোধ করেন নি। আরও আশ্চর্য তাঁর মুখের সেই সদাপ্রসন্ন হাসিটুকুও একটি বারের তরে মিলিয়ে যায় নি। সকলের সঙ্গেই তিনি হেসে কথা বলেছেন, মিষ্টিভাষায় সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন, করুণাভরা আঁখির দৃষ্টি মেলে সকলকে দেখেছেন, যথাকর্তব্য নির্দেশও দিয়েছেন শেষে মুহূর্ত পর্যন্ত। রোগকে এমনভাবে ‘যোগে’ পরিণত করার অসাধ্য-সাধ্য একমাত্র নলিনচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

জীবনের শেষ সাতদিন তাঁর প্রশান্ত চেতনায় যেন একটু আলোড়ন উঠে। তিনি যেন আর এই জরাজীর্ণ শরীর বহন করতে রাজী নন—এমনই ধারা অভিব্যক্তি প্রদান করেন। কিন্তু সে ইচ্ছাও তিনি উৎসর্গ করে দেন ইচ্ছের চরণে। তাই তাঁর সর্বোৎসর্গীকৃত মগ্ন চেতনায় ইচ্ছাই ঘনায়মান হয়ে উঠেন বিদায় বেলায়। তিনিও দুই বাহু বিস্তার করে ইচ্ছের উপস্থিতির অন্তিম জ্ঞাপন করেন। তারপর ধীরে অতি ধীরে আত্মসমাহিত হয়ে পড়েন।

১৩৭১ সনের ২৬শে আশ্বিন ইং ১১ই অক্টোবর ১৯৬৪ মহালয়ার পূর্বাহ্ন সজ্জের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবসান

শ্রীমতী হেমবরগী মুখোপাধ্যায়
জীবনের বেলা মোর হো'ল অবসান,
দেহরবি অন্ত যাবে সায়াফ সমান ।
অসীম আঁধার হবে মহাঘোর নিশি,
অনন্ত কালিমা কোলে যাব আমি মিশি ॥
পাতিয়া মরণশয্যা করিব শয়ান,
মৃত্যু নহে সে যে মোর সু-মহা প্রয়াণ ।
যাপিব রজনী সেথা গভীর নিদ্রায়,
পোহাবেনা নিশীথিনী সেই অচেনায় ॥
আঁখি মেলি দেখিব না প্রভাতের আলো,
সন্ধ্যা-সখীর রূপ শাদা কিবা কালো ।
হীরা সম উজলিবে আকাশের তারা,
ঝরিবে চাঁদিনী রাতে জ্যোছনার ধারা ॥
দিবসের খরতাপে তাপিত ধরণী,
বরষার জলধারা আনিবে শ্রাবণী ।
ভাদরের ভরা নদী ছ'কুল প্লাবিয়া,
পড়িবে ধানের ক্ষেতে জলরাশি নিয়া ॥
শারদ আসিবে ল'য়ে শিউলি বকুল,
টগর, মল্লিকা, ঘুঁই—কত বনফুল ।
সাজিবে সবুজ সাজে তৃণ-শাখাদল,
দীঘির সরসী জলে ফুটিবে কমল ॥
হেমন্ত আনিবে টানি শীতের পরশ,
বসুধা মায়ের বুকে স্নেহ-সুধারস ।
ঝরে পড়া শীত শাখে ধরিবে মুকুল
মধু লোভে আসিবেক যত অলিকুল ।
বসন্ত রাঙ্গিয়া যবে ফাগুন রাঙ্গাবে,
বিরহের সুর কত রাগিণী বাজাবে ।
বধির শ্রবণে তাহা শুনিব না আর,
হেরিব না শুনিব না সে বীণা-ঝঙ্কার ॥
অনন্ত অসীম এক মহা ঘোর নিশা,
নাহি সেথা স্নেহ-প্রীতি নাহি ভালবাসা ।
নাহি কোন অনুরাগ, নাহি অভিমান,
ব্যথা ভরা হৃদয়ের দান প্রতিদান ॥
রহিয়াছি প্রতীক্ষায় সেই নিশি লাগি—
যতটুকু বেলা আছে ততটুকু জাগি ।

ভাটিয়ালী গান

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কামরাঙা ফল ঝুলছে গাছে থলকমলে হাসে—
সেই ভিটা মোর ছাইর্যা বন্ধু যামু কিসের আশে ।
বট অশথে বিছায় ছায়া—
তুলসীতলার মধুর মায়া
ঝুমকোলতা হাত বারাইছে নাগকেশরের পাশে—
সেই ভিটা মোর ছাইর্যা বন্ধু যামু কিসের আশে ।
কল্লীলতায় ভরা ও ভাই দীঘল দীঘির ঘাট
সাঁঝ-মালতির রঙীন বনে আনন্দেরই হাট ।
সরষে ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে—
দোয়েল-ফিঙের নাচন লাগে
ভোমরা ফেরে গুণ-গুনিয়ে মধুর ফাগুন মাসে—
সেই ভিটা মোর ছাইর্যা বন্ধু, যামু কিসের আশে ।

তোমাকে শুধাই

সুনীতকুমার মিত্র

তোমার শান্ত নয়ন-সায়র কেন ছলছল ?
কোন সে নিষ্ঠুর ছিঁড়ছে গো প্রাণের শতদল ?
তোমার প্রাণের শীতলতা কে করেছে চুরি,
তোমার কোলে ঠাঁই না পেয়ে দেশবিদেশে ঘুরি ।
আসল ছেড়ে নকল পানে চলছি সমারোহে,
কেন আমার মন চলেছে সোনার যুগ মোহে ?
জীবন দিয়েও পাইনা কেন শান্তি এতটুক
তোমার কথা ভাবতে গিয়ে ভরেনা তো বুক ।
বলন গো ঘুচবে কবে আঁধার কুহেলিকা
সেই আঁধারে জ্বলবে কবে তোমার আলোর শিখা ?

স্বীকারোক্তি

দীপংকর সেন

দুর্ঘ-সাংবাদিক হওয়ার নিয়ম কি প্রশ্নটা জনৈক ইন্টার্যাকচুয়াল করেছিলেন। বলেছিলাম বিচক্ষণ, ধীশক্তিসম্পন্ন, নির্ভীক নিরলস কর্মী দুর্ঘ সাংবাদিক হতে পারেন। এর জন্ত প্রথমে যেটা দরকার সেটা হোল আপন ব্রতের প্রতি নিষ্ঠা। সত্যি কথা বলতে কি সার্থক সাংবাদিক হওয়াও সাধনা। সার্থক শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যেমন, ঠিক তেমনই।

আপন মনে ভাবছিলাম কি ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় একজন সাংবাদিকে। সাংবাদিকতা যেন নেশা। শুধু ছুটে চলা। তথ্যসম্ভান বুঝি তার কাজ। মনে পড়ছে একটি বিদেশী গল্পের কথা। ছেলেটি সাংবাদিক। তার বিয়েরলগ্ন উপস্থিত। অতিথি আত্মীয় পরিজন সমাগম ঘটেছে। কিন্তু সেই দিনের যে নায়ক তার দেখা নেই। সকলে ভাবছেন কি হোল? কোথায় গেল? অচমক সকল চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সাংবাদিক হবু বরকে আসতে দেখা গেল, শীঘ্র দিতে দিতে। গায়ের জামাটি কাঁধে ঝুলছে। তিনি এলেন। দেখা গেল সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়ছে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার দেবী করলে কেন?

শহর থেকে ফিরছি। দেখি চারটে ষণ্ডামার্কী গুণ্ডা একটি রমণীকে জোর করে ধরে ক্যাডিলাক গাড়ী করে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ওরা চলে যেতেই খেয়াল হল। কি ভীষণ উত্তেজনা। রমণীটির আর্ডচিংকার এখনও কানে বাজছে। ক্রীড না করে পারলাম না।

বুঝুন কাণ্ড। নিজের বিয়ে, বেচারী ভুলেছে। নারী-হরণের মত রোমহর্ষক ঘটনা যদি না সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারে তাহলে সে কি করে যথার্থ সাংবাদিক হবে, কাজেই সে ভুলে গেছে নিজের বিয়ের কথা।

এত গল্প কথা। সত্যি কি তাই ঘটে? হ্যাঁ, ঘটে। ডেভিডের কথা মনে পড়ছে। ডেভিড ফ্লিম ডিভিশনের সেরা ফটোগ্রাফার। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে

যে ১৪ জন সাংবাদিক বিদেশে সফরে যান তার একজন। তাঁর পিতা পরলোকগত পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গেও গিয়েছিল। এই ডেভিডের সঙ্গে পরিচয় হয় বিচিত্র ভাবে। সারনাথে একদল প্রতিনিধি এসেছে। ও দিল্লী থেকে এসে হাজির। ছম দাম ছবি তুলে চলেছে।

বললে দিল্লী যাবার প্লেন কখন পাওয়া যাবে?

বললাম, আগামী কাল।

তবে? ও যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে, আজ চলে যাব ভেবেছিলাম তা আর হোল না। যাক্ টুরিষ্ট লঞ্জে রাতটা না হয় কাটিয়ে নেব।

বললাম, বেনারসে এসেছ। শহরটা দেখে নাও।

বললে, বেশ তাই হবে, তুমি বুঝি কলকাতার লোক?

বললাম, কেন?

তোমার কথা-বার্তা শুনে মনে হচ্ছে। কলকাতা আমি গেছি। সে এক বিচিত্র ঘটনা।

কি সেটা?

দুর্গা পূজার সময়। কলকাতা যেন সেজেছে। রূপসী কলকাতা। পাড়ায় পাড়ায় পূজা হচ্ছে। দেবীকে নানরূপে নানা ভাবে সজ্জিয়েছে। নাচ-গান-বাণ সর্বত্র চলছে। সেই সহরে বেরিয়েছিলাম প্রতিমা দর্শনে। আমি আমার স্ত্রী আর বন্ধু পত্নী। হাতে ক্যামেরা ছিল। কলকাতার ঐ রূপ দেখে সামলাতে পারিনি নিজেকে। হটাৎ মনে হল দিল্লী চলে যাব। আর আসা হবে কি না কে জানে। ছবি তুলে রাখি। পরে কাজে লাগতে পারে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেল। ছবি তুলতে তুলতে কখন দেখি সঙ্গছাড়া হয়ে পড়েছি। পাশে তাকিয়ে দেখি সঙ্গীরা কেউ নেই। ঘড়িতে সময় বললে দুঘণ্টা কেটে গেছে। ক্লান্তি লাগছিল, ট্যাক্সি ধরে বাড়ীর দিকে যাত্রা করলাম। বাড়ীতে পৌঁছতেই গিল্লীর কি ভৎসনা! সত্যিকথা বলতে কি তখন মনে হচ্ছিল বিয়ে করে কি ভুলই না করেছি।

সুনন্দা বললে, মিসেস বসুর কাছে আমার লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছিল। তুমি আসছি বলে কোথায় যে চলে

গেলে। শেষে আমরা বাড়ী চলে এলাম। আজ সারা সন্ধ্যোটাই মাটি হয়ে গেল।

বুঝুন এবার সাংবাদিক হওয়ার বিপদ কত।

স্বাধীন ভারতে বিদেশী সমাগম বেড়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বেশী। কাজেই যত বেশী টুরিষ্ট আসে ততই মঙ্গল। তাই চারদিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সারনাথ নতুন রূপ ধারণ করেছে। সারনাথ বুদ্ধ মন্দির এখন বিশ্ববুদ্ধ সম্মেলন কেন্দ্র। কত লোক আসছে। দেখছে সেই করুণা-ঘন বুদ্ধ মূর্তি। পাশেই মিউজিয়াম। বুদ্ধযুগের অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চুপাশে নানান ফুলের মেলা। ভারতের প্রতীক অশোকচক্রটি এখানে এখনও রয়েছে। পার্থরের মস্তকতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। বা পাশে রয়েছে আসল বুদ্ধমূর্তি। একটি পার্থরের ওপরে খোদাই করা সেই সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহটি। এরই অনুকৃতি আছে সারনাথের মন্দিরে। আর রয়েছে সেই সারনাথ শহরের ধ্বংসস্তুপ। মাটির তলা থেকে বের করা হয়েছে এই শহরকে। একদা অসংখ্য ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করতেন। তাদের থাকার ঘর, পড়ার ঘর, বিরাট বুদ্ধমন্দির, রাণীর গমনাগমনের গোপন স্তরঙ্গপথ এখানেই রয়েছে। কত লোক আসছে দেখছে মন ভরে এই স্থান। দেখছে সারনাথ স্তূপ। বৌদ্ধরা পূজার আয়োজন করছে এই স্তূপের পাদদেশে। ভগবান বুদ্ধ এখানেই নাকি তার শিষ্যদের প্রথম দীক্ষাদান করেন।

ডেভিড ছবি তুলছিল, আমি দেখছিলাম। স্তূপের তলায় তখন বৌদ্ধদের পূজা চলছে। এরা সবাই এসেছে সুদূর বর্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা থেকে।

ছবিতোলা শেষে ডেভিড বললো, চলো সেন চা খাওয়া যাক।

বললাম, চলো গাছের তলায় বসে চা খাই।

গাছের তলায়? বল কি! সারনাথকে কি শাস্তি নিকেতন করে তুলছে?

হাসলাম, তার পর বললাম, এখানকার টুরিষ্ট লজটি এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয় নি। থাকার ব্যবস্থা আছে,

খাওয়ার নেই। অবিশি, থাকার জুতা যা করছে তা রাজসুখ। খাওয়ার ব্যবস্থা করলে হবে অনন্ত সুখ।

বললে, চলো।

ছুজনে বসলাম একটি গাছের তলায়। বেসরকারী এক প্রতিষ্ঠান কোনক্রমে চা ও কিছু স্ন্যাক বিক্রির ব্যবস্থা করেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডেভিড বললে, মহাবোধি সোসাইটি লাইব্রেরীতে গেছি। একজন বললে—কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কি ডেভিড?

বললাম, কেন?

অপনার ছবি দেখলাম। শ্রীমতী গান্ধীর ল্যাটিন আমেরিকা ট্যুর দেখাচ্ছে।

কোথায় দেখান হচ্ছে?

বেনারসের এক সিনেমা হলে, অপূর্ব হয়েছে। সেন খবর নাও কোথায় হচ্ছে ছুজনে গিয়ে দেখে আসবো। দেখবে কি সুন্দর কাজ হয়েছে।

বললাম বেশ নেব। কাল তাহলে ঐ ছবি আমরা দেখবো। হ্যা, কালই, পরশু দিল্লী ফিরে যাব।

চা খাওয়া শেষে ছুজনে বিদায় নিলাম।

সারনাথে বৌদ্ধ সম্মেলন। ক্রীড করা হয়ে গেছে।

কয়েকটি ফোন করতেই জানতে পারলাম ললিতা সিনেমা হলে ছবিটি দেখানো হচ্ছে।

ডেভিডকে টুরিষ্ট লজ্জে ফোন করে বললাম, জানতে পেরেছি।

কোথায় হচ্ছে?

ললিতায়।

সেটা কোথায় জানিনা তো।

কাল চলে এসো আমার অফিসে। তারপর একসঙ্গে ছুজনে বেরিয়ে যাব।

কখন আসবো?

ছুটোয়, আমার ঠিকানাতো তোমার কাছে আছে।

হ্যাঁ। গুড নাইট।

গুড নাইট।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র ডিরেক্টর শ্রীতারশংকর ফোন করছেন।

দীপংকর।

কে, আমি তারশংকরদা।

কবে এলেন।

আজ। একটু আসতে পারবে?

কোথায়?

সারনাথে। আমার সঙ্গে প্রসাদ পাবে।

হাসলাম। বললাম আপনার প্রসাদ পাওয়াতো ইংরাজী লাঞ্চ। বেশ সকাল ১০ টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

এস তাই।

রাখলাম।

আচ্ছা।

তারশংকরদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সারনাথেই। সেবার সেখানে এসেছিলেন সিংহলের গভর্নর জেনারেল। সবাই পরদেশী। নিজ দেশের পোষাক পরিহিত একজনকে দেখে ভাল লাগলো। ধূতি আর পাঞ্জাবী ছিল তার পরিধানে।

বললাম, কয়েকটি নাম জানবো।

সহাত্তে সব তথ্য দিলেন। বললেন, প্রবাসে বাঙালী সাংবাদিক দেখে খুব ভাল লাগলো। হাসলাম।

সারনাথের গেটের সামনে কথা বলছিলাম। কয়েক লহমা মাত্র তারপরই এগিয়ে চললাম সেই ভি আই পি সারির সঙ্গে। গভর্নর জেনারেল থামলেন মনুমেন্টটার কাছে। ওকে বলা হল এর ওপরই ছিল প্রখ্যাত অশোক স্তম্ভটি, দুটি টুকরো সময়ে রক্ষিত আছে।

পাশের অলিন্দ দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। বললেন এরকমই একটি অলিন্দ দেখেছি যবদীপে।

তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন। আমি ভাবছিলাম সেই প্রাচীনযুগে ভারতীয় শিল্পীরা কোথায় চলে গিয়ে ছিল ভারত থেকে শাম, ব্রহ্মদেশ, জাপান, চীন, সুমাত্রা বোর্নিও, জাভা। অর্থাৎ যবদীপে। তাই ঐ সব অঞ্চলেও ভারতীয় স্থাপত্য কলার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

কমিশনার নিজে বোঝাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সিংহলের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তার পত্নী, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির।

তারশংকরদা বললেন, কলকাতায় এলে মহাবোধি সোসাইটিতে যাবেন। ওদের আমি গভর্নরবন্ডির সদস্য। বললাম যাব।

ওরা সবাই চলে গেল।

আমিও ফিরে এলাম নিজে ডেরায়।

জীবনশিল্পী মতিলাল

ডাঃ তারাশ্রম সরকার

(৩৪)

প্রমাণ অভাবে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, শ্রীশ ঘোষ, ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেকসুর খালাস হইল। শ্রীশ-চন্দ্র ফিরিল বটে, কিন্তু পুলিশের কড়া পাহারায় তার গতি বিধি একপ্রকার বন্ধ হইল। শ্রীশচন্দ্র রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া মতিলালের নিটক আসিত এবং বিপ্লব কর্মের পরামর্শ করিয়া শেষ রাত্রে বিদায় হইত। শ্রীশবিন্দু পণ্ডিতেরীতে, অথবা মারফৎ তাঁর পত্রাদি মতিলালকে ধারাবাহিক আত্মসমর্পণ যোগের লক্ষ্যে পরিচালিত করিতেন। পণ্ডিতেরী হইতে পত্র আসিলেই

চন্দননগরের বিপ্লবীগণ শ্রীশবিন্দু কি নির্দেশ দিলেন, এই কথা জানিবার জন্য উদগ্রীব হইতেন, কিন্তু চিঠি পড়িয়া তাহাদের মন নৈরাশ্রে ভবিয়া যাইত। যোগের নির্দেশ ভিন্ন অন্য কথা তাহার পক্ষে বড় একটা মিলিত না।

একদা শ্রীশবিন্দু জানাইলেন যে, পণ্ডিতেরীতে রাজ-নৈতিক পলাতকরূপে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বাস করেন। তাহার ভাই পার্শ্বসারথী নাম লইয়া কলিকাতা যাইতেছেন। বড় বাজারের একটি গলির ঠিকনায় তাহার

হিত দেখা করিলে শ্রীঅরবিন্দের বর্তমান অবস্থার কথা সব শুনিতে পাইবেন। মতিলাল পত্রের মর্মানুসরণে কলিকাতায় পার্শ্বসারথির সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে গোয়েন্দা পুলিশ মতিলালের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। মতিলালের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তাহাদের একজন নিয়ত মতিলালের পশ্চাৎ অনুসরণ করিত। একদিন মতিলাল ইহাকে এড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'কিছুতেই' কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। বহুবাজার ফীট ধরিয়া হাওড়া স্টেশনের অভিমুখে মতিলাল প্রতিদিন ফিরিতেন। প্রত্যাগমনের ভান করিলে, সে ব্যক্তি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ঘাড়িত। মতিলাল তাহার অতর্কিতে বহুবাজারের পথ ছাড়িয়া একটি গলির মধ্যে চীনা পল্লীতে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া মতিলাল দেখেন যে সে ব্যক্তি মতিলালকে হারাইয়াছে। মতিলালও নিরাপদে এপথ সেপথ ঘুরিয়া হ্যারিশন রোডে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিছুক্ষণ ফুটপাথের উপর দাঁড়ইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি তাহার খোঁজ না পাইয়া সঙ্গ ছাড়িয়াছে। তখন নিরাপদেই বহুবাজারে নির্দিষ্ট গলিতে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীটি ত্রিতল, নিম্নতল ও দ্বিতলে মাদ্রাজীরা স্ত্রীপুত্র নইয়া বাস করিতেছে। এক ব্যক্তি মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?' মতিলাল চন্দননগরের নাম করায় সেই ব্যক্তি মতিলালকে সঙ্গে নইয়া জিতলের ছাদে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। এই ঘরে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, দাড়িগোফ-কামান এক ভদ্রলোক বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন। আগন্তুক মতিলালের দিকে বিস্ময়িত নয়নে চাহিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনিই কি চন্দননগরের মতিবাবু?'

সেই ব্যক্তির আকৃতি যেমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যপূর্ণ, প্রকৃতিও তেমন মধুময়। তিনি মতিলালকে সঙ্গেই তাহার নিকট বসাইলেন। তাহার সহিত মতিলালের গভীর পরিচয় সংস্থাপিত হইল। শুধু বিপ্লব যুগের কাহিনী এই অজানা লোকটির চরিত্র চিত্রনে সবখানি নহে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও মাদ্রাজ শহরে ভাবিষ্ণুতে তিনি বড় ব্যবসায়ী

হইয়াছিলেন। তাহার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্য তিনি মতিলালের নিকট ব্যক্ত করিলেন। কয়েক জন নেপালী ছাত্রকে বোমা শিক্ষা করাইয়া তাঁহাদের দেশে বিপ্লব সংহতি সৃজনের প্রেরণা তাহার আছে। এই কর্মে মতিলাল তাঁহার কতটা সহায়তা করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পণ্ডিচেরী হইতে এই কাজের জন্যই বাংলায় আসিয়াছেন, হইও মতিলালকে বলিলেন। নেপালে তিনি স্বয়ং যাইবেন। এবং নেপালের মন্ত্রী মহাশয় ভারতের বিপ্লবে কতখানি সহায়তা করিবেন, ইহা জানিয় আবার ফিরিয়া আসিবেন। চন্দননগরের বিপ্লব সংহতি নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, একথাও তিনি মতিলালকে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক নির্দেশেই তিনি ছদ্মবেশে আসিয়াছেন, ছদ্মবেশেই তিনি নেপাল যাত্রা করিবেন।

তারপর তিনি একখানা বিবেকানন্দের পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তকের প্রথম পাতাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার শ্রীঅরবিন্দকে নম্বর দিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন, এই পুস্তকের কত নম্বর পাতায় কত নম্বরের অক্ষর, সেই কথা উল্লেখ করিবেন। যেমন The কথাটি লিখিতে হইলে প্রথম পৃষ্ঠার গোড়া হইতে গননা করিয়া T আছে ৫টি অক্ষরের পর, h ও e আছে ১০ ও ১২ অক্ষরের পর। অতএব The শব্দটি লিখিতে হইলে ৫, ১০, ১২ এইরূপ লিখিবেন। আপনার যাহা কিছু জানিবার, এইরূপ কোড নম্বরে পত্র লিখিলে, শ্রীঅরবিন্দও সেইরূপ কোডেই উত্তর দিবেন। পুস্তকখানা আপনি সঙ্গে রাখুন। শ্রীঅরবিন্দের নিকটও এই পুস্তক আছে। এই কথা আর কাহাকেও জানাইবেন না। এইরূপ নম্বর লেখা পত্র পুলিশের হস্তগত হইলেও, তাহারা ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।

তারপর মতিলালের সহিত তাহার বাংলার বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব সম্ভব দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে, একথাও তিনি মতিলালকে জানাইলেন। সম্ভাব্যবাদের মধ্য দিয়াই ইংরেজ রাষ্ট্র শক্তিকে সর্বপ্রথমে ক্ষুন্ন করিতে হইবে। তারপর দেশী রাজ্যগুলিকে সংহতিবদ্ধভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সুযোগ লওয়াইতে হইবে। এমন অনেক

আলোচনা করিয়া মতিলাল তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। মতিলাল হাওড়া স্টেশনে আসিয়া দেখিল— পুলিশ অনুচরটি গাড়ীর কামরায় কামরায় উঁকি মারিয়া মতিলালকে খুঁজিতেছে। তাহার দুঃখ দেখিয়া মতিলাল হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

চন্দননগরে ফিরিয়া শ্রীশকে মতিলাল সকল কথা জানাইল। পার্থসারথীর অমায়িক ব্যবহারের কথা শুনিয়া শ্রীশ বলিল “শ্রীঅরবিন্দ একজন খাঁটি লোককে কার্যে লাগাইয়াছেন। এই ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে। মণীন্দ্রের মারফৎ শীঘ্রই তাহার সহিত সংযোগ করিতে তৎপর হও। ভারতে বিপ্লবসংগ্রাম রচনার দায়িত্ব চন্দননগরের উপরই বিধাতা হস্ত করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের আসল উদ্দেশ্য ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।” শ্রীশ শ্রীঅরবিন্দকে রাষ্ট্রগুরু হিসাবেই দেখিত। কিন্তু মতিলাল রাষ্ট্র বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দকে গৌণভাবেই অনুসরণ করিতেন। মতিলালের মুখ্য লক্ষ্য ছিল শ্রীঅরবিন্দের সহিত অধ্যায়যোগ। মতিলালও দেখিয়াছিলেন—তার মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা নিঃশেষ হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ যোগের দিকেই মতিলালের চিত্ত সমাহিত করার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

মতিলাল মণীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া পরদিন সন্ধ্যায় পার্থসারথীর নিকট উপস্থিত হইয়া মণীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই সময়ে মণীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এস-সি পড়ার সুযোগ হারাইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রসায়নে এম-এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রাষ্ট্রীয় কারণেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মণীন্দ্রনাথ বহিস্কৃত হয়।

নেপালী ছাত্রদের সহিত মণীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিল। পুলিশের চক্ষে সংশয় সৃষ্টি করিতে পারে—এই আশঙ্কায় পার্থসারথী মণীন্দ্রনাথকে বলিলেন ‘নেপালী ছাত্রের একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই বলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। আপনি সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। ছাত্রটি আপনাকেই গৃহশিক্ষক রূপে বহাল করিবে।’

মণীন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়া বাড়ী ফিরিল। এই নেপালী

ছাত্রটি নেপালের একজন উচ্চরাজপদস্থ কর্মচারীর সন্তান। ছাত্রটি মণীন্দ্রনাথের নিকট হইতে বোমা প্রস্তুতির কৌশল শিখিতে শুরু করিল। মণীন্দ্রনাথ শিক্ষকরূপেই তাহার নিকট যাতায়াত করিত।

এই সময়ে কলিকাতা যাতায়াত মতিলালের প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। সম্ভবতঃ কলিকাতার পথে মতিলাল প্রায় পুলিশের দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পড়িতেন বলিয়া একজনের স্থলে প্রথমে দুইজন অনুসরণকারী নিয়োজিত হইয়াছিল পরে মতিলাল তাহাদেরও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতেছে বুঝিয়া, ক্রমে চারিজন গুপ্তচর মতিলালের সঙ্গী হইল। এই অবস্থায় মতিলালের ঘোরাফেরা এক প্রকার বন্ধ হইল। মতিলাল বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবসার খাতিরে কলিকাতায় যাইতেন। বৈপ্লবিক কর্মের জন্য বাড়ী হইতে অন্য পথে উধাও হইতেন। ক্রমে পুলিশের কড়াকড়ি বাড়িল। অনুসরণ নীতি ছাড়িয়া গোয়েন্দা পুলিশ মতিলালকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিবার নিমিত্ত মতিলালের বাড়ীর কিছুদূরে এক প্রকাণ্ড ফাঁড়ি বসাইয়া দিল।

মতিলালের ইচ্ছা ছিল ভারতের সমস্ত বিপ্লবকে এক-গুলিকে সম্ভব কর। পার্থসারথীর সহিত সংযোগ স্থাপিত হওয়ায়, মাদ্রাজের বিপ্লব রহস্য অবিদিত ছিল না। পরে রাসবিহারীর সহযোগিতায় বোম্বাই ও পাঞ্জাবের সহিত চন্দননগরের বিপ্লব সমিতির সংযোগ হয়। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীরামপুরের সতীশ সেনগুপ্তের সহিত এক সুপুরুষ তরুণ মতিলালের সহিত দেখা করিতে আসে। সতীশ বাবুর মতিলালের সাহিত্র পরিচয় মতিলালের ছাত্র ও শিষ্য অরুণচন্দ্রের বাসায়। অরুণচন্দ্র সেই সময়ে রিপন কলেজে বি এ পড়িত।

তাহাকে মাঝে মাঝে দেখার জন্য মতিলাল তার বাসায় উপস্থিত হইত। সতীশ সেনগুপ্ত তখন কলিকাতা কোন এক স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং আত্মোন্নতি নামে যে বিপ্লব সংহতি মধ্য কলিকাতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার এক প্রকার অধিনায়ক ছিলেন। সতীশ বাবু মতিলালকে তরুণ ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, অনুশীলন সমিতির ইনি একজন সুদক্ষ কর্মী। রডা ডাকাতির ইনি একজন পলাতক

আসামী। সম্প্রতি ইনি কলিকাতা আইস্ ফেক্টরীতে কাজ করেন। আসল নাম অমৃত হাজরা। বর্তমানে বিপ্লবী মণ্ডলে শশাঙ্ক নামে পরিচিত। মতিলাল দেখিলেন, লোকটা মিষ্টভাষী, হাসি তার ঠোঁটে লাগিয়া আছে। মতিলালের সহিত পরিচয় হওয়ায় মতিলাল বুঝিলেন লোকটা বেশ কাজের। ভদ্রলোক আর একদিন আসিবেন বলিয়া সেইদিন সতীশ সেনগুপ্তের সহিত প্রস্থান করিল। মতিলাল শ্রীশচন্দ্রকে এই কথা জানাইলেন।

শশাঙ্ক মতিলালের প্রতি আকৃষ্ট চিত্ত হওয়ায় দুইদিন যাইতে না যাইতেই মতিলালের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিল। মতিলাল বিপ্লব কাজে নিজেকে সংযুক্ত রাখিতে ন বটে, কিন্তু মতিলালের লক্ষ্য ছিল সকলের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও আদর্শ প্রচার করা। ১৯১০ সালে ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিচেরী হইতে প্রেরিত শ্রীঅরবিন্দের টাইপ করা দুইটি প্রবন্ধ সম্প্রতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। একটি Yoga and its Object, অর্থাৎ Yogic Sadhan। এই দুইটি প্রবন্ধই বাংলায় অনুবাদ করিয়া মতিলাল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন—লীলা ও যৌগিক সাধন নামে। শশাঙ্ককে যোগ সম্বন্ধে মতিলাল দীর্ঘ বক্তৃতা

করিলেন। মতিলাল দেখিল তাহার গৌববর্ণ ললাটে অনুরাগের বক্তবর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহার উজ্জল চক্ষুদুইটি বহিয়া অশ্রু বরিতেছে। ধর্মপ্রাণ এই যুবক ক্রমে মতিলালের অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিল। তাহার নির্দেশে মতিলাল অনুশীলন সমিতির প্রধান নায়ক মাখনলাল সেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিল।

মতিলাল শশাঙ্কের নির্দেশে শ্রীশচন্দ্র সহ সীতারাম ঘোষ ফ্রীটে একটি অঙ্ককার ঘরে মাখন সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মাখন সেন ঢাকা বিক্রমপুরের সোনারং স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বৈপ্লবিক ঘটনায় তিনি একপ্রকার গা ঢাকা দিয়া তখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। মাখন বাবুর সহিত মতিলালের বিপ্লবের কথা ব্যতীত অনেক ধর্মতত্ত্বের আলোচনাও হইয়াছিল। মাখন বাবু ছিলেন ধর্মপ্রাণ। ভবিষ্যতে তিনি বেলেড় মঠে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহকারী হইয়া ছিলেন। এই প্রজ্ঞানন্দ স্বামী মানিকতলা বোমার মামলায় আসামী দেবব্রত বসু নামে পরিচিত ছিলেন। (ক্রমশঃ

শরৎচন্দ্র

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

কখনো তোমায় নিয়ে কিছুই লিখিনি
কেন, তা হয়নি স্পষ্ট নিজের কাছেও।
খুব বেশী কাছে কিনা, তাই এতদিনই
ধ্যানের দূরত্বে গিয়ে হওনিকো ধ্যেয়।
ইন্দ্রনাথ থেকে ধর, অন্নদা দিদি ও
রাজলক্ষ্মী, কি অভয়া, কিম্বা দেবদাস
আমরা যে নিজেবাই। কথাগুলো প্রিয়
চাটুবাঁকে সাজাবার পোষাকী অভয়াস

এখানে অপ্রয়োজন। তাই এতদিন
ছাপার হরফে অঙ্কাজ্ঞাপন প্রয়াস
মনে হত যেন জলো, স্তূল, অর্থহীন।
শব্দহীন নিঃশ্বাসের মত অনায়াস
তুমি ও তোমার সৃষ্টি। বুক ভরে তাই
গ্রহণ করেছি নিভা। ছিল যত ঋণ,
কখনো তা ঋণ বলে ভাবা হয় নাই।
আকাশ কি বাতাসের মত অন্তহীন

ভাবে পেয়ে এসেছি যে সর্বস্ব তোমার।

শতবর্ষে ধন্য পেরে করতে স্বীকার।

সজ্জগুরুর স্মৃতিকথা

শ্রীফণিভূষণ সামন্ত

“কোন পার্থিব কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে এখানে আসবে না”, বললেন সজ্জগুরুজী এক ২২শে পৌষের প্রাতরূপাসনার পর সজ্জমন্দিরে উপসনাগৃহের সম্মুখে উন্মুক্ত চত্বারে তক্তাপোষ দিয়ে তৈয়ারী আশীর্বাদ-সভার মঞ্চাসনে বসে, উপস্থিত অন্তরঙ্গ, সহযোগী, সাধারণ ও সজ্জানুরাগীদের উদ্দেশ্য করে। পুনশ্চ বললেন, “আকাজ্জার পূরণ না হলে মনে আসবে বিরাগ, বিতৃষ্ণা, সুতরাং নিষ্কাম চিত্ত নিয়ে আসবে।”

শিউরে উঠলাম। আমি ত মনে-মনে স্থির করেছিলাম আজই বলব আমার মেয়েটিকে বিনাব্যয়ে নারীমন্দির ছাত্রীবাসে রেখে প্রবর্তক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ-দানের কথা। অন্তর্যামী অন্তরের কথা বুঝলেন কি করে? আর বলা হল না, প্রশ্ন করবার আগেই উত্তর পেলাম কি না।

অনেক সময়ে অনেক প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর কাছে প্রশ্ন করবার আগে নানা আলোচনার মাধ্যমে আমার উত্তর পেয়ে গিয়েছি। প্রশ্ন আর প্রকাশ করতে হয় নি।

* * *

“কতটুকু জান তোমরা বিপ্লবের?”

আশ্রমস্থিত রবীন্দ্রহলে রবিবারের প্রাতে অনুষ্ঠিত অন্তরঙ্গ ও উপস্থিত অগ্রাগ্র সজ্জানুরাগী সভ্যদের আলোচনা সভা, নিজস্ব আসনে বসেছেন সজ্জগুরুজী। সাফাঙ্গ প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানিয়ে করযোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অনুরাগী ভবতোষ ঘটক মহাশয়। কি এক আলোচনায় উঠল বিপ্লবের কথা। কে একজন বললেন তাঁর মতের বিপরীত কথা। শুনে সোজা হয়ে বসে মুখ উচু করে দৃষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন সজ্জগুরুজী “কতটুকু জান তোমরা বিপ্লবের?”

নিরোদেশের স্নান পক্ষকেশ উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধধূর্জটির জটার মত। উপস্থিত সকলে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। পাশে যুক্তপাণি হয়ে তাঁকে প্রশমিত করার প্রয়াসে,—“দাদা, থামুন-ওরা কি জানে, আপনি শান্ত হউন।”—কাতর স্বরে বলছেন ভবতোষবাবু।

আমি হতবাক। তাঁর সে মূর্তি দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে আর কোনদিন দেখি নাই।

* * *

“ব্রহ্মচর্যপালন বিধি তোমাদের রক্ষা করতেই হবে।” বললেন সজ্জগুরুজী শ্রীমন্দিরে শনিবারের সাক্ষ্যবাসরে সমাগত সজ্জের অন্তরঙ্গ সভ্যদের উদ্দেশ্য করে। তাঁদের সকলের বয়স তখন চল্লিশ বৎসর থেকে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে।

“সেদিকে আমরা সতত সজাগ আছি।”—বললেন কৃষ্ণচাঁটুয্যোদা।

“সহযোগী সভ্যদের পক্ষে ইহা সাময়িক ও ঐচ্ছিক, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ইহা আজীবন এবং বাধ্যতামূলক”—সজ্জগুরুজী পুনরায় বলতে লাগলেন “আচার আচরিত হবে অন্তরের টানে, তবেই পাবে দেহমনে শক্তি আর আনন্দ।”

* * *

“এবার বিমলা যাক” আনন্দে সম্মতি দিয়ে বললেন সজ্জগুরুজী। “অরুণের সঙ্গে এক-একবারে এক-একজন সজ্জকণ্ঠা সুবিধামত যাবে গুরুভাতাদের বাড়ী। একটু পরিবর্তন পাবে। অধ্যাত্ম যোগসূত্র স্থাপিত হবে।”

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অরুণ দাদামণি খড়গপুরে স্থানীয় এক ক্লাবের সভ্যদের উদ্যোগে গোলবাজার দুর্গামন্দিরে সভা করতে আসেন বিমলাকে (বিমলা ঘোষ বর্তমানে রায়) সঙ্গে নিয়ে।

তদবধি গুরুজীর সেই অলিখিত আদেশ জানিয়ে সাদর আহ্বান জানাই সজ্জ, গুরুভগ্নীদের আমার বাড়ীতে শ্রীগুরু উপাসনামন্দিরে।

* * *

“ভগবন্, তুমি আমায় গাছতলায় দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করছ, কিন্তু যেখানে যাব, তোমার আসন আগে পাতব। তার পাশে দাঁড়াতে আমার আর লজ্জা কি?”

সাক্ষ্য উপাসনার পর প্রণাম নিবেদনান্তে গণ্ডবেয়ে গড়িয়ে পড়ল অক্ষর আর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হল উপোষিত উক্ত কথাগুলি।

“আরে অশ্বিনি, ইনি ত ফণীবাবু আমার বিশেষ পরিচিত, অতি ভাল মানুষ। এঁকে তোমার কোয়াটার ভাড়া দেওয়ার জন্ত আমাকে ডেকে এনেছ কথাবার্তা স্থির করতে?” উপাসনান্তে বাহিরে এসে সম্মুখের দরজায় দাঁড়াতেই আমায় দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পরিচিত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন “আমায় বলল, সামন্তবাবু, আমি ভাবলাম অণ্ড কে সামন্ত, আপনার নাম বললে তবে ত চিনতাম। আমার আসার প্রয়োজনই হত না। আমার আর বসবার প্রয়োজন নাই।” সঙ্গীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, “এঁকে কোয়াটার ভাড়া দিয়ে দাও। যতদিন থাকবেন, থাকতে দিও। কোন চিন্তা নাই।”

আমি হাত-ধরে ঐ পরিচিত ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী অশ্বিনীবাবুকে ঘরে এনে বসলাম। চা বিস্কুট পরিবেশনের পর এক মাসের ভাড়া ৩৫ টাকা এনে অশ্বিনীবাবুর হাতে দিতে গেলাম। তিনি হাত গুটিয়ে বললেন, “আপনার নিকট আর অগ্রিম ভাড়া নিতে পারব না।” জোর করে হাতে নোট চারখানি গুঁজে দিলাম।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার কথা। খড়গপুর থেকে চক্রধরপুর বদলীর পর এগারমাস অতিক্রান্ত এখনও খড়গপুর আমার অধিকৃত রেল কোয়াটার না ছাড়ার জন্ত চার্জ শীটে ও বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি স্থগিতের নোটিশ পেয়েছি। অশ্বিনীবাবুর রেলকোয়াটার ছিল, কিন্তু সাংসারিক কারণে বাড়ী থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতেন। তিন মাস ধরে তাঁর কোয়াটার আমাকে ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাহিরে সুবিধামত ভাড়াবাড়ী বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করতে পারি নি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজনে খড়গপুরে বাসা রাখতেই হবে। ভিন্নপ্রদেশ বিহারের অন্তর্গত চক্রধরপুরে ওদের নেওয়া যাবে না। এইরকম যখন

পরিস্থিতি, তখন অফিস থেকে শেষ নোটিশ দিয়ে জানান হল—নির্দিষ্ট দিনে কোয়াটার না ছাড়লে চাকুরীর চরম ক্ষতি হবে।

ভাড়াবাসার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সেদিন সন্ধ্যা উপাসনার পর শ্রীগুরুর শ্রীচরণে কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর কোয়াটার আমার কোয়াটারেরই অনুরূপ এবং পশ্চাৎদিকে খুব সন্নিকটে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কোয়াটার পেয়ে পরদিনই ধূয়ে মুছে শ্রীগুরুর আসন পেতে সেইদিনই সকলে মিলে কোয়াটার বদলি করে ফেললাম। আমার চাকুরীর কোন ক্ষতি হল না, অধিকন্তু পরিবেশিত সমস্ত পত্রগুলি প্রত্যাশ্রিত হ’ল।

* * *

“চন্দর নগর, চন্দর নগর”, চমকে উঠলাম কুলির ডাকে। সিট ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়েও গেলাম কয়েক পা।

“নামবেন নাকি?” সহযাত্রীর প্রশ্নে ফিরে এসে বসতে বসতে বললাম, “না, কিন্তু মনটা”—১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই কি আগস্ট মাসে নবদ্বীপধাম হইতে হাওড়া ফিরছিলাম।

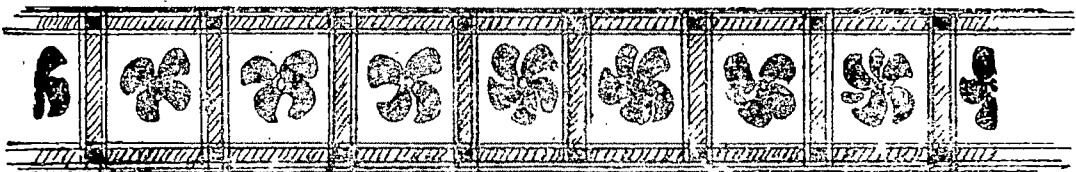
“তোমার চন্দননগরে নামা স্থিরীকৃত ছিল।” বললেন সজ্জগুরুজী। “তবে সময় তখনও হয় নাই, তাই সেদিন নামি নাই।”

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী দীক্ষার পূর্বাঙ্ক শ্রীগুরুর সহিত একান্ত আলাপে সব শুনে তিনি বললেন।

মন্ত্রদাতা পিতৃভূমি হবে এই চন্দননগর, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কি সেই কথা ভেবেছিলাম? অবচেতন মনে কি জেগেছিল সেদিন সে কথা?

একবার নহে, অনেকবার আসতে হবে চন্দননগর।

* * *



সজ্জ-সংবাদ

আশ্রমী

শ্রীশ্রীসজ্জননীর তিরোভাবোৎসব

বিগত ২২-এ অগ্রহায়ণ ১৩৮২ সাল, (ইং ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫) সোমবার চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে অধ্যাপক-ভাবযোগে ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তপঃপূতা সজ্জননীর শ্রীশ্রীরাধারানী দেবীর ৪৭তম তিরোভাব দিবস উদ্‌যাপিত হ'ল। তপস্বিনী জননীর স্মরণোৎসব কায়িক, বাচিক ও মানসিক—ত্রিবিধ তপস্যার মধ্যদিয়াই সুসম্পন্ন হল। সজ্জের কেন্দ্রতীর্থে এই উপলক্ষ্যে পূর্বদিন ২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার সন্ধ্যায় অধিবাস। আশ্রমের যুগল-মন্দির সংলগ্ন নাট্যমন্দিরে সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা। সজ্জের সর্ব শ্রেণীর সভ্য-সভ্যা ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী ও ভক্তগণ ইহাতে যোগদান করেন। উপাসনার প্রারম্ভে ও পরে সজ্জসভ্যা নির্মলা ঘোষের পরিচালনায় প্রতিবেশী অনুরাগী ও ভক্ত কণ্ঠাগণসহ মাতৃসঙ্গীত ও দেবীস্তুতি গীত হওয়ার পর দশ মিনিট নীরব ধ্যান। তৎপরে সহ-সভাপতি শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃবন্দনা। পরিশেষে নির্মলা ঘোষেরই তত্ত্বাবধানে উক্তকণ্ঠাগণ সহ “মাতৃকীর্তন”। এই কীর্তনের যত্নসঙ্গীতে ও সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেন আমাদেরই প্রতিবেশী পরমস্নেহাস্পদ সন্তানরা।

পরদিন, মহালয়ার দিন। ৪৭ বৎসর (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) পূর্বে এই মহাদিনেই তপস্বিনী মহামাতার ইচ্ছাক্রমে পতিদেহতার নির্দেশে তাঁরই হৃদয়ে মহাযোগে, মহাসমাধি। ইহা কথা নয়, কাহিনী নয়; প্রত্যক্ষ সত্য। আত্মসমর্পণ যোগসিদ্ধা, জননী সংঘ-মাতার মানস-পুত্র-কণ্ঠাগণের সাধা-সাধন ইহাই। এই সাধনারই সিদ্ধমূর্তি সজ্জ। সজ্জ তাই সাধ্য নয়, প্রাপ্ত বস্তু। এই প্রাপ্তি বোধের চেতনায় তন্ময় থাকা সারাদিন, ভোর ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

অগ্রহায়ণের তীর্থ হিমেল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে প্রভাতী উপাসনায় ভোর ৫ টায় সকলে আশ্রমে সমবেত হন। সেই থেকেই শুরু হয় একটানা উৎসব প্রবাহ তথা তপস্যার অনুষ্ঠান। উপাসনার পূর্বে ভজন-সঙ্গীত, সজ্জগুরুদেবের বাণী পাঠ। বাণীটি পাঠ করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। উপাসনার পরে সজ্জজননীরই মর্মসূত্র ধরে সজ্জসভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের ভাষণ। তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম কথা—“(১) শ্রীগুরু প্রদত্ত চাতুর্যাস্ত-ব্রতের পরিসমাপ্ত হ'ল রাস পূর্ণিমা। অতঃপর এই ২২শে অগ্রহায়ণ থেকে ২৭ শে চৈত্র শ্রীশ্রী সজ্জগুরুদেবের মহাসমাধির দিন পর্যন্ত আমরা পুনরায় নব-চাতুর্যাস্ত-ব্রত গ্রহণ করব। শ্রীগুরুতে আত্ম-

সমর্পণের সিদ্ধ-প্রকাশ। (২) যে অভিশপ্ত প্রকৃতির প্রভাব সজ্জের দিব্যরূপ স্বচ্ছরূপ প্রকাশকে ব্যাহত করছে, সেই অভিশপ্ত প্রকৃতির প্রভাব থেকে চার-মাসের কঠোর তপস্যায়, আমরা মুক্ত হবই হব।”

অতঃপরঃ সজ্জ সভ্যাগণ কর্তৃক সমগ্র গীতা, সজ্জ সভ্যাগণ কর্তৃক সমগ্র চণ্ডী পাঠ করা হয়। তারপর সজ্জের প্রতিভূরূপে সজ্জ-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী শ্রীশ্রীসজ্জ-জননীর ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগারতি সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্ন উপাসনার পর থেকে একদিকে শুরু হয় “ওঁ সচ্চিদানন্দময়ী মা” এই মহামাতৃমন্ত্র জপ, অপর দিকে প্রজ্জ্বলিত হয় ঐ মাতৃনামেই হোমাগ্নি। অবিরাম আহুতি চলে একটির পর একটি সম্মত-বিস্মপত্রে “ওঁ হ্রীং শ্রীং সজ্জমাতৃকায়ৈ রাধারানী দেবৌ স্বাহা”—মন্ত্রে। একদিকে জপ যজ্ঞ, অপর দিকে হোম-যজ্ঞ—এ এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ। অনুভূতিসম্পন্ন সাধক-সাধিকা মন্ত্রেরই অন্তঃকরণ, উৎসর্গের আকৃতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণ করে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয়, অতঃপর সজ্জ সভাপতি নিম্নলিখিত তাঁর বাণীটি পাঠ করেন :

সজ্জজনী—সজ্জমাতৃকা-আমাদের মা, ওঁ হ্রীং শ্রীং সজ্জ-মাতৃকায়ৈ রাধারানী দেবৌ স্বাহা

আমাদের জপ—আমাদের পূজা—আমাদের হোম—আমাদের সম্মুখের ঐ জ্বলন্ত হোমকুণ্ডে প্রত্যেকটি আহুতির নিবেদন আজ একটি মাত্র মহাসকল্লের বীজে—সে বীজআমূল আত্মশুদ্ধি প্রতি জন অন্তরঙ্গ সভ্য ও সভ্যা, সজ্জগুরু দীক্ষিত, চিহ্নিত প্রত্যেকটি নর ও নারীর মূলধার হইতে আজ্ঞাচক্রে—আধার যন্ত্রের প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, কারণে যত গত জীবনের, জন্ম-জন্মান্তরের গোপন পাপাঙ্কুর লুক্কায়িত জৈবিক সংস্কার অধিনিহিত আছে—সবটুকু একান্ত আগ্রহে, মহাদেবী স্বরূপিনীর প্রদীপিত লেলিহান হোমাগ্নি শিখায় আজ আহুতি দিয়াছি—এই জীবন্ত হবন, মাগো, তুমিই আমাদের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা দিয়াছ—পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছ সমুদয় পাপাঙ্কুরকে আমূল ভগ্নীভূত করিয়াছ—নির্মূল করিয়াছ।

এই বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্ত, এই যজ্ঞসিদ্ধিই আজ আমাদের মর্মে-মর্মে অধিগত হউক—আমাদের চেতনার প্রতিটি বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হউক—আমাদের উর্দ্ধস্থ অখণ্ড চিদাকাশে, আমাদের সকল অন্তরঙ্গের অন্তঃস্থ চিত্তাকাশে আমাদের চতুরঙ্গ জ্ঞানাকাশে আমাদের অন্তরীক্ষচারী

পঞ্চ প্রাণাকাশে, এমন কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্ত রক্তমাংসের শরীরের প্রতিটি-শিরায়-উপশিরায় অনুসৃত হউক—প্রবাহিত হউক—উদ্বেলিত করুক অভিযুক্ত করুক আমাদের প্রত্যেকেরই আপন-আপন সর্ব্বাঙ্গ।

এই যজ্ঞানলের অগ্নিস্নানে আজ প্রবর্তক সজ্জজীবন পবিত্র হইল, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, নিষ্কলক হইল—প্রবর্তক সজ্জ অন্তরে-বাহিরে আজ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইল।

এই-বিশুদ্ধ, পবিত্র, জ্যোতির্ময় সজ্জই আজ সত্য-সত্যই যোগেশ্বর গুরুদত্ত ‘প্রবর্তক’—নামের যথার্থ, যোগ্য অধিকারী হইল।

যোগশক্তি যাঁর প্রাপ্য, সেই যোগারূঢ় প্রকৃত দীক্ষিত—আর যোগশক্তি যিনি প্রাপ্ত, তিনিই তো যোগী বা যোগিনী—এমন যোগী বা যোগিনী যোগেশ্বরের ও যোগেশ্বরী, শ্রীশ্রী সজ্জগুরু ও শ্রীশ্রী সজ্জমাতৃকার সত্য অন্তরঙ্গ।

আজ খাঁটি, শুদ্ধ, সিদ্ধ অন্তরঙ্গ-জীবন সজ্জতীর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

আজ তাই সজ্জের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে ইহা এক বিশিষ্ট দিন, চিরস্মরণীয় পুণ্যতিথি।

এই পবিত্র মহাদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ পাপমুক্ত, জৈবিক সংস্কার মুক্ত, অন্তর ও বাহিরের সকল ব্যাধিমুক্ত—এক কথায় শ্রীশ্রীগুরু রূপায় ও শ্রীশ্রী মাতৃশক্তির অনু-কম্পায়, অনন্ত করুণায় আমরা অভিশপ্ত প্রকৃতির আচ্ছন্নতা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়াছি—আর বিশ্বজগতের কাছে সেই সত্য সিদ্ধান্তই দৃষ্ট উদাত্ত কর্তে ঘোষণা করিতে পারিব।

যদি কখনও অভিশাপের শক্তি জৈবিক প্রকৃতির অব-চেতনার গর্ভ হইতে মাথা তোলার চেষ্টা করে, সে দুষ্টি অপশক্তিকে এই মাতৃমন্ত্রেরই পরমাশক্তি আশ্রয় করিয়া, আবাহন করিয়া, বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার তুলিয়া সে পাপকে বিভাড়ন করিব—বিদায় দিব পাপকেই—পাপীকে হয় পাপমুক্ত করিব নয় তাকে সজ্জতীর্থে হইতে অধিকারচ্যুত করিয়া দূরে অবর-জন্মজন্মান্তরের তপস্যায় আত্মশোধন করার জন্য বিসর্জন দিব।

আজি ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে আগামী ২২শে পৌষ—এই এক মাস কাল আমাদের তপস্যা হইবে—দৃষ্টি-জ্ঞতি-স্মৃতি ও প্রতিবোধ এই চতুরঙ্গ জ্ঞান সাধনার।

দ্বিতীয় মাস—মাঘ মাস হইবে ত্রিকাল দৃষ্টির তপস্যা কাল।

তৃতীয় মাস—ফাল্গুন হইবে আমাদের অষ্টসিদ্ধির সাধনা কাল।

আর চতুর্থ মাস চৈত্র হইবে আমাদের কারণ, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ সমাধির উপলব্ধি কাল।

এই নূতন চাতুর্মাস্যের সাধন-সূচী—যাহার ইঙ্গিত আজিকার পঠিত সজ্জগুরুর ২৯ বছর আগেকার এই ২২শে অগ্রহায়ণেরই প্রভাতবাণীতে পাইয়া আমার উপলব্ধির ভাষায় ব্যক্ত করার আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বিজ্ঞানময় কোষের পরিভাষাটুকু মাত্র প্রকাশ করিলাম।

আজ আমরা শ্রীশ্রী সজ্জমাতারই—আমাদের মায়েরই পরম আশীর্বাদ পাইয়া ধ্যত হইলাম—কৃতার্থ হইলাম।

যজ্ঞান্ত-বাণী পাঠান্তে স্বামীশ্রদ্ধানন্দজী সকলের ললাটে যজ্ঞসীকা পরিয়ে দেন। তারপর সমবেত কর্তে উপাসনার পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণ। উপাসনান্তে ‘প্রসন্ন অন্তঃকরণে মাতৃপ্রসাদ নবান্ন গ্রহণ করে’ উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করা হয়। সারা দিনের কঠোর তপস্যার এইখানেই পরিসমাপ্তি।

অগ্ন্যুপাশা কেন্দ্রেও মাতৃ অনুষ্ঠান দিবসটি স্ব-স্ব ক্ষেত্রানুযায়ী পালিত হয়। হাওড়া জেলার দফরপুর প্রবর্তক আশ্রমে এবং ২৩ পরগণা সুন্দরবনের ফ্রেজার গঞ্জ, নবদ্বারাকপুর প্রবর্তক আশ্রমে ইহা স্ব-নিষ্ঠায়, পালিত হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই সভ্য-সভ্যাগণ উপবাস-ব্রত পালন, সাধ্যমত স্বাধ্যায়, মাতৃমন্ত্র জপ, মাতৃজীবনী আলোচনা ও সমবেত-উপাসনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানদিবসটি প্রতিপালন করেন।

কাঁকিনাড়া—(২৪ পঃ) কাঁকিনাড়ার সকল দীক্ষিত সভ্য-সভ্যাগণ সারাদিন উপবাসী থেকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁরা শ্রীপ্রভাতকুমার মজুমদারের গৃহে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত হন। প্রভাতী উপাসনার মধ্যদিয়েই উৎসব সূচনা—ভক্তিমূলক সঙ্গীত, গুরুবন্দনা মাতৃস্তুতি ও ১০৮ বার মাতৃনাম জপ। সন্ধ্যায় পুনরায় সকলে সমবেত হন। সন্ধ্যাউপাসনা অনুরূপ ভাবে সম্পন্ন হলে পর শ্রীপ্রভাতকুমার মজুমদার মাতৃস্থান আলোচনা করেন। পূর্ণ-প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর রমারাগী মজুমদার সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করেন। সেই প্রসাদ গ্রহণ করেই সকলে উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করেন।

বাংকুল্লা—(নদীয়া জেলা)। বাংকুল্লাতেও অনুরূপ ভাবে অনুষ্ঠান দিবস পালিত হয় শ্রীরমেননাথ দাসের গৃহে। সেখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানীয় দীক্ষিত সভ্য-সভ্যাগণ ভিন্ন, নূতন দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুক ও ঐ দিন রমেন দাসের গৃহে সমবেত হয়ে দিবসব্যাপী উপবাস ও জপযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় উপাসনান্তে নিভারাগী দাস মাতৃজীবনী আলোচনা করেন। পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর প্রসাদগ্রহণান্তে সকলে উপবাস-ভঙ্গ করেন।



শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের আবির্ভাবোৎসব :

আগামী ২২-এ পৌষ ১৩৮২ সাল, ইং ৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৬, বুধবার, চন্দননগর প্রবর্তক আগ্রমে পরমারাধ্য সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের চতুর্নব্বিতম আবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে নয় দিবস-ব্যাপী সমবেত উপাসনা, শ্রীগুরুপূজা, হোম, দীক্ষাবজ্জ, শ্রীশ্রীসজ্জগুরুজীর জীবন, দর্শন ও সাহিত্য-আলোচনা, কথকতা, কীর্তন, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি নিম্নের স্থাী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

১১ই জানুয়ারী, রবিবার (২৬-এ পৌষ) সভাপতি-বেশনে পৌরোহিত্যে করিবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়ের এ্যাসিষ্টেন্ট রেজিষ্টার শ্রীবিমলকান্তি মৈত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিবেন দেশপ্রেমিক জ্বলন্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য মহোদয়।

এই শুভ উৎসবে সর্ব সাধারণ যোগদান করিয়া আমাদের পুণ্যযজ্ঞ সুসিদ্ধ করিতে সহায়তা করুন—ইহাই বিনিত নিবেদন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (সম্পাদক) হুগলী চুচুড়ায় “বন্দেমাতরম্” দ্বিতবার্ষিকী উদ্বোধন সভা :

হুগলী-চুচুড়া সাংস্কৃতিক সজ্জ-সংহতির উদ্যোগে গত ২৬শে অক্টোবর ডাফ হাই স্কুল হলে “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র ও সঙ্গীতের শতবার্ষিকী উৎসব বর্ষব্যাপী পালন সঙ্কল্পে উদ্বোধনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে প্রবর্তক সজ্জের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও স্থপরিচিত মনীষী শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী।

প্রারম্ভে সংহতির সভাপতি শ্রীশিবরাম ধর অতিথি-গণকে স্বাগত জ্ঞাপন করিলে পর, সাধারণ সম্পাদক শ্রী.গারাচাঁদ আচা “বন্দেমাতরম্” মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ সালে মন্ত্র ও সঙ্গীতের প্রথম প্রকাশ করেন চুচুড়াতেই, এই তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বলেন—ইহার শত বার্ষিকী উৎসব যোগ্য ভাবে সম্পন্ন করার সঙ্কল্প নিবেদন করেন। দেশ প্রেম, জাতীয়তাই সার্থক উৎস—এই মহামন্ত্রের প্রভাব ও দৈবীশক্তি জাতির জীবনকে কি ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল, ঐতিহাসিক ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রধান অতিথি শ্রীবাগচী তাহার চমৎকার লিখিত বিবরণ পরিবেশন করেন।

সভাপতি শ্রীদত্ত বলেন—স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের এখনও শেষ হয় নাই পুনরায় “বন্দেমাতরম্” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, জাতির অন্তর্জীবনে ও বহির্জীবনে আমূল ঐপ্রবিক পরিবর্তন সিদ্ধ করিয়া আমাদেরকে অশুভ মহাভারতই গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিনি অনু-প্রেরণাময় কণ্ঠে আরও বলেন ‘আমার বিশ্বাস—আগামী ৫৭ বৎসরের মধ্যে যে বিরাট বিপ্লবের তরঙ্গ সারা দেশকে পরিপ্লাবিত করিবে, এই “বন্দেমাতরম্” শতবার্ষিকী তারই প্রস্তুতির সূচনা।

অবল্য দেশকামী শ্রীসিরাজুল হক সভাপতির আস্থানে উঠিয়া বলেন—এই ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রে উদ্ভুদ্ধ হইয়াই আমি কিশোর বয়সে দেশসেবার কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি ও বিদেশী শাসকদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়াও এই ধ্বনি ত্যাগ করিতে পারি নাই।’

সভারম্ভে স্থানীয় শিল্পী সুকণ্ঠ শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাশেষেও তিনি কয়েকটি দেশমূলক গীত গান করেন এবং শ্রীসিরাজুল হকের কণ্ঠেও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের কয়েক ছত্র শুনিয়া সভাপতি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রীরবি কর

প্রবর্তক পারিশার্গ, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠিচন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত।





પ્રીતિઓળ: શ્રીમણિલાલરાય

૦૪ ૭૦, માર્ચ ૨૦

આનંદ ઉપસાર
કે. શાહર

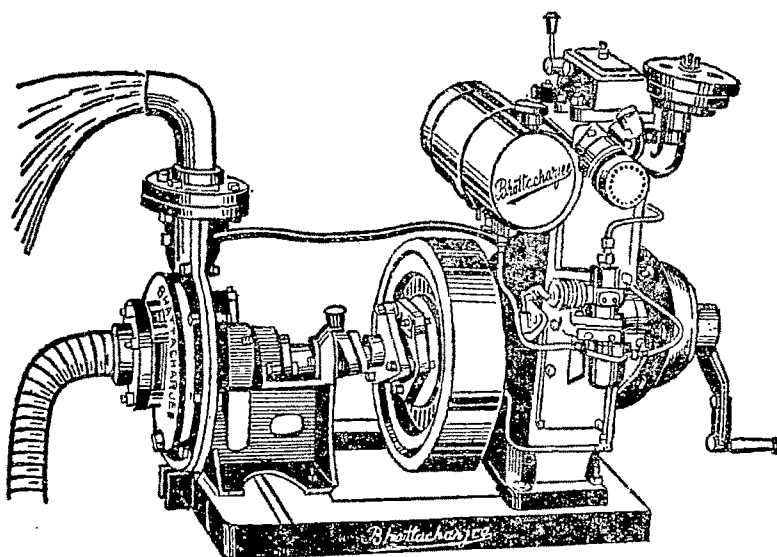
અમરિન આલોચી

ક. શાહર & કો. • અમરિન આલોચી

ভারত সরকারের কাশিখাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অগাঢ় সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ (স. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্
সন, হেপোলাইট; ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিষ্টন, ট্রান্স্কো,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, ষ্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুম : ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

হাসি : ৪৭-২৯১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	... 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES

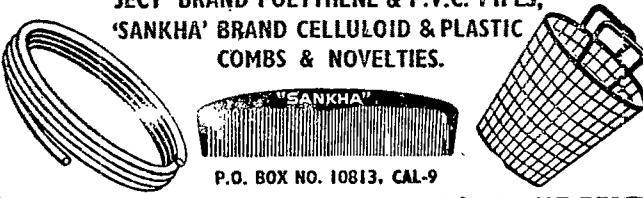


GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4832

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

D. RATAN & Co.

Photographers PHOTO

22-1, CORNWALLIS ST. CALCUTTA

PHONE : 54-3711

ডিব্রতন কোর্স

কটোয়া হার্স

ই.সি. কণ্ঠ্যাবিস্তারীট, কলিকতা

ফোন : ৩৬-০৭১১

বাংলাসাহিত্যের উপন্যাস ভাণ্ডারে অভিনব সংযোজন

হাসি চৌধুরীর—মনীষা—৮০০

ডিমাই সাইজ, মনোরম প্রচ্ছদপট, সুন্দর ছাপা,
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, উপহার উপযোগী

প্রাপ্তিস্থান : ৩৫।১ ডায়মণ্ড হারবার রোড,
কলিকাতা—২৭

সাহিত্য প্রকাশ : রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভগবান

শ্রীসত্য সাই বাবা

কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বর্তমান কালে বিশ্বের আকর্ষণ কেন্দ্র, সবচেয়ে
অলৌকিক শক্তিশালী ঈশ্বরমানব সত্য সাই
বাবা—ভগবান স্বয়ম। বাংলা ভাষায় সত্য
সাই বাবার সম্বন্ধে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

দক্ষিণা — দেড় টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিফ : দশনসংস্কার চূর্ণ :
সারিবাটারিফ : অশোকারিফ : ব্রাহ্মী ঘৃত (হাত্রবন্ধু) : মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : মাঘ ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	৩৮৫
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	৩৮৬
আমাদের ক্ষিতীশচন্দ্র	সম্পাদকীয়	শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত	৩৮৭
কৈফিয়ত	প্রবন্ধ	ডাঃ বিশ্বনাথ রায়	৩৯০
তান্ত্রয়ুগেই বর্তমান সভ্যতার পত্তন	প্রবন্ধ	শ্রীসন্তোষকুমার দে	৩৯৪
আলো চাই, আলো	কবিতা	শান্তশীল দাশ	৩৯৮
বসুমতী	বড়গল্প	অজিত দাস	৩৯৯
অর্চনা	কবিতা	হেমবরুণী মুখোপাধ্যায়	৪০৪
মুক্তিভীর্ণ	গল্প	শান্তনু দে সরকার	৪০৫
প্রার্থনা	কবিতা	মহর্ষি প্রেমানন্দ	৪০৯
বিপ্লববশেষে ঋতুক কানাইলাল	আলেখ্য	কিরনেন্দু বাগচী	৪১০
সজ্জসংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	৪১৪
সেই লেখনী আজ স্তব্ধ	...	রবি কর	৪১৫
সাময়িকী			৪১৬

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে
অগ্নিধূগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক
হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা।
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়।
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ
তার জন্য দায়ী নহে। কপি রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—
সম্পাদকের নহে।

এজেলি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেলি দেওয়া
হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য।
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে
পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ

গীতায় ভগবান ৫.০০

(গীতার যৌগিক জীবনভাষ্য)

মহর্ষি প্রেমানন্দজী প্রণীত

গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গুহ্যতিগুহ্য
রাজযোগের নিগূঢ় মর্মটি এই গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তত্পার
সহজ শ্রাণায়াম মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে
মানসোত্তর লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত
ব্যাখ্যাত।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত

রোগ ও আরোগ্য—৪.০০

যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব—১.০০

স্বধীরকুমার দত্তের সর্বজন সমাদৃত বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর
অপরিহার্য গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাধনা—৪.০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১বি, বি, গাজুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯২

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেন্ট ঔষধ

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রের প্রচুর আমদানী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাট্টিং, স্টিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্রশিল্পে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ POLISHING & BUFFING

DOUBLE ENDED-GRINDER
FLEXIBLE SHAFT GRINDER

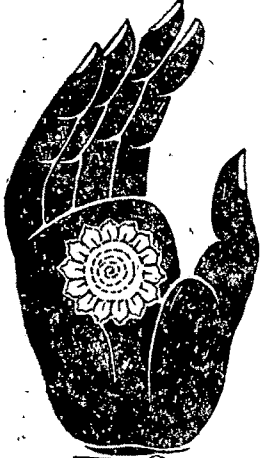
MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332



বহুজন দ্বিতীয়

৬০তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

মাঘ : ১৩৮২

জাহ্নারী-ফেব্রুয়ারী : ১৯৭৫-৭৬

প্রবর্তক

জীবনের আলো

তুমি আর সে—জীব আর ভগবান—মাঝে কিছু নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে—ইহাই যুক্তির কথা। যোগের আশ্রয় ভক্তি। ভক্তি দুই প্রকার। মিশ্রা ও অমিশ্রা, মুখ্য আর গোণ। গোণ বেদাশ্রয়। মুখ্য প্রেমাশ্রয়। প্রথম সাধন—আনুগত্য। আচার—সেবা। রোগের শুক্রষা, দরিদ্রকে দান—এ সেবা গোণ। মুখ্য-সেবা—জাতিকে ঐশ্বর্যে, জ্ঞানে বড় করা। ইহার কৌশল—শিক্ষা আর অর্থ-সাধনা।

আনুগত্যে, সেবায় অন্তর শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই দীক্ষার বীর্ষ লাভ হয়। যার অনুগত, তিনি নেতা। দীক্ষাদাতা গুরু। গুরু-বিগ্রহ একাক্ষ আশ্রয়। ভগবান বিরাট—তার বহু ভাব, বহু অঙ্গ। শক্তির অনুরূপ সাধনাক্ষ। যে একাক্ষ সাধে, তার বহু অঙ্গও যথাকালে সিদ্ধ হয় ভক্তিরসের অতিশয্যে।

ভক্তিই রাগোৎপত্তির হেতু। রাগ পঞ্চবিধ। যেখানে ভক্তি সেখানে রাগ। সংহতি-সৃষ্টি রাগের প্রথম লক্ষণ। সাধু-সংহতিই ভক্ত-সজ্জ। এখানে অনৈক্য নাই, বিদ্বেষ নাই। দীক্ষিত জীবন-সমষ্টির স্বতঃপ্রকাশ প্রেম ও ঐক্যের ক্ষেত্র।

রাগের দ্বিতীয় লক্ষণ—ভজন। মানুষ সবার উপর—পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বে যার প্রীতি, তার ভোগ ভাগ অনিবার্য। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরমানন্দ ইচ্ছামূর্ত্তির দর্শনে, স্পর্শনে, বাণীশ্রবণে, ইচ্ছাসেবায়, অমৃত স্মৃতি, অমৃত সংস্কার তত্ত্বকে ভুলাইয়া দেয়। সর্বার্থসিদ্ধি তাই লক্ষ্যযোগে। ইহাই পরম পুরুষার্থ। অনর্থ নিরুত্তি ইহার অমৃত নাম। রাগের ইহা তৃতীয় লক্ষণ।

গুরুতীর্থে বাস চতুর্থ। প্রীতি যার চিত্তে ঘনিষ্মায় ভরিয়া উঠে, তার তত্ত্বের তীর্থে সতত নিবাস। গুরু-ধামই তার ইচ্ছাধাম। পরম ইচ্ছাধাম প্রাপ্তির কথাই এই ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়। ভক্তি-নিষ্ঠার অটল ভিত্তির উপর সাধকের প্রতিষ্ঠা এই অবস্থায়।

পঞ্চমাক্ষ সাধন—শ্রীমূর্ত্তির ধ্যানে, শ্রদ্ধা, বীর্ষ, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার উদয়। ইহাই পরিপূর্ণ নবজন্ম। আদর্শের মোহে সে মানুষ আর প্রসূদ্ধ নয়, নবরতির উদয়ে তার হৃদয় পরিতৃপ্ত। এই রতির উদয়েই নব যুগ-ধর্মে রুচির আশ্রয়ে আসক্তি গাঢ় হয়। যাহা ছিল ভাব, তাহা হয় রস-বস্তু। জীবন হয় ভাবসিদ্ধ অর্থাৎ রসধন প্রেম-বিগ্রহ। সেই পরম সিদ্ধকেই চাহেন শ্রীভগবান।

অসংখ্য কর্মের মাঝে বিচার কর সাধু যে জ্ঞান বিজ্ঞান—পরম সাধন তোমার সঙ্গী কিনা। বিচিত্র সাধনায় সাধন-বিগ্রহ রচনায় নবযুগের প্রবর্তক হও। অন্তরঙ্গ সাধনরঙ্গে সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি যদি গড়িয়া উঠে, যে নব-তীর্থ-মন্দিরের গগণচুম্বী চূড়া সন্দর্শন করিতে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। এই নতুন ধামের তাহারাই হইবে অধিবাসী।

—সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল

(১৩৪৭ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবর্তক হইতে)

বেদমন্ত্র

প্রথমোহ্যিকঃ ॥ চতুর্থোহ্যায়ঃ ॥ চতুর্দশং সূক্তং ॥ তৃতীয়া-চতুর্থী ও পঞ্চমী ঋক্
(মণ্ডলস্য ষষ্ঠীতমং সূক্তং)

তং নবাসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎসুকীর্তির্মধুজিহ্বমশ্রাঃ ।

যম্বজিহো বৃজনে মানুযাসঃ প্রয়স্বন্ত আয়বো জীজনন্ত ॥ ৩

উশিক্ পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো হোতাধায়ি বিক্ষু ।

দমুনা গৃহপতির্দম আ অগ্নিভূ বদ্রয়িপতি রয়ীণাম্ ॥ ৪

তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্রশংসামো মতিভির্গোতমাসঃ ।

আশুং ন বাজন্তরং মর্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাং ॥ ৫

অন্থ—নবাসী সুকীর্তি অস্মৎ হৃদঃ জায়মানং মধুজিহ্বং তং আ অশ্রাঃ । বৃজনে আয়বো মানুযাসঃ ঋজিহ্বঃ প্রয়স্বন্ত যং জীজনন্ত ॥ ৩

উশিক্ পাবকঃ বসুঃ বরেণ্যঃ হোতা বিক্ষু মানুযেষু আধায়ি । অগ্নিঃ দমুনা গৃহপতিঃ দমে রয়ীণাম্ রয়িপতিঃ আ-ভুবৎ ॥ ৪

হে অগ্নে বয়ং গোতমাসঃ তং রয়ীণাং পতিং, ত্বা (ত্বাং) মতিভিঃ প্রশংসামঃ । আশুং ন বাজন্তরং মর্জয়ন্তঃ ধিয়াবসুঃ প্রাতঃ মক্ষু জগম্যাং ॥ ৫

ব্যাখ্যা—নবাসী (নবতর) সুকীর্তি (শোভন স্তুতি) অস্মৎ হৃদঃ (আমাদের হৃদয়জাত । হৃদঃ অর্থাৎ প্রাণ ইহাতে) জায়মানং (উৎপদ্যমান । আচার্য সায়ন বলেন—অগ্নির্হি বায়োরূপদ্যভে বায়ুশ্চ প্রাণ এব । যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ ইতি আত্মানাং—অগ্নিই বায়ুর উৎপাদনকারী এবং বায়ুই প্রাণ । যেই প্রাণ, সেই বায়ু—(এইরূপ প্রখ্যাত আছে ।) মধুজিহ্বং (উন্মাদক জালা বা শিখা সমন্বিত) তং (অগ্নি) আঅশ্রাঃ (আভিমুখে ব্যাপ্ত হউক) বৃজনে (সংগ্রামে) আয়বঃ (দৃঢ়চেতা) মানুযাসঃ (মনুর সন্তানগণ) ঋজিহ্বঃ (ঋজিকগণ) প্রয়স্বন্তঃ (হবির্লক্ষণ অন্বিশিষ্ট) যং (যাকে—অগ্নিকে) জীজনন্ত (যজ্ঞার্থে উৎপাদন করেন) ॥ ৩

উশিক্ (কামনার পাত্র) পাবকঃ (পবিত্রকারক) বসুঃ (নিবাসহেতু, আশ্রয়দাতা) বরেণ্যঃ (বরণীয়) হোতা (আহ্বাতা এখানে যয়ং অগ্নি) বিক্ষু (যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট) মানুযেষু (যজ্ঞমানগণের মধ্যে) আধায়ি (স্থাপিত হন) অগ্নিঃ (সেই অগ্নি) দমুনা (শত্রু দমনে কৃতসম্বল হইয়া) গৃহপতিঃ (গৃহের পালয়িতা হইয়া) দমে (যজ্ঞগৃহে) রয়ীণাং রয়িপতিঃ (ধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ধন, সেই ধনের অধিপতি হইয়া) আ-ভুবৎ (অবস্থান করুন) ॥ ৪

অগ্নে বয়ং গোতমাসঃ (হে অগ্নিদেব ! আমরা গোতমগোত্রীয় । আচার্য সায়ন বলেন—নোদাধি এই মন্ত্রের উল্গাতা, তিনি গোতম গোত্রীয় । নিজের সম্পর্কে মন্ত্রে একবচন হওয়াই যুক্তিস্থল । কিন্তু এখানে পূজা অর্থে “বয়ং গোতমাসঃ”—এই বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন ।) তং রয়ীণাংপতিং (আপনি ধনসমূহের পতি অর্থাৎ রক্ষয়িতা) ত্বা (ত্বাং-আপনাকে) মতিভিঃ (মননীয় স্তুতির দ্বারা) প্রশংসামঃ (প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিব) অশুং ন (অশ্বের হায়া) বাজন্তরং (বাজ অগ্নির ইহা বৈদিক সংজ্ঞা—যজ্ঞগৃহ) মর্জয়ন্তঃ (মার্জি, করা) ধিয়াবসুঃ (কর্মের বা বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত সেই অগ্নি) প্রাতঃ (প্রাতকালে) মক্ষু (শীঘ্র) জগম্যাং (আগমন করুন) ॥ ৫

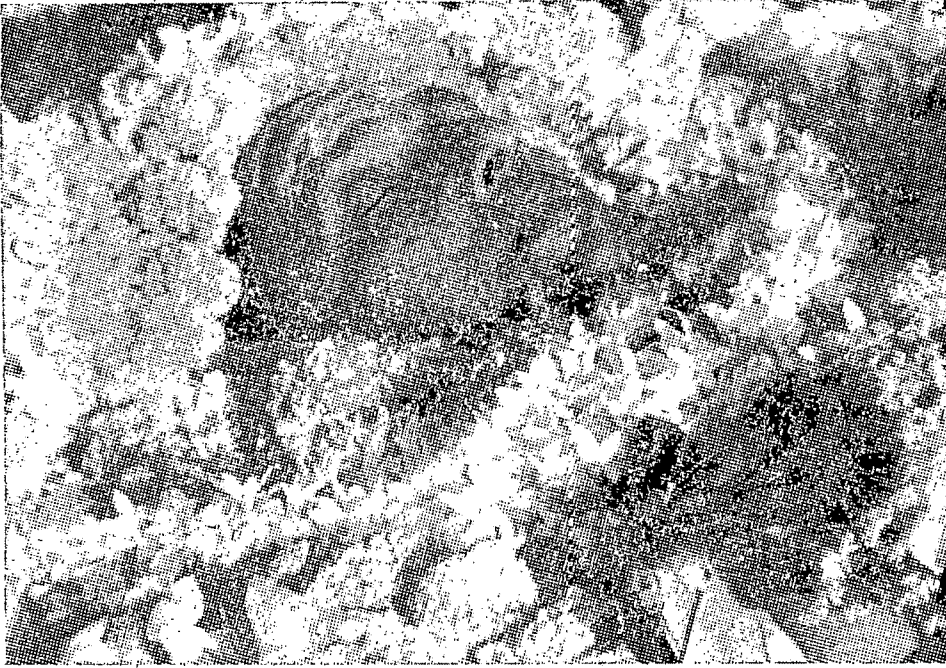
সরলার্থ—নবতর শোভন স্তুতিসকল আমাদের হৃদয় হইতে উদ্গীত হইয়া উজ্জ্বল শিখা সমন্বিত অগ্নির আভিমুখে ব্যাপ্ত হউক । মনুর সন্তান দৃঢ়চেতা ঋজিকগণ যজ্ঞান-বিশিষ্ট অগ্নিকে সংগ্রাম সময়ে যজ্ঞার্থে উৎপাদন করেন ॥ ৩

অগ্নি আমাদের কামনার পাত্র, পবিত্রকারক, আশ্রয়দাতা এবং বরণীয়—এইহেতু অগ্নি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞমানগণের মধ্যে স্থাপিত হন । এই অগ্নি শত্রু দমনে কৃতসম্বল এবং গৃহের পালয়িতা হইয়া যজ্ঞগৃহে ধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ধন—সেই ধনের অধিপতি হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৪

আমাদের ক্ষিতীশচন্দ্র

নীলাকাশ থেকে আকস্মিক বজ্রপাত! টেলিফোনে খবর এল সিংখির বাসভবন থেকে ক্ষিতীশের মহা-প্রয়াণের! একেবারেই অপ্রত্যাশিত—এ দুঃসংবাদেদের জন্ম আমরা তো প্রস্তুত ছিলাম না—কেউই!

—পেটের গ্যাস কমেছে—এখন ক্ষিতীশ ভালই আছে। পরদিন থেকেই সে অফিসে যোগ দিবে। তবে এর মাঝে অকস্মাৎ কি ঘটল। প্রাতঃকৃত্যকালে শৌচাগারে ঢোকার পরে, সেইখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে।



“নিশ্চয় দেহ—মুখে সেই শান্ত ছবি—কর্শশেবে যেন ক্লান্ত হয়ে শেষ নিদ্রায় রণপ্রান্ত সৈনিক”

রবিবারে সামান্য জ্বরের কথা শুনলাম—সুখাংশুর বিলম্ব দেখে দরজা ভেঙেই যখন তাকে বাইরে আনা মুখে। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালেও সুখাংশু খবর নিয়েছে হয়, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার বড় ডাক্তার শ্রীরায়ের ঔষধ খেয়ে তার সে জ্বর ছেড়ে গেছে সকালেই মাছের ঝোল খেয়ে সে অফিসে যাবে, এই

হে অগ্নিদেব! আপনি ধনপতি এবং আমাদের রক্ষক। সেইজন্য গৌতমগোত্রীয়ী আমরা আপনাকে মননীয় স্তুতির দ্বারা চিরকাল প্রশংসা করিব। অশ্বারোহী যেমন অশ্বপৃষ্ঠ মার্জিত করেন—আমরাও তদ্রূপ “বাজসুরং” (যজ্ঞশালাকে) মার্জিত করিব। হে অগ্নিদেব! আপনি এই প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৫

নোদাখ্যির অগ্নিস্তুতির এই তিনটিই শেষ মন্ত্র। এরপর তিনি ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে মন্ত্র রচনা করিবেন। উপরিউক্ত তিনটি ঋক্ মন্ত্রেই ঋষি অগ্নির সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রদ্বারাই স্তুতি-নতি জানাইলেন। তখনকার যুগে অগ্নিই ছিলেন গৃহস্থের রক্ষাকর্তা, অন্নদাতা এবং গৃহপতি। গৌতমগোত্রীয় নোদাখ্যি বংশপরম্পরাক্রমে অগ্নিশালা নিত্য মার্জিত করিয়া অনাহত অগ্নিশিখা আজীবন প্রজ্জ্বলিত রাখিবেন—এইরূপ অঙ্গীকারই যেন অগ্নির নিকট করিতেছেন।

রেণুকণা ঘোষ

জন্মই কৃষ্ণপ্রসাদ নিজেই বাজারে মাছ কিনতে গেছেন। কিন্তু মাছ কেনার আগেই সেখানে খবর পৌঁছে গেল—ক্ষিতীশের অভাবনীয় মৃত্যু-সংবাদ। বিধাতার দুর্ভেদ্য। কিন্তু দুর্ভজ্য ঘটনারই চক্রান্ত।

ক্ষিতীশ সজ্জের মানুষ—তার মরদেহ সজ্জকেল্লেই আনতে হবে। ইহাই সজ্জের আন্তরিক ইচ্ছা। সিঁথির পাড়া-ভরা-পল্লীবাসী প্রতিবেশীদের স্নেহ ও আপনকরা আদরের কেন্দ্র, তাদের সে সুনিবিড় স্নেহবেষ্টিত আকর্ষণ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সহজ নয়। ঘটনার গতিক্ষেপের উপর যেন কোন হাত নেই আমার, তাই জোর করে কোন নির্দেশসূচক কিছু বলতেও পারছি না তা।

সুধাংশুকেই কৃষ্ণপ্রসাদ সেখানে ডেকে পাঠিয়েছেন সিঁথিতে। খবর পেয়ে সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীও সঙ্গে যাবেন আমায় ফোনে জানানলেন। তাঁরা চলেও গেলেন একটু পরে—আমার চিঠি নিয়ে। পরে মধু ভাইও রওনা হলেন। বেলা প্রায় ১২।১৫টা আবার টেলিফোন এল সিঁথি থেকে। ক্ষিতীশের নাকি শেষ ইচ্ছা একটা স্নেহপাত্র ছেলেকে সে বহুদিন জানিয়ে গেছে তার দেহ যেন চন্দননগর মূলকেল্লেই নিয়ে যাওয়া হয় কারণ সে যে সজ্জেরই ছেলে।

ঘটা দেড়েক মধ্যেই মোটরে শবদেহ নিয়ে আশ্রমে পৌঁছে গেলেন স্বামীজি, সুধাংশু ও মধুসূদন এবং স্নেহভাজন সেই ছেলেটি মদন সাঁতরা।

নিম্প্রাণ দেহ—মুখে সেই শান্ত ছবি—কর্মশেষে যেন ক্লান্ত হয়ে শেষনিদ্রায় রণপ্রান্ত সৈনিক। অক্ষর বারণ মানে না! চেতনায় বেদনার মর্মহারী ছায়া। 'সজ্জ-সাধকের সমুদ্রপোষিত দীর্ঘ তপস্যার সৃষ্টি, তরুণ ভবিষ্যতের এক-স্বপ্ন-বিগ্রহ কালশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে সহসা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেল। এসব এলোমেলো ভাবনা আমার অস্থির মনকে আরও আকুলি-বিকুলি করে' তুলল।

খবর পাওয়া সজ্জমানস—সজ্জের স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নরনারী—প্রবর্তক বালিকা বিদ্যালয়, প্রবর্তক বিদ্যার্থিভবন, ছাত্রনিবাস ও ছাত্রীনিবাস, প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটি ও জুনিয়র বেসিকস্কুল এবং প্রবর্তক সেবানিকেতনের মহিলাসদন ও শিশুসদনের

শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীর দল—কাতারে-কাতারে এসে আশ্রমে শ্রদ্ধাধ্য দিয়ে গেল। ছবি তোলা হল বিদ্যায়ী সজ্জসাধকের 'একক বা সজন মাতৃমন্দিরে মাতৃবিগ্রহের সম্মুখে। শ্রদ্ধানকৃত্য-পরে যথারীতি দশাহ সজ্জাচারপালন—সভা, তিলতর্পণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এই শোকোচ্ছল ধারাবিবরণের প্রয়োজন কি? সজ্জব্রতী তরুণ সজ্জপ্রাণ সজ্জের মানুষ হওয়ার সিদ্ধক্ষেপেই সজ্জজননী তাঁকে টেনে নিলেন তাঁর স্নেহকোলে। শুধু ব্যবসায়ের বৈষয়িক ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়, সজ্জ তরুণসংযুক্তির আশাময়, প্রতীক্ষাময় নব সূচনা ও পরিকল্পনার তপঃ-সৃষ্টিও কি আত্মরেই নিম্মূল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?

এই মর্মান্তিক দুঃসহ প্রশ্ন নিয়েই আমি দিন গুণে চলেছি। বার-বার অন্তরের দেবতাকে প্রশ্ন করছি—কেন কেড়ে নিলে বোধনমুহূর্তেই নিষ্ঠুর নির্দয়তায় একটা সজ্জশক্তির হাতে গড়া তরুণ প্রাণকে? সজ্জ-ভবিষ্যতের রঙীন সোণালী স্বপ্ন কি তোমার মনঃপুত নয়, অভিপ্রেত নয়, তবে কি জন্ম তার এই সম্ভাবনোজ্জ্বল জীবন-প্রতীককে বিনা জানান দিয়ে ছিনিয়ে নিলে সজ্জের কর্মক্ষেত্র তথা তার জীবনক্ষেত্র থেকে—এ কোন উদ্দেশ্য তোমার? এ নির্মম ঘটনার নিগূঢ় মর্মার্থ ও তাৎপর্য কি?

এই একই অনুভূতির স্পন্দন এল চট্টলার প্রবর্তক তীর্থ থেকে—আশ্রমসম্পাদিকা কুমারী মীরা সিংহ লিখলেন ২২শে জানুয়ারীতেই সজ্জের সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পেয়েঃ—“বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত যে খবরটি শুনলাম, তার জন্ম তৈরী ছিলাম না! এ আঘাত সইবার জন্ম যারা রইলেন তাঁদের আঘাত আমাদের বুকে যেন দ্বিগুণ হয়ে বাজছে। কত শত প্রশ্ন মনে জাগে—শেষ সময়ের অবস্থা জানার জন্ম মনটা আকুলি-বিকুলি করছে। বারে-বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে—আপনাদের বেদনা-বিস্মৃক মুখগুলি। ক্ষিতীশদার জানুয়ারীর শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে এখানে আসার কথা ছিল। ওখানকার বিস্তারিত খবর দিয়ে কে আমাদের লিখবে? সকলে আমার প্রণাম নেবেন। তাঁকুরের পায়ে আপনাদের কুশল কামনা করে’ এখানে শেষ করি।”

অন্য পরিচালিকা কুমারী কণাধারা চৌধুরীর লিপি-

* মর্মও সেই একই সূরে, একই ধারায় : আমার এখনও বিশ্বাস হয় না—মনে হয় কেউ বুঝি দুটামী করে' এ রকম সংবাদ দিয়েছে।...আজ আপনাদের বুকের যে বেদনা, তা কেমন করে মোছাবে? ঈশ্বরের কি ইচ্ছা? কেন তিনি আপনাদের আজন্ম সন্ন্যাস ব্রতীদের জীবন-সায়াহ্নে এ হেন আঘাত দিলেন।

ক্ষিতীশদা সর্বদাই আমাদের জন্ম খুবই উৎকর্ষায় থাকতেন। চিঠি দিতে দেরী হলে কত দুঃখ করে' লিখতেন। আজ তাঁর হৃদয়ের আকুলতা কেমন করে স্তব্ধ হয়ে গেল। দাদামণি, আজ এই মুহূর্তে আপনার স্নেহস্পর্শের জন্ম মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দু'লাইন লিখবেন—কাউকে বলবেন অদ্বৈত ক্ষিতীশদার শেষ সময়ের সকল অবস্থা বিস্তৃতভাবে যেন আমাদের লেখেন। এখানে ওনার জন্ম কি কি করতে হবে, সব তো জানি না। মীরাদি আজ (ঢাকা থেকে) আসবেন। আগামী কাল-পরশুর দিকে শোক-সভার ব্যবস্থা হবে। ১০ দিন নিরামিষ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ক্ষিতীশদার ছোটখাট জীবনী জানার প্রয়োজন। ওনার বাবা-মা কি বেঁচে আছেন? ক্ষিতীশদা যেখানেই থাকুন, তাঁর উদ্দেশ্যে আমি প্রাণের প্রণাম জ্ঞাপন করছি।”

ক্ষিতীশচন্দ্র এসেছিল—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে “প্রবর্তক কলেজ অফ কাল্চারের” অগ্রতম ছাত্ররূপে দুই বৎসর কলেজে পড়ার পর ১৯৪৪ সালে সে সজ্জকেন্দ্রে ব্রতী রূপে সজ্জসেবায় নিযুক্ত হয়। আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীসজ্জগুরু আরও ২১৩ জন সজ্জব্রতী ছাত্রের সঙ্গে ক্ষিতীশকেও প্রেরণ করেন কলিকাতায় প্রবর্তক ট্রাফ্টে সজ্জের অর্থকেন্দ্রে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী (trainee বা apprentice) রূপে। সেখানে ৩০ বৎসর কাল এই অর্থাজ্ঞানের শিক্ষা সুযোগ গ্রহণ করে' পারিবারিক চেতনার ক্ষেত্র থেকে ধীরে-ধীরে সজ্জের সমষ্টিচেতনায় সে আকৃষ্ট ও পরিশেষে সম্যক রূপে সংযুক্ত হয়। ১৯৬৫ অব্দে সে প্রবর্তক ট্রাফ্টের কনিষ্ঠতম ডিরেক্টর-পদে উন্নীত হয়। এই ১৯৭৬ সালেই ক্ষিতীশচন্দ্রকে প্রবর্তক কমানিশিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে' শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সজ্জের তদুর্দ্ধ কৰ্মান্তরে আত্মনিয়োগ করার পরিকল্পনা স্থির করে-ছিলেন—তারই ঠিক প্রাক-ক্ষেণে ক্ষিতীশচন্দ্রই ছুটি নিলেন—সজ্জের সকল কর্মক্ষেত্র থেকেই বিধিনির্দিষ্ট অনির্দেশ্য কর্মবিধানে বা জীবনবিধানে। এইখানেই

তো প্রগাঢ় বিশ্বয়ক্ষেপে সন্তাড়িত হয়ে আমি মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলেছি বিশ্ববিধাতার কাছে—কি তোমার, অভিপ্রায়? কি তোমার ভবিতব্য বিধান? সজ্জের ভবিষ্যৎ কি? সজ্জের নূতন জীবনপ্রোতঃ, নূতন রক্তধারা কোথায়? এ মর্মান্তিক প্রশ্নের যত মর্মস্তদ উত্তরই হোক না কেন, সে উত্তরেরই প্রতীক্ষা আমার, দাবী আমার।

উত্তর এল—মনের ক্ষেত্রে নয়, মনের উপরে এক অজানা লোক থেকে নেমে বিজ্ঞানময় গুরুত্ব কঠোর। শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ বাণী—‘ক্ষিতীশকে নিতে হল তার সাধন শেষ হয়েছে। তার এই সিদ্ধির বীজ নিয়ে শত তরুণ যাবে—প্রথমে দশ জন—আমারই কাজ করতে। সজ্জের জয়পতাকা তাঁদেরই হাতে তুলে দে। সজ্জের ভবিষ্যৎ এরাই রক্ষা করবে।’

শ্রীগুরুর সিদ্ধবাণী—সার্থক হবেই। এই আমার অমোঘ প্রত্যয়। তোমরাও কি শোন-নি তোমাদের কাণে, পাণ্ডনি তোমাদের মনে এই বিজ্ঞানময়ী গুরু-বাণীরই ধ্বনিপ্রতিধ্বনির সাড়া?

ভারতের মহাকবি কালিদাসের অমর শ্লোক এই গুরুবাণীরই উপর অভিনব আলোকপাত করছে আমার মনে, আমার প্রাণে—

“সহস্রগুণমুৎ প্রস্তুত্বাদত্তে হি রসং রবিঃ”

বিজ্ঞানময় মহাসূর্য্য তাঁর জলসৃষ্টি থেকে রস-কর আদায় করেন বিশ্বনিময়—সেই সংগৃহীত বাষ্প-গুরুকেই সহস্রগুণিত আকারে ও প্রকারে ধরাবক্ষে পুনরুৎসর্গ করার জন্ম। সৃষ্টির তাই শেষ নেই—সজ্জেরও বংশধারা অশেষ, অফুরন্ত।

নবজাতির অভ্যুদয় সজ্জেরই রূপান্তরে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ত্রিস্তর অতিক্রম করে' বিজ্ঞানঘন গুরুসত্তারই উর্দ্ধ চেতন সাবলীল আত্মপ্রকাশে। সে মহাসৃষ্টিরই নবযুগ—নব অবতরণ সুনিশ্চিত ও আসন্ন।

“শুশ্রূষা বিশ্বৈ অমৃতস্য পুত্রাঃ

আ য়ে ধামানি দিব্যানি তত্বাঃ—

বেদাহমেতম্ পুরুষং মহাত্মম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাপ ॥”

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

কৈফিয়ত

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

কৈফিয়ত দেবার সময় এসেছে কি না জানি না, তবে কৈফিয়তের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত হবার একটা সুযোগ নিশ্চয়ই ভাবীকাল আমাদের দেবে। বর্তমানকাল অতীত এবং ভবিষ্যৎকালের কাছে তার কিছু কৈফিয়ত রেখে যাবার চেষ্টা করবে; জানে না সেই কৈফিয়তে মহাকাল সন্তুষ্ট হবেন কি না?

কৈফিয়তের কি কারণ ঘটল তার কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রয়োজন। আমার জীবনে অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। শিশুকাল থেকেই এমন এমন পুরুষ-সিংহের দর্শন লাভ করেছি, যা যে কোন মানুষের পক্ষে সম্পদ হয়ে থাকবে। শিশুকাল এবং কৈশোরকালে দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তারপর দেখেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি বৌবনের প্রারম্ভে। তারপর দেখেছি মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়কে। পরবর্তী কালে প্রায় প্রত্যেক নম্র চরিত্রের সান্নিধ্যে এসেছি। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কবিশেখর কালিদাস রায়, অপর্ণা দেবী (অন্ধ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জননী) প্রভৃতি স্মরণীয় মনীষীদের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছি।

জীবনের এই সঞ্চয় যখন বিগতযৌবনকালে হারিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় অত্যাশ্চর্যরূপে নিমন্ত্রণ পাই চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। প্রবর্তকসঙ্ঘের কর্ণধার সর্বজন অন্ধ্র শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের অত্যন্ত স্নেহ ভাজন শ্রীমান প্রশান্ত চক্রবর্তী আমার কাছে এসে জানান যে প্রবর্তকসঙ্ঘে ধর্মসম্বন্ধীয় কিছু বক্তৃতা দিতে হবে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ ধরনের বক্তৃতা আমি কি করে দেব? আমি ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানি না, বরং প্রতিদিন আমার কর্মের ভেতর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম বা দর্শন শাস্ত্রের কোন স্থান নেই। সবিনয়ে আমার অযোগ্যতা স্বীকার করলাম, কিন্তু তাঁদের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে মত দিলাম। চন্দননগরের প্রবর্তকসঙ্ঘে অরুণ বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আর প্রথম দর্শনেই

অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি কল্পনাও করতে পারিনি আজকের সমাজে একজন উনবিংশ শতাব্দীর খাজু বাঙালী চরিত্র দেখতে পাব। অরুণবাবুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শৈশব কাল থেকে বিগতযৌবন পর্যন্ত যে সমস্ত মহামানবকে স্পর্শ করার অধিকার পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের ছবি ভিড় করে মনের ভেতর জেগে উঠল। ঠিক করলাম এদের কাছে কৈফিয়ত দেব, তাঁদের প্রতিভূরূপ অরুণদাকে সামনে রেখে আমার বর্তমানকালের কৈফিয়ত তুলে ধরছি। বিচারের তুল্যদণ্ড আপনাদের হাতে। আমাদের সবকথা শোনার পর আপনারা বিচারে যে রায় দেবেন, বিনা দ্বিধায় আমরা মাথা পেতে নেব।

আমরা, অর্থাৎ বর্তমানকাল অধার্মিক, অসামাজিক এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যত্নতত্র। ধর্ম কি, সমাজ কি, এ বিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই, দেবতা কি তাও আমার অজানা। যতদূর জানি, ঐতিহাসিক যুগে (cromagnon age) প্রাকমানুষ জন্তুর মতই জীবন-যাপন করত। অগ্ন্যস্ত্র প্রাণীর সঙ্গে মানুষ বনে বসবাস করত আর বনের পশুর সঙ্গে পশুর মতই থাকত। মানুষের দেহে ছিল দীর্ঘ লোম, নখ প্রখর আর দাঁত তীক্ষ্ণ ধারাল। দেহের গঠনও ছিল কর্কশ, পুরুষ আর বৃদ্ধ। অগ্ন্যস্ত্র প্রাণীর সঙ্গে মারামারি করে বন্য মানুষের দল নিজের অস্তিত্বকে রক্ষায় রাখার চেষ্টা করত। অধিকাংশ পশুই মানুষের চেয়ে ক্ষমতাবান ছিল তার ফলে বহু মানুষের সংখ্যা অগ্ন্যস্ত্র হাতে পশুর মতই ক্ষতিবিক্ষিত হয়ে সেইসব প্রাণীর খাদ্য হিসেবে রূপান্তরিত হত।

তখনকার মানবসমাজ ছিল পশুসমাজের মতই। উল্লেখ্য রোমাশ দেহ নিয়ে নরনারী ঘুরে বেড়াত দল বেঁধে। এই একত্র ভ্রমণের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ছিল না, শুধু ছিল ভীতি। অগ্ন্যস্ত্র কোন প্রাণী আক্রমণ করলে দল বেঁধে তাকে হত্যা করতে পারবে, এই ভরসায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত। মানুষের আহার ছিল কোন পশুপাখী। যে প্রাণীকে তারা হত্যা করত, তারই কাঁচা মাংস রক্ত, মানুষের দল কাড়াকাড়ি করে খেত। এই কাড়াকাড়ির

সময় নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না, এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটি আহাৰ্য্য ভক্ষণ করত, অথ সবাই দূরে দাঁড়িয়ে লুক্কৃত দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখত।

নরনারীর সম্পর্কও ছিল গম্ভীর মত। শক্তিশালী পুরুষ এক বা একাধিক নারীকে সর্বসমক্ষে উপভোগ করত, আবার কোন শক্তিশালী নারী তার মনোমত পুরুষকে অথ নারীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কামনা চরিতার্থ করত।

এই তো ছিল তিরিশ হাজার বছর আগের সমাজ এবং মানবজীবন।

কি করে মানুষ তাহলে এত সভ্য হয়ে উঠল? অধুনাকালে উক্ত দানিকেন তাঁর বৈপ্লবিক ব্যাখ্যায় বলেছেন সেই প্রাচীনকালে গ্রহান্তর থেকে উচ্চশিক্ষিত মানুষের আগমন হয়েছিল এই পৃথিবীতে। তাঁদের শিক্ষায় দীক্ষায় পৃথিবীর মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হয়ে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে পা বাড়িয়েছিল। এই মন্তব্যকে জোরাল করার জন্য দানিকেন একাধিক যুক্তি, প্রমাণ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে যে সমস্ত প্রাচীন মন্দির আছে, সেগুলির অধিকাংশই আফ্রিক এবং আকাশ পথচারীর প্রতি নির্দেশ সংকেত, যা লক্ষ্য করে গ্রহান্তর থেকে মানুষ নিশানা লক্ষ্য করে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করত। তাঁর মতে বানর বা বনমানুষ লক্ষ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বনমানুষ হয়েই আছে। ডারউইন এর প্রতিপাদ্য যদি সত্য হত, তাহলে নিশ্চয়ই একটি বনমানুষের বংশও এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানুষে রূপান্তরিত হত, কিন্তু তা হয় নি। আশ্চর্যের বিষয় একমাত্র মানুষ সভ্যতার পদক্ষেপে ছুঁছে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর বুকে আর কোন প্রাণী সভ্যতার আলো দেখতে পায়নি; কেন?

দানিকেন বলেছেন গ্রহান্তরের মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করে পার্থিব নারীর সঙ্গে সহবাস করে একটি বর্ণশঙ্কর মানবশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, আর, সেই নবসৃষ্ট মানবগোষ্ঠী থেকেই বর্তমানকালের মানুষের সৃষ্টি। গ্রহান্তরের মানুষকে পৃথিবীর মানুষ দেবতা বলত। সেই জন্মে প্রায় সর্বদেশের পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা

আকাশে উড়ে চলে যেতেন আবার আকাশ থেকে নেমে আসতেন। দেবতারা বাস করতেন আকাশের ওপারে কোন এক রাজ্যে, যে রাজ্য পৃথিবীর মানুষ কোনদিন দেখেনি, কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সেই রাজ্যের নাম দিয়েছেন ‘স্বর্গরাজ্য’।

বস্তুব্যাঙসি বৈপ্লবিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দানিকেনের বস্তুবা যদি পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করে নেন, তাহলে এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস, ধর্মের আদর্শ, দেবতার পবিত্রতা অমৃতের আবাস সব ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যাংপাতের নীচে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে।

এবার অত্মদিকে দেখা যাক। প্রায় সমস্ত পুরাণে আগুনের নানারকম ব্যবহারের কথা দেখা যায়। অথ্য দেশের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের কৈফিয়ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে এবং আপনারাও বিচারকের আসনে বসে অকারণে হাই ভুলে ধৈর্যচূড়তির লক্ষণ প্রকাশ করবেন। এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে আপনারা বেশি ভাল করে জানেন। আমরা শুধু বলতে চাইছি, আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মনুষ্টের প্রাণীর সঙ্গে মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করত এ কথা আগেই বলেছি। বনে যখন দাবানল জ্বলে উঠত, অত্যন্ত গম্ভীরাখীর সঙ্গে মানুষও পালাত বনান্তরে নিরাপত্তার জন্মে। একদিন একটি মানুষ ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা জ্বলন্ত গাছের ডাল ভেঙে তার সামনে পড়েছিল। সে ভয় না পেয়ে জ্বলন্ত ডালটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল, আগুন তো তার কোন ক্ষতি করছে না। সে জ্বলন্ত ডালটি হাতে নিয়ে ছুটতে লাগল, তারপর সে যখন দলের সঙ্গে মিশল, দলের লোক অবাধ বিশ্বাসে লোকটিকে দেখল এবং সেই মুহূর্তেই তাকে দলপতিরূপে নির্বাচিত করল। দলপতি দলটিকে নিয়ে একটি সমতল জায়গায় জড় করল। সকলের সাহায্যে জায়গাটির চারপাশে পাতা লতা দিয়ে গম্ভী তৈরি করে দিল। সেই গম্ভীতে হাতের জ্বলন্ত ডালটি ছুঁইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো গম্ভীরেখা আগুনের গম্ভীরেখায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। গম্ভীর মাঝখানে মানুষের দল ভয়বিহীন হয়ে বসে রইল, কিন্তু সকলে আশ্চর্যের সঙ্গে

লক্ষ্য করল, অগ্নি সব পশু আগুন দেখে দূরে পালিয়ে গেল। পরম নিশ্চিতে, পরম নিরাপদে মানুষের দল সেই অগ্নিরলয়ের মাঝখানে রাজি যাপন করল এবং পর দিন প্রাতঃকালেই অনুভব করল অগ্নিই হচ্ছে একমাত্র বন্ধু, যা মানুষকে নিরাপদে রাখার কর্তব্য পালন করতে পারে।

সেদিন থেকেই মানুষের দল অগ্নিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করল। আমি যে কৈফিয়ত দিলাম, তাকি প্রমিথুউস-এর স্বর্গ থেকে আগুন আনার চেয়ে কোন অংশে হয়? আপনারা বিচারক। আপনারা যদি নির্লিপ্ত এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনাদের ধার্মিক পৌরানিক কাহিনীর থেকে খুব বেশি আলাদা নয়।

কোন দেশ সর্বপ্রথমে আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল একথা বলা কঠিন, কিন্তু একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলাতে পারি, এই পৃথিবীর মানুষই আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল, অগ্নি কোন গ্রহের মানুষ নয়। দানিকেন যে মস্তিকের দীপ্তি নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন অগ্নি গ্রহের উন্নততর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এই গ্রহের মানুষকে জ্ঞানের আলোক দেখিয়েছিল, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন অথর্ববেদ, সামবেদ, খগবেদ আর যজুর বেদের রচয়িতারা। আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে জেনেছি মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজে নির্বিকারভাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি জারজ। তারপর তিনি মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। যিনি নিজের জন্মকলঙ্কের কথা ঘোষণা করার পরও যা রচনা করেছেন, তা আজও আমরা, বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগের অধিবাসীরা, সমস্তে পূজোর ঘরে সাজিয়ে রেখে দিই। যাদের চিন্তাধারা এত পরিষ্কার ছিল, এত নিরপেক্ষ ছিল এবং এত উন্নত ধরনের ছিল, তাঁরা যদি পৃথিবীর কোথাও গ্রহান্তরের মানুষের চিহ্ন বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করতেন, তারা লিপিবদ্ধ করতে একটুও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না।

মানুষের ধর্ম ও সমাজের বিবর্তনের বিশ্লেষণ করলে কিন্তু অগ্নি চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ভারতবর্ষ আশ্চর্য্য একটি দেশ। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা এত গভীর

ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে পৃথিবীর অগ্নি কোন দেশের লোক তার ধারে কাছে আসবার ক্ষমতা রাখে না। এই পৃথিবীর মানুষই সর্বপ্রথমে আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল বলে, সর্বস্থানে আগুনের প্রতি সম্মান জানাতে ছবি এঁকে রাখতেন। দানিকেনের বক্তব্যকে যদি সত্য বলে ভেবে নিই, তাহলে বর্তমান ভারতের সামাজিক মান দেখে কখনই বিশ্বাস করা যায় না এদেশে বৈদিক সভ্যতার মত উচ্চমানের সমাজ বর্তমান ছিল। দানিকেনের অভিমতে পৃথিবীর বহুমানুষ, গ্রহান্তরের উন্নত-শীল মানুষের সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে। কিন্তু উন্নতমানুষ ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায় কেন? তার মুখ্যতম কারণ যে অনুশীলনে মানুষ অমৃতের আশ্বাদ পায়, সেই অনুশীলনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের তপস্যাও নষ্ট হয়ে যায়।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? দেবতা কারা? দেবতার কি কোন অস্তিত্ব আছে? ধর্মের উৎপত্তি তাহলে কোথেকে এল? ধর্মের প্রয়োজনই বা কি?

হে বিচারকগণ! চলুন আমরা আবার ফিরে যাই সেই অরণ্যচারী একদল মানুষের কাছে যারা দল বেঁধে বসে আছে একটি আগুনের গভীরেখার মধ্যস্থলে।

পরদিন সকালে সেই দলপতি যখন দেখল পরম নিশ্চিতে এবং নিরাপদে সকলে রাজিযাপন করেছে, তখন ঠিক হল সারাদিন তারা ঋতুদের জন্ম পশু বধ করবে আর রাজিবেলায় আগুনের গভীরে তৈরি করে তার মাঝখানে বাস করবে। এইভাবে বাস করতে করতে ক্রমশঃ তারা অগ্নি পশুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আগে মানুষের ধারণা ছিল, তারাও একরকমের পশু, তাই বিনা দ্বিধায় যে কোন ইতর প্রাণীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে দ্বিধাবোধ করত না; কিন্তু যখন মানুষের দল আগুনের কল্যাণে অগ্নি পশুসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন মানুষপ্রাণী, মানুষপ্রাণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনা করতে বাধ্য হল। আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই মানুষপ্রাণী নাম আখ্যা দিচ্ছি, কারণ সে যুগে মানুষ পশু ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আগুন ক্রমাগতঃ জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব নয় আর সদা-সটদা দাবানলের আগুন জ্বলে না। প্রকৃতিগত আগুন

নিবে যাবার পর মানুষ খুঁজতে লাগল, কি করে আগুন সৃষ্টি করা যায়। দানিকেন সাহেব যদি একটু তলিয়ে চিন্তা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন পৃথিবীর মানুষ কোন কিছু আবিষ্কারের প্রথম সূত্র পেয়ে যান আকস্মিকভাবে, একেবারে আচমকা। বেশি দূরে যেতে হবে না, হালফিল পেনিসিলিন আবিষ্কারের কথা পড়লেই আমার বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

অরণ্যজীবনের শেষ দিকে একদিন একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল আচমকা। একজন অরণ্যচারী মানুষ একটি পাথর ছুঁড়েছিল শিকার বধ করার জন্তে, সেই পাথরটি শিকারের গায়ে না লেগে আর একটা পাথরের গায়ে ঠোকর লাগে। পাথরটির পাশে পড়েছিল কিছু শুকনো পাতালতা। লোকটি আশ্চর্যের সঙ্গে দেখল হুটো পাথরে ঠোকর লেগে আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল, আর সেই ফুলকি থেকে শুকনো পাতালতা জ্বলতে লাগল।

লোকটি ভয় পেয়ে ছুটে পালাল। ভাবল মাটি ফুঁড়ে আগুন বেরিয়ে পড়েছে মাটির বুকে। কিন্তু খানিকটা ছোট্টার পর সে ঘুরে দাড়াইল, ভাবতে লাগল কই আগুন তো ছুটে এসে কামড়াচ্ছে না। এর আগে ধারণা ছিল, আগুন একরকমের পশু। তার বিরাটকায় আকার থেকে ধোয়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়ে, আর সেই নিঃশ্বাসের স্পর্শে সব পশু পাখি গাছ পালা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আলাদা করে আর মানুষ বললাম না, কারণ মানুষ তখনও পশু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

মানুষটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ একলা ভাবল, তারপর পায়ের পায়ের আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল। আগুন তো কামড়াতে আসছে না। নিজের মনেই জ্বলছে। লোকটি একখণ্ড ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আগুনের মধ্যে ধরল। ডালটা জ্বলে উঠল। প্রথমে ভয় পেলেও একটু সাহস করে ডালটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কোন ভয় নেই, না—আগুন কামড়াচ্ছে না। লোকটি জ্বলন্ত ডালটি ছুড়ে ফেলে দিল। খানিকটা দূরে পড়ে ডালটা নিবে গেল। হঠাৎ লোকটির মাথায় এল, পাথরে পাথরে ঠুকলে আগুন বেরোয় কি না দেখা যাক। লোকটি ঠুকল। পাথরে পাথরে ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ একবার আগুনের ফুলকি দেখা গেল। লোকটি একটা

শুকনো কাঠ ধরে পাথরে পাথরে ঠুকতে দিল। আশ্চর্য! ফুলকি ছিটকে শুকনো কাঠে লাগল, তারপর জ্বলতে লাগল কাঠের টুকরো। লোকটির আনন্দ আর ধরে না। সে দাবানল ছাড়াও আগুন তৈরি করতে পেরেছে। নিবিয়ে দিল কাঠটি, আবার পাথরে ঠুকতে আগুন ধরাল। ঠিক! এর মধ্যে আর কোন ভুল নেই। সে আগুন তৈরি করার প্রথা করায়ত্ত করেছে।

আমার কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছে না? হে বিচারক মণ্ডলী! আপনাদের অনুরোধ করব অথর্ববেদের পাতাগুলি একবার উল্টে পাল্টে দেখতে। অথর্বনু সম্প্রদায় এই বেদ রচনা করেছিলেন বলেই বেদটির নাম হয় অথর্ব। বেদের চালু ইংরিজী নাম ম্যানুয়েল এ কথা আমার চেয়ে আপনারা বেশি জানেন। অথর্ববেদের পাতাগুলি খুঁজলে দেখা যাবে, অগ্নিরস সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ কি ভাবে আগুন জ্বালাতে হয় জানতেন। তাঁরা আগুন-জ্বালার পদ্ধতি গোপন রেখেছিলেন এবং স্বগোষ্ঠীয় ছাড়া আর কাউকে শেখাতেন না। এ কথা আমার চেয়েও আপনারা আরও ভাল করে জানেন কেন কয়লার নাম অঙ্গার হয়েছে। কাঠ আগুনে পোড়ার পর যে ছাই পড়ে থাকে, তাকে বলা হয় অঙ্গার। অঙ্গার নামটি এসেছে অগ্নিরস সম্প্রদায় থেকে।

কেন শেখাবে বলুন? আজও বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে বসে আমরা পেটেন্ট রাইটের দরখাস্ত করছি আচার্য-জগদীশ বসু রোডের অফিসে। আমি যদি কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করে থাকি, সে পদ্ধতি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না, এই নিরাপত্তার জন্তেই পেটেন্ট অফিসে দরখাস্ত করা। বৈদিকযুগে কোন পেটেন্ট অফিস ছিল কিনা জানি না, কিন্তু অগ্নিরস সম্প্রদায় আগুন তৈরির প্রথা বাইরের কাউকে শেখাতেন না, এর মধ্যে আশ্চর্যের কোন ব্যাপার নেই।

মানুষ তখন বুঝতে শিখেছে আগুন ছাড়া কোন কিছুই তৈরি করা সম্ভব নয়। মানুষ বুঝেছে কাঁচা মাংস থেকে ঝলসানো মাংস অনেক সুস্বাদু। মানুষ বুঝেছে, আগুনের মতই অগ্নি কোন অস্ত্র তৈরি করতে পারলে অনায়াসে বিভিন্ন শক্তিশালী পশুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা যেতে পারে। সুরু হল প্রস্তরযুগ।

মানুষ একটু একটু করে পাথর দিয়ে নানারকমের অস্ত্র তৈরি করতে লাগল।

আজ থেকে চল্লিশ হাজার বছর পরে কোন পরিব্রাজক যদি এশিয়া পরিভ্রমণ করেন, তিনি বলবেন এ দেশে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের লোকেরা এসে বিভিন্ন স্থপতি কার্য করেছিলেন, তাতে অবাঁক হবার কিছু থাকবে না। হয়ত এও ঘটতে পারে চল্লিশ হাজার বছর পরে আমেরিকা বা ইউরোপের সভ্যতা বিলীন হয়ে অরণ্যচারী মানুষের সংখ্যাই বেশী হবে। সেই পর্যটকটি যদি বলেন এই অরণ্যচারী মানুষের পূর্বপুরুষ সুসভ্য ছিল একথা ভাবা সম্ভব নয়, তাই বিশ্বাস হচ্ছে গ্রহান্তর থেকে কোন

উন্নত চিন্তার মানুষ এশিয়াতে পদার্পণ করে সভ্যতাকে গড়ে তুলেছিল। তার অর্থ আজ যা এশিয়ার মাটিতে গড়ে উঠছে, দূর ভবিষ্যতে কোন মানুষ বলবে এগুলি গ্রহান্তরের মানুষের সৃষ্টি।

তাহলে আমি কী বলতে চাইছি, জানতে চাইছেন? আমি দুপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি, এ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রত্যেকটি তৈরি হয়েছে এই পৃথিবীর মানুষের হাতে, তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং দূরদর্শিতায়। আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করব। শুনুন তাহলে—

(ক্রমশঃ)

তাম্রযুগেই বর্তমান সভ্যতার পত্তন

শ্রীসন্তোষকুমার দে

বর্তমান যুগের জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নব প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাপন করা সম্ভবপর হয় নি; তার কারণ ধাতুবিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় লাভ হয় নি। তারা জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করত পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে। কিন্তু পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতি ধাতু-নির্মিত যন্ত্রপাতির মত কার্যকরী না হওয়ায় এবং তা আকারে বড় ও ওজনে ভারী হওয়ায় যে পরিমাণে পেশীশক্তি ব্যবহার করতে হত, তাতে প্রয়োজনীয় সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হত না। সে যুগের উপযোগী জীবনের প্রায় সব কাজ তারা কোন রকমে চালিয়ে নিত। অবশ্য প্রস্তরযুগের মানুষ ধাতুর সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত ছিল একথা বলা হয়ত ঠিক হবে না। ধাতুর সঙ্গে তারা মোটামুটিভাবে পরিচিত ছিল; কিন্তু ধাতুকে কাজে লাগাবার মত বিদ্যা সে যুগে তারা অর্জন করতে পারে নি। টিন, তামা প্রভৃতি ধাতু ছিল তাদের কাছে পাথরেরই মত। পাথর চোঁচে ছুলে তাকে অস্ত্রে পরিণত করতে পেরে ছিল, কিন্তু তামা,

টিন প্রভৃতি ধাতুকে গালিয়ে মিশিয়ে কাজের উপযুক্ত অস্ত্র তৈরি করতে যে পারা যায়, সে বিদ্যা তাদের ছিল অজানা।

অবশ্য যে-যুগটাকে আমরা তাম্রযুগ বলছি সেটাকে তাম্রযুগ বলা হয়ত ঠিক হবে না। বলা উচিত তাম্র-বোঁজ-যুগ; কেন না বেশির ভাগ প্রত্নতাত্ত্বিক খাঁটি তামার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র পান নি, পেয়েছেন টিন বা অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে মেশানো তামার অস্ত্রশস্ত্র। তাই তাঁরা তাম্র-যুগ না বলে তাম্র-বোঁজ যুগ বলতে চান। এই তাম্রযুগে বা তাম্র-বোঁজ-যুগেই মানুষ তামাকে গালাবার বিদ্যা অধিগত করেছিল। আর এই তামা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে। দৈবক্রমেই হোক বা যে ভাবেই হোক সে যুগে মানুষ জানতে পেরে ছিল, তামার সঙ্গে টিন মেশালে যে মিশ্র ধাতুটি হয়, সেটা হয় খাঁটি তামার চেয়ে অনেক শক্ত আর কার্যোপযোগী ভাবে এটাকে গালাতে খুব বেশী উত্তাপের দরকার হয় না। কাজেই খাঁটি তামার পরিবর্তে টিন মেশানো

তামারই প্রচলন হল। সেই জগ্রে পণ্ডিতেরা এই যুগকে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ বলে অবিহিত করেছেন। আর এই যুগ চলেছিল খৃঃ পূঃ ৪০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত। এরপর সম্ভান মিলেছিল লোহার—যার ফলে পৃথিবীতে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় হল।

এই তথাকথিত তাম্রযুগের মানুষেরা পূর্বযুগের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নতুন ধাতুযুগের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে লাগল—পূর্ব-যুগের অভিজ্ঞতাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেয় নি। তাই দেখা যায় পূর্বযুগের মানুষ চাকার সঙ্গে পরিচিত হলেও চাকাকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে নি। এখন এ যুগের মানুষ চাকা দিয়ে যুগান্তর সৃষ্টি করল। চাকার প্রথম সম্ভাবহার হল কুস্তকারের হাতে। তারা এক দলা ভালভাবে তৈরি করা কাদা ঘুরন্ত চাকার মাঝখানে ফেলে হাতের কৌশলে প্রয়োজনীয় নানারকম যুগপাত্রের সৃষ্টি করতে লেগে গেল। আগের যুগের মানুষেরা শুধু হাতের চাপে নানারকম পাত্র তৈরি করত মাটি দিয়ে; তাই সেগুলো বেশ সুন্দর, স্টাম ও হাল্কা ধরণের হত না; আর এগুলো তৈরি করার ভার ছিল মেয়েদের ওপর। এখন কুমারের চাকা প্রচলন হওয়ায় পেশাটি স্ত্রীলোকদের হাতছাড়া হয়ে গিয়ে একেবারে পুরোপুরি পুরুষদের একচেটে হয়ে গেল। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন এল সমাজবিজ্ঞানীরা তার সঠিক কারণ নির্দেশ করতে পারেন না। এই চাকা চালানোর মত দক্ষতা দৈহিক শক্তি কি সে যুগের মেয়েদের ছিল না? জানি না।

তারপর চাকার কাজ শুধু যুগপাত্র তৈরির মধ্যেই আবদ্ধ থাকল না। চাকা স্বচ্ছ হল বড় বড় কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে এবং তা নিল গাড়ির আকার। ভারী জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার অসুবিধে অনেকটা দূর হল। মানুষই ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল এইসব ভারী ভারী গাড়ি। তারপর মাথায় বুদ্ধি এল ঘোড়া, বলদ, গাধাকে দিয়ে এইসব দুই চাকা বা চার চাকার গাড়ি, যদি চালানো যায় তা হলে, মানুষের পরিশ্রম অনেকটা কমে যেতে পারে। কিন্তু ঘোড়া, বলদ গাড়ি টানবে কেন? এজগ্রে

তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শুধু শিক্ষা দিলেই হবে না। চাই জিন, লাগাম, কড়া, শেকল প্রভৃতি। এগুলো নব-প্রস্তর যুগে তৈরি করা সম্ভব হয় নি; কারণ সে যুগে তারা ধাতুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এখন এ অভাব দূর হল। তাই ভারবাহী পশুদের শিক্ষা দিয়ে গাড়ির সঙ্গে যুক্ত মানুষ ভার বইবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেল। তারপর শুধু ভার বহা নয়। পশুকে দিয়ে মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে শেখালো। আর শেখালো জমিতে লাঙ্গল দিতে।

তামা গালাতে শিখে মানুষ দেখতে পেল ধাতুটা নরম; তাই তার সঙ্গে এখন টিন মিশিয়ে (৮০%—৯০% তামার সঙ্গে ১০%—১৫% টিন) নানান রকম যুদ্ধের অস্ত্র থেকে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কুড়াল, দাঁকাটারি, কাস্তে প্রভৃতি তৈরি করতে লাগল। দেখতে পেলে আগের যুগের পাথরের অস্ত্রের চেয়ে এদের কাজ করবার ক্ষমতা অনেক বেশি আর হাল্কা হওয়ায় এগুলো নিয়ে কাজ করা খুব সুবিধাজনক। অস্ত্র আছে তামা গালানো যায় দেখে তারা তামার তার তৈরি করতে শিখলো এবং দেখতে পেলে গাছের ছালের দড়ির চেয়ে তামার তারের দড়ি বেশি মজবুদ। কাজেই তারের দড়ি দরকার মত ব্যবহার করতে লাগল। খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্যন্ত এই রকম অবস্থা চলতে থাকে।

সমাজ ও কৃষি বিষয়ক পরিবর্তন

ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষের সমাজজীবনে কৃষি বিষয়ক অনেক পরিবর্তন এল। কিন্তু তামা ও টিন এইভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার ফলে মাটির ওপরে ও অঙ্গ নীচে যে তামা ও টিন সঞ্চিত ছিল তা ফুরিয়ে গেল। এর আগে মাটির গভীর খনির মধ্যে যে টিন ও তামা আছে তা খুঁড়ে তুলে নিতে মানুষ জানত না। তাই এবার দরকার হল মাটির নীচে যে টিন ও তামা আছে, তা সংগ্রহ করা। কিন্তু এ কাজ ত সহজ সাধ্য নয়। এর জগ্রে দরকার বিশেষ জ্ঞান, ধাতু নিষ্কাশনের কৌশল জ্ঞান; কারণ মাটির নীচে তামা বা টিন থাকে মাটির সঙ্গে মিশান অবস্থায়। সেই মাটি বেশান ধাতু গালিয়ে, তা

থেকে তামা বা টিন নিষ্কাশণ করা হল এক বিশেষ বিদ্যা। এ বিদ্যা অবিগত করতে সে যুগের মানুষের বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। আর এ কাজ একলা একলা করবার নয়, অনেকে মিলেমিশে করতে হবে। তাই মানুষ এবার শিখল সমবেত ভাবে মিলেমিশে এক যোগে কাজ করতে। অনেক চেষ্টার পর খনি থেকে মাটি মেশানো তামা নিষ্কাশণ করে গালিয়ে তামা বার করতে শিখল মানুষ; কিন্তু এ তামা দিয়ে ত কাজ চলে না; চাই টিন। তামা আর টিন কিন্তু এক জায়গায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাজেই তামা এলাকার মানুষ এখন টিন এলাকা থেকে টিন আমদানি করতে আর টিন এলাকার মানুষ তামা এলাকা থেকে তামা আমদানি করতে চেষ্টা করল। এই চেষ্টার ফলে সে যুগের মানুষ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা ভাবতে আরম্ভ করল। কিন্তু বাধা ছিল অনেক। প্রথম বাধা বিদেশ থেকে টিন আমদানি করতে হলে, তার বিনিময়ে রপ্তানিকারী দেশকে কিছু জিনিস দিতে হবে। অমনি ত কেউ নিজের জিনিস পরকে দেবে না (মুদ্রা তখনও চালু হয় নি)। যে জিনিস দিয়ে এই বিনিময় কাজ চালাতে হবে সে জিনিসটা আমদানিকারী দেশের হওয়া চাই উদ্ভূত এবং মূল্যবান। উদ্ভূত না হলে দেওয়া চলবে না, আর মূল্যবান বা প্রয়োজনীয় জিনিস না হলে অন্য দেশ সেটা নিতে চাইবে না। তামার বিনিময়ে টিন আর টিনের বিনিময়ে তামা আনার বদলে অন্য বিনিময়যোগ্য বস্তুর কথা মানুষ ভাবতে লাগল। ৩০০০ খৃঃ পূঃ মধ্যেই সুজলা সুফলা অঞ্চলগুলো খাতু নির্মিত কৃষিজন্তু ও গরু মোষ প্রভৃতি জন্তুর সাহায্যে কৃষিপণ্যে বেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠল। তাই তারা এখন কৃষিপণ্য বিনিময়ে দূর দূর অঞ্চল থেকে টিন বা তামা আনবার কথা ভাবতে আরম্ভ করল? কিন্তু কোথায় নিজের প্রয়োজন মত জিনিস পাওয়া সম্ভব যে জ্ঞানটাও থাকা দরকার। এই জানবার চেষ্টার ফলে মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা বেড়ে উঠল। এইবার তারা জানতে পারল কোথায় তাদের ইপ্সিত বস্তুটি পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে জানলেই ত হল না; সেই জায়গায় কি করে যাওয়া যাবে এবং পণ্য নিয়ে কি করে ফেরা সম্ভব সে বিষয়েও ওয়াকি-

বহাল হওয়া দরকার। আর ঐ জায়গায় যেতে হলে স্থল পথে যেতে হবে না জলপথে যেতে হবে সেটাও জানা দরকার। স্থলপথে যেতে হলে, যেতে যেতে কোথায় কোথায় বনভূমি, মরুভূমি, পাহাড় পর্বত পড়বে সে সব জানা দরকার। আর জলপথে হলে কোথায় খালবিল নদী হ্রদ বা সাগর সমুদ্র পড়বে তাও জানা দরকার। এই ভাবে ভূগোলের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করল মানুষ। স্থলপথে হলে ভারবাহী পশুচালিত গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে আর জলপথে হলে দাঁড়টানা, পালখাটানো বড় বড় নৌকার দরকার হবে—দরকার হবে সমুদ্রপথে নৌচালনাবিদ্যা ভালভাবে অধিগত করা। ইতিমধ্যে বাতাসকে কাজে লাগাবার জন্তে পাল আবিষ্কৃত হল। ফলে সমুদ্রপথে দূরদূরান্তে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হল।

ভাল ভাল নৌকা আর বড় বড় গাড়ি তৈরি করার কলা-কৌশল, পথের নিশানা ঠিক করা প্রভৃতি কাজ ত সকলকে দিয়ে হয় না। এসব করতে পারে এক শ্রেণীর লোক, যাদের বলা হয় বুদ্ধিজীবী। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা এসব কলাকৌশল প্রয়োগে মন দেবেন, না জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী আহরণে ব্যস্ত থাকবেন? একটা করতে গেলে আর একটা হয় না। তাই এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বুদ্ধি ও প্রয়োগবিদ্যা দিয়ে এইসব গাড়ি নৌকা প্রভৃতি তৈরি করতে সাহায্য করতে লাগলেন আর তার বিনিময়ে পেতে থাকলেন খাদ্য-সামগ্রী। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিক এই দুই শ্রেণী অল্পে অল্পে গড়ে উঠল। এর আগে সকলেই ছিল শ্রমিক, শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী বলে কেউ ছিল না। ক্রমে বুদ্ধিজীবীরা শুধু মাত্র লেখাপড়া, জ্ঞান সাধনায় ব্যস্ত রইলেন; তাঁদের আর অন্য কোনও কাজ রইল না। তবে বুদ্ধিজীবীরা তখন পর্যন্ত খুব উন্নত ধরনের হতে পারেন নি। তাঁরা তখনও মানচিত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতির কল্পনাও করতে পারেন নি। যাই হোক বড় বড় গাড়ি নৌকা প্রভৃতি তৈরি হলে দূরবর্তী এলাকা হতে মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আনানো করতে লাগল। এইভাবে উৎপত্তি হল সত্যিকারের ব্যবসা-বাণিজ্য। এই ব্যবসা-বাণিজ্য

বস্তুতঃ বিনিময় ব্যবস্থার, এক সামগ্রীর বিনিময়ে আর এক সামগ্রী। শিগগিরই এই বিনিময় ব্যবস্থায় অনেক অমুরিধা দেখা দিল। মানুষ ভাবতে লাগল, ভারী ভারী জিনিষের আদান প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানোর পরিবর্তে, অল্পকোন উপায় অবলম্বন করা যায় কিনা। এই ভাবনা চিন্তার ফলে এক নতুন উপায় বার হল। সেই উপায়টি হল জিনিষপত্র কেনা বা বেচা হবে মূল্যবান ধাতুপিণ্ডের বিনিময়ে। আর সেই ধাতুটি হল রূপা (সোনা তখনও প্রচলিত হয় নি) এটিই হল বর্তমান যুগের প্রচলিত মুদ্রার সূচনা। ছাপ-মারা মুদ্রা অবশ্য এ যুগে প্রচলিত হয় নি; সেটি হয়েছিল পরবর্তী যুগে (খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর)

এইভাবে দেশ বিদেশে যখন ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশ জাঁকিয়ে উঠল। তখন ব্যবসায়ীরা লক্ষ্য করলেন বিনিময় দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ সর্বজন স্বীকৃত হওয়া উচিত আর বিনিময়ের মাধ্যমে যে রূপা সেটাও খাঁটি হওয়া দরকার; নইলে ব্যবসায় লাভ লোকসান কিছুই বোঝা যাবে না। এই চিন্তার ফলে একটা আদর্শ ওজন ও পরিমাপ ঠিক হল; আর রূপাটা খাঁটি কিনা তারও পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। রূপা খাঁটি না হলে বিনিময়ের সময় তার মূল্য কমে যাবে। এর আগে এক নৌকা পণ্যের বিনিময়ে আর এক সমপরিমাণ নৌকার জিনিসের বিনিময় হত; ফলে ভারি তামা ও টিনের পরিবর্তে পেত হাক্কা খাদ্যসামগ্রী। কাছের এলাকা থেকে জিনিসপত্র আনতে দূর এলাকা থেকে জিনিস আনার চেয়ে খরচ কম পড়ে এটাও মানুষ প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাই এখন তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশ কতদিনের পথ তাই মেপে দূরত্ব ঠিক করল এবং এই দূরত্ব অনুসারে পণ্যের দাম ঠিক করল। ভূগোল ও খগোল বিষয়ে কিছু কিছু প্রাথমিক জ্ঞান এই যুগেই অর্জিত হল।

কোন দেশের পণ্যসামগ্রী এবং কার সে পণ্য সামগ্রী তা মনে রাখার জন্যে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন তৈরি হল। এই চিহ্ন থেকেই উৎপত্তি হল শিলমোহরের। কিন্তু এতেও বড় মাপের ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো সম্ভব

নয়। কোথায় কত জিনিস বিক্রি হল আর কত কেনা হল, সে সব মনে করে রাখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। মানুষ এখন চাইল এমন একটা জিনিস বার করতে বার ফলে এইসব হিসেব নিকেশ চিরদিনের জন্যে নিভুলভাবে মানুষের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। এই চেষ্টার ফলে ধ্বনিনির্দেশক বর্ণমালার (phonetic alphabet) সৃষ্টি হল। মেসোপটোমিয়ায় এই লিপি হল কীলকাকারে (cuneiform) এর ফলে উৎপত্তি হল কীলকলিপি (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৮০০০ বৎসর)। এই লিপিগুলো কাঁচা মাটিতে খোদাই করে রোঁদে শুকিয়ে ও পরে পুড়িয়ে নেওয়া হত। মিশরে এই লিপি লেখা হত ছবির আকারে। তার নাম হল হাইলোগ্রাফিক। এর অনেক পরে প্যাপিরাসের পাতায় ও তালপাতায় (বর্ণমালা সৃষ্টি হলে) তা লেখা হতে লাগল। আর বর্ণমালা আবিষ্কারের ফলে লেখাপড়া শেখার প্রচলন হল।

এই তাত্র-ব্রোঞ্জ-যুগেই একে একে দেখা দিল খনিখনক, ধাতু পরিষ্কারক, ব্যবসায়ী, পর্যটক, নাবিক, জাহাজচালক প্রভৃতি নিছক প্রয়োজনের তাগিদে। তারপর দূর দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাতে; বিভিন্ন নদী সমুদ্রপথে গমনাগমনের সুবিধে অসুবিধে জানবার জন্যে, তিথি নক্ষত্র দেখে জোয়ার ভাঁটার হদিস পাবার জন্যে, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোলতত্ত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন হল। এর পর সমাজে স্থিতির ভাব আনবার জন্যে প্রয়োজন হল রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির। কুস্তকার, তন্তুবায় এর আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে এ যুগের লোক পরিচিত হলেও, এই দুই ধাতু মূল্যবান হওয়ায়, গ্রামে ও প্রত্যন্ত প্রদেশের সাধারণ লোক এইসব ধাতু ব্যবহারের সুযোগ পেল না; তাই তাদের সেই পুরনো নবপ্রস্তরযুগের জীবন যাপন করতে হতে লাগল। তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র বা চাষবাসের যন্ত্রপাতি পাওয়া তাদের পক্ষে দুরূহ হওয়ায় পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালাতে লাগল। এইভাবে সেই যুগেই প্রলিতেলিয়েত ও বুর্জোয়া সমাজের দেখা মিলেছিল।

এইভাবে সব দিক দিয়ে আলোচনা করে বলা চলে,

তাত্রয়োঃ-যুগেই মোটামুটিভাবে বর্তমান সভ্যযুগের প্রায় সমস্ত চিহ্নগুলো দেখা গিয়েছিল ; কাজেই এ যুগের অবদানকে অবহেলা করা চলে না।

তারপর আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ পূঃ বর্তমান আর্মেনিয়ার কাছাকাছি লোহা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হল, তখন আরম্ভ হল লৌহযুগ এবং সেইসঙ্গে মানুষের জীবনধারা এক নতুন পথে চলতে আরম্ভ করল। লৌহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র লৌহযুগ আরম্ভ হয় নি—যে যে দেশ লোহার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তারাই পেয়েছিল এই নতুন যুগের আশীর্বাদ। এশিয়ার মধ্যে চীন ও ভারতবর্ষ এই আশীর্বাদে সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়েছিল। পশ্চাৎপদ দেশগুলো লোহার সংস্পর্শে অনেক পরে এসেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইর-ইরোরন্ট (Yir Yoront)-নামে অস্ট্রেলিয়ার এক আদিম জাতি লোহার ব্যবহার জানত না। মাত্র সেদিন (১৯১৫ সালে) খ্রীষ্টান মিশনারিরা এদের মধ্যে লোহার কোদাল কুড়ুল, কাস্তে কাটারি প্রভৃতি চালন করেন। এতাবৎ তারা কোনরকম ধাতুদ্রব্যের সঙ্গে

পরিচিত ছিল না। কোদাল কুড়ুল প্রভৃতি তাদের যা ছিল, সবই ছিল পাথরের তৈরি ; তাতে হাড়ের বা কাঠের হাতল লগোনো থাকত এবং গাছের ছালের দড়ি ও আঠা দিয়ে শক্ত করে বসানো হত। এই পাথরও আবার অস্ট্রেলিয়ার যে অংশে তারা বাস করত সেখানে মিলত না। তা আসত বিভিন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে হাত ফের হয়ে ব্যবসায়ের মাধ্যমে।

আজকের যে সভ্যতা তার সত্যিকারের রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লৌহযুগে অঙ্কুরের আকারে। লৌহ-যুগের আশীর্বাদ হল রেল, ফীমার, ট্রাম, বিদ্যুৎ, উড়ো-জাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিজন কত কি! আর তারই ফলে মানুষ করলো চাঁদের ভূমিতে পদ চারণা! এরপরই আরম্ভ হবে মানুষের গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাত্রা। আবার লৌহযুগের পরিণতি হল পারমাণবিক যুগ—সে যুগ এনে উপস্থিত করল মহাকাশ-যুগ। সভ্যতার এই যে অকল্পনীয় অগ্রগতি (অ্যাপলো-সমুদ্র-অর্থভট্টের অভিযান) তা তাত্রযুগের মানুষের পক্ষে কল্পনা করা ছিল অবাস্তব স্বপ্নচারিতা।

আলো চাই, আলো

শান্তীল দাশ

কবে সেই গুহার ভিতরে
আলোকের তৃষ্ণা জেগেছিল
মানুষের মনে ; সেই তৃষ্ণা
আজো তো মেটেনি।
আজো সেই তৃষ্ণা বুকে নিয়ে
চলেছে মানুষঃ
আলো চাই, আলো।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে, অজস্র আলোক ধারা
ঢেলে দেয় পৃথিবীর বুকে।
তবু সে আলোয় কই কমনাতো মনের আঁধার।
এখনো সেখানে কত কালো-কালো মেঘ—
অঘটন ঘটে কত সেই অন্ধকারে।
সমস্ত আলোক যেন নিভে যায় পৃথিবীর
একটি নিমেষেঃ
অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।
আলোর তপস্যা চলে তাই দিকে দিকেঃ
সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দেয় পূবের আকাশে

সেই আলো তিমির বিনাশী ;
মনে হয়, বুঝি কেটে গেল সব গহন আঁধার—
এবার আলোর মেলা এদিকে ওদিকে,
এর মুখে, ওর মুখে ; উদরে, অধ, উত্তরে দক্ষিণে,
তৃণশ্রেণী, ধূলি কণিকায়—
সর্বত্র, সর্বত্র সেই আলোকের প্রসন্ন বর্ষণ।

তবু সেই অন্ধকার ঘোচে না, ঘোচে না।
মনের গোপন কোণে
কোথায় লুকিয়ে থাকে—চিরজীবী যেন।
মৃত্যু নেই তার।
যখনই সুযোগ মেলে, দেখা দেয় ; সমস্ত আলোক
নিমেষে নিঃশেষ করে ঘন অন্ধকারে
ঢেকে দেয় চারিধার।
লক্ষ কণ্ঠে আর্তনাদ ওঠে চারিদিকে ;
আলো চাই, আলো।

বসুমতী

(পূর্বানুভূতি)

অজিত দাস

॥ ৪ ॥

প্রকৃতপক্ষে সংকট শুরু হইল কন্যা বসুমতীর। সে তাহার হৃদয় মন্দিরে যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এখন তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। সেই শূণ্য বেদীতে এমন একজনকে দেবতারূপে বরণ করিতে হইবে, যাহাকে সে একদিন তাহার দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই। একদিনের প্রত্যাখ্যানকেই আজ নতমস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। কার্তিক প্রামাণিকের মার প্রস্তাবের ফলে এইরূপ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হইল। নিঃসন্দেহে তাহার জীবনে ইহা একটি গুরুতর সংকট।

হরিহর বসাক ও তাহার স্ত্রীর সম্মুখে একটি নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

সতাই, কৃত্তিবাস, কাহাকেও না জানাইয়া, গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তাহার একেবারেই সর্বনাশের মুখে পড়িয়াছিল। আর কোন নূতন পথ খুজিয়া পাইতেছিল না।

তাহারা আরও বিপন্ন বোধ করিতেছিল কার্তিকের দিকে তাকাইয়া। কার্তিকও বেকার হইল। তাহারও কাজ চলিয়া গেল। কিন্তু সে ভয় পাইল না। সে কেমন কাজ খুঁজিয়া বাহির করিল। কেমন আয় উন্নতি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে দোকান ঘর খুলিয়া বসিল। কার্তিকের মা নিজের আসিয়া কথা চাহিয়াছিল। তখন যদি তাহার সম্মত হইত এতোদিন কবে মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত। তাহা হইলে তাহাদের মেয়ের কপালে কতো সুখ আসিত। কিন্তু তাহারা ভুল করিয়া বসিল। তাহারা কার্তিককে ছাড়িয়া কৃত্তিবাসকে ধরিল। কৃত্তিবাসের কি দেখিয়াছিল? শহরে সে ভদ্রলোকদের সহিত ওঠাবসা করে, লেখাপড়া করে, সকলে তাহাকে মান্য করে। তাই ছেলেটি ভালো বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে আচ্ছা জব্দ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এইসব চিন্তাকরিয়া হরিহর বসাক ও তার স্ত্রী লজ্জায়,

ক্ষোভে, দুঃখে হতাশায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। বসুমতীও মরমে মরিয়া ছিল।

তাহার প্রেম এই ভাবে রাধার বিরহে পরিণত হইবে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সেই বিরহ-জ্বালা বুকে লইয়া সে দিন যাপন করিতে ছিল। সে ভালবাসিয়াছিল, সে মুখ ফুটিয়া বলিয়া বসিয়াছিল সে কৃত্তিবাসকে বিবাহ করিবে। সকলের কাছেই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। এখন সকলে হাসিতেছে। নিশ্চয়ই হাসিতেছে। কি লজ্জার কথা! কলঙ্কের কথা! তাহার এই জীবনের কোন পরিণতি ঘটিবে! এই জীবনে আর কখনও কি সুদিন আসিবে? তাহা কি সম্ভব? বসুমতীর মনে আশার কোন আলোই ছিল না। বন্দাবনে বসিয়া রাধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় বসিয়া মনের সুখে রাজত্ব করিয়াছিল। রুক্মিণী বিবাহ করিয়া রাধাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়াছিল।

কৃত্তিবাসও সুখের সন্ধানে রাজা হইবার জন্ম চলিয়া গিয়াছে। রাজা হইবে, কোন রুক্মিণীকে বিবাহ করিবে, একবারও ভাবিবে না তাহাকে ভালোবাসিয়া বসুমতী মেয়েটি কলঙ্কিত হইয়াছে, জীবনের সর্বনাশ করিয়াছে, সে জীবনে কতো কষ্ট পাইতেছে। বসুমতী মরিল কি বাঁচিল সে কথা একবারও ভাবিবে না।

এই সময় কার্তিকের মার প্রস্তাব পরিস্থিতিকে ঘুরাইয়া দিল। নূতন ভাবনায় হরিহর বসাকের পরিবার ভাবিত হইয়া উঠিল। প্রস্তাব যখন কার্তিকের মার নিকট হইতে আসিয়াছে তখন জটিলতা অনেক কমিয়াছে।

হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিল, আর কোন কথায় কাজ নেই। বলে দিই, ইয়া মেয়ে দেব।

হরিহর বসাক বলিল, কিন্তু আবার আমাদের মেয়ে চাইল কেন?

হরিহর বসাকের স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার মেয়ে রাজকণ্ঠে বলে।

হরিহর বসাক বলিল, সে কথা নয়। একবার অমন করে মুখপুড়ালাম। সেটা অপমানতো বটেই। ছেলের বাড়ি এমন অপমান ভোগ করল। তারপর আবার সেই মেয়েকেই নেব বলছে। ছেলের এখন আয় উন্নতিও অনেক।

হরিহর বসাকের স্ত্রী প্রথমে বলিল, ওরা লোক ভালো তাই আবার এলো। অপমানকে গায়ে মাখল না। তোমার মতো ওদের মনে অতো পাক নেই।

হরিহরের স্ত্রী তাহার পর বলিল, ওই ঘরে, ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে লেখা আছে। অগুতানে হবে কেন? ভাগ্য কেউ কারও নিতে পারে না। যা কপালে আছে তা হবেই। তোমার মেয়ের কপালে সুখ আছে তাই অমন হোল।

হরিহর বসাক বলিল, হ্যাঁ, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে? আমি বরাবরই বলি, মেয়ে সুলক্ষণা। ওর কপালে অনেক সুখ। যেখানে দুঃখ সেখানে মেয়ে যাবে কেন?

কান্তিকের মার প্রস্তাবে হরিহর বসাক ও তাহার স্ত্রী সম্মত হইয়া গেল।

কিন্তু কথা বসুমতী তখনও মনস্থির করিতে পারে নাই। তাহার অনেক দ্বিধা। কি করিয়া সে কান্তিক প্রামাণিককে স্বামীরূপে বরণ করিবে? কেমন করিয়া তাহাকে তাহার প্রিয়পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিবে; যাহার প্রতি প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই, যাহাকে একদিন সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সেই পুরুষকে সে কেমন করিয়া দেহ মন সমর্পণ করিবে? কেমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইবে, তাহার দিকে তাকাইয়া কেমন করিয়া সে পরম প্রিয় ভাবে হাসিয়া উঠিবে? কেমন করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটাইবে? তাহার সংসার আগলাইতে হইবে, প্রতিদিন তাহার সম্মুখে ভাতের থালা জাগাইয়া দিতে হইবে, তাহার পরিচর্যা করিতে হইবে, তাহার সুখ দুঃখ রুচি, রসবোধকে ভালোবাসিতে হইবে, তাহার সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, সেই সন্তানকে লালন করিতে

হইবে, জীবনের মতো তাহার ছায়া হইয়া যাইতে হইবে। সে হাসিবে, হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিবে, কৃতিবাস ভালো না আমি ভালো? কৃতিবাস কোথায় গেল? কৃতিবাস পালিয়ে গেল, তোমাকে সঙ্গে নিল না? সেইতো আমার কাছেই আসতে হোল, আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়তে হোল। আমার ভাতই খেতে হোল। না, না, না।

বসুমতী আর ভাবিতে পারে না। বসুমতী ওই কান্তিককে বিবাহ করিবে না। বসুমতী সারা জীবনেও বিবাহ করিবে না। বসুমতীর জীবন ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার জীবনে আর কোন বাসনা নাই। তাহার জীবন এখন বৃন্দাবনের শ্রীরাধার তুল্য। কাঁদিয়াই এ জীবন কাটাইয়া দিবে। বসুমতী মাকে বলিল যে সে বিবাহ করিবে না।

হরিহর বসাকের স্ত্রী মেয়ের কথা শুনিয়া জলিয়া উঠিল। বলিল, ওখানে বিয়ে করবে না তো ছেলে পাব কোথায়? একটা ওই করে পালাল। লোক জানাজানির শেষ নেই। এখন তোমাকে কে বিয়ে করতে আসবে?

বসুমতী বলিল, আমার বিয়ে দিতে হবে না। আমি বিয়ে করব না।

মেয়ের কথা শুনিয়া হরিহর বসাকের স্ত্রী আরও ক্ষিপ্ত হইল। বলিল, আদিখ্যেতা। গালটিপলে দুধ বেরোয়, সেই মেয়ের আবার কথা। ছোট মুখে বড় বড় কথা বলিসনে বসুমতী। তোর কণ্ঠোটুকু বুদ্ধি। তুই কি বুঝিস রে?

তাহার পর নারীজীবনের বিপদসমূহকে হরিহর বসাকের স্ত্রী মেয়ের সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া শোনাইতে লাগিল।

হঁস নেই, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস। বিয়ে করবিনে কি করবি? খুবড়ো হয়ে থাকবি তখন খাওয়াবে কে? বাপ কি চিরকাল থাকবে? ছেলে হলে আয় করে বাপকে তার বুড়ো বয়সে খাওয়ায়। বাপের বল ভরসা হয়। মেয়ে কি করবে? মেয়েকে জীবন ভর বসে বসে খাওয়াতে হবে? তাছাড়া মেয়ে মানুষ। ছেলে বল ভরসা। মেয়ে কি? বিপদের জিনিশ, ভয়ের জিনিশ। বিয়ে করবে না কি করবে? পীরিত করে বেড়াবে? হরিহর বসাকের স্ত্রী

ইহার পর মেয়েকে আরও অনেক কঠিন ও অশালীন অশ্রাব্য কথা শোনাইল। তাহার ভিতর দিয়া মেয়ের সম্মুখে একটি সম্ভাবনাময় বিভীষিকার ছবি ফুটাইয়া তুলিল। হরিহর বসাকের স্ত্রী তাহার ভিতর দিয়া বলিতে চাহিল, নারীর জীবনে পুরুষ ভিন্ন গতি নাই, নিরাপত্তা নাই। নারী দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিলেও পুরুষ তাহাকে রেহাই দিবে না। অতি গোপন স্থানে থাকিলেও যাহোক করিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিবে, নিজের প্রয়োজনে লাগাইবে। যতদিন নারী কোন পুরুষের আশ্রয়ে ঠাই না লইবে, ততদিন সমস্ত পুরুষসমাজ তাহাকে উত্যক্ত করিবে, পদে পদে বিপন্ন করিবে, অপমানের চূড়ান্ত করিবে, ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবে। পুরুষের হাত হইতে নারীর পরিজ্ঞান লাভের উপায় নাই। পুরুষের দৃষ্টি হইতে নারীর নিস্তার নাই।

এবং নারীতো পুরুষের জগৎই সৃষ্টি। ভগবান নারীকে পুরুষের জগৎই সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের সঙ্গী না হইলে নারী হইয়া জন্মাইয়া, নারীত্ব লইয়া একাকী দূরে বসিয়া জীবন কাটাইয়া যাইবার কোন সার্থকতা? এই পৃথিবীতে নারীজীবন লইয়া আসিবার তবে কোন প্রয়োজন, কোন উদ্দেশ্য? জীবন ভরিয়া একাকী সে কি করিবে, কোন কাজ করিবে। আজীবন তাহার নারীত্বের বেকারত্ব লইয়া সে কিরূপে কাটাইবে? তাহা কি সম্ভব? কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে? একদিন তাহার স্থলন হইবেই, পতন ঘটবেই। এবং সেই অস্বাভাবিক ভাবে স্থলন-পতনের জালায় সারাজীবন জলিয়া পুড়িয়া মরিবে। তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

সেদিন তাহার কান্নায় কেহ কান পাতিবে না, কেহ তাহাকে ভালবাসিবে না। শুধু ঘৃণা ও লাঞ্ছনা ছাড়া সে আর কিছুই পাইবে না।

হরিহর বসাক মেয়েকে শোনাইয়া বলিতে লাগিল, এই পাত্রই ভালো। মানুষের জীবনে খাওয়া পরার চিন্তাই আগে। রাজার রাণী হওয়া সুখের কারণ সেখানে খাওয়া পরা থাকার কোন ভাবনাই থাকে না। সবচেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে, রাজ বাড়ীতে সোনার খাটে নরম গদীর বিছানায় শোয়, হীরে মাণিকের

গয়না পরে, জেল্লাদার শাড়ী পরে থাকে। রাজরাণীর মতো অতো সুখ আর কেউ পায় না। তাই লোকে রাজরাণীর কথা বলে। আসল হচ্ছে খাওয়া পরার সুখ। সেদিক থেকে কার্তিক খুব উপযুক্ত পাত্র। এইতো আমাদের জীবন। কি করলাম জীবনে। জীবন ভর তাঁত ঠেঙালাম। কিন্তু দু'বেলা পেটের ভাত জুটানই দায়। সখ আছলাম কিছুই পূরণ হোল না। বউ মেয়েকে ভালো শাড়ী কিনে দিতে পারলাম না। গহনা দিতে পারলাম না। শুধু দুটো পেটে খেয়ে কোন রকমে জীবন কাটান। এ আমাদের কুকুর শিয়ালের জীবন। কার্তিক এই তাঁতের কাজ ছেড়ে খুব ভালো কাজ করেছে। বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। সত্যিই ওর বুদ্ধি আছে। এতকালতো সহরে আছে। কেউ তো পারল না। কৃতিবাস পালাল। তার অতো বুদ্ধি, অতো লেখালেখি। কিন্তু যেই কাজ গেল এমনি কৈঁচো, এমনি সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায়। ওকে বুদ্ধিমান বলে? কিন্তু কার্তিক? কেমন নিজের পথ দেখে নিল। যেমন কলি তেমনি চলি। এ যুগে মানুষ যে ভাবে বাঁচছে মাথা ভুলে দাঁড়াচ্ছে, দু'পয়সা আয় করে মানুষের মতো দাঁড়াচ্ছে—যা যুগের হাওয়া ঠিক সেটা বুঝে ফেলল, আর সেই পথে নেমে পড়ল। এইতো বুদ্ধির খেলা।

বাবার কথা শুনিয়া বসুমতী অবাক হইয়া গেল। তাহাদের অভাবের সংসার। খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনটন ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় তাহার ধাক্কা তাহাদের পরিবারে কিরূপে আঘাত হানিয়াছে বসুমতীর তাহা জানা। তাহার ফলে বাবা বিপন্ন হইয়া বাড়িতে আসিয়া চোরাবাজারীদের কিরূপ গালমন্দ করিয়া থাকেন তাহাও বসুমতীর জানা।

চোরাবাজারীরাই সমস্ত নষ্টের মূল।

বাবা বলিয়া থাকেন, আমাদের সর্বনাশ আর ওদের পোষমাস। ওই সব চোরের দল আমাদের হাড় খাবে, মাস খাবে, তারপর আমাদের চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। আমাদের খেয়ে খেয়ে ওরা ফুলবে, ফুলে ঢোল হবে, ঢাক হবে আর ফুটির বাজনা বাজাবে। এ রাজ্য থাকবে না, রসাতলে যাবে। মানুষের এতো সর্বনাশ, ভগবান সহিবে কেন? এতো অত্যাচার মানুষের ওপর।

এ কি দেশ? চোরের দেশ, ডাকাতির দেশ, বাটপাড়ের দেশ।

শুধু বাবা নয়। সমস্ত সমাজই ওই কথা বলে। রাস্তায় কতো মিছিল, কতো বক্তৃতা। মানুষের দুঃখের আর ওদের অভ্যাচারের কতো কথা, সে সব বক্তৃতায় শোনান হয়।

কার্তিক প্রামাণিকতো সেই দলেই যোগ দিয়েছে। সেই চোরের দল। চুরি করিয়া আয় করিতেছে, মানুষ মারিয়া আয় করিতেছে। কিন্তু বাবা এখন অন্য কথা বলিতেছে। এখন সেই কার্তিক প্রামাণিককেই মুখ্যতা করিতেছে। তাহাকেই বুদ্ধিমান বলিতেছে।

বসুমতী অবাক হইল।

হরিহর বসাক সত্যই বিপরীত কথা বলিতেছে। সে একজন সাধারণ শ্রমিক। তাঁত বুনিয়া খায়। এই অনটনের দিনে, তাহার দুঃখ দুর্দশার শেষ নাই। কান্নাকাটি করিয়াও দুঃখের জ্বালা জ্বড়ায় না। কাজেই যাহারা এই ভাবে জীবনকে তিলে তিলে দগ্ধাইয়া মারিতেছে, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ঘৃণা, আক্রোশ দেখাইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। এতোকাল তাহার মুখ হইতে সেই সবই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কার্তিক প্রামাণিকের মা আবার যখন কথা যাচিয়া গেল, কার্তিক যখন আবার পাত্রের ভূমিকায় দাঁড়াইল তখন সে দৃষ্টকারীর সমাজ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কার্তিক তখন তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত যুক্ত হইয়া ভিন্নমূর্তি গ্রহণ করিল। তখন সে বুদ্ধিমান, কৃতি হইয়া গেল। সে জামাই হইবে। তাহার আর্থিক স্থিতি লাভে মেয়েরই মঙ্গল, তাহার উন্নতিতে মেয়ের জীবনই সুখ। যে অর্থ সে লুট করিতেছে সে সবই তাহার স্বার্থের সহিত যুক্ত হইয়া যাইতেছে। তাই হরিহর বসাকের চিন্তা বিপরীত হইয়া গেল। কার্তিক যাহা করিতেছে তাহাই এই যুগের যথার্থ সত্য পথ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহারা মাথা উঁচু করিয়া বাঁচিবার হিম্মত রাখে তাহারা এই পথের পথিক হইয়াছে, কোন না কোন ভাবে ওই পথের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

হরিহর বসাকের এখন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, যদি ওই পথ অসত্য হইত অগ্নায় হইত তাহা হইলে ওই পথ এতোকাল

কবে বন্ধ হইয়া যাইত। দেশে এতো নেতা আছে, জ্ঞানী আছে, গুণী আছে, এতো আদালত আইন আছে, এতো বাঘা বাঘা হাকিম আছে, পুলিশ আছে, থানা আছে, দারোগা আছে, মানুষের পিছনে লাগিয়া তাহাকে পাগল করিয়া দিবার এতো ব্যবস্থা আছে। যদি কার্তিকের কাজ অগ্নায় হইত তাহা হইলে তাহারা কখনই তাহা সহ্য করিত না। তাহার মূল উপাতিত করিয়া জড় মারিয়া দিত। ওই পথ একেবারে মুছিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতো হয় নাই। এবং ওই পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে। দেশের ওই সমুদয় ব্যবস্থাই কোথাও উহাদের সহিত যুক্ত, কোথাও নীরব দর্শক মাত্র। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ, ওই পথ অগ্নায় নহে, অসত্য নহে।

হরিহর বসাক-এর এইরূপ চিন্তাই সাধারণ ভাবে বাড়িতে প্রকাশ পাইতে থাকিল। যেন কন্যাকে বুকাইতেই সে এই সব কথা বলিতে লাগিল। বারংবার সে বলিতে লাগল, কার্তিক সত্যিই বুদ্ধিমান ছেলে। কাজের ছেলে। জীবনে অনেক উন্নতি করবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। ভগবান যা করে ভালোর জগ্গেই করে। মানুষতো সব বোঝেনা। মানুষ ভুলকরে, কিন্তু ভগবান রক্ষা করে। যদি তখন ওই কৃতিবাস-এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতাম? আজ কি হোত? সবনাশ হয়ে যেত। মেয়ের বিয়েও হোত আবার ঘরের মেয়ে ঘরে এসে পড়ত। জাতও যেত পেটও ভরতো না। ভগবান খুব রক্ষা করেছে। আমি জানি মেয়ের কপালে সুখ আছে। মূলক্ষণা মেয়ে। ওর কপালে অনেক সুখ লেখা আছে। নাহলে ওই কার্তিক, ওর এখন সুখের কাল, ওর এখন কিসের অভাব! তার বিয়ে করার মেয়ের অভাব? তবু সে আবার এই মেয়েকেই বিয়ে করতে চাইল। তার মানে কি? মেয়ের কপাল। মেয়েও কপালের জগ্গেই বাঁচল, আবার ওই কপালের জোরেই কার্তিক যেচে বিয়ে করতে চাচ্ছে।

হরিহর বসাকের স্ত্রী বলিতে লাগিল, যত ভাড়াভাড়ি দুই হাত এক হয় তার ব্যবস্থা কর। বলা যায় না, মানুষের মন। দেশে মেয়েরতো অভাব নেই। অমন ছেলের জগ্গে কতো মেয়ের বাপমা হাঁ করে আছে। হয়তো তলায় ওলায় কথাও বলছে।

বাবা মা, অভিভাবক অভিভাবিকা—সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ। সমাজ-মানস লইয়া, সমাজের প্রতিনিধি রূপেই তাহারা যেন নানা যুক্তির বাঁটালী ছেনি হাতুড়ি দ্বারা বসুমতীর মানস মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে উচ্ছেদ করিয়া, বিগ্রহকে ভাঙিয়া চুরিয়া দূরে ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের মনোমত নূতন বিগ্রহকে সেই শূন্য বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিতে অবিরাম চেষ্টা চালাইতে লাগিল।

মন্দিরের কোন শক্তি? মন্দিরের সেবাইতেরই বা কোন শক্তি? সমাজই মন্দির গড়ে, সেবাইত সৃষ্টি করে, সমাজই দেবতার রূপ দেয়, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে, আবার সমাজমানসই তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন রূপ দেয়।

জগৎ সংসারে যুগে যুগে এই ঘটনা কতোকতোরবার ঘটিয়াছে ও ঘটতেছে। কতো মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কতো ঐশ্বর্য আড়ম্বর, তাহাকে ঘিরিয়া কতো উৎসব আনন্দ, ভক্তি প্রদর্শনের ঘটনা। কতো দেবদাসী নৃত্য করিয়াছে। পুরোহিত কতো বিমুগ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে, সমগ্র সমাজ ভক্তি গদগদ চিত্তে আত্মনিমগ্ন হইয়া তাহার পদতলে সাফল্যে প্রণিপাত হইয়াছে। তাহার পর কালের প্রবাহে সেই সমাজমানস পরিবর্তিত হইলে, অমনি মন্দিরের আলো নিভিয়া গেল, নৃত্য থামিয়া গেল, মন্ত্র বর্জিত হইল এবং সেই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ভাঙিয়া বেদী হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল।

তাহার পর কোথাও সেই শূন্য বেদীতে নূতন বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া পূজা পাইতে থাকিল, কোথাও বেদী, মন্দির সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া অবজ্ঞায় অবহেলায় ক্রমে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত অরণ্য সঙ্কুল হইয়া গেল। মানুষ তাহার কথা ভুলিয়া গেল।

ইহাই তো মানবসমাজ সৃষ্ট মন্দির ও তাহার বিগ্রহের ইতিহাস। মন্দির কি করিতে পারে, সেবাইত কি করিতে পারে? সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার কোথায়?

বসুমতী কি করিতে পারে? সে বাবা মার ঘরে সন্তান হইয়া জন্মিয়াছে, সে পুরুষপ্রধান সমাজে নারী হইয়া জন্মিয়াছে, সে এই দেশে দরিদ্র অসহায় পরিবারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার শুধু ছায়াবৎ আচরণ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। তাহাই হইল।

কার্তিক প্রামাণিক একদিন খুব ঘটনা করিয়া বসুমতীকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। বসুমতী বধূবেশে কার্তিক প্রামাণিকের হাত ধরিয়া, যাহাকে একদিন প্রত্যাখান করিয়াছিল তাহাকেই ছায়াৰূপে অনুসরণ করিয়া স্বামীগৃহে প্রবেশ করিল। অভিভাবক ও সমাজ শংখ বাজাইয়া, হলুধ্বনি দিয়া তাহার এই আচরণকে অভিনন্দন জানাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। সব কিছুই বেশ সুস্বচ্ছলভাবে ঘটয়া গেল।

হরিহর বসাক ও তাহার স্ত্রী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কার্তিক প্রামাণিকের এখন সাফল্যের কাল। সব কিছুতেই তাহার সফলতা। সে প্রাণ ভরিয়া হাসিল। বসুমতীর এখন সকলকে মানাইয়া চলা কাজ। সে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

॥ ৫ ॥

কৃষ্ণবাস দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভাগ্যের সন্ধানে সে দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথা ব্যস্ত সহরজীবন আর মনে রাখিতে পারে নাই। বিশ্বস্তির কোন অতলে তলাইয়া গিয়াছে। তাহার পর আরও কতো নূতন নূতন ঘটনা আসিয়াছে এবং আসিতেছে, তাহার পর তাহারাও অতীত হইয়া যাইতেছে। নূতন ঘটনাস্রোত আসিয়া তাহার স্থান দখল করিতেছে। মানুষ সেই বর্তমানের সহিত সঙ্গ করিয়া তাহার তালে তাল মিলাইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিয়া চলিয়াছে। অতীত ভবিষ্যৎ কোনদিকেই তাহার দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ বা সাধ্য নাই। সে আজ বর্তমান সর্বস্ব, বর্তমানকে সামলাইতেই সে ব্যস্ত।

সেই সময় একদিন সেই অতীতের কৃষ্ণবাস আবার এই সহরের বর্তমান জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার দেশত্যাগের পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তখন। সেদিনের সেই আকাল ইয়তো তখন আর নাই। কিন্তু সমাজজীবন আরও অনেক জটিল হইয়াছে। মানুষের অভাব অনটন দারিদ্র্য অনেক বাড়িয়াছে। দেশে শোষণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই

সঙ্গে সাধারণ বঞ্চিত মানুষের রুদ্ধ রোষ রাজনৈতিক পথে জিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে।

সহরজীবনে মানুষের মনে তখন শান্তি সুখ স্বস্তির বড়ই অভাব।

শান্তি সুখ স্বস্তি কৃতিবাসের জীবনেও নাই।

ভাগ্যের সন্ধানে সে দেশ ছাড়িয়াছিল। তাহার পর এই তিন বৎসর ধরিয়া ভাগ্যের সন্ধানে সে কোথায় না ঘুরিয়াছে। কার দরজায় না দাঁড়াইয়াছে? বাঙলার ঘরে-ঘরে দ্বারে দ্বারে সে গিয়াছে, বাঙলার বাহিরে যে নূতন স্বাধীন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানেও মানুষের দ্বারে দ্বারে সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কাজ পায় নাই তাহা নহে। করিয়াছেও। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারে নাই। কোথাও সে স্থির হইয়া বসিতে পারে নাই।

দেশে কি কোথাও স্থিরতা আছে যে সে স্থির হইয়া বসিবে? সে তো এই তিন বৎসর ধরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কোথাও যেন সুস্থতা বলিতে কিছু নাই। মানুষ সর্বত্রই অস্থির চঞ্চল দিশাহারা। মানুষ মানুষকে ভালোবাসিবে কি করিয়া, কোন সাহসে?

সে যদি নিজেই নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগিতে থাকে তবে অন্তর্গত সে কি রূপে নিরাপত্তা দান করিবে?

কৃতিবাস তাই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দেশ জুড়িয়া মানুষের মনে শুধু অবিস্থাস, ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ। স্থূল স্বার্থ বৃদ্ধির দাসরূপে মানুষ সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা ইত্যাদির অনুগামী হইয়া নিজের সামাজিক বোধকে নিরাপত্তার মূলধনকে প্রতিনিয়ত হনন করিতেছে এবং সর্বস্বান্ত হইয়া হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে, অস্থির চঞ্চল হইয়া উন্নাদের মতো আচরণ করিতেছে। সেখানে কৃতিবাস কোথায় শান্তি স্বস্তি লাভ করিবে, কোথায় স্থির হইয়া বসিয়া আত্মীয় পরিজন প্রাপ্তির সুখ অনুভব করিবে?

সে শুধু হুগো হইয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের পরিত্যক্ত পরিবেশ, পরিচিত জনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সেখানেই মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য মনস্থির করিয়া আবার এই শহরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অচনা

হেমবরণী মুখোপাধ্যায়

সাক্ষ্য রবির অরুণ রাগে

বিশ্ব যখন পড়বে ঢ'লে,

ঝরা ফুলের পাতে পাতে

আসবে তুমি চরণফেলে।

অন্ত রাগের রং লালিমায়

রাংবে তোমার আননখানি,

দেয় দোলা মোর মরমেতে

শ্যামল ধরার বন ও বাণী।

বাঁশীর তামে গায় পাণিরা

সাঁঝের বেলার মিলন গীতি,

অজানা কোন ভুবন জয়ীর

আকুল করা প্রেমের স্মৃতি।

রাখি সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে

পূজার আসন পেতে হিয়ায়,

ঘুঁই পারিজাত কুন্দ কলি

হাসনা-হানা বরণ-ডালায়।

অধ্যায়তি নিবেদিয়া

নমিব ঐ চরণ তলে,

কুসুম ঝরা সে পথ বেয়ে

আসবে যখন সন্ধ্যাকালে।

মুক্তি তীর্থ

শান্তনু দে সরকার

সন্তোষ হালদার ছাত্রজীবনে বিশেষ এক রাজনৈতিক
ফলের সংস্পর্শে এসে কার্ল মার্কসের ভক্ত হয়ে পড়েছিল।
ধর্মের আফিনের প্রভাবে সারা দেশটাকে অচৈতন্য করে
রেখে একচেটে শোষণের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার ওপরে
সে ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা দিয়ে পথে ঘাটে লোক জড়ো
করতে পারতো।

ঠাঁৎ কোনো একটা সওদাগরী অফিসে চাকরী
পাওয়ার পর তার এই উত্তামবেগ অত্যাধিকার বইতে
শুরু করলো। জনসংগঠনে ছিল ওর অদ্ভুত ক্ষমতা।
লোক ভোলাতে ওর জুড়িদার কমই ছিল। চাকরী
করতে গিয়েও শ্রমিকদরদী মজদুরনেতা রূপে খ্যাতি
লাভ করলো।

চাকরী করে সন্তোষ ভালোই মাইনে পেতো।
শ্রমিককল্যাণ আর শোষণমুক্তির পতাকা হাতে নিয়েই
সে ফুলের মালা গলায় দিয়ে প্রজাপতির কবলে পড়লো।
প্রকৃতির নিয়মে তিন বছরে যখন ও দুটি সন্তানের পিতা,
ক্রমাগত কর্মে অবহেলার অপরাধে ওর চাকরী গেল।
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সন্তোষ কর্মে পুনর্বহাল হ'তে
পারলো না।

রাজনীতি বা শ্রমনীতিবিদের মত বিচক্ষণতা ওর
ছিল না। সংসার প্রতিপালন করতে ও চোখে অন্ধকার
দেখলো; জী আর সন্তানদের কষ্ট ওর দিব্যচক্ষু খুলে
দিল। ও দেখতে পেল দেবতাকে সামনে রেখে ধর্মের
মাদক পান করিয়ে যে ভণ্ডামী আবহমান কাল চলে
আসছিল, সে জন-কল্যাণের মুখোশ পরে নূতনরূপ
নিিয়েছে।

জী আর অসহায় দুটো শিশু মুখ ওকে কাতর করে
তুললো। জন-দরদের নেশা ওর ছুটে গেল। জীবিকা
অর্জনের উপযুক্ত কোনো পথ না পেয়ে এক বুড়ো দাছুর
পরামর্শে নতুন ধরণের পেশা গ্রহণ করলো।

এখন ও বলে,—ফলের রস কগী আর শিশুদের
প্রাণশক্তি বাড়ায়, তা দিয়ে মদ তৈরী করলে ফলের
কী দোষ? সমস্ত দেবতার মন্দির ভেঙে হাসপাতাল

আর বিশ্ববিদ্যালয় করলে মানুষকে কি শোষণমুক্ত
করা যাবে? মুক্তির রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
হাসপাতালে সম্প্রসারিত হয়ে কতখানি ভালো
করেছে ছাত্র আর আতুরের আজতো সকলেই স্ব চোখে
দেখতে পাচ্ছে।

আজ আর সন্তোষ হালদার দেবতা-বিদ্বেষী নয়।
জী আর পুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে তীর্থ-যাত্রণী বিধবা
ও বৃদ্ধাদের পর্যটন করানোর ব্যবসা চালু করেছে। এক
কালের বক্তৃতার কৌশল আজ তীর্থের মহিমা কীর্তনে
সমান তালে মানুষকে প্রভাবিত করার কাজে
লাগিয়েছে। বছরে চার কিংবা পাঁচবার করে ভারতের
বিভিন্ন স্থানে তীর্থ যাত্রায় বেরোয়, অল্প ব্যয়ে মধ্যবিত্ত,
নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ীর সধবা ও বিধবা গিন্নীদের, দাসী
রাধুনীজীবিনী জীলোকদের যত্নের সঙ্গে তীর্থ করিয়ে
আনে। মাথাপেছু পনেরো থেকে কুড়ি টাকা ওর আয়
হয়, কোনো রকমে সংসার চলে।

সামনে অক্ষয় তৃতীয়া; ও কেদারনাথ বজ্রীনারায়ণের
পথে যাবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিল। বাড়ীর রকে বসে
জনকয়েক পেনশনার বৃদ্ধ ও বিধবাদের সামনে হিমালয়ের
দুর্গম পথ অতিক্রম করে মহাতীর্থের মহিমা ও নয়না-
ভিরাম দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করছিল।

পথ দিয়ে ফিরছিল মেয়েদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে
কমলা বালিকা বিড়ালয়ের একুটি গিরিবালা দাসী।
ওর বয়েস পঞ্চাশের উর্দ্ধে। তীর্থ আর দেবমহিমা
কীর্তনের আকর্ষণে ও দাঁড়িয়ে পড়লো। কিংবদন্তীকে
ভিত্তি করে এই তীর্থপথের অসংখ্যক আলৌকিক গল্প
প্রচলিত আছে। বারবার ওখানে গিয়ে সন্তোষ
সেগুলো কণ্ঠস্থ করেছিল। কবে কোন্ সাধু গভীর
তুষারপাতে দেবতার মহিমা কেমন করে প্রত্যক্ষ
করেছিলেন, কোন খঞ্জ-সন্ন্যাসী, অন্ধভক্ত, পঙ্ক পর্যটক
সমস্ত পথদুর্গমতাকে পরাভূত করে দেবতার আশীর্বাদ
পেয়েছিলেন।

গল্প শেষ হলে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা

বাবাঠাকুর, বজ্রীনারায়ণ যেতে কত খরচ পড়বে ?

সন্তোষ উৎসাহিত হয়ে বললে,—তা খরচ একটু পড়বে মেয়ে শুধু বজ্রীনারায়ণ তো নয়, ওপথে অনেক তীর্থ আছে; হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, কেশবনাথ, বজ্রীনারায়ণ। ইচ্ছে করলে ফেরার পথে বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও হতে পারে। আসল কথা তো পয়সা নয় মেয়ে,—মন। কপালে না লেখা থাকলে অনেক পয়সা থাকলেও দেখানে মাহুষ যেতে পারবে না।

মোট কতটাকা খরচ, যেতে হলে কুড়ি দিন আগে গাড়ী ভাড়া বাবদ কতটাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে জেনে নিয়ে গিরিবালা বাড়ী চলে গেল। বিকালে সহকর্মী নন্দরানীকে এই তীর্থ-ভ্রমণের কথা শোনালো। নন্দরানীও খুব আগ্রহ প্রকাশ করলো। দুজনে মিলে পরামর্শ করে সন্তোষ হালদারের সঙ্গে দেখা করে গাড়ী ভাড়ার টাকা জমা দিয়ে গেল।

তীর্থের দুর্গমতা, পবিত্রতা, দেবতার মহাসম্মতি, পার্বত্য পথের শোভা ওকে যুগপৎ উৎগ্রীব ও চঞ্চল করে তুললো। ও ভাবতে লাগলো, ওর মত মহাপাপিনীর অমন পবিত্র স্থানে যাবার অধিকার আছে কী না? মনের অগোচর পাপ নেই। অতীতের ভুলে যাওয়া দিনগুলো ওর সায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

চাষীর মেয়ে গিরিবালা, বারোবছর বয়সে বিয়ে হয়ে স্বস্তুর বাড়ী গিয়েছিল। বিয়ের পর বাপের বাড়ী ফিরে এসে আর ওকে সেখানে যেতে হয়নি। দু-মাস পরেই বৈধব্যের খবর এসে পৌঁছেছিল। বৈধব্যের মর্ম না বেঝায় বাড়ীশুদ্ধলোক কাদলেও গিরিবালা বিচলিত হয়নি।

তখন দেশে গ্রামে বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় নি। কালীঘাটের সরকার গিন্নী রাস দেখতে বড় বোনের বাড়ী গেলে, চাষী বোঁ কেঁদে কেটে ওর মেয়েকে ওর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। গ্রামের মেয়ে গিরিবালা চোদ্দ বছর বয়সে শহরে এসেছিল।

রান্না আর বাসনধোয়া ছাড়া ওকে ঘরে বাইরের

যাবতীয় কাজ করতে হ'ত। বাজার দোকান করার সমস্ত দায়িত্ব গিন্নী ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছিল।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মানুষের আকর্ষণের বস্তু হয়ে পড়লো। ময়রার দোকানের অমূল্য ওর দিকে আদেধলের মত চেয়ে থাকতো, হেসে গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করতো। খাবার কিনতে গেলে বেশি খাবার দিতো, ভাঙানির পয়সাও বেশি ফেরাও দিতো। বাড়তি খাবার ও পয়সা ও ফিরিয়ে দিতে গেলে বলতো, ওগুলো ভুল করে তোমার কাছে গেছে, তুমি নিয়ে যাও। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।

এমনি করে সামান্য দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে বৃহত্তর লেনদেন ঘটে গেল। অনাদ্যাতা বনফুলকে পোকায় কাটলো। গিরিবালা মনিষবাড়ী ছেড়ে অমূল্যর সঙ্গে বস্তিতে এসে ঘর বাঁধলো। দু এক মাস ঘরের বোঁয়ের মত থাকার পর অর্থ কষ্ট দেখা দিল, ও আবার লোকের বাড়ী ঠিকে বিয়ের কাজ করতে বেরলো।

অমূল্যর বাড়ী মেদিনীপুর। ও দু-এক মাস অন্তর বাপ-মাকে দেখতে যাবার অছিলায় দেশে যেতো, চার পাচ দিন পরে ফিরে আসতো। বছর কয়েক যাবার পর গিরিবালা দোকানের মালিকের মুখে শুনলো, অমূল্যর দেশে বোঁ-ছেলে আছে।

অমূল্যর বন্ধনায় ওর মাথা আগুন হয়ে উঠলো। অভিমানে রান্না খাওয়া বন্ধ করে সারাদিন কেঁদে কাটলো। অমূল্য ফিরে এলে রাগে দুঃখে মুখে যা এলো তাই বলে ত্যাগিয়ে দিতে চাইলো। অমূল্য কিন্তু গেল না, অনেক মিনতি করে, হাতে পায়ে ধরে গিরি বালার রাগ জল করে দিলে।

ভোরবেলা কাজ করতে যাবে বলে ঘুম থেকে উঠে গিরিবালা অবাক হয়ে দেখলে ওর যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে অমূল্য রাত্রে পালিয়ে গেছে। স্বামীর মৃত্যুর মত এ ঘটনায়ও গিরিবালায় চোখে জল এলো না। তখন ও অবুঝ ছিল, এখন বুঝলে দেবতা বলে কিছু নেই, মানুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর জীব সংসারে আর দুটো নেই! সরকার গিন্নীর বাড়ী ছেড়ে ও অস্থায় করেছে।

এ সময় সরকারদের অবস্থা পড়ার মুখে। বাড়ীতে আর রাত দিনের লোক ছিল না, ঠিকে লোক দাণ্ডার মা ছুটি নিয়ে দেশে যাবে। গিরিবালাকে বদলি দিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো গিন্নীকে। বড় মেয়ে রাণী প্রতিবাদ জানালো মায়ের কাছে। গিরিবার মত মন্দ মেয়েকে লোক মা যেন আর বাড়ীতে না ঢুকতে দেয়। মেয়ের কথায় দয়াবতী গিন্নী জবাব দিলেন, মন্দ কাজের জন্তে কোথায় আর ভালো লোক পাওয়া যাবে মা? ঝি চাকরাণীর কাজ করতে সতী সাবিত্রী আসবে কেন রাণি। চোরছেঁচোর না হলেই হ'ল। বাড়ীতে উটকো লোক না ঢুকিয়ে জানা লোক রাখা ভালো।

ঠিকেলোক হিসেবে গিরিবালা ওদের বাড়ী পুনঃ বহাল হ'ল। মাইনে ছাড়াও গিন্নী ওকে ছপুর বেলায় খাওয়া দিতো।

এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। ছেলের বিয়ে হ'ল, বোয়ের ছেলে হ'ল, তার অন্তপ্রাশনে ঘটা হ'ল না। খুড়া-অবস্থায় নমো নমো করে গিন্নি নাতির ভাত দিলেন। নিজের গলার হার কেটে নাতিকে এক ভরি দিয়ে হার গড়িয়ে দিলেন।

নাতি দালানময় হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়ায় ওকে দেখলে 'গিগি' করে কাপড়ের অংশ ধরে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করে, ও শিশুকে কোলে তুলে বুকে চেপে ধরে আদর করে।

একদিন সকালবেলা উঠে বৌ ভয়ে ভয়ে বড় ননদকে জানালে, বড়দি, খোকার গলার হার নেই।

এঘর ওঘর বিছানা বালিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হার পাওয়া গেল না। বড় মেয়ে রাণী চিৎকার করে বললে,—হারের কি ডানা গজালো যে উড়ে যাবে? এ গিরির কাজ। ভালো চায় তো হার বার করুক, না হলে পুলিশের হাতে দেবো।

গিরিবালা কলতলায় বাসন ধুচ্ছিল। কথা শুনে কঁদে তাসিয়ে দিলে, দিব্যিগেলে বললে,—শিশু নারায়ণ। ওর হার যে নিয়েছে তার হাতে কুট হবে, চাঞ্চ কানা হয়ে যাবে, মাথায় বজ্রাঘাত পড়বে।

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি এমন কাজ আমি করিনি।

গিন্নী এসে বললেন,—দোহাই গিরি বাস্তব মাজতে মাজতে আর ছেলেকে ছুঁসনি। রাণি, তুই চুপ কর। সর্বশ যেতে বসেছে, সামান্য একভরি সোনার হার নিয়ে আর মাথা গরম করিস নি।

গিরিবালা দেওয়ালে মাথা ঠুকে কঁদে কঁদে বললে, আমার কপালে শেষে এমন অপবাদ লিখেছিলে ভগবান। যে এমন কাজ করেছে তার সর্বনাশ হোক, মরণকালে সে যেন—

গিন্নি ধমক দিয়ে বললেন,—মড়া কান্না থামা গিরি। তোকে তো আমরা দোষ দিই নি। রাসভারী গিন্নীর দাপটে হার চুরি নিয়ে আর কোনো কথা বাড়ীতে ওঠে নি।

এরপর কত বড় বয়ে গেল। গিন্নীর একমাত্র ছেলে বোয়ের যক্ষা হয়েছে শুনে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। বৌ মারা গেল, গিন্নীও গত হলেন। নাতি হারিয়ে গেল। গিরিবালা কমলা বালিকা বিতালয়ের মেয়ে আনার চাকরি পেলো। আরো দশ বছর পার হয়ে গেল।

বিশ বছর ধরে ও প্রায় স্বপ্ন দেশে, চিক্চিকে সোনার হার গলায় একটা শিশু 'গিগি' করে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। গিরিবালা মেয়ে আনতে গিয়ে মায়েদের বলে,—মেয়েদের গায়ে যেন সোনার কিছু না থাকে বৌদি। আমরা মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারি, গয়নার দায়িত্ব নেবো না।

আজ তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে বিশ বছরের হৃৎস্পন্দ হৃচ্চিত্তার পাহাড় হয়ে ওর বুকে চেপে বসলো। ও নন্দ-রাণীকে ডেকে বললে,—বাবা কেদার-বজ্রীনারায়ণ আমাকে দয়া করবে না নন্দ, আমি যাবো না। বাবা-ঠাকুরকে তুই একথা জানিয়ে দিস।

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করলে,—কেন গিরিদিদি? তোমার আবার হ'ল কী? ও জবাব দিলে,—আমার মত মহাপাপীর তীর্থ করবার নেই।

নন্দরাণী বললে,—তোমার একটু বাড়াবাড়ি গিরি-

দিদি। পাপ-অত্যাচার সবাই করে, আর কেউ তা হচ্ছে করে করে না। ভগবান কপালে যা লিখেছিল তা হয়েছে। এখন তীর্থে যাওয়া লিখেছে, তীর্থে চলে। পুরনো কাস্তি চটকে মনকে আর টকিয়ে তুলে না। পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছিলুম, এখন আর পেছন দিকে তাকিয়ে কী হবে?

গিরিবালা কিন্তু মনকে সাজুনা দিতে পারলো না। উনিশ কুড়ি বছর আগের কথা। ও সরকার বাড়ীর কাজে সেয়ে ভর ছপুয়ে ভাতের থালা হাতে করে বাড়ী ফিরে দেখে, চোর বিশ্বাসঘাতক অমূল্য ওর দাবার ওপর বসে আছে। নাক কান আর আঙুলের দগা ফুলে ঢোল হয়েছে। ও ঘুণা ভরা দৃষ্টিতে লোকটার পানে চেয়ে চাবি খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ীউলী নিস্তারিণী ছুটে এসে বললে মিনসেটা গা ভর্তি কুষ্ঠব্যাদি নিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছে গিরি। আমার পাঁচ জনের বাড়ী ও মড়াকে এফুনি বিদেয় কর।

গিরিবার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। ওর জীবনকে নষ্ট করেছে ওই লোকটা। ওকে ঠকিয়েছে, ওর পয়সা খেয়ে সর্বস্ব চুরি করে পালিয়েছে। ভগবান ওর পাপের উচিত শাস্তি দিয়েছে। গিরিবালা তেড়ে এসে বললে, শীগগীর বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে।

অমূল্য চোখ ছলছলিয়ে বললে,—যমের বাড়ী ছাড়া আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই গিরি।

গিরিবালা বন্ধার দিয়ে বলে,—তাই যাও সেখানে। কোথায় গেল তোমার রৌছেলে?

অমূল্য চোখ মুছতে মুছতে বললে,—আমার রোগের কথা ওরাও জান্তে পেরেছে তাই তাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে যাচ্ছি সবাই দূর দূর করছে। তিন দিন খাওয়া হয়নি; আমি আর বাঁচবো না গিরি।

গিরিবার ও চোখে জল এসেছিল। ও শাল পাতা পেতে সরকার বাড়ী থেকে আনা ভাত তরকারী অমূল্যকে ঢেলে দিয়ে, মাটির ভাঁড়ে খানিকটা জল দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপর হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বাড়ীউলী অমূল্যকে থাকতে দেবে

না, হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। অমূল্য অসহায় ভাবে জানালো, কুড়ি পচিশটা টাকা পেলে ও হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে। অনেক চেষ্টা করেও গিরিবালা কারু কাছ থেকে ধার হিসেবে পাচটা টাকাও যোগাড় করতে পারে নি।

সন্ধ্যার পর ও যখন সরকার বাড়ীর কাজে সেয়ে ফিরছিল, গিন্নী চোখবুজিয়ে ঠাকুর ঘরে আহ্নিক কর ছিল। নাতিটা ঘরের বাইরে দেওয়াল ঘরে পা পা করে ঠাকুর কাছাকাছি যাচ্ছিল। ওকে দেখে আহ্নাদে ‘গিগি’ করে হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি এলো, গলার শোনার হারটা চিক্ চিক্ করে উঠলো। গিরিবার চোখে অমূল্যর ফুলো ফুলো নাক ও কানের ডগা ভেসে উঠলো। ও ছেলেটাকে কোলে তুলে গালে চুমু খেতে গিয়ে হারটা খুলে নিয়ে ওকে নামিয়ে দিয়ে হনহন করে বাড়ী চলে গেল।

চাবি লাগানো ঘরের দাবায় ছেঁড়া চট পেতে বসে ছিল অমূল্য। ও অন্ধকারে হারটা ওর গায়ে ছুড়ে দিয়ে বললে,—একদিন তোমাকে দিয়েছিলুম নারীধর্ম, আজ দিলুম মনুষ্যত্বের শেষ অবশিষ্টটুকু। এবার আমায় চির কালের মত রেহাই দিয়ে বিদেয় হও।

হার পাবার পর অমূল্য উঠে গেল। গিরিবালা ছেঁড়া চট্টা রাস্তায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে খিল দিয়ে দিল। সারারাত কিছু খায়নি, কারু সঙ্গে কথা বলে নি। আজ আছে কী ওর কোনো পবিত্র তীর্থের মাটিতে মাথা ঠেকাবার অধিকার!

ভাবতে ভাবতে গিরিবালা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওর মনে পড়লো গিন্নীর ছোট বোনের ভাস্কর-পো হারানো নাতিটাকে কিছুদিন আগে কাশীতে দেখেছে। ও ছুটলো চক্রবেড়ের মিস্তির বাড়ী। ওখানে থেকে জেনে এলো ছেলেটা হাওড়ায় কাদের বাড়ী থাকে। বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে পড়লো ছেলেটার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে। ওর তীর্থযাত্রার পাশ-পোর্ট চাই, চাই ওর বিবেকের মুক্তি। সোনার হার ওকে বিষাক্ত সাপের মত অহোরাত্র দংশন করছে।

মিস্তিরদের দেওয়া ঠিকানা নিয়ে খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যার

আগে গিরিবালা এসে উপস্থিত হ'ল সুরকারগিন্নীর নাতি যেখানে থাকে। বাড়ীর সাম্নে রাস্তার ওপর একটা খড় কয়লার দোকান ছিল। গিরিবালা দোকানে ছেলেটার খোঁজ করতে ওরা বললে, সে এখন পড়াতে গেছে, একটু পরে আসবে।

ও পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। একটা উনিশ কুড়ি বছরের ছেলেকে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দেখে ও সামনে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দশ বছর আগে দেখা একটা পরিচিত মুখ। বালক যুবক হয়েছে অনেক পরিবর্তন। দশ বছরে গিরিবালার পরিবর্তন সামান্যই। ও ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে নিজের মুখে আঁচল ঢেকে হাউ হাউ কার কঁদে উঠলো। ছেলেটা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গিরিবালা সামলে নিয়ে বললে—বাবা, তোমার কাছে একটা পুরনো ঋণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্তে এসেছি। একতরি সোনার দাম একশ টাকা আমার কাছে থেকে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও।

গিরিবালা পেটের আঁচল থেকে দশখানা দশটাকার নোট বার করলে। ছেলেটি বললে,—যে ঋণ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই, তা আমি কেমন করে নোবো পিসীমা! তাছাড়া অতো টাকা নিয়ে আমি কী করবো আমার টাকার দরকার নেই, আপনি নিয়ে যান। গিরিবালা বললে,—যে হাতে অছায় করেছি, সেই হাত দিয়ে কী করে দেবতার পা ছোঁবো; তুমি আমায় মুক্ত করো বাবা। কাল রাত্রে গাড়ীতে আমার কেদার-বদী যাওয়ার ঠিকঠাক। এ টাকা না নিলে, আমার যে তীর্থে যাওয়া হবে না।

ছেলেটা আর কোনো কথা না বলে ডান হাতটা

পেতে দিলে। হোক গিরিবালা ঋণমুক্ত, ও হবে না ওর তীর্থ যাত্রার অন্তরায়। পরদিন সকালে কলেজে গিয়ে ও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য ভাণ্ডারে টাকাগুলো গিরিবালা দাসীর নামে জমা করিয়ে দিলে।

রাত্রি নটার সময় সন্তোষ হালদার তার তীর্থ যাত্রিনীর দলবল নিয়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হ'ল। ওদের সঙ্গে এলো কমলা বালিকা বিতালয়ের একষ্ট গিরিবালা ও নন্দরাণী। একদা সামাজিক নিদার ভাগিনী, বস্তি নিবাসিনী স্ত্রীলোক দুটি নিজেদের মাল পত্তর নিয়ে অনেক গৃহস্থ গৃহিণীদের সঙ্গে এসে বসলো গাড়ীর একধারে,—সন্তোষ হালদারের কমিউনে। মানুষ ওদের দেয়নি সম্মান, দেবতাও কি বিমুখ হবে!

হুইশেল দিয়ে গাড়ী ছাড়লো, যাত্রার মঙ্গল কামনায় হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অকপট অন্তরে সন্তোষ হালদার ধ্বনি দিলো,—জয় বাবা কেদারনাথ, জয় বাবা বদ্রীনারায়ণ। যাত্রীরাও হাত কপালে হুইয়ে প্রতিধ্বনি দিলো। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো।

দোলয়মান গাড়ীর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজিয়ে বসেছিল গিরিবালা। ওর চোখের মধ্যে ভেসে উঠলো গি গি করে সোনারহার গলায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা এক শিশু মূর্তি, সহসা শিশুর ভেতর থেকে এক যুবক বেরিয়ে ওর সামনে ডান হাত স্থানা পেতে দাঁড়ালো। গিরিবালার বিশ বছরের জমানো মনোস্তাপের বোঝা বরফের মত গলে জল হয়ে ওর দু-চোখ দিয়ে বারে পড়তে লাগলো। সন্তোষের মুখে শোনা, চেউ খেলানো অসংখ্য ভূষার ধবল গিরি চূড়া ওর চারি পাশে বিরাজ করতে লাগলো। ওই শত শত পর্বতের আড়ালে মুক্তিতীর্থের দ্বার খুলে ওর অন্তরদেবতা যেন মানুষের মূর্তি ধরে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রার্থনা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

আমারে করিয়া লহ,

তোমারি পূজার ফুল,

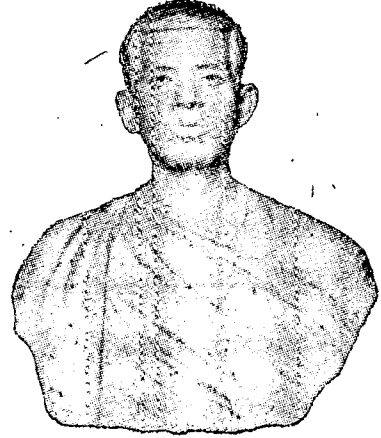
ভেঙ্গে দাও প্রভু, শত জনমের

সঞ্চিত যত ভুল।

বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

॥ ৯ ॥

কিরণেন্দু বাগ চী



লর্ড কার্জনের দুপ্রভৃতি বাঙালীর মরা মনে প্রতি-
হিংসার জ্বালাময়ী স্রোত বইয়ে দিল। চির বিদ্রোহী
ব্যথিত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একযোগে ইংরেজের
বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়ল।

অরবিন্দ এবার সক্রিয়ভাবে ফিরে এলেন
রাজনীতিতে। তখনও তিনি বরোদায়।

ভগিনী নিবেদিতা সারা বাঙলায় কাজ শুরু করে
দিলেন। আগে যা কেন্দ্রীভূত ছিল সেটিকে ছড়িয়ে
দিলেন।

সংগ্রামের ধারা এবার নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে
চলল। গতিবেগ ক্রমে ক্রমে চঞ্চল উন্মাদনায় ধাবিত
হল। কীর্তিনাশা ইংরেজ স্পর্ধার শালসী বৃক্ষকে
সমূলে গ্রাস করতে কৃতসঙ্কল্প; বন্সার ভয়বহ মূর্তি ধারণ
করে কার্জনের সামনে ফুসতে লাগল।

এই আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করে সুরেন্দ্রনাথ বললেন,
—“It is not merely an economic or a social
or a political movement, but it is an all-com-
prehensive movement co-extensive with the
entire circle of our national life, one in which
are centred the manysided activities of our
growing community. It is the shibboleth of our
unity and industrial and political salvation. It
would have tremendous appeal to the masses
—Deccan peasant or the Bengali rustic—who
are indifferent to politics.”

১৯০৩ সাল* থেকেই দেশে জনজাগরণ যে নতুন রূপে
রূপায়িত হয়ে উঠছিল, সেই আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ শুরু
হ’ল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

ভারতের জনজাগরণকে অনুপ্রাণিত করতে একটি
দৃষ্টান্ত সময় মত উপস্থিত হয়ে উৎপীড়িতদের মনের
আগুনে ঘৃত সেচন করল।

১৯০৪ এ হ’ল রুশ-জাপান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জাপানীদের
কাছে রুশজাতির পরাজয় ভারতবাসীর মনে এক নতুন
উন্মাদনা সৃষ্টি করল। প্রাচ্যের এক ক্ষুদ্রজাতির কাছে
পাশ্চাত্যের এক শক্তিশালী জাতির পরাজয় বাঙলা তথা
ভারতের বিপ্লবীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রচুর বেড়ে গেল।
জাপানের সাহস দেখে ভারতবর্ষের চোখ খুলল।

সারা এশিয়াবাসী যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গে জেগে
উঠল।

এই সময়ে ভারতীয় যুব শক্তির অগ্রগতির যে কি
রূপ নিয়েছিল তার বর্ণনা সরকারী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন
রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায় :—“At Calcutta and
Dacca youths belonging to respectable families

* বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন চলেছিল ১৯০৩ থেকে ১৯১০
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১১ সালে ভারত সত্রাট পঞ্চম জর্জ ইংলণ্ড থেকে
ভারতবর্ষে এসে বাঙলাকে এক করবার আদেশ দিলেন। সুরেন্দ্র
নাথের কথায় ঠিক হল। অর্থাৎ যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বলে
চলেছে যে বঙ্গভঙ্গ ‘Sattled fact’ সুরেন্দ্রনাথ জাতির পক্ষ থেকে
তার উত্তরে বলে চললেন যে এ ব্যবস্থাকে ‘Unsettle করতে
বাঙালী দৃঢ় সঙ্কল্প। শেষ পর্যন্ত ‘unsettled’ করিয়ে তবে ছাড়লেন।
বঙ্গভঙ্গ হল না কিন্তু পরে বিহার উড়িষ্যা বাংলাথেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
গেল।

who had begun with drilling and club exercises had passed into swords and daggers and were studying the use of pistols and explosives. The conspirators were all supplied with money were bound together with stringent vows, were fuming with racial hatred and firm belief, that they could initiate a national rising.' এই নোটটি থেকেই বুঝতে পারা যায়, রাজশক্তি ঐ অবস্থায় কি পরিমাণ ভীত হয়ে পড়েছিল।

ব্রহ্মবান্ধব দেখলেন ইংরেজদের যাবড়ে দিতে হলে এই সুযোগে নতুন ধরনের কিছু লেখার প্রয়োজন। বাঙালীকে উৎসাহিত করতে হবে লেখনীর মাধ্যমে। অঙ্কুরিত করতে হবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে উদ্ভা।

১৯০৪, ১৬ই ডিসেম্বর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রকাশ করলেন দৈনিকপত্র 'সন্ধ্যা'।

দেশে জনজাগরণের সঙ্গে সমতা রেখে প্রয়োজন মত নরমে গরমে লিখে চললেন। নতুন ধরনের লেখা। 'সন্ধ্যা'র চাহিদা গেল বেশ বেড়ে।

কাজ হয়েছিল যথেষ্ট। কাগজের জ্বালাময়ী ভাষার স্কুলিঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটকে পড়ল গ্রামে গ্রামে সহরে-গঞ্জে।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন। চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন অভিভাষণে কটাক্ষ করলেন, 'প্রাচ্য-দেশবাসীরা অভ্যুজ্জীবাদী ও অতিরঞ্জন প্রিয়।'।

সংবাদ-পত্রের ক্রোধটা ছুঁড়ে মারলেন কার্জন ভারত-বাসীর চরিত্রে।

কার্জনের এই অশালীন উক্তির সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতীয়ের হয়ে তাঁর নিজের দেশের একজন মহিলাকে এমনি কটুক্তি করতে দেখে কার্জন স্তম্ভিত হলেন, রাগে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু নিবেদিতার কোন শাস্তি বিধানে সাহস পেলেন না।

২০শে জুলাই ১৯০৫ যখন পাকাপাকি ভাবে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করার মঞ্জুর এল ভারত-সচিবের কাছ থেকে, বড়লাট কার্জনের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কুখে দাঁড়ালেন, রাজা-মহারাজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক জোটে।

'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "...আমরা প্রশ্রয় চাহিনা। প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিজ্ঞাণ।"

'সঞ্জীবনী' লিখল, 'দীক্ষামন্ত্র—বিদেশী বর্জন-স্বদেশী গ্রহণ।—এতেই ইংরেজ জব্দ হবে।'

সুরেন্দ্রনাথ বসুকেট মন্ত্রের সর্বাধিনায়ক; তাঁর এই দীক্ষামন্ত্র বাঙালীজাতি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করল।

'হিতবাদী'তে সখারাম লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একই সঙ্গে গর্জে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দর মা-বোনদের একই মন্ত্রগ্রহণে উৎসাহিত করলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চেষ্ঠায় সৃষ্টি হয়ে ছিল 'স্বদেশী ভাণ্ডার।' প্রকাশিত হল এইনামে একখানি পত্রিকাও। সহায়তা করলেন, সরলাদেবী আর কেদারনাথ দাসগুপ্ত।

স্বদেশী শিল্পে গড়ে উঠল তিনটি সংস্থা তিন জায়গায়। দুটির নাম হ'ল 'স্বদেশী ভাণ্ডার' আর একটির নাম হ'ল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।'

পি, এন, মিত্রের কলকাতার অনুশীলন সমিতিতে শক্তিচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই। এর একটি শাখা একই সঙ্গে ঢাকায় জন্মলাভ করেছিল পুলিন দাসের নেতৃত্বে। যুবকেরা সেখানেও শক্তিচর্চায় মেতে উঠল। কলকাতা অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা ছিলেন সত্যচন্দ্র বসু।

সরলাদেবীর যুব-আঞ্চলার সঙ্গে মিলিত হয়ে পি, এন, মিত্রের দল বীরাক্ষরীতে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাচাম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করল।

সরলাদেবী চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের—দেবী চৌধুরাণীর 'ভবানীপাঠকের' চরিত্রে যুবকদের শিক্ষা দিতে।

'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হল সঙ্গে সঙ্গে—'বিদেশী ঘৃষি বনাম দেশী কিল' স্বদেশী মন্ত্রকে অবলম্বন করে।

অলিতে-গলিতে, গ্রামে-সহরে, হাটে-বাজারে, আকাশে-বাতাসে নদীতরঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সঙ্গে 'বর্জন বিদেশী, স্বদেশী গ্রহণ' সমগ্র বাঙলা জুড়ে।

বিপিন পাল এই সময়ে সবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ

করলেন। তিনি বললেন—“Every large human movement, essentially a movement of thought has, whether consciously or unconsciously, some Philosophy of life behind it.”

এই কর্মক্ষেত্রে যোগ দিলেন বিপিনের সঙ্গে, পাঞ্জাব কেশরী লাল লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রবীর বালগঙ্গাধর তিলক। লাল-বাল-পালের একত্র অভিযান এবার সহস্র ফণা বিস্তার করে ছুটে চলল ভারতের দিকে দিকে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভো আছেনই এই যজ্ঞে আগে থেকে। ভূগেন্দ্রনাথ বসু ঘরের বাইরে এলেন।

অরবিন্দ জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—“In the ideal of nationalism which India will set before the world, there will be an essential equality between man and man, between caste and caste, between class and class, all being as Mr Tilak has pointed out, different but equal and united parts of the VIRAT PURUSH, as realised in the nation”.

ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর, পাঁচ কড়ি, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণ কুমার সুতীক্ষ্ণ কলমের ফলকে পাতার পর পাতা ভরে বিষ ছড়িয়ে চললেন শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে নীলকণ্ঠ করে তুলতে।

বরিশালের অশ্বিনীকুমার জাগলেন—বরিশালকে জাগালেন। দিবা-নিশি তাঁর চোখে আর ঘুম এল না।

ব্যবহারজীবী আব্দুল রশিদ ইংরেজের এই চক্রান্তের প্রতিরোধে একই ছত্রতলে এসে দাঁড়ালেন।

মৌলভী আবু হোসেন, হিন্দু-মুসলমানকে ‘রাম-লক্ষণ’ বলে অভিহিত করে, দুই সম্প্রদায়ের হাত ধরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন ছাত্রসম্মেলন গড়ে পথে পথে স্বদেশী গান গেয়ে বাঙালীর মনে আগুন ধরাতে লাগলেন।

অরবিন্দ আবার ঘোষণা করলেন—“patriotism is only a phase of that universal brother-hood which humanity aims at”.

আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। বিজিতি বস্ত্রের বাজারে আগুন ধরল।

ম্যাক্‌ফেয়ার ল্যাক্‌শ্যায়ারের ব্যবসায়ে একে একে তালি পড়ছে দেখে, ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আতঁনাদ করে উঠল।

ভারতের শাসক সরকার, তাদের সাহুনা দিতে সেখানে লিখে পাঠাল—ধৈর্য ধর আন্দোলনের শেকড় আমরা সমূলে উচ্ছেদ করতে কৃত নিশ্চিৎ। কয়েকদিনের মধ্যেই ফল ফলবে। চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

ইংরেজ ছাড়বার পাত্র নয়। এই ধাক্কাই বিধ্বস্ত হয়ে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। ছাড়লনা কিছুতেই। যতই ঐক্যের বাণী শোনান তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি—হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহায্য নিল।

১৯০৫, ৭ই আগস্ট।

কলকাতা টাউন হলে আহত হল বিরাট প্রতিবাদ সভা। ‘বঙ্গভঙ্গ’ রোধ করতেই হবে। কাতারে কাতারে লোক জমতে শুরু করল। বাইরের বহুদরদী জমায়েত হলেন বাঙ্গালীর সঙ্গে। কোথাও আর তিলধারনের জায়গা থাকল না, এমনই ভীড়। শেষকালটায় সামনের কার রাজপথও জনসমুদ্রের ধাক্কা আছাড়িপিছাড়ি খেতে লাগল। কেবল মাথা আর মাথা। চেউয়ের পর চেউ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোতা। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি।

এই সভাতে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বন্দেমাতরম ধ্বনি উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দ মঠের’ মাতৃমুর্তি জেগে উঠল বঙ্গজননীর তথা ভারতজননীর দশপ্রহরণ ধারিনী রূপ নিয়ে মানব হৃদয়ে।

সুরেন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে শাসালেন—“আমি এ বিধান রদ করবই—বাঙলা ভাগ হতে দেব না কিছুতেই।”

সভায় রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল।

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।.....

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ,

বাঙালীর ভাষা,

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত

ভাইবোন,

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।”

বড়-ছোট অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। একবাক্যে ঘোষিত হল—“ইংরেজদের বয়কট কর, স্বদেশী গ্রহণ কর”।

এই মহতী সভার পর সকলেই ভাবল নিশ্চয় কার্জনর মনে সুবুদ্ধির উদ্রেক হবে। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতিটি বাঙালী প্রতিক্ষা করতে লাগল কার্জন কি করে? ভবী ভুলবার নয়। আবেদন-নিবেদন, আশ্বাসন-প্রতিবাদ, সমালোচনা, চোখরাঙানি কিছুতেই কিছু হল না।

কার্জন যা মনে মনে স্থির করেছেন, তা তিনি করবেনই; পার্লামেন্টের কাছেও ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছেন। নগণ্য প্রজার চোখরাঙানীতে ভয় পেলে রাজ্য শাসন করা চলে না।

সভা শেষে হাজার হাজার তরুণ ছেলে-বুড়ো সকলেই হলুদ রংয়ের পাগড়ী মাথায়, বঙ্গভঙ্গুরোধের আন্দোলনে কলকাতার রাজপথে মিছিল করে বেরিয়ে পড়লেন। পুরোভাগে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংরেজের যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্যত।

টাউন হলের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ দেখে চন্দননগরের মতিলাল রায় এবং তার বন্ধুদের বৃকের গরম রক্ত, টগবগিয়ে ফুটে উঠল। উত্তেজনায় তারা চন্দননগরে ছুটে এসে কাজে নেমে পড়ল।

বেরিয়ে পড়ল ছেলেরদল খোল করতাল নিয়ে সেই রাত্রিতেই। পথে পথে তারা গেয়ে চলল—“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক...” আরও গাইল—“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই, দীন দুখিনী মা যে তোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই...”। মাতৃবন্দনায় অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সে মাতৃসংকীর্ণনে যোগ দিল। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ’ল। কেউবা বাম্প রুদ্ধ কণ্ঠে সজল নয়নে

উপলব্ধি করছে গানের সুমধুর কলিগুলোকে, কেউ আবার ছেলেরদলকে উপহাস করছে।

কানাইলাল আর ঘরের কোণে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারল না, ছুটে এসে মতিলালের গলা জড়িয়ে ধরল।

এই চরম মুহূর্তে তার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হল। এতদিন যে আগুন কানাইয়ের অন্তরে থিকি থিকি জ্বলছিল, এখন তা লেলিহান শিখা বিস্তার করল।

কানাইলাল সঙ্কল্প স্থির ক’রে ফেলল।

স্বামী বিবেকানন্দের ‘বীরবাণী’ আশ্রয় করে একদল তরুণ এই সময় চন্দননগরে ‘সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়’ সংগঠন করে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করে ছিল, যার কর্ম ছিল সাগরকালী ঘোষ, সত্যচরণ কর্মকার ননীলাল দে আর যার হোতা ছিল মতিলাল। শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন দৃঢ়চেতা বন্ধুদের নিয়ে কানাইলাল দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল অক্লান্ত পথ ধরে, চারুচন্দ্র রায়কে গুরু করে।

এই শ্রীশ ঘোষের এক অভূত বৈশিষ্ট্য ছিল এদের মধ্যে। সে ছিল বর্ণচোরা আম। গায়ের রং ও ছিল ‘কালাপাহাড় আমের’ মতই কাল যা পাকালেও বাহির থেকে বোঝার যো থাকে না। কাজও ছিল তার ঠিক সেই রকম ‘অন্তরমিষ্ট’ সুচিন্তিত সুগঠিত। বহু অসম সাহসের কাজ সে সমাধান করেছে সুকৌশলে। সরকার তার বুদ্ধির কাছে কোন দিনই দাঁড়াতে পারে নি। সরকারী গোয়েন্দার চোখে ধূল দিয়ে সে অনার্যাসে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করেছে।

স্ববশস্তির প্রলম্বছক্কার দিতে দিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অনাসক্ত বীর্যবান তরুণের দল রুদ্ধ মূর্তি ধারণ করল।

‘সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়’ স্বদেশীর জোয়ারে কোথায় ভেসে গেল। কানাই আবেগে মতিলালের গলাটা আবার জড়িয়ে ধরল। আত্মহারা হয়ে তার গালে একটা চুষন করল। যদিও মতিলাল বয়সে বেশ কিছু বড় ছিল কিন্তু হৃদয়তার বন্ধন তাদের এমনি ভাবেই আকৃষ্ট করেছিল।

স্বদেশী মন্ত্রে নতুন সমিতি জন্মিল চন্দননগরে।

সজ্জ-সংবাদ

আশ্রমী

শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের ৯৪তম আবির্ভাবোৎসব

বিগত ২২শে পৌষ ১৩৮২ সাল, ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৬, বুধবার পূজাপাদ শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের ৯৪তম আবির্ভাবোৎসব কেন্দ্রসজ্জে স্বাভাবিক সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রসজ্জে ২১শে পৌষ হ'তে ২৯শে পৌষ মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত নয়দিন ব্যাপী উৎসব প্রবাহ চলে।

২১শে পৌষ অধিবাস তথা উৎসব সূচনা। অপরাহ্ন ৪টা থেকেই দলে দলে সজ্জের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসভ্যা ও নূতন দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু ভক্তমণ্ডলীতে আশ্রমপ্রাঙ্গণ ভরে উঠে। সন্ধ্যা ৬টায় সমবেত উপাসনার মাধ্যমে অধিবাস। প্রারম্ভিক ভজন সঙ্গীত, উপাসনা ও দশ মিনিট নীরবে শ্রীগুরুর ধ্যানের পর উদ্বোধনীভাষণ দেন “প্রবর্তক” সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ও সজ্জসভাপতি শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত। উভয়ের ভাষণই গুরুমুখী এবং মনোজ্ঞ। ভাষণ দুটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

পরদিন ২২শে পৌষ ভোর ৪টায় প্রভাতী মন্তো-চ্চারণের পর থেকেই উৎসবের কলধ্বনি শোনা যায়। যে যেখানে, যেভাবেই রাজিবাস করুন না কেন, প্রাতঃ কৃত্য সমাপনান্তে প্রত্যেকেই শুচিশুদ্ধ দেহ মন নিয়ে সমাগত হন আশ্রমের শ্রীগুরুমন্দির ও মাতৃমন্দিরের মধ্যস্থলের নাট্যমন্দিরে। শুরু হয় ব্রহ্মযজ্ঞ, ভজন ও শ্রীগুরুবন্দান্তে সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মোপসনা। তৎপরে সমবেত কণ্ঠেই দ্বাদশ অধায় গীতাপাঠ করা হয়। গীতাপাঠান্তে দশ মিনিট নীরব ধ্যান, সজ্জবাণী পাঠ ও যুগলমন্দির প্রদক্ষিণ।

অতঃপর ঘোড়শোপাচারে শ্রীগুরুর পূজা পুষ্পাঞ্জলি ও হোমান্তে দীক্ষায়জ্ঞের আরম্ভ। নানা জায়গা থেকেই দীক্ষার্থীরা আসেন—তাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা আগামী সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত হবে। এবার দীক্ষার্থী সংখ্যা হয় মোট ৫৭ জন। তার মধ্যে ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। একবারে একসঙ্গে ৫৭ জনের হোম করা সম্ভবপর না হওয়ায় দুইবারে হোম হয়, পূর্ণাহুতি প্রদান একসঙ্গেই হয়। সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করে এই দীক্ষায়জ্ঞ সম্পন্ন হতে বেলা প্রায় সাড়ে বারটা বেজে যায়।

এরপর শ্রদ্ধেয় সজ্জসভাপতি পূজাপাদ সজ্জগুরুদেবের শয়নকক্ষে প্রথম ৭ জন ছাত্রছাত্রীকে সারস্বত দীক্ষা প্রদান করেন, তারপর অবিবাহিত যে কয়জন পুরুষ ও নারী ছিলেন তাঁদের, তারপর স্বামী-স্ত্রী যুক্তভাবে একে একে দীক্ষা দান করেন। এই দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হতে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা বেজে যায়। ইহা শেষ হওয়া মাত্রই সন্ধ্যা উপাসনান্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আসর শুরু হয়। এই আসরটি পরিচালনা করেন আমাদেরই প্রতিবেশী-কন্যা স্নেহাস্পদা কল্যাণীয়া সবিতা দত্ত। সবিতা সঙ্গীতে এম, এ। প্রতিবেশী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার এই ভক্তিমূলক গান পরিবেশন খুবই সুন্দর হয়।

২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার সজ্জেরই দীক্ষিতা সহ-যোগীসভ্যা বিজয়া মজুমদারের রচিত “সহধর্মিনী” গীতি-আলেখ্য অতীব সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন সঙ্গীতশিল্পী শ্রীসোমেশচন্দ্র ঘোষাল ও তৎ সম্প্রদায়।

২৪শে পৌষ শুক্রবার আলাচ্য বিষয়বস্তু ছিল গুরু ও ভক্তিতত্ত্ব। আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের সম্পাদক শ্রীমং সিদ্ধেশ্বরভাই আর আলোচনা করেন বিদূষিণী ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী, আদ্যাপীঠেরই মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। তাঁর ভাষণ যেমনই প্রাজ্ঞ, তেমনই জ্ঞানগর্ভ ও মধুর। শুধু শ্রোতারাই নন—স্বয়ং সজ্জগুরুদেব ও সজ্জজননীও যেন প্রাণবন্ত হয়ে শ্রবণ করেন গুরু ও ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা। অল্প কথায় সিদ্ধেশ্বরভাইও খুব সুন্দর ভাষণ দান করেন।

২৫শে পৌষ শনিবার অনুরূপভাবেই আর এক বিদূষিণী অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে কথকতার মাধ্যমে সূদামা ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা অনবদ্য ভাষায় সুমধুর কণ্ঠে সুর-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উৎসবপ্রাঙ্গণ মধুময় হয়ে উঠে—‘মধুবাতা ঋতাস্তে, মধুমং পার্থিব জগৎ।’

২৬শে পৌষ রবিবার—উৎসব সভা। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্টেন্ট রেজিষ্টার শ্রীবিমলকান্তি মৈত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন দেশপ্রেমিক

সুলেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য মহোদয়। উৎসবের বিবরণ আগামী বারে প্রতীক্ষিতব্য।

২৭শে পৌষ সোমবার রামায়ণের মহীরাবনবধ লীলা গান করেন চতুর্দশী পল্লীবালািকা লক্ষ্মীরাণী চট্টোপাধ্যায়। তার সঙ্গে দোহার দেয় তারই অনুজা ভগ্নী। ভারি সুন্দর গান করে—যেমন মিষ্টিগলা, ভেমনি স্মৃতিশক্তি—কোথাও একটুও আটকাইনি, সঙ্গে পিতা ছিলেন কিন্তু তাঁকে একটুও সূত্র ধরিয়ে দিতে হয়নি। সম্ভবসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সোৎসাহে সম্মুখে বালিকাকে “রামায়ণ কণ্ঠি” উপাধি দান করেন।

২৮শে পৌষ মঙ্গলবার বাঁশবেড়িয়া “গীতমাধুরী” পল্লীগীতি সংস্থা কর্তৃক ভক্তিমূলক বাউল গানের আসর বসে। গায়করা প্রত্যেকেই উপার্জনক্ষম স্বপ্রতিষ্ঠ। এই গান তাঁদের ব্যবসায়—সাধনঅঙ্গ। এঁদের মধ্যে অনেকেই দীক্ষিত তাই গানের মধ্যেও ভক্তিভক্ত, সাধনতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব সবই অপূর্বাভাব। ভাষায়, সুরে ও ছন্দে ফুটে উঠে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

২৯শে পৌষ বুধবার শেষদিন পালা কীর্তন দ্বারা মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়। গায়ক হুগলী জেলার সিজুর থানার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রামের শ্রীগণেশচন্দ্র বাগ ও সম্প্রদায়। কীর্তনের বিষয়বস্তু “কলহান্তরিতা।” এর মধ্যে জয়দেবের ব্যাখ্যায়িকাই মুখ্যস্থান গ্রহণ করে— কারণ ‘দেহীপদ পল্লব মুদারমে’র রচয়িতা ভক্ত জয়দেব

নন, ভক্তাধীন ভগবান স্বয়ং। উৎসব অন্তে কীর্তনীয় ভক্ত শ্রীমান গণেশ বাগের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা জানাই স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীচরণে—“দেহী পদপল্লব মুদারমা।”

অতঃপর পূর্ণপ্রশস্তি মন্তোচ্চারণের পর নয়দিন ব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

ফ্রেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রমঃ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর ৯৪তম জন্মদিবস এখানেও মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। কাকদ্বীপ গোড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ মঙ্গল মহারাজ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে আশ্রম প্রাঙ্গণ জনতায় উদ্বেলমুখর হয়ে ওঠে। শ্রীমৎ মঙ্গল মহারাজের দুই ঘণ্টা ব্যাপি সুললিত কণ্ঠের সুদীর্ঘ ভাষণ উপস্থিত শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধচিত্তে সাগ্রহে শ্রবণ করেন। মহারাজজী সংঘগুরুজীর জীবন-দর্শনই যে বর্তমান সমাজের ধর্ম, অর্থ ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় তা সবিস্তারে যুক্তি, প্রমাণ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সূচাক্রমে উপস্থাপিত করেন। এই সকালের অনুষ্ঠান দ্বিপ্রহরে শেষ হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমের শিশুভবনের শিক্ষক শ্রীগণপতি গিরির পরিচালনায় ও নির্দেশনায় ছাত্র-ছাত্রীদের নাটিকাভিনয়, গান, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকায় উৎসব সমাপ্তি হয়।

সেই লেখনী আজ স্তব্ধ

সেই লেখনী আজ স্তব্ধ। যে লেখনী মাসের পর মাস প্রবর্তকের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মুখর হয়ে উঠত, সে লেখনী আজ স্তব্ধ। গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকার অতি পরিচিত সেই অনবদ্য রচনাইশৈলী উন্মেষকারী সে লেখনী আজ অসহায়। ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ ভারতের নূতন সমাজব্যবস্থা রূপায়ণের যে রূপরেখা সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রচনা করে গেছেন,—সেই রূপ-রেখার সার্থক এবং বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা এমন প্রাজ্ঞ ভাষায় যে লেখনীমুখে নিঃসরিত হত, সে লেখনী আজ স্তব্ধ—মুক।

যাঁর অঙ্গুলীস্পর্শে সে লেখনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, সে অঙ্গুলী আজ রোগত্বর্ন, লেখনীধারনে অসমর্থ। বিগত ৩৫ বৎসর যিনি এই লেখনী ধারণ করে এসেছেন, সেই প্রজ্ঞাবান, স্থিতবী, ঋষিতুল্য, আমাদের অগ্রজপ্রতিম সম্পাদক এবং বিগত ৪২ বৎসর যাবৎ প্রবর্তক পত্রিকার

প্রাণপুরুষ ও কর্ণধার শ্রীরাধারমণ চৌধুরী আজ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। শ্রীভগবান তাঁকে অচিরে রোগমুক্ত করুন এই প্রার্থনা।

বর্তমান মাসের প্রবর্তকে তাঁর কোন রচিত লেখা, গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম, প্রকাশিত হল না। আমাদের অন্যতম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় হিসাবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

পাঠকপাঠিকা ও অনুরাগী সুহৃদ বন্ধু স্বজনদের কাছে অনুরোধ—আমুন আমাদের সঙ্গে আপনারাও কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হয়ে উঠুন—আবার সেই স্তব্ধ লেখনী তাঁর অঙ্গুলীস্পর্শে প্রাণবন্ত ও মুখর হয়ে উঠুক।

—রবি কর

সাহিত্যিক

পরলোকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত :

গত ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭৫ খ্যাতিমান সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর ‘কল্লোল-যুগ’-এর যেসব সাহিত্যিক বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার ছিলেন অন্যতম।

১৯০৪ সনে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালিতে (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি তাঁর নোয়াখালিতেই অতিবাহিত হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার বছরই তাঁর প্রথম কবিতা ‘নিহারিকা দেবী’ এই ছদ্মনামে ১৩২৮ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং বি. এল. পরীক্ষা সম্মানে উত্তীর্ণ হন। প্রথমদিকে তিনি কবিতা লিখতেন। পরবর্তীকালে গল্প ও উপন্যাসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কবিতা লেখা ছাড়েন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে মূলফরুগে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর সাবজজ এবং পরে জেলা জজ হন। দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাজ করে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে ঘিরে। তাঁর লিখিত ‘কল্লোল যুগ’ বইটি বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য স্মৃতিচিত্র। বয়সের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের চিন্তারও পরিবর্তন আসে এবং লেখার মধ্যেও সেটা প্রতিফলিত হয়। “পরমপুরুষ”—এই অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ তাঁর চিন্তাবীত চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই সময় তিনি আরও কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন।

১৯৬১ সনে সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি ‘মতিলাল স্মৃতি’ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। তিনি শতাধিক বই লিখে গিয়েছেন।

‘প্রবর্তকে’র সঙ্গে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন এক মধুর সন্ধর্ষ গড়ে উঠেছিল। তাঁর বহু কবিতা, গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাস একসময় প্রবর্তকের পৃষ্ঠা সযুগ্ন করেছে। নিরহংকার, অমায়িক এই সাহিত্যসেবী অচিন্ত্যকুমারের আত্মার উদ্ধগতি ও চিরশান্তি কামনা করি।

পরলোকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় :

খ্যাতিমান সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ২রা জানুয়ারী ১৯৭৬ দুপুরে পরলোকগমন করেন। গত দেড় বছর ‘কালিকলম যুগ’-এর অষ্টা এই মানুষটির কালিকলমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪। জন্ম মামা বাড়িতে, বর্ধমানের অণ্ডাল গ্রামে। পিতৃভূমি বীরভূমের রূপসীপুর, বাবার নাম ধরনীধর। তিন বছর বয়সে মাতৃহীন হন। মায়ের মৃত্যুর পর দাদামশাই রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেই বড় হয়েছে শৈলজানন্দ। কয়লাখনির দেশে মামাবাড়িতে থাকতে থাকতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নজরুল ইসলামের সাথে। দুই বন্ধু একসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নাম লেখাতে যান। ডাক্তারি পরীক্ষায় শৈলজানন্দ বাতিল হয়ে যান—নজরুল যুদ্ধে চলে যান। শৈলজানন্দ কলেজে ঢুকলেন, অর্থাভাবে পড়া হলো না। চাকুরী নিলেন কয়লা-কুঠিতে। কিন্তু সেখানে পোষাল না। শেষে এলেন সাহিত্যে। এলেন কলকাতায়। ওর মত ছোট গল্প খুব কম সাহিত্যিকই লিখতে পারতেন। খনিপ্রমিকদের নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে গল্প রচনায় শৈলজানন্দই পথিকৃৎ। তিনি প্রায় শ দেড়েক গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেন এবং খান বার সফল চলচ্চিত্রের নির্মাতা। প্রবর্তকে পত্রিকাতে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধগতি ও শান্তিকামনা করি।

সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রী রাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক : শ্রী রবি কর

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন লিমিটেড, ২২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রী রাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন লিমিটেড, ২২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রী গণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত।

৬০তম বর্ষ : ১২ সংখ্যা

প্রবর্তক

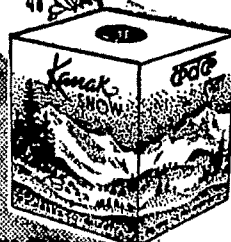
দ্রষ্টব্য: শ্রীমতী লালমণি

চৈত্র ১৩৮২

মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৬



আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারন সামগ্রী

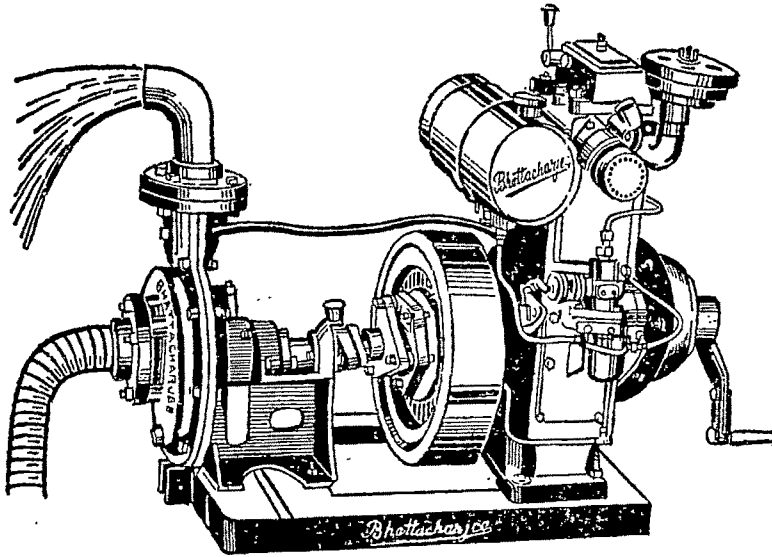


ক. হোড ২৩ কোং • কলিকতা-১৪

ভারত সরকারের গ্যারান্টি টেস্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

Bhattacharjee

অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূল্যে
'ভট্টাচার্য ডিজেল পাম্পিং সেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী,
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত



—বৈশিষ্ট্য—

মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া
লাইনার, পিস্টন, ট্রান্সমি,
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার
ইউনিট, ষ্টীল পার্টস্, উৎকৃষ্ট
মেটাল বিয়ারিংস্ ও উন্নত
কারিগরী।

ভারতে এই ধরনের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং সেটের সমকক্ষ

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

শো-রুমঃ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

বিঃ দ্রঃ—ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

টেলিগ্রাম : “মেসিনারিস”

অফিস ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

রেসি : ৪৭-২১১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

has the pleasure to announce

INCREASED RATE OF INTEREST ON FIXED DEPOSITS

AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74

DEPOSIT PERIOD	RATE OF INTEREST PER ANNUM
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS	... 10%
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS	.. 9 %
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE BUT LESS THAN 3 YEARS	.. 8 %
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 1 YEAR	.. 7 %
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE BUT LESS THAN 9 MONTHS	.. 6 %
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE BUT LESS THAN 6 MONTHS	.. 5.5%

EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION
OF THE CONTRACTED PERIODS.

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE
CONTACT:

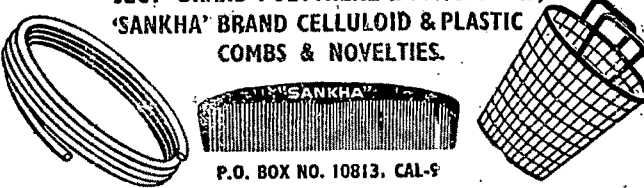
Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001.
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES)
OR ANY OF THE BRANCHES

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.



P.O. BOX NO. 10813, CAL-5

D. RATAN & Co.

Photographers

400 WALLIS ST. 2ND FLOOR

PHONE : 54 - 3711

ডি রতন কোম্পানি

ফটোগ্রাফার্স

৪০০ ওয়ালিস স্ট্রীট ২য় ফ্লোর

ফোন: ৫৪ - ৩৭১১

হাসি চৌধুরীর—মনীষা—৮০০

জ্যোতিষ শাস্ত্র কি সত্য !!!

মনের সূক্ষ্মতন্ত্রে বিষয় জগায় মনস্তত্ত্বমূলক এই উপন্যাস যুগান্তর—“তোদের বিশ্বাস অবিশ্বাস, সংস্কার ও দুর্বলতাকে তিনি কাজে লাগাতে পেরেছেন...পাঠক পাঠিকারা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারবেন”

প্রকাশিকা, ৩৫/১, ডায়মণ্ড হারবার রোড। কলি-২৭

‘সাহিত্য প্রকাশ’ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা-৯

ভগবান

শ্রীসত্য সাই বাবা

কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বর্তমান কালে বিশ্বের আকর্ষণ কেন্দ্র, সবচেয়ে অলৌকিক শক্তিশালী ঈশ্বরমানব সত্য সাই বাবা—ভগবান স্বয়ম। বাংলা ভাষায় সত্য সাই বাবার সম্বন্ধে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

দক্ষিণা — দেড় টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি. টি. রোড : : বড়বাজার

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভারত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব কর্মসচিব।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাণ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিফ : দশনসংস্কার চূর্ণ :

সারিবাটারিফ : অশোকারিফ : ব্রাহ্মী স্নাত (ছাত্রবন্ধু) : মহাভঙ্গরাজ তৈল।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সূচীপত্র : চৈত্র ১৩৮২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	৪৫১
বেদমন্ত্র	নিবন্ধ	রেনুকণা ঘোষ	৪৫২
সম্পাদকীয়	...	শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত	৪৫৩
মহিমা	কবিতা	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	৪৫৬
কেদার-বদরী	কবিতা	শ্রীসুশীল গুপ্ত	৪৫৬
অধ্যাত্মচেতনার আলোকে বিভূতিভূষণ	প্রবন্ধ	রতন দাশগুপ্ত	৪৫৭
লক্ষ্মীকৃপা	নিবন্ধ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়	৪৬১
জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল	জীবনালেখ্য	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৪৬৩
বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল	জীবনালেখ্য	কিরণেন্দু বাগচী	৪৬৬
শত্রু ও মিত্র	কবিতা	শ্রীমতী হেমবরুণী মুখোপাধ্যায়	৪৭০
বসুমতী	বড় গল্প	অজিত দাস	৪৭১
ভার মুক্ত	কবিতা	বাজীরাও সেন	৪৭৪
জীবন যেখানে শেষ	গল্প	শ্রীঅপূর্ব চক্রবর্তী	৪৭৫
স্বীকারোক্তি (২)	রম্যরচনা	দীপংকর সেন	৪৭৭
বক্ষিতা	কবিতা	সন্তোষ ভট্টাচার্য	৪৭৮
পুস্তক সমালোচনা	...	...	৪৭৯
সজ্জ-সংবাদ	বিবরণী	আশ্রমী	৪৮১
সাময়িকী			৪৮৩

প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠা—১৯১৫। পত্রিকার ৬০তম বর্ষ চলছে

অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।

বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া চলে। দক্ষিণা—সডাক বার্ষিক ছ' (৬-০০) টাকা। গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয়। পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে। কপি রেখে লেখা প্রেরিতব্য।

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই—সম্পাদকের নহে।

এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে পাঠানো হয়।

—পরিচালক : প্রবর্তক

কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ

গীতায় ভগবান ৫.০০

গীতার যৌগিক জীবনভাষ্য)

মহর্ষি প্রেমানন্দজী প্রণীত

গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গুহ্যতিত্ত্ব রাজযোগের নিগূঢ় মর্মটি এই গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তদুপরি সহজ প্রাণায়াম মাধ্যমে অনাহত নাদানুসরণে মানসোত্তর লোকে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সাধন সংকেত ব্যাখ্যাত।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিত

রোগ ও আরোগ্য—৪.০০

যাবতীয় রোগের সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়।

স্বপ্নিতত্ত্ব—১.০০

স্বধীরকুমার দত্তের সর্বজন সমাদৃত বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর অপরিহার্য গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাধনা—৪.০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বহু বিখ্যাত নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান

ৰামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোৰ

১২৮/১ বিধান সৰণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

পেটেণ্ট ঔষধ

সৰ্বপ্ৰকাৰ দেশী ও বিসাতী ঔষধ

প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্ৰেসক্ৰিপ্‌শন যত্নসহকাৰে সরবরাহ কৰা হইয়া থাকে।

বিচিত্ৰ বস্ত্ৰৰ প্ৰচুৰ আমদানী

ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেৰিকটন, টেৰিলিং-এৰ শাৰ্টিং, স্ফ্ৰটিং। আমাদেৰ নিজস্ব তৈয়াৰী পোষাক। বিবাহেৰ বেনাৰসী শাড়ী, জোড় ও বৰমাৰী ছাপ শাড়ী বিক্ৰয়ৰ্থে সৰ্বদা মজুত থাকে।

বস্ত্ৰশিল্পে একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান

ৰামকানাই যামিনীৰজন পাল প্ৰাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী ৰোড (বড়বাজার) : কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৩-২৩০৩

===== An Important Announcement =====

A BOON TO THE INDUSTRY

- ★ ELECTRICAL MOTOR
- ★ POLISHING & BUFFING

- DOUBLE ENDED-GRINDER
- FLEXIBLE SHAFT GRINDER

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56

Phone : Office 61-1715

Phone : Resi. 33-2332

‘প্রবর্তক’ সম্পাদক রাধারমণ চৌধুরীর মহাপ্রয়াণ

১০ই এপ্রিল ১৯৭৬ (২৭শে চৈত্র ১৩৮২) শনিবার সকাল ৭-৫০ মিনিটে প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রবর্তক সজ্জের সহ-সভাপতি সিঁথির প্রবর্তক বাসভবনে সম্পূর্ণ সজ্জানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর।

তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, সংসার ত্যাগ করে প্রবর্তক সজ্জে আত্মোৎসর্গ করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি আশ্রম জীবন যাপন করেন এবং গুরুদেবের যুক্ত মিশন নিষ্ঠা সহকারে বহন করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে তিনি ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার পরিচালনা ও সহ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে ‘প্রবর্তক’-এর ২৫ বর্ষ পূর্ণ হলে সজ্জগুরু সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব রাধারমণ চৌধুরীর ওপর অর্পিত হয়। তিনি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত এ দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পালন করেন।

১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল ‘প্রবর্তক’র স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সময় প্রবর্তক তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে অনন্য হয়ে ওঠে, এবং ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গোষ্ঠিনিরপেক্ষ একটি আদর্শ সাময়িক পত্র হিসাবে বিদগ্ধ পাঠক ও লেখক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এর পেছনে রাধারমণ চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘প্রবর্তক’-এর বিশেষ ‘শরৎস্মৃতি সংখ্যা’ ও সজ্জগুরুর মৃত্যুর পর ‘প্রবর্তক’-এর বিশেষ ‘সজ্জগুরু-স্মৃতি সংখ্যা’ দু’টি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পাদনা প্রতিভার অবিনশ্বর কীর্তি। সম্পাদক রাধারমণের বাংলা সাহিত্যের সার্বিক উন্নতির দিকেই প্রচেষ্টা ছিল বেশী। তিনি অকৃত্রিম গুণগ্রাহী ও দরদী মনের অধিকারী ছিলেন। অনেক নতুন লেখক লেখিকাদের তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে তাদের সাহিত্য-প্রতিভা স্মরণে সহায়তা করেছেন। এক সময়ের অখ্যাত অবজ্ঞাত, আজকের খ্যাতিমান অনেক লেখক তাঁর সান্নিধ্যে এসে, উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছেন এবং তাদের প্রথম লেখা ‘প্রবর্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা, কৃতজ্ঞ কয়েকজন লেখক যথাস্থানে স্বীকারও করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে সম্পাদক রাধারমণের এটা একটা বড় অবদান।

তিনি কবিতা কোনদিন লেখেন নি। তাঁর অনেক ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তদানীন্তন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। ইদানীং কালে তিনি ভারতীয় দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধই প্রবর্তকে বেশী লিখতেন।

জীবনের শেষ দু বছর ‘প্রবর্তক’-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতীয় দর্শনের আলোকে সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-দর্শন তথা ‘অথাতো অর্থ জিজ্ঞাসা’ অনন্য সাধারণ দক্ষতা ও নিষ্ঠায় এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে শেষ গুরু দক্ষিণা দিয়ে গেছেন। শেষের কয়েক মাস তিনি গুরুগত প্রাণ হয়েছিলেন। তাঁর শেষ রচনা ‘গুরু প্রণাম’ গত ফাল্গুন মাসের প্রবর্তকে যা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে এর সাক্ষ্যবহন করে।

২৭শে চৈত্র সজ্জের দিন লিপিতে একটি বিশেষ দিন—এইদিন সজ্জগুরু দেহ রক্ষা করেন। গুরুগত-প্রাণ রাধারমণ এই তারিখেই ইচ্ছামে চলে গেলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে রাধারমণ চৌধুরীর মরদেহ সিঁথির বাসভবন থেকে কেন্দ্র সজ্জচন্দ্রনগরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আশ্রম সংলগ্ন পুণ্যতোষা ভাগীরথীতীরে মহাশ্মানে তাঁর শেষকৃত্য সজ্জের রীতি অনুযায়ী সমাপ্ত হয়। তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়।

প্রবর্তক-এর আগামী সংখ্যা বৈশাখ ১৩৮৩, বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় ‘রাধারমণ চৌধুরী ও মনীন্দ্র নাথ নায়েক’ স্মরণে বিশেষ প্রবন্ধাদি থাকবে।

পরলোকে প্রখ্যাত বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়েক



গত ৭ই এপ্রিল ১৯৭৬ (২৪শে চৈত্র ১৩৮২) বুধবার সকাল ১১:১৫ মিনিটে প্রখ্যাত বিপ্লবী, সজ্জগুরুর আবাল্য অহুরাগী ভক্ত, শিষ্য ও সাথী মণীন্দ্রনাথ নায়েক চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে, সজ্জানে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শান্তিশীলা দেবী, পুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও কন্যা শ্রীমতী শঙ্করীবালা (নন্দী) বর্তমান।

শৈশবকাল থেকেই সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শ্রীমতিলাল প্রতিষ্ঠিত সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি সজ্জগুরুকে নেতার আসনে বসিয়ে নিজের জীবনকে তাঁর (শ্রীমতিলালের) আদর্শে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীমতিলালের আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল অমলিন।

১৯১৩ সালে স্কটিশার্চ কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করেন। সম্ভবতঃ তিনিই চন্দননগরের সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের স্নাতক। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত সম্ভাবনাকে স্বৈচ্ছায় দূরে ঠেলে—কঠিন অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি দেশের ও জাতির সেবায় নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। শ্রীমতিলালের নির্দেশে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব কর্মীদের একজন নিষ্ঠাবান সেবক হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা নিক্ষেপ হয়, সে বোমা চন্দননগরে মণীন্দ্রনাথের হাতেই তৈরী হয়েছিল।

আবার সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের নির্দেশেই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে সজ্জগুরু প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে গভীর নিষ্ঠা সহকারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রবর্তক সজ্জের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। ১৯৭২ পর্যন্ত সেখানে নিরলস সেবা দান করেন। তিনি ছিলেন সজ্জগুরুর একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বস্ত অনুচর ও সাথী। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী, অমায়িক, বন্ধুবৎসল ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী। তাঁর এই পুত্চরিত্র দলমত নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

চন্দননগরের গৌরব এই প্রিয় বিপ্লবীর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নগরের সমস্ত দোকান পাট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃতের মরদেহ শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণের পর ভাগীরথী তীরে বোড়াইচণ্ডীতলা ঘাটের মহাশয়ানে শেষকৃত্য সমাপন হয়।



৬০তম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

চৈত্র : ১৩৮২

মার্চ-এপ্রিল : ১৯৭৬

প্রবর্তক

জীবনের আলো

যদি কাহারও মনে প্রশ্ন জাগে, কর্ম কি আমাদের লক্ষ্য? আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিব—না। লক্ষ্য—ভগবান। কর্ম আশ্রয়। যেমন কাশী লক্ষ্য; রেলগাড়ী আশ্রয়। কর্ম তবে পথ? ত্রিমার্গের মধ্যে ইহা অন্যতম? আমি বলি—না, তাহাও নহে। কর্মের একীভূত মূর্তি মার্গত্বে। ত্রিমার্গ কর্মের বিচার ফল। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি একাত্মক। কর্ম, ভক্তি অথবা জ্ঞান হইতে পৃথক হয় না। কর্মের মর্য্যাবধারণের জগৎ কর্ম বিশ্লেষণে ভক্তি ও জ্ঞানের অনুভূতি লাভ হয়। পরন্তু ঈশ্বর লক্ষ্যে এক মার্গই বিহিত। উহা কর্ম।...কর্ম তাই অতিশয় রহস্যময়। কর্মের গতি এইজন্যই গহন বলিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কর্ম হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টি দেখিয়া কর্তার অনুভূতি। কর্মসূত্র ধরিয়া কর্তার সহিত জীব যুক্তি পায়। সাধনার ইহা অমোঘ নীতি। কর্মমাহাত্ম্য ভারতে তাই চির কীর্ষিত। কর্মবৈরাগ্য ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া যেদিন এ জাতি স্বীকার করিয়াছে, সেইদিন হইতেই ইহার ক্লীবত্ব এবং ধর্ম্মও হইয়াছে অলৌকিক ইন্দ্রজাল।

বিনা অর্চনায় প্রেম লাভ হয় না। প্রশ্ন—কর্মের পর প্রেম লাভ এবং প্রেমেরদ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধ দৃঢ় হইলে, কর্ম সমাপ্ত হয় কি না? ইহার উত্তরে বলিব—কর্ম ভক্তির পরিণতি। ভক্তি যদি কর্মে নিহিত হয়, তবে কর্মই প্রেমের বীজ এবং কর্মই যথাক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সুতরাং কর্ম হইতে প্রেম পৃথক না হওয়ায় কর্মের অনাহত স্রোতই থাকিয়া যায়। প্রেম কর্মেরই রূপান্তর। জ্ঞানের প্রসঙ্গেও এই একই স্রোত প্রযোজ্য। আমরা বলিতে চাই—মানবতার ধর্ম্ম কর্মকে ছাড়িয়া নহে। কর্মবিমুক্ততা যে মূহুর্তে আসিবে, সেই মূহুর্তে বুঝিবে—মানুষ ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। কর্মহীন জীবন মানবের প্রেতমূর্তি।

কর্মের চতুরঙ্গ লীলা। কোন অবস্থায় মানুষ কর্মহীন নহে। এইরূপ হইলে তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া মানব-ধর্ম্ম উপেক্ষা করিবে। শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, কর্মবিমুক্ত কেহ নহে। কর্মের যে চতুরঙ্গ লীলা, তাহার ভিতর দিয়াই অতি বড় দৃষ্টি-পরায়ণ ব্যক্তিও ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে। মানুষের যন্ত্র চতুর্ক্ষয়ে যুগপৎ ক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায়। যে কর্ম ঈশ্বর যুক্তির পথ, সেই কর্ম আশ্রয় করিয়াই ভগবান প্রকাশিত হন।

ঈশ্বর যুক্তির জগৎ কর্ম ঈশ্বর লক্ষ্যে লইয়া চলে। অগৎ কর্ম কামনা পূর্তির হেতু। মানুষ জন্মিয়াছে কামনা সিদ্ধির জন্য নহে। ঈশ্বর প্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। অতএব ঈশ্বর যুক্তির জগৎ যে কর্ম, সেই কর্মই বিধেয় বলিতে হইবে।...চতুরঙ্গ কর্মের কথা বলিয়াছি। জ্ঞান-ক্রিয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম। প্রেম-ক্রিয়া হৃদয়ের ধর্ম্ম। শক্তি-ক্রিয়া প্রাণের আর সেবা শরীর-ক্রিয়া। ঈশ্বর-লক্ষ্যে যন্ত্র চতুর্ক্ষয়ের যে কর্ম, তাহাই প্রেম ও জ্ঞানে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া লয় এবং ইহা যখন ত্রীমূর্তি ধরে, তখন উহা উৎসর্গের অর্ঘ্য স্বরূপ হয়। এই অবস্থায় কর্মের পূর্ণাঙ্গতি দিবার যুগ উপস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। জীবনের সার্থকতা ইহাতেই।

সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল
(১৩৪৭-এর প্রবর্তক হইতে)

বেদমন্ত্র

প্রথমোহৃষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ পঞ্চদশং সূক্তং ॥ দ্বিতীয়া-তৃতীয়া ঋক্
(মণ্ডলস্য একষষ্ঠীতমং সূক্তং)

অস্মা ইহ প্রয় ইব প্র যং সি ভরাম্যঙ্গুষং বাধে সুবুজ্জি ।

ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্যয় পত্যে ধিয়ো মর্জ্জয়ন্ত ॥ ২

অস্মা ইহ ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যঙ্গুষমাশ্চেন ।

মংহিষ্টমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবুজ্জিভিঃ সুরিং বাবৃধৈ ॥ ৩

অর্থ—প্রত্যয় পত্যে ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা ধিয়ো মর্জ্জয়ন্ত । অস্মা ইহ আঙ্গুষং প্রযংসি । প্রয় ইব
বাধে সুবুজ্জি ভরামি ॥ ২

অস্মা ইহ ত্যং উপমং স্বর্ষাং সুরিং বাবৃধৈ সুবুজ্জিভিঃ মতীনাং অচ্ছোক্তিভিঃ মংহিষ্টং আঙ্গুষং আশ্চেন
ভরামি ॥ ৩

ব্যাখ্যা—প্রত্যয় (পুরাতন, অনাদি) পত্যে (প্রতু, স্বামীন্), ইন্দ্রায় (ভগবান ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত) হৃদা
(হৃদয়ের দ্বারা) মনসা (মন বা অন্তঃকরণের দ্বারা) মনীষা (প্রজ্ঞার দ্বারা) ধিয়ঃ (জ্ঞানিগণ) মর্জ্জয়ন্ত
(মার্জ্জয়ন্তি—মার্জিত করা, আরাধনা করা) অস্মা ইহ (অস্মৈ-ইং-উ সেই ইন্দ্রদেবের নিমিত্তই) আঙ্গুষং (আঙ্গুষ
স্তোম'আবোষ'ইতি যাক্—স্তোত্র বা স্তুতি মন্ত্র সম্পাদন করা বা উচ্চারণ করা) প্রযংসি (প্রার্থনা করা) প্রায় ইব
(অনের ন্যায়—অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন ব্যাগ্রভাবে অনের অনুসন্ধান করে, সেইরূপ) বাধে (শত্রুবধের
নিমিত্ত) সুবুজ্জি (স্তুতি বা মন্ত্র) ভরামি (সমর্পণ করিতেছি) ॥ ২

উপমং (উপমান হেতুভূত) স্বর্ষাং (সূর্য অরণ্যীয় ধনের দাতা) সুরিং (বিপশিত ; বিজ্ঞ) অস্মা ইহ ত্যং
(তং—সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রদেবেরই) বাবৃধৈ (বৃদ্ধির নিমিত্ত) সুবুজ্জিভিঃ (সুন্দর সুন্দর স্তব বা বিশুদ্ধ মন্ত্র-মালার
দ্বারা) মতীনাং (জ্ঞানীদের) অচ্ছোক্তিভিঃ (স্বচ্ছ বাক্য সমূহ দ্বারা ; নিষ্কলুষ) মংহিষ্টং (মহত্ত্ব সম্পন্ন, অতিশয়
প্রবুদ্ধ) আঙ্গুষং (উচ্চারিত স্তুতি মন্ত্রকে) আশ্চেন (মুখের দ্বারা) ভরামি (সমর্পণ করি) ॥ ৩

সরলার্থ—অনাদি আদি স্বরূপ প্রভু ভগবান ইন্দ্রদেবকে পাইবার নিমিত্ত হৃদয়, মন ও প্রজ্ঞার দ্বারা
জ্ঞানিগণ আরাধনা করিয়া থাকেন । সেই প্রসিদ্ধ দেবতার উদ্দেশে (আমিও) স্তুতি মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইতেছি ।
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন অনের জন্য ব্যগ্র হয়—সেইরূপ ব্যগ্রতা সহকারে (আমিও) শত্রুবধের নিমিত্ত বিশুদ্ধ মন্ত্র-
সমূহ তাঁহাকেই সমর্পণ করিতেছি ॥ ২

উপমানহেতুভূত সূর্য ধনদাতা, বিজ্ঞ প্রসিদ্ধ সেই ইন্দ্রদেবের বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশুদ্ধ মন্ত্রমালাসমূহ এবং
জ্ঞানিগণোচ্চারিত, স্বচ্ছ বাক্যদ্বারা মহত্ত্ব সম্পন্ন স্তুতিমন্ত্রগুলিকে (আমিও) স্বমুখে উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকেই
নিবেদন করিতেছি ॥ ৩

নোধস্ ঋষির/ইন্দ্রস্তুতি । ঋষি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রাধান্যহীনতা । “ইতি শুক্রমঃ ধীরাণাম্”—এই
তাদের বুলি । এখানেও তার অর্থ হয় নাই । পূর্বসূরীদেরই অনুগামী নোধস্ ঋষি ।

আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি—ইন্দ্র দ্ব্যলোকভিসারী মনের দেবতা । এ মন বৈষ্ণব কবি ও সাধকের
ভাষায় “অন্তের অশ্রু মন, আমার মন শ্রীকৃন্দাবন” । “বাবৃধৈ” ইন্দ্রদেবের বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থেই মনকে পরা-
মনে রূপান্তরিত করা, বৃন্দাবনে পরিণত করার সাধনা । মনের ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া ব্যপ্তি, বৃদ্ধি, বিস্তৃতিই
সাধকের কাম্য ॥

রেণুকণা ঘোষ

সম্পাদকীয়

প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধামণ চৌধুরী অসুস্থ। তাঁর 'সেই লেখনী আজ স্তব্ধ'—এ সংবাদও আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। ঈশ্বরের অমোঘ বিধান আমরা যুক্তচিন্তে মাথা পাতিয়া লইয়াছি। কিন্তু প্রবর্তক সজ্ব ও তার বিজয়বৈজয়ন্তী 'প্রবর্তক'-পত্র অনাহত ধারায় চলিবেই—এই গুরুসিদ্ধ চিরন্তন বিশ্বাসের আলোকে ও প্রেরণায় আমরা চলিয়াছি।

প্রবর্তকের বৈশিষ্ট্যময় সম্পাদকীয় স্তম্ভে—অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ততঃ কিম্? অথ শ্রীগুরু-যুগাভিসন্ধিরূপনিম্' ও পৌষসংখ্যায় 'ততঃ কিম্? অথ শ্রীগুরু-আবির্ভব লীলা প্রসঙ্গ'—এই মর্মসূত্রে প্রকাশিত লেখা দুইটির পর, এই ভাবধারার অনুবৃত্তি করার অধ্যাত্মগুরুভাব সম্পাদকীয় বিভাগের চিহ্নিত সাধক-মণ্ডলীর উপর সংকলিত হইয়াছে। ধারানুবর্তন আমাদের উপস্থিত লক্ষ্য। এই সিদ্ধ ধারার অনুশীলনে—অনুধানে ও অনুবর্তনে প্রবর্তকের অনন্য সাধারণ অনুরাগী ও সুনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকা তথা শুভানুধ্যায়ী সহযোগী মনীষিবর্গের সর্বাস্তঃকরণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমরা চিরদিনের ন্যায় পাইতেছি ও পাইব—এ ধারণা আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও আশা অনন্ত। এই অফুরন্ত আশাময় প্রেরণা লইয়াই আমাদের ভবিষ্যতের জয়যাত্রা। পূর্ণ যোগেশ্বর সজ্বদেবতা শ্রীভগবান দেশবাসী তথা উদীয়মান নবজাতির এই প্রার্থনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ ও সার্থক করিবেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, সজ্ব সভাপতি, ও প্রবর্তক-সম্পাদক

“ততঃ কিম্?”

“অধাতো গুরু-সজ্ব-তত্ত্ব প্রসঙ্গানুধানম্।”

“প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভষ্মমুক্ত হয়ে ক্রমশঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই যিনি বিশ্বপ্রকাশ আমাদের চিন্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে।”

বাংলা ১৩১৬ সালে (ইং ১৯১০) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের সম্বোধন করে একটি প্রভাত-বাণীতে এ-কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ ঋষি রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধির কথা। একটি তত্ত্ব-কথা। এই তত্ত্বটির বাস্তবরূপ রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালায় রচনাকাল বাংলা ১৩১৫ থেকে ১৩২১। এ সময়টিকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনা ও চিন্তার স্বর্ণযুগ বলা চলে। তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন ১৩৯৭-র ২৫শে বৈশাখ। অর্থাৎ এ কালটি রবীন্দ্র জীবনের ষষ্ঠদশক।

রবীন্দ্রনাথের উপরি উদ্ধৃত তত্ত্বদর্শনের বাবস্তরূপ

যেমন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, তেমনি ঐ তত্ত্বের আর একটি বাস্তবরূপ মতিলাল ও তৎসৃষ্ট প্রবর্তক সজ্ব। বস্তুতঃ সজ্ব ও সজ্বগুরু একটি অদ্বৈত সত্তা। দুটির পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মতিলালই প্রবর্তক সজ্ব, সজ্বই মতিলাল।

মতিলালের জীবনবিবর্তনের ষষ্ঠদশকটিও বিশেষ ভাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩১-১৯৪০, পঞ্চাশ অতিক্রান্ত মতিলাল তখন ষাটের অভিমুখে অভিযাত্রী। এই কালটিকে মতিলালের অধ্যাত্মচেতনারও স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই দশকে মতিলালের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে, বিভিন্ন অর্থ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মধ্যে, বিশেষ করে প্রাত্যহিক সজ্ববাণী-গুলির মধ্যে প্রতিকূলতার সহিত অহরহঃ সংগ্রামরত মতিলালের মূর্তিটি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মতিলালের জীবনদর্শনের ভষ্মমুক্ত রূপটি। মতিলালের অন্তর্নিহিত তেজরশ্মি ক্রমশঃ দীপ্যমান হয়ে উঠেছে এবং সেই দীপ্তিতে যিনি বিশ্বপ্রকাশ তাঁর প্রকাশও উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে মতিলালের সন্তায়। মতিলাল ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন গুরু-স্বরূপে।

প্রতিকূলতা তো মতিলালের জীবনের সূচনা থেকেই।

সাংসারিক অভাব অনটনের প্রতিকূলতা, তৎকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রতিকূলতা, বন্ধুগণের বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রতিকূলতা—প্রতিকূলতা সবদিক থেকে। তথাপি অটুট আত্মবিশ্বাসে আর অবিচলিত নিষ্ঠায় মতিলাল অচল-প্রতিষ্ঠ থেকেছেন তাঁর সত্যানুসঙ্গী সাধনায়।

উপনিষৎ বলেছেন, “আত্মানং বিদ্ধি” নিজেকে জান। সেই জানাটা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন সাধক মনে প্রাণে যুক্ত হয়ে যান পরমাত্মার সহিত। তখন তিনি যুক্তাত্মা, তখন তিনি ভূমার সহিত একাত্ম। তখনই তিনি বলতে পারেন, “ভূমৈব সুখম্, নান্নৈ সুখমস্তি।”

যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে ‘আত্মানং পরিপশুতি’—আত্মদর্শন যিনি করেছেন, ‘ন ততো বিজ্ঞপ্তম্’—তিনি আর নিজেকে গোপন রাখতে পারেন না। বলেছেন উপনিষৎ। সে তখন নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্তে ব্যাকুল।

এই বিলিমে দেবার ব্যাকুলতায় দক্ষিণেশ্বরের ‘পাগলা ঠাকুর’ দিনের পর দিন বুক চাপড়ে আত্ননাদ করেছেন—“ওরে তোর। কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়, আমার অমৃত পাত্র যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, কে নিবি এই অমৃত, ছুটে আয়।”

এই বিলিমে দেবার ব্যাকুলতায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন মতিলালও তাঁর জীবন বিবর্তনের ষষ্ঠদশকে। সে কী বুকফাটা আর্তি!

“ওরে আমার অন্তরঙ্গ, আমারই বৃকের পাজরায় তোরা যে সৃষ্টিধর। আমারই আয়ুঃ তোদের নাসাপুটে বয়। ...ওরে অভিন্ন প্রাণের শতদল, তোদের মলিন মূর্তি আমার একমাত্র হুঃখ। তোদের দুর্বল অস্তিত্বটুকুই আমার ব্যথা...”

তাঁর সাধনালব্ধ সত্যকে বাস্তবায়িত করতে একদল সর্বোৎসর্গীকৃত তরুণকে তিনি আহ্বান করেছেন ব্যাকুলভাবে। পেয়েওছিলেন কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে নিতান্ত কতিপয় ব্যতীত আর সকলের নিকটই মতিলাল ছিলেন দুর্বোধ্য। যেমন দুর্বোধ্য ছিলেন ভগবান যীশু তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছেও। বস্তুতঃ সেই অন্তরঙ্গ দ্বাদশ খ্রীষ্ট শিষ্যের একজনই তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিটে (betray) করল। না; সজ্ঞগুরুকে যুড়াসের মত স্থূল

অর্থে কেউ ‘বিটে’ অবশ্য করেন নি, কিন্তু ব্যাপকার্থে কোন কোন সজ্ঞসন্তান তাঁকে ‘বিটে’ করেছেন বৈকি। তাঁরা অপারগ হয়েছেন সজ্ঞগুরুর আদর্শানুযায়ী আত্মগঠন করতে, ব্যর্থ হয়েছেন আত্মসমর্পণযোগে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে। পারেন নি কর্মকে সম্পূর্ণ ফলকামনামুক্ত এবং অহংমুক্ত করতে। তাঁদের জন্মেই মতিলালের গুরুসন্তান এই আত্ননাদ। তাঁদেরই ‘দুর্বল অস্তিত্ব’, তাঁদেরই ‘মলিন মূর্তি’ মতিলালের পাজর ভেঙে দিয়েছে বারে-বারে, অবশ্য পথ যে একলা চলারই পথ, ওপথের সহযাত্রী হওয়া যে সহজসাধ্য নয়, তা’ মতিলালও জানতেন। তাইতো মাঝে-মাঝে আত্ননাদ করে উঠেছেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। তবে একলা চল রে।’ এ পথটি তো সোজা নয়, সহজও নয়। ক্ষুরধারশাগিত পথ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় ও পথ সহজও আবার শক্তও।

১৩১৫-র একটি প্রভাতবাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ ‘সাধনার দুই অঙ্গ আছে...এক যায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক যায়গায় সহজ হওয়া।’

তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি একটি অপরূপ উপমার সাহায্যে।

‘জাহাজ যে চলে তাঁর দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধ’রে রাখতে হবে। প্রবতারাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিঁধে পথ ধ’রে চলা চাই।.....এর জন্তে অহরহঃ সচেত্ন সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্তে জ্ঞান এবং শক্তি চাই। আর একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা।...আধ্যাত্মিক সাধনাত্তেও তেমনি একদিকে যেমন নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেত্ন রাখতে হবে, তেমনি আর এক দিকে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে।’

শ্রীমতিলালের মধ্যে একাধারে এই সহজ এবং শক্তের পরমাশ্চর্য্যকর সমন্বয় ঘটেছিল। অর্থসাধন ক্ষেত্রে, সজ্ঞপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর শক্ত রূপটিই সহজে সকলের দৃষ্টগোচর হয়েছিল; তাঁর অন্তর্গত সহজ রূপটিই

সংগুপ্ত থেকে গেছে অনেকের কাছে। সেইটিই তাঁর যুগসত্যদ্রষ্টা রূপ, যুগগুরু রূপ। সেই যুগগুরু মতিলাল বলেছেন, “যুগচেতনায় আমার প্রাণের সাড়া যদি না যুক্ত হয়, ভাগবত জীবনবাদের সাধনা যে অসিদ্ধ হয়।”

অতীতের আচার্যকুল প্রদর্শিত ভাগবত চেতনার সঙ্গে মতিলাল সংযোগ করলেন যুগচেতনা। এযুগ কেবল কৌপীনবস্ত্র গৃহবাসী হয়ে পরমার্থ চিন্তার যুগ নয়। এ যুগে বেঁচে থাকতে হবে সংগ্রাম করে এবং সে সংগ্রামে অর্থশক্তি একটি অপরিহার্য আয়ুধ। এ যুগে অর্থকে ‘অনর্থম্’ বলে এড়িয়ে থাকার উপায় নেই। মতিলালের যুগ-চেতনাসিদ্ধ দৃষ্টিতে অর্থ ‘অনর্থম্’ নয়। সে অর্থ মানবকল্যাণপ্রসূ এবং ফলাকাজ্ঞাবজিত কর্মের প্রকরণ মাত্র। মতিলাল-সৃষ্টি অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলি তথাকথিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নয়, একদল শুদ্ধসত্ত্ব নরনারীর নিষ্কাম কর্মক্ষেত্র।

এই নিষ্কাম কর্মসাধনা তথা অর্থসাধনাকেই তিনি বলেছেন ‘নূতন সৃষ্টি’, বলেছেন, ‘অতীতের রচনা নয়’। এই যুগসত্যদ্রষ্টা মতিলাল যেমন সহজ, তেমনই ছর্ব্বোধ্য। এই মতিলালকে প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন মায়াবাদীরা ভুল বুঝবেন বৈকি! অন্তরঙ্গদের মধ্যেও কি সকলে এই মতিলালের যথার্থ স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিলেন? তাই যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, “কতজন ছিল শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গেপাঞ্জ—দ্বাদশ গোপাল বৈ তো নয়। দক্ষিণেশ্বরের কীর্তি প্রচারের জন্মেই বা ক’জন সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হয়েছে?”

মতিলাল যে যুগের মানুষ, সেই যুগেরই মানুষ রবীন্দ্রনাথ। সে যুগ বর্তমান যুগ। এই কালটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ১৩১৬ সালের একটি প্রভাত বাণীতে :

“তোমরা জাননা এই কাল কত বড় কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব কমই এসেছে। বিশ্ব-মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে..... পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করার জন্য মানবমাত্রেই উঠেপড়ে লেগেছে। নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলতে হবে।.....মানব প্রকৃতি পূর্ণতার আশ্বাদ পেয়েছে,

একে এখন কোনোমতেই বাহিরের শক্তির দ্বারা চেপে ছোট করে রাখা যাবে না।’

রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে যে যুগের ছবিটি ধরা দিয়েছিল প্রায় দুইদশক আগে, সেই যুগেরই অবদান মতিলাল। মতিলালের জীবনের ষষ্ঠদশকে দেখা যাচ্ছে যুগচেতনার সেই চাঞ্চল্য। নূতন ভাবে জীবনকে, দেশকে গড়ে তুলবার সেই মত্ত আবেগ। সে মতিলাল পূর্ণতার আশ্বাদ পেয়েছেন, এবং সেই রস (রসো বৈ সঃ) জনে-জনে বিতরণ করবার জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন।

সাধকের যে অবস্থার বর্ণনায় উপনিষৎ বলেছেন, “আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন”—ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপটি যিনি জেনেছেন, তিনি কিছুতেই ভয় পান না—মতিলালের সাধকসত্তা তথা গুরুসত্তা তখন লাভ করেছে সেই অভীঃ স্বরূপ। তাইতো তিনি অকম্পিত নির্ভীক কণ্ঠে বলতে পারেন, ‘তোমাদের নির্ভয় কণ্ঠে বলি, আমার জীবনে লভিয়া জীবন, সফল কররে দেশ’। বলতে পারেন, ‘আমি যখন সজ্জগুরুর আসনে দাঁড়াইয়াছি তখন নির্ভয় কণ্ঠে বলি, ‘মামেকং শরণং ব্রজ’।

এমন কথা কে বলতে পারে? কখন বলতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে :

“নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরে ভালবাসা আসবে। নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ঈশ্বর প্রেম। আর ভালবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখোচোখি হয় না। ভালবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা।’

এই মুখচন্দ্রিকা তখন হয়ে গেছে মতিলালের। নিষ্কাম কর্মসাধনায় তিনি সিদ্ধ হয়েছেন, হয়েছেন শুদ্ধাত্মা। তাই তো ‘না বিভেতি কুতশ্চন’। আত্মস্বরূপ প্রকাশ করতে আর ভয় নেই। যেমন একদা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অনবদ্য ক’টি কাব্যময় শব্দে : ‘যে রাম, সে কৃষ্ণ, ইদানিং সে-ই রামকৃষ্ণ’।

মতিলালের দিব্যদৃষ্টিতে যুগোপযোগী ভাগবৎ ধর্ম-সাধনার যে পথটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে, সে পথ অতীতের কোন মহাজন প্রদর্শিত পথ নয়। সে এক দূরূহ দুর্গম নূতন পথ। বলা চলে আত্মসমর্পণ তথা ধর্মার্থ সাধন যোগমার্গ। তাই তো তিনি বলেন, ‘পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা

দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা। এ পথ অতীতের রচনা নয়—নূতন সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জ্যেষ্ঠ বিশ্বমানব প্রকৃতির মধ্যে যে চাঞ্চল্যের পদধ্বনি শুনেছিলেন প্রায় দুইযুগ আগে, অনুভব করেছিলেন জীবনকে ও দেশকে নূতনভাবে গড়ে তুলবার অনাগত পথ প্রদর্শকের আসন্ন আবির্ভাব—সেই যুগ-প্রতীক মতিলাল; সেই পথ-প্রদর্শক মতিলাল। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভেঙে জীবনকে ও জাতিকে নূতনভাবে গড়ে তুলবার স্বপ্নে তখন মাতোয়ারা মতিলাল। সেই স্বপ্নকে রূপ দিতে চাইলেন তিনি প্রবর্তক সজ্জ। হোক না বীজাকারে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, তবু বীজের মধ্যেই তো বনস্পতি থাকে প্রচ্ছন্ন হয়ে। ‘সেই বীজ অমর অঙ্কুরে/উঠবে অমর পানে’— এই স্বপ্নই দেখে গেছেন মতিলাল আমরণ। ব্যাকুল কণ্ঠে

ডাক দিয়েছেন, ‘তোমরা বিশ পঁচিশ জন মানুষ অপ্রাকৃত জীবনের ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়াও। নূতন ভাগবত ধর্মে দেশে প্লাবন সৃষ্টি হবে।’

সেই প্লাবন আজও অনাগত। তবু আমরা নিরাশ হব না। প্রবর্তক সজ্জ আজও বীজাকারে ধারণ করে রেখেছে মতিলালের অন্তর্গত সাধন শক্তিকে। এর হাল ধরে আছেন শক্তহাতে বর্তমান সজ্জ সভাপতি ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রেখে, এর ‘পালে’ও লেগেছে অনুকূল হাওয়া, যে হাওয়াটা প্রভাবিত করছে ভারতাত্মার শাস্ত্র বাণীমূর্তি এই ক্ষীণকলেবর ‘প্রবর্তক’ নামা পত্রিকাটিকে।

তাই কবিগুরু ভাষায় বলব, সজ্জগুরু পুণ্যস্পর্শে প্রবর্তক সজ্জ পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে। একে আর কোন-মতেই বাইরের কোন অন্তর্ভুক্ত শক্তি চেপে ছোট করে রাখতে পারবে না।

মহিমা

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

বিসর্জন হয়ে গেলে মাটির প্রতিমা
জায়গাটা কিছুক্ষণ যেন ফাঁকা ফাঁকা
মনে হয়। দেবতার নিজস্ব মহিমা
বলি যদি, কেউ খুসী, কেউ মন রাখা
কথা হল মনে করে করবে গোপন
ঠোঁটের তির্যক হাসি। দুই বিপরীত
মনে করা করি ঠিক মনের দুকোণ
থেকে যে ফেলেছে আলো। দুই চায় জিৎ।

কিছুক্ষণ কাছাকাছি; তারপর যদি
দূরে চলে যায় কেউ, শূণ্যতার বোধ
কেন যে বইয়ে দেয় অক্ষর নদী,
মানো নাকো কোন কথা, কোন অবরোধ,
মানতে চায়না যেন জীবনের সীমা
দেবতার চেয়ে বড় মনের মহিমা।

কেদার-বদরী

শ্রীশুধীর গুপ্ত

ভারতের ভাব-লোকে কেদার-বদরী
সমুদ্ভাসে বিরাজিত। যুগলের টান
অপূর্ব নির্বেদময় ক’রে তোলে প্রাণ।
এই দুই মহাতীর্থ-দেবতারে ‘স্মরি’
কত পাস্থ গৃহ-গণ্ডি উত্তরণ করি’
ধ্যান-মৌন মহাদ্রিতে ক’রেছে প্রস্থাপ;
শ্রেয় যাহা, ক্রমে তা’রও পেয়েছে সন্ধান;
চুপে চুপে নিয়েছে যে বরণে বরি’।

হিমাদ্রি যে অধ্যাত্মেরই পরম নিলয়।
কেদার-বদরী সেথা তুষার-মণ্ডলে
মানবের ভাবনিষ্ঠ হ’তে শুধু কয় :
মর্ম ভরে তুষারের উজ্জ্বল ধবলে।
এ শুভ্রতা-জীবনেরই সম্পদ অক্ষয়,—
কাল-ভীতি প্রশমিত করে মর্ত্য-তলে।

অধ্যাত্ম চেতনার আলোকে বিভূতিভূষণ

রতন দাশগুপ্ত

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে যে সুরটি অনুরোপিত হয়েছে তা ঐতিহ্যলালিত ভারতীয় মরমীয় চেতনা সঞ্জাত। ভারতীয় ভাবধারার সময়সীমী চেতনা তার মনে সবসময় গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব চৈতন্য-প্রবাহের অপার্থিব, ঐকান্তিকতায় মুখর। মধ্যযুগীয় সাধু, সন্ত, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ যারা প্রচলিত বিধি বিধান তুচ্ছ করে মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। ভগবানকে শাবার ঐকান্তিকতাকে নির্দিষ্ট কোন পথকে ধ্রুবতারার লক্ষ্য করে অগ্রসর হননি। আপন হৃদয়মন্দিরে যে সুপ্ত শক্তি ক্রিয়াশীল তারই উদ্ঘাটন এই সাধনার মূল সূর। আপন হৃদয়ের অন্তর প্রদীপ জ্বলে পথ করে নেন। সেই অগ্নিশিখার স্তিমিত রশ্মিই এদের আলোকাভিসার। বিভূতিভূষণের নিজস্ব চিন্তার দিকটি অনেকটা এই লক্ষের অভিমুখিন। কামনা থেকে মুক্ত হবার সদা জাগ্রত প্রয়াস তার সৃষ্টি রহস্যের দিক। অগাধ আরো দিক গুলি উপেক্ষণীয় নয়। সর্বোপরি একটা অপার্থিব চেতনার স্পর্শ চরিত্র চিত্রনের মধ্যে মিশে আছে। সে সুরটির প্রেরণা হৃদয় সঞ্জাত কিন্তু অপার্থিব চেতনার সঙ্গে দৃঢ়পিনদ্ধ। জীবনসায়াকে এই সুরটি আরো প্রকট।

জন্মসূত্রে বিভূতিভূষণ ব্রাহ্মণ সন্তান যাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে পৌরোহিত্যে, বজ্রন, যাঞ্জন এবং অধ্যাপনায় যা মুখ্যতঃ পারলৌকিক ধর্মচেতনার দ্বারা বিদ্ধত। পিতার স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ তাই তাকে বলা যায় বৃত্তিচ্যুত কিন্তু ব্রতচ্যুত নয়। পৌরোহিত্য তাকে টানতে পারেনি, তীর্থ পরিভ্রমণের মধ্যে লোকজীবনের ধারাকে অনুসরণ কোরে তাদের সহজাত হৃদয় বৃত্তির মধ্যে ভক্তির পরোৎকর্ষকে খুঁজেছেন। বিভূতিভূষণ যেমন বলেছেন, তিনি তাম্রা তুলসীতে বিশ্বাসবান নন, এ বোধ এসেছে পিতা মহানন্দের মধ্যে।

মর্ত্যচেতনার মধ্য দিয়ে পারলৌকিক জীবনের স্বাদকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। সাধন মার্গের মধ্যদিয়ে ঐশীচেতনার উদ্বোধন হয়। এই চেতনা অধিকারী ভেদে বিভিন্ন স্তর বিভাগ আছে। মানুষের

কর্মফল এই চেতনার মধ্যে ক্রিয়াশীল, লেখকের 'দেবযানে'র পরিকল্পিত চরিত্রগুলি বহু দিনের চিন্তার ফসল। বাংলা উপন্যাসে এমন অভিনব সৃষ্টিকৌশল ইতিপূর্বে কোথাও পরিবেশিত হয়নি। এ পরিকল্পনায় আছে গগণবিহারী দৈবীভাবাপন্ন আত্মার অবস্থান। সূক্ষ্ম দেহ থেকে সূক্ষ্মতর দেহের অবস্থান, বিরাট বিপুল বিশ্ব যেন চিৎশক্তির আধার। মানুষ এসেছে আকস্মিকভাবে, এর নেই আদি নেই অন্ত, দ্বার দ্বারীক্ষা জগতের অণু পরমাণুর মধ্যে, কোটি কোটি জীবনের সন্ধান, এই অন্ত-হীন জীবনপ্রবাহের মধ্যে সে মিশে যায় হয়ত অন্যলোকে চলে যায়। পৃথিবীর মানুষের মত জৈবসত্তা থাকে না। এখানেও কি আছে সুখ দুঃখের অতিনাটুকেপনা। ক্রান্তিকর জীবনযন্ত্রণার নিষ্পেষণ। লেখক আধিমানসিক চেতনার অবগুষ্ঠন সরিয়ে জৈবচেতনার উর্দে একটি শান্তিময় জগতের সন্ধান দিয়েছেন। যার উপলব্ধি রয়েছে মুক্ত প্রাণের প্রসারণের মধ্যে। এ জীবন একদিন শেষ হবে, এখানেই কি তার সমাপ্তি, কাম্য সাধনার চরম অভিব্যক্তি কি এটুতেই, না আরো আছে প্রসারণ, সাধকেরা যার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ছুটে চলেছে সেই দিকে, অনন্ত জীবনের উপলব্ধি কি এই মর্ত্য কাম্যতেই শেষ।

বিভূতিভূষণ পৃথিবীর উর্দ্বলোকে যে ছবি এঁকেছেন তারই আভাস পাই তার রচনায়—“আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু উর্দে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্প সভার সমুদ্র বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মত তাদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই মা বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন এ যেন তাদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিতে দেখতে পেলুম।”

দেবযান লেখার জন্য অনেককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তাঁর সংশয় ছিল পাঠকরা ভালভাবে গ্রহণ করবে না। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও সংশয় প্রকাশ করে, তাঁটার হলে গাঁজাখুরি আখ্যা দিয়েছিলেন, পরে অবশ্য মত পরিবর্তন করেন। আজও এ বিষয়ে অনুল্লেখ্য, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-‘বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ নামক বিখ্যাত পুস্তকে এ বইয়ের কোন উল্লেখ নেই। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়েনি। বোধহয় মানুষের মহত্ব অনেকাংশে সমসাময়িকরা অনুধাবন করতে পারেন না। সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অনেকাংশে তারা বার্থ, কারণ ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফল ঈর্ষা, অসূয়া ও জুগুপ্সা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশে থাকা অস্বাভাবিক নয়। হত্যার পর আমরা উপলব্ধি করি সামগ্রীকভাবে, তখন আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সহজ সম্পর্কটি ছিন্ন হয়, ব্যক্তিত্বের খোলসটি তখন দ্বিধলপত্র বীজের মত খোলস ত্যাগ করে নতুন জীবন সঞ্চারে তৎপর হয়ে ওঠে। এই নতুন জীবনকে উপলব্ধি করি নিঃসংশয় দৃষ্টিতে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি তখন থাকে না, ফলে সমগ্র জীবন চেতনার গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে সুন্দরের প্রকাশ পূর্ণতর ভাবে বিরাজ করে। সমসাময়িকের দরবারে তাই দেখা যায় সব প্রতিভাবান মানুষেরাই অবহেলিত, মৃত্যুর পর আমরা অনুশোচনার দ্বারা স্মৃতি রোমন্থনে আত্মতৃপ্তি খুঁজি। কারণ অনুশোচনার মধ্যে কৃতকর্মের অদমিত ইচ্ছা বা অভিপ্সাকে সত্যরূপে প্রকাশ করি। আমাদের মূল্যায়ন সকল ক্ষেত্রেই এই গতি নিয়ে চলে, তা না হলে, প্রতিভাবানদের চিনতে এত দেরী হয় কেন? অত্যাধিক প্রথাগত চিন্তায় আমরা সবসময় অভ্যস্ত নতুন কিছু চিন্তা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হলে আমরা সন্দেহান হয়ে উঠি। সরল গদ্যভঙ্গি উপল ব্যথিত গতি নেয়। বিভূতিভূষণের, ‘দেব-যান’ যেন নতুন পরীক্ষার সোনালী ফসল, একে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করার মধ্যে আমাদের কুণ্ঠা স্বভাবতই প্রবল, কারণ এ যে নতুন ফসল।

‘দেবযান’ লেখার পর অনেকেই প্রশ্ন করলেন লেখকের শক্তি স্তিমিত হয়ে এসেছে। পাঠকদের আর বৈচিত্র্যের

স্বাদ দিতে না পেরে, অলৌকিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি পরলোক তত্ত্বে মেতে উঠেছেন—“যশোহর কলেজের এক অধ্যাপক বলে উঠলেন, আরে, শুনেছেন—বিভূতিবাবু মারা গেছেন? স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি রকম! কই কানজে দেখিনিতো? তিনি হেসে উঠে বললেন, না, না দৈহিক মৃত্যু নয়, সাহিত্যিক মৃত্যু। মানুষ ছেড়ে ভূত প্রেত নিয়ে কারবার শুরু করেছেন। পরে জানলাম অধ্যাপকের মন্তব্য ‘দেবযান’ সম্বন্ধে।”*

পরলোক সম্বন্ধে একটা কল্পিত জগৎ, সেই জগতের রূপ-রেখা সম্বন্ধে গল্পের আকারে পরিবেশন করা বাংলা সাহিত্যে বোধহয় প্রথম প্রয়াস। এই বইকে অভিনন্দন না জানিয়ে সংশয় প্রকাশ করার মধ্যে আমাদের বৈচিত্র্যহীনতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। জন্মান্তর-বাদ বিশ্বাসী লোকেরা এর একটা মূল্য দেবেন। আমাদের স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সংস্কারের দ্বারা আবর্তিত হচ্ছে। বিভূতিভূষণ আমাদের একটি কল্পিত জগতের সন্ধান দিয়েছেন এবং উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে তাকে রূপ দিয়েছেন। সে চেষ্টা উপন্যাসের ফলশ্রুতির দিক দিয়ে অভিনব। পরলোক বিশ্বাসীদের কাছে এর একটা আবেদন আছে, যদি নাও থাকে, তবে অন্তত পক্ষে একটা তীব্র সন্দানী আলো ফেলা হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। গবেষকরা এ বইকে যেন উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন। বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ এবং মদভগবত গীতার মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার যে সূর অনুরোধিত হয়েছে, তার মূল ভাষ্য এই বইতে বিদ্যুত হয়েছে। সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভূতিভূষণ একটি চিঠিতে যে কথা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি এবিষয়ে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ছিলেন কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, তারা মনে করতেন এগুলি তাঁর প্রতিভার অবক্ষয়ই সূচিত হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে তার কেন্দ্রাতিগশক্তির উৎসই হচ্ছে spiritualism.

“আপনি পরলোক সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, আমি সারা জীবন ধরে জন্ম মৃত্যু রহস্যের আলোচনা করে ও রহস্য জেনে ফেলেছি। আমি গত ২৫ বছর ধরে

* শ্রীশিবদাস চক্রবর্তীর লেখা থেকে।

spiritualism আলোচনা করেছি। মৃত্যু যে বৃহত্তর জগতের দ্বার সে কথা আমি জানি যখন আমার বয়স ২৭ বৎসর তখন থেকেই। প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর উর্দ্ধে বহুস্তর বিদ্যমান; বিশ্বে বহুলোক, বহুস্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর সেখানে জীবের গতি হয়। এই সব Super Mundance worlds আছে এবং ঋষিরাও প্রাচীন যুগে তাদের অস্তিত্ব জেনে ছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।”*

লেখক জীবাত্মা ও পরমাঙ্গার যোগ সূত্রটি রক্ষা করেছেন কল্পনাসূত্রে। মৃত্যুর পর দেহ লীন হয় সত্য, সে যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করে—এই মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান রয়েছে সেই ব্যবধানের মধ্যে লেখকের উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি। লেখক এখানে স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করেছেন, আঙ্গার অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন কর্মফল অনুসারে, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে। পাপ ও পুণ্যের এই কল্পনা সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রে স্বীকৃত, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান ইত্যাদি। কর্মানুসারে মৃত্যুর পর লোকে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করেন এ কথা কাল্পনিক মন গড়া হলেও আমাদের নীতিবোধ অনেকাংশে এই অনুশাসনের দ্বারা চালিত। লেখক যদি এর মধ্যে একটা কাহিনীর অবতারণা করেন তাহলে সেটা স্পষ্টভাবে আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনে ও দৃষ্টি তাত্ত্বিক বিষয়ে রূপরেখা গল্পাকারে সহজভাবে প্রকাশ পায়।

মানুষ চিরকালের গল্পপ্রিয়, আমাদের নীতিকথা-গুলো প্রায় সবই গল্পছলে বলা হয়েছে। মানুষ এ থেকে পেয়েছে গল্পের স্বাদ সেই সঙ্গে জীবনে আচরণীয় কর্তব্য কর্মগুলি এই নীতিবোধকে প্রসারিত করে জীবনচর্যার সহায়ক হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতে নীতিবোধগুলি যদি সাধারণভাবে প্রকাশ পেত তা হলে কি লোকে এগুলো গ্রহণ করতো। এতে কাহিনীর বিস্তার আছে বলেই লোকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে পেয়েছি, ত্যগ, নীতি, মমত্ববোধ, একতা, নীচতা, শঠতা, প্রেম, ভালবাসা, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি সেই সঙ্গে আরো পেয়েছি রাজ্য চালাবার কূট

কৌশল, রণনীতি এক কথায় সেকালের পরিপূর্ণ জীবন, দর্শন। এ সব কাহিনী কতদূর ঐতিহাসিক সত্যতায় পৌঁচেছে তার হিসাব না করলেও চলে, কারণ আমরা ইতিহাসের বিচারবোধ দিয়ে ঘটনার সত্য নির্ণয়ে সাহায্য করছি না। কল্পনার খাদ অনেকাংশে রয়েছে এতে। আমাদের মধ্যে গল্পপ্রিয় যে মনটি রয়েছে তার ক্ষুধার নিরসন হয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের একটি সত্য লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রয়াস। আজগুবি অথবা গাঁজাখুরি হতে পারে গল্পটা কিন্তু আসল লক্ষ্যে পৌঁছাবার ইঙ্গিত রয়েছে এতে।

বিভূতিভূষণের জীবনের প্রব লক্ষ্য ছিল একটি, সেটাকেও তিনি এগ্নি গল্পের রসে রঞ্জিত করে বৃহত্তর ও মহোত্তর জীবনের পরিণতির কথা স্মরণ করেছেন। বিভূতিভূষণের দৃঢ়প্রত্যয়ী মন একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন :

“আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পরে এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত জীবন, পৃথিবীর এই মৃত্যু স্পর্শ না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তা তোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই জ্ঞানটা শুধু মানুষের দরকার।”*

বিভূতিভূষণ পরলোক তত্ত্বে যে সব ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং সেই সব তথ্য বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে কিভাবে আছে তার পর্যালোচনা করা দরকার। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে বহুসংখ্যের বিশ্লেষণ হোল—“হিন্দুরা বলেন যে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না। আপনাত্ত কৃতকর্মামুসারে পুনর্বার দেহান্ত প্রাপ্ত হয়, আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় বা নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়

* ধৃতীদীপা, ১৬ আষাঢ় ১৩৭৩।

* শ্রুতির রেখা—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাই অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে স্বর্গাদি উপ-
ভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃতপুণ্যের পরিমানানুযায়ী
কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।*

গীতার অক্ষর ব্রহ্মযোগে বলা হয়েছে, দেবযান মার্গে
সপ্তম ব্রহ্মের উপাসকগণ, অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, সুরূপক্ষ ও
উত্তরযানের ৬ মাস অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন
করেন। কিন্তু সন্ধ্যোমুক্তিভাক্ যোগিগণ জীবৎকালেই
ব্রহ্মময় হন। তাহার প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হয়
না ॥ ২৪

দেবযান ও পিতৃযানঃ জগতের এই দুটি মার্গ
সনাতন (নিত্য) বলিয়া কথিত হয়। দেবযানের গতি
হইলে মুক্তি লাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করিলে
পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় ॥ ২৬

দেবযান মার্গে গমন করিলে যোগী যথাক্রমে অর্চিঃ
অহঃ সুরূপক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু,
সূর্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যাহ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রাপ্ত হয়।
অমানব পুরুষ প্রজাপতিলোক হইতে বিদ্যাহলোকে
আসিয়া উপাসককে প্রজাপতিলোকে (ব্রহ্মলোক)
লাইয়া যান। সেই উপাসকদের আর পুনর্জন্ম হয় না।
(ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১-৪, বৃহ উপ ৬।২।১৫ দ্রঃ)

পিতৃযানমার্গে কর্মীপুরুষ, ধূম, রাজি, কৃষ্ণপক্ষ,
দক্ষিণায়ন ও পিতৃলোক অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকরূপ
স্বর্গ লাভ করেন। স্বর্গ ভোগান্তে তাদের পুনর্জন্ম হয়।
(বৃহদারণ্যক উপ ৬।২।১৬)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শৌত,
উত্তর মার্গ ও শৌত দক্ষিণ মার্গ বর্ণিত হইল। অতিবাহিত
শরীর ও অতিবাহিত দেবতার বিষয়, ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪
দ্রষ্টব্য।

কিন্তু সন্ধ্যোমুক্তিভাক্ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ জ্ঞানিগণের
কোন মার্গে গতি হয় না। তাদের প্রাণেরও উৎক্রমণ
হয় না। এইরূপ শ্রুতিতে আছে।*

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর, কারণ
শরীর বা অতিবাহিক দেহধারীদের সম্পর্কে আলোচনা
আছে, প্রমথনাথ সান্যাল সম্পাদিত 'সাহিত্য সংবাদ'

পত্রিকায় ১৩১৯ সালে মাঘ সংখ্যায়, শ্রীধরহস্য নামক
প্রবন্ধে উল্লেখ আছে, ইহার লেখক চন্দ্রনাথ কবিরত্ন।

মৃত্যুর পরেই প্রথমতঃ একটি সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন
করিতে হয়। এই দেহ অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা পর্যায়-
ক্রমে ভুবলোক ও স্বর্গলোক ভোগ করিতে পারে।
স্বর্গে যাইয়া পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্যলোকে আসিবার
কারণ হয়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে বাসনা শূন্য হইলে
তখন সে কারণ শরীর প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকের উর্দ্ধে
মহাদিলোকে চলিয়া যায়। তখন জীবাত্মা আপনাকে
চিনিতে পারে। কতজন্ম তাহার হইয়া গিয়াছে এবং
আবার বা কি হইবে তাহা সে বুঝিতে পারে। সংসার
ভ্রমণ উদ্দেশ্য বুঝিয়া পুনঃ তাহা সিদ্ধ করিবার জন্ম আবার
একটি নতুন দেহ ধারণ করিবার চেষ্টা করে, তখন আবার
একটি সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত পিতামাতার
সংযোগে একটি স্থূল দেহ রচিত হইলে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট
হইয়া তাহাকে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়।

পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে ধ্রুবতারার পর্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র
তারকাদি খচিত যে আকাশময় স্থান আমরা দেখিতে
পাই, উহার নাম ভুবলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক। এই
লোকে অসংখ্য জীব বাস করিতেছে এবং উহার উর্দ্ধে
মহেন্দ্রলোক। এই লোকে অসংখ্য উত্তমোত্তম প্রাণী
সকল বাস করিতেছে। এখানে তিন জাতীয় দেবতা
বাস করেন। ইহারা সকলেই সংকল্পসিদ্ধ, অনিত্যাদি,
ঐশ্বর্যযুক্ত, কল্যায় এবং মনুষ্যগণের পূজনীয়। ইহাদের
দেহ মাতৃপিতৃ সংযোগে উৎপন্ন নহে। ইহাদের দেহ
পূর্বজন্মার্জিত ধর্মের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। পুণ্যবলে
এবং ধর্মের তেজে সুসংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অনুসকল
ইহাদের সেই পবিত্রতম দেহ উৎপন্ন করিয়াছে। এইজন্য
ইহাদের সেই নির্মল দেহ মলিনদেহী মানবগণ কখনও
দেখিতে পায় না। তদুর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক। এখানে
শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। আমাদের ন্যায় ইহারা
আহার করেন না, ইহারা ভোগ্যবস্তু পরিদর্শন ও ধ্যান
করিয়াই পরিতৃপ্ত। তারপর জনলোক। এখানে চার
প্রকার দেবজাতি আছেন। এই লোক অতিক্রম করিলে
তপলোক। তাহার পরেই সেই সত্যলোক। এখানেও
চারপ্রকার দেবজাতি বাস করেন। ব্রহ্মার ন্যায় ইহারা

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—বঙ্কিম রচনাবলী।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত।

সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ইহারা মহাপ্রলয় পর্যন্ত জীবিত থাকেন। আমাদের পিতৃগণের জীবাত্মা যখন এই সকল লোকের অন্তর্গত তখন তাহাদের তৃপ্তির জন্য কামনা করি, অন্ধাপূর্বক অন্নজলাদি দান যে নিরর্থক তাহা মনে করা অজ্ঞতার কার্য।

কল্পনাশ্রমী এই কাহিনীতে সত্যের প্রতিভাস বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিজ্ঞান কি মানুষের জীবনের সর্ব ব্যাপক কোতুহলকে নিরসন করতে পেরেছে? মানবজীবনের জটিল রহস্যময় অনেকদিক আজও বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে অনুদঘাটিত। “The scientist holds that only empirical verifiable evidence is to be treated as true.....Science can not solve the ultimate mystery of nature. কিন্তু সত্যে পৌছবার জন্য ধর্মীয় প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে—“All religions are human attempts to reach the ultimate reality.” বিজ্ঞানের যুক্তি এক Transcendent and immanent বিশ্বাতিগ আর বিশ্বনিহিত শাস্ত্র সত্তা আছে, যে সত্তা হচ্ছে সর্বস্বর, যার মধ্যে আমরা সকলে আছি—যে সত্তার মুখ্য রূপ হচ্ছে প্রজ্ঞান বা সম্পূর্ণজ্ঞান আর যে সত্তার সঙ্গে আমাদের প্রধান যোগ সূত্র হচ্ছে আমাদের রতনানন্দানুভূতি—Rapturous amazement. বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। Albert Einstein in his book “The World as I

see it”, observes that the scientist’s religious feeling takes the form of a rapturous amazement at the harmony of natural law, which reveals an intelligence of such superiority that, compared with it, all the systematic thinking and acting of human beings, is an utterly insignificant reflection.

বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের যোগ কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত আছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সাফল্য আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছে কিন্তু মানুষ এই বিশ্বাস-বোধ থেকে নিজেকে জানতে গিয়ে একটা অসহায় অবস্থায় এনে ফেলেছে। এই অবস্থা বিজ্ঞানের কল্যাণ-কর অবস্থার মধ্যে একটা গভীর শূন্যতা বোধ সৃষ্টি করেছে যে শূন্যতাকে পূর্ণতা দিতে বিজ্ঞান অপারগ। তাই মানুষ চাইছে এমন একটি নির্ভরতা যা মানুষের শাস্ত্র সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে। সর্বজন আক্রেয় দার্শনিক ডঃ রাখাক্ষণ এই স্বরূপের আভাস দিয়েছেন, তাঁর বক্তব্য হোল, Man has a submerged consciousness which is in contact and communion with similarly submerged worlds of consciousness. Man’s consciousness possesses acrials that catch vibrations from unknown regions. He has a secret sensitivity that receives informations from other where than his physical senses and his logical reasons.

(উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি ডঃ রাখাক্ষণের লেখা থেকে নেওয়া)।

লক্ষ্মী-কৃপা

(মহাভারতের শান্তিপর্ব অবলম্বনে লিখিত)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

অমুরদের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর অমুরধুরী পরিত্যাগ করার সময় দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

দেবরাজের প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মীদেবী অমুরদের যে সব আচরণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। এগুলি বর্তমান কালেও প্রণিধানযোগ্য এবং তাৎপর্য পূর্ণ।

উচ্চৈশ্চাভ্য বদন রাত্রৌ

নীচস্ত্রাগ্নির তুল্য

পুত্রাং পিতৃনত্যাচরেন্

নার্যাস্তত্যা চরণ পতীন্।

অমুরগণ অধিক রাত্রি পর্যন্ত উচ্চৈশ্বরে কোলাহল করে এবং তাহাদের গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি উজ্জলভাবে জ্বলে না।

অসুরদের পুত্রগণ স্ব স্ব পিতাকে অত্যাচার করে এবং
জীলোকেরাও তাহাদের স্বামীকে অত্যাচার করে।

বর্তমান সমাজেও অনেক অসুরভাবাপন্ন পুত্র,
উপার্জনহীন বৃদ্ধ পিতামাতাকে অবহেলা অশ্রদ্ধা ও
অবজ্ঞা করে।

আসুরিক ভাবাপন্ন অনেক স্ত্রীগণও পতিকে অবজ্ঞা
ও অশ্রদ্ধা করে এবং অপ্রিয় কথা বলে। এরূপ পরিবেশ
লক্ষ্মীকৃপার অনুপযোগী।

যুবানশচ সমাসীনা

বৃদ্ধানপি গতান্ যতঃ

নাভ্যাঞ্চানাভি বাদাভ্যাং

খল পূর্বমপুজয়ন্।

উচ্চাসনে উপবিষ্ট নব-যুবক (অসুরগণ), বৃদ্ধবাস্তি
আসিলেও পূর্বের তায় উঠিয়া দাঁড়ায় না এবং বৃদ্ধগণকে
অভিবাদন সংকার আদি করে না।

সর্বদেশেই সুধীসমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান
এবং মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

দেশাচার অনুসারে চেয়ার বা উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া,
বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।

অনেক পরিবারে উশৃঙ্খল অসুরভাবাপন্ন যুবক
যুবতীগণ এসব সদাচার পালন করে না। এরূপ আচরণ
কল্যাণ ও শ্রী পরিপন্থী।

উৎ সূর্য্য শায়িতাশ্চাসন

সর্বোচাসন প্রাপেনিদাঃ

অর্বত্তন্ কলহশ্চাত্র

দিবা রাত্রিঃ গৃহেগৃহে।

অসুরেরা এখন সূর্যোদয়ের পরও শয্যায় শায়িত
থাকে এবং প্রাতঃকালকেও তাহারা রাত্রি মনে করে।

অসুরদের প্রতিগৃহেই দিবারাত্রি ঝগড়া বিবাদ লাগিয়া
আছে।

আজকাল বহু পরিবারে যুবক যুবতীগণ সূর্যোদয়ের
পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে না; অনেকেই প্রাতঃকালের
অমূল্য সময় হেলায় নষ্ট করে।

এরূপ উশৃঙ্খলতা স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। ইহাতে দেহ
মনের শান্ত সুন্দরভাব নষ্ট হয় এবং ধৈর্যহীনতার
অভাবে পারিবারিক শান্তিও ক্ষুণ্ণ হয় এবং ঝগড়া বিবাদ
বৃদ্ধি পায়। পরিণামে ক্রমে সংসার শ্রীহীন হয়।

সভাসদাঞ্চ বৃদ্ধানাং

সতাং কথয়তাং কথা

প্রাহসন্নভাসুয়ংস্চ সর্ব বৃদ্ধান্
গুণাবরাঃ।

যখন বয়োবৃদ্ধগণ একত্রিত হইয়া নানা সং বিষয়
আলোচনা করেন, তখন গুণহীন অসুর যুবকেরা
তাহাদিকে উপহাস করে এবং দ্বেষ-দৃষ্টিতে দেখে।

বৃদ্ধগণের প্রতি যুবকদের এরূপ ব্যবহার, লক্ষ্মীকৃপার
পরিপন্থী।

বর্তমান সমাজেও অনেক স্থলে যুবকদের উক্তরূপ
আচরণ দৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য এরূপ ব্যবহার আসুরিক
ভাবেরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি।

প্রথেন্নোনাপি চারক্ষচ্চিত্তং পুত্রয় বৈ পিতা।

পিতাকে বিশেষ চেষ্টা করে, পুত্রের মনরক্ষা করে
চলতে হয়। সবই বিপরীত।

শ্রুজ্ঞ শ্রুতরোরগ্রে

বধুঃ শ্রেষ্ঠান শাসিত

অনুশাসনচতুর্ভাং

সমাছয়াভি বজ্জতি।

অসুর-স্ত্রীগণ শ্রুত শাস্ত্রীর সম্মুখে সেবক সেবিকাকে
শাসন করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীকেও শাসন করে ও
আদেশ দেয়। শুধু তাহা নহে প্রকাশে সকলের সম্মুখে
স্বামীকে ডাকিয়া আলাপ আলোচনা করিতেও তাহারা
সঙ্কোচ বোধ করে না।

বর্তমান সমাজেও অনেক পরিবারে কুলবধুদের
আচরণ উক্ত প্রকার দোষযুক্ত হইতে দেখা যায়। রলা
বাহুল্য, এইরূপ আচরণ অপমানজনক।

অনুশাসন পর্বের একটি শ্লোক, এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা
যাইতে পারে।

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্তিবর্দ্ধনঃ

আপরাং বর্দ্ধতে ছায়ুরাচারো হন্তি অলক্ষণম।

সদাচার পালনে সর্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণ হয়।
সদাচার পালনে যশ ও কীর্তি এবং পরমায়ু বৃদ্ধি লাভ
করে। শুধু তাহা নহে সদাচার পালনকারীর সমস্ত
অমঙ্গল নষ্ট হয়।

এরূপ সর্বকল্যাণকারী সদাচার পালনে যুবকদের
অবহেলাই দুঃখ দৈন্তের কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জীবনশিখী শ্রীমতিলাল

ডাঃ তারাশ্রম সরকার

॥ ৩৫ ॥

চন্দননগর বিপ্লব সমিতির কাজ পুরোদমে চলিতেছে। ওদিকে পূর্ববঙ্গেও বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুলিন দাসের অনুশীলন সমিতি বিশেষ কর্মতৎপর হইয়া উঠে। পুলিনবাবুকে ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে আটক রাখা হয়। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে অনুশীলন সমিতির রাজদ্রোহকর কার্যকলাপের জন্য পুনরায় তিনি সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

১৯০৮ সালের ২২শে মে “আমার পলায়ন” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের পর ‘যুগান্তর’ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতে ‘স্বাধীন ভারত’ নামে অপর একখানি কাগজ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে এই কাগজখানির লেখার দায়িত্ব মতিলালকে গ্রহণ করিতে হয়।

পুলিনবাবু প্রমুখ কয়েকজন জননেতা কারাদণ্ড লাভ করিলে, ঢাকার অনুশীলন সমিতি পূর্ববঙ্গে বিপ্লবের আগুন আরও ছড়াইয়া দেয়। এই সময়ে ১৮টি লোম-হর্ষক বৈপ্লবিক ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহার মধ্যে ১৬টি ঘটনা ঘটেছিল পূর্ববঙ্গেই এবং সেই সমস্তই অনুশীলন সমিতির দ্বারা সংঘটিত হয়। ১৯০৮ সালে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পুলিনবাবু কারা বরণ করিলে, এই সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষকের সহিত ৭০ জন ছাত্র বিপ্লবযজ্ঞ পরিচালনা করেন। সংবাদপত্র পড়িয়া তরুণের প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠে। রসুল দেওয়ান নামক একব্যক্তি গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যকারী হওয়ায় সোনারংএ তাহাকে হত্যাকরা হয়। এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার রাজকীয় সাক্ষী মনোমোহন দাসকে হত্যাকরা হয়। বিপ্লবীদের পরিপন্থী পুলিশ কর্মচারী-বৃন্দ এই সময়ে সহজে নিকৃতি পাইত না। রাজকুমার দে নামক একজন সাব-ইনস্পেক্টার ময়মনসিংহে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিশেষ ভাবে ইনস্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ কর্মতৎপর

হইয়াছিলেন; বরিশালে তাহাকে হত্যাকরা হয়। চাঞ্চল্যের সীমা থাকে না। তরুণের প্রাণে এই সকল ঘটনায় আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইত। এই সকল সংবাদপত্রে বিশেষ ঘটা করিয়া ছাপা হইত।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ চন্দননগর বিপ্লবকেজের একজন প্রধান সাথী ছিল। তিনি হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। কলেজের ছাত্রগণকে তিনি স্বাধীনতার প্রেরণা দিতেন। ছাত্রগণও জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কলেজে কতৃপক্ষগণ তাহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে ডেনহাম সাহেব পুলিশের প্রসিদ্ধ অফিসার ছিলেন। বিপ্লব পথে তিনি পরম প্রতিবন্ধক বিবেচিত হওয়ায় চন্দননগর বিপ্লব সংহতি কতৃক ডেনহামকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করার ব্যবস্থা হয়। এবং কর্মীবৃন্দ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য ১৬ বৎসর বয়স্ক ননীগোপাল কলিকাতা সি. আই. ডি. বিভাগের হেড কনস্টেবল শশী চক্রবর্তীকে হত্যাকরে। এই লোকটা বিপ্লবীদের পিছনে ছায়ার মায় ঘুরিয়া বেড়াইত। শশী চক্রবর্তীকে হত্যা করিয়া ননীগোপাল প্রায় ১৫ মিনিট পর তৃষ্ণা বোধে এক দোকানে লেমনেড পান করেন। শার্টের পকেট হইতে দোকানীকে পয়সা দিলে সেই হিন্দুস্থানী দোকানী অসহ্য গরম বোধ হওয়াতে সে পয়সা হাত হইতে ফেলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া ননীগোপাল তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে। এইজগাই ননীগোপালকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়। চন্দননগরে নিমিত্ত বোমার দ্বারাই ডেনহামকে নিহত করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের উপর লোক নির্বাচনের ভার পড়িল। জ্যোতিষচন্দ্র তাহার উপযুক্ত শিষ্য চুঁচুড়াবাসী ননীগোপালকেই মনোনীত করিলেন। ননীগোপালের সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থার ভার শশী ঘোষের উপর অর্পিত



হয়। আবশ্যকবোধে নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ননীগোপালের বাসায় যাতয়াত করিতে লাগিলেন।

চন্দননগরের নরেন্দ্রনাথ, বসন্তকুমার ও শ্রীশচন্দ্র ডেন্‌হামের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন রাত্রে চন্দননগরে মতিলালের নিকট সংবাদ আসিত ডেন্‌হাম সাহেব কোন সময়ে বাসা হইতে বাহির হন, কখন হোটলে আশ্রয়প্রসাদ করেন। কোন সময়ে বাগড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শেষে স্থির হইল রাইটার্স বিল্ডিং হইতে যখন তিনি মোটর গাড়ীতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময়ে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। চন্দননগরের এই প্রথম সন্ত্রাসমূলক উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে, বিপ্লবী জগতে একটা হলুতুল পড়িবে।

ডালহাউসী স্কোয়ারে দিনের পর দিন ডেন্‌হামের গাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হইল। কিন্তু ডেন্‌হাম সাহেবের সে গাড়ীর আর দেখা পাওয়া যায় না। ননীগোপাল বোমা হাতে প্রতিদিন ডালহাউসী স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলে—ডালহাম সাহেবের গাড়ী আর সে দেখিতে পায় না। বোধ হয় সাহেব আর রাইটার্স বিল্ডিংএ আসেন না। বাহিরে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে ইহা জানাইলেন। ডেন্‌হাম সাহেবের বাসায় অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি কলিকাতাতেই আছেন। ননীগোপালের সহিত শ্রীশচন্দ্র ডালহাউসী স্কোয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেন। আজ আর রক্ষা নাই। ডেন্‌হাম সাহেবের গাড়ি বটে, রাইটার্স বিল্ডিং এর সীমানা ছাড়াইয়া কিছুদূর আসিতেই ননীগোপালের হস্ত হইতে নিক্ষেপ হইয়া বোমা গাড়ীর মধ্যে পতিত হইল। চতুর্দিকে সোরগোল উঠিল। পলায়নপর ননীগোপাল পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল।

ডেন্‌হামের গাড়ীতে মিষ্টির কাউলী (একজন ইঞ্জিনিয়ার) ঐ দিন বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সে গাড়ীতে বোমা পড়িল বটে কিন্তু বোমা ফাটিল না। পুলিশ বোমাটিকে লইয়া বিশ্লেষণের পর জানাইল—এ বোমা চন্দননগরের, অতিশয় বিপজ্জনক ধরনের। বিদীর্ণ হইলে,

কাউলী সাহেব আর রক্ষা পাইতেন না। ডেন্‌হামের পরিবর্তে) কাউলী সাহেবের প্রাণ হ্রনের অভিসন্ধি বিপ্লবীদের ছিল না। অতএব চন্দননগরের বিপ্লবীগণ বোমা বিদীর্ণ না হওয়ার দ্বংস প্রকাশ করিল না। কিন্তু এ ঘটনায় শাসক মহলে চাক্ষু্যের সীমা রহিল না। ডেন্‌হামের মৃত্যু হইল না বটে কিন্তু বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বৈপ্লবিক গরম হাওয়ায় দেশের মুক্ত প্রাণে উত্তেজনার ঢেউ বহিল।

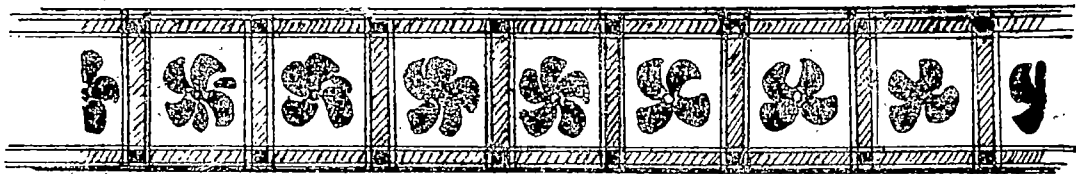
শ্রীশচন্দ্রের সহিত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রও এই ঘটনায় ধরা পড়িলেন। আর ধরা পড়িলেন চন্দননগরের অগ্রতম বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ নীরব কর্মী ও অসাধারণ সাহসী। পুলিশ বুঝিল চন্দননগরের বিপ্লবকে ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পরই মতিলাল রায়ের বাড়ির দরজায় পুলিশের থানা বসিল। এতদিন মতিলাল পুলিশের সংশয় দৃষ্টির বাহিরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ঘটনার পর হইতেই মতিলালের গতিবিধিও পুলিশের দৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হইল। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ধৃত হইলে মতিলাল মণীন্দ্রনাথ নায়েককে সুরেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন, বোমা বিদীর্ণ না হওয়ার হেতু নির্ধারণ করিবার জন্য। পরে প্রত্যেকটি বোমা বিদীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

সে সময় হইতে পুলিশের অনুচরগণ মতিলালের নিত্য সঙ্গী হইয়াছিল। মতিলালও ইচ্ছা করিয়া সারা দিন পথে পথে ঘুরিতেন। তিনি কখনও সঙ্গীহারা নহেন। অজস্র বর্ষণ মাথায় করিয়া বাহির হইলেও পরিত্রাণ ছিল না। কোন আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাইতে হইলেও একা যাইতে হইত না। ছায়ার ন্যায় পুলিশ গ্রহরী সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। মতিলালের মনে কৌতুক হইত। মজাও অনেক করিতেন কিন্তু ক্রমে বিরক্তির সীমাও থাকিত না। এই জন্ম কাজ কর্মের জন্ম বাহির হওয়াও বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি কোন প্রয়োজনে বাহির হইতেন তাহা এই সতর্ক সঙ্গীদের চক্ষে ধূলা দিয়াই বাইর হইতেন। মতিলালের বাহিরের জীবনটা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু মতিলালের সাধনজীবনের অতুলনীয় সুযোগ সৃষ্টি হইল।

বিচারে ননীগোপাল দীর্ঘ দশবৎসরের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইল। শ্রীশচন্দ্র প্রমুখ চন্দননগরের নেতৃবৃন্দ তখন কারাগারে, মতিলাল নজরবন্দী। এই সময়ে একটি সন্ধ্যায় আশুতোষ নিয়োগী মতিলালের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বোমা নির্মাণের জন্ত বোতল বোতল কার্বলিক সালফিউরিক এসিড সংগ্রহ করিতে। মতিলালের বন্ধু সত্যরঞ্জন স্বর্ণকার কলিকাতা ও চন্দননগর বাজার হইতে ইহা বহুলাংশে যোগাড় করিয়া দিতেন। এত এসিডের বোতল মতিলালের বাড়ী রাখা সম্ভব মনে না করিয়া উহা ইতস্ততঃ মাটির মধ্যে খুঁড়িয়া রাখা হইত। আশুতোষ নিজেই মধ্য রাত্রে আসিয়া এই কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। একবার গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার রাস্তার ধারে যখন আশুতোষ মাটি খনন করিয়া বোতলগুলি প্রোথিত করিতেছিলেন সেই সময়ে শশ্মান ঘাটের কোন মুদ্গাফরাস তাহা দেখিতে পায়। কোন তরুর মাটির মধ্যে সোনা দানা পুতিয়া রাখিয়া যাইতেছে এই ভাবিয়া আশুতোষের প্রস্থানের পর সেই ব্যক্তি মাটি খুঁড়িয়া অনেকগুলি এসিডের বোতল বাহির করিয়া ফেলিল। সে কি মনে করিয়া তদবস্থায় এসিডের বোতলগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া চলিয়া যায়। প্রাতঃকালে স্নানার্থীরা অনেকগুলি এসিডভরা বোতল দর্শন করিয়া পুলিসকে খবর পাঠাইল। ফরাসী পুলিস উহা হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। পরে ইংরেজর গোয়েন্দা পুলিস বোমা প্রস্তুতির বিস্ফোরক উপাদানের সন্ধানে ব্যাপৃত হন। এই অনুসন্ধানের ফলেই কাউলীর গাড়ীতে বোমা পাইয়া তাহারা তার বিশ্লেষণে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ বোমা চন্দননগরের অতিশয় মারাত্মক ও বিপজ্জনক বিস্ফোরক দিয়া তাহা নির্মিত হইয়াছে।

মতিলালের বন্ধু আশুতোষ ছিলেন একজন অকপট বৈপ্লবিক। তাঁহার পিতার দোকানে বসিয়া তিনি যথেষ্ট উপার্জন করিতেন। এবং সে টাকার বাহুলাংশ বিপ্লব কর্মে ব্যয় করিতেন। সেই দিন আশুতোষ মতিলালকে জানাইলেন তিনি এ কর্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন এবং বিবাহ করিবেন। এই আপত্তির কোন যুক্তি ছিল না। মতিলাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, “পিতা মাতার কাছে যখন বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছি, তখন এই বিপদসঙ্কুল কর্মে আমার আর থাকা সম্ভব হইবে না। বিপ্লব কাজে আমার অনুরাগ কোন দিন নষ্ট হইবে না।” মতিলাল বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বুকের মধ্য হইতে একটি থলিয়া বাহির করিলেন ও মতিলালের সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন একরাশ গিনি। রাত্রির আলোকে তাহা ঝিকমিক করিয়া উঠিল। মতিলাল বলিলেন “ইহা লইয়া কি হইবে?” আশুতোষ বলিলেন, “বোমার কাজে এই অর্থ নিয়োগ করুন।” তারপর মতিলালকে আলিঙ্গন করিয়া আশুতোষ সজল নয়নে বিদায় লইলেন। মতিলাল সেই অর্থই সুরেশচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। বোমা প্রস্তুতির তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। সুরেশ তখন এম. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নিরব কর্মী ছিলেন। সেই অর্থ লইয়া বোমা নির্মাণের ক্ষেত্র বিস্তার না করিয়া, তিনি বিলাতে চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিলেন, তখন তিনি আর বিপ্লবী সুরেশ নহেন, বিজ্ঞান কলেজের মস্ত অধ্যাপক। তাঁহার দ্বারা বিপ্লব কার্যে আর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

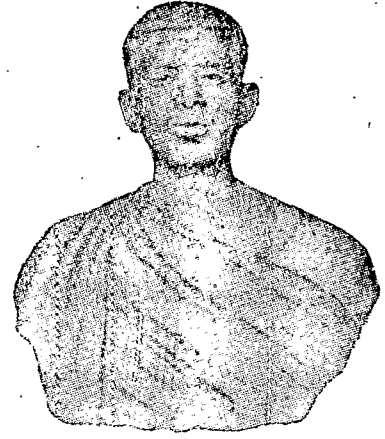
(ক্রমশঃ)



বিপ্লবযজ্ঞে ঋত্বিক কানাইলাল

॥ ১১ ॥

কিরণেন্দু বাগ্‌চী



রাখীবন্ধনের ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদের উদ্যোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চন্দননগরে এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠান বিশেষভাবে পালিত হ'ল। কর্মসূচী দেশব্যাপী সূষ্ঠ ভাবে পালনের জন্তে কানাইলালের অদম্য প্রচেষ্টা চন্দননগরকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করল। অতি প্রত্যুষে ছেলে-বুড়োর দল নগ্নপদে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। সামনের সারিতে কানাই, মতিলাল আর তাদের সহকর্মীরা। নগর পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান শেষ করে দ্বৈত কণ্ঠে সেই মন মাতান গান শুরু করল শোভাযাত্রীরা—

“বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন

.....এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।”

গান শেষে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—

একজাতি—এক ভগবান, এক দেশ—এক মনোপ্রাণ।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে রাখীবন্ধন পর্ব শেষ হ'ল।

কানাইলাল, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, বিশ্বনাথ সিং, নগেন ঘোষ, বিশ্বনাথ সরকার, ননীলাল, সাগরকালী প্রভৃতি একশ দেশভক্ত দিনান্তে সামান্য কিছু ফল খেয়ে থেকে এই পবিত্র দিনের মর্যাদা রক্ষা করল।

এই সময় কীর্তন করে নগর প্রদক্ষিণের সময় মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর আগে মতিলাল এবং শ্রীশের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

সন্ধ্যার পর জনসভায় স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন

সহজে কয়েকজন বক্তা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন।

কানাইলাল স্বচ্ছ সরল ভাষায় অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়ে দিল, “স্বদেশীই আমাদের বাঁচবার একমাত্র পথ। ইংরেজদের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। ও জাতকে ভাতে না মারলে সায়েস্তা হবে না। এ সংগ্রামের জন্তে প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। বাঙালী যে কী, আমরা তা কার্জনকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।”

যে শান্তশিফি ছেলেটির মুখ থেকে কেউ কোন দিন উচু গলায় কথা শোনেনি তার কণ্ঠে একি অগ্নিময়ী ভাষা!

—সভার সকলে স্তম্ভিত।

শরীর চর্চার সঙ্গে কানাই স্বদেশী যুগের খবরের কাগজগুলো রোজই মন দিয়ে পড়ে। এর মধ্যে বাছাই করা কয়েকখানার সে বেশী ভক্ত—‘সন্ধ্যা’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সঞ্জীবনী’ ‘হিতবাদী’, ‘ডন’, বিপিন পালের ‘নিউ ইন্ডিয়া’ প্রভৃতির। নতুন কোন পত্রিকা বেরুলেই কানাই সেখানি জোগাড় করে আনে।

এইসব লেখা নিয়ে মনের মত সহপাঠী ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে কোথা দিয়ে যে দিন রাত কেটে যায় সিদ্ধান্তে না পৌছান পর্যন্ত, আর খেয়াল থাকে না।

দেশের চিন্তায় কানাইলালের রাত্ৰিতে ঘুম নেই। মুক্তি পথের সন্ধান সে করতে থাকে গোপনে। কার সহযোগীতায়, কি উপায়ে এই দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করা যার অহর্নিশি এই চিন্তা তাকে ঘিরে থাকে। মাঝে মাঝে

সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লম্বা ছিপ ছিপে দেহে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো তখন তার, খাড়া হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ দুটোতে রক্ত জমাট বেধে যায়। চোখের মোটা কাচের চশমাখানা খুলে সে বার বার মুহূর্তে মুহূর্তে তাকায়; সবই যেন তার চোখে ঘোলাটে হয়ে যায়। উন্নত গ্রীবার শীরা উপশীরাগুলো চামরার ভেতর থেকে ফেটে বেরোতে চায়। এই উত্তেজনা প্রসমনে মাথায় ঘটি ঘটি জঙ্গ ঢেলে, চোখে জলের বাপটা দিয়েও সে নিজেকে সামলাতে পারে না।

মুক্তির সন্ধানে সে ঘোর ফেরে। কোথায় গেলে প্রশ্নের জবাব সঠিক মিলবে? পৃথিবীতে এসে পঙ্খ বাঙালীর ভূমিকা নিয়ে জীবনটাকে জ্বিয়ে রাখা বৃথা। এমন একটা কাজ তাকে করতে হবে যাতে সে, স্বদেশের কিছুটা কাজে লাগে। এই মহাযজ্ঞে সে তো কবেই নিজেকে উৎসর্গ করবে বলে স্থির করেছে কিন্তু কোথায় বাধা তার? সে বড়ই চাপা। বাহিরে শাস্তিগ্ৰীষ্ট। মনের অভিপ্রায় সে এখনও কাউকে বলেনি।

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয়, অকুতোভয়, নিরহঙ্কার, দুই হাতে সিদ্ধহস্ত কানাইলাল, দেশের সামান্য কাজে লাগতে পারলে নিজেকে দৃঢ় মনে করে।

একদিন সত্য সত্যই সকল বাধা ছিন্ন করে কানাইলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই কাজে।

দেশের লোকও এখন অনেকটা সজ্জবদ্ধ। ১৯০৫ এর রাণী কোম্পানীতে ষ্ট্রাইক হ'ল। ভারতীয় কর্মচারীরা এক জোটে বাহিরে বেরিয়ে এল। সাহেবদের গোলামী ছাড়তে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ছা-পোষা কর্মীরা অন্ন-কষ্টে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

চাকরবাবু ডাকলেন কানাইকে।—সাহায্য ভাঙার গড়ে না উঠলে লোক গুলো তো খেতে না পেয়ে মারা যায়। ব্যবস্থা কি করছে?

গুরুজীর হুকুম। কানাই বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে লেগে গেল অর্থ সংগ্রহে।

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তারা ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিল।

পরেই এল চন্দননগরে স্বদেশী সভার অধিবেশন। কানাইলালের সক্রিয় ভূমিকা সকলকেই মুগ্ধ করল। পাল-পার্বনে, মেলার মাঠে, গঙ্গাপূজার ভীড়ে যেখানেই বহু লোকের সমাগম, সেখানেই সেচ্ছাসেবক

বাহিনী গড়ে তুলে কানাই সাহায্য দিতে এগিয়ে গেছে।

সেবার ম্যালেরিয়া জ্বর কানাইকে বেশ কান্না করে দিয়েছে। রোজই ১০৫° ডিগ্রী জ্বর উঠছে। ভীষণ আশুনা লাগল চন্দননগরে একটা পাড়ায়। যেই সে কথা কানাইয়ের কানে পৌঁছেছে, কোথায় গেল তার জ্বর ঐ অবস্থায় তেড়ে ফুঁরে গিয়ে খড়ের চালের ওপর উঠে কলসী কলসী জল ঢালতে লেগে পড়ল আশুনের মধ্যে। আশুনা আসছে এলে, সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নেতিয়ে পড়ল।

জ্বরটা একটু বাগে আসতেই শুরু করে দিল বিদেশী বর্জনের সংগ্রাম। মতিলাল, কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ, সাগরকালী প্রভৃতি দলবল নিয়ে দোকানে দোকানে আরম্ভ করল পিকেটিং। কার সাধ্য এক টুকরো বিলিভী জিনিষ কেনে।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বাঙালার দিকে দিকে নুনকলে তিন হাজার জনসভা হয়ে গেল প্রতিবাদ জানিয়ে, যার প্রতিটি সভায় পাঁচশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। এটা কম বড় কথা নয়।

এই বিপ্লব যজ্ঞের চিতা বহিতে মতিলাল অনেক ঘূতা-হুতি দিয়েছেন। কর্ম যজ্ঞে ইনি কানাইলালের দোসর।

একটি মহৎ প্রাণ। বিহারীলাল রায়ের পুত্র মতিলাল—সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান।

জন্ম—বোড়াইচণ্ডীতলা, চন্দননগরে; ১২৮৮ সালের ২২শে পৌষ, শুক্রবার (ইং ৬ই জানুয়ারী ১৮৮২)।

জাতিতে—চৌহান বংশীয় ছেলী রাজপুত।

এঁর পিতামহ গোলকনাথ উত্তর প্রদেশের মৈনপুর জেলা থেকে চন্দননগরে এসে বসবাস শুরু করেন।

তৃতীয় পুরুষে মতিলাল রায় খাঁটি বাঙালী বনে গেছেন।

কে এখন বুঝবে সে উত্তর প্রদেশের ছেলে। বাঙলা দেশকে যে, সে এখন, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতে শিখেছে। এখানকার পুর নাগরীক সে তাই। আচার ব্যবহারে কথা বার্তায় সে পুরন্দর বাঙালী। বাঙলা মায়ের শৃঙ্খল মোচনে সে-ই তো কত তরুণ বাঙালীকে টেনে নামিয়েছে দেশের এবং দশের কাজে।

কানাইলালের কলেজ জীবনের শুরু থেকেই মতি-

লাল তার ছায়াসঙ্গী। এগিয়ে যেতে যেতে এই কাণ্ডে আমরা এর অনেক কিছুই দেখতে পাব।

কর্মবহুল জীবন গুণপনায় বিস্তৃত মতিলালের।

বিপ্লবী জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে মতিলাল ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীঅরবিন্দের আদেশে যৌবনকাল থেকেই আধ্যাত্মিক জীবনযাপন শুরু করেন। পরে প্রবর্তক সজ্জের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দননগরে শ্রী শিক্ষার প্রচলনে ব্রতী হন এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্তে নানা সং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। চরকাই সূতাকাটা, কলের সূতোয় বস্ত্র, দেশী সূতোর কাপড় চোপড় এবং স্বদেশী শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেশের শ্রী পুরুষকে নিয়োগ করে উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। মহাত্মা গান্ধীর বাঙলা দেশে চরকা যজ্ঞের প্রবর্তনের অনেক আগে থেকেই মতিলাল চন্দননগরে চরকাই সূতো কেটে, তাই দিয়ে তাঁতে বস্ত্র নির্মাণ শুরু করে দেন। এ ছাড়া স্থানীয় গরীব দুঃখী ছেলে মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার জন্তে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন ও নতুন শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন।

মতিলালের ঐকান্তিক চেষ্টায় বোড়াইচণ্ডীতলায় নিজবাটীর সন্নিকট গঙ্গা পার্শ্বে অনেকখানি জমির ওপর ‘প্রবর্তক আশ্রম’ গড়ে ওঠে। প্রবর্তক সজ্জের অনেক গুলি শাখা লোকশিক্ষার জন্যে ধীরে ধীরে ভারতের নানা স্থানে আত্মপ্রকাশ করে।

এই ভগবৎ বিশ্বাসী একনিষ্ঠ যোগী পুরুষ উত্তরকালে প্রবর্তক সজ্জের ‘সজ্জগুরু’ আখ্যা লাভ করেন। এবং এর সহধর্মিণী মহাযোগিনী ‘সজ্জজননী’ নামে ভক্তদের দ্বারা আখ্যায়িতা ও পূজিতা হন।

পুলিশের ডি, এস, পি শামসুল আলমকে হত্যার মাত্র তিনদিন আগে ১৯১০ এর ২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় থাকাকালীন দেবতার নির্দেশ পেলেন “Go to Chandannagore” তিনি কাল বিলম্ব না করে দশ মিনিটের মধ্যে বাগবাজার ঘাট থেকে নৌকায় রওনা হয়ে চন্দননগরে চলে এলেন। আত্মগোপন করে থাকার জন্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের আশ্রয় প্রার্থী হলেন। পুলিশ তাঁর পিছু ছাড়েনি জেনে চারুবাবু তাঁকে আশ্রয় দিতে দ্বিধা বোধ করলেন। যদিও তখন

মতিলালের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন পরিচয় ছিল না তথাপি তখন এই মতিলালই ছুটে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে নৌকা থেকে সাদর আহ্বান জানিয়ে অরবিন্দকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। স্বদেশীতে লিপ্ত থাকায় মতিলাল তখন তাঁর বহিবাটীতে স্বজনীক নির্বাসিত। আগন্তুককে চুপি চুপি নিয়ে গিয়ে তুললেন, বহিবাটীর সেই একটি কক্ষে যেটি সচরাচর খোলা হ’ত না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা আমি প্রবর্তক সজ্জের সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত মশায়ের মুখে শুনেছি। ঘটনাটি এইরূপ—সজ্জজননী সেই সময় প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে বহিবাটী প্রখ্যালন করতেন ছোট একখানি শাড়ী পরে। প্রত্যহ সকালে, উঠানে খাবারের ঠোঁয়া পড়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর স্বামীকে নানা প্রকার প্রশ্ন করতেন। সঠিক জবাব পেতেন না। এর পর একদিন বাঁট দেওয়ার সময় তিনি ভাবলেন, বাহির থেকে শিকল দেওয়া ঘরটি অনেকদিন কাট পড়েনি, ওই কারণে যেই তিনি বাঁটা হাতে দরজার শিকল হুলে ঘরের ভেতরে পা বাড়িয়েছেন, দেখেন, মাথায় ঘাড় অর্ধি লম্বা লম্বা চুল, গুফ শাশ্রু সমন্বিত এক যুবা পুরুষ যোগা সনে বসে ধ্যান নিমগ্ন। সচকিত অবস্থায় তিনি দ্রুত দরজাটি বাহির থেকে টেনে দিয়ে সরে এসে স্বামীর কাছে প্রশ্ন রাখলেন। এই ঘটনার পর, সংসার থেকে ছুবেলা নিজেদের দুজনের যে আহাির মিলত, তা সেই যোগীপুরুষের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া শুরু হল মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট যে কদিন শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের আশ্রয়ে ছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ মতিলালের সঙ্গে বেশ কিছুকাল যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। চিঠির ভাষাতে সাংকেতিক কথা ব্যবহৃত হতো। যাতে পুলিশের হাতে চিঠি গিয়ে পড়লেও তাঁরা কিছু বুঝতে না পারে এই কারণে।

আর একটি বিশেষ ঘটনা যা শুনেছি—কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ তখন মতিলালকে ধরবার জন্য ব্যস্ত। বিপ্লবীদের খাতায় তখনও মতিলালের নাম। ১৯১২ সালের অনেক পরে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে মতিলালকে চন্দননগর থেকে ডেকে পাঠালেন। মতি-

লাল এসেছেন। গান্ধীজীর নিকট তখন পুলিশের বড় কর্তা উপস্থিত। মহাত্মার প্রশ্নের জবাবে এবং তিনি তাঁকে বিপ্লব থেকে সরে আসতে বলায় মতিলাল বলেছিলেন “আমি এখন বিপ্লবীদের মধ্যে নেই। বর্তমানে ধর্ম কর্মে আত্মনিয়োগ করেছি। ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেব কিনা তা এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।”

পুলিশ অবিশ্বি এরপর গান্ধীজীর কথাতেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক মতিলালকে গ্রেপ্তারের প্রয়াস ত্যাগ করে।

গান্ধীজী মতিলালকে চন্দননগরবাসীর চরকা গ্রহণের কথা বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, তা বহুপূর্ব থেকেই চন্দননগরে শুরু হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান জানিয়ে সেখানে নিজ বাটিতে নিয়ে যান (২২শে বৈশাখ ১৩৩২ মঙ্গলবার, ইং ৫ই মে ১৯২৫ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে) এবং তিনি তাঁর গ’ড়ে তোলা স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ও খদ্দেরের প্রচার কার্য দেখান।

আর একবার মতিলাল মহাত্মাজীকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখাতে চন্দননগরে নিয়ে আসেন ১৬ই পৌষ ১৩৩৩ ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৫, এবার গান্ধীজীর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরাবাই গান্ধী, মীরা বেন, মিটিবেন, পিয়ারীবেন প্রভৃতি।

এইরূপ নানান ঘটনা আমি সদালাপি প্রবর্তক সজ্জের সভাপতি অরুণদার মুখে শুনেছি।

ব্যারিফার চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে ‘স্বদেশী মণ্ডলী’ জন্ম নিয়েছে জেনে, বরোদা থেকে অরবিন্দ বিপিন পালের কাছে পুস্তিকাকারে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। এই পুস্তিকাতে তাঁর নাম ছিল না। ‘নো কমপ্রোমাইজ’ পড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চমকে উঠলেন।

এই সময় বাড়লার দিকে দিকে স্বদেশী ডাকাতি শুরু হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা বাঙলাদেশে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলবার চিন্তা করছিলেন। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষা পরিষদকে রূপায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করলেন।

১৯০২ সালে ‘ডন’ সোসাইটি সৃষ্টি করে ‘ডন পত্রিকা’র

মাধ্যমে পরাধীন জাতির মনের ভেতর এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করেছিলেন সতীশচন্দ্র।

সতীশচন্দ্রের চিন্তাধারা ভিন্নধাতে প্রবাহিত।

তিনি চিন্তা করলেন, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্তে সর্ব প্রথম প্রয়োজন—শিক্ষা, প্রয়োজন নিজেকে চিনতে শেখা, স্বজাতিকে জানা, নিজের দেশকে ভালবাসা, জাতির ঐতিহ্য বজায় রাখা, জাতির স্বার্থ চিন্তা, জাতির শিক্ষার মূল্যায়ন করা।

আচার্যের যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে নেতৃস্থানীয় অনেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে।

এই সময় দেশে রাজনৈতিক চেতনা বেশ খানিকটা দানা বেঁধে উঠছে।

সতীশচন্দ্র নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন, জাতির বনেদ শক্ত করতে প্রয়োজন হবে, তরুণদের জাতীয় শিক্ষাপর্যদে শিক্ষাদান করা অর্থাৎ ‘স্টাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে’র মাধ্যমে।

দেশে ইংরিজী শিক্ষার বাহকরাই এই সময়েই এমন একটি শিক্ষা কেন্দ্রের আশু প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন।

অনতিবিলম্বে আলোচনা সভা আহত হল।

রথী মহারথীরা সকলেই এলেন। সভা বসল পার্ক স্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স স্যামোসিয়েসনের কার্যালয়ে, ১৯০৫ এর ১৬ই ডিসেম্বর। অনেক বিতর্কের পর জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পে একটি কমিটি তৈরী হ’ল।

প্রথম কমিটিতে এলেন—স্বার রাসবিহারী ঘোষ, স্বার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বার ভারকনাথ পালিত, ব্যারিফার আব্দুল রসুল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যারিফার চিত্তরঞ্জন দাস আর ‘মিরার’-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

এঁরা সকলেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝে কেউ আর না করলেন না।

ঠিক পরদিনই পাণ্ডুর মাঠে প্রায় পনের হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ’ল।

ময়মনসিংয়ের ব্রজেন্দ্ৰকিশোর আচার্য চৌধুরীর অবদানও এতে কম ছিল না।

প্রথম পদক্ষেপে অর্থাভাবে পরিষদের কাজ শুরু হতে যাতে বিলম্ব না হয় এই বিবেচনা করে সুবোধ মল্লিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“আমি এক লক্ষ টাকা দিচ্ছি। আর দেবী নয়, কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হোক।”

সুবোধ মল্লিকের প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য বোধ করলেন ও বিশেষ উৎসাহিত হলেন। বিনা দ্বিধায় স্বদেশের জন্তে এক লক্ষ টাকা এক কথায় বার করে দেওয়া যার তার কাজ নয়; বাঙালীরও এই প্রথম। সুবোধ

মল্লিকের দরাজ মনের প্রসারতা দেখে বাঙালীরা তাঁকে ‘রাজা সুবোধ মল্লিক’ আখ্যা দিয়ে, রাজা বলেই ডাকতে শুরু করলেন।

পটলভাঙ্গার মল্লিক পরিবারে সুবোধ মল্লিকের জন্ম। ব্যারিস্টারী পড়তে প্রথম জীবনে কেমব্রিজে যান। পড়া শেষ হওয়ার আগেই পারিবারিক ব্যাপারে দেশে ফিরে এলেন এবং ১৯০১ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, এখন যা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার।

এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের ঘাঁটি।

শত্রু ও মিত্র

শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়

শত্রু—বৃথা কর মনস্তাপ

বৃথা কর শোক

শত্রু তব নহে কেহ

বাহিরের লোক।

জঠরে ধরেছ যাকে

সেই কালগ্রহ

দহনৈ দহিছে তোমা

নিত্য অহরহ ॥

বিচার বিবেকহীন

অপযশ, গুণহীন

হেরিয়া আশ্রজে।

রাবণের চিতা হেন

লেলিহান শিখা যেন

জ্বলে হুপি মাঝে ॥

ইহাপেক্ষা শত্রু কেহ কেহ

নাহি পারাবারে

এত ব্যথা এত জ্বালা

কেহ দিতে নারে।

মিত্র—রয়েছে জঠরে পুনঃ

বহু সুখ শান্তি।

জুড়ায় মনের ব্যথা

হেরি মুখশান্তি ॥

হ'লে মহা মহীয়ান,

হয় যদি বলীয়ান,

তার সাথে ভাগ্যবান,

হয় মহামতি ॥

এত সুখ রাখিবার,

স্থান নেই কোথা আর,

সেই হয় কর্ণধার,

হ'লে শুভমতি ॥

রোগশয্যা পাশে বসে,

সেবা করে অবশেষে,

কহে কথা হেসে হেসে,

জুড়ায় পরাণ ॥

কহ কহ কহ এবে

কেবা তব ব্যথা লবে,

কে আছে বন্ধু ভবে,

ইহার সমান ?

বসুমতী

(পূর্বানুযতি)

অজিত দাস

বসুমতী নাই, বসুমতী দরজা হইতে সরিয়া গিয়াছে। শূন্য দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কৃতিবাস যেন হাহাকারে ভরিয়া গেল। তাঁহার জীবন মন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। হরিহর বসাকের ওই খোলা দরজার মতোই তাহার হৃদয়ের দরজাও হাট হইয়া খুলিয়া গিয়াছে। বসুমতীর অদৃশ্য হাওয়ার মতোই হৃদয়ের খোলা দরজা দিয়া তাহার চিন্তা স্বপ্ন মুখ পরিকল্পনাগুলিও বাহির হইয়া অদৃশ্য উধাও হইয়া গিয়াছে। হরিহর বসাকের উঠানে বেগুন ও লঙ্কার গাছগুলি সবুজ সজীবতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহার জীবনে এই মুহূর্তে ওই সবুজ সজীবতাটুকুও নাই। হরিহর বসাকের ওই উঠানের সম্মুখভাগের মতোই তাহার জীবনের সবটুকুই রক্ত ধূ ধূ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। বিধবার সিঁড়ির বিহীন সিঁড়ির মতোই রক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে।

কৃতিবাসও আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। অবসন্ন মনে স্নান মন্তরগতি হইয়া ফিরিয়া চলিল। কার্তিকের বাড়ি আর যাইবার প্রয়োজন নাই। কার্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর তাহার কোন প্রয়োজনই নাই। সে বাড়ির পথেই ফিরিয়া চলিল।

কিন্তু কৃতিবাস বেশিদূর যাইতে পারিল না।

হরিহর বসাকের বাড়ির সেই গলিপথের মোড়ে আসিতেই সে দেখিল রিক্সায় চাপিয়া কার্তিক প্রামাণিক আসিতেছে। কৃতিবাসের অন্তমনস্কতা কাটিয়া গেল। সে কার্তিককে দেখিয়া খুসী হইল। সে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

কিন্তু সেই সময়েই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। মুখে রুমাল বাঁধা কয়েকটি যুবক হাতে নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কার্তিক প্রামাণিকের রিক্সা প্রায় ঘিরিয়া ধরিল।

রিক্সাওয়ালা রিক্সা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া পলাইতে লাগিল। কার্তিক প্রামাণিকের সহ-আরোহী সঙ্গী যুবকও লাফাইয়া হাউমাউ করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। কার্তিক প্রামাণিকও লাফাইয়া ছিল। কিন্তু

সে পলাইতে পারিল না। সেই অস্ত্রধারী যুবকেরা তাহাকে পলাইতে দিল না। তাহাকে উত্তোলিত মারাত্মক অস্ত্র হস্তে তাহারা আক্রমণে উদ্ভত হইল।

ইতিমধ্যে কৃতিবাস সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। সে এই আকস্মিক ঘটনায় কিছুটা হতচকিত। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাবশতঃই সে ছুটিয়া আসিয়া কার্তিক প্রামাণিককে আগলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে কোন চিন্তার অবকাশও সে পায় নাই, কৃতিবাস ঘনিষ্ঠ হইয়া কার্তিক প্রামাণিককে আগলাইয়া ধরিয়াছে। আক্রমণকারী যুবকেরা হঠাৎ কেমন যেন থমকিয়া গেল। বুঝিবা কিছুটা পিছাইয়া গেল। এবং পরমুহূর্তেই পিছন হইতে আক্রমণকারীদের একজন বলিয়া উঠিল, কৃতিবাস সেরে যান—ওকে ছেড়ে দিন।

আরেকজন বলিল, শয়তান—সমাজ শত্রু। ওকে ছেড়ে দিন। কৃতিবাস আপনি সেরে যান—

কৃতিবাস তাহাদের এই কথায় যেন মনে বল পাইল। তাহার মনে হইল, তবে আর ভয় নাই। আক্রমণকারীরা তাহা হইলে তাহাকে চেনে, তাহাকে সম্মান করিতেছে, তাহা হইলে তাহার এই চেষ্টাকেও তাহারা সম্মান দিবে, তাহারা নিরস্ত হইবে।

কৃতিবাস বলিয়া উঠিল, মেরো না মেরো না—ওকে তোমরা মেরো না।

কিন্তু আক্রমণকারীরা যেন বেপরোয়া, তাহারা বলিয়া উঠিল, আপনি সেরে যান।

কার্তিক প্রামাণিক এই অবসরে সম্মুখ দিকে, সদর রাস্তার দিকে পলাইতে চেষ্টা করিল। আক্রমণকারীরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে চেষ্টা করিল। এবং কৃতিবাস তাহাদের আগে আগে কার্তিককে আড়াল করিয়া ছুটিবার চেষ্টা করিল। যেন এই জীবনে অজিত তাহার সমস্ত পুণ্যের বিনিময়ে সে কার্তিককে রক্ষা করিবেই।

কার্তিক প্রামাণিক বুঝি এই যাত্রায় রক্ষা পাইয়া গেল। এইরূপ চিন্তা করিফাই বুঝি আক্রমণকারীদের

একজন পশ্চাৎ হইতে পাইপগানের গুলী ছুঁড়িল। কৃতিবাস যেন ঠিক করিয়াছিল সে কিছুতে কার্তিক প্রামাণিককে মরিতে দিবে না। নিজের পুণ্য দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।

তাহাই হইল, সেই গুলী কার্তিক প্রামাণিককে স্পর্শ করিতে পারিল না। সে গুলী কৃতিবাসকে বিদ্ধ করিল। কৃতিবাস তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। ফলে সেই মুহূর্তে এই অভাবিত ঘটনার জন্য আক্রমণকারীরা বুকি অগ্রমনস্ক ও বিচলিত হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে কার্তিক প্রামাণিক উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া নানা গলীপথের ভিতর একটি পথ ধরিয়া উধাও হইয়া গেল।

আক্রমণকারীরাও আর সেখানে দাঁড়াইল না। কৃতিবাস পথের উপর পড়িয়া থাকিল। কেহ সাহস করিয়া তাহার নিকটে আসিতেও সাহস করিল না। কৃতিবাসের দেহ হইতে অনেক রক্ত ক্ষরিত হইল। তাহার পর এক সময় পথের ওপরেই তাহার মৃত্যু হইল।

॥ ৬ ॥

কৃতিবাস বসাক আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছে। কেন নিহত হইয়াছে এই সংবাদও শহরে প্রচারিত হইয়া গেল।

কৃতিবাস বসাক যে শহরে ফিরিয়াছে এই সংবাদও অনেকের জানা ছিল না। সকলেই সংবাদ শুনিল এবং চমকাইয়া উঠিল। শোকার্ত হইল। শহর চঞ্চল হইয়া উঠিল।

একজনকে বাঁচাইতে গিয়া কৃতিবাস নিজের প্রাণ দিয়াছে এই সংবাদটুকু যেন বিশেষ করিয়া সকলের মনে বিশেষভাবে স্থান পাইল। সমাজ জীবনে যখন সবাই ভীত সন্ত্রস্ত, সবাই যখন আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন, বিপন্ন হইয়া কেহ সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রাণ ভয়ে কেহ সাড়া দেয় না, সম্মুখে কাহাকেও বিপন্ন হইতে দেখিয়া যখন সকলে নীরব, দর্শক হইয়া থাকে, নড়ুবা পলাইয়া যায়, তখন এইরূপ ভাবে অন্যকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজ প্রাণদান নিঃসন্দেহে বিরল, ব্যতিক্রম ঘটনা। নিহত ব্যক্তি নিশ্চিত মহাপ্রাণ, মহাপুরুষ।

বস্তুতঃ এই সঙ্কটকালে শহরবাসী মনে প্রাণে মানুষের ভিতর এইরূপ বীর ভূমিকাই প্রত্যাশা করিতেছিল। কৃতিবাস তাহাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়াছে। সকলেই শোকার্ত হইল। অর্থাৎ সকলেই তাহার এই কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইল। শহর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৃতিবাসের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া নহে, পরের জন্ত মৃত্যুবরণ করিয়াছে বলিয়া।

কৃতিবাস তিন বৎসর শহরের বাহিরে ছিল। শহরের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই তিন বৎসরে শহরের সমাজে যে সংকট ঘনাইয়াছে তাহার সহিত সে যুক্ত ছিল না। এই তিন বৎসরে সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হইয়াছে। এবং তাহার পরস্পর বিরোধী হইয়া চরম সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। কৃতিবাস যদি এই শহরে থাকিত তবে সেও কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের সহিত যুক্ত হইয়া যাইতে বাধ্য হইত।

কিন্তু সে অনুপস্থিত ছিল।

একদিন সে নিরুপায় হইয়া পেটের ক্ষুধার জ্বালায় দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আজ তাহাই যেন কৃতিবাস ও শহরবাসীর কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কৃতিবাস তাহাদের সঙ্গে জীবন জড়াইয়া ভাঙিয়া টুকরা হইয়া যায় নাই। তিন বৎসর পূর্বে শহর ত্যাগের কালে সমাজজীবনে সে যে অখণ্ড সন্তান গৌরবময় পরিচয়ে পরিচিত ছিল, তাহার পরিচয় সেখানেই থামিয়া স্থির অক্ষুণ্ণ অটুট হইয়া আছে। কৃতিবাস বসাক বলিতে শহরবাসীর মনে তাহার সেই পরিচয়ই জাগে। তাহার পরিবর্তন কথা কাহারও জানা নাই। তাই শহরের পরস্পর বিরোধী প্রতি ক্ষুদ্র অংশের কাছে সে তাহাদের আপনজন বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার মৃত্যুতে শোক তাই সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার সেই অখণ্ড সন্তান প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা জানাইতে চাহিল।

তাহারই ফলে তাহার মরদেহের প্রতি পরদিবস শ্রদ্ধা-জানাইবার আয়োজন হইল। তাহার মরদেহ পৌরসভা-গৃহের বারন্দায় প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হইল। শহরের প্রিয় নট্যকার, কবি, লেখক, সর্বোপরি মহৎ প্রাণ

কৃতিবাস বসাকের প্রতি সকল দল ও মতের মানুষ আসিয়া তাহার মরদেহে মাল্যদান করিতে থাকিল। এমন কি যাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহারাও ভীড়ের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও তাহার মরদেহে মাল্যদান করিল। সকলে মিলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল তাহারা সকলেই আজ এই অখণ্ড সত্যের কাঙাল। এই অখণ্ড সত্যই আজ তাহাদের পরম নির্ভর, শান্তির আশ্রয়।

ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবকে কৃতিবাস বসাকের মরদেহ ঢাকিয়া গেল। ফুল ও মালার স্তূপ হইয়া গেল।

সকলেই সেই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে থাকিল। কৃতিবাসের মরদেহ শায়িত রহিয়াছে। মুখ অনাবৃত, মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। বুঝিবা ঈশ্বর মৃদুভাবে হাসিতেছে।

ওই মুখ হাসিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। হয়তো বলিতে চাহিতেছে, আমাকে মাল্যদান করিতেছ, আমার প্রতি শোক জ্ঞাপন করিতেছ। কিন্তু কেন? তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি তিন বৎসর পূর্বে কেন শহর ত্যাগ করিয়াছিলাম? সমাজে কেন এই রূপ সংকট সৃষ্টি হইল? যাহারা আমাকে হত্যা করিয়াছে তাহারা এই সমাজের সন্তান হইয়া এতো উগ্র হইয়া উঠিল কেন? কেন তাহারা কার্তিক প্রামাণিকের প্রতি অতো বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইল? কেন তোমাদের এই অসামাজিকতা, কার্তিক প্রামাণিকের ওই অসামাজিক জীবনযাত্রা? সমাজের সার্বিক সংকট যে সত্য হইয়া উঠিল সে বিষয়ে কি তোমরা অনুসন্ধান করিয়াছ? তাহার প্রতিকারের জন্ম তোমরা কি সামাজিক দায়িত্ব পালন করিয়াছ? আমি দেশেদেশে ঘুরিয়াছি, কোথাও শান্তি পাই নাই, স্বস্তি বোধ করি নাই। মানুষ তাহার চরিত্র হারা হইয়াছে, তাই শহরে ফিরিয়াছিলাম। এখানে সেই সংকটের প্রকাশই আমার মৃত্যু আনিয়া দিল। আমি শহরে ফিরিয়াছিলাম। মনে আশা ছিল, আবার তোমাদের সকলকে লইয়া আনন্দ করিব, উৎসব করিব, সকলে মিলিয়া একাসনে বসিয়া আত্মীয়তা অনুভব করিব। এই স্বপ্ন জীবনভর লালন করিয়াছি, মন্ত্ররূপে এই স্বপ্ন প্রতি মুহূর্তে জপ

করিয়াছি। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। কেন? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিও।

দুপুর বেলা কৃতিবাসের মরদেহ লইয়া শোক মিছিল বাহির হইল। বিশাল জনসমুদ্র মিছিল করিয়া সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিতে চলিল। ইদানীং মানুষ প্রায় গৃহবন্দী হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাসের ফলে কেহ সাহস করিয়া এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় সহসা যাইত না। ফলে সমগ্র শহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। ইহাতে সকলেরই শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মিছিলে যোগদিয়া তাহারা আবার অনেকদিন পরে তাহাদের প্রিয় শহরের পথে পথে হাঁটিবার সুযোগ পাইল। তাহারা প্রাণ ভরিয়া শহরের সমগ্রতার আলোবাতাস গ্রহণ করিবার একটা নির্ভরযোগ্য উপলক্ষ্য পাইল। তাই তাহারা সকলেই উৎসাহ ভরে মিছিল করিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিতে চলিল।

শহর প্রদক্ষিণ শেষ হইতে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তখন কৃতিবাসের মরদেহ লইয়া শ্মশান যাত্রীরা শ্মশানে গমন করিল।

মিছিল ভাঙ্গিয়া মানুষ যে যার গৃহে ফিরিয়া গেল। সেই দিন, সেই সন্ধ্যায় শহর জীবন যেন অনেকদিন পর স্বাভাবিক মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা খনাইয়া আসিয়াছে। শহরের বুকে অন্ধকার নামিয়াছে। হরিহর বসাকের গৃহে তখনও আলো জ্বলে নাই। বসুমতী ঘরের ভিতর দরজার সামনে একাকী বসিয়া আছে। তাহার চোখে জল নাই। অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। চিন্তা করিয়া সে কোন কিছুই কুল পাইতেছে না। বরংবার কৃতিবাসের মুখখানাই তাহার মনে জাগিতেছে।

একদিন সে তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল। তাহাকেই সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কৃতিবাস কাহাকেও না জানাইয়া ওই ভাবে চলিয়া গিয়া তাহার কী সর্বনাশই না করিয়াছিল। তাই তাহার প্রতি বসুমতীর মনে ক্ষোভ ছিল। তাই কাল সে কৃতিবাসকে দেখিয়া দরজা হইতে সরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু কে জানিত, যে মানুষ একদিন দেশ ছাড়িয়া

যাইবার কালে সংবাদও দেয় নাই, সেই মানুষ চিরকালের মতো পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার আগে এমন করিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া চিরবিদায় লইতে আসিবে? কে জানিত যে মানুষ তাকে এতো ভালোবাসিত, তাহারই মঙ্গলের জন্য এমন করিয়া নিজের প্রাণ পর্যন্ত ঢালিয়া দিবে?

কৃতিবাসের মরা মুখখানি একবার শেষবারের মত দেখিবার জন্য তাহার মনে খুব ইচ্ছা জাগিয়াছিল।

কিন্তু বাবা-মা ঘোর আপত্তি জানাইয়াছে। সে গর্ভবতী। তাহার গর্ভে সন্তান আছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তাহার ওই মৃতদেহ দর্শন অনুচিত।

বসুমতী যাইতে পারে নাই। তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। সে ঘরে বসিয়া কৃতিবাসের সহিত মনে মনে কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছে, তুমি এমন করিয়া আমাদের ফাঁকি দিবে ভাবিতে পারি নাই। আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছিলাম। সেই অপরাধে তুমি আমাকে জীবনে এতোকষ্ট দিবে তাহা কখনও চিন্তা করি নাই। কাহাকেও ভালোবাসিলে সে কি এই রূপ কষ্ট দিয়া থাকে? ভালোবাসা কি কষ্ট পাইবার জন্য? ভালোবাসার সুখ কি কষ্টে?

কৃতিবাসের মৃত্যুর পর হইতে বসুমতী এই-দুই দিন জল গ্রহণও করে নাই। কেহ তাকে খাওয়াইতে পারে নাই। কার্তিক প্রমাণিকের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। সে পলাইয়াছে। কোথায় পলাইয়াছে তাহা কেহ জানে না। কাল হইতে তাহার সংবাদ কেহ জানে না।

অন্ধকার ঘরে বসিয়া বসুমতী ভাবিতেছিল, কৃতিবাস

দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার ফলে তাহার জীবন ওলোট পালোট হইয়া গিয়াছে।

অভিভাবক—বাবা মা তাহা লইয়া কতো জট পাকাইয়াছে। তাহার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। এখন স্বামী কার্তিক প্রামাণিক পলাইল। এইবার তাহার জীবনের আবার কোন পরিণতি ঘটবে?

একবার তাহার মনে হইল, স্বামী যদি আর না ফেরে? চিন্তামাত্র তাহার মাথাটি কেমন ঘুরিয়া গেল। তাহার মাটিতে বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, মেদিনী বুকি প্রকম্পিত হইতেছে, বুকি ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে।

বসুমতী দরজা দিয়া বাহিরে তাকাইল। রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিকে গাছপালাগুলি ঝাপসা ও স্তব্ধ দেখাইতেছে। কিন্তু বসুমতীর মনে হইল, ঝড় উঠিয়াছে। প্রবল ঝড়ে প্রকৃতিরাজ্য ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইতেছে। সব মিলিয়া প্রলয় শুরু হইয়াছে, মহাপ্রলয়ে সব কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

সেই সময় বসুমতীর মা ঘরে প্রবেশ করিল।

বসুমতীকে বলিল, অন্ধকারে এমন করে বসে থাকিসনে মা। পোয়াতী মানুষ অন্ধকারে বসে থাকতে নেই। অলক্ষণ। আলোটা জ্বাল। আলোটা জ্বলে বস। হরিহর বসাক বারন্দা হইতে বলিয়া উঠিল, ই্যা, ভেবে লাভ নেই, ভগবান যা করেন তাই হবে। তিনিই ভরসা।

সমাপ্ত

“ভারযুক্ত”

বাজীরাও সেন

ঐশ্বর্যে আনন্দ নেই—

ভালোবাসা সূতিক্ত, বিষাদ,

নয় আদৌ রমনীয় রমনীর প্রেম।

তাসের মিনার বুকি খ্যাতির প্রাসাদ

রাত গেলে স্বপ্ন সমাপিকা।

এসব ঈঙ্গিত নয়

লোভাতুর কাঙাল কামনা—

আমি খুঁজি অগতর ধন

অফুরন্ত অব্যাহত আত্মার বিকাশ,

সূর্য স্বপ্ন বিমুক্ত চেতনা

অসংখ্য দুঃখের মধ্যে সৃষ্টিশীল জীবন যোজনা।

জীবন যেখানে শেষ

শ্রীঅপূর্ব চক্রবর্তী

প্রথম পর্ব

অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা এখানে শেষ। বাঁ দিকে মস্ত দীঘি। দীঘিতে টলটলে জল; বটের ছায়া পড়ে।

ডানদিকে মাঠ। লম্বায় চওড়ায় অনেকখানি। মাঠের শেষে ইঁট বায় করা বিবর্ণ হলদে রঙের বাড়ীটায় থাকে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়া কিশোরী। সতেজ রজনীগন্ধা।

সকালে রান্নায়ের মাকে টুকটাক সাহায্য করে। দশ টায় স্কুলে যায়। চকচকে পিচ ঢালা মসৃণ রাস্তাটা হাসে। রাস্তার দু পাশে লোভাতুর চাহনি; মাথা নিচু করে হাঁটে।

বিকেলবেলা। খোলা মাঠটাতে খেলে—হা-ডু-ডু, বুড়ী-ছোঁওয়া, চোর-পুলিশ।

দিগন্তে সূর্যের পাটল রঙ। ফাটা কাঁচের হারিকেন সামনে রেখে চটা-ওঠা বারান্দায় বসে বই খোলে সুপ্রিয়া।

ছুটির দিনে, বই নয়, খেলা নয়, টেনে নেয় বাঁয়া তবলা, হারমোনিয়াম। বাবার গলার সুরে সুর মেলায়: “আকাশভরা সূর্য-ভারা।”

একদিন। চটা-ওঠা বাড়ীটাতে শানাই বাজল, হ্যাজাক জ্বললো। বড়দির বিষে হলো এক ফিটার-মিস্ত্রীর সাথে। তিল তিল করে জমানো বাবার অর্ধাং প্রণবেশ ব্যানার্জীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দু হাজার টাকা নিঃশেষ।

আর একটা রাতে। শ্যাওলাপড়া কুয়োতলায় ধপাস করে একটা শব্দ; বাবা চলে গেলেন। সব অন্ধকার।

সকাল থেকে রাত্রি; রাত্রি থেকে সকাল; বৈশাখ থেকে চৈত্র আর চৈত্র থেকে বৈশাখ—

ছোট ভাই টিংকু, মা আর নিজে—একবেলা খায়। ফেনদেওয়া ভাত আর শাকচচ্চড়ি, ডাল নেই, মশলা নেই, তেল নেই।

পড়া, ট্যুশনি আর ধার করা উষা মেশিনে অনবরত ঘরর, ঘরর—অর্ডারি সেলাইএর কাজ। মাঝে মাঝে হাত পাতা—মামাদের কাছে, নিখিলের কাছে।

পাঁচটা বসন্ত ঝরে গেল। টিংকুর নাকের তলায় গৌফের রেখা—মুখে ব্রণ। হাতে অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বই।

হাত পাততে পাততে কখন অজান্তে দিয়ে ফেললো হৃদয়টাকে নিখিলের কাছে। আর সে হৃদয়টাকে ভাল-বাসার রঙে নিবিড় করে রাঙিয়ে নিখিল নিয়ে তুললো দিঘির ওপারের নীল রঙের বাড়ীটার মধ্যে।

নিখিলরা জাতিতে জেলে। প্রণবেশ ব্যানার্জীর মেয়ে সুপ্রিয়া ব্যানার্জী হল সুপ্রিয়া মণ্ডল।

দ্বিতীয় পর্ব

খুঁচু চক্রের কয়েকটা আবর্তন শেষ! দীঘির বাঁ দিকের নীল রঙের একতলা বাড়ী।

সামনে ছোট বাগান; সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। এক দিকে কোণে প্যাগোডা বাউ গাছ। গেট।

গেটটা খুলে বেরুল সুপ্রিয়া। বাঁহাতের মুঠিতে নিলয়ের মুঠি। নিলয়। সুপ্রিয়া-নিখিলের প্রথম সন্তান; ভবিষ্যতের আশা-ভরসা।

নিলয়ের গায়ের জামাতে রেলগাড়ী, সমুদ্রের ঢেউ।

পিচ-ডালা রাস্তা। রিক্সায় উঠল সুপ্রিয়া-নিলয়। বাসের প্যাঁ পেঁ ; লেভেল ক্রসিং; খেলার মাঠ; মিস্ত্রির দোকানের সামনে ঘোঁরা কুকুরটা পাতা চাটছে।

শশ্মান ঘাট; মোড়ের কোণে জটলা। স্কুলের গেট।

গেটের মধ্যে দিছে সোজা অফিসঘরের মধ্যে এল সুপ্রিয়া।

সামনে চেয়ারে বসা ডাবল লেনসের চশমা পরা উক্কো থুক্কো চুলওয়ালা কেরানী।

“কি চাই?”

“দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করাতে চাই ছেলেকে।”

চাবির ঝমঝমানি; ড্রয়ার খোলা হল। ছাপা ফর্ম বেরুলো।

‘নাম—’

প্রচণ্ড স্তব্ধতা; এক মিনিট।

প্রস্তর যুগের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কবে শেষ হয়ে গেছে! এখন বাপের পদবীতে ছেলের পদবী!

“শ্রীনিলায় মণ্ডল।” নিস্কলতা ভাঙল সুপ্রিয়া।

“বাবার নাম।”

“শ্রীনিখিল মণ্ডল।”

দাঁত দিয়ে জিবটা শক্ত করে ধরল।

“আপনি প্রণবেশ কাকুর ছোট মেয়ে তাই না?”

কেরানীর চাহনি তির্যক, মুখে ব্যঙ্গের ঝিলিক।

সুপ্রিয়ার কানে গরম সীসের ঢেউ। আবার বাতাস, শব্দ। দেওয়ালে গান্ধীজীর ছবি; চোখে অজস্র করুণা।

“আর কিছু বলতে হবে?”—সুপ্রিয়ার কান্নাভরা আওয়াজ।

‘বয়স’

‘ছয়’

তপশীল ভুক্ত জাতি না উপজাতি?

‘জলে।’

নিলায়ের ভক্তির কাজ শেষ।

বাড়ী ফিরে এসে আর ধরে রাখতে পারল না নিজে। টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে চিবুকে—চিবুকে থেকে পায়ের পাতায়।

“বল ভাই, চণ্ডাল ভারতবাসী, মুখ ভারতবাসী, আমার ভাই”—পাশের বাড়ীর রেডিও থেকে ভেসে আসছে কচি গলায় আবৃত্তি।

কানে আবার জ্বালা। দরজা জানলা সব বন্ধ করল।

রাত্রে নিখিল অফিস থেকে ফিরে রলল: “টিংকুর বিয়ে; আগামী তেসরা ফাস্তুন। চুপচাপ শুনে গেলো সুপ্রিয়া।

× × ×
টিংকুর বিয়ের দিন। রবাহুত সুপ্রিয়া। তবু এসেছে ভাই ত!

মামণির চুলগুলো পাকা শণ। বললেন: “আয়। আমি আর চোখে দেখতে পাই না। আজ ভোর বাবা নেই।”

মামণির চোখ—জলে টলমল।

রাত্রে খাবার সময়। সকলের সাথে সুপ্রিয়া বসেছে। সামনে পাতা—পাতাতে লুচি, শাকভাজা, আর পোলাও।

বড়বাড়ির চক্রবর্তী গিন্নি হঠাৎ বলে উঠল: “আমরা খাব না।”

সাথে সাথে নড়ে উঠল আরও কতকগুলো শাড়ী।

“না বাপু, অজাত-কুজাতের সাথে বসে খেতে পারব না; আমাদের সমাজ আছে; মেয়েদেরও বিয়ে দিতে হবে।”

মা-এর চোখে শ্রাবণের ধারা।

সামনে দাঁড়ান টিংকু। লম্বা বাবুরি চুল মাথার পিছনে। চোখে পরশুরামের ক্রোধাগ্নি। দামী সেন্টের গন্ধ হাওয়ায়।

দেওয়ালে বিনোবা ভাবে। ঘরের কোণায় একদিকে ধার করে কেনা সেই ‘উষা’ মেশিন।

ভালবাসা, ত্যাগ এগুলো অভিধানের অলংকার মাত্র।

“আমারই অনায়ে হয়ে গেছে। ভায়ের বিয়ে—আমার ত আগে ভাগে যাওয়া উচিত না। তাই না?”

পাত থেকে উঠে পড়লো সুপ্রিয়া। কানে ভিনু-ভিনুসের অগ্নিদগীরণ—পায়ের তলায় ভুকিকম্প।

মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। ঘর থেকে লম্বা পায়ে বেরিয়ে এসে খোলা মাঠটাতে পা রাখল।

মাঠে অনেক লোকের জমায়েত। হট্টগোল। চীৎকার। কে যেন কাকে ডাকছে। চাই চিনেবাদাম। হাজাকের আলো।

মাথার উপর টুকরো টুকরো মেঘের মাঝে বিবর্ণ চাঁদ।

মাইকে সচকিত কণ্ঠস্বর: “আপনারা আজ কাগজে পড়েছেন আমাদের নয়া ঘোষণা: মুচি, মেথর ও জেলে—এই সমস্ত তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির সার্বিক উন্নয়ন। সমাজে যাতে এরা অগ্রাধিকার পায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের ছেলেমেয়ের বিয়েতে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেওয়া হবে দু হাজার টাকা।...

আবার বৃকের মধ্যে প্রচণ্ড ঘণার আবর্ত। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। পা টলছে; মাথা টলছে।

কোনমতে পাটাকে টানতে টানতে গটটা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে শিখিল। দেহটাকে ফেলে দিলো বিছানায়; আর খোলা জানলা দিয়ে আচ্ছন্ন দৃষ্টিটা রাখলো লম্বা প্যাগোডা ঝাড় গাছটার শীর্ষতম কেন্দ্রবিন্দুতে—যেখানে তলা থেকে ভাল পালা ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশঃ সরু হয়ে এসে হঠাৎ হমকে থেমে গেছে গাছটা—ঠিক সুপ্রিয়ার জীবনের মতন।



স্বীকারোক্তি

(২)

দীপংকর সেন

সকালে কাগজটা দেখছি এমন সময় টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

কে ?

আমি অনীতা বলছি, মিঃ সেন আছেন ?

মাই গুডনেশ, সকালে উঠেই আপনার ফোন !

কেন ভুল করলাম নাকি ?

ভাবছিলাম, সেই সুন্দর গানের কলিটা, দিন যাবে বুঝি ভালো।

দেহাই ঠাকুরপো, সাংবাদিকতা করুন, কাব্যি করবেন না। মেয়েরা সাংবাদিকদের সহ করে কিন্তু কবিদের কোন মতে বরদাস্ত করতে পারে না।

বলি কোন মেয়ে কি গালিব পড়েছে ?

‘নিতান্ত নির্জনে যেতে চাই, যেখানে কেউ থাকবে না কথা বলবার। কিম্বা আমার ভাবনার কোন সঙ্গী। যখন আমি বিদায় নেব কেউ থাকবে না শোকের জন্ম।’

কাজেই বুঝেছেন পড়লে বলতো না।

আঃ দেখুন দেখি কাব্যের কপচানিতে কাজের কথা ভুলতে বসেছি।

বলুন কি লুকুম !

শুভকে দেখে আসতে হবে। অনেক দিন খবর পাইনি।

কেন এইতো পশু দেখলাম দিব্যি সাইকেল চড়ে। মনে হল দুদিন পরেই ডঃ সেনের গাড়িটি নিজেই ড্রাইভ করবে।

আপনার পশু মানে দু সপ্তাহ আগে।

তাই নাকি ? তা ও মীরাতের কোন বোডিংএ থাকে ?

সেন্ট লরেন্স।

কাল বলবো, আপনার সোনার খোকনের খবর। ছাড়লাম আজ।

বাঁচালেন ভাই, যা চিন্তায় আছি।

অনীতা বোদির কথা রাখতে ছুটে হোল মীরাত। সেন্ট লরেন্স লনে ঢুকে দেখি একদল ছেলে খেলছে। কোথাও শুভব্রতর পাতা নেই।

শেষকালে প্রক্টরের রেসিডেন্সের দিকে পা বাড়লাম।

কলিংবেল বাজাতেই বেরিয়ে এলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি।

পরিচয় দিতেই সমানের সোফা দেখিয়ে বললেন, বি সীটেড প্লীজ, আই এ্যাম স্লেডিং এ পারসন্ টু গेट দি বয়।

কিছু পরেই শুভ এল। বললে, কাকু কখন এলে ?

বললাম, এই কিছুক্ষণ হোল। চলো তোমার রুমটা দেখে আসি।

প্রক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা দুজনে লেনে নেমে পড়লাম।

শুভ বললে, কাকু তোমাকে কিন্তু আমি দেখেছিলাম প্রক্টরের কোয়ার্টার্সের দিকে যাচ্ছিলে।

ডাকলে না কেন ?

খেলার সময় ডাকতে নেই যে !

ও ডিসিপ্লিন ! কিছু থেমে বললাম, মাকে কোন চিঠি দাওনি।

বা পশুতো দাড় ফোন করেছিলেন।

হাসলাম। বললাম, দাড় ফোন করেছিলেন হতে-পারে, তবে মনে হচ্ছে তিনি তোমার খবর দিতেই ভুলে গেছেন। নইলে তোমার মা এত ভাববেন কেন ?

মা একটু বেশী ভাবে।

ওভাবে কথা বলে না। মাকে নিয়মিত চিঠি দিও কেমন ?

কথা বলতে বলতে কখন ওর রুমে এসে গেছি। একটি ঘরে পাশা পাশি দুটো খাটিয়া। মাথার কাছে ছোট ছোট দুটো টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের ওপর বইগুলি সাজানো। দু পাশে দুটো মীট সেফ। বললাম এতে ওরা খাবার টাবার বা প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র রাখে।

বললাম, এই-নাও তোমার প্রোজেক্টেশন।

কাকু এত বিস্কিট নিয়ে আমি কি করবো ? মা তো অনেক দিচ্ছেন।

নিজে খাবে আর বন্ধুদের বিলোবে। চলি কেমন ?

এসো।

ভাল ছেলের মত থাকবে।

ও ইয়েন্।
 গুড বয়।
 বেনারসে ফিরেই টেলিফোনে ডায়াল করলাম।
 কে?
 আমি দীপংকর বলছি।
 ও ঠাকুরপো, কখন এলেন?
 এইমাত্র। শুনুন আপনার শোকন সোনা ভাল আছে।
 স্বাস্থ্যটা এত জেলা দিচ্ছে যে মাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
 আপনি যে কি?
 বলি রামায়ণ পড়েছেন, রামায়ণ?
 কেন?
 কনভেন্টে পড়লেই চলে না, রামায়ণ পড়তে হয়।
 দেখবেন সেখানে সীতা আছে, আর আছে দেবর লক্ষ্মণ।
 বেচারী সীতার পা দেখেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে।
 আঃ কি হচ্ছে, সব সমায় ফকড়ি।
 একটু থেমে অনীতা বোদি বললেন, তবে জননতো
 শরৎবারুর রামের স্মৃতি বলে একটা বই আছে। সেখানে
 বেয়াড়া ঠাকুরপোর কান মূলে দিয়েছিলেন নারায়ণী।

হৃষ্টমী করে জিগগেস করি, স্মৃতি হয়েছিল
 রামের।
 হু হয়েছিল। দাদা যখন রামকে আলাদা করে
 দিলেন। হুজনেই কেঁদে আকুল।
 বললাম, বা গল্পটা মুখস্থ করেছেন দেখছি।
 কিছুক্ষণ চুপচাপ।
 একটু পরেই অনীতা বোদি বললেন, বাবা সকালে
 ফোনে জানালেন, আপনি গিয়েছিলেন।
 মাই গুডনেশ। এখানেও আমার স্কুপটা মাটি করে
 দিলেন। কোথায় আমি ভাবলাম, আগে খবর দিয়ে
 মিষ্টি খাব, তা নয়। সত্যি প্রবীণদের কিছুতেই স্মৃতি
 হবে না।
 আঃ গুরুজনদের নিয়ে এরকম বলতে নেই। অসবন
 মিষ্টি খাওয়াবো।
 বললাম, রাখছি।
 আচ্ছা।
 রিসিভারটা রেখে দিলাম।

বঞ্চিতা

সন্তোষ ভট্টাচার্য

আশ্রয় আত্মীয়ের কাছে
 কল্লিত অভাব
 নানা অভিযোগ
 পাঠশালে হল না পদার্পণ।
 নিরক্ষর।
 নিম্ন হতে উচ্চতম সর্ব কর্ম বিনিময়ে
 একটু মিষ্টি মুখ।
 শিক্ষার অজুহাতে
 বন্ধ হল বিবাহ উৎসব।
 পারিবারিক প্রয়োজনে
 নিঃস্বাসের কোথা অবকাশ
 বাড়ীতে দেখেছে বাসর

নাহি পরিতাপ
 হৃদয় উত্তাপ অর্থ ছাড়া হয় না গরম।
 স্নেহ, ভালবাসা প্রেম
 অকল্লিত কল্লনা,
 ঐশ্বর্য বঞ্চিতা
 অবহেলিতা
 কুমারী জীবনঃ
 বার্ষিকের দ্বারপ্রান্তে,
 শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের পানে
 নূতন আশ্রয়
 রাজপথ
 না দেবালয় প্রাঙ্গণ।

মহাপ্রভু

বেদান্ত দর্শন—২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ; অনুবাদক ও
ব্যাখ্যাতা : স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পাদক
স্বামী চিদম্বানন্দ পুরী এবং বেদান্তবাগীশ শ্রীঅনন্দ বা,
স্বামীচার্য। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন
লেন বাগবাজার, কলিকাতা—৩।

এই মহামূল্য বেদান্তগ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত গ্রন্থপ্রিয়
গৃহস্থের গৃহে স্থাপিত হওয়া উচিত। মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের উদ্যোগী হয়ে এর যাবতীয় মুদ্রণব্যয় বহন
করা কর্তব্য। এই গ্রন্থের সব খণ্ড কয়টি অর্থাভাবে
মুদ্রিত না থাকা জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

বেদান্ত এমন এক দর্শন যা মানুষকে সব রকম
গোড়ামি-মুক্ত হয়ে আত্মানুসন্ধানে তথা তত্ত্বানুসন্ধানে
প্রবৃত্ত করে। ভগবান অনন্ত, অসীম ; তিনি কখনও
বচনের দ্বারা বিষয়ীকৃত হতে পারেন না। রামকৃষ্ণের
ভাষায় ব্রহ্ম কখনও বচনের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হবেন না।
আমরা তত্ত্বমন্ত্র, পূজাপদ্ধতি, উপাসনা, প্রার্থনা, পরলোক
তত্ত্বানুশীলন প্রভৃতির দ্বারা নিজের আত্মাকে খুঁজে
মরছি। কিন্তু শাস্ত্রালোচনার দ্বারা কোনদিন নিজের
প্রকৃত স্বরূপকে কেউ খুঁজে পায়নি, পাবে না। তাই
বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার তথা দার্শনিক শঙ্করাচার্য
বলেছিলেন, শব্দজাল মহারণ্যবিশেষ, চিত্ত সেখানে বৃথা
ঘুরে-মরে! এক পো ঘুঘের বাটি দিয়ে যেমন একমণ
ঘুঘের একত্র পরিমাপ হয় না, হয় কেবল অন্ধের হস্তীদর্শন,
যেমন নুনের পুতুল পারে না সমুদ্রের গভীরতা মাপতে,
তেমনি আমরাও পারি না তাঁর আশ্চর্য স্বরূপ ব্যাখ্যা
করতে।

বেদান্তের সার্থকতা আমাদের সসীম মনের এই
দুর্বলতা ঘুচিয়ে ধর্মীয় গোড়ামি থেকে আমাদের মুক্ত
করায়। ভগবানকে অমুক পথে পাওয়া যায়, আর অমুক
মতে পাওয়া যায় না, আমার ধর্মই সদ্ধর্ম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী
হল পাষণ্ড, এই মূঢ়তা পরিহার করতে বেদান্ত যত সাহায্য

করেছে এমন আর কিছু নয়। অথচ তাঁর জন্তে মানুষের
পাপ প্রযুক্তিকে উস্কে দিয়ে তাকে বিপথে চালিত করার
প্রয়োজন হয় নি। উপচারবিশুদ্ধি ও সংযমের ভিত্তিতে
বেদান্তের জ্ঞান-সাধনা প্রতিষ্ঠিত। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী
এই সাধনার মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রসন্ন, প্রশান্ত, নির্ভীক,
অবদ্ব।

অনুবাদক বিশ্বরূপানন্দ এমনই এক সন্ন্যাসী। তাঁর
শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার অক্ষম
সমালোচনা শেষ করলাম। যদি কেউ ধর্মের বিষদাঁত
ভেঙে ফেলে, নাস্তিক্যের কুয়াসা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বব্যাপী
যে সত্তা, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হতে চান, তবে তিনি যেন
বিশ্বরূপানন্দের সূর্যালোকিত সরণীতে পদার্পণ করেন।
সে পথে বিদেহ বা সংশয় নেই, আছে শুধু আনন্দ, যা
দৈতের আলোছায়ায় কিকিমিকির অনেক উদ্বেগ।

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগৌরানন্দ-স্বরূপ রহস্য—ডাক্তার গণপতি ঘোষ,
এম, বি, প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, পোঃ
দাইহাট, বর্ধমান। প্রাপ্তিস্থান-মহেশ লাইব্রেরী,
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা—২২। মূল্য এক টাকা

মহাপ্রভুর স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস সূদীর্ঘকাল ধরে
হয়ে আসছে। ভক্তজনের কাছে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের
পূর্ণভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবত,
চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি নানা গ্রন্থে তাঁর আলোচনা
হয়েছে। ভক্ত ডাক্তার গণপতি ঘোষ তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে
রহস্যময় মহাপ্রভুর লীলা মাহাত্ম্য ও তাঁর স্বরূপ বর্ণনায়
প্রয়াসী হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ পাঠে একথাই
পরিস্ফুট হয় তিনি যুগের এক সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন
হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে
তুলতে। যুগাবতারের এইটেই কাজ। জাতিধর্ম
নির্বিশেষে তিনি কৃষ্ণনাম বিভরণ করেছেন। প্রশ্ন হবে
কে এই চৈতন্য মহাপ্রভু? তাঁর স্বরূপ কি? রাধাভাবে
ভাবিত স্বয়ং কৃষ্ণই মহাপ্রভু। তাই প্রেমবিকাশ এবং
কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্তে যোগসাধনা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ
অনাবশ্যক। তথাপি ব্রজলীলায় যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায়
রাধা এবং গোপীগণ ধর্মলাভের সাধনা নিজেরা অনুষ্ঠান

করে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি মহাপ্রভু নিজেও সাধনার ক্রমবিকাশ দেখিয়ে গেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বৃন্দাবন লীলার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা কি কাম লীলা? এখানেই অনেকের ভ্রান্তি। চৈতন্যপুরুষ আর চিংশক্তি প্রকৃতির সম্ভোগ নিয়ে রাস। রসোপভোগ করানোই রাসলীলা। রমণ ইচ্ছা হলো সহজ ভাব। সুখের পূর্বসংগ। এই রমণ ইন্দ্রিয়াতীত। কারণ মূলহীন মূল প্রকৃতি এবং অনাদি পুরুষের ইন্দ্রিয় কোথায়? এ হলো প্রাণ এবং ভাবের মিলন। প্রাণ আর ভাব নিয়েই প্রেম। ইন্দ্রিয় প্রীতি হলো কাম। শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছাকে বলা হয় অপ্রাকৃত কাম—কামবীজ তাঁর উপাসনার মন্ত্র। শ্রীমতী রাধিকা সেই কামবীজের স্বরূপ। তাই ছায়াদিনী শক্তির সঙ্গে রাসলীলা ক'রে কামবিজয় হয়েছিল। জগতের জীবের কামনাশের জগুই রাসলীলা। প্রেমের চরম অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ দেহাত্মবুদ্ধির বা ভেদবুদ্ধির বিলোপ হয়। রায় রামানন্দ বলেন 'ন সো রমণ, ন হাম রমণী। দু'হো মন মনোভাব পোষল জানি।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়েছেন শ্রীভগবানের নিত্য-লীলায় প্রতি জীবেরই অধিকার আছে। কিন্তু যতক্ষণ ভাবের পথে প্রেমের দ্বারা রসের বিকাশ না হয়, ততক্ষণ রসময়ের দিব্যালীলায় প্রবেশের অধিকার হয় না। রসাবস্থায় প্রবেশলাভ হলে মঞ্জরী থেকে সখী এবং সখী থেকে রাধাভাবের স্পর্শ হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যের দেহে কৃষ্ণভাব গুপ্ত থেকে রাধাভাবের বিকাশ ঘটেছে। এবং যেভাবে তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা করেছেন তার বিশ্লেষণ করেছেন ভক্ত ডাক্তার ঘোষ। প্রার্থনা করি তিনি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করুন। এজাতীয় গ্রন্থের প্রচার আশিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নবদ্বীপ গীতাঙ্গ—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সার্বভৌম গ্রন্থপ্রকাশ, ১৬ সৈয়দ আমির আলি এডিনিউ, কলিকাতা—১৭, পৃষ্ঠা ১০৪; দাম—চার টাকা।

সাম্প্রতিক কালে কোন অবতার বা অবতারকল্প পুরুষের জীবনকাহিনী ছন্দে প্রকাশ করা প্রায় বিরল ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করেছিলেন অক্ষয় সেন মহাশয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু শ্রীমুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় অত্যাধুনিক কালে যে মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ আসন অধিকার ক'রে থাকবে।

চারশ স্তবকে গ্রন্থকার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আলেখ্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন 'স্বর্ণে' বিভক্ত করা হলে মহাকাব্য বলা যেত, তথাপি ইতিহাসের পটভূমিকা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং শ্রীরাধিকার মহাভাব আঘাদনে নবদ্বীপচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁর ক্রমবিকাশ এমনভাবে সুগ্রন্থিত হয়েছে যে মহাকাব্যের সৌগন্ধ এখানে পল্লি-সুটিত। শুধু তাই নয়, নবদ্বীপ-তত্ত্ব যে সনাতন-তত্ত্বের বাহ্যিক বিকাশ গ্রন্থকার তা সুন্দর ভাবে বলেছেন।

'রাধা' শব্দের অর্থ কি? 'রা' হলো শব্দোচ্চারণদ ভক্তো ভক্তিমুক্তির রাতি সং। 'ধা' হলো শব্দোচ্চারণে নৈব ধাবতোষ হরেঃ পদম্॥ রাধয়তি আরাধয়তি রাধা। কৃষ্ণ বিষয়স্বরূপ, তাঁর আশ্রয়স্বরূপা শ্রীরাধা। রাধা সৃষ্টি স্থিতি অন্তরূপা, তিনি মহামায়া, তিনি চিন্ময়ী। তিনি সকলের আধারস্বরূপা তাই তিনি রাধা।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে কয়েকটি চরণ তুলে ধরছি—'শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রজ্ঞা বেদান্তের ব্রহ্মমূলে', 'জাগে অখণ্ড-রসবল্লাভা শক্তিরূপিনী স্বয়ং রাধা', 'আরাধিকা তাই রাধিকামূর্তি-কৃষ্ণচেতনা কৃষ্ণধ্যান।'

শ্রীচৈতন্যদেব আপামর সাধারণে 'নাম' বিতরণ করেছেন। এর স্বার্থকতা কি? ভাগবতে মহারাজ পৃথু যে ভগবৎ স্তুতি করেছেন সেটি তুলে ধরছি:

"স উত্তমলোক! মহান্মুখচ্যুতো/ভবং পদান্তেজি সুধাকর্ণানিলঃ/স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ব বজ্রনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বটৈঃ॥" মহতের কর্তনিসূত বিগলিত আপনার লীলারস মাধুর্যগন্ধ সম্বন্ধযুক্ত বায়ু ভগবৎ স্মৃতি-বিরহিত আমাদের কাণে প্রবেশ করলেও আমাদের অন্তরে ভগবৎ স্মৃতি জাগ্রত করে। শ্রীভগবানের নম উচ্চারণ করলে অন্ত্যজ ব্যক্তিও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু ভক্তের মুখোচ্চারিত নাম শ্রবণে মর্ত্যদেহেই অমৃত লাভ করা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু দেশের এক সঙ্কটকালে হিন্দুধর্মকে শোচনীয় অশ্রুপতন থেকে উদ্ধার করার জগুে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

গ্রন্থকার শ্রীমুক্ত ভট্টাচার্য চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃতলীলা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। ভাবের গাভীরে, বর্ণনার পারিপাট্যে, ঘটনার বিঘাসে তিনি সফল হয়েছেন। শ্যাম আর শ্যামার মিলন ঘটোচ্ছ শ্রীকৃষ্ণে। তাঁরই প্রতিরূপ নবদ্বীপচন্দ্র। এই মহৎ গাথামঞ্জরী, ভক্তমহলে সুপ্রচারিত হোক, তাঁদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মাধুর্যে পরিপূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করি।

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

সজ্জ-সংবাদ

আশ্রমী

প্রজাতন্ত্র দিবস : ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৬ প্রবর্তক সজ্জ চন্দননগরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ঐ দিন বেলা ৮।। ঘটিকায় সজ্জসভাপতি শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত “বন্দেমাতরম্” সঙ্গীত ও মন্ত্রধ্বনি সহ শুভ শঙ্খঝোলে জাতীয় পতকা উত্তোলন করেন। তৎপরে জাতীয় সঙ্গীতান্তে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী স্বাধীনতার সঙ্কল্প-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সমবেত কণ্ঠে সকলেই তাহা আবৃত্তি করেন। সজ্জসভাপতি স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে সুন্দর একটি ভাষণ দেন। শেষে সমাপ্তি সঙ্গীত সজ্জ-কন্ঠারাই সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন।

অতপরঃ বেলা ১১ ঘটিকায় উপাসনা শেষে নিমন্তর “ভারতীয় অধ্যাত্ম সমাজের” উদ্যোগে কিশোর ও যুবকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সজ্জসভাপতি সজ্জসম্পাদক, সজ্জের কয়েকজন প্রবীণ সভ্য, স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং বিপ্লবী দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীজ্ঞানরঞ্জন পালও এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। ভগিনী মৈত্রেয়ীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শ্রীমান প্রবীর রায় শ্রদ্ধেয় সজ্জসভাপতি সহ সকলকেই বরণ করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে কিশোর ও যুবকদের এই আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্ম অনুরোধ জানান এবং সাপ্তাহিক এই অনুষ্ঠানের একটি কর্মসূচীও প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরা প্রবর্তকসজ্জের সভাপতি ও উপস্থিত সকলকেই গার্ড অব্ অনার প্রদান করেন। তাঁদের ৮ জন সভ্য এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

প্রবর্তক আশ্রম ফ্রেজারগঞ্জ :—প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ফ্রেজারগঞ্জে প্রবর্তক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় প্রবর্তক আশ্রমের কর্ণধার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। আশ্রমের আবাসিক কিশোরীদের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও সমাগত সকলের “বন্দেমাতরম্” মন্ত্রে পুষ্পোশোভিত জিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতকা উত্তোলন করেন সভাপতি মহোদয়। তৎপরে জাতীয়সঙ্গীত গীতান্তে শিক্ষক মহাশয়গণ, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহোদয় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের বিষয়বস্তু ইংরেজের ভারতে পদার্পণ থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এবং স্বাধীনতা লাভের

পর প্রত্যেকের কর্তব্য সম্বন্ধেও তাঁরা বলেন যে এখন প্রত্যেকের কর্তব্য সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশকে ভাল-বাসতে শেখা—দেশের ভাষা, দেশের মানুষ, দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম; দেশের অতিতুচ্ছ বস্তুও যেন আমাদের প্রত্যেকের কাছে আদরণীয় বলে গণ্য হয়। ছাত্রদের মধ্য থেকেও কেহ কেহ ভাষণ প্রদান করে। ছেলেমেয়েদের ব্রতচারী অভীপ্রদর্শনার পর জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শ্রীপঞ্চমী : ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ (২২শে মাঘ ১৩৮২) বৃহস্পতিবার শুভ শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথি। এই দিন প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত সজ্জমন্দিরে মাতৃ প্রতিমার সন্মুখে ঘট স্থাপনা করে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়। পূজায় পৌরোহিত্য করেন পণ্ডিত শ্রীঅনিল-বরণ তর্কবেদান্ততীর্থ। পূজান্তে সজ্জ-সভ্য-সভ্যার সহিত ছাত্রছাত্রীরাও পুষ্পাজলি প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত সজ্জের সর্বত্রই ছাত্রছাত্রীরা বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে প্রতিমা পূজা সম্পন্ন করেন।

মাঘী পূর্ণিমা—কেন্দ্রসজ্জ : মাঘী পূর্ণিমার দিনটি সজ্জের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন—কারণ ইহা মায়ের সাধনার সিদ্ধির দিন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই পূণ্য দিনে মা নিজ ব্যক্তিত্বকে সজ্জের মধ্যে লয় করে দিয়ে সজ্জজননীরূপে আশ্রমতীর্থে আত্মপ্রকাশ করেন। এই দিনটি তাই সংঘের সর্বত্র বিশেষ স্মরণ-মননের মধ্য দিয়াই পালিত হয়। সংঘ-সন্তান-সন্ততিগণ সারাদিন মায়ের অনুষ্ঠানে রত থেকে, মায়েরই কাছে প্রার্থনা জানান—তাঁরই স্নেহ কারুণ্যে অভিষিক্ত হয়ে তাঁরাও যেন নিজ নিজ জীবনে সজ্জের প্রতিষ্ঠা দিয়ে ধন্য হতে পারেন।

এবার ২রা ফাল্গুন, ১৩৮২ (ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) রবিবার মাঘী পূর্ণিমা পড়ে। কেন্দ্রসজ্জ মাঘী পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমের মাতৃমন্দিরে। সন্ধ্যায় অষ্টোত্তরশত মাতৃনাম জপান্তে সমবেত উপাসনা। তৎপরে সম্মেলন সুরু হয় মায়েরই আবাহনী সঙ্গীতে। মাঘী পূর্ণিমা সম্বন্ধীয় একটি সজ্জবাণী পাঠের পর পাঁচ মিনিট তন্ময়তা। তারপর “মায়ের কথা” অর্থাৎ মায়ের উপদেশাবলী পাঠ, মাতৃমহিমা কীর্তন, সঙ্গীতে মাতৃপ্রণাম এবং পুনরায় পূর্ণ প্রশস্তিমন্ত্রে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

নববারাকপুরে : শ্রীমতী লীলা বসুর গৃহে মাঘী পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিমতী লীলাদেবী

এই দিনটিতে বিশেষভাবে মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় গুরু ভাইবোনদের নিয়ে ভজন-পূজন নাম কীর্তনের মধ্যদিয়ে দিনটি অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যায় তাঁর গৃহে সমবেত উপাসনা, মাতৃনাম জপ, মাতৃ অনুষ্ঠান, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যদিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

ফ্রেজারগঞ্জে : ফ্রেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রম নিসর্গ সৌন্দর্যের আকর। পূর্ণিমার জ্যেষ্ঠাবিধৌত আশ্রম-ভূমি যেন স্বর্গের সুসমা দিয়ে গড়া। ধূপ, নীপ, গন্ধ পুষ্পের সৌবাত মন আপনা হতে ঈশ্বরীয়ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মাঘীপূর্ণিমা সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমাগত প্রায় দেড়শতাধিক মানুষের মন ভাগবতমুখী। তথাকার প্রাত্যহিক সাক্ষ্য উপাসনার নিয়মানুসারে গুরুবন্দনা রামধন, সজ্জ প্রশান্তি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠের পর পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীমন্তাগবৎ পাঠ হয়। পঠিত বস্তু নিয়ে কয়েকজন আলোচনা করেন। ভাগবত কথা সকলেরই চিত্তগ্রাহী হয়। পরিশেষে সন্ধ্যারতি। ওখানকার সন্ধ্যারতি একটি সুন্দর জিনিষ। ছোট ছোট মেয়েরা পঞ্চ প্রনীপ জেলে আরতি করে, তার সঙ্গে নানারকম বাদ্য বাজে, ভক্তিমূলক গান হয়। আবহাওয়ায় এমন একটি পবিত্রতাব ফুটে উঠে যা মানুষকে মুগ্ধ করে, ঈশ্বরীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। আরতির শেষে সংকীর্তন তৎপরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাঁকিনাড়া : কাঁকিনাড়ায় শ্রীপ্রভাত মজুমদারের গৃহখানি যেন একটি মাতৃ-আশ্রম। ভক্তিমতী রমারানীর নিষ্ঠা ভক্তি অতুলনীয়। তিনি যেন স্বয়ংই মাতৃরূপা। তাঁর স্নেহ প্রীতি ভালবাসার আকর্ষণে কাঁকিনাড়া নিবাসী সকল গুরু-ভাই-বোনই আকৃষ্ট। তিনি এইদিন উপবাসী থেকে মাতৃপূজা ও ভোগাদির আয়োজন করেন। তাঁরই আকর্ষণে সজ্জ সভাপতি এইদিন তাঁর গৃহে উপস্থিত থেকে সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন।

শ্রীপ্রভাত মজুমদারের উদারভায় এবং শ্রীমান ধীরাজের কর্মদক্ষতার গুণে সম্মেলনটি অতীব সাফল্য মণ্ডিত হয়। তাদের আহ্বানে স্থানীয় সভা-সভা এবং প্রতিবেশী বন্ধুমহল ভিন্ন বহু দূরদূরান্ত থেকে প্রায় দুই শতাধিক ভক্তসম্মেলন, জ্ঞানী গুণী মনীষীর সমাবেশ হয়। কলিকাতা থেকে প্রধান অতিথিরূপে আসেন প্রখ্যাত বক্তা এবং সাহিত্যিক শ্রীভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংকুড়া, কৃষ্ণনগর আগড়গাড়া, সোদপুর, নাটাগড়, বারাকপুর, নববারাকপুর, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের সহযোগী সভা-সভার সমাগম হয়। চন্দননগর থেকেও সজ্জ সভাপতির সঙ্গে কয়েকজন আসেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী এবং প্রখ্যাত গায়কও সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমবেত হন।

অপরায় ৫ ঘটিকায় সম্মেলন শুরু হয় শ্রীরাজিৎ মিত্রের

“শৃঙ্খল বিশ্ব-অমৃতময় পুত্রা”র উদগানে। শ্রীরমেন দাস সভাপতি ও প্রধানঅতিথিকে বরণ করিলে সমবেত কণ্ঠে মাতৃ আহ্বান সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ সমাগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীশ্রী সজ্জজননীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। শ্রীপ্রভাত মজুমদার বলেন, আজকের সম্মেলনে এতগুলি মানুষের সমাবেশ কোন ব্যক্তির আকর্ষণে কখনই সম্ভবপর নয় দিব্য মাতৃত্বের প্রভাবই এর একমাত্র কারণ।

শ্রীমতী গীতাদাস বলেন—সমাজ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই চাই পবিত্রতা রক্ষা আর ত্যাগের আদর্শকে সম্মুখে রাখা। আজিকার দিনে সজ্জজননীর জীবন-দৃষ্টান্তই সমাজ জীবনে অনুসরণীয়। শ্রীঅজয় দাস প্রবর্তকে মারের জীবনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য আবেদন জানান। শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র ধর্মকে মঠ, মন্দির, মসজিদের গভীতে সীমাবদ্ধ না রেখে উদার সার্বজনীন ভাবে সর্বত্র সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কথা ব্যক্ত করেন।

শ্রীমান ধীরাজ মজুমদার বলেন—দেশে আজ সং মানুষের বড় অভাব। ধর্মহীনতাই এর প্রধান কারণ। গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে না পারলে, প্রকৃত ধর্মজীবন তথা অধ্যাত্মজীবনের আনন্দ অনুভূত হয় না। শ্রীভারত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহীমময়ী সজ্জমাতৃকার অীচরণে প্রগতি জ্ঞাপন করে গীতায় ভগবানের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন—“ইচ্ছোহসি মে দৃঢ়মিতি”—এইটিই শ্রীভগবানের সর্বগুহ্য কথা। এই গুহ্য তত্ত্বকথাটি জেনে তাঁতে সর্বকর্ম, সর্বধর্ম সর্বাঙ্গী অর্পণ করে তাঁকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই জীবনের সার্থকতা।

সমবেত সাক্ষ্যউপাসনার পর সজ্জসভাপতি উদাস কণ্ঠে ঘোষণা করেন সজ্জের ধর্ম, কোন বিশেষিত ধর্ম নয়। ইহা সীমাবদ্ধ বা গভীবদ্ধও নয়। সজ্জের ধর্ম সনাতন—যাহা শাস্ত্র, নীতি, যাহার পালনে মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত হয়। সেই ধর্ম সজ্জজীবনে অনুবাদিত করে দেশকেও সেই সনাতন ধর্মে অনুপ্রাণিত করার সাধনাই সজ্জ গ্রহণ করেছে।

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী রঞ্জিৎ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বাড়ী, দিলীপ মুখার্জি, পূর্ণিমা, বীণা, রচা, মালতী, বাসন্তী, জয়ন্তী, স্নেহলতা, মায়ী প্রভৃতি।

সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন শ্রীভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথি বিদায় গ্রহণ করেন। তৎপরে অধিকরাতি অবধি ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আসর চলে। শ্রীমতী রমারানী গুরুভগ্নীদের সহিত সকলকে পরমানন্দে প্রসাদ বিতরণ করেন।

প্রবন্ধ

বার্ষিক সূচীপত্র : বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৮২

লেখক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী :

প্রশ=প্রশস্তি ; প্র=প্রবন্ধ ; নি=নিবন্ধ ; স=সঙ্কলন ; উ=উপন্যাস ; গা=গান ; গ=গল্প ; ক=কবিতা ; কা=কাহিনী ; আ=আলোচনা ; বিব=বিবরণী ; রর=রম্যরচনা ; জী=জীবনী ; স্ম ক=স্মৃতিকথা ।

শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত		শ্রী অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রবর্তকের নববর্ষ	৩	“ওনাম”-কেরালার বিরাট জাতীয় উৎসব (প্রঃ)	২৯২
সম্পাদকীয়	৩৮৭, ৪১৩	শ্রী অজিত দাস	
ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার		বসুমতী (উঃ)	৩১৬, ৩৫৬, ৩৯৯, ৪৭১
বিজ্ঞান ও ধর্ম (প্রঃ)	২৪	শ্রী শ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র	
যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মেরই অনুলিপি (প্রঃ)	৮৫	হে মহান্ (কঃ)	৩৪৬
ডঃ অক্ষ কোলের দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ বসু (জীঃ)	৯৭	শ্রী অখিল নিয়োগী	
জাতীয় কংগ্রেসে শরৎচন্দ্রের অবদান (প্রঃ)	১৫০	ভাটিয়ালী গান	৩৭৩
অসাধারে আলোর সাধনা (প্রঃ)	২১০	শ্রী অজন্তা মিত্র	
শ্রী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়		আমরা সভা (কঃ)	৪৩৭
মুন্নি (গঃ)	৫৩	শ্রী অমর কর	
শ্রী অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়		বুবুর ছবি (গঃ)	৪৪১
জাতীয়তার ঋষি ও সাধক		ডঃ আশা দাশ	
বিপিনচন্দ্র ও শ্রী অরবিন্দ (প্রঃ)	৮১, ১১৫, ৪৭৩	বৌদ্ধিচিহ্ন পরিগ্রহ ও শ্রীচৈতন্যচিদাকাশ (প্রঃ)	১৭
শ্রী অভয়পদ মজুমদার		আহ্বায়ক	
জাগৃহি (কঃ)	১৫৮	কঙ্কীরূপ বন্দনা (প্রঃ)	৩১
বিধাতা পুরুষ (কঃ)	২০৬	আশ্রমী	
কোজাগরী পূর্ণিমা (কঃ)	৩১০	সঙ্ঘ-সংবাদ (বিবঃ)	১০৪, ১১৮, ১৭০, ১৯৯, ৩০০, ৩৫৮, ৩৮২, ৪১৪, ৪৪৪, ৪৮১
শ্রী অমিয়া সেন		শ্রী ইন্দুভূষণ রায়	
জননী (গঃ)	২৪০	‘প্রবর্তক’-পত্রিকার ৬০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত	
শ্রী অনাদিনাথ ঘোষ		ইতিবৃত্ত (বিবঃ)	২৪৯
বেলা ব’য়ে যায় (কঃ)	২৭৬	শ্রী উমাপদ নাথ	
শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু		অতএব ফিরে এসো (কঃ)	৩১০
অপরাজিতা (গঃ)	২৭৭	শোভের আশায় (কঃ)	৩৭৪
শ্রী অপূর্ব চক্রবর্তী			
জীবন যেখানে শেষ (গঃ)	৪৭৫		



শ্রীকিরণেন্দু বাগচী		শ্রীভূগাদাস ভট্ট	
বিপ্লবযজ্ঞ-ঋত্বিক কানাইলাল (জী:) ৩৭, ৯৩, ১১৮, ১৬৫; ১৮৯, ২৯৬, ৩৩১, ৩৬০, ৪১০, ৪২৯, ৪৬৬		আত্মনিয়ন্ত্রণ (গঃ)	৬৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর		শ্রীদেবশীষ দাস	
দুর্গাপূজার শাস্ত্র-বিজ্ঞান (প্রঃ)	২১৭	এভাবেই সব শেষ হয় না (কঃ)	৭৯
শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়		শ্রীদীপেন রাহা	
হিন্দু সমাজ-দর্শনে আকার ও সংস্কার (প্রঃ)	২৮৩	ফসল (গঃ)	১১১
যুগাবতার শ্রীসত্য সাই বাবা (প্রঃ)	৩৩৬	রক্তচন্দন (গঃ)	২৯৪
ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীদীপঙ্কর সেন	
সম্মতির স্বাক্ষর (প্রঃ)	৩৫৪	হৈমন্তী সান্ন্যাল (গঃ)	১২৩
শ্রীকৌশিককিশোর পাল		সাহিত্যের আসর (গঃ)	২৬৬
শীতের সকাল (কঃ)	৪৩২	স্বীকারোক্তি (গঃ)	৩৭৪, ৪৭৭
শ্রীগোপাল বাগচী		শ্রীদীপ্তোপল রায়	
মহাকাশে-অর্ঘ্যভট্ট (প্রঃ)	১৩৮	উক্তি: নেপথ্যে (কঃ)	২৩৬
ডাঃ গৌরমোহন দাস দে		শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	
অভিশাপ (গঃ)	১১৩	রক্তের সম্পর্ক (গঃ)	১০১
শ্রীগোপীনাথ সেন		ভূমিকা (গঃ)	২৩৪
দার্জিলিং জিলার আদিবাসী সংস্কৃতি (প্রঃ)	৩১২	বিজ্ঞাপনের ইতিহাস (গঃ)	৪০৮
শ্রীমতী গীতা হাজরা		শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার	
প্রণাম (কঃ)	৩২৮	মায়ার টান (কঃ)	১৬৯
শ্রীচিত্রিতা দেবী		শাস্ত্রত প্রেম (কঃ)	২৩৯
রবীন্দ্রনাথ (কঃ)	১৫	ক্ষুধা (কঃ)	৪৩৭
শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীনীহারকণা দাস দে	
কবিগান (কঃ)	১০৩	ধুন, না বলি (কঃ)	৭৯
শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী		শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ	
হোঁচট্ (কঃ)	২৯১	আনন্দো ব্রজেন (কঃ)	১৮২
ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়		শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য	
দেশজননীর প্রতি (কঃ)	২৩৩	বঙ্গের আদি বারোয়ারী (প্রঃ)	২২০
শরৎচন্দ্র (কঃ)	৩৭৯	নরনারায়ণ	
মহিমা (কঃ)	৪৫৬	মহাপ্রভুর ভাবনৃত্য (প্রঃ)	২৩২
শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীনলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	
সাহিত্য প্রসঙ্গে (প্রঃ)	১১	অন্ধকার, সে আমারই (কঃ)	২৩৬
মধুরেণ (গঃ)	২১৬	শ্রীনীরেন রায়	
ডাঃ তারাশ্রম সরকার		মাতৃপূজা ও আরতি (প্রঃ)	২৩৭
জীবনশিল্পী মতিলাল (জী:) ৩৭, ৪৩৩, ৪৬৩		শ্রীমতী ননীবালা দোবে	
		বিদ্যরূপ (কঃ)	৪২৮

নর্মলকুমার মান্না		শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য	
মন্ত্রার্থ্য (কঃ)	৪৩২	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (প্রঃ)	১১৬
মালাল দাশগুপ্ত		শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	
য, মানুষের জয় (প্রঃ)	৬	কাছের মানুষ শরৎচন্দ্র (প্রঃ)	২২৪
প্রেমানন্দ		টোমাস্ মান (জীঃ)	৩১৫
বাণী (কঃ)	১৬	শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস	
ধতা (কঃ)	২১৯	আত্মসমর্পণ যোগে কর্ম ও কর্মী (প্রঃ)	৩২৭
র্থনা (কঃ)	৪০৯	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ শীল	
দীর বিশ্বাস		চাঁদকে (কঃ)	৭৯
মন আছেন ? (গঃ)	৫৭	কোথা সেই মানুষ (কঃ)	৪৩৭
তিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
রণ স্মৃতি (কঃ)	১২৪	শরৎচন্দ্র (কঃ)	১৮২
ভাস বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়	
দী (কঃ)	১৬৪	শীল (প্রঃ)	১৯৫
ভূক (কঃ)	২৩৩	লক্ষ্মী-কৃপা (নিঃ)	৪৬৯
নিকের চেয়ে শক্তিমান (কঃ)	৪৩৭	ভবঘুরে	
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী		প্ল্যাটফর্ম (গঃ)	৩২৬
শ্রীদুর্গা-প্রশস্তি (প্রশঃ)	২০২	সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল	
প্রশান্ত ভবাই		প্রবর্তক কি করিবে ?	১
দ্বদের মত (কঃ)	৩৬৪	জীবনের আলো (প্রশঃ)	৭৩, ১০৯, ১৪৫, ১৭৩, ২৬৯, ৩০৫, ৩৪১, ৩৮৫, ৪১৭, ৪৫১
কণিভূষণ বিশ্বাস		শক্তিপূজা (প্রশঃ)	২০১
জাল (কঃ)	২৪৬	শ্রীমানবেন্দ্র পাল	
কণিভূষণ সামন্ত		সেকলে গল্প : চিরকালের মন (গঃ)	৪৭
সজ্জগুরু স্মৃতিকথা (স্মৃঃ কঃ)	৩৪০, ৪৩৫	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	
বিধ		নীল দিগন্তে (গঃ)	৬৯
সাময়িকী	৭১, ১০৭, ১৪৩, ১৭২, ২০০, ২৬৭, ৩০৩, ৩৩৯, ৩৮৪, ৪১৬, ৪৪৭, ৪৮৩	যমের বাড়ি (গঃ)	২৪৩
পাঠকের মতামত	৩৩১, ১৯৮	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	
সমালোচনা	১৪১, ১৯৭, ২৯৯, ৪৭৯	মাতৃবোধন (কঃ)	২০৩
রুপেন্দ্রনাথ ঘোষ		শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	
কালীরূপ বন্দনা (প্রঃ)	৮৮, ১২৫, ১৫৯, ১৮৬	সম্পাদকীয়	২, ৭৫, ১১১, ১৪৭, ১৭৫, ২০৪, ২৭১, ৩০৭, ৩৪৩, ৪১৯
বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত		শ্রীরাইমোহন সামন্ত	
শেষের গান (গাঃ)	১০০	রঙায়োর ভেদ (কঃ)	১৬
সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল (কঃ)	৩৪৭	পান [Pun] (কঃ)	২৯১
বাজীরাম সেন		অত্যাংসাহী (অঃ গঃ)	৩২৪
দাদা ভারত (কঃ)	১২৪	শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য	
রমুজ (কঃ)	৪৭৪	সভাপতির মডেল অভিভাষণ (গঃ)	৩৪
স			
গুলো ছড়িয়ে আছে (কঃ)	১৬৯		

শ্রীরেণুকণা ঘোষ		সার্বজনীন দুর্গোৎসব (কঃ)	
বেদমন্ত্র (নিঃ)	৭৪, ১১০, ১৪৬, ১৭৪, ২৭০, ৩০৬,	মহাকালী (কঃ)	
	৩৪২, ৩৮৬, ৪১৮, ৪৫২	বক্ষিতা (কঃ)	
সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতি নলিনচন্দ্র দত্ত (জীঃ)	৩৬৫	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী	
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী		ভভারভ (প্রঃ)	
অতীত ভারতের ঐশ্বর্য্য (প্রঃ)	৮০	দুর্গাপূজার বিগতকাল (প্রঃ)	
শ্রীমতী রিত্তা মুখোপাধ্যায়		সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	
নেপথ্য নায়ক (গঃ)	১৬৮	রাজকন্যা (গঃ)	
শ্রীরবি কর		শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী	
সেই লেখনী আজ স্তব্ধ (বিবঃ)	৪১৫	ডায়েরী থেকে (প্রঃ)	
শ্রীরতন দাশগুপ্ত		শ্রীসুধীর গুপ্ত	
অধ্যাত্মচেনার আলোকে বিভূতিভূষণ (প্রঃ)	৪৫৭	মহাশক্তি সম্পূজন (কঃ)	
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		কেদার-বদরী (কঃ)	
বর্তমান ভারতের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে		ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী	
পশ্চিমবঙ্গ (প্রঃ)	৮	গান (গাঃ)	
শ্রীশান্তনু দে সরকার		শ্রীসুশীতকুমার মিত্র	
ছবি (গঃ)	৯৮	তোমাকে শুধাই (কঃ)	
শরৎ-সাহিত্যে জীবনের গান (প্রঃ)	১৮১	শ্রীসন্তোষকুমার দে	
মুক্তিভীর (গঃ)	৪০৫	তাম্রযুগই বর্তমান সভ্যতার যুগ (প্রঃ)	
শ্রীশ্যামাদাস দে		হুসেন আহমদ নূরী	
মুনাকা (গঃ)	১৩০	আক্ষেপুষ্ঠে শোকাতুর (কঃ)	
রবীন্দ্র স্মরণ (প্রঃ)	২২৯	শ্রীমতী হেমবরণী মুখোপাধ্যায়	
ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়		পরোয়ানা (কঃ)	
বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত (প্রঃ)	২০৭	অবসান (কঃ)	
শ্রীশান্তশীল দাশ		অর্চনা (কঃ)	
আলো চাই, আলো (কঃ)	৩৯৮	শত্রু ও মিত্র (কঃ)	
ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী	
কবির্মণীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত (জীঃ)	১৩	আচার্য্য মতিলালের 'জীবন দর্শন' (প্রঃ)	
শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য		শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে	
নিষ্ফল পূজা (কঃ)	১৬	চট্টল স্মৃতি-সমীক্ষা (নিঃ)	
ভূমি এখনো বেঁচে আছে (কঃ)	১২৪		
একটা পয়সার প্রার্থনা শেষ হ'ল না (কঃ)	১৮২		

সাম্মানিক

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব :

শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমমূর্তি, অসহায়ের সহায়, দুঃস্থের দ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভ ৫০৩ তম আবির্ভাব উৎসব পালিত হলো। গত ২৯শে ৩০শে মাঘ শ্রীগোরাঙ্গ মন্দির, ভূমিতে। শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব উৎসব সমিতি ও শ্রীগোরাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে ভূপাদ বিনোদকিশোর গোস্বামী বলেন, বিশ্বপ্রেম পায়িত শ্রীনিত্যানন্দে। অনাদিকালের অনন্ত আনন্দ-পার ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ। ২য় দিবসে ১শ নিত্যানন্দ আচার্য প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজ বলেন, শ্রীগোরাঙ্গের সঙ্গী হয়ে জনগণের কল্যাণে নিত্যানন্দ আদর্শ সরল গৃহস্থ জীবনেও গর্ভের প্রেমপ্রবাহকে বাহিত করেছিলেন। সন্ন্যাস ও গৃহস্থজীবনে এক মধুর সমন্বয় সমাধান বাংলার নিত্যানন্দ গোরাঙ্গে দেখা যায়। ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করে চ্যানন্দ সর্বভারতীয় প্রেম সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। শ্রী, নানক, তুকারাম, মীরাবাইয়ের জীবনে সেই প্রেম তফলিত হয়েছিল। ঐ উৎসবানুষ্ঠানে কীর্তন পরিবেশন রন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন বণিক ও সম্প্রদায়। ভারতীয় শিল্পী সংসদ, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় সুরারোপিত শ্রীচৈতন্য 'মহাপ্রভু' নৃত্যনাট্যটি সাফল্যের সাথে ভনীত করে।

আগরপাড়া সঙ্গীত সম্মেলনী :

গত ৬ই মার্চ আগরপাড়া তারাপুকুর বিদ্যামন্দির হলে আগরপাড়া সঙ্গীত সম্মেলনীর দশম বার্ষিক পূর্তি উৎসব পালকে সারারাত ব্যাপী এক মনোজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আদান হয়। সভাপতি শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায় এবং প্রধান অতিথি শ্রীদুর্গাধরনাথ লাহিড়ীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তির্দীর্ঘ বক্তৃতার পর সদস্য মানসী দাস ও পম্প পাল তকঠে "সরস্বতী বন্দনা" গান করেন।

ওস্তাদ ইউসুফ আলী খাঁ রাগেশ্রী রাগের খেয়াল, রী ও গজল, বিখ্যাত সারেক্ষীবাদক ওস্তাদ সাগীরুদ্দিন

খাঁ যোগকোষ রাগের খেয়াল ঝুংরী, গজল এবং ওস্তাদ ওমর খাঁ সরোদে সুমং ভৈরো ললিত ও ভৈরবীর আলাপ গং, বালা অতি উচ্চাঙ্গের পরিবেশন হয়েছিল। সন্মিলনী সদস্য-শিল্পীরা সবাই কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তার মধ্যে গোপাল দত্তের দরবারী কানোড়া রাগের খেয়াল এবং অনিন্দ্য চক্রবর্তীর সেতারে বসন্তরাগ খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। তবলা সঙ্গতে পং গঙ্গাধর পিলাই, মানিক ব্যানার্জি ও মনোরঞ্জন দেব সঙ্গত প্রশংসার্হ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমল লোধ, সৌমেন ও কমল বসু।

ওস্তাদ ওমর খাঁ সাহেব সরোদ নিয়ে বসেই প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বললেন—“আপনাদের সভাপতি দুর্গা প্রসাদ রায়ের সঙ্গীতে গুণপনার কথা আমি ৬৭বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ও রায়বাহাদুর কেশব ব্যানার্জির কাছে বহু শুনেছি। তাঁর নব আবিষ্কৃত রাগ “উর্বশী” খুব ভাল লাগল।” উৎসবটি সারা রাত্রি ব্যাপী শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে অশেষ আনন্দ প্রদান করে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব :

গত ৬ই মার্চ ১৯৭৬, “স্কুডেটস্ হলে” মধ্য-কলিকাতার “জয়নারায়ণ চন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব, অবৈতনিক পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয়”-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব এবং বাৎসরিক পুরস্কার ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ তৎসহ বিচিত্রা-নুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমলিকুমার রায়চৌধুরী, প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ), দরিত্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক ও বাৎসরিক ক্রীড়া বিজয়ীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন পূর্ণবাসন দত্তের ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রীমতী হুমায়ী বসু।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রবিবাসরের খ্যাত-নামা কবি শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীনবকুমার সেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, অরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, রামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিবেকা-

নন্দ মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর প্রধান সম্পাদক শ্রীকেদার ঘোষ বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার রায়চৌধুরী শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিগতাব্দাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিবরণ আলোচনা করেন।

প্রবর্তক সাহিত্যচক্রঃ

প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক সভাতে (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) অধ্যক্ষ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক, আভা পত্রিকার সম্পাদিকা। শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায় এর পিতৃদেব দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রবর্তক-এর বিশিষ্ট কর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র দেব অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নিরবে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তি কামনা করা হয়। অধ্যক্ষ সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুধীরকুমার মিত্র,

গত ২২শে ফাল্গুন ১৩৮২ (ইং ৬ই মার্চ ১৯৭৬) বে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সর্বশ্রী রিজতা মুখোপাধ্যায় ডঃ ফটিকচন্দ্র কুণ্ডু, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আরাদনা গুপ্ত মুকুল বাগচি, অপূর্ব চক্রবর্তী, বীথিকা দাস, অশোককুমার ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ পাল, রেখা চট্টোপাধ্যায়, সুধী কুমার বসু, উত্তর বসু, তুষার দে, গঙ্গেশ ভট্টাচার্য, সম্মী গুপ্ত, ঋতীশ চক্রবর্তী, দিলীপ মুখার্জী, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রকৃতিরঞ্জন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দাশ, ধীরেন্দ্রপাল ধর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ অংশ গ্রহণ করেন।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

বর্তমান চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্তক-এর ৬০ তম বর্ষ শেষ হলো। ১৩৮৩ বৈশাখ বিশেষ সংখ্যা থেকে প্রবর্তক-এর ৬১ তম বর্ষ শুরু হবে।

গ্রাহকদের মধ্যে যাদের বর্তমান বর্ষের (১৩৮২ সন) দেয় চাঁদা এখনো বাকী আছে, তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ—বৈশাখ মাসের মধ্যেই বকেয়া চাঁদা পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করুন।

প্রবর্তক-এর অনুরাগী গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যয়শীলতা ও ডাক ব্যায় বৃদ্ধির হেতু সাধারণতঃ বকেয়া চাঁদার জন্য স্বতন্ত্র কোন তাগাদাপত্র দেওয়া হয় না। কিন্তু অনেকেই নিত্য-দিনের ব্যতিব্যস্ততায় আমাদের প্রত্যয় বিষয়ে অবহিত নহেন বলিয়াই আমাদের এই বিনীত নিবেদন।

পত্রিকা পরিচালনের আনুষঙ্গিক সবকিছুরই ক্রমবর্ধমান আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি পত্রিকা প্রকাশই সংকট-ময় করে তুলছে। কিন্তু তবুও আমাদের সহৃদয় গ্রাহকদের আর্থিক সংকটের কথা চিন্তা করে এবছরও চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হলো না। মিশনধর্মী ও ভারতীয় ভাবাদর্শ প্রচারে ব্রতধারী প্রবর্তক ভরসা রাখে, গ্রাহকগণ নিজেদের দেয় চাঁদা যথা সময়ে পাঠিয়ে দিয়ে ও পত্রিকাখানির প্রচারে সহযোগিতা করে এই সংকটকালে পত্রিকা পরিচালনের সহায়ক হবেন।

যে-সব গ্রাহকের নিকট একাধিক বর্ষের চাঁদা বাকী, তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইলে, দুঃখের সহিতেই আগামী বর্ষের বৈশাখ বিশেষ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য হব।

—পরিচালকঃ প্রবর্তক

সম্পাদকঃ অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদকঃ শ্রীরবি কর
প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হান্ডটোন লিমিটেড, ৩২১৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

P 8286